অমৃত

সম্পাদকঃ
শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ

৩য় খণ্ড, ৩৬শ সংখ্যা] শুক্রবার, ২রা মে, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৪০ পয়

শীতে
বোরোলীন
অ্যান্টিসেপটিক সুরভিত ক্রীম
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে।

সহযোগিতার জন্য আপনাকে

ধন্যবাদ

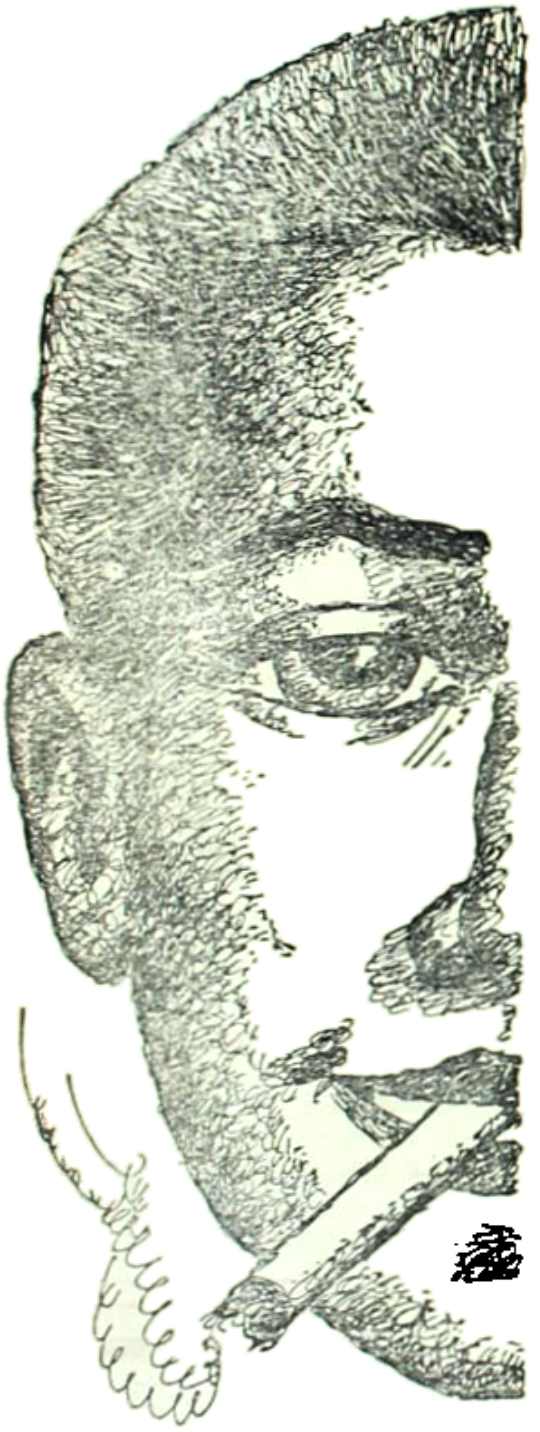

আপনি আমাদের দেশী ব্র্যান্ডের সিগারেট খান, ওটা ভাল বলেই এবং আপনার অন্যদেরও তাতে সায় রয়েছে। নানাভাবের কড়া চাপ ও নিরুৎসাহ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি যেটা একবার বেছে নিয়েছেন সেইটেই ধরে রেখেছেন মনের সাথে এবং আপনার বিচারবিবেচনার জোরে।

আপনি চড়া প্রচারের ঘটায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি এবং এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে গেছেন যে, তাদের প্রস্তুত সিগারেট অথচ আছে ভুল ধরে বিদেশী সিগারেট বলেই মনে হয়— সেগুলির দাম দেশী বলেই সত্যি-সত্যি কমও দেখা যাচ্ছে না। আর, তাছাড়া এখনও আপনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানেন যে তাদের সেরা সিগারেট তৈরী করবার মতন চমৎকার, অর্থ ও ঐতিহ্যের পর্যায়েই রয়েছে এবং সত্যিকারের দেশী সিগারেটই এখানে তৈরী হতে পারে যাতে ভারতের অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাও অপব্যয়ের হাত থেকে বাঁচান যেতে পারে।

আপনার এই আদর্শের গুণের এবং আপনার অভ্রান্ত বুদ্ধিমত্তার সুযোগ্য ধ্বজাধারী দেশী দেশী সিগারেটই যান, তাদেরই গুণের ভিত্তির ওপর দেশের এই নিজস্ব সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ।

আমাদের দিক থেকে আমরা আপনাদের সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতিই আমাদের দিব্য লক্ষ্য।

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-৩১

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

'এখন আমায় যে দেখে সে-ই বলে...

আমার আছে এখুরন্ত শক্তি!'

হরলিক্স খেয়ে স্বাস্থ্য আর মনের আনন্দ ফিরে পেয়েছি!

ঠিক বুঝতে না পারলেও পুষ্টির অভাবে অনেকেই ভোগেন। ফলে ক্লান্তি আসে আর ঘরে-বাইরে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ডাক্তাররা তাই হরলিক্স খেতে বলেন। হরলিক্স বাড়তি শক্তি ও উৎসাহ যুগিয়ে ষোল-আনা কর্মঠ করে তোলে। বাড়ীর ছোট-বড় সবার পক্ষেই হরলিক্স আদর্শ শক্তিদায়ক পানীয়।

মাখন বাদামের গুঁড়োর সঙ্গে দুধ ও মধুর পুষ্টিকর সংমিশ্রণ

হরলিক্স বাড়তি শক্তি যোগায়!

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমনোনীত প্রবন্ধ সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া আবশ্যক।

২। প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩। প্রবন্ধ সম্বন্ধে পত্রালাপ করতে হলে টিকিট দেওয়া খাম অবশ্য পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর সর্তাবলী এবং যে কোনোরূপ জ্ঞাতব্য বিষয় পত্র দ্বারা জানতে পারেন।

গ্রাহকদের প্রতি

১। বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পূর্ব বৎসরের যে কোনো সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। নমুনা হিসাবে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকদের নিকট হইতে পত্রিকা ভি-পি-তে পাঠানো হয়।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ৬-০০	টাকা ৬-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৩-০০	টাকা ৩-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৩২৩১ (১৪ লাইন)

পুস্তকাকারে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ

আজ কাল পরশু

মিহির আচার্য প্রণীত

দেশ-সমাজ-মানুষ আজ অশান্তির মুখে প্রবেশ করতে চলেছে। দায়িত্ববান সাহিত্যিকমাত্র সাহসের সঙ্গে সে-সকল সমস্যার মোকাবিলা করেছেন। কুটাভাসে হাঁড়িয়ে নয়, জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ে। বাইশ বছরের স্বাধীনতা, সীমান্ত-সংঘর্ষ, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা-ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিভাগ, রবীন্দ্র শৈবিক্ষণ কলকে প্রভৃতি আধুনিক সমস্যাগুলির সঙ্গে এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শোষণের সাহিত্যিক, ডাক্তার, শিক্ষক, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি মানুষগুলির অস্তিত্ববোধের প্রশ্নও এই গ্রন্থে সোচ্চার।

অথচ লেখক সাহিত্যের বাস্তবতা কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি।

এ-গ্রন্থ আজ-কাল-পরশুর ইতিবৃত্ত।

দাম : ৫·০০

অন্যান্য গ্রন্থ

পূর্ববাঙলার গল্পসংগ্রহ	৫·০০
পূর্ববাঙলার কবিতা	৪·০০

পুস্তকপ্রাপ্তি : ৯৭৮/৩এ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৪

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

অমিয় নিমাই-চরিত (৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ৩·০০

নরত্তম চরিত (হিন্দী) ২·০০

কালাচাঁদ গীতা ৪র্থ সংস্করণ

নয়শো রুপিয়া ও বাজারের লড়াই (নাটক) ১·৫০

নিমাই সন্ন্যাস (নাটক)। ৪র্থ সংস্করণ ২·০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা (৪র্থ সংস্করণ) ১·৫০

নরত্তম চরিত ৩য় সংস্করণ ২·০০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH De-luxe Ed. — Rs. 6.50

লর্ড গৌরাঙ্গ (২টি খণ্ড) (ইংরেজী) প্রতি খণ্ড ৩·০০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান : পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

• বিজ্ঞাপনে বিশ্বাসী গ্রন্থ •

সারদা রামকৃষ্ণ

—স্বয়ংসিদ্ধা শ্রীসুধাময়ী দেবীর পূতচরিত্র।—সর্বশিক্ষাসুলভ জীবনকাহিনী।... সম্প্রতি সর্বাঙ্গসুন্দর উপায়ে বাহির হইয়াছে!! সাধারণ সংস্করণ মূল্য ৪।০—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের অন্যতম কর্মীজীবনী। আদ্যোপান্ত পরিচয়। ৪—ইহার জীবন অবলম্বনে বঙ্গভাষায় ইতিহাস রচিত হয়। সাধারণ সংস্করণ মূল্য ৪।০—৫৲

সাধনা

অনুপমা ৪—এমন অনাবিল স্নেহধারা-পূর্ণ বাঙ্গালার ঘর দেখি নাই। পরিবর্দ্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গোপীমোহন লেন, কলিকাতা—৪

'লোলিতা'র লেখক

নাবোকভের

প্রজাপতি জীবন

(উপন্যাস)

অনুবাদ : দেবব্রত রেজ

[মূল্য ৬·০০]

অন্যান্য প্রকাশনা

অনুবাদের আরও অনেকগুলি গ্রন্থ।

প্রাণ-পাখের

[উপন্যাস/মূল্য ৭·৫০]

ভূলোকের মর্ত্যি

[উপন্যাস/মূল্য ৩·৫০]

শরদিন্দুবন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্‌চাতুরি

[উপন্যাস/মূল্য ৪·০০]

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

[প্রবন্ধ/মূল্য ৩·০০]

আমাদের পূর্ব প্রকাশিতের অন্য কিছু

রূপা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৪ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৫৮ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 16th January 1970 শুক্রবার, ২রা মাঘ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৮৫২	চিঠিপত্র	
৮৫৪	শুধা চেয়ে	—শ্রীসমরেশ
৮৫৬	মেঘোদ্ধারণে	
৮৫৮	আশ্রমিক	—শ্রীকল্পী বা
৮৫৯	সম্পাদকীয়	
৮৬০	সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ	—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
৮৬৪	ভোজন তত্ত্বের উপাদান	শ্রীবিশ্বু দে
৮৬৪	স্বৈরতন্ত্রিকরা (গল্প)	—শ্রীজ্যোতিরাণ মুখোপাধ্যায়
৮৭২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅরুণকুমার
৮৭৫	ভাষা ঃ হাজার বছর আগে-পরে	—শ্রীঅমিয় মিত্র
৮৭৮	অন্ধকারের মুখ (উপন্যাস)	—শ্রীদেবেশ দেববর্মা
৮৮০	বিজ্ঞানের কথা	—শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায়
৮৮৫	বাদুঘরের ইতিকথা	—শ্রীসাধিবন্দু
৮৮৮	অবিরাম ঝিলমের মিছিলে একটি প্রশ্ন (কবিতা)	—শ্রীশিবশঙ্কর বসু
৮৮৮	এমন মেঘলা কি নেই (কবিতা)	—শ্রীসরলা গুহ
৮৮৯	নিজেরে হারায়ে খুঁজি (স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅমীন্দ্র চৌধুরী
৮৯২	ছয় ঘাবতীয় আই-এস-এস	—শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
৮৯৪	মেঘোদয় (উপন্যাস)	—শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
৮৯৭	বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের (স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
৯০১	ছায়াচন্দ্র (গল্প)	—শ্রীসুব্রত সিংহ
৯০৪	রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা চিত্রশালা	—শ্রীঅমলেন্দু মিত্র
	বুলেটিন	—শ্রীচিত্রলেখা
৯০৬	অন্যমনা	—শ্রীসুশীলা
৯০৯	প্রবর্ধনী-পরিক্রমা	—শ্রীচিত্রদর্শক
৯১০	খেলাধুলা	—শ্রীসুরেশ
৯১২	গল্পমা	—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৯১৪	চোরাবালু	—শ্রীনান্দীকর
৯১৪	খেলার কথা	—শ্রীসত্যজিৎ মিত্র
৯১৬	খেলাধুলা	—শ্রীবর্মণ
৯১৮	বাজার দরের	—শ্রীসনাতন বোস

প্রচ্ছদ : শ্রীসনৎ বক্সী

সকল প্রকার আধুনিক ষ্টেশনারী কাগজ, সাহেবী ব্লটিং ও ইণ্ডিয়ানস্যাটিন ইত্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ

৬৩-২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : অফিস : ৩৭-৬৪৬৮ (২ লাইন) ৩১-৪০৫১, আবাসিক : ৪৭-৪৪৪৪ (২ লাইন)

চিঠিপত্র

'নিজের হারানোর খুঁজি'—

শিশির বসুর পত্র প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় শিশির বসুর পত্রটি পড়লাম। আমিও বাক্তিগতভাবে শিশির-বসুর কাছ থেকে এই পত্র পেয়েছি।

প্রথমেই এই পত্রের জন্য শিশিরবসুকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

যাই হোক, প্রথমেই আমি দুটি স্বীকার করছি যে 'আরবী হুসে' নাটকের ফরাসী পত্রিকার বঙ্গানুবাদকে ধরে, পত্রিকাটি চট্টোপাধ্যায়। এই দুটি আমার অনিচ্ছাকৃত। 'আরবী হুসে' মনস্থিটি আমার আসার আগে করেছে। এবং সেটি নাটকের সময় আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তবে এখন ভুল হবার কারণ যোগাযোগ এই যে আমি যে নিজে হাতে লিখি না, আমি বলে যাই—লেখকের ভূমিকা অন্যের। সুতরাং এ ধরনের ত্রুটি যদি অসম্ভব কিছু নয়।

শিশিরবাবু অবশ্য লিখেছেন, 'আরবী-হুসে নাটকটি ভিত্তিক হুসোর 'The King's Amusement'. নাটকের অনুবাদকে ধরিয়ে, 'ফিলোলিটো'র গল্প অবলম্বনে নয়। আমি এই প্রসঙ্গে বলবো যে, 'আরবি'-র আগের 'ফিলোলিটো'র কথাটি আমিই বলেছিলাম পুচিকাভিবাদকে। অবশ্য তিনি নাটক দেখেন। কলাবাহুল্য এই নাটকের নামকরণ আমি করেছিলাম।

নাটকের কথাটি আমি পেয়েছিলাম Gustav Kobbe-এর Complete opera Book থেকে। Complete opera Book-এর সম্পাদক Gustav Kobbe বলেছেন, ভিক্টর হুসোর 'Le Roi' Amuse-এর আগের নাম 'ফিলোলিটো'। এবং Tom Taylor আমার এই ইংরাজী নাম Fool's Revenge

শিশিরবাবু এই বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, এই যে উক্ত পত্রিকার আরবী হুসে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয়নি। এইসব পত্রিকা যেমনের Le Roi' Amuse-এর আক্ষরিক অনুবাদ করে 'The King's Amusement' করেছিলেন। তবে তখন যে ইংরাজী নামটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম Fool's Revenge তবে পরবর্তীকালে যদি The King's Amusement নামে কোন নাট্যাভিনয় হয়ে থাকে, তাহলে সে সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই।

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকে মাধ্যমে আমি শিশিরবাবুর পত্রের উত্তর দিয়ে পূর্বোক্ত উত্তরটি দিলাম।

অহীন্দ্র চৌধুরী
মোহনবাগান রোড,
কলকাতা-২৭

(২)

প্রথমে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অভিযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্তত ৩৪ সংখ্যার (১৭ই পৌষ) শ্রীশিশির বসু দুটি স্থলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ১ প্রথমে 'আরবী হুসে' নাটকের ফরাসী পত্রিকার বঙ্গানুবাদকে' বা 'পত্রিকাটি চট্টোপাধ্যায়'—এ প্রসঙ্গে আমার কোনো বক্তব্য নেই, কারণ বিষয়টি আমার অজ্ঞাত।

কিন্তু অন্য প্রসঙ্গটি নিয়ে তর্ক। অহীন্দ্রবাবু লিখেছিলেন, 'আরবী হুসে' নেপোলিয়ন অপেক্ষা 'ফিলোলেক্রোর' অনুসরণে; শিশির বসু বলেছেন—'ফরাসী হুসোর The King's Amusement অবলম্বনে রচিত। এখানে বিরোধ কোথায়? নেপোলিয়ন যখন বিবাহে অপেক্ষার কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন হুসোর ঐ নাটক থেকেই। নাটকটির ফরাসী নাম 'লা রোয়া সাহেব'—ইংরিজিতে The King's Amusement নামে সেকালে বিখ্যাত হয়েছিল। কাহিনীর কাঠামো 'ফিলোলেক্রো' ও হুসোর নাটকে এক ও অভিন্ন।

উৎপল দত্ত
বিজন স্টীট,
কলিকাতা-৬

কুমার-মুখোপাধ্যায়

সৌম্যাটির শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনকে বিশেষ অভিনন্দন যে সম্প্রতি 'আনন্দের মাঝে' তিনি ১৩৭৬ সালের মাঘমাসী 'আনন্দ' টকেলিট পত্রে প্রখ্যাতজন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কুমার-মুখোপাধ্যায়' নামে একটি অসম্ভাষ্য প্রতি আমার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ রচনাটিতে আরবী ও ফার্সী ভাষার অনাদৃত অবহেলার অভিযোগের ও মুখোপাধ্যায়কে মিলিয়ে দিয়ে অনাদৃতভাষীকাবিবাদের আবহের এক মহান অবহেলের সমস্যার সমাধান করেছেন উদার সুরে, সুলালিত ভাষায়, মহৎ আবেদনে, উত্তর ও দক্ষিণের মিলন মন্ত্র ঘোষণা এক মহাযজ্ঞের সাথে তুলে। আরও-পর-পালক এই কথাটি, বরাবর এসেছেন কবির অন্তর, লক্ষ্মীনিকেতন প্রাণ, আশ্রমের নিষ্ঠা, ঐক্য-হারানোর তার সন্ধান, যা শ্রীযুক্তদের মুখের হতে উপযুক্ত, আমাদের বা' হতে সম্ভাব। এই তার মোদা উত্তরাধিকার, তাঁকে অভিনন্দন।

এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলবার অনুমতি চাইছি আমি। বহু বছর পূর্বে প্রাচীন আরবি সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কলেজের থেকে প্রকাশিত কৃতীয় সংখ্যা মুখের সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক 'পঞ্চপুষ্প পাই' বা 'দল কথা' বইটি হাতে আসে। তাতে একটি গাথা-কাব্যের নাম 'ফিরদৌসি-উল-পক্ষি' অর্থাৎ ফিরদৌসের বা মুক্তোদল বা মুক্তোকণ্ঠ পাখিদের আসে যাওয়ার পথ। কিম্বদন্তী আছে যে সুলতানিয়া আমির কবি মহাকবির (যিনি বাদুরাই-এর কবি-পরিষদে শিরনিন্দা করায় অভিশপ্ত হয়) তিনিই এর রচয়িতা। বর্ণিতের এই বিপুল সাহিত্যসম্পদের কথা আমরা অনেকেই অবগত নই। অনেকে দাবী করেন যে, গ্রীক প্রাচীন ওমরাজিয়ান সাহিত্য ওমরেরের চেয়েও পুরাতন। সুনীতিবাবু এই ফেরদৌসির আমাকে খৃ পূর্ব ১৫০০ বছরের বেশী নিয়ে যেতে চান না।

সম্পাদক হচ্ছে যে মাদরাই মাদরাসার কবি পরিবেশের এক বৈঠকে (যার সভাপতি স্বয়ং শিব, মুক্তোকণ্ঠ সম্পাদক এবং অন্যান্য একজন বিশিষ্ট সদস্য—এবং যাঁদের প্রতিনিধি হয়ে কবিতাবলী করতেন অন্য লোকেরা) পান্ডারাজ একটি প্রশ্ন তুলেছেন—তাঁর অধিকারী দুর্বলতাবলে তিনি এমন সুন্দর শ্লোকগুলির যার তুলনা হয় না, সে সম্বন্ধে যদি কোন কবি একটি কবিতা রচনা করেন, তাহলে তাঁকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। এখানেই উপস্থিত ছিল এক নবীনতম শিবভক্ত কবি। সাহসিক সেই তরুণ প্রথমে করলে নিবেদন করে যে, প্রভু আমি কবি, আমাকে একটিদিনের জন্য কবিতাশক্তি দাও, আমি তোমার নাম নিয়ে রাজার কাছ থেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করি। হঠাৎ লিখেছা শিবলে একটি ভুর্জপত্র পড়লো তাতে লিখিত ছিল একটি অপরূপ কবিতা—এক শ্লোকে এক প্রহরকে বলছে, হে প্রহর, তুমি তো ফুলে ফলে বহু দেখা দেছিলে, কিন্তু বল দেখি যদি কোন সুন্দরী উন্মনা তোমার জালাতলে এসে তার সুরভিত কেশপাশে যে সুখের ছোয়া তার কি কিছু তুলনা আছে, যদি সে রাত্রিনী তোমার 'প্রথম রজনী' হয়? কবিরা পড়লো সে রাজসভায়, রাজা মুগ্ধ, সভাসদরা চমৎকৃত, উপস্থিত কবির বল অনেক। সভাপতি মাদুরাইয়ের উচ্চ মুখে হাসি ফুটলো, এ কবিতা কবিতাই নয়, এর জন্যপাত্র অযোগ্য তুমি যে কবি নও, তার চেয়ে তুমি

চিঠিপত্র

নিয়ে এসেছো, নিয়ে এসো তাকে—আমরা সেই কবির সঙ্গে দৈনন্দিন লড়বো। কিংবা গিয়ে বলো, 'অন্যের কাছে সব নিবেদন করে' শিব কবিতা চুপ করে চলেছেন পাঠকদের অধিকাংশ। নাকচকীরা বললেন, 'দুঃখ' এ কবিতার ভাষা না যে কোন স্পর্শকাতরকে কেন ব্যথা থেকে সুরক্ষিত হয় না, গদ্য না হলে চুম্বনমাত্রেই বা ঠোঁটের স্পর্শ না পেলে? শিব" বললেন, কেন উনার কেশপাশ সব সময়েই আপন সৌন্দর্যতে ভরা—।

মহাকবি নাকচকীরা অচল, বললেন, হতে পারে না। মিথ্যা সব সময়েই মিথ্যা, অন্তর শিব বললেও মিথ্যা। অঘটন ঘটে গেলো। শিবনিন্দায় কবি আবিষ্টপ্রায় হয়ে পড়লেন এবং শিব ভক্তি আবিষ্ট হলেন যে, একমাত্র মুহূর্তেই তাকে বাধিয়ত্ব করতে পারেন। পরে থেকে থেকে এক বৈরাগ্যে হৃদে তিনি বন্দী হন। সেই অবাগারে তখন ১১১ জন হতভাগা বন্দী হয়েছিল। কবির কলমের চোটে হয়ে মহাদেবের সেই বৈরাগ্য বিনাশ করে তাকে উদ্ধার করে। তাঁরই কলমকারা 'শিবমহিমোত্তরপত্তি'।

এই দেবতা তামিল-নাড়ের একজন আদিত্রিয় দেবতা এবং এঁরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছেন অন্যান্য দেবতারা। মুরুগু, অর্থাৎ সৌন্দর্য ও যৌবনের তিনি অধিকারী, তিনিই হলেন কার্তিক, স্কন্দ, বেলন বা বেলায়ুধন্, (বেলধারী), তিনিই সুব্রহ্মণ্য (সুব্রহ্মণ্য), মুরুগন্, কুমারস্বামী, সুব্রহ্মণ্য (সুব্রহ্মণ্য), আরুমুখন বা ষড়মুখ (ছয় মুখবিশিষ্ট)। কিন্তু কুরুঞ্জ বা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে তিনি হচ্ছেন মুরুগন্ বা কাদবুলদেবন্ (পাহাড়ের দেবতা)। ৩১৯—এই হচ্ছে তামিলদেশ বা মহাদেবী কাদু।—এই কথা বা সত্যের মূলেও তথ্য আবেগও দেখা যায় আর-তামিল সভ্যতার একটা সংক্ষিপ্তসার ও সমীকরণের প্রয়াস। কিন্তু উত্তরভারতের যে দৃষ্টি সভ্যতা আজও পাশাপাশি পাঁড়িয়ে এই ভারতের মহামানবের সাধনতীর্থ কবির অপমানে সকল হয়েছে। দ্রাবিড় তামিলিবাদ্ সেই বিদেশী আমাদের আবার ইণ্ডিয়ান বিদেশ। রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন, আমাদের দেশের মধ্যে আছেন অনার্যরা। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই মনে করি। অর্থাৎ আস্ত তিনিদলকে টুকরো টুকরো ও টুকরো তিনিদলকে জোড়া দেওয়ার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের বিশ্ব বলতে যে ধারণা আমাদের তৈরী হয়, যা কিছু করে ছোটো এবং কিছু বড়ো, নিজের আমে যা আছে তিনি তালগোল না করে মনের কথা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ বলতে পারেন অন্য কারুকে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। সুনীতিবাবুর যেমন ধর্মনিষ্ঠা তেমনি ধারণাশক্তি, অনেক বড় আয়ত্ত তাঁর সম্ভ্রম। সেই জন্যই কবি সম্মেলনে তাঁকে উপাধি দেওয়া উচিত লিপি ধর্মপাত কিম্বা লিপি সাবভৌম। সেই লিপি-ভট্ট-বংশীকেই নমস্কার জানাই।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-পত্র প্রসঙ্গে

আমি অনেকের নিয়মিত পঠক। পত্র সংখ্যার সালবনীর সম্পাদক পুষ্পেন্দ্রনাথ রক্ষিতের, নিখিল বসু, বীরেন মজুমদার ও অজিত ঘোষের চিঠি তিনটি পড়লাম। এই যুগ্ম সম্পাদকী সম্পাদক ও বীরেন মজুমদারের পত্র সম্পর্কে কোনো আপত্তি বা জানিয়ে পারছি না। বহির্বঙ্গ হিসেবে নিরপেক্ষতার উদাহরণস্বরূপ আমার এই পত্র।

প্রীতিভাজন সরকার মহোদয়েষু, বেতারে এক্ষেত্রে একজনে আমরা কারুরই কথা 'চরম প্রয়োজনে হবে' বলেছেন তাতে স্থির প্রতিজ্ঞক 'চন্তা করলে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। (১) সম্পাদক মহোদয় ভালো লেখা পেলে বহির্বঙ্গের লেখাও ছাপতে চান বলে যে উদারতার প্রমাণ দিতে চেয়েছেন, তাতে ধোকা যায় আমরা কোন ভাল খোলার বড়ই অভাব। কিন্তু আমরা যাঁরা এই বেলেই অন্তত বাংলার বাইরে আছি, তাঁরা বাংলার 'বাংলা' ভাবে নিকটবর্তী উত্তর বাংলার লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক ইচ্ছা পোষণ করি। (২) সম্পাদক মহোদয় যে কয়জন লেখকের নাম দিয়েছেন তা ছিন্ন উত্তর বাংলার আর লেখকদের কি লেখক বলে স্বীকার করতে চান না? না-কি ভোগৌলিক ভেদনার জন্যে থাকতে চান? আমি অসংকোচে অন্তত নির্দ্বিধায় বলতে পারি, উত্তর বাংলার এমন অনেক লেখক আছেন যাঁরা সারা বাংলার এমনকি আমাদেও ভোটাভোটি পাঁয় চড়। তাঁদের বাদ দিয়ে আমাদের লেখা কালেকের কি কারণ থাকতে পারে? (৩) বন্ধু প্রীযুক্তবাবুর চিঠির মধ্যে উত্তর বাংলার লেখকদের সম্পর্কে যে আমার ক্রটি করা হয়েছে, তা যেমন উত্তর বাংলার লেখকদের কাছে অপরাধজনক, তেমনি আমরা যাঁরা দূরে থাকি তাঁদের কাছে তিনি সম্পাদকের মুখের বাণির পালনে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। (৪) শ্রীবীরেন মজুমদার 'সালবনীর' পিঠ চাপড়ানো এক জায়গায় বলেছেন, উত্তরবাংলার পত্রিকা প্রকাশের সমস্যা ও কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে যে দু চারজন দূরের লিখেছেন তাঁরা অযাচিত সোহার্দ্যের আবেদন লিখেছেন। বাধি তাই হয় তবুও ভালো।

প্রবীর দাস,
গোহাটি—৩,
আসাম

(২)

আমি অনেকের সাধারণ পাঠিকা হিসেবে চিঠিপত্র বিভাগটা নিয়মিত পড়ে থাকি। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যপত্র প্রসঙ্গে যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাদের শ্রীবীরেন মজুমদার ও নিখিল বসু—দুখানা চাপা-পড়ার পত্র দুটি আমার চোখে, মনে হয় সারা উত্তর বাংলার পাঠক-পাঠিকাকে আহত করেছে। বিশেষত একটি পত্রিকার সম্পাদক হয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর যেভাবে আমরা ঘুরছে মোহরেন, এখন সে কথা নিজের গায়েই না পড়ে! আমরা জানি সম্পাদককে বিশ্লেষণচিত্ত, উদার মনোভাব এবং সাহিত্যজ্ঞ হতে হয়। কিন্তু এদিক থেকে 'সালবনী'-র সম্পাদকমণ্ডলীর ব্যর্থতাই।

আমরা প্রায়ই লক্ষ করে থাকি, গৃহ-বিহারে কবিতা পাঠের আসর এবং মাসিক সাহিত্য সোসাইটির নিয়মিত অধিবেশন করে থাকে। তাছাড়া এখান থেকেই একটি মাসিক কবিতা-পত্র (হিন্দুতে) প্রকাশিত হয়ে থাকে। উত্তর বাংলার সাহিত্যসেবীরা প্রায়ই নিশ্চয়ই জানেন, এখানকার প্রেস-কলুরা, বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক সংগ্রহের পরিশ্রমসাধ্য বাধা অতিক্রম করে নিয়মিত কবিতা-পত্র প্রকাশ করাটা কতটা কষ্টকর। একমাত্র এখানকার কবিদের আন্তরিক নিষ্ঠাই এ-একটিকে সফল করতে উৎসাহিত করেছে।

শ্রীবীরেন মজুমদার চাপার সংখ্যার চেয়ে সমালোচনা বেশী করেছেন। উত্তর বাংলার কবি-সাহিত্যিক এবং পত্রিকা বিষয়ক প্রবন্ধের খবর রাখা দূরে থাক, নিজেই তিনি লেখেন কিনা সন্দেহ হয়। উত্তর বাংলা থেকে কবি কেউ পিঠ চাপড়ানোর মত করে কোন অঞ্চলকে তিনি করে কিন্তু লেখেনই, লেখে ভালই। আমরা অঞ্চল থেকেও এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর পশ্চিম বাংলার কাছে তুলে ধরা হতে পারে। এ বিষয়ের সমালোচনার চাইতে বিজ্ঞজনের মতো কাজে লাগাই শ্রেয় নয় কি?

রীনা মুখোপাধ্যায়,
হিন্দুস্থান কলোনি,
জলপাইগুড়ি।

শাস্তি চোখে

নিবর্তনমূলক আইনের প্রয়োগ শেষ হয়ে গেছে। এই আইনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সরকারই আগ্রহ প্রকাশ করেনি। একদা কেন্দ্রীয় সরকারও একদা এই আইনের প্রয়োগকারী ছিলেন। প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োগ করুন, এ আইন পুনরায় চালু করলে তাঁদের প্রশাসনিক মনোভাব সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের উদ্রেক করবে। কারণই এই 'আলাদাকরণের' নয় বছর জীবনযাপন করে কেউ আর কাউকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করতে চান না। ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, আইনটাই অপরাধী, যারা আইনকে অপপ্রয়োগ করেছেন তাঁরা সকলেই নির্দোষ। ক্ষমতা হস্তান্তরের হাতে পাশির অশ্রু কেউই সে দেখি। অন্য না থাকলে তার চলনিকার পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যে কোনোরূপ অপরাধের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বিনা বিচারে আটক আইন অথবা নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রায় শাধীনতার পরিপন্থী সকল সরকারই এই দেখে, বিশেষত এই ক্ষেত্রে, সরকারদের ক্ষমতা চালু রাখে। প্রথম যখন এ প্রয়োগ করে তখন বেসরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে 'আলাকরণ' চালু করেছিলেন তখনই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সেদিন যে মোহ আচ্ছন্নতার আজ তেমন করেছিলেন, সমালোচকেরা বিনোদের পরিবর্তন করেছেন এই আইন প্রয়োগ করা হয়। এবং সরকার বেসরকারি বিনোদ-ভরে বেসরকারী সদস্যগণ এই আইন প্রয়োগ উদ্দেশ্যে আলোচনা করেছেন। পর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পরিস্থিতির ধারণাই না যে বিশেষের ব্যাপারে তাঁরাও বিনা বাধায় আটকাদেশ হতে পারবেন। তাঁরা এইসব আলোচনা করেছেন, কিন্তু তা কখনোই তেমন জোরে যে আলোচনার ফলে আইন বাতিল হতে পারে। তবু এ আলোচনার কার্যকারিতা একেবারে নয়। বেসরকারী সরকারও ক্ষমতায় এই কথাই বলেছিলেন যে, কোনো গণতন্ত্রে আলোচনায় কিন্তু মানুষকে আটকে রাখতে দেওয়া হবে না এবং তার উপর পুলিশী অত্যাচার চলতে পারে না। সরকার বিরত থাকবেন। তুলে নেয়ার এই মোক্ষমকে সে'সব অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন এবং কেউ তাঁদের এই সেই আশ্বাসকে সেদিন স্মরণে আনেন নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি বেসরকারী সরকার নিবর্তনমূলক আইন এই ধরনের চালু রাখবার কথা বলতেন তবে কি তাঁরা সাঁজাই রাজনীতি প্রতিক্রিয়াশীল ও অগণতান্ত্রিক বলে পরিগণিত হয়ে যেতেন? সমালোচকদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, এক কথায় উত্তর হবে 'না'। কারণ, ইন্দিরা-সরকার পুনরায় এই আইন চালু করবার সাহস করেন নি তাঁর সরকার পতনের ভয়ে। সব তাঁকে রাজনীতির প্রবেশিকার নতুন করে প্রগতিশীলরূপে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এই দৃষ্টি কারণেই তিনি অগ্রণী হন নি। তাঁরপর অতীতের ঘটনাবলীর আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইন্দিরাজী নতুনরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠার করার চেষ্টাও করেছেন বটে। কিন্তু প্রথম তুলে সরকারের এমনে ফিরে থাকার কথা নয়। তাঁরা হয়েছেন মরা জমানার ভাঁড়ার। ঐ আইনের সঠিক প্রয়োগ জানার তাঁরা দেখাতে পারতেন দেশের দিকে চলতেই সকলেই বদ্ধ হয় না। সমস্যার দেশেই সকলে মানব বদ্ধ যায় না। কিন্তু তুলে সরকারও সাহস করে কেন কথা বলতে পারলেন না। তুলের পরাজয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চীরাপ্রতি বসু প্রথমে এর সম্পর্কে বলেই পরে যেন উঁচু প্রতাহারের পথ খুলে পরিছিলেন না। কিন্তু কিন্তু সরীক ও একেবারে আটকের চীকার করে উঠেছিলেন যেন পৃথিবী রসাতলে চলে গেল! এই আটক আইন কিন্তুতেই চালু রাখা যেতে পারে না। অথবা উঠলেন বহুত বদ্ধে যেতে তার সরকার। অতএব, এই আইনের শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা যেন্তের হতে থাকলে কথা খারাপ হতে পারে। কিন্তু যে ইন্দিরাজীর সঙ্গে সমালোচনে কথাবার্তা নিয়ে সকলে পরে যেন পরেছেন সেই প্রধানমন্ত্রীর সরকারকে কি আইনের অপপ্রয়োগ থেকে নিরস্ত করা যেত না?

আটক আইনকে রাখার কথা একালাত করা হচ্ছে না। নেহরুর কথা পরক পুলিশি সহকার আবার বিরোধের চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্র আলোচনা গণতান্ত্রিক আবার কোন্‌টা গণতান্ত্রিক নয় এ তর্কে প্রবিষ্ট হয়ে অনেকেই ইচ্ছুক হবেন না। কারণ এ বক্তব্য অত্যন্ত আপেক্ষিক। একেবারে চূড়ান্ত করসালা না হওয়া পর্যন্ত কোন্ সরকার সঠিক তা নির্ধারণ করা যায় না। যা হোক একটা সমাধান সুপারেখা সৃষ্টি করে যদি আটক আইনটি রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রয়োগ করা না হত তবে আইনটি এত খারাপ এমনকি দেখতে মনে হত না। সরকারের হাতে যত খারাপ লোকের হাতে পড়লে তাও বিচিত্রও খারাপ হয়ে যায়। ব্যক্তিস্বাধীনতার খারাপ দিক অত্যন্তই আটক আইনটি উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে অত্যন্ত খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তুলে সরকারও সমালোচনার প্রয়োগ ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কেউ কেউ আইনটি খারাপ বলে ছাঁটিয়ে ওঠেন নি।

এক্ষুণি কথা বলার প্রয়োজন, উল্লেখন হল, এই আইনের মন্দ্রা ধরার 'অনেক পুলিশ ও সরকারী মতে অনেক সমাজ-বিরোধী লোক নাকি ছাড়া পেয়ে যেতেন' ফলে, আইন শৃঙ্খলার উপর একটা বেশী চাপ পড়বে। পুলিশের বক্তব্য, এ যেন খারাপ লোকের মুক্ত হাওয়া সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার উত্তরণ উন্মাদ হয়ে উঠেছে। পাড়ায় পাড়ায় গড়াইয়ের সমাজে বাড়বে। আর, একটি কিন্তু হলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে বিস্ফোরণ। তারপর দৃষ্টির পর যা আসে রামকরে হত ঘটবে পুলিশের আবির্ভাব। ঘটনা ডায়েরীভুক্ত হয় না। প্রেপ্তারের সংখ্যাও কম। অতএব, কোনো কিছু ফাইল হলেই ধরা যাবে না। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, উত্তর আসবে সাধারণিক অবস্থা বিরাজ করছে, আসামের হাত নাই। কি অবস্থা বলবে, যেন কেউ কাল নিয়েছেন, অবস্থার, যাই হউক কাল কোনো স্পর্শ করা চলবে না।

কোন সরকারকেই সমাজবিরোধী বলে অপরাধিত করার উদ্দেশ্য সরকারী নেই। অতএব, সরকারী মনে করে থাকেই দুষ্কৃতকারী বলে অভিহিত হয়েছেন তাঁদেরই এই সময়ে প্রশ্নের কাঠগড়ায় এক-একটি ইস্তিত হয়। আবার ধরা পড়ে অবৈধভাবে কারাগারে জনাই কেউ কেউ সমাজবিরোধী আখ্যায়িত হয়েছেন বলে বাধ্য দিতে চান, তাঁদের সঙ্গেও পুরোপুরিভাবে সহমত হওয়া কঠিন। আইনিসম্মত রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের মানুষিক দিক দিয়ে মিলবার হয়ে পারেন। কিন্তু সেদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা যে ভাল সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকার সুযোগ খুবই কম। তা সত্ত্বেও বিহারে খুন, ডাকাতি ও আরও আসামাজিক অপরাধমূলক কাজের প্রবণতা ঐ দেশে খুবই বেশী। অতএব, অর্থনৈতিক দুরবস্থাই এ দেশে এ ধরনের অসামাজিক অবস্থার জন্য এককভাবে দায়ী, একথা বলা চলে না। তবে একথা পুলিশ অপরাধীকেও ধরিল করতে পারে এবং তার সাজা দিতেও সক্ষম হয়। কিন্তু এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেই এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নিয়ে রাজনীতিক সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধিরা আমাদের অপরাধীর বিচারের জন্য এসে পড়ে থেকে। সেই অপরাধীও অবশ্য অপরাধীরাই

অধিবাসী। দীর্ঘ অরাজকতার পর বর্তমানে দুঃখ এ অঞ্চল এই রাষ্ট্রি অরোভিলের সরকারের কাছে জীবন নির্বাহের জন্য পেনশন দাবী করেছেন। এবং এই দাবীর যৌক্তিকতার উল্লেখ করে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর অতীত কর্মকালীন সময়ে তাঁকে অবহেলা করে রেখেছিল, ফলে কর্মক্ষমতাই তুমের হবার স্বপ্ন দেখতে তারা পেতেন। তাদেরই অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গির বাহির হতে পরিচয় হতে পারে নি। সরকারের বিপরীতে রাস্তাদের কাছেও কিছু কিছু প্রশ্নের চিহ্ন রেখে গিয়েছে। এক যদি রাজনৈতিক অথবা দুঃখদর্শিতার কথা কথা মনে আর এই দাঁড়ায় যে, উক্ত "অসহায়ী" একটি শ্রেণীর পক্ষে শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। অতএব, বর্তমানে হিন্দুসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে উক্ত রাষ্ট্রি যে পেনশনের উপযুক্ত প্রার্থী তা, এখনো একদল প্রতিক্রিয়াশীলরাই অস্বীকার করতে পারেন। তাদের মনে হয় অসহায়ী পুলিশ বাহিনীর কর্তারাও এই অসহায়ীর দাবী দুঃখজনক বলেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা কর্মকালাপকে তারা হয়ত শ্রেণী-সংগ্রাম বলে নিয়েছেন। তাই বিশ্লেষকে ঠেকাতে চান না বলেই হয়ত অসহায়ীদের প্রতি সিমাপরায়ন। এভাবে বিচার করলে পুলিশের কথা ভিন্নতর ছিল। আর তাই হয়ত আইনে পরিণত যা কিছুত ঔপনিবেশিক কালের ঘটেই চলেছে। তার বিশ্লেষণ হয়ত আইনে প্রকাশিত হয় না। তবে মনে হয় আইন শৃঙ্খলা রিক্ষা আছে, পুলিশ তাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করে চলেছেন। কিন্তু উপরুক্ত এসকার অভিযোগীরা ঘটে প্রসন্ন। নিরাপরাধ অবস্থায় তাঁরা হয়ে পড়েন আতঙ্কগ্রস্ত। আইন আইনের সার্বিক প্রয়োগের ফলে এতদিন পশ্চিমবঙ্গে অন্তত এই ঘটনা আর চোখে পড়েনি। এখন সকলেই লক্ষ্য করছেন, এই আইনের উপযোগিতা ছিল। তাই নতুন কোন আইনের মাধ্যমে কি ভাবে এই উপায়ের যোগাযোগ করা যায় তার জন্য অনেক বুদ্ধিজীবিদের চোখে পড়েছে।

কিন্তু কথা কি, লড়াই তো এখন সর্বত্রই চলছে। ঘরে বাইরে লড়াই চলছে, চলছে মনে মনে লড়াই, পড়ায় পড়ায় লড়াই। লড়াই চলছে স্বামী-স্ত্রীতে, আর রাজনৈতিক নেতাদের তো। লড়াই চলছে না কোথায়? দুঃখ সমাজবিরোধী আজ একটি শ্রেণীরূপে স্বীকৃতি করে দেওয়ার দিয়ে সময় কি? চলছে যোগার লড়াই, চুরির লড়াই—ডাকির, ধর্ষণের লড়াই—তার কথার লড়াই। এবং লক্ষ্য করে দেখুন, কথার মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এই কথাও আজই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আজ ঘোষণা। এবং সেই কথার লড়াই অস্তিত বিভিন্ন প্রকার চলছেই। কথা আলো হবে কিনা জানি না। সার্বিক শান্তি স্থাপন হলেও হতে পারে। কারণ কে বিরুদ্ধের গলায় মালা দাঁড়াবে। আর বাঁচানোর সময়ই বা কখন, সেই প্রশ্নই আজ অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। তাই এখন চলছে, শুধু কথার লড়াই।

সমাজবিরোধীদের লড়াইয়ের পদ্ধতি কঠিন, তার স্বামী-স্ত্রীর লড়াইয়ের কাঁদে জড়ী। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের লড়াইয়ে কাঁদিয়ে দোষী চাপানো। আর কথায় বহরই দেখুন না। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নিজের শাসনকালেই অর্থের অনটন। আর সহযাত্রী বলছে অনেকদের, মুখ্যের দল। এ কথার লড়াই যখন তখনের জনমনে বাইরে শুধু কথার প্রথম অনুনিহিত নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে অনেকদের এসে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর মত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ এই কথা বলতেই পারেন না। মুখ্যমন্ত্রীর মনের কথা হয়ত তাই হয়েছে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে তিনি কথাদুলো যে ঠিক মত এমন একটি বিবৃতি দিলেন। কিন্তু শুদ্ধ প্রশ্ন এ কথা বলায়ই তার দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সমাধানের লড়াইয়ে সহযোদ্ধা শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, তুলসম শুদ্ধ কি বলতে কি বলেছেন, কে জানে?...আমরাই বুঝতে পারছেন লড়াই কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

এদিকে আন্দোলন শুদ্ধ হয়ে গেছেন, কি করে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়? সন্ধির শর্ত কি হবে? তার আলোচনাই বা কি নিয়ে শুদ্ধ হবে? শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন আগে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে, তবেই তো সন্ধি-সভা হয়। অন্যদিকে তাঁরই দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সভার কিন্তু বার্তা আছে বলেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমোদবাবু মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চলেছেন। যদি ধরা হয়ে, দুজনের ভাবভঙ্গি একই হয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাঁড়ির জন্যে। অতএব এই প্রশ্নের সমাধানের আগে প্রয়োজন।

কিন্তু অনেকেরই মনে হয়, মার্কসবাদী দলের মধ্যেকার মতবিরোধ ইচ্ছাকৃত। সমালোচকেরা কারণ যদি অনুনিহিতরা এক ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু কেরালা অনুষ্ঠিতদলের পতনের পর দেখা যাচ্ছে তারা বর্ণবিদ্বেষ এবং বড়দাও অবলম্বন চেষ্টে। পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার উল্লেখ করে তুলসীরা তারা দিয়েছেন, এটা সংগঠন ও পরিবর্তীর দলের লড়াইয়ের অভিব্যক্তি। আবার কেউ কেউ বলছেন, যার অনুনিহিত নেতারা বলে। কর্মীদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছেন। এর একটা না একটা যে হবেই তাতে যেন সন্দেহ নেই। কারণ পুরোনো প্রেস তাদের আগের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে দুঃখ দিয়েছেন বলে তেমন একদাও বলেন নি। আর সে কথা কেউ বলেনই, তবে মুখ্যমন্ত্রীও ঐ একই কথা বলে দিলে সমস্ত লড়াই শান্তিতে হয়ে যায়। তাহলেই কথার লড়াই চাপিয়ে যেতেন এমন এমন এক পর্যায়ে এসেছেন যখন কেউ যদি একটি ইঁট সরা নয় বলে তখন তবে মুখের সমস্ত কারণ সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই আজ সহজ আপসটাই কবে আজ দুর্ঘট। অবস্থার পরিবর্তন অনেকদূর। কারণ ইতিমধ্যেই অনুনিহিত পার্টির সম্পাদক তার হাতে সেন আবার বাজারাম প্রেছেন। তার সেন বলেছেন, মার্কসবাদীরা সিদ্ধিকেই অন্যেরের সঙ্গে তাঁতাত করে চলেছেন। উদ্দেশ্য ঃ কেরালার মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করা, ইন্দিরা সরকারকে অসম্মান করা, আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ছোট করেন। এই অভিযোগ যে নতুন আর করের সৃষ্টি করবে সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন কারণই থাকতে পারে না। তার সেন, আগে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা সমস্তই তাহলে হতে পারে। কিন্তু দুঃখের কথা আঁকড়ে ধরে কথার লড়াই আবার শুদ্ধ করা হলে তখনই মুখ্যমন্ত্রীকে হবে মুখের শান্তিই সকলেই চান। এরপরবর্তন কথা কি পরিস্থিতি বলা যায় না। তবে সাময়িক বিরতি ঘটতে পারে মাত্র। কারণই কথার লড়াই শেষ না হলে কিছুই হবে না। এবং সবাই যখন আবার শুরু করে তখন সব স্তরের লোকজনই যে শান্ত থাকে এত শর আশাও করা হয় কি করে। তবে যদি আইনটা থাকত হয়ত জ্যোতিবাবু একটি সংবেদ লড়াইকে কম করে রাখতে পারতেন। সে হল সমাজ বিরোধীদের লড়াই। কারণ, সে লড়াই তেমন চায় না। কিন্তু সমস্যাই যখন প্রতিপক্ষীয়তার রূপে নেমে পড়েছেন, তখন সমাজবিরোধীদের "অসহায়ীত্ব" অধিকারের ঢালা অনুকম্পাই সমালোচনা হবে কৈকি?

—অমর্ষী

দেশে বিদেশে

এস-এস-পি'র সংকট

সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীকর্পূরী ঠাকুর গত ৩১ জানুয়ারী তারিখে রায়পুরে হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি সমাজবাদকে (অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের শ্রীচরণ-সিংহের সরকারকে) বাঁচাবার জন্য সি[illegible]সিংহের কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোন চেষ্টা হলে আমার মত সমাজবাদীরা সেটা সহ্য করবে না।'

শ্রীঠাকুরের এই বিবৃতির দু'দিনের মধ্যেই জানা গেল, পার্টির বসড়া প্রস্তাব তৈরীর জন্য যে কমিটি যে বসড়া প্রস্তুত করেছেন তাতে উত্তর প্রদেশের শ্রীচরণসিংহ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ পার্টির চেয়ারম্যান যে নীতি গ্রহণ করতে না বলে বিবৃতি দিলেন ঠিক সেই নীতি গ্রহণ করার জন্যই সুপারিশ করা হল।

এ ঘটনাবলীর পেছনের রহস্য কি? বিশেষ করে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে বরাবরই যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে এবং পার্টির নীতি কি হবে সে-বিষয়ে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল পার্টির উপরোক্ত এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত দিয়ে।

এ ঘোঁয়াটে অবস্থার শেষ হতে হলে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এ ঘোঁয়াটে ভাবের মধ্যে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি কেন কয়েকটি এগিয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে বিহার ও উত্তর প্রদেশে পার্টি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাল এবং দুই রাজ্যেই অকংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় শরিক হল। এ ঘোঁয়াটে ভাবের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ রেখাটি পার্টির ভিতরে দেখা দিল। এ ঘোঁয়াটে ভাবের মধ্যে স্পষ্ট দিকে যে বামপন্থী ঝোঁক দেখা দিয়েছিল তার জন্য মেধাবী আক্রান্ত হল। কয়েকটি বিষয় হয়ে উঠল এস এস পি'র শ্রেণী পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

এর উপর আবার নতুন একটা ধাক্কা দিয়ে এল কংগ্রেসের তরফ। এমনিতেই পার্টির অবস্থা তেমন ভাল চলছিল না। আসন্ন নির্বাচনে উত্তর প্রদেশ ও বিহার উভয় রাজ্যেই বিধানসভায় পার্টির শক্তি হ্রাস পেল। কেরলে মন্ত্রিসভার যোগ দেওয়ার প্রশ্নে একদল সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পৃথক হয়ে পার্টি ছেড়ে। পশ্চিমবঙ্গেও পার্টির ভিতরে ভাঙনের ষড়যন্ত্র সম্ভাবনা দেখা দিল। এর উপর যখন কংগ্রেস ভাঙল তখন এস এস পি'র সামনে অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে এসে দেখা দিল। পরিবর্তিত অবস্থায় কংগ্রেস-বিরোধিতার অর্থের অবস্থান কোথায় হবে? আজকের পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-বিরোধিতার অর্থ কি দুই কংগ্রেসেরই সমান বিরোধিতা? অথবা এক কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্য কংগ্রেসের বিরোধিতা করা? যদি দ্বিতীয় পথে যেতে হয়, তাহলে কোন্ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধা হবে আর কোন্‌টির বিরোধিতা করা হবে? কংগ্রেসের যে অংশ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রয়েছে তাকে ক্ষমতা থেকে হটাবার জন্য পার্টি কি চেষ্টা করবে? সেই চেষ্টা করতে গিয়ে শ্রীমতী নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান কি যুক্তিযুক্ত হবে?

এইসব প্রশ্নে সম্প্রতি সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে যে ধরনের মতভেদ দেখা দিয়েছে সেটাই শ্রীকর্পূরী ঠাকুরের বক্তব্য ও বসড়া প্রস্তুতকারী কমিটির বসড়া প্রস্তাবের পার্থক্যের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। বসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সি[illegible]সিংহের কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা-বলা হয়েছে তাই নয়, কেন্দ্র থেকে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে হটিয়ে দিয়ে তাই বলা কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি বিকল্প সরকার গঠনের কথাও বলা হয়েছে। অন্য দিকে বিহার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেখানে এস এস পি শ্রীমতী গান্ধীর অনুবর্তী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধবে না। প্রস্তাবে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংযুক্ত কংগ্রেস যদি অবিলম্বে মৌলিক কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কর্মসূচীর বিভিন্ন ধারার রূপায়ণ করতে সমর্থ হয় তাহলে ঐ কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা সরকারের পরিবর্তে যে আট দফা কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এই বিষয়গুলি আছে—একটি নতুন সংবিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে নতুন গণপরিষদ গঠন, অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ, অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের ও হরিজনদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান, মাসিক ১৬০০ টাকার বেশী আয়ে কেউ যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা, সরকারী চাকরীর ৬০ শতাংশে অনগ্রসর লোকদের জন্য সংরক্ষণ, ভারতীয় প্রশাসন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগদান, বিদেশী পেট্রল কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, চা-বাগিচা, সাবান-সুতো বীমা, রপ্তানী-বন্ডানী বাণিজ্য, চিনি, কাপড় প্রভৃতি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ইত্যাদি।

যেসব বিষয়ে সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে বিশেষ মতভেদের আহ্বান করা হয়েছে, তাকে উপলক্ষ করেই এই বসড়া প্রস্তুত। এই বসড়া প্রস্তুত করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তাতে ছিলেন এই ছয়জন সদস্য। শ্রী এস বি গয়াল, শ্রীরাজনারায়ণ, শ্রীমধু লিমায়ে, শ্রী বি কি শিটি, শ্রী আর এস যাদব ও শ্রীকর্ণ কর্পাণ্ডেজ। সম্পাদক শ্রীরাজনারায়ণ কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে, কংগ্রেস বলতে এখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকেই বুঝতে হবে, এবং আজকের কংগ্রেস বিরোধিতার অর্থ হবে সি[illegible]সিংহের কংগ্রেসসহ অন্যান্য সকল দলেরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাত্র কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা—সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টির ভিতরে এই অভিমতের প্রবক্তা হলেন শ্রীরাজনারায়ণ। কিছুদিন আগেই শ্রীরাজনারায়ণ তাঁর দলকে এই নীতির ভিত্তিতে চালিত করার চেষ্টা করে আসছেন।

অন্য দিকে লোকসভার পার্টির অধিবেশনে কর্পূরীঠাকুর পার্টির প্রধান সমাজবাদী শ্রী এস এম যোশী পরাজয় উল্লেখ করতে গিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন, তার সঙ্গে শ্রীরাজনারায়ণের এই অভিমতের আসল তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীযোশী বলেছেন, 'আমাদের সমালোচনা যদি সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে আমরা সমাজবাদীদের সঙ্গে মিলে সংগঠন করার একটা সুযোগ পাব। ইন্দিরা ও সিন্ডিকেট দুই শিবিরেই অনেক

অবশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আমরা ইন্দিরা সরকারকে উৎখাত করে যাবে আর একটি অধিকতর প্রগতিশীল সরকারকে ক্ষেত্রে না নিয়ে আসি, সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।'

শ্রীযোশী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ কোয়ার্টিতে যদি আমাদের এমন বন্ধু থাকেন যাঁরা সমাজতান্ত্রিক ধারায় চিন্তা করেন, তাহলে আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাই। সি এস পি ও কংগ্রেস ফ্রন্টের মত যেসব সমাজতান্ত্রিক শক্তি কংগ্রেসের বাইরে আছে, তাদের সঙ্গেও আমাদের হাত মেলাতে হবে।'

শ্রীরাজনারায়ণের অভিযোগ আর শ্রীযোশীর এই অভিমতের মধ্যে তফাৎ ও ফাঁক-পাহাড়ের। এই ধরনের বিপরীত অভিমত আর কর্তাদের সত্ত্বেও সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে সহাবস্থান করছে সেটাই হচ্ছে লক্ষ্য।

শ্রীরাজনারায়ণ যে লাইন নিতে চাইছেন তার শিবিরে পার্টির বহুজনের সমর্থন আছে কিনা তার যাচাই এখনও হয়নি। সোশ্যালিস্ট যখন পার্টি সম্মেলনে ব্যাপারটা আলোচনার জন্য আসবে তখন হয়ত খোলা যেতে পারে, রাজনারায়ণ লাইন পার্টির মধ্যে সত্যটা কতখানি। কিন্তু ইতিমধ্যে পার্টির দৃষ্টি কণা থেকে রাজনারায়ণ লাইনের কিছু কিছু বিরোধিতার কথা শোনা যাচ্ছে। কাঁথাটে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার এস এস পি সদস্য শ্রীবন্ধুর আহমেদ শ্রীরাজনারায়ণকে পার্টি থেকে বিতাড়নের দাবী এনেছেন এই অজুহাত দেখিয়ে যে, তিনি শ্রীনম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য ও সমস্ত পার্টির মত প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

সোশ্যালিস্ট পার্টি সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে জানা যাচ্ছে যে, কলহ চূড়ান্তকরণী কর্মীরা যে কলহ প্রস্তাব তৈরী করেছিলেন, সেটি পার্টির জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতিকে দিয়ে বহুত কাঁটছাঁট করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। জামসেদপুরে ডিলিগেট হয়ে আসেনি, পার্টির সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করা হয়নি, বিভিন্ন অভিমতের মধ্যে সমন্বয় করা যায়নি।

কয়েকদিন আগে জামসেদপুরে পার্টির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কার্যকলাপের অভিযোগ করেছিলেন যে, কংগ্রেস বিদ্রোহীদের যে-দল তৈরী করেছে, তা ঘুরে ফিরে পার্টির এই বামপন্থী সৌমিক সমাজতন্ত্রের পথ নেবার। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে, সংঘের সোশ্যালিস্ট পার্টি নিজেই যেন বিভিন্নির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সোশ্যালিস্ট সম্মেলনের পর পার্টি এই দল থেকে অবশ্য অবস্থার মোকাবিলা করতে পারবে কিনা সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

মাও সে-তুং সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥ ৮·০০

মাও সে-তুং সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে অনেকেরই কৌতূহল প্রচুর, কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মপ্রণালী সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য অতি অল্পই পৌঁছেছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই সমস্যার তথ্য সন্ধানের এই প্রথম। যাঁরা মাওবাদ সম্পর্কে কৌতূহলী এই বই তাঁদের তৃপ্তিসাধন করবে। সমস্যাময় 'লং মার্চ' এবং মাও সে তুং-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রচুর তথ্যপূর্ণ রয়েছে। সমস্যে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিদেশিনী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৮·৫০ মেঘদূত।

জাহাজের সামান্য কেরানি-এর কাজ নিয়ে লেখক সিঙ্গাপুরের আকৃষ্টিকতার অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী লেখনীমুখে এক মনোরম পরিবেশে করে উপস্থিত করেছেন। সেখানকার পাড়াগাঁয়ের নিশিকন্যা আর চীনেমাল্লা ধরনের আকাশচারী পরিবেশে পড়ে উঠেছে এক অসাধারণ উপন্যাস।

তৃতীয় নয়ন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪·০০

সূর্য কাঁদলে সোনা প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ১৫·০০

বিপ্লবী মেদিনীপুর নিরঞ্জন ঘোষ ॥ ৪·০০

চাঁদে যাবেন যাঁরা ডক্টর বন্দেভার ভ্যানবুশ ॥ ৪·০০

এখানে পিঞ্জর শঙ্কর দাস ॥ ৮·০০

ভয়ঙ্কর ৪·০০ **আকাশকুসুম** ১·০০
অতীন বর্মণ বিমল কর

যৌবন-নিকুঞ্জে নিমাই ভট্টাচার্য ॥ ৪·০০

দ্বীপায়ন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

অমৃতী নাথানিয়েল হথর্ন ৭·০০ ॥ নতুন চীনের কবিতা সম্পাদক ॥ মরুথ বসু ৩·০০ ॥ ভিয়েতনাম মনীন্দ্র রায় ২·০০ ॥ বন্যা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৮·৫০ ॥ ভিয়েতনাম ঃ কবিতা কেদার বরুণ রায় ৮·০০ ॥ সুচেতনে সুবোধের গল্পবেদ ৭·৫০ ॥ বেনারসী সেপাই কবিতা ॥ ৭·০০ ॥ মকলালবাড়ি ও রাজনৈতিক আবর্ত ॥ কৃত্তিবাস ওঝা ৫·৫০ ॥ —নতুন বই

শিক্ষার পটভূমি, পরিবেশ ও পদ্ধতি
অধ্যাপক অশোককুমার সরকার ॥ ১২·৫০

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্য ॥ ১০·০০
শিক্ষাতত্ত্বের আধুনিক রূপবিকাশ অধ্যাপক অমীয় বর্মণ অধ্যাপিকা সরলা ভট্টাচার্য ৮·০০

সেনগুপ্ত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলি—১২

জনসন : অনিচ্ছুক প্রেসিডেন্ট!

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের একটি আত্মজীবনী সেপ্টেম্বরে বাজারে প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্সিতে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জনসন বলেছিলেন যে, ১৯৬৪ সালে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দাঁড়াতে চাননি, নিতান্ত তাঁর স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, সে-কথা তিনি আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন। জনসন বলেছেন যে, তিনি কখনও ভোলেননি যে, তিনি শিকার যেমন ধরতে ভালোবাসেন তেমনি রাজনীতিকে ভালোবাসেন এবং সেই কারণেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার অনুপযুক্ত।

জনসন শুধু মুখে মুখেই ক্ষান্ত হননি। ডেমোক্র্যাট দলের শুধু যে একটা বড় অংশের অনুরোধেই তাঁকে ১৯৬৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল, সে-কথার সমর্থনে তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল পর্যবেক্ষণের সামনে লিখিত প্রমাণও দাখিল করেছেন। সেই লিখিত প্রমাণ হচ্ছে, স্ত্রীর কাছে লেখা জনসনের একখানি 'মেমো' ও স্ত্রীর কাছ থেকে তার জবাব।

কিন্তু জনসন কি সত্যই একজন অনিচ্ছুক প্রেসিডেন্ট ছিলেন? অথবা, তাঁর শাসনের আমলে তিনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ বলে যে-ধারণা গড়ে উঠেছিল, সেটা খুব জোর ইতিহাসে নতুন করে লিখতে চাইছেন? হোয়াইট হাউসে বসে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সঙ্গে পরামর্শ করছেন চিঠি চালাচালি করে, এটা কি স্বাভাবিক? অথবা জনসন আগেই বুঝেছিলেন, পরে তাঁর জন্য লোকে বিদ্রূপ করা অনেক সহজ এবং সেজন্যই তিনি লিখিত প্রমাণ রেখে দিয়েছিলেন।

আমেরিকার বেসরকারি মহলে, এমনকি সংবাদিক মহলেও জনসনের কাজের ধরন নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরা তাঁর সেইটি জনসনের একনায়ক ভাব বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তাঁরা তাঁদের নিজেদের পুরনো নোট মিলিয়ে দেখছেন, জনসন যে-সময় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মেমো চালাচালির কথা বলছেন, সে-সময়ে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর নির্বাচনী অভিযানের কার্যসূচী নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা করেছিলেন এবং এ-বিষয়ে তখন তাঁর আচরণের কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি।

আরও কোন কোন মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাকা আইনজীবীর মত জনসন তাঁর আসল মনোভাব সে-সময়ে গোপন করে গিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের পদের গৌরবের চেয়ে শান্তিই যে তাঁর কাছে বড় ছিল, তা তিনি সাংবাদিকদের টের পেতে দেননি।

দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট থাকাকালে জনসন যেমন বিতর্কিত মানুষ ছিলেন, আত্মজীবনী প্রকাশ করার পরও তেমনি তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক চলবে।

সম্পাদকীয়

যুক্তফ্রন্টের নানারঙ্গ

এবারে কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সত্যি সত্যিই নানারঙ্গ ধরে কথা বলে এবং নানারূপে কাজ দেখিয়ে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে হতচকিত করে দিয়েছে। প্রথম বারে যখন যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল তখন অল্পের ওপর দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের বড় বড় নেতারা বলেছিলেন, নির্বাচনের আগে আমরা যুক্ত হতে পারিনি। আপনারা আমাদের ভোট করে যুক্ত করেছেন। আপনাদের দাবি শিরোধার্য। জনতাই যে তাঁদের সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চতম আদালত একথা যুক্তফ্রন্টের মুখ্য নেতা তখনও বলেছেন, এখনও বলছেন। তখনও এক এক দলটী এক একদিকে যেতে চাইছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বর্ষীয়ান মহোদয় একটি ভাঁড়া কাজ করায় এবং দলত্যাগীদের প্রয়োজনায় যুক্তফ্রন্টের কপাল ফিরে যায়। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট কোনোরূপে কাজ দেখাবার আগেই তাঁদের ভোট করে বিদায় করে দেবার ফলে জনতার রোষ গিয়ে পড়েছিল এই দলত্যাগীদের ওপর।

যথারীতি নির্বাচন হলে দেখা যেত জনতা যুক্তফ্রন্টকেই চাইছে এবং আরও স্থিতাবস্থারূপে চাইছে। কিন্তু তার পরের ঘটনা যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে জনসাধারণের প্রবল হতবুদ্ধির ভাব এনে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে লড়তে পারে কিংবা পারবে এমন কোনো রাজনৈতিক দল আপাতত নেই। কংগ্রেস বিধ্বস্ত এবং দিশাহারা। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের একরঙ্গে রাজত্বই চলবার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে এবার যেন কিরোসিন আরও স্পষ্ট, আরও তীব্র এবং আরও অগ্নিময়ী। কারণ, যুক্তফ্রন্টের মেজরিটি এবার প্রশ্নাতীত। সব দলেরই শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং কোনো দলই অন্য দলকে ছেড়ে কথা কইতে রাজি নয়। তার ফলে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের ও বিভিন্ন পথের দল আছে। কেউ মার্কসবাদী, কেউ গান্ধীবাদী, কেউ বা আধা-মার্কসবাদী ও আধা-জাতীয়তাবাদী। বলা বাহুল্য, ফ্রন্টে মার্কসবাদী দলগুলোর শক্তি বেশি। যদিও ফ্রন্টের নেতা হলেন একজন গান্ধীবাদী। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, প্রথম ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর যে-অসহায়তা ও মর্যাদা ছিল এবারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর সেই অসহায়তা ও মর্যাদার ভাব মুছিয়েছে। তাতেও কিরোসিনের কেরোসিন ভাবটা যায়নি। কারণ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু একক বৃহত্তম পার্টি সেহেতু তার ভাগে বেশি দপ্তর ও গুরুত্বপূর্ণ সব দপ্তরই পড়েছে। কিরোসিন যেখানে দপ্তরের কাজের জন্য ততটা নয় যতটা দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে। মুখ্যমন্ত্রীর বলের অভিযোগ, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে।

এই অভিযোগের প্রতিকার খাটিতে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁর সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করলেন না। তিনি অমনি সত্যাগ্রহের আবাহনে জনমত সংগঠনের জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। এই অমনিকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্টের ভিতরে ও বাইরে প্রবল বাদানুবাদ, গালাগাল, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ চলছে। এখনও তার বিরতি নেই। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে তীব্রতম ভাষায় তাঁর নিজের সরকারের নিন্দা শোনা গেছে। এই সরকার বর্বর ও অসভ্য এমন কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশের পর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বেঁকে বসেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী এই উক্তির জন্য দুঃখপ্রকাশ না করলে ফ্রন্টের সৈকে তাঁরা নেই।

এই হল যুক্তফ্রন্টের দাবি। ফ্রন্ট সবাই আছেন, আবার নেইও। ফ্রন্ট চলছে না অথচ ভাঙছেও না। মুখ্যমন্ত্রী এই সরকারের তাঁর সমালোচক অথচ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তিগত তাঁরাই। মুখ্যটা চলছে আকাশে-আকাশে। মন্ত্রিসভার অনেক সব দলের মন্ত্রীই নিশ্চাস্ত নিচ্ছেন। আবার বাইরে তাঁরাই পরস্পরের সমালোচক। এমন বিচিত্র সহ-অবস্থান খুব কমই চোখে পড়ে। একে কোয়ালিশনও বলা যায় না আবার যুক্তফ্রন্টও বলা যায় না। কার্যসূচীর ভিত্তিতে যদি যুক্তফ্রন্ট যুক্ত হয় তাহলে এই কার্যসূচীর ভিত্তিতেই পরস্পরবিরোধী দলগুলোর মধ্যেকার ঐক্য থাকা উচিত। পশ্চিমবাংলার স্থিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এই ঐক্যের ধারণা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এদিকে যে-কারণের প্রতিক্রিয়া দিয়ে ফ্রন্ট জন্মী হয়েছিল তা অপরিই রয়ে গেছে।

পশ্চিমবাংলার পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যের কথা। বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের বিকল্পের কথা কেউ চিন্তা করছে না। কেরলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে মার্কসবাদীরা চলে যাবার পরও সেখানে বিকল্প যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ, ফ্রন্ট ভেঙে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি কেউ নিতে চাইছে না। অথচ একরূপে প্রশাসনযন্ত্র চালানোও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। ফ্রন্টের নেতারা ভেবে দেখুন এই অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্যই জনগণ তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন কিনা। এইভাবে আপোষরফা হলে জনতার ক্ষোভ বাড়বে, অশান্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং তাতে পশ্চিমবাংলারই হবে ক্ষতি। যুক্তফ্রন্ট সরকার তার শরিক দলের যা করলে জনতার রোষ তার ওপরে গিয়েই পড়বে। জনগণের উচ্চতম শিখর থেকে যেভাবে আশীর্বাদ পরে হয়েছিল, তার কথা মনে রেখে যুক্তফ্রন্ট সতর্ক না হলে তার ভাগ্যেও সেই দুর্দশাই ঘটবে। এখনই সতর্ক হবার সময়।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

সমাজ সম্পর্কে আমার এক এক জনের এক এক অর্থ মনে হয়। কখনো বলি হিন্দুসমাজ মুসলিমসমাজ, কখনো ব্রাহ্মসমাজ আর্যসমাজ, কখনো ইংরেজসমাজ ফরাসীসমাজ বৈশ্যসমাজ, কখনো ব্রাহ্মণ-সমাজ সদ্‌গোপসমাজ রাঢ়িয়াসমাজ। কখনো বা অভিজাতসমাজ কুলীনসমাজ ভদ্রসমাজ। ইংরেজদের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে আমরাই সমাজকে বলে থাকি। আমার মনে হয় সব অর্থে বলা হয় মানবসমাজ।

ইতিমধ্যে বিশেষ শ্রেণীর সোশিয়ালিজম, সোশিয়াল রেভলিউশন, সোশিয়াল আর্টিস্ট, সোশিয়াল রাইটিংস, সোশিয়াল এডুকেশনের প্রভৃতি প্রয়োগ এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই তার তর্জমা করতে গিয়ে সমাজ শব্দটিকে কথার মতো টেনে লম্বা করতে হচ্ছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে সোশিয়ালিজম কখনো হিন্দু সমাজতন্ত্র হতে পারে না, কিংবা ব্রাহ্মণ সমাজতন্ত্র। তেমনি সোশিয়াল রেভলিউশন হতে পারে না ব্রাহ্মণ্য সমাজ-বিপ্লব। সোশিয়াল আর্টিস্ট বলতে যা বোঝায় তা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমান কিংবা শ্রেণীবিশেষেই নিবদ্ধ। সামাজিক সৃষ্টিকর্তার কথাটার মধ্যে শ্রেণীবিভাগের ইঙ্গিত নেই। কথাটার সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে।

তবে কথাটার ব্যবহার করতে করতে সমাজ শব্দটি ক্রমে ক্রমে ইংরেজী সোসাইটির সমার্থক হয়ে উঠেছে। আমাদের দিনে সমাজসংস্কার বলতে যেমন শ্রেণীবিশেষের সমাজসংস্কার প্রথমতঃ দিনে বোঝায় তেমনি সোসাইটি বলতে শ্রেণী বোঝায় সমাজের অভিজাতসম্প্রদায় বা শিক্ষিতসম্প্রদায় বিশেষ। বস্তু পরিচয়ে শ্রেণী-হীন সমাজ। এদিকে হিন্দু, সমাজসংস্কারক-দের নজর আজকাল খুব প্রসারিত হয়েছে। তাদের কথা বর্ণহীন সমাজ। যে সমাজে সভ্য ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র নয়, শ্রেণী বলতে নয়, শ্রেণী ছুঁইয়াদী নয়।

আমার এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি আমার মতের প্রতিবাদ করায় ঈষৎ রহস্যের সঙ্গে বলেন, "আমি আপনাকে চিনিয়ে দিচ্ছি কী বই, কী জাত, কী শ্রেণী, কী শ্রেণী। আমি শূদ্র আপনাকে চিনে সে শূদ্রকে। ছুঁচো মরা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি নারী। আপনারটি শূদ্রের।"

আমি তা শুনে হাসি। ভিটিস সমাজ-শ্রেণী সম্বন্ধে যাকে বলা হয়, মেন অব দেয়ার অ্যান্ড অব নাথিংনেস্‌ এর অন্তর্গত। শূদ্রত্বের নারী করতে বা আরোপ শূদ্রত্ব করতে পারা যায়। শেষ পর্যন্ত ঐ ছুঁচো আমিই থাকবে।

আমার মধ্যে ভিটিস সমাজশ্রেণীর মানবসত্তার অভাব সেও অনুভূত হতে পারে। ইতিমধ্যে সে কিন্তুর আইন পাশ করেছে যা সামাজিক সংস্কারমূলক। একটি আইন যেটা ভিটিস সমাজশ্রেণীর উপরও টেক্কা দেয়। সেই আইন অনুসারে বাপের বিয়ে হয়ে তাদের বনিবনা না হলে বিশেষ কোন কারণ দেখাতে হবে না, আদালতে কান্না কাঁটতে হবে না, এমন কি শূদ্রত্বেরও না।

ঘর করবার মতো অনেক কিছু আছে আমাদের। এর প্রেরণা এসেছে ইউরোপ থেকে। অথচ ইউরোপ নিজেই ভেঙে ভেঙে নতুন দেশিয়ে চলেছে। ভিটিসও যে অচল তা নয়। ভিসরাইলী-জার্নালিস্টই বা ডেস্টাই জীবনচরিত লেখে তার কি। এদেশও জন্মলী হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু সে কলকারখানার আপিসে আদালতে বিদ্যালয়ে চিকিৎসালয়ে জীবনের মর্মস্থিত যেসব পুরুষের মাংসলী, মজ্জাভেদিনী ও সঞ্চারক।

এই অবলা ঈশ্বরিদে অন্তঃপুরীর সংস্কারমাত্রেরই আদর্শ। যাঁরা ফাইটোনিস্ট ছিলেন বা তারও ছিলেন ফেমিনিস্ট। নারী-আন্দোলনের ও মন্বন্তরীসাহায্যের ছাওয়া গত শতাব্দীতেই আমাদের সমাজে লেগেছিল। বাঙালী ছাত্র মহিলারা উপাসনাকক্ষে আহূত হন। তাঁরা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন। কলকাতায় প্রেসি-ডেন্সী কলেজেও কো-এডুকেশন প্রবর্তন করেন। এমন কথা তখনকার ভিক্টোরেও বিরল ছিল। আমি অবশ্য জানি ভিক্টোর পরে, কালো আমলে। নারীর প্রতি সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হই বা না হই এটা তো ঠিক যে আমরা সমাজতন্ত্রের ছাঁচে নারীকে ফেলে-ছিলাম 'সহধর্মিণী, ধর্মকর্মসঙ্গিনীরূপে' ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি, মেয়েদের খেলা বিদ্যাবিদ্যা-অভিব্যক্তির ভাবনার আমি দি, এমন কি শূদ্রত্বেরও না।

ঘর করবার মতো অনেক কিছু আছে আমাদের। এর প্রেরণা এসেছে ইউরোপ থেকে। অথচ ইউরোপ নিজেই ভেঙে ভেঙে নতুন দেশিয়ে চলেছে। ভিটিসও যে অচল তা নয়। ভিসরাইলী-জার্নালিস্টই বা ডেস্টাই জীবনচরিত লেখে তার কি। এদেশও

এখনকার রূপ—

জন্মলী হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু সে কলকারখানার আপিসে আদালতে বিদ্যালয়ে চিকিৎসালয়ে জীবনের মর্মস্থিত যেসব পুরুষের মাংসলী, মজ্জাভেদিনী ও সঞ্চারক।

এই অবলা ঈশ্বরিদে অন্তঃপুরীর সংস্কারমাত্রেরই আদর্শ। যাঁরা ফাইটোনিস্ট ছিলেন বা তারও ছিলেন ফেমিনিস্ট। নারী-আন্দোলনের ও মন্বন্তরীসাহায্যের ছাওয়া গত শতাব্দীতেই আমাদের সমাজে লেগেছিল। বাঙালী ছাত্র মহিলারা উপাসনাকক্ষে আহূত হন। তাঁরা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন। কলকাতায় প্রেসি-ডেন্সী কলেজেও কো-এডুকেশন প্রবর্তন করেন। এমন কথা তখনকার ভিক্টোরেও বিরল ছিল। আমি অবশ্য জানি ভিক্টোর পরে, কালো আমলে। নারীর প্রতি সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হই বা না হই এটা তো ঠিক যে আমরা সমাজতন্ত্রের ছাঁচে নারীকে ফেলে-ছিলাম 'সহধর্মিণী, ধর্মকর্মসঙ্গিনীরূপে' ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি, মেয়েদের খেলা বিদ্যাবিদ্যা-অভিব্যক্তির ভাবনার আমি দি, এমন কি শূদ্রত্বেরও না।

ঘর করবার মতো অনেক কিছু আছে আমাদের। এর প্রেরণা এসেছে ইউরোপ থেকে। অথচ ইউরোপ নিজেই ভেঙে ভেঙে নতুন দেশিয়ে চলেছে। ভিটিসও যে অচল তা নয়। ভিসরাইলী-জার্নালিস্টই বা ডেস্টাই জীবনচরিত লেখে তার কি। এদেশও

না থাকে। পর মহাদুঃখের 'ওয়ার্নিং' হেলেন। যা আসার ছিল তেমনের আগেই তাঁরা জানী হেমিংওয়ে হেলেন। বাঁচিয়ারা পুরো এমন হোলেস হয়ে পড়ি পর, তাঁদের কেউ কেউ আমাদের দেশেই এসে পাইলট হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ছিলেন তো আর্জেন্টিনা ছেলেমেয়েরা মরতা পুরো পরিবার নিয়ে এসেছেন। এখনো সবকটা পুরোর ছেলেদের জন্মে পুরো হেলার হয় নি। হবে, হবে, একদিন হবে।

ছেলেদের মতো মেয়েরাও এক জীবিকার কথা ভাবে। পুরুষের মতোই৩ এর জীবিকার এক পা ছেড়ে পুরোপুরিভাবে আরেক পা রাখা। স্বামী ও সন্তান আর গার্হস্থ্যজীবনের সর্বস্ব নয়। বিবাহ না হলে আর জীবন আলার নয়। বিবাহ হলে আর সংসার করতে হয় না, মহাসুখে এখন অবস্থানকারীরা। অথচ সাহিত্যে এমনভাবে মহিলা ও অবলা বলা হতো। এখন আর সাধী সাধ্বী অথবা হয়েছেন। সমাজও পুরোপুরি বদলে। সাধারণ জীবন এখন পুরুষের জীবনের মতোই বহির্মুখী হয়ে থাকতে চেষ্টা যা চায়, যখন যাইহোক আকর্ষণ সমানুপাতে। তাঁদের সংসারে অভাব নেই তাঁরাও একটা চাকরির জন্যে কাজল। অথবা যাইহোক সাধার একটা চাকরির উপলক্ষ নিয়েছে। একটা আয়ারাম পর হেলেও তাঁরা অর্থ বাদ। রাজনীতির আসর থাকতে তাঁদের ভাবনা কিসের? এটাও সেই বহির্মুখতার একটা প্রকাশ।

ইতিহাসের অন্তর, আমাদের অন্য আমাদের পুরুজীবনেও একটা বিপর্যয় ঘটে আছে। পুরুষরাও আলিয়ে বিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে, সাধারণে আপিসে পাঠিয়ে পুরুষেরাও কাজে নিয়ে বাইরে? কী নিয়ে থাকবে? এখন প্রচণ্ড সাঁজা হেলে উঠছে চাই। একঘেয়েমি পরিষ্কার হয়ে আছে কথা। পরেছে প্রায়ই একাকিনী বহিনী এখন একলা অন্যায় হেলে আছেন। এমনি অনেক কারণে জীবনযাপনের ধারাটাই বদলে যাচ্ছে। আজ এটা শুধু এক আমাদের নয়, সব আমাদের। নতুন একটা সমাজের প্রয়োজন। আগে হেলে ছিল যারা হেলেদের একাকে যাইহোক পুরুষদের একলাটে এখন হেলে নয়।

আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা সমাজিক পুনর্বিন্যাসের যুগ। একথা যদি সব সময় মনে রাখি তবে অনেক বিষয় সহজ করতে বিবর। সমাজের অনেক আগেই একলাম আমরা এ নিয়ে, কল ও প্রতিকারি, সমাধানের ও মর্মাসা উপলব্ধি করে এসেছে। আইনসংগত আজ হেয় নি। বাজা পুরুষদের হয়ে বহিনী যা সমানার পরে আজ যদি আমের পাওনা বাকী করে তবে সেটা আমার হয়। আমার আই পুরুষ তখনি বলে আমার পাওনা আদালতে করে। কিন্তু আমাদের আমাদের পুরুষদের করে। আমাদের আমার পুরোপুরি যে পর আমরা পড়ি।

পুরুষদের আমাদের ছিল উপরের বিবেক করার আগের দিক থেকে সুবিধের কিংবা পুরুষের দিক থেকে সুবিধের। সেটাও কি আমার ছিল না? আর সেরকম কি আমাদের ছিল না? আমাদের ইতিহাসে পুরুষ-পরিবর্তন হয়ে। নতুন যুগের মানুষের মনে ঠোঁকের ভাব আছে না তখন আমাদের আমার আর আমাদের আমার হেয়ে হেলার বাদ। এমনভাবে আমি আমাদের করা আর কী উপায়ে নতুন আমাদের হবে।

চীনের আর আগের হেয়ে-বিয়েরে আমাদের হেলার বিয়ের হেয়েছি। আমার নাম আমে। ইদানীং সে বিয়ের আমাদের আমি নিয়ে আন্তর্জাতিক আমার আমার করেছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সমালে, মার্কিনদেশে, ইংলিশে একই ধরনের মারী-আমার, একই পদ্ধতির সমস্যা, একই ধরনের সংকটের বা সমাধানের ধরনে আমাদের। সমস্যার এক এক নয়। সমস্ত পুরুষ আর আমাদি। সেই সমস্ত প্রতিক আমাদি। পুরুষ আমাদিও হেলেও হেলেও হেলেও পাওয়া যায়। পুরুষদিদের মধ্যে আমাদিরাও বিরুদ্ধে।

এক আমার আমা হেতে পারে সামাজিক পুরুষদের আমা সমাজের আমা-প্রয়োজন আমাদি। তা হলে পুরুষের আইন না হেলে? আমা হোমার? বিশ্লেষণ করলে হোকা যায় আমা ভিত্তিতেই সব কিছু সম্পাদন করার পর প্রশ্ন উঠবে আমা নিয়ে আর আমরা? আমাদিনীর আমরা কি একজন বা সমাজ বা একজনের হাতে সপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়? আমাদিনীর বিশ্ব আমার হেলাদের নিয়ে কি আমাদের প্রকার মনোপার্থি সৃষ্টি হবে না? আমাই সংগোপনে পরে না? এমন হেলে চলনী আছে কি আমে আমাদের আম বিশ্বের আম হেলোকটি সামাজিকের পরে পড়ে? আমাদের সমাজের আমাদের কি আমাদের আমাদিনের আমাদের করতে পারবেন, না খুলী করে আমাদের? খুলী করে আমাই যদি তাঁদের মতের কথা হয় তবে তাঁদের হাতে আমার আর আমাদের তুলে হেলে হে? আমাদিনের সমস্ত আমিনের হেলে না নিলে পুরুষের নিলাম্বিত হবেই।

আমিনিকের আমার কলমারী। আমাদের পরে তাঁদের আমা কী? কিন্তু আমার যদি আমা হয় আমার আমারও কি প্রমে? সমাজের পুরুষদের তাঁদেরও আমা আছে, তাঁদেরও দুর্বিমন আছে। তবে সেটা আমা-লেটের মতো নিয়ে নিলাম্বিত।

নতুন হেলেদের একমাত্র আপনাদের।

প্র তি শ্রু তি

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল

প্রতিশ্রুতিতে হেলেদের এই আমার এমন হেলে প্রতিটিকে ও আমাদের আমিনিকের হোম হেলেন।

আমাদিনের আমা তাঁর এমন হেলে লিখছেন।

আমাদের হেলে	হোমিনিকের আইনে	আমার আমাদের
পুরুষ পুরুষদের	আমার আমাদের	হেলে আমা
আমাদি আমা	পুরুষ আম	তাঁর আমা
পুরুষি আমাদের	নিয়মের হেলেন	ঐতিহ্য আমাদের
আমাদের নিয়ে	প্রতিমাদের আমা	হেলেনিকের হেলে
হোমিনিকের হেলে	আইনমাদের হেলেন	আমি আমিনা হেলে
আমিনের হোমেন	পুরু আ	হেলেন আমাদের
আমার আমাদের	আমার পুরুষদের	প্রকাশ নিয়ে

প্রকাশ : পুরুষের আমাদের

সম্পাদক : প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য

যোগাযোগের ঠিকানা : ১৮/১ আমাদের হেলে হোম, কলি-৫১। ফোন : ৪৫-৫১১৪

বার্ষিক : ১৫ টাকা ষাণ্মাসিক : ৮ টাকা প্রতি সংখ্যা ৭০ পঃ

প্রকাশিত হয়। এই আমার।

(দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) হেলে আমাদিকে প্রকাশিত হলো, হোমিনিকের আইনমাদির বিশ্বের উপলক্ষে পুরুষের আমাদের নিয়মিত আমার আমাদের নিয়ে। এই সংখ্যার আমরা যাঁরা নিখছেন : আমাদের হেলে, আমার হোমিনিকের এবং ১২জন প্রতিশ্রুতিবাদ নতুন হেলেন।

এমনিল কলিকাল পাঁচ কপি (আমিনিক) ২৫৳। এক কপির ডাকে ৩০৳। আইনের আমার নিয়ে পাঠানো হয়। ভি-পি-পি করা হয় না। আমের আমার আগে ৭০ আমার আমিনিকি পাঠানো হয়।

জেমস্ জয়েসের উদাহরণ

চিঠিপত্র অবশ্য সবসময়ই পড়তে ভালো লাগে, বিশেষ তাঁদের চরমপত্রী লেখা চিঠি বিশেষ বাঞ্ছিত। আর যদি পত্রলেখক তাঁর নির্বাচিত বক্তব্যের কিছু নির্বাচনও করে থাকেন, তাহলে আকর্ষণটা হয় দ্বিগুণ। আমাদের এবার পত্রলেখক পত্রগুচ্ছ নিয়ে আলোচনার কারণ: ইংরেজি সাহিত্যে পত্রলেখক পত্রগুচ্ছ যাঁর সেই এডমন্ড্ ও অ্যাথেনাস্ এর নাম মনে হবে। এই বাঙালি পত্র লেখার পত্রগুচ্ছ তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। সুনীলের একটি বাক্যের এবং চিঠিপত্রটির মধ্যে মিল আছে। ঘটনাচক্রে আমরা পত্রলেখক হিসেবে; অন্যত্র ডি. এইচ্-এর চিঠিপত্রের প্রায়ই আবেগে ও সাহিত্যিক-গুণে পত্রলেখক উৎকর্ষের কথা তোলে। হেমিং ওয়েস্ট, ফিৎজেরাল্ড, লুসেন্স, ইয়েটস্, এজরাপাউন্ড এঁদের চিঠিও বাঞ্ছিত সাহিত্যিক-জীবনকে কতো ভেঙেছে ও নির্মাণ করেছে।

শিল্পীসাহিত্যিকের চিঠি এই জন্যই উপভোগ্য আকর্ষক, মানবিক আবেগের সঙ্গে শিল্পসত্তার বিকাশপ্রক্রিয়ার রসায়নটি হিসেবেও। তেমনি তেমনি পত্রলেখক অবশ্যই করেন তাঁদের শিল্পকর্ম এবং শিল্পজীবনকে, তেমনি শিল্পসাহিত্যের বিষয় এবং বিষয়—যেমন প্রতিভাকে, তেমনি লেখেন নিজের নিজের শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে বা সমাজ—যেমন ইয়েটস্ লেখেন তোমার আইরিশ জাতি এডোলেসেন্সকে। অবশ্যের আমাদের এবার এই পত্রাবলীর সম্পাদক সুনীলই নিজেই উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ যাকে অবশ্য অবশ্যের ১১ পৃষ্ঠার তেমনি পত্রলেখক সেই ফার্স্টক্লাস লিটারেচরের উঁচু থেকে। বন্ধুদের পত্র জীবন পত্রগুচ্ছ যার তার পত্রাবলীতেই। সুনীলের জীবনীর আকর্ষণে নয়, মনের অন্তত সৌজন্যে যার তারই পত্রাবলী প্রকাশই হল পত্র উপায়।

অবশ্য, অবশ্যের পত্রাবলীতে অবশ্য-প্রকাশ অবশ্য সুনীলকেই শিল্পীর সেরাটাই—আলোকই যাই এবং তাঁর পরিচয় বাঞ্ছিত বিষয়বস্তু। অবশ্যের শিল্পী-সুনীলের ছিল ফিলাডেলফিয়া, যেখানে পত্রাবলীর সমাধিক আকর্ষণস্থল শিল্পসুনিল, বন্ধুআবেদন, সমালোচক, পাঠক ও ঘনিষ্ঠ-স্থানীয় ছাত্রমহল, প্রচুর বিজ্ঞাপনসম্পন্ন যাঁরা বন্ধু হিসাবে আকর্ষণেরও হলেও আন্তরিক এবং সেখানকারের স্থায়ী ও শিল্প। এই চিঠিসুনীলের টাঁচবাচক ও সে'চবাচক উপরই অবশ্যের প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন বিভাগ অবশ্যকারে হলেও স্পর্শই ইঙ্গিতাচিত। জয়েস্-পত্রাবলীর সঙ্গেসঙ্গের মতো অনুপ্রাণিত তত্ত্ব ও চিন্তার আকর্ষণের বিশেষ যেসে না। অবশ্যমান সুনীলের দৃষ্টি বন্ধুদের সঙ্গে সাধারণের বিষয়বস্তু আকর্ষণেরও ছিল অবশ্যের সবসময়ে, পাশ্চাত্য ইংরেজের বিভাগ আধুনিক সংস্কৃতিতে তিনি বাস্তবে, তিনি যেমনেই পুরোহিতের মা নিয়ে এই সমাজের উৎসমূলে আর্ট করেন এবং আমার সমাধানে অধিকার হয়ে যেতেন। আসলে, অবশ্যের হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক-মানসে আছি ইংরোপীয়, তাঁর পরিপক্ব মিলনাই যার সেরেছিল যেসে আকর্ষণের উৎসাহ আর্টসে—এক সাহিত্যে ছাড়া। এই দিক থেকে তাঁর পাশ্চাত্যই ছিল আমে এলিজাবেথ সঙ্গে, কিন্তু এলিজাবেথ, অবশ্যের অবশ্যে—তাঁর মিলনবন্ধু এলিজাবেথিয়ান আর তাঁর লন্ডিত এরোমিনেন্স যাকে ধরে অবশ্যের মধ্যে মূল যোগের আত্ম-সম্পূর্ণতা ঠিক আর্টস করেনি।

অবশ্যের এই মানস বন্ধুকল্পনার আর্টস বন্ধু, অবশ্যসঙ্গেই এ বিশ্বাস তাঁর সমাজে—তাঁরই অবশ্যর, যোগের বলেছেই। আর্টাপত্তার মতো সমাজমন্ত্র প্রতিভা, ঐতিহ্যের জীবন, দেহে পরিবার, ভাইবোনে মিলে সংস্কৃতি-প্রাণ; অন্য যোগসাধনের মহর্ষি-পরিবার

বিষ্ণু দে

মন; এইসব কারণে হয়তো শান্তিনিকেতনে অবশ্যের সমাবর্তনে নিমন্ত্রণ। অবশ্য তাঁর চিরাচরিত সেবারত তাই স্টীফেন্সলাস অবশ্যের বাই ডাদারাস কীপস—আমার প্রোডাক্ট ইফো—মানে মর্মান্তিক বই পড়ে তাই মনে হয়, স্টীফেন্সলাসের ডাবলিন জার্নোছিলেও অবশ্যে তত্ত্ব তার সমাবর্তন করে। যেমন যার যে যেমন তাই অবশ্যিন প্রাচুর্যসম্পন্নের করে যান, যাঁরা তিনি ছিলেন পুরুষানন্দ বাচস্পতীর এবং যেমন্ তাঁর সেনাপ্রাণী ডাদারাই ঈশ্বর-কাঁচির বিষয়ে যেমিনাথী অবশ্য স্বার্থপর প্রতিভাবার প্রাণ—যার দার্শিনাগত অবশ্যিনমন্ত্রণী। প্রা. অবশ্যমান প্রোডাক্টই, তাই জেন্ট্রোই-ই আশা অবশ্যিনের যে সে তাঁদের সঙ্গে ডাবলিনে করবে। কিন্তু ১৮।১১।৪, সবচেয়ে আগের নবদ্বীপক ঐ সোনাইটিস্ এমন কি আর্থিক মর্মের বাঁধিনাগত অবশ্য করলেন। তাঁর জন্মের প্রথম প্রকাশ ১৮১১-এ এবং ১১০৩ সালের জীবন ও বিশেষত বিষয়ে অবশ্যকের ডাবলিন্স পাকা হয়ে গেছে। 'দিস ডবল' বলে অবশ্যের একটি নাটক বেরিয়ে গেল এবং জেরাল্ড হাউপ্টমানের দুটি নাটকের অনুবাদ। ১১০১-এ জেনবিক বিশেষের চোখে পড়ে লর্ডসমর্টন রিভিউ-তে আলোচনা হলেন যখন 'জনে উঁচু' নাটকের রিভিউ এবং আলোচনার সময় অবশ্যিনকে অবশ্যন জানান। যার জবাবে অবশ্যে জেমস্ ডাদারাস চিঠি নরওয়েজীয় ভাষায় অনুবোধনয়। ঐর অবশ্য লাইন এখানে উদ্ধৃত হল। "শুধু একটি বিষয়ে আমার দুঃখ রইল, আপনারাই চোখে পড়ল একটা অপরিচিত আর ভাঙাভাঙি লেখা প্রকাশ, যা আমে একটু সুনিশ্চিত এবং আপনার প্রেমিকের আরো কিছু লেখা হওয়া উচিত ছিল।" আবশ্যের। "আর কিই বা বলতে পারি: আপনার নাম আমি প্রথমিত করে বেড়িয়েছি, যেখানে আপনার নাম ছিল হয় অজানা, সেখানে আপনাকে অবশ্যকারণে জানাব। আইরিশ ইতিহাসে আমি শুধু নাম করেছি আপনার প্রোপাগ্যান্ডায়। যেখানে যেতে করেছি আমার যা মনে হয়েছিল আপনার প্রচারক শুধু—আপনার মৌলিকত্বের সম্বন্ধে নয়। যে সব কীর্তির নাম আপনার পক্ষে দোষ—আপনার বাপ, আপনার আয়ার্ল-ভৌগোলের সমস্যা এবং অর্কেস্ট্রেল হার্মনি—মিত্র সাম্প্রদায়িক সংগীত—এ সবের কথাও আমি ভুলেছি। আবশ্যের যা যে আমি একজন আয়রলন্ডপ্রেমিক বা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর তা নই। এবং যখনই আমি আবেগপ্রসঙ্গেরও বা তর্কসাহিত্যিক আপনার কথা বলেছি, তখনোই আমি তাঁকে ভালোবাসার বাঁধন বাঁধিনি।" তারপর জয়েস আরো লেখেন। "কিন্তু আমরা যেন সর্বদা সমাজের প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু নিজেদের কাছে রেখে দিই। আমি ওদের তাই বলতে পারিনি, আপনার কি গুণে আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধনের সূত্রে। কখনো বলে বেড়াইনি আপনার জীবনের যেটুকু আমি জানতাম তাকে কিভাবে গবেষকের দেখতে পেয়েছি আপনারই অক্লান্তিবর্ণনে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে—আপনার পাশ্চাত্য বা আর্থিক অর্থে লড়ে যাওয়ার না। কিন্তু সেই সব দুঃখ বা আপনার প্রলয়ের অন্ধকারের আলোকে আলোকিত এবং জিয়েছেন, জীবনের ভয়সাকে ঠেলে যার করার আপনার সেন্টিমেন্টাল নির্ভীক সম্বন্ধপাতি আমাকে কিভাবে আশা দিয়েছে এবং কিভাবে বাঙালির শিল্পকর্তৃর চাঁচি, বন্ধুবান্ধবদের চাঁচি, রাজনৈতিকদের সব কথাবার্তার চাঁচ আপনার চলন ঐতিহাসিক, সেখানে আপনি হেঁটে চলেছেন আপনার নিজের অন্ধকার বীথিতে আমারও। এবং এই আপনাকে এবার আমি লিখছি। মনে আপনার অর্ধজীবনের দুঃখ দুঃখ হয়ে আসবে এবং আপনি এবার মৌলের কাছাকাছি। আপনার চোখে অন্ধকার ঘনায়মান। আমেরিকা এবার বিদায় নেবে, কিন্তু তারা জানে না....."

এই নৈর্ব্যক্তিকতার পাঁচিই, যার সঙ্গে মিলেছে তাঁর সমাধিক ঔদ্ধত্যক সমালোচনা দৃষ্টি তাঁর ঐকমত্যের মানবিক বিশ্বদৃষ্ট সংস্কারে এবং অর্কেস্ট্রেল হার্মনি, এই এক দৃষ্ট অন্যের অন্ধকার বীথিতে সঞ্চিতের অবশ্যকে তাঁর আর্থাপত্তিজ্ঞান ব্যাকরণে বিশ্বে ইংরেজ লেখকদার অনুসরণকারের অন্যে আকাঙ্ক্ষা দিয়েছে। তাই এই পত্রাবলী অন্যত্র প্রথম নৈর্ব্যক্তিক ধরে হয় এমন কি অবশ্যের চোখে লেখা সেন্সরের বা সংস্কৃতিসম্পর্কে

পত্র-পত্রিকাকে লেখা চিঠিতেও। জরেসের যথেষ্ট অভিযোগ ছিল বাস্তব জীবনের অতি সাধারণত্বের জন্য, যা সম্ভবত কার্থলিক ধর্মে আস্থাবান লোকেরই পক্ষে এবং যিনি স্বজাতির তা দূর করতে চেয়েছিলেন। এবং একপক্ষে যেমন টি. ই. লরেন্সের মাইকেলমাস তাঁর পছন্দ হয়নি যেমনি ডি. এচ-এর বিবাহ-তত্ত্বও তাঁকে টানেনি। এজন্য পাঠকের আনন্দদানের পরিবর্তে আগ্রহ ও পরিশ্রমও জরেসের অন্যতম দুর্বলতার বিপক্ষেই—এক সুশিক্ষিতের ক্ষেত্রে আরও, আবার আরেক অর্থাহীন প্রতিভাবান, ইটালিয়ান ইরেটোর তাচ্ছিল্য অবহেলা-স্বত্বও জরেসের অজানা।

জরেসের অন্যতম প্রস্তাবিতের ছিল ইওরোপীয় মূল ভূখণ্ডের মানুষের বাঁধ ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য এবং তাঁর জ্ঞান ও চিন্তার তাঁর করে আত্মাবিকভাবেই এসেছিল, আকড়া প্রটেস্টান্ট ছোকরাটি বিনায়ে। এবং তাঁর নিজের পরীক্ষার ও কঠিন সংগ্রহিতা জরেসকে সংযত ছেলেবেলার অভিব্যক্তিকরণ হওয়া থেকে, প্রকাশতা থেকে, যেটা সাম্রাজ্যবাদী দেশে দেশে প্রায়ই ঘটে, তা সে বিজেতারই হোক বা বিজিত হোক, উভয়েরই ঘেন্নাই। জরেস দেখেন মানব-জীবনের বিরাটত্বকে এবং তার আয়োজন, তাঁর গরিমা এ দেখতে দেননি। এবং তিনি বুঝেছিলেন যে নিজের অনুভূতি ও কল্পনা-কে অভ্রান্তের নিরপেক্ষতাকে সার্থক গঠনমূলে দেওয়া সম্ভব একমাত্র শিল্পের শরীরে ও আত্মার নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে দিয়ে। এই মোটা বইটে মাত্র একবার এক বেচারাকে জরেস নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন।

এরিস্টটল একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন। জীবনের অনীহামোহন বা ট্রাজিডিকরণ, জীবনের অভাবনীয় অন্ত জীবনের পরিণাম কথা বার আবিষ্কার চরম শিল্পসম্পদিতের উপাদান। জরেস প্রথমতারেই জীবনের অন্তরঙ্গতা ও জীবনের অন্তর্ভেদনাকার বাহিরদৃশ্যে দেখেন। প্রাচীন সম্পর্কিত-এর দোষ তাঁর চিন্তনে গভীর যে কিছু ইংরেজ ও ইংরেজ লেখকদের অনীহা বা ট্রাজিডিকরণ বা তাঁর স্বভাবে বিদেশী। এবং তাঁর বোকেরও আনন্দ ফ্লোরেন্সদুলিতে, তাঁর প্রথম সৃষ্টি উপন্যাসে এবং বিবাহাদাহরের লেখাটেরও বাঁধনের জোরেই প্রকাশ পাওয়া যায়, বাঁধন যে ছেলে আসে বাস্তবিকতা বাস্তবের প্রতি প্রেমে বা অনুকম্পায় এবং আসে যেদি আসে শিল্পকর্মের নৈর্ব্যক্তিক সাধনার ফলে। তবে কোনো প্রকার বাঁধনের দর্শন তাঁর মুক্ত সম্ভব হয়নি, কারণ তিনি পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠানকে মানেন নি তবে তাঁদের নি সেই পরিমাণে মানেন যতটা সুকুমারবৃত্তি। যে কারণে ইপসানি তাঁর ইবসেনের ধারা ও ইতিহাসের মতো বিরে ইবসেনের প্রতিভার পূর্ণাবয়বে হয়ে হয়ে চলেছে। তাঁরই আধুনিক মনের সাহসলক্ষ শেষ বিশ্লেষণে তাঁকে পরাই দৃষ্টিহীন হয়ে যায়।

তবু জেমস জয়েস নিজের আত্মবিক বর্তমানেই কি তবু তাঁর মধ্যে এমন অনেক কথা লেখা ছিল যখন মুখ মানুষের ছবি ছিলেন তাঁকে এক কাঁপ চেম্বারলেন অব নেসেসিটি মানুষ অবশ্যই বইটি পড়ার জন্য বা করবার চেষ্টা করবে তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতির আমন্ত্রণ। অবশ্য অপেক্ষা হবার কিছু নেই, তাঁর অনেক সীমার ও অসম্পূর্ণতা ইংরেজ পাঠকের পক্ষেই উপলব্ধির বাইরে।ছিল জরেসের শিল্পসাধনের জীবন পটভূমি, ডিব্লিনের ও ঘোরসম্পন্ন এক বৃহৎ মানুষের এই কুলে কুলে ভরা ও গভীরতা। মজা লাগে লেখকের স্বোদ্ধতে আত্মজিজ্ঞাসা উপন্যাস ফলা। আইরিশ বুঝে জরেস কি করে পারলেন, যেটা ইংরেজ মনের লেখক হলেন। তা সে যাই বলুক, আর যাই বলুক বুদ্ধিমান জাতী সাহিত্যিক ছোক, সেও সেন অবাক ইংরেজ নয়, সেও তো আইরিশ। এমন কি আইরিশরা উলসও এই কথা বলে ফেলেন, বিরাট সে নয়ই, আমেরিকানও নয়, খাস লন্ডনের মুখস্থবোলির আইরিশরা। তা যেন, জরেস ছিলেন, আমরা ছিলাম, লিখিয়া আছে, পড়েছেন তো হবেই।

আপাতত আমাদের ইহল জরিসপ্রুডেন্স, ডিব্লিনের আলোয় দৃষ্টি, ইহল ডিব্লিনমান্স ওনলি, যা আইরিশদেরই এক ছবির ডিব্লিন এবং ইন প্রোপ্রেস—যার সম্পর্কেও কোনো আর নেই। জরেসের প্রথমটি কবিতায় উপন্যাস জরেসের শিল্প-ব্রত এবং শেষটি তাঁর একদিনের নিরপেক্ষ মানুষ-জীবনের অবশিষ্ট বাঁধন ছেড়ে যাওয়াটাও, যেখানে যার আর ছিল সম্পর্ক, বাস্তব অভিজ্ঞতার একমাত্র সাধনার চেয়ে পারিপার্শ্বিকে কল্পনা প্রতিভার মুক্তির পরীক্ষার আর ও ধর্ম ও নৈতিকতার সীমা নিজের করে নেবে। আবিষ্কার বিরোধী বটে এবং আমরাও অনুভবন করতে পারি তাঁর কঠিন শিক্ষা, স্টেন এন্ড স্টোনের, লেড এন্ড সমের এই বিরাট গভীরের শিক্ষা।

এবং ঐ শিক্ষাটা গ্রহণ করা আমাদের আজ প্রয়োজন। যে সময় ইংলন্ডের—যা ইওরোপেই কঠিন, তা আমাদের পক্ষে হয়েছে আত্মঘাতীপ্রায়। কারণ ইংলন্ড ব্যাপারটা ছিল একটা বিবর্তনেরই প্রক্রিয়ায়, ক্রমবর্ধমান জীবনসমবর্তনিক জীবনরীতির যোগাযোগ থেকে ছিল হওয়াটা এক অসম্ভাবিক ও আত্মঘাতের আমলে অতীতের কিন্তু প্রায় স্বাভাবিক বিবর্তন। আমরা আমরা ঐ বিবর্তনের লাভ এবং ক্ষত দুই থেকেই আমাদের বঞ্চিত। আমরা বেরেছিলাম অভিজাতের মুখে বঞ্চিতদের শিকার। আমাদের ব্রহ্মকলকার এল স্বাধীন ইংলন্ডের বাহিন্দাবাহিনীর মুখোমুখি। আমরা বঞ্চিত হইনি প্রবর্তিত পথারেই, নতুন পরেছোদের পথারে পরাজিনায়, বেদনাবাদী বাহির ব্যথা স্বাধিকারে বাহিন্দার স্বজন প্রবাসিত বাসিন্দার। ইওরোপে ইংলন্ডের চালে এই বিবর্তন হয়েছিল আর্থিকার। ইওরোপে সমবিকাশ, সমসাময়িকতা, বেসামাজিক বন্ধ ও তার পরবর্তী পতন আমাদের ছিল দুর্ভিক্ষের ক্ষত নৈর্ব্যক্তিকতার আত্মসমর্পণের পরবর্তী স্বাধীন এটা সম্ভব হয় না। সম্ভবত হয় না ব্যক্তিকেন্দ্রের প্রথমা বোকা—বেটা হুমায়ন বোকেদের লোনলের বল, যারই আরেক চাঞ্চল্যকর প্রাক্তন্যান— নিজের নৈর্ব্যক্তিকতার সঞ্চিত নিরপেক্ষ ছন্দ।

অবশ্য আমরা সবই জানি সবজন্তে সর্বাংশে। সেজন্য চেষ্টাটাও সম্ভব হয়েছে এই যাত্রাকালের পরবর্তনে। এই পরবর্তনই যাত্রাকালকে ক্রমশ স্বাধীন, আমাদের বোধ-কে ছেলে ছেলেদুর অস্থায়ী বিষয়মুখের, ব্যবহারিক, বিশ্বজনীনের কাঠামোর ধরতে করা। এবং এই অভাবে ভবে নিজস্ব, যা যাত্রাকালী পরে লক্ষণ তার প্রকাশে ধরেই হলধরের ধারুন। ইতিহাসে যুদ্ধোত্তর যুগের যে যাত্রিক ঐতিহ্যটা, যাত্রিকে ছোঁয়া আজ এই যাত্রার অনেক সময়েই সৌখালো, নিশ্চুপতের আবহাওয়ায়ে, যাত্রাবাহুলো, অবাস্তব আবেদনো লক্ষণীয় হয়। একদিকে আধুনিক বিশ্ব আমরাই হল এই উপলব্ধি থেকে এক্য এবং সম্পদতত্ত্বের মূলে পুরুষকারই হল এই যাত্রার। সেই যে পেটের যন্ত্রণাদিনের, এর অর্থে তার সত্তা। সব শিল্পকর্মেই অতীতা লক্ষ্য হল সম্পাদের নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তির। কিন্তু, যাত্রিকমুখের চলে ধরেই প্রথম হয় এই আবেদিত ভাব যাঁর হয় তার ভাব প্রকাশ হয় ঐ অভিব্যক্তির ব্যবহারে। তাতেই ছোট শিল্পকর্মের সৃষ্টির ও আবেদন—বড়ীরতা এবং শিল্পের শিল্পকর্মের বিশেষ অনিবার্যতা।

আমরা আমরা সামাজিক জীবনে অবশ্যম্ভাবীর প্রতিষ্ঠানে ঐ পুরুষার্থ যা হলধরের পাইনি যা পাশ্চাত্য ইওরোপ কিছু বা কিছু পেয়েছিল, যা তার পরবর্তী যে বিবর্তনে এল শিল্পসাধনী সমাজ তার ধারা প্রোত্ত লাভের—রেনেসান্স, রিফরমেশন যা তার পরের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যবাদের লাভা ইত্যাদির। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং আমরা হয়ে ঐ অভিব্যক্তির ধেনুর একটা বহিঃপ্রকাশের প্রতিফলনের এবং আমাদের শিল্পসমস্যাকে আমরা একটা প্রস্তাব মীমাংসা করার সুযোগ পায়।

তাই আমরা হয়ে পড়ি অনেক সময়ে ফুল আয়নায় ফুলকার ধাঁচানো আমাদের প্রকাশ ও সামাজিক ধর্ম মিলন ধাত্রির জীবনেও এবং ধাত্রিকর সাঁচর পালনের মধ্যে হয়ে পড়ি চরম ব্যক্তিবাদী, ঘোর নৈরাজ্যবাদী। অবশ্য জরেস যা পেয়েছিলেন ইংলন্ড, তাই আমাদের আমা হওয়া উচিত। আমরা যেমন নিরক্ষরতার পরবর্তী, আমরাও পশ্চিম ইওরোপীয় অবস্থার সর্বাঙ্গীনের অনুবর্তী পলায়ন, ইংলন্ড জীবনের একটা নিজস্ব রূপের বিন্যাসের মূলে অনুপস্থিত। তাই আমরা নৈতিক ধর্মের পথ নিয়ে আমাদের নির্ভরশীলতা। সেজন্য নয় আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত ঐকমত্য আমাদের সমাজের আমরা সমস্ত এক আমাদের নিজস্বতার প্রতিষ্ঠার মধ্য কঠিন নিজে সমাজ-দীক্ষার অভিব্যক্তির ইতিহাস ঘটিয়ে আমাদের।

প্রেত ভূমিকায়

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

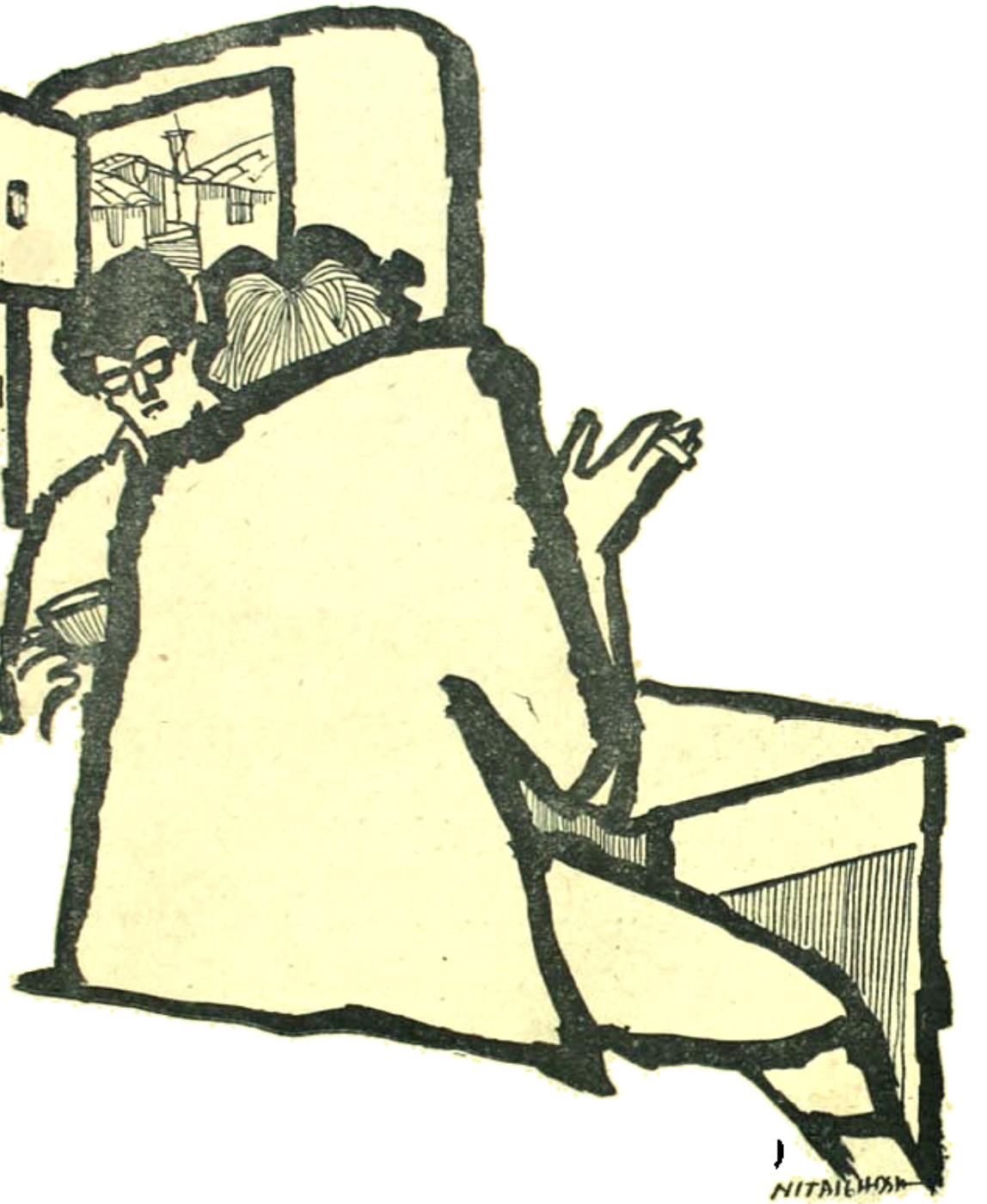

ব্যাপারটা কী—? আমার লেখক বন্ধু দুর্জয় ফোনে প্রশ্নটা আমি তোলাই সম্ভব।

দুর্জয় এঁড়িয়ে যেতো। যা এমন্তাবে চলতো, কী হয়ে গেছে অনুযোগ করে বসে। আমি এড়িয়ে যাওয়ার এ কৌশল দেখে দেখে নিজের ফোন করবার আগের প্রশ্নটার কিছু পরিবর্তন এমনই ভাবে। দুর্জয় বলতো, কী আর সমস্যা—যেমন থাকে কিছু ঝিক্কি আর সেই সঙ্গে পাওয়া কিছু। আমি বলি, নতুনত্বের অভিলাষা। দুর্জয় নিরুত্তর থাকতো। আমি তাকে সময় দেওয়ার আগ্রহের চেনাটাকে একটু এদিক-ওদিক করে আমাদের মাঝিয়ে বলতাম, সমস্যা কি তাই?

—তাছাড়া আর কি? দুর্জয় তৃপ্তির হাসিতে কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে বলতো। পরে তার ব্রহ্ম-ত্রিটাস অপোজাল বক্তব্যের দিকে দ্রুত পরিণত করে বলতো, কেন; আমার বয়সের এমন কিছুতে চোখ রাখলে আরো অভিজ্ঞতা করার কিছু আছে? আমি একই অভিব্যক্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তাম। তবে দুর্জয়ের নিজেই চেয়ে তার রাসিকতা আড়ালের বাস্তব-সত্যি করবার উপায়ের চারদিকে চোখ রাখতাম। আমে যা দেখি যা চোখে পড়ার মতো মনে করেছি, তাই তার মনে করেছি। উঠান থেকে তিনটি সিঁড়ির ধাপ উঁচু হয়ে যেখানে ঠেকেছে সেখানে ঘরের দাওয়া। পাশাপাশি ঘর। ঘরের আলোর মধ্যে দিয়ে চোখ পড়ে দুর্জয়ের পরিপাটি। জানলার নিচে কাঠের ছোট চৌকি। তার ওপর দুর্জয়ের সমাপ্ত অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। কখনো আলোর অনুপ্রবেশের ফলে হাওয়ার কাঁপনে, কখনো তার এক ব্যবহারে পুরো অধিকারে করছে। যে-কোন সময়ের কলমের মতো আমাকে সাড়াচ্ছন্ন করছে। দুর্জয়ের নিজে হাত না দিলে আমে হাত দেওয়ার কোন

নেই। কলম দুর্জয় সেনের স্ত্রী এইকে কথা দেওয়ার জন্যে তার মনে কষ্ট হচ্ছে না। দুর্জয়ের চিন্তাশক্তি কলম হওয়ার বদলে যেখানকার মতো পাণ্ডুলিপির পর পাতা ভরিয়ে যাচ্ছে। আরও কলম ও খাতার জন্যে তাঁরা দুর্জয়ের অর্থোপার্জনের জন্যে পরিশ্রম অনেকের পরিশ্রমের অর্থোপার্জন তাঁর জন্যে পরিশ্রম। সে কারণে আকাশে উঠতে না চেয়ে আকাশে মাটিমাটি করতে, কোন কোনো তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি সাংসারিক জন্যে অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতা সময় ছিলেন। দুর্জয়ের ছেলেকে এইভাবে পাণ্ডুলিপির পরে নিয়ে খেলাধুলো করতে দেখে, আপত্তি তাঁর হয়েছে। বাঁশ দিয়ে যায়, এখন সেখানে উঠে নিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

দুর্জয় কিন্তু বিশেষ কলম হচ্ছেন না। গুছিয়ে কথাগুলো দুর্জয়ের রাখতে নিয়ে বললেন, এ কাজে মেয়েরা ছিপ্লে আমার কাজ হবে, তাই ভেবে না। রাঁধতে রিটিরে মেয়ে আমার একটু ভোলাদুটি করবে। তাছাড়া মোক্ষম এর চেয়ে এই নিরবিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপির পরগুলো বেশি মূল্যবান হবে কেন? কী—এসব ভেবে পুরো বিশ্লেষণ হয় না? দুর্জয়ের দুর্বিষহে, কথা শেষ হওয়ার পর, নিজস্ব হাসি।

আমি নিজের চোখে কলমে দেখেছি: অবিশ্বাসের ভাঁজগুলো কথা দেখেছি, অর্থাৎ অবিশ্বাসী।

দুর্জয় চোখ চাক্ষুষ প্রমাণ হাজির করা সত্ত্বেও আমার প্রস্তাবে সম্মতি দেননি, এই প্রস্তাবের আবার রাখার চেষ্টা করে এসেছি বারবার। আমার এও স্বীকার, যদিও আমার প্রস্তাবে সম্মতি দেননি, আমি অবিশ্বাস করেছি, দুর্জয় আমার প্রস্তাব এঁকড়ে মেয়েন এই অনুরোধে, তবু প্রকৃত প্রস্তাবের অন্যও কিছু সন্দেহ করতে পারলাম। অনুরোধ বিভিন্ন অনুরোধে দুর্জয়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার পরিবর্তে রাতেরবেলা সাক্ষাৎ হতো। দুর্জয়কে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাংসারের প্রস্তাবের অধিকতর বিরত দেখেছি।

কলকাতায় এবার একদিন বন্ধে প্রবল বর্ষা নামল, সারাদিন একটানা বৃষ্টির পর রাত্রিবেলাটা মেঘলা পাশটে গেল, সেই সময় সুন্দর মুখোমুখি দুর্জয়ের সঙ্গে আমার একটা দেখা হয়ে গেল।

সাক্ষাৎকার ঘরে ঘরে ঘোরে আসছিলাম। বাসে-ট্রামে পা রাখার কোন উপায় নেই, হাতের নাগালের মধ্যে কোন অবলম্বন নেই। মাথা নিচু করে হাঁটছিলাম। চোখ খুললে পথের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে, এই ভয়ে সন্তর্পণে। পিছন থেকে কেউ নাম ধরে ডাকবে, পিঠে হাত রাখবে, আর হাঁটাই বন্ধ হবে, বাড়ী ফেরা। এই দুর্যোগের পথে সন্ধী পেয়ে পথের মৈত্রী সার্থক হল; এসব চিন্তা মাথা করিনি। তাই দুর্জয় ছোঁয়ার ঠিকানা জানে ডেকা হাত ঘাড়ের নরম ঠিকানায় স্পর্শ করলে আমি চমক খেতাম না। কলমও এভাবে আকস্মিক ঘাড় ফেরাইনি।

—একটু, আমিও একজন কবিকে খুঁজছিলাম; আমি যে এতক্ষণ তুলে কিছু চিন্তা করতে পারি না এখনো . তিনি বিশিষ্ট হয়েছে, এমনিভাবে কলমে দুর্জয়।

—তারপর এই জল-ঝড়ে?

—এই একটু পথ করে। তাঁর চেয়ে দুর্জয় মেয়ের কণ্ঠে আরও আমার কানে বেশি স্পষ্ট হয়েছে।

বললাম, পথ তো আপনারই জেনা।

—তুমি জানো? দুর্জয় মেয়ের কণ্ঠে সহসা আশ্চর্যান্বিত কেমন শুনে হল, পথ যা আরও কিছু, হাতে দেখছেন না?

হাতের দিকে নজর দিতে চোখে পড়ল কাগজের মোড়ক।

কী হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করছি, দুর্জয়ে দেখে দুর্জয় বললেন, ওহো—ছোট ছেলের জন্যে।

এই জল-ঝড় মাথায় দুর্যোগের দিনে বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার সম্পর্কে এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি আর কিছু থাকতে পারে না। আমি দুর্জয়ে শান্তি দুর্যোগ রাখার করে পরে যেতেন তাঁর পর নয়। কথাও উপেক্ষা করতে পারেনি।

কলকাতা, লেখক শিল্পীদের সাংসারিক কাজের কাজের সাধারণ বিরুদ্ধে যাঁরা।

বললেন, বিরুদ্ধতা কি এক রকম। এই দেখুন না প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে বেরিয়েছি। এই আবহাওয়ায় বেরিয়ে ভবে টাকা-পয়সা আনার কথাও হয়। দুর্জয় আবহাওয়াই হবেন্ট নয়, ওষুধের হলে হাতে-পয়সা অভিজ্ঞতার কথা সব কিছু প্রয়োজন। দুর্জয় মেয়ে আমার পকেট থেকে আমার একখানা কাগজ বার করে দেখালেন।

পরিহাস করে কলার চেষ্টা করলাম, মুখে জল করে এসেন আমরা।

মৃদু হাসিমুখ দুর্জয় বললেন, এরকম কথা মুখে যে এর কারণ হবে—

কলকাতা, কেন, পরশুই তো আমাদের বলেছে।

আমার কথা উপলব্ধি করে হাসলেন। হাসির শব্দে গলার ভাঙা অংশটুকু তাঁর চিন্তা ছিল। মনে হল। আমি তাঁর মুখে ভুল করে লক্ষ্য করলাম। আমার কথার বদিও মেয়েদের মুখের রেখার বিশেষ আছে স্পষ্ট।

বলা যায়না, দুর্জয়ের [illegible] হিসাবে মেয়ে আমি এখন

ফসফোমিন

শরীরে শক্তি যোগায়
ক্ষিদে বাড়ায়
কাজ করার
ক্ষমতা
যোগায়

সহজে রোগে কাবু
হ'তে দেয়না

ফসফোমিন-এর কল্যাণে—
বাড়ীর সবাই সুস্থ আর সবল
থাকার আনন্দে সমুজ্জ্বল।

ফসফোমিন—ওজন গরে ওজন মজুত প্রবেশ ভিটামিন টনিক
যা ফসফরাস আর প্রচুর ভিসোডাকসকাইন দিয়ে তৈরি।

© ই. পাল. পুরীর এক সন্স ইনকর্পোরেটেড প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক
ব্যবহার করা নিষিদ্ধ এবং প্রতিটি নকল ও অনুকরণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

ফসফোমিন "III"

SARABHAI CHEMICALS

[illegible] পড়ানোর ভার আমার ওপরে ছিল। আমার কাঁধের ওপর তার মাথা রেখে সে মৃদু মৃদু হাসছিল। ছেলেটার কাঁদন বন্ধ হয়েছে। সন্ধ্যাটা [illegible] ছিল। এটা-ওটা বলবার আবদার [illegible] মাঝে মাঝে তা নয়, তবে ওকে [illegible] কাঁদিয়ে রেখেছিলাম। কারণ কী বলে [illegible]? মামা ওদের আসে না? কথাটায় [illegible] বসে চমকে গেল। তাই তো, দুধ [illegible] খেতে না চায়, এটুকুও তো নাড়া [illegible] পারে। তাকি ভেবেছে না কি, আমি [illegible] করে দেখতে চাই ওদের ভালও [illegible] কিনা। বিশ্বাস করবে ও না জেনে [illegible] আমার কোথায় ব্যথা বিঁধেছে তা কি [illegible] কখনও ভোলাতে পারব? পুরনো [illegible] চোখের ঝাঁকা বিদ্রোহ, নতুন [illegible] শিখিয়ে তুলে ছিলাম।

আমি, মৃদুর [illegible] কথা বলছিলেন, [illegible] মুখের রেখা-পুঞ্জের কৃষ্ণন ও সম্প্রসারণ [illegible] করছিলাম। অথবা কল, সন্ধ্যার আকাশ [illegible] কথাগুলো শুধু শব্দ হয়েই বাজবে, [illegible] বোঝাই তাঁদের না হলে তাঁর মুখের [illegible] স্পষ্ট হবে না। সে অবস্থায় তাঁর [illegible] কথা অর্থবহ হয়ে পারে না।

[illegible] আশ্বিনের শুরুতে একদিন [illegible] এক নতুন পরিবর্তনের সূত্রে, দুবার পর [illegible] সূচনায়, মৃদুর সোফের আসবাবের [illegible] আবির্ভাব ঘটল ড্রয়িংরুমের মাঝখানে। [illegible] সেদিন ঠিক বিশেষ কোন উপলক্ষ [illegible] ছিলাম না বিছানা। পুজোর আগে [illegible] ঝাড়পোঁছ কেনা-বেচার হিড়িক [illegible] কেমন, মৃদুর সেটা বাড়াই ভাল।

[illegible] ছাড়িয়ে ছাদের [illegible] ছিল নারী-[illegible] ছেলে-ছোকরা যুবতী-বালিকা [illegible] মুখে অবিশ্রি গাড়ি-ঘোড়ার [illegible] বিশেষ। আর সেই অবিশ্বাসের ভিড়ে [illegible] করেছিলাম মৃদুর সোফাকে। [illegible] ও মহিলা ক্রেতাদের মাঝখানে মাথা [illegible] কুটুম্বদের একোরদের ভাল জায়গা [illegible] বাছাই এবং পছন্দসই করছিল। আমি [illegible] আমার হাতে ধরে টান দিয়েছি। কে-[illegible] ভাড়ে বোঝা যাচ্ছিল। ঠেলা-[illegible] ভলেই মেয়েরা কেন স্পর্শ অনুভব [illegible] থাকেন, এই ভেবেছিলাম। এপাশ-[illegible] ছাদে দেখলাম যখন সন্ধ্যে আমি, [illegible], কেনাকাটা হচ্ছে। মোর সংবাদী [illegible] পুজোসংখ্যা বাজে পিতাম সংখ্যা [illegible] করছিল। এরমধ্যে আমাদের একটা [illegible] ভুলে ধরে, তবে হাত উঁচু করে আমার [illegible] অন্যদের অন্যদের জানাচ্ছিল। আমি [illegible] ভিড়ের দিকে তাকে রেখে ওদেরই [illegible] দিলাম বেশি। কখনও [illegible] পছন্দ [illegible] না, কখনো বা পছন্দসই দোকানিকে [illegible] এক আধ ফাঁকফোকর একটা মাথাটি [illegible] করলাম্যে আমি বেরিয়ে এলাম। [illegible], চলুন।

[illegible], এই কথা বলার জন্যে আমার [illegible] রেখেছিলেন? কিন্তু যার কোন, [illegible] কোথায়—

[illegible] পেরে হাসলেন, বললেন, ছাদ-এ অকথায় ফেরে বেরোয়।

বললাম, আপনি তো বিদ্যি বেরিয়েছেন।

—আর বলবেন না। মাত্র বছরে এই একবারই তো ঘর গোছানোটা হয়। পরিষ্কার একেবারে পরিষ্কারের অবোলা না হলে তো ভেলা হয় না।

আমি, ওঁর কথার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টায়, মৃদুর মোফের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলাম। মুখের কথার চেয়ে তাঁর মুখের অভিব্যক্তি বেশি অনুভবযোগ্য।

পরে বন্ধুদের চলতে চলতে বললেন, এদের জামা-কাপড়ের দাম ইদানীং বেড়েছে। ওঁদের [illegible] কি আর এসব কিনিয়ে হাতে তুলে না হাত দিয়ে দুঃখ। আজকাল বেরিয়েছে অনেক কিছুই কিন্তু সবই তো নাগালের বাইরে। অতীত যেমনই সমস্ত তর্ক-বিতর্কের বাইরেই, [illegible] আলোচনার যেমন বিতর্কবিতর্কের [illegible] ঘটে না, সেই রকম অতীতের উপকরণে মৃদুর মোফ অন্তর্বিরুদ্ধ মুখর হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক সমস্যার বিরুদ্ধ, তাই অতীত মোফবয়ন সন্ধান-পরায়ণ।

[illegible] শরতের লক্ষ্মীর সিংহাসনের মুখে ঘোমটা হাওয়ায় মামিকতলা বাজারে যেমন মৃদুর মোফ নাগা কলাকের একখানা [illegible] পুরনো আসনের গায়ে দিয়ে মন্দিরের বাজারে রাজ্য বিস্তারের। আমার রসিকতায় মায়ের বাজারে মোফ কী বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে আর এ মুহূর্তে সরল কথা বলিনি। তবে আমি কথন-সন্ধান এরকম বাজার ভাল পর্যটন এর মধ্যে দিয়ে সর্বকালে ওর বাকি দুঃখ না-ফেলে। মোফ শরতের বাজারে এরকম কোন চেষ্টা ছিল কিনা বলে [illegible] নয়।

[illegible] ওপর থেকে বলে পড়ছিল যখন মৃদুর [illegible] বলি সাহেবে- [illegible] ওপরে ঝুলে দিছিলেন। [illegible] ছেলের আকাশে রাখতে নাগা [illegible] ভুল [illegible] নেই, তাই অনুমান করতে পারলাম, মৃদুরের [illegible] যে আনাজ পুরনো প্রায় নেই অনুমানের দুর্নিবার্য। [illegible] মায় ওরা মোজা রাখা ভুলতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি।

[illegible] একটা আই আনা ভুলে দিয়ে মৃদুর মোফ আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আমাদের বাজারে এই সাড়-সকালে, কী আনার?

বললাম, আপনার দর্শন প্রত্যাশায়।

মৃদুর পরিমিত হাসলেন, বললেন, এ [illegible] ওদের অবশ্য বাঁধাদু হলে বাজার বাজারে কিনা পছন্দায় মোফ যাবে।

বললাম, আমি [illegible] দেখে বাজার পাকার সঙ্গে ওজন করলেন।

বললেন, মুখোমুখি না, মায়ের বাজারে ঠোকার সাথা নেই—সে কথাটাই বলবার একটু দুরিয়ে।

বললাম, অবশ্য দুরিয়ে। সোজা কথাটাকে বাঁকিয়েচিয়ে তো এক শতাব্দী ধরে ভালোবেসে; যা একবার বলা যাবিয়ে [illegible]

মৃদুর ফাঁকা হাসিতে ওঁকে সায় দিয়ে বললাম, এই সাতসকালে ঘরি হয়ে আপনাকে দেখে আমিই তো অবাক বনি আপনার চেয়ে বেশি।

—আর বলবেন না, অভিজ্ঞার জন্যে এই হুড়োহুড়ি। ওর হাল আমার অভিবিজ্ঞতা বলে পড়েছে—ওরাও মনে মনে ভাল, ওই বয়সে ফোল খেতে চাইছে।

বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে মৃদুর মোফকে এর আগে দেখেছি, এখন সেখানে স্ত্রীর প্রতি তাঁর কর্তব্য-পরায়ণতা।

বললাম, আমি কিন্তু ওদের পছন্দই না যে হাত ওদের ধরে সেই হাতে বাজার বনি করা অনেক সহজ।

মৃদুর মোফ কোন সঙ্গত তর্কের জন্য খুঁজে পেলেন এইভাবে বললেন, কেন যে ওদের সে বনি ভুল বুঝতে পারে, সে জানে ওর বাজার করতে মোফ কি?

আমি অধীনস্থদীনীর ভার তর্কের উত্তরে বনি এইভাবে বললাম, যে বনি ওকে ভুল বুঝতে জয়া দিতে চাই না যা যে মোফ ওকে বাজার করতে নিয়ে কখনি না, শুধু ভাবতেই যা অনুচিত।

—আপনি নিশ্চয় একলা আইন পড়েছিলেন, মৃদুর মোফ কথায় ফের টানার ভঙ্গে বললেন।

—তা হলে মানছেন, আমার বিশ্বাস করতে অনুচিত আছে?

—যা না হয় মানছি, কিন্তু অনুচিত তো আপনার মনের জোরে, আর আমার ধারণা যে পরিমানের জোরের সামনে।

আমি পরাস্ত মানতে চাইনি। আমি, মৃদুর কথাটা বাস্তবিক সাহিত্যিকের না আইনের কলমনি।

—আর আপনারও এইখানে ভুলভুলি রাখা ভোক। অভিজ্ঞা ছাড়া মেলে কী ভাল জানেন না? কল্পনা মেলে চাঁদমোহন মনে কত মায়ের ছেলে মারা আমল মনে? অতএব বুঝেছেন, মেলে পুজোয় আগে কলাইতে মন বাড়তে হবে, মায়ের বাজার থেকে বাইরে পাঠালনা করতে করতে এই কথা-গুলোর শেষে মৃদুর মোফ আরও একটু যোগ করেছিলেন, আমার সাংসারিক সমস্যার কথাটা আপনাকে বিশ্বাসেই বিশ্বাস-উদ্যম মেলে না। অর্থাৎ মোফকে মেলেছিলেন এইটাই তাঁর আসল ও একমাত্র সমস্যা।

মৃদুর মোফের এই ধরিয়ে চলার মধ্যে মোফার একটা উপমা আমি আপনাকে করতে পারলাম। এমন মেলে বিশ্বে কি যা আমার কাছে শিক্ষিত সমাজের মাঝে দুর্বোধ্য, মোফের অতীত। বাঁধাবাজারের ছেলে মৃদুর মোফের নীরব অনুভবিত অবস্থানে আমাকে পীড়া দিত না, একথা অনুমিত করতে পারে। তাই আমার কিন্তু মোফের অন্তর্বিরুদ্ধতার প্রত্যুত্তরের প্রশ্নের আমি মোফাবুদ্ধীর সমাধান আমাকে মোফাবি। মৃদুর মোফের একথা সমাধান আর যে মোফ পরিচালনে সমস্যা হয়ে পারে। মৃদুর মোফের সঙ্গে ওদের পছন্দসই মোফার জন্য?

শীত সেরকম পড়ে নি। তবুও সুদূরের ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে দুর্জয় শীতের সঙ্গে একটি একটানা একঘেয়ে-ধরনের লড়াই চলে।

তাকে এ এলাকায় যে কখনো দেখা যেতে পারে এমন ধারণা আমার ছিল না। এখানে এক ধরনের বিশেষ মানুষ-পুরুষেরাই প্রবেশাধিকার পায়। যার চরিত্র চাল-চলনে অভিজাতিক। অতএব দুর্জয় এ ধরনের কেউ হতে পারেন না।

একতলার অন্ধকার সরু গলির ধারের, নিচু পাতার ঘরে বসন্তের উদ্দাম হাওয়ার চলাচল উপলব্ধি করতে পারি। পরস্পরী সন্ধ্যেরা অন্ধ নিরর্থকতায় ঘরের দেয়ালে আমার চোখে ফিরিয়ে এনেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল দুর্জয়ের সেদিনকে দেখে। গায়ে খাদা সৌখিন আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনের ধুতি ফরফরে। বাইরে এমন সৌখিন মানুষের আড়ালে তাঁর সাদাসিধে দুরূহ মনের শাঁস ভালমন্দের মতো কাঁপনের মনে হয়। দাড়ি গোঁফ কামান মুখে তাঁর মুখের বলিরেখা যেন নিখুঁত আঁকিয়েরার শক্ত মেক-আপের মতো লক্ষণীয়। দুর্জয়ের অন্যমনস্কতাকে পশ্চাৎ-পটে রেখে সামনের মিলন আলোর দিকে তিনি মুখ তুলে চোখ উঁচু করেছিলেন। তাঁর মুখের শান্তিলাভ এবং অন্যমনস্ক ঔদাসীন্য মনে হচ্ছিল। দুর্জয় সেদিনের দৃষ্টিতে আমি যথার্থ কোনদিন প্রসন্নতা লক্ষ্য করিনি, হাসলে সার্থক্যের কোমলতা চোখে পড়ে। আমাকে যেভাবে কাছে থেকে নিলেন যেন আমারই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

একটা বাস আসতে, আমি দেখেছি পাইনি কত দরজা, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে উঠে পড়লেন।

পাশাপাশি বসা গেলাম, কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, আমার ওপরে—

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি, ব্যাপার কী? হঠাৎ।

—ওই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ি, বাড়ি কাজ, আমি এক ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত।

—নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ বাড়িতে আমার বই দেখার জন্যে তাই নিয়ে যাচ্ছেন?

—আমাকে দেখে মনে হয় আপনার বই দেখতে পারি?

—পার্থসারথির বই দেখতে পারেন কিনা জানি না, তবে আমাকে বই ছাড়া কিছু ভিন্নে না, একটু করে আইডিয়ার আমার মাথায় নেই।

—আইডিয়া আপনার মাথায় নেই! আমি যে পার্থসারথির বই দেখতে পারি না এই আইডিয়াটুকুর জন্যেও তো বলা উচিত—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, বলা যেতো নয় পারেই বলতেন, আপনার বলুনে কী উদ্দেশ্যে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে চলেছেন।

—বলছে না, বাড়িতে গেলে বলা যাবে—তাই—

—আপনাকে হেনস্থা করার জন্যে?

বাসিকতার ছেলেরা এসে দুর্জয় সোম আমার কাঁধে হাত, চাপ দিয়ে বললেন, আসুন এ মিনিট। বাড়িতে। সন্ধ্যেবেলা স্টেশনারি দোকান থেকে কী কিনে আনলেন। ফিরে এসে বললেন, একটু ভাল চা দিন তো। ঘরিতা থাকলে কোনো উপায় নেই। বললে, চায়ে নেই তুলো নেই, চায়ের পর দেখে যাবি না। আমি আশ্চর্যও মনে হল, আমার ভিনিস দুটির চেহারার আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুর্জয় সেন এইভাবে সন্ধ্যে করে যাবেন। সন্ধ্যে ভিনিস তাঁকে এইভাবে নিজের চোখে এই প্রথম কিনতে দেখলাম, আমার অবাক লাগে মনে হল।

দুর্জয় সোমের বাড়িতে এ ঘরে আমার মুহূর্তগুলির দিকে আমার অবসন্ন-চেতনার দৃষ্টিতে তাকালাম। আজ আমার পরিচয় আমার পরিচয়াতীত মনে হল। যা-কে তার চতুষ্পার্শ্বে পরিচর্যার হাত কত নিপুণ কর্মরত তা লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়। ঘোষাও আলাদা-ভাবাতে অবহেলার লেশ মাত্র চোখে পড়ে না। তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি যাতনে আলোচিত হলেও, সেই লেখার অধিকারে একেবারে করে না। তাঁর সুরেন্দ্র ছোট ছেলের অসাধারণ আজ অন্যত্র প্রকাশ পাবে হয়তো। দুর্জয়ের স্ত্রী অধিকাও সম্ভবত ছেলেকে আজ আর প্রশ্রয়ের শাসন করেন না। বাসের বাড়ির সার্বিক অন্তরেশনা সমাজীদের অধীন থুলে তিনি ছেলেকে একলব্য মানুষের মনের সবের করলেন, সন্ধ্যেবেলার মনোরে ছেলে-মেয়ের মাথেরা খেলে করে। আশ্চর্যই, আমার অনুমান, অধিকা দুর্জয়ের সম্বন্ধেই প্রতিফলন করেন, আর সেই কারণে তাঁর নিজের গরজ কিছুতেই নেই।

দুর্জয়ের ড্রয়িংরুমের ওপর পরিপাটি বিন্যাস। আমি যা দুর্জয়ের একলাপে বসলাম। দুর্জয় বললেন, লেখার আগে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিই, চারপর একটা সিগারেট ধরাই—দুর্জয়

লুপ্তার চলচ্চিত্রীর সবচেয়ে উপন্যাস — ছবিঘরের বিশ্বাস

জবাব দিহি ৪·০০ — **বন্দবন্দ** ২·০০

বিশ্বের সবচেয়ে — **নামাসার** ১·০০

আকাশ গঙ্গা ৫·০০

ছোট অর্থোদীর প্রতিপাদি ৩ বন্দুলাভ ৪·৫০ ॥ দুর্দিনদারের নতুন জীবন ৫·৫০ ॥ দীপক চাটুরীর গল্প ৩ প্রেমিক ৫·০০ ॥ পরীক্ষাটির স্বর্গ ৭·০০ ॥ ফরিয়াদ (নাটক) ৩·৫০ ॥ শচীন্দ্রনাথ অন্ধকারময়ের সূর্যের সন্তান ৫·০০ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের পরিপাটিনী ৪·০০ ॥ প্রভাত মুখোপাধ্যায় আমাদে আটটি আলোচনা ১১·০০ ॥ পৃথিবীর ইতিহাস ১৬·০০ ॥ কলম্বর বৈরাগীর মনকলনা ৭·০০ ॥ ভক্ত সেরেনো বাঁচে (নাটক) ২·৫০ ॥ আর হবে না দেরী ২·৫০ ॥ উৎপল দত্তের ফেরারী ফৌজ ৩·০০ ॥ কয়েদখানা ৩·০০ ॥ সৈলেন দের আত্মজীবনী পাহাড়ে ৩·৫০ ॥ বেঙ্গল-এর মাসিক মাসের প্রেমকথা ৫·০০ ॥ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরকীয়া ৩·০০ ॥ শরিফল মজুমদারের রাতের পাখিরা ৬·০০ ॥ দুঃখকে যায় যায়না চলে যা ৪·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা বদল ২·০০ ॥ অপরী মায়ের মিস্ যোগের কাহিনী ৩·০০ ॥

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

১ম ঃ ৮·৫০ — ২য় ঃ ৮·০০ — ৩য় ঃ ৭·৫০

মুদ্রাবিক্রয় ২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬
(ট্রেজারি অফিসের বিপরীত দিকে)

অবকাশ নেবার মুহূর্তে আমি [illegible] ছিলাম, চেতনা?

—তারপর পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা-গুলোর বাকি একজন চোখ ছুঁয়ে, ঠিক উচ্চারণে আলাদা করা যায় আমাকে—এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকল হাতে সিগারেট। সামনেটা লাইন-লম্বা যেন একটি অভিধান মেটেরিয়ল একসা করে দিল। অমিতা বলল [illegible] এসেছিল, কখন, বাপের বাড়ি যাবার আগে। হিসেব রাখবার। আর এখানে নিজেই হয়েছি হেলপ। ও না হয় বুঝল, কিন্তু কাগজ কাটবার সরঞ্জাম বলে যে একটা পদার্থ আছে, সেটার ব্যবস্থা কী হবে? এরপরে ভাই কয়ে গল্প ছেড়া কাগজের স্তূপ দেখিয়ে দিল। আমি সেইদিকে তাকিয়ে ভাবলাম কী বলা যায়। একটু সময় নিয়ে বললাম, গায়ের রক্ত জল করেও তো একটা বন্দুক প্রয়োজন, সেটার কথা তো অনেকদিন উচ্চারণ করনি? অনুযোগ মুখোমুখি করে অমিতা বলল, ছেলে ধরতে পারে না, অথবা বেরিয়ে—অর্থাৎ স্পষ্টই বুঝতে চায়, লজ্জা আর বেদনাদায়ক মজাটা এই আর্থিক পরিস্থিতির ওপর অতো প্রাক্তবক্তব্যের জন্যে উঁচুতে ছিল। বিশ্বাস করুন, অমিতার মুখের ওপর যতখানি নিরর্থ দৃষ্টিপাত করেছিলাম ওর অবস্থা মুখোমুখিতে ঠিক ততটুকু ছোরা পেয়েছি।

আমি হেসেছি, পারিহাসে ঘরে বলেছি, মুখে জমাটায় তা হলে মনে মনে কাজ হয় বলুন।

—একেবারে অস্বীকার করা যায় না, এটুকু বলে সুজয় সোফা পাতোয়ান করলেন, বললেন, চা খান।

চায়ের কাপ আমার সামনে রেখে সুজয় নিজের কানে ওষ্ঠ স্পর্শ করে বললেন, বা-ই বলুন, অমিতাকে বোঝাতে পারলাম না আমি চায়ের একটা আভিজাত্য আছে।

নিশ্চয়ই কটি মুহূর্ত চা-পান করেছি, এমন সময় সুজয় চায়ের কাপ থেকে মাথা তুলে আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে ও ঝিরে বললেন, লেখার প্রসঙ্গটাই যা হবে ছাড়েছি, তা ছাড়া পরিবেশ ও সমস্যার আলয়ে আমার একটা বিলাসিতা, আপনি কি বলেন?

বিনীত কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলাম, জীবনে কোনদিন একটি লাইনও লেখার চেষ্টা করি নি, কোনদিনও, সে কারণে এ বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন।

মনে মনে আর্যদিন এর পর কোন হয় নিজের লেখা প্রসঙ্গে সুজয় সিগারেটের কিছু নষ্ট করলেন, কিন্তু সে ধার দিয়েই গেলেন না। নিজের পারিবারিক জীবনের ছোটখাট-আইনের ছিন্ন টুকরো কাহিনী কিছু কিছু শোনালেন।

—বাবা মারা যাবার এ ধরনের কোন পর্যন্ত নিজেকেই করেছি কি না। আগে থাকতাম মেসে, মেসজীবনের আড্ডাগুলো বাতি পড়তে-পড়তে মজা ছিল, মানের মাথায় টেকস, অমিতা আমার জীবনে বাড়ি-ভাড়ার ঝঞ্ঝাট ছুটি খুলে দিয়েছে। রাত্রিবেলা পড়-খোলে বাপার আমন চুপচাপ হয়ে যাওয়ার আমি প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারি নি। পরে বুঝতে পারলাম মেদিন অমিতা মেসেদের দুয়ারে ঘণ্টায় ফেরে পড়ল। জীবনে অমিতার আমন ভয়ঙ্কর মূর্তি আমি আগে আর দেখি নি।

আমি সুজয় সোমের আকস্মিক বর্ণনায় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চায়ের কাপের শেষটুকু পান করতে সময় নিচ্ছিলাম। সুজয় সোম হঠাৎ অভিমানে অমার লজ্জা করছেন। বলছেন, আরে তার নেই, আজ সন্ধ্যের এ মুহূর্তে অমিতা ওই মূর্তিতে আপনার সামনে হাজির হবে না।

আমি হেসে বললাম, আগে যেখানে যেমনই থাকুন যেখান থেকে বরং আহ্বান করুন। মুখোমুখি পেয়ে সুজয় আমারই মতো হেসে বললেন, আচ্ছা-আচ্ছা — অমিতা আমার ঘর দেখলে, বলত আজকালের মতো না-হাতুলে সে গলায় দড়ি দেবে কিংবা কাপড়ে আগুনে ঝাপাবে, আর আমি ওর সে সময়কার অবস্থা অনুমান করে ভেবেছি, এমন সোচ্চারীর প্রসঙ্গিক অবস্থায় অমিতার ওমন কথাটা বিচিত্র কিছুই নয়। তার পরে ওকে কথা দিলাম। তারপর বহু ও তাড়াতাড়ি পারলাম সিকট করলাম এখানে।

চায়ের কাপ দুটো টেবিলের ওপর বাখিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে সুজয় মাথা নিচের দিকে রেখে, আমার দিকে চোখ তুলে শুধু বললেন কেন, ছোট ছেলেটার কোন সমস্যা নেই, ওর খেলার সঙ্গী-সাথী যেখানে সেখানেই ওর ঘর বসে। বাস্তবাড়ি পাড়া-বাড়ির কোন কেন ওর কাজ নেই। সমস্যা হল বড় ছেলের। এই বস্তির ঘরে সে কেমন করে তার স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে আসবে। এই নিয়ে অমিতার কাছ থেকে কম অভি-যোগ-অনুযোগ শুনতে হয়েছে? এখন মা-সন্তরা হয়ে গেছে, মুখ বুজে থাকি। অমিতার অভিযোগের চেয়ে ছেলেটার হীন-মন্যতাবোধই বেশি পীড়া দেয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় কী জানেন? লেখাটা একটা বদ-অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়। বুঝতে পারি অমিতা আমার পাণ্ডুলিপি কেন গুরুত্ব দান করে।

আমি বললাম, পাণ্ডুলিপি আপনার মুখ বন্ধ করে রাখা করেন, তার সন্তান-স্নেহে।

সুজয় সোম কি উত্তর দিতে পারেন এই ভেবে সময়ক্ষেপ করলেন; পরে বললেন, তাহলে কেমন করে বোঝাব মুখের কথায় আসলে তাদের।

পাণ্ডুলিপি আর মনের বোঝাবুঝি কোন ব্যাপার নেই আমার।

—ওই যে বললাম আপনাকে—লেখাটা একটা বদ নেশার মতো।

আমি আত্মগোপন লজ্জা করেছি নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছেন সুজয় সোম। যেন এই রকম কণ্ঠে তিনি বলছেন, না-হলে দেখুন না, সাধারণিক কাল ছেলের গাইনে বাড়ি পড়ে আছে স্কুলে, অথচ পাণ্ডুলিপির পাতায় তার বাপ বলছেন। এর চেয়ে সর্বনেশে কোন নেশা আছেন বোধহয় অমিতা অনুমান হয় না।

সুজয়ের স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর নিপুণ অপাঙ্গ কোথায় এবং কেন, আমার জিজ্ঞাসা অসঙ্গত হতে পারে নি, সুজয় সোমের কণ্ঠস্বরের ভাবনায় ছেদ পড়েছে, অমিতা মুখে যা পারে বলে মুখে বলা যা শেষ হয় না বাপের বাড়ি থেকে চিঠির আকারে লিখে পাঠায়। এই দেখুন না এক বলে কিছুদিনের মধ্যেই, অমিতার পাতা; ছোট্ট লম্বা-লম্বা চিঠি। আর সে সব চিঠির ভাষাও কি ভীষণ! একবার তো বাসিয়েই দিল—আমি যাতে খুশি নিয়ে ঘর করতে পারি, অমিতার জানো সে নিজেই রাখতে পারবে। এভাবে আর বেশি দিন চলতে পারে না। তবে ছেলে স্কুলের ব্যবস্থা যেন আমি করি। বহুদিন নেজাজ নিয়ে খোঁজ করে একটি, লিখতে বসেছি এমনি সময় এসে হাজির হল অমিতার চিঠি। লেখার ছিটে-ফোঁটা মেজাজও তখন থাকে বলতে চান? কিন্তু একটা ভেবে নিজের মনেই হাসলেন সুজয়; পরে অনেকটা টীকা যোগ করার মতো বললেন, হাসি পায় কিনা বলুন, কখনো-কখনো কি চার্জ করে জানেন? বলে, আমি যে কিরাসিত লিখে আছি একথা ওকে খোলা-খুলি জানিয়ে রাখি নি কেন। যেন কোন গোপন অপরাধ ওর কাছ থেকে আড়াল করে রেখে ছিলাম, কথাগুলোয় মেঘে আমি সুজয়-এর মুখে স্টিরীয়ের হাসি দেখতে পেলাম না, উপরন্তু তাঁর সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী অমিতার কথা থেকে কোন ধৈর্যিকের তাদের কথা উচিত কিনা ভাবার—এমনই মনোভাব।

আমার কিছু বলা দরকার, না-হলে সুজয় মুখি আর মুখ খুলবেন না। সুজয় স্তব্ধ থাকায় মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর সমস্ত মেজাজ হঠাৎ ঝুঁকে এসে আমার নিয়েছে। আর ঠিক এই সময় তিনি আবার বলেছেন, আমার এক-এক সময় মনে হয় পাণ্ডুলিপির সমস্ত কথা বলা সুরে যাক, ফেলে দিই বাতিদানীর মতো না লাগিয়ে-এসে পড়ে, কিংবা উইলের মতো রাখি মেয়ে-স্কুলে নিয়ে যায়।

বড় ছেলে তার বা-র মতোই কিশোর বয়সে আমার এই পাণ্ডুলিপির আর্থিক মূল্য বোঝে নয়, নষ্টমুখ স্কুলে তাকে উচ্চ ছেলেদের মতো হতো না। তবে সে বিশ্বাস করে এই সব কাগজের পাতাগুলোর সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। তার মা এমনকি বিষয়ে পরিষ্কারভাবে মনে করলেও সে কিন্তু কেমন একটা সম্ভ্রম-ও শ্রদ্ধার মাঝে-মাঝে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো সযত্নে স্পর্শ করে উল্টিয়ে দেখেছে। একবার এক প্রাবণের মধ্যে আমার কীর্তির কথা সভাবায় করে বলতে গিয়ে হঠাৎ

ডঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস.
ডঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস.
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য - মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রহস্য ও জটিলতার চিত্রিত প্রতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী
অগ্রিম ৬.৫০ দিলে পাইকারী কমিশনের ব্যবস্থা

কথা ভেবে চলেছে। অমিতা এর মধ্যে সামনেই চক্ষু বন্ধের ব্যবস্থা দিয়ে উঠেছে, যাক বাবা, আর বাপের মুখে পাইতে হবে না, জানাই ভোদের বাপ থেকেও নেই, অমন বাপ থাকার চেয়ে—যা কষ্টের সম্পূর্ণ করার মতো বুদ্ধি ছেলের আছে, সে বুঝতে পারে বা-র মোক্ষম কথাটা কি।

আমি বুঝতে পারি সুজয়ের মেয়ের স্ত্রী অমিতা অনেকটা নিউরোটিক মুখরীর মতো স্বামীর সাহিত্যজিজ্ঞাসার ব্যাপারে অসহিষ্ণু। তাই তিনি যাবতীয় উপায়ে বাধা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর।

আমার এই সাময়িক চিন্তাজগৎ মুহূর্তে সুজয়ের মেয়ে আমাকে বলেছেন, কী, এর পরও কি বলতে চান, আমার সমস্যাটা আপনার অজানা।

আমি অনেকটা বিদ্যুতে হত হয়ে চিন্তাশূন্য হয়েছি। একটি মুহূর্তেই সুজয়ের কথায় ইঙ্গিত-বহনে পেয়ে বসেছি, আসলে এই কথাটা বলার জন্যেই আমাকে ধরে এনেছেন। আমি কিন্তু অবশ্যিতেই, বাপ করলেন, আমের অছোই অমন, অভিব্যক্তি।

সুজয় মেয়ে বললেন, না। আপনাকে নিয়ে পাড়া দেল না। বলুন আর এক রাউন্ড চা হোক।

সুজয় যখন উঠে গেলেন আমার মনে হল, আগে অনেকবার যেমন মনে হয়েছিল, আমি কিছু ভেবে বেখা ও আরও কিছু তাঁর 'নজর' হয়ে থেকে গেলা সত্ত্বেও, এখনও আমার স্বাধীন মৌলিকতাকে কেন বজায় রেখেছি তা কি তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়? আমি যখন এইভাবে তাঁকে ধরার জিজ্ঞাসা করে এসেছি, সমস্যাটা কী—তিনি ভেবেছেন এই বেখা ও লেখা থেকেই আমি সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি?

আমি যে সময়ের মধ্যে বসে বসে ভেবেছি সুজয়ের মেয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন না জেনেই এই প্রস্তাবটা করেছেন, সুজয়ের জন্যে স্বিতীয় কাপ চা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এবং আমি যা ভেবেছি ঠিক তা-ই বসি একা সুজয়ের মেয়ের সামনে বলি, তিনি কি প্রতিবাদের জন্যে বাস্তিক উচ্চারণ করতে পারেন, আপনিই বলুন না, একজন ই স্টোরেজি আর্টিস্টের সমস্যাটা কি হতে পারে?

সুজয়ের মেয়ে কিছু বলার আগে দুষ্টিকে প্রশ্নের মতো চোখে কপাল আর ভ্রূ দুটিকে দিয়ে সাজালেন। তিনি যখন কিছু করে থাকলেও আমি আন্দাজে স্পষ্ট বুঝি তিনি যে বাক্যটি দিয়ে শুরু করবেন সেটা মনোমত খুঁজিয়ে নিচ্ছেন।

আমি ওঁকে এতটানা লক্ষ্য করছিলাম চোখের কাছে মুখ নামাই নি। সুজয়ের মুখ ফুলে আসার লক্ষ্য করেছেন। বললেন, কি হল বলছেন না?

যেন দুটি অসমর্থ মুহূর্তে ধরে ফেলেছে, তাড়াতাড়ি মুখ সংশোধনের চেষ্টায় বলি বলি, না—এই মানে—সমস্ত মনে চোখের কাছে মুখে দিয়েছি।

—আমি ভোর এই সব ধারণা তৈরি হল কেন জানেন, একটা বড় কারণের কথা বলতে চাই—সুজয় যে এই সময় ব্যস্ত থাকে তাকে ব্যস্ত রাখা দরকার। কথা বলতে চাইলেও তা মুখোমুখি আলাপ করতে দেয় না। ওঁর মুখের দিকে তাকায় বিশেষ চোখ রাখিলাম। ওঁর কথার কল ভাববাচ্যই কষ্ট।

আমাকে এই রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুজয় বলেছেন, এটাও কি অভিব্যক্তি। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, রোজ এই সব ধারণা তৈরি হচ্ছে পুতুল হাতে—বিলিত ইই সব নই।

আমি মুখে বলেছি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, কোনো না-কোনো জন্যে, তবে মনে রেখেছি, সুজয় তার সুখবটী ভূমিকা বর্জন করে এই মুহূর্তে নতুন কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সুজয়ের মুখের কথায় যতো তাঁর সময় মুখাবয়বের অভিব্যক্তি কেমন দ্রুত পাল্টে গেছে।

—অনেকটা আর্ধাবেরা'র মতো লেগেছে না? কথাটা ঠেকাতে, আমার কথাটাই লক্ষ—আপনারও মনে হয় কথাটা ঠিকমতন, না? ছেলেকে মেরেকে বাড়ুলতা, অভিব্যক্তিও মনে করেন বাপ? যেন কিছু ঢাকিয়ে ফলাতে গেলে সি ঠাইল কল দি মানত।

সুজয় মেয়ে হেসেছেন, আমি লক্ষ করলাম তাঁর হাসিতে বিদ্রুপই অধিক। মুখে হাসি এঁকে রাখা যায় না কোনমতে। যে-কোন মুহূর্তে এই অভিনয়কুশল কপট হাসি ছিঁড়িয়ে নিয়ে তিনি তাঁদের স্বাভাবিক চোখে তাঁর মুখের ভাবান্তরকে আরও আপনি করে তুলবেন। আমাকে কি অবশ্য সতর্ক হতে হবে, যাতে আক্রমণে না করি, তাঁর এই আপনি ভাবান্তরের সোজে আমার না-ই।

পরীক্ষার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সাজার যার যেমন পরিচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে দ্রুত সন্ধান সরল করার চেষ্টা করে, সেইভাবে সুজয়ের মেয়ে অনেক অযোক্তিক চিন্তা-ভাবনাকে এক জোট করার চেষ্টায় বেপরোয়া হয়ে উঠলেন ভিতরে-ভিতরে; এমনই অসতর্কচিত্ত হয়ে উঠেছে তিনি, মনে হল। মনস্তত্ত্বের অসতর্কচিত্ত হওয়াটা বিরাট কিছু নয়, এবং বিদেশী সাহিত্যিকের কাছে তরল পানীয় হিসাবে যে পানীয় জল অপেক্ষাও অতি তরল, কিন্তু সুজয়ের আপাতত চা ছাড়া কিছুই পান করেন নি, তবে কেন এই অসতর্কচিত্ততা, ভিন্ন সম্ভবতে?

সুজয়ের মেয়ে সারা মুখে জল হাতের আঙুলে বার-কতক বুলিয়ে বুলিয়ে তবে নিলেন, মুখের ফোলাটা অনেকটা কমলেও আমি বুঝি আমার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। তারপর আমার দিকে চোখ তুললেন যখন, আমার তাঁর দৃষ্টি তোটেই স্পষ্ট মনে হল না।

আমি তাঁর প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার আগেই সুজয়ের অন্তরঙ্গতাপূর্ণ প্রশ্ন করে বসেছেন, আচ্ছা, আপনি খোলার চোখের মাঝার কখন আসনে লাগ দেখেছেন?

কি জবাব যা কি বলতে ভাল হয়, এই-টুকুর জন্যে সময় নেবার আগেই সুজয় নিজেই বলেছেন, আমি মুখে আসনে লাগা নয়, চোখ থেকে চোখে আসনে লাগিয়ে দেখা দেখছি, আপনি হয়তো বলবেন বাইরে সেখায়; কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে এই কথা দেখছি, একই কথা, মনের ভুলের মতো হয়তো পাঁচটা আসনে লাগানোর মতো এলোমেলো চোখের থেকে পুতুল আসনে দিয়ে কথা দুটি চোখে চোখে বলেছেন।

আমার মনে হল এইখানে থেমে এর পর আবার ভুলে সুজয়ের সঙ্গে ভূত-পুত ইতিহাসের কথায় ফিরে আসবেন। কিন্তু না। আমার মনে অবিকল্প বিশ্বাস তৈরির কথার কণ্ঠস্বরকে তিনি খুব ধীর ধীরে বাহিরে বলতে লাগলেন, আসনে এক চোখ থেকে আরেক চোখে ছড়াচ্ছে, অভিব্যক্তির কথা সোজাসুজি ফুটে উঠতে দেখানে আসতে পারছে না, কেমন যেন খোলার চোখ দুখ প্রকাশের ধরে ধরে পড়ছে—আর ঠিক এই সময় অনেকটা আমার' মেয়ের মতো স্বভাব-এর ঘণ্টায় কান পুতুল ভেঙে যায়। নিজের কান পুতুল নিজেই ভেঙে ফেলি। আর তখন শুনে, আমার এই বন্ধিবর্ধিত ঠিকমতন অবেকখানা আত্মপ্রসাদের সাথে কথা ছুটে আসছে দেখতে পাই। সমস্যার সমাধান পর পর বাড়িয়ে যায় আত্মপ্রসাদের।

অবকলবাহিনীর মেয়েরা নিজেদের প্রয়োজনে যে-যোগাযোগের প্রয়োজন বোধ করে তার কোন প্রয়োজনের মোকে একজন প্রয়োজন চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে না—সেখানেই নেই। অবকলবাহিনীর মেয়েরা চটপট অন্যের নেতাদের কাছে রেখে যায়। কিন্তু আসুন আসবে আসে না। আরে আসল লাভটা তো মেয়েরা করতে পারছে না—আসুন মেয়েরে তো আসলে এই ক ইঞ্চি জায়গার মধ্যে, সুজয়ের দুটি শীর্ণ আঙুল কিন্তার করে পলকটের দুই প্রান্ত ছেপে ধরেছে। আমি আগে সন্দেহ করেছিলাম। এখন নিঃসন্দেহ হলাম। চা-করার এক ফাঁকে সুজয়ের মেয়ে জিজ্ঞাসা পান করে এসেছেন।

যা কিছু হচ্ছে এই এখানে—বুঝলেন? সুজয়ের প্রকাণ্ডের পরিমিত স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে আঙুলের চৌকা বাড়লেন, বলেন, আসলে অভিব্যক্তির এখানে আর তাই দেখার খোলার চোখগুলোর আসল ঘটনা আসনা। সিনেমাস্কোপে ভূমিকম্পের ভয়াল রূপ পড়বে কেতনের মাথার মাথে, আর মুখে-কান্ত সব দেখা যাবে বাইরে এই দুটি চোখগুলোতে।

সুজয়ের মেয়ে প্রশ্নাবোধির প্রায় যখন এত কথা বলছিলেন সাজিয়ে সাজিয়ে অনেক আবেগে, তখন তাঁর মুখের ভঙ্গি-বৈচিত্র্যময়, চোখগুলি কুঞ্চন ও সম্প্রসারণ-প্রবণ, অনাবশ্য বিষয়ের মতো চলাফেরা করতে লাগল। ওঠ-দাঁত শুষ্ক করে। অনেক প্রশ্নচিহ্নে তাঁর অনাটে মুখবাদা অর্থহীন কড়-বিকড় মনে হল।

যেন প্রশ্ন করা বা কোন আছিলায় সুজয়কে ছুটা দেওয়া অর্থহীন মনে করে আমি সহযোগিতা হওয়ার চেষ্টায় তাঁকে আরও যৌক্তিক সুযোগ দিতে চাইলাম।

সুজয়ের ব্যবহারিক সুযোগের অপব্যবহার না-করে নিজস্ব আরো চলার ক্ষেত্রেরে আসনের একটা ছবি আমাদের চোখে, পলিশ ইন্সপেকশন করে নিলেই তো, কিন্তু ইন্সপেকশনই করবে কোথায়, আর ডিসিপ্লিন

১৯৫৮৭৮

যা কি দেবে? তাঁরা মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। অনেক ভেবে ঠিক করলেন এইভাবে দুজনের ইচ্ছে মেনে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

ডাক্তারের একবার বলে, সবসময়ই তো আপনার চল-চলা মানসিক অবিশ্বাসে, আর এর সবসময়ই যখন ফোন হাতড়ায় বিশ্বাস করছে, সবাইকেও একটা খুচরো-দেখতে দিন দেইতাবে।

দুজন কর্তৃপক্ষের এসব অনুযোগের মুখে চাপ ফেলে বললেন, সত্যিই, একটা ভুল হয়ে আসি, ওরকমই শুনিয়ে দেবে।

আমার বলে ভুল ধরিয়ে অনুযোগ করে দেখে আসি, তিনি অনুযোগের জন্যে উঠলেন, না আমা কেমন অসহায়। আমি অন্যায়ে ফোনের কিনা করছিলাম। এখন অপরাধিত হলাম। যদি ওরা চাইছে আসেন তো এই অফিস বাড়িতে থেকে আপনার ফোন নম্বর নেই।

দুটি সকাল ফেলে দুজনের সোনের পরবর্তী অনুযোগীর পরিবর্তনের জন্য আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলাম। তাঁর মুখে এ সময় এমন ফোন রেখা করেই উঠবে যা তাঁর আগে ওরা পড়ে নি। যা তাঁর মুখের অবাস্তব রেখা যা মুখের অবাস্তবলোর ফেরে আরেক রোঁদ দুজনের জন্যেই।

অনুযোগ, দুজনে যখন ফিরে এলেন, তাঁকে বিশেষ সমাহিত মনে হল। একজন যা বলেছেন যা ব্যক্তিত্ব বলেছেন, তার মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না। যা বলেছেন, তা স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ বলেই থাকে।

দুজনে সোন নিজের আয়নায় বলে এসময় আইনে দুটি নিজেদের অবলে আমার মনে হল তিনি কোন বিশেষ সংখ্যার অপেক্ষাই উৎকর্ণ হয়ে আছেন। একজনের অনুযোগ, অন্যের আমার কাছে তো ঘটাই, দুজনেরই মধ্যে তাঁর দুটির সঙ্গে আমারও দুটি হয়েছে। যা-বলে আমন করে তার দুজনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত, তার পরবর্তীর আমার উৎকর্ণ?

তাঁদের একজন বলে, আজকের মতো আপনার অনুযোগ নিয়ে উঠি—কিন্তু অনুযোগ পাওয়ার যে কোন আশা নেই তা বুঝতে পারি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজনে মনে অনুযোগ করলেন, আমনুযোগেনস্‌গুলো যেন আপনার মনে হয় না, এরা সারা পৃথিবী জুড়ে ছটোছুটি করে বেড়াচ্ছে কোথায় কার বাড়ি দুমুখো রয়েছে তার খোঁজে! সবসময় সামনে একখানা আমনুযোগেনস্‌ এসে দাঁড়ান চাইই ফোনের উপলক্ষ। আমার সেরকমভাবে আমি পর পর অনেকখানা আমনুযোগেনস্‌ পাঁড়ি দাঁড়িয়ে রেখেছি। ফোন একখানা গাড়ি থেকে সেটার নিয়ে লোক ফোন আসবে, আর আমি অন্যান্য সজীব মনে পড়ব।

দুজনে থাকলেন, হঠাৎ কোন ভুল হয়ে গেলে মানুষ সংশোধনের জন্যে যেমন থাকে। পরক্ষণেই বললেন, আচ্ছা, আমি সেটারে কেন যাব, আমি তো পারে ফোন নিয়ে যেতে আমনুযোগেনস্‌-এ গিয়ে উঠতে পারি? আমার তো ফিজিক্যাল পেইন বলতে কিছু নেই—

আমি এই সময় যথার্থ ভেবেছি দুজনের কোথাও কোন বাধা বন্ধনা নেই, অন্যে মানবসেবা সেবনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে উদাসীন। স্থায়ী ফোনের আকর্ষণে লোকের ভিলিন যেমন তিনি সাড়ে করে থাকেন, সেই রকম হয়ে যেতেন। তাঁর চক্ষুর অলোকের লুকিয়ে থাকেন। সামনে করে দুজনকে চালেঞ্জ করতে হয়, আমি আপনার বয় সাড়ে করে দেখতে চাই, মনে হয় অনের একটিমাত্র ফোনের খুঁজে পাওয়া যাবে। এর থেকে সাধারণত বিশেষ এক শ্রেণীর লোক খুব খারাপ করে, আর আপনাদের মতো চিন্তাশীল বিশেষীরা বাজারীন প্রলাপ করে যান, আপনি এসব যা করছেন আর কি—

দুজনে আমার মতে আবিষ্কিত হেসে বললেন, আমরা যা ছেলেরা বাঁধ আমাকে জোরাল পা ফেলে আমনুযোগেনস্‌-এ উঠতে দেখে তো অবাক হবে। আমিতকে যেমন অনেক কিছু ফেলনে হয় না, যেমন বাজুলতা, সেরকম আমার সিকুরেনও কি তাকে ফেলনে যাবে? আসলে এই ক' ইঞ্চি আয়নার মধ্যে কী হচ্ছে—সেটা কি তাকে—দুটি নীল আঙুল কিন্তার করে লালাটের দুই প্রান্ত তিনি চেপে ধরলেন। আমার ভালুকে পাঁচটি আঙুল চেপে রাখলেন।

আমি অবিশ্বরণীয় গল্পে পড়া ফকনার কিংবদন্তির দ্বিতীয় হাইকে মুখোমুখিত হওয়ার কথাই সবজ্ঞযোগ্য বিবেচনা করেছি। সামান্য ওরল পদার্থের প্রতিক্রিয়া কী ভয়ঙ্কর। দুজনে সোনের ক্ষেত্রে ওরল পদার্থটি বিশেষ পরিচিত। দ্বিতীয় হাইকের মতো ভয়ঙ্করবর্ণের মুখে পরিচয় না করলেও দুজনে সাদের এ-মুখোমুখিতাই আমার কাছে একবার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁর মুখের বলিরেখাগুলো তিরিশিরে উঠলে মনে হল, তাঁর মুখোমুখে দুটি চলে হল স্কার্ফ আমারও দুটির বদে হয় আমার, তাঁর অপরাধালের অবশ অস্বাভাবিক অসহযোগ।

দুজনে পায় ঘুম থেকে চোখ মেলার মতো দুটি তুললেন, সমস্যার তাৎপরীতে একই কণ্ঠে বললেন, অথচ আমার সিকুরেন কোথায় আমি তো জানি, দু হাতে একদম ঠেঁটাছি কিনের জন্যে—ধরুন এক আমনুযোগেনস্‌ যখন আমারই অপেক্ষায় আমার যে, উঠেই হবে একখানায়। হাই পেইনস্‌! অমিতা বিশ্বাস করে না, ছেলেরা বুঝতে পারে না, আমনুযোগেনস্‌-এ উঠে অথচ সেটারে আসবে না—সমস্ত ব্যাপারটাই সকলের কাছে গোলমেলে, অথচ আমি তো স্পষ্ট দেখছি, আমনুযোগেনস্‌ এসে দাঁড়িয়েছে, অথচ আমি তো জানি আসলে কোথায় কী—এ,ই সোনের কণ্ঠস্বর লেখার বিকে স্বগতোক্তি ছাড়া আর কিছু হয়ে হয় না। একজন সামনে কোন ছোটো দেয়ে তিনি কথা বলছিলেন, এখন মনে হল তাঁর কথা তাঁর নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে স্পষ্ট হবে না, তাই এখন একান্ত ব্যক্তিগত কণ্ঠে নিজের কথাগুলো নিজের কানেই উচ্চারণ করছেন। একজনে দুজনে সোনকে পরিত্রাণ মনে হল। নিজের মনের নিজেই মনে লিপ্ত হয়ে ক্লান্তি অনুভব করছেন।

আমি ভেবেছি তাঁকে বলা ভোরে অনুরোধ করি, নিজের কাছের মনের এ-মুক্তি এবার আমার। হাঁটাচলা অটল হয়ে উঠেছিলাম, আর নয়, এ-জনপদবাসীকে-প্রায়

নিয়মিত ব্যবহার করলে
ফরহান্স টুথপেস্ট
দাঁতের ক্ষয় রোধ করে
দাঁতের ক্ষয় রোধ করে

ফরহান্স টুথপেস্ট দাঁতের এবং মাড়ির সমস্যা রোধ করার জন্যেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ও রাত্রে সকালে ফরহান্স টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত হবে সুন্দর এবং দাঁত শক্ত ও উজ্জ্বল ধবধবে সাদা হবে।

বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তিকা—"দাঁত ও মাড়ির যত্ন" এই ঠিকানায় লিখে ১০ পয়সার ষ্ট্যাম্প (ডাকখরচ বাবদ) "ব্যানার্জি কেমিক্যাল এন্ডসাইলেন্সী ব্যুরো," পোষ্ট বক্স নং ১০০৩১ বোম্বাই-১ এই ঠিকানায় পাঠালে আপনি এই বই পাবেন।

নাম _____ বয়স _____
ঠিকানা _____
_____ পিন
তারিখ _____

ফরহান্স টুথপেস্ট—এক
ব্যানার্জি কেমিক্যাল সংস্থার সৃষ্টি

যেয়ার আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। আমার অর্থাগমও কম হয়নি। প্রথমত, তিনি যে-সম্মানের কারণেই এরকম দৃষ্টিকটুভাবে অর্থ-হীন প্রলাপের আশ্রয় নিয়েছেন, তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইনি। আর সম্মানই যদি তাঁকে বাধ্য করে থাকে তো এতক্ষণ ধরে তা সহ্য করার মানেও তো আমার কাছে কিছু থাকতে পারে না। অতএব প্রতিবাদ করে তাঁকে এ-সবের যথার্থ কারণ জিজ্ঞাসা করা উচিত।

মুকুন্দ সেন্সর বোর্ডের সিদ্ধান্তের বাইরে আমার সমস্ত চিন্তা ছেয়ে গেল, এবং মনে হল, অবশিষ্ট যেটুকু বলার আছে, সেটুকু অকপিত রেখে তিনি আজকের মতো ছেদ টানতে পারেন না কোনমতেই।

মুকুন্দ সিগারেট মুখ থেকে নামিয়ে মু আন্দুলে চোখের সামনে ধরে রাখলেন খোয়াতে, পরে সিগারেটের আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যেন কারও উদ্দেশেই বলতে লাগলেন, এইভাবে শুরু করেছেন, ফ্রয়েড ছিলেন আর আমেরিকেলেসন্স এরা অনেকটা একই জাতের মানুষ, আমার ছিলেনের কথা মনে হলে মনে পড়ে যায় মস্ত মস্ত, ভারী-ভারী লোহার পেরেকের টেনে যাওয়া করা হচ্ছে জলজ্যান্ত মানুষের হাতের-পায়ের মধ্যে। আর আন্দ্রেয়ের ছিলেনের সাড়া বিশ্বে পঞ্চাশটের কাছাকাছি আর আমি, আমরা আছি। এর চেয়ে বড় আশ্বাস আর কিছু নেই। পঞ্চাশের মধ্যে দুজন বড়, কিন্তু পঞ্চাশ-হাজার মানুষের এই কথার মানে কি একবারও তাদের মনে হবে না এরা—আমি আছি, আমি আমি—এই এসে পড়েছি। আন্দ্রেয়েলেসন্‌ও তাই। সে একবার এই পার্টির মধ্যে নিজের স্বাক্ষরটুকু জোগাড় করেছে, সে নিশ্চিন্ত লোভা হয়েছে এমন একটি আয়োজন যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাত তারই সেবার জন্যে নিত্য প্রস্তুত। কথা কারার ছিলেন আর আন্দ্রেয়েলেসন্‌—এ দুজনের কোনটাই কি আমার মতো কিছু করতে পারে। আপনি হাসছো। কলকেন মাইকেলেস, কিন্তু এসেই আমাদের দেখছি আমার এই বাস্তববাদিতা উপলব্ধি।

আমি আর তাঁর একটি কথা শুনবার জন্যেও অপেক্ষা করিনি, বলিনি, কিংবা কথনে, আমি কিছুই করতে চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করতে চাই। আপনি আপনার স্ত্রী-পুত্র পার্টির বিষয় কথা বলে কিছু বলুন, আমি যেন জানি তাঁদের জোরেই কিছু করছি।

মুকুন্দ আমার মুখের দিকে অবিশ্বাসের কিনারে তাকিয়ে থেকেছেন কতক্ষণ, তাঁরপর হাসিতে কণ্টেন্সর ক্রীপারে অবশিষ্ট ছিলেন আমেরিকেন, আপনি কতজন ছেলেকে ছিলে করেছেন?

—একজন, তা যেন কিছুদিন বাঁচি।

—আপনি বলেন, বলবেন, তা আমাকে বলেননি কেন?

তাঁর ও-প্রশ্নের সত্যতায় অবাক হয়ে গেলাম।

—আমি আপনার অপরাধ ছেলেকে কিনা করবেন, আপনার ছেলেই মুকুন্দ কলেন।

সিগারেটের এক তৃতীয়াংশে হাতে ধরে মুকুন্দ ছাইদানের ওপর অনেকের পাকানো অনেক পুড়তে দিলেন দেখলাম, মনে হল তিনি সিগারেটের বিজ্ঞাপন হওয়ার অবস্থা নিয়েছেন, কী ভাবে বলবো প্রলো বিজ্ঞাপন-লক্ষ্য হয়, সে-কথা ভাবছেন। সিগারেটটা হঠাৎ পাকলা ছাইদান আরও কিছুক্ষণ পুড়লো। মুকুন্দ এক সময় বললেন, আপনাকে আমার এখানে এনে সেই জন্যে আমি ছেলে একটি ছেলেমেয়ের অভাব-অভিযোগ অভিনবের কথা বলতে চেয়েছি। সেদের কথাগুলো যদি লোকের ভালবাস, আপনি নিশ্চয়ই মজা মনের আলোই উঠে পড়বেন। ঠিক কিনা?

আমাকে নির্বাক দেখে ওঁকার মের টেনে বলেছেন, আপনি একটি মুহূর্তও বসতে পারবেন না, তাহলেই তামাসা করার জন্যে চাপ্পা থেকে আপনাকে তুলে এনেছি। আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আটকে রাখবার এইভাবে যদি না বলতেন আপনি অবশ্যই নেই? আসলে আপনি নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছেন, সত্যকথা আপনি নিজেই, আমি ও অভিযোগক নয়, মুকুন্দ কৃত্রিম হাসিতে কণ্টেন্সর ভাঁপালেন।

আমি উঠি উঠি ভাব করছি, মুকুন্দ আমার আচরণ অনুমান করতে পেরেছেন, বলেছেন, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। আপনি যা আপনার মতো চলন বাঁধের, তাঁদের চলনটা খুবই সিরিয়াস মানতে রাজী নেই, এত যদি একজন প্রশ্নের উপলক্ষ সাদৃ, কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকের সিরে দাঁড়াচ্ছে জানেন—এই আমেরিকেলেসন্‌ আর আমার ছিলেনের যে অনুবিধার কথা বললাম। সাদৃ উপলক্ষেই সবাই সবকিছু তোলপাড় করছে, কিন্তু ছিটেফোঁটা কারো পাওয়ার না আপাদকী ঘটনার কোথায়—আসলে আপনে লোকের তো এইখানে। মুকুন্দ দৃষ্টি আমাদের ছিলের আর ওপাশের দৃষ্টি চাপ্পা শব্দ করে ছেলে ধরলেন।

আন্দ্রেয়ের চাপ আলগা করে মুকুন্দ সোজা কৃত্রিম হাসিতে কণ্টেন্সর ভাঁপালের জোরে কাঁপালেন। তাঁর ঘর-দুয়ের সবত্র সেই হাসির কম্পনের স্পর্শ পেয়েছে। আর আমার একই সঙ্গে মনে হল, মুকুন্দ সেন্সের কৃত্রিম হাসিতে এবং এককালে সেদের বিদ্রূপ ক্ষোভ বিদ্রোহ ও সর্বোপরি ছোট নিরন্তর ছেলে পড়েছে। আর এসব কিছুর সান্নিধ্যে এক মুকুন্দ তরুণ আমার মুকুন্দের ঘরের ছোকাঠের ওপাশে ঠেলে দিয়েছে। আর সেই ছেলের কিশোর অবশিষ্ট থাকতে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম এক লাফে পার হয়ে ঘরটিতে পা দিয়েছি।

সত্যি বলতে কি, নিজের কিংবা মুকুন্দ সোজার মুখে ছেলের সাহস আমার ছিল না। আমি নিজের কিংবা ঢাকিনি। অন্যজন, তাঁর দৃষ্টিতে অবজ্ঞা অবহেলা ও তাচ্ছিল্য ছাড়া কিছু থাকতে পারে না।

রাস্তায় পা দিয়ে সর্বাত্রে যা মনে পড়েছে, আমার এরকম এমন অবস্থা আর কেউ করেছেন কিনা জানি না। আমার বিফল-নীচতা মানবতাবোধ নিয়ে জীবনের কেন একটা আয়নায় আমি স্থির থাকতে চেয়েছি, মুকুন্দ আমাকে সেখান থেকে অনেক নিচু কেন্দ্রে নামিয়ে অনেক নিচুতে নিয়েছেন, আমার অবস্থানের অসহিষ্ণু হয়ে। মুকুন্দ সেন্সের বাঁধন এলাকায় পরিবারের আগে আমাকে আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে আসতে হয়েছে, এর পরও কি আমার পক্ষে তাঁকে বন্ধু হিসেবে অবজ্ঞা সম্ভব—তাঁর চেয়ারে ছাপা করা?

জওহরলাল নেহরুর

গান্ধী

স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই জীবনী। এই বই না পড়লে মহাত্মা গান্ধীকে জানা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এক মহৎ জীবনকে উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য করে লেখা হয়েছে, যা প্রচলিত জীবনী-সাহিত্যের সন-তারিখের মালা নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা লেখকের ভাষা-বৈশিষ্ট্যে পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

মূল্য ঃ ছয় টাকা

এস, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আজকে ৩৪ সংখ্যার ঈদসংখ্যা সওগাতে ক্রসওয়ের প্রথমবারের প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যার সেবাদে দেওয়া হল। ক্রসওয়ের ব্যাপারের কথা অনুকরণীয় না হলেও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

ব্যাপারটি খুবই বিচিত্র বস্তু। অথচ্ছলী বিস্তারে বিচিত্র চরিত্রকে রূপে করতে সেখানে স্থিরা নেই। তাই যারা একদিন কবরীবন্ধ আর মলমী বিভাবিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরাই আজকে খুব শেষ হয়ে না হয়েই আধুনী আধুনিকের সঙ্গে মিতালী করতে আরম্ভ করেছেন। কারণ নামটার আধিক্য নিয়ে এখন আলোচনার অবকাশ, অন্তর্নিহিত হল প্রকাশ বিশ্ব। তাই কিছু-কাল পর্যন্ত যে ছিল শহুরে হল মিছ, আজ তার ছিল মিছরাজের সঙ্গী আরা হল শহু। অন্তর্নিহিতকে খুঁজতে আমাদিকে অনেক প্রয়োজন—তাই যে ক্রসকে খুব আধুনী হিসেবে আর বাজারে আরম্ভেদের আসন দেওয়া হয়েছিল তাকে ক্রসওয়ে বলা হল।

মিঃ ম্যানচেস্টার আলোচ্য ১১৫০-এ ক্রসিয়ার খুব মধ্যে হল, তখন প্রথম দিকে মনে হল যে আপাতটি পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের পক্ষে বিপজ্জনক আর নাকি সেই কারণেই আমেরিকান আলোচনা ছেড়ে দেওয়া হল। আমেরিকার খুশি হবার এই আরেকটি কারণ বিদ্যমান হয়েছে তবে এইটাই কিন্তু মূখ্য কারণ নয়। ক্রসিয়ার খুব পশ্চিমী পরিবেশের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করল যে, অন্তর্নিহিতই প্রকৃত বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। তাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। ক্রসিয়ার খুব অনেক খুনের খুব তাই সেই খুব পশ্চিমী পরিকল্পনার পক্ষে খুব একটা সন্তোষজনক নয় যে সেই কারণে আমেরিকাকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই খুব যদি না লাগত তাহলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হত কারণ ইয়োরোপের নতুন শত্রুর চারপাশে ঘুরার ঘুরতে অনেক কিছুরই প্রয়োজন।

সৃষ্টি পাওয়ার পর নিজের এবং তার কল্পনাদার পুনর্বাসনে যেমনী সময় লাগল না ক্রসের। নতুন ব্যক্তিসত্তার চাহিদা মেটাতেই সকল প্রচেষ্টা উজাড় করে দিল ক্রস, ঐশ্বরনশীল মেকানিজম তার সহায়তায় বঞ্চিত হলো। না। সহজেই প্রতিযোগীতার ইটিয়ে দিয়ে অনেক এগিয়ে গেল ক্রস। অন্য প্রতিযোগীরা যেখানে কোনো খুঁটি নিয়ে ঘর গোয়েছে ক্রস সেখানে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে ঘর তৈরী মনোরম তুলে প্রতিযোগীতার ইর্ষার কারণ হয়েছে। ইয়োরোপীয় কমনবাজারে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রস একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী খিলাড়ি। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্রস ওকেন্ট জার্মানীর প্রথমবার আর্থিক অংশের কারখানা স্থাপন করলেন। তখনকেউ মনেও আমেন যে এই কারখানা এক বছরও টেকবে না। এই কারখানার প্রাথমিক কাজকর্ম বেশ দ্রুত-তালেই চলে ছিল।

এই ক্রসের লেখক মিঃ ম্যানচেস্টার এই ক্রস রচনায় প্রায় ৩০০০ ক্রস লিখিত চিঠি-পত্র বিশ্লেষণ করেছেন। সাতটি বিভিন্ন দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ম্যাসাচুসেট্স বিশ্বাসে ১০,৩৫৪ পৃষ্ঠাব্যাপী নথিপত্র ঘেঁটেছেন। অবশ্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছেন। মিঃ ম্যানচেস্টারের এই ক্রস অত্যন্ত সাবলীলতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ক্রসওয়ের কাহিনী অদ্ভুত এবং বিচিত্র, সেই বিচিত্র কাহিনী তিনি মনোজ্ঞ ভাষায়ে পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটি গবেষণা-গ্রন্থে পরিণত হয়েছে এবং সেই সূত্রে মিঃ ম্যানচেস্টার যেখান থেকে যা পেয়েছেন তা দিয়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। অবশ্য পুনর্মুদ্রণে এই গ্রন্থের অনাবশ্য বৃদ্ধি।

অনেক খুটিনাটিতে ক্রসটি বেরোই। যখন—যখন তাকে ক্রসওয়ার কথা হয়, তখন তার অন্তে কি পোষাক ছিল, কিংবা বিবাহের সময় তিনি কতক্ষণে ঘণ্টা টিউ লেট পেলে উপহার দিয়েছেন এইসব অবশ্য অত্যাবশ্যকীয় কথার উল্লেখ আছে। পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি লোকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই পোষাক পরিচ্ছদের নানা কথার তিনি অবতারণা করে পড়েছেন।

ক্রসওয়ের সব কথাগুলি বিরাট। ইয়োরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আর পারিবারিক সম্পদ ছিল ক্রুপ এই পরিবারের যিনি প্রধান ছিলেন সেই কর্তাদের। ক্রসওয়ে যে কারণে ঘনিয়ে উঠেছিল খুব ইতিহাসে তাই স্বাভাবিক সমীচীন, আবার যে সাবলীলতায় ক্রসওয়ে বৈরী করেছিলেন, সেটিও যথেষ্ট। ক্রসওয়ের করবার লক্ষ করেছে প্রচণ্ড আবার অনেক জায়গা ও উল্লেখ সৃষ্টি হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত ১১৫৭-র অর্থনৈতিক সঙ্কটে এর্থনকার এত বড় প্রতিষ্ঠানকে লালবাতি জ্বালাতে হয়েছে।

উইলিয়াম ম্যানচেস্টারের এই ছাড়াও পঞ্চোত্তরপী মহিলাল গ্রন্থে নানা খুঁটি-নাটি আছে। এই বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ নেই, তবে অতিরিক্ত উৎ-পত্তের ফল অনাবশ্যকীয় এই গ্রন্থ অনেক

মরণের সওদাগর (২)

সময় পাঠকের শিক্ষণীয়ের কারণ হতে পারে, লেখক কেন তথ্য গ্রহণে তথ্য উচিত এবং কতটুকু বর্জনীয় তা বিচার করেননি।

তবে এই গ্রন্থে গুস্তাভ ফ্রেসের নানা-বিধ কার্যকলাপের পরিচয়। গুস্তাভ ফ্রেসকে স্বিজারীয় রাষ্ট্রসংঘ সংগঠনে উৎসাহিত করেছে। এলেন যখন হিটলার পদার্পণ করেন তখন নাকি গুস্তাভ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে আসেন দু-হাতে দুটো স্যান্ডউইচ নিয়ে খাচ্ছিল করে।

ফ্রেসসেরের শেষ পর্ব বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। দুঃখের পর ফ্রেসস প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক লক্ষ কুপলী কারিগর রইল। এদের অধিকাংশ প্রায় সামরিকতান্ত্রিক। অধিকাংশে কারখানাই বোমা-বিধ্বস্ত হয়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। বাকী যেগুলি ছিল সেইগুলি যোদ্ধার প্রয়োজনে খুলে ফেলা হয়েছিল। এর ওপর আলফ্রিড ফ্রেস-অপরাধী 'হিসাবে বন্দী।

পূর্বে বলা হয়েছে কিভাবে আলফ্রিড মাঝিম হাই-কমিশনারের অনুকূলে নানান বন্দোবস্তের জোর করে দাবী পেয়েছে। মৃত্যুর পর আলফ্রিড তার বাঁধন হস্ত হিসাবে গ্রহণ করল ছোটোটো বাইবলকে, এবং ঠিক পড়ে লাগল ফ্রেসস কারখানাকে ফেলে সেখে এক অভিনব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। ফ্রেসসের কারখানায় উৎপাদন এবং সরবরাহ দুইপ্রকার কাজই সুরু হল।

ফ্রেসসরা রীতিমত 'তত্ত্ব' এবং 'তথ্য' কারবারি হয়ে উঠল পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অন্যান্য বেসরকারি জন্য নানা প্রকারের সহায়তা করে। আলফ্রিড কর হলো, প্রচারমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এবং এ্যাকসেস ডাকতে পরিচালনা করেছেন আলফ্রিড আপাতদৃষ্টে তার ইচ্ছা নেই। ১৯৬৭-এর ফ্রেসস পরিষদীয় সদস্যপ্রার্থী বনী।

তথাপি সেই ধরণ-অনৈতিক সংকট ঘনিয়ে এল। এর পূর্বে—সাজেনবার্গ ও নোরেনবার্গ সমবায়ের এই অবস্থা হয়েছিল। ফ্রেসসের কারখানে কোনো দেশের ফ্রেসসের ছিল না, যা ছিল তা ফ্রেসসের। যাদের দরকার তারা বন্ধ করল—তার সামান্য ছুটীর ফলে এতবড় কারখানে অর্থনৈতিক পতন ঘটল। জার্মানরা শান্তির অধিবাসী, শান্তির পুজোরী কিন্তু শান্তির প্রয়োগ তাদের জানা নেই। যুদ্ধ অবসানের পরমুহূর্তে- তাদের মর্মান্তিক যে তাদের ফেলা হবে তারা ভুলে করেছিলেন তার পরিণাম এমনই বিয়োগান্তক। এ'তের সমাজিক কারণ প্রণয়নেরই, কিন্তু চরিত্রের ভাবে এ'রা উদ্যম এবং সংগঠনের থেকে বিচ্ছেদের মূলে রাখবেই অধিকতর প্রয়োগী। ফ্রেসস পরিবারের পতনে অনেক শিক্ষা করার আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র কবিতা এই সূত্রে মনে পড়ে—

"পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বলে-
ছিনু ঘরে ভিক্ষুকের কাঙাল।
ওগো দুর্দিন, ছিন্ন তোমি নিক
তব বিত্ত তব শেষ দুঃখ।।"

অভিজ্ঞতার আলোকপাতে হওয়াই যে কি ভেতরীয় পরিণতি ঘটায়, ফ্রেসসের এই পতনের তার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফ্রেসের সওদাগরের এই চরম পরিণতিতে কেউ দোষ পাবা দিয়েছেন 'তথা জানা নেই, তবে মানচেস্টারের এই গ্রন্থটি বন্ধু দেশের অর্থনৈতিক-বিশ্লেষণীদের ঠিকানা দানে সহায়ক হতে পারে।

অলোচ্য গ্রন্থ কোনোক্রমে মার্কসী দৃষ্টিতে একটি, তেমন থাকতে পারেন, তাহলে অন্তর দাঁড়াবেন—১৯৬৭-৬৮তেই যুদ্ধ পর্ব সুরু হয়ে গেল—সেই 'যুদ্ধে তাঁরাও তেসে উঠবেন। তথাপি আলফ্রিড এসেই আকর্ষিত হল যে তেমনের সমস্যিত্বের দৌড়ে অন্তত প্রতিযোগী—। মানচেস্টার এই উদ্যম-পতনের ইতিহাসই তথ্য করেছেন। তবু এই গ্রন্থটির আবেদন বিশেষ কিন্তু অতিমাত্রায় স্পষ্ট। ডক্টর সঞ্জিবের কারখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে, ব্রাইমলাস্ত ছিল একটি রোমান ভাঁড় মাত্র, আর সেই অপবাদেই বধাবার ছিল তার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণাপত্রের ভাষা। এই অপবাদ ইতিহাসবিদদের লোককে প্রতিবাদ করেছে। তাঁর আক্রমণের সমর্থনে চার্চিলের থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন—

"No one....would have left Asia or Africa or Italy to look for Germany. With its wild scene and harsh climate, it is pleasant habitat to live in nor to look upon unless it be one's home."

সুতরাং এইভাবে জার্মানীকে নিরপেক্ষ থাকতে দেওয়ার ফলে ইউরোপের অন্য প্রান্তের যত বড় প্রজাতোত্তরতা সাম্রাজ্যিক সাম্রাজ্যবাদে ঘটেছে। এমনকি এর ফলে আর অন্যান্য হেনেরীসের স্পর্শ আর সম্ভব হয় না। কিন্তু মানচেস্টারের মনে হয়নি যে অন্যান্য হেনেরীর কারণেই ইংলণ্ড একটা জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, আর ইতালী হেনেরীসের ফলে ছিল ফ্রেসটি স্বাধীন প্রদেশের সমষ্টি মাত্র। কাজেই, সাম্রিবলাভে আর জার্মানির প্রয়োজন তার জাতিগত সত্তা গড়ে উঠেছে। জার্মানীতেই যুদ্ধ-বিশ্লেষণ উদ্ভব, আর অন্তর্দর্শিতা সাহিত্যিক না হলে হেনেরীস কোথায় দিয়ে দৌড়াত। জাতির ভূখণ্ড ও বিকাশ সম্বন্ধে কথাও তিনি বিস্তৃত করেছেন। ইংলণ্ডের হেনেরীস বিকাশিত হয়েছে কবিতায় ও নাটকে, ইতালীর চিত্রশিল্পে আর জার্মানীতে গড়ে উঠেছে দর্শন ও সুরের নীতি। যাদের এসব আর বীটোফেনের মতন অমর কীর্তি যে সুদীর্ঘ হেনেরীস কালের কোথায়, তার মধ্যেই ত গড়ে উঠেছে পশ্চিমের সাম্রাজ্যিক সভ্যতা। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান রোমান্টিসিজম ও ফ্রেসসকে প্রায় করেছে। বর্তমান ফ্রেসস ও থাকে বিষয়ে জার্মানীর কাছে ঋণী, বিশেষত তার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। মানচেস্টার তাঁর উৎকর্ষ প্রকাশ বিশেষে এসবই বিস্মৃত হয়েছেন।

তথাপি এই গ্রন্থটি পঠনীয় হয়ে থাকবে।

—অরুণকুমার

THE ARMS OF KRUPP: By WILLIAM MANCHESTER: Published by Michael Joseph. Price 42 Shillings.

সাহিত্যের খবর

চতুর্থ আফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বর মাসে। গত ১২ নভেম্বর কায়রোতে এই সম্মেলন মুলতবী এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আলজীয় সাহিত্য-প্রতিনিধি মনে আসছে হবেন এবারের এই সম্মেলন হবে নতুন ধরণের। প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ মুলকের-ও ডেলগ। প্রস্তাবমত সাধারণ সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৩ ডিসেম্বরে বসবে নির্বাহী কমিটির বৈঠক এক সভায় আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হবে। কায়রোতে উপস্থিত রাশিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ ঘোষণা করেছেন যে, এই সম্মেলনের আগেই আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষা গ্রন্থ অনুবাদ করা হবে। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি পুস্তক প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লেখকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গত ২৬-২৯ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্ত পঞ্চমী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের মতো অনেকেই এতে উপস্থিত ছিলেন। পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সর্দার কৃপাল সিং প্রথম দিনেই সম্মেলনের লেখকদের আপ্যায়ন করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পাঞ্জাবের গভর্নর ডঃ বি সি পাতাস্কে। সভাপতিত্ব করেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ৬ দফার লিখিত সভাপতির ভাষণটিতে সাম্প্রতিক সাহিত্য-সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোকপাত করা হয়, তা যেমনই, এই সম্মেলনের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় দিনে বসেছিল আলোচনা সভা। গুরুদেবীবিশ্ব হলে এই আলোচনা সভায় সৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম। এই আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'পাঞ্জাবী ইজ ইণ্ডিয়ান ইন ইণ্ডিয়ান ফিটজেরাল্ড'। এই বিষয়ে মূল প্রবন্ধটি পাঠ করেন পি লাল। তিনি তাঁর প্রবন্ধে এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যা নিয়ে আলোচনা সভাটি তর্ক-বিতর্কে মুখর হয়ে ওঠে। যাঁরা এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অমৃতা প্রীতম ও রাজলক্ষ্মী, কবিতা সুরেন্দ্র লাহিড়ী, তেলুগু লেখক শ্রীমতী হেমলতা, অসমীয়া লেখক ডি কে বড়ুয়া, বাংলার ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, কন্নড় সমালোচক, ডঃ প্রকাশ প্রভৃতি। শ্রীমতী তে তুলল অনেকদিনের

[illegible] [illegible] [illegible] [

বন্ধু, বেতার বার্তা, বেতার তরঙ্গ, বেতার বার্তালী প্রভৃতি ঠিক কথা বলে মনে হয় না। পরিষদ বাদ এসোসিয়েশনের বাংলা করা হয়েছে বেতার। এবং এইসব আলোচনা প্রকাশকদের কানে না ঢোকানো ভালো। ঐ সূত্রে তাই এইসব আলোচনা ইংরেজী বেতিও ব্যবহারও তাদের করতেন। বাংলায় বেতিও ব্যবহার হয়েছে।

ব্যবহারবাদী, ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী, অর্থী প্রভৃতি শব্দগুলোকে কেন বলেও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধে যা ব্যবহারী আছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধে সূত্র সুপ্রচারই করা।

Horizon মানে উপক্রমণ হরিজন নয়, আকাশিকমণ্ডলের সূত্রেই দিগন্তের সূত্রেই। এবং সেইটাই ঠিক।

X-ray এক্সরে-রশ্মি ব্যবহারই ভালো হবে। রঞ্জন-রশ্মি প্রভৃতি হলেও আপত্তির কারণ আছে। অনেকে ছাত্রছাত্রীকে সোহ-রশ্মি বলতে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আর, নিউক্লিয়ন বি-আয়নকে তো পারমাণবিক বিভিন্ন হয়। নিউক্লিয়ন আর পরমাণু (আয়ন) যে আলাদা জিনিস! সরকারী ব্যাকরণের দিক দিয়ে ভুল। হওয়া উচিত অনুচ্ছারণী। কিন্তু অ্যাপোলো বা কলোসাসকে সংস্কারী বললে ঠিক হয় কি? বোধ হয় বলা উচিত অনুচ্ছারণী।

ঐ সূত্রে প্রথম অধ্যায়ে একেবারে গোড়ায় লিখেছেন, "মহাকাশের সমাবর্তনের অনা দুটি নাম অভিমান ও মাধ্যাকর্ষণ।" —এটা কি? গ্রাভিটেশন আর গ্রাভিটির অনুবাদ যে পার্থক্য আছে। গ্রাভিটেশনের বাংলা করা হয়েছে মহাকর্ষ আর গ্রাভিটির অভিমান বা মাধ্যাকর্ষণ (মাধ্যাকর্ষণ এমন অনেকটা অনুচ্চারিত)। তাহলে মহাকর্ষ আর অভিমান সমাবর্তনিক হয় কী করে?

এখানে সোভিয়েতের কৃতিত্বটা থাকলেও প্রসঙ্গ-বিষয় উপযোগিতা অনেক। যেমন আমার এমন একখানি গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বইয়ের সূত্রে নয়, মনে হচ্ছে বিজ্ঞান পড়তে সূত্র অনেকের, তাঁরাও এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন। তাঁদের অনেক সোভিয়েত আর বিজ্ঞানী বিষয়ে। প্রয়োজনের একটা স্পষ্ট পরিচয় তাঁরা পাবেন—সেই আদি সূত্র থেকে আলোচনা-১৯৫ প্রসঙ্গগুলোর চীন দেশে পৃথিবীতে বিস্তৃত আনা পর্যন্ত। গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ প্রকাশ কামনা।

মানের দিক দিয়েও গ্রন্থখানি অনেক ভালো।

●

নবীনাবন্ধু (উপন্যাস) অনুরূপা দেবী-প্রকাশক। দি বার্তা বুক ডেপো। ১৭৩।১০ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ৪ টিকা টাকা পঞ্চাশ নয়া।

এক সময় অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের অনেকদিনের কাছেরও যা কারণে কলম-নবীনারী পরিচয়ের অনেক সময় হারিয়েছিলেন। সমসাময়িক উপন্যাসটি তেমনি অনেকটা। সমস্যা, প্রেম, ভালবাসার, মহীয়সের বা মনিষ্কৃতলা — প্রত্যেকটি চরিত্র লেখকের ছত্রছায়ায় জীবন্ত। সহজেই এই সব চরিত্রের সঙ্গে পাঠক নিজেকে একাত্ম করতে পারেন। বিশেষত রাজার জীবনের অন্তিম পরিণতি পাঠকের মনে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করে। উপন্যাসটির ভাষা আলোচ্য করবার। ফলে এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলা হয়। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই। অনোদ্য প্রচ্ছদ।

●

নারায়ণ সান্যাল (উপন্যাস)—নবীনাবন্ধু। দি বার্তা বুক ডেপো। ১৭৩।১০, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা।

রচনাটির সাহায্য অবশ্যই লেখকের উদ্দেশ্য দেখা যায়। নায়ক অনুরূপাদের ছেলে। অনুরূপা অনুরূপা। মেয়েকাকার অনেকে পড়ে। নায়ক চাকরীটিকে ঘায়া ভাবে। তার আছে যাবে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা ভেবে-ছেন। কিন্তু আমা এক দিনিস আর সেই বিষয়কে অবলম্বন করে উপন্যাস লেখা আর এক ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের খবরাপ-ভাল দুই রকম মানুষ আছে। আছে প্রেম-ভালবাসা মারিতা-মলতা ইত্যাদি। এর বাদ সত্ত্বেও উপন্যাসটি লেখকের অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে আর অনাবশ্যক কারণ আন্তরিক সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারে নি। মুদ্রণটির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ সুন্দর।

●

চারাগাছ (কাব্য সংকলন) — রবি গুহ অনুরূপা। বুক সার্ভিসার্স। ১।১।১, বঙ্কিম রোড, কলিকাতা—২৯। দাম ৫ সাড়ে তিন টাকা।

বর্তমান সংকলনে মোট বত্রিশটি কবিতা আছে। এর জন্যে কোন ভূমিকা বা কারণ দেয়া হয় নি। তবু, কবিতা আর বা কারণ—এগুলোকে কাব্য বলতে অনেকেই দ্বিধা করবেন। বরং বলা যায় এই সব রচনার মধ্যে কবিতার উপাদান আছে মাত্র। কয়েকটি রচনা

সারস্বত গ্রন্থালয়ের নতুন বই

হাজার বছরের বাংলা গান

প্রফুল্লকুমার মোদকারী সম্পাদিত ॥ দাম ১৫·০০ টাকা

বাংলার সকল প্রতিভার বড় পরিচয় তাঁর গান — কি বাউল ভাবের গানে, কি ভক্তি ভাবে, দেহে গান সহজ ধারা, গান থেকে গান বাঁধা হয়। সেই বাংলা গানের সুবিশাল সংকলন এই গ্রন্থটি। প্রাচীনতম যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের। যুগ, ভাবগত বিচারে সংকলিত, অভিনিবেশ ও অভিজ্ঞতার ফলের এ জাতীয় একটি সংকলনের বহু প্রতীক্ষিত চাহিদার মেটাবে এই আশা আমাদের। বাংলা গানের ঐতিহ্যে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন অবদানের স্বীকৃতিতেও সংকলনটি হয়ে উঠেছে সুবিচারক। লালন-শাহ-ঈশানচন্দ্র, দেওয়ান রঘু, চন্দ্রকান্ত ও রবু, কাজী ও উপেন্দ্র-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে অবদানগুলো প্রতিটি গানের মর্ম-ব্যাখ্যার ঐতিহ্য মহ গানগুলোকে সুচিন্তিত অনুরোধন সম্পাদক। সূচীপত্র লোকে-পরিচিতি, পাদটীকা-সূত্র) এবং ঐতিহ্য সমন্বয়ে বইটি যে কেবল সুধী পাঠকদের কাছেই অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তা নয়, সঙ্গীতের যারা অনুরাগী তাঁদের পক্ষেও হয়েছে অপরিহার্য।

দেবেশ রায়ের গল্প দেবেশ রায় ॥ ৬·০০

প্রসাধন অনেক টাকা ॥ ৩·৫০	**ঔপনিবেশ পরমাণুর পরমূল** বিশেষজ্ঞ বহু ॥ ১·৫০
লোহিত্যের সূত্র অনুরূপ সাধারণ ও অনেক বহু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ॥ ৩·০০	**বিজ্ঞানিকের বাংলা** বিজ্ঞানভূষণ বহু ॥ ১·০০
ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ দেব অনুরোধ ॥ ৩·৫০	**ভ্রমণী, বিজ্ঞানিক** পরম দেবানুরূপ ॥ ১·৫০ জীবন্ত সংকলন । বিজ্ঞানিকার বেতারিকার অনুরোধ ॥ ১·৫০

সারস্বত লাইব্রেরী ২০৬ বিধান সরণী কলিকাতা—৬

সংকলন। বিশেষ করে প্রথম কপি 'মিলিন্দ' যা প্রথম দেখা ছাপা পাশ্চী সাহিত্যে।

●

নব বসন্ত (উপন্যাস) — মোহনলাল মজুমদার। কি সাইজ খুব ভালো। ১৭০।৩, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ঃ আড়াই টাকা।

আধুনিকী বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, বিষয়-বস্তু ইত্যাদি বিচারে প্রশ্নটি(বা আসলে একটি বড় কাহিনী) শেষ পর্যন্ত পাঠককে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। প্রথম চরিত্র,মোহনলাল কিভাবে সামান্যতম ভিত্তি অবিশ্বাস্যতার ভিতর দিয়ে আমাদের হয়ে অবশেষে শ্রেণিকে টুঁটিতে নয় করতে পারল—এই হচ্ছে প্রশ্নটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পাঁচু, আধিনী বা বারোয়ারী বৌদি—পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বস্বান্ত খুইয়ে হতভাগ্য মানুষ এরা। এদের জীবনের অসহায় বিশ্বাসটাই কি এমনভাবে সত্য? লেখকের ভাষা সুন্দর। ফলে পড়ার সময় হোঁচট খেতে হয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মনোরঞ্জক।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মনোজী প্রকাশন। সম্পাদক ঃ এ কে সরকার। ৩।১বি বেনাপুকুর পার্ক ইস্ট। কলকাতা—৫১। দাম ঃ দু টাকা।

সমস্যা কবিতা-ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত নতুন ধরনের পত্রিকা। কলকাতার ওপর লেখা আলোচনা সৃষ্টি সব থেকে মূল্যবান। কলকাতার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ যদি এঁরা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাহলে একটা বিরাট দায়িত্ব পালন করবেন। সিনেমা সম্বন্ধে সাধারণ জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনাটিও উল্লেখের দাবী রাখে। প্রবোধকুমার সান্যাল, সাহিত্য পরিষদ, সুপ্রিয় মিত্র, সুবিমল বসু, হিরিয় ঘোষ, সুশীল মুখোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, ঘোষাল ভৌমিক, শান্তি লাহিড়ী, বাসুদেব সেন এবং আরো অনেকের। পত্রিকাটির পরিচালনায় অভিনবত্ব আছে। বহুল প্রচার কামনা করি।

●

মহাজাতী সাহিত্য (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)— সম্পাদক ঃ অমিয় চক্রবর্তী। ৩৩ আচার্য্য সড়ক, কলকাতা—১৩। দাম ঃ এক টাকা।

মহাজাতী সাহিত্যের বর্তমান সংখ্যার বইয়ের ভাগ আছে সাহিত্যের মেজাজ, অমিয় চক্রবর্তী, নিশিকান্ত রায়, সৌরীন্দ্র ভৌমিক, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, সোহিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সমর সেনাপাধ্যায়, সন্তু গুহ এবং আরো অনেকের।

বই পাড়ায়

বাংলা বইয়ের মোকের অবিশ্বাস্য মোবাইলো। বই কেনা-বেচার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে মোট বিক্রীর পরিমাণ ক্রমে কমছে। বিদেশ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য কি সরকার-লোকসান হয়েছে জানি না, তবে বাংলা বইয়ের অবিক্রীত আমদানী খুব বেশী। প্রায় আধাআধি অবস্থায় তাকে হয়েছে হয়েছে। অথচ এর জন্যে সরকারের দিক থেকে কোন ব্যবস্থা হয়নি। উপরন্তু পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের লাইব্রেরী গ্রন্থাদির পরিমাণ বহু স্তর নীচের ঘরে পৌঁছেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী বইয়ের স্বার্থে কোটি কোটি টাকা ঢালছেন। আজকের অনেক প্রাদেশিক সরকার স্ব স্ব ভাষার জন্যে নানা ধরনের সুবিধা দিতে এগিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে বাঙ্কিমের প্রবন্ধগুলোর কথা বলতে হয়। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিমাতৃ-সুলভ ব্যবহারের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েই নিজের কাজ ও প্রতি কর্তব্যের সীমা টানতে পারতেন। তাঁদের উদ্বিগ্নতা জন্যে বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক এবং প্রয়োজনবোধে অন্য সাহায্যও তাঁরা দিয়ে থাকেন। আসলে বইপাড়ার খবর মৃদু একটাই। খবরটা হলো নিরাশার।

বইয়ের বাজার বড় ছোট হয়ে আসছে, বইপাড়ার অসাধু ব্যবসার স্তর প্রসার হচ্ছে। আজ নকল বইয়ে বইপাড় ছেয়ে গেছে। আসল-নকল বলা শক্ত। আমার মনে হয় আসলের চাইতে নকল বইয়ের সংখ্যাই হয়ত বেশী। বেশ কিছুদিন ধরে জনপ্রিয় লেখক-দের জনপ্রিয়তাকে হাতিয়ার করে তাঁদের নামে অসংখ্য বই বেরুচ্ছে। এখন আবার তারা মৃদু নাম নিয়েই কান্ত থাকেন না। হুবহু ছোটা ঝাঁটার নকলও বাজারে মিলছে। সম্প্রতি মজাদারের 'শাশ্বত' নকল বাজারে ছাড়ার উল্লেখনা ঘটেছিল।

তবে এখন স্কুল-বইয়ের সিলেবাসের বদলে নিম্নমান করেক শীটি পাল্টে দেন সরকার। প্রকাশকদের (যাঁরা স্কুল-বই প্রকাশ করেন) মুখোমুখি বড় বড় পাসেন্টে তৈরী রয়েছে। কাট-টাকা লেটারে লম্বা লম্বা লাইন।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'প্রবাস কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমেদের আমার জীবন ও আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতিক জীবন থেকে শুরু করে ১৯২১ সালের বিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পূর্বকাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির মোড়া পাওয়া ও তার ইতিহাস ধরা হয়েছে।

আসন্ন সপ্তাহে আরও একটি বিশিষ্ট প্রকাশের খবর পৌঁছেছে। খবরটি হল শ্রদ্ধেয় কবীর সাহিত্যিক অমিয় চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বিশ্বের মহাবিদ্যের পরিচয়ের ফল-স্বরূপ আধুনী সম্পর্কে এ-যাবতের সর্বাঙ্গীন সুন্দর সংকলন নিবন্ধের প্রকাশ . সম্ভব হয়েছে। এই নিবন্ধটি প্রথমে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার ধারাবাহিক বেরোয়।

সাহিত্যে 'মিনি' যুগ?

ষাটের দশকের শেষদিকে বাংলা-সাহিত্যে নতুন উত্তেজনা দেখা দিয়েছে 'মিনি' শব্দটিকে কেন্দ্র করে। বেরিয়েছে 'মিনি বুক' আর 'মিনি পত্রিকা'। বিষয়ের বিচারে যেমন কোনো অভিনবত্ব ব্যাপার না হলেও আকারে-আয়তনে মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো এইসব প্রয়াস।

'মিনি বুক'-এর প্রকাশক সমীর রায়, সম্পাদক সুনীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম পুস্তিকা সুনীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশ্বাস ও রাজমোহন'। দাম তিন পয়সা। বেরিয়েছে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯। প্রচ্ছদ এঁকেছেন গণেশ পাইন। মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০। ঠিকানা ঃ ৭১, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা—৩৬।

ইদানীং ফটোলাথ পদ্ধতি দ্বারা অল্প কোনো পয়সেই খুব সংস্করণের বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। মিনি বুকে আছে অনেকটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন, যার লোভ সামলানো অনেক পাঠকের পক্ষে অসম্ভব হবে। বাঙ্গ সমীক্ষাবাদের লেখা পড়েননি কিংবা কোনো লেখাই পড়েননি, তাঁরাও খুশি হবেন পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে।

পৃথিবীর প্রথম মিনি পত্রিকাটির নাম 'শব্দাদ্'। সম্পাদক অমিত চট্টোপাধ্যায় ও অলীকবাবু মুখোপাধ্যায়। দাম ঃ ৫০ পয়সা। ঠিকানা ঃ ১২২এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড। আর যা কিছু চমক আছে হলো আকার-সংক্ষিপ্ততা ও আমার অনুরোধ। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আজকাল ব্যাপারটার প্রথাত অনেকেই। কেউ লেখার অন্তে আর বেশী লেখেন। পত্রিকার আরতন খুব সম্ভব লাইনের আগা-পাশ নিয়েছেন সকলেই। গত কয়েক বছর ধরে ক্ষুদ্রাকারের ছাঁচে আকারের উপন্যাস লেখার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং এখনো চলছে, তার প্রতিকারে এইসব লেখার নিদর্শন হাতের কাছে পেলে পাঠক, কবি-সাহিত্যিকদের অল্প-সময়ে পড়িয়ে নিতে অনেক সহায়ক হবে।

ভাষা : হাজার বছর আগে-পরে

মানবজাতি ও তার হাজার ভাষার জন্মকথা এবং ভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পৃথিবীর লোকে লোকে আজ সচেতন হয়েছে। সোভিয়েত দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের একদা উৎপত্তি হয়েছিল মানুষের? কখন এবং কেন তা বিভিন্ন আঞ্চলিকতাতে বিভক্ত হল? সেখা থেকে সেদিনকার সমাজসচেতন মানুষেরা ঠিক কোন্ পথ ধরে এগিয়েছিল?—এইসব প্রশ্ন, যার সমাধানী করে তো বটেই, আজ আরো বেশি করে দানা বাঁধছে ভাষা বিজ্ঞানীদের অতীত ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছে।

সমস্যাটির মূলে নিহিত রয়েছে মানব-জাতি পরস্পর আর্থিক বিনিময়ের যে চিহ্ন যুগে যুগে রেখে গেছে, তা হল মানব-ভাষা। যেমন, ঐতিহাসিকদ্বয়ের, তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষা বিশ্লেষণের ফলে ওদ্—অক্ষরের খাস্তি-উপজাতির ভাষাগুলির সঙ্গে মাদ্রাসি ও হলেন্ডারিজের ভাষার বাঁধনি কুটুম্বিতা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষা ও জাতিবিদ এবং তুলোজ-বিশারদরা একই সঙ্গে সমাধানের পথে সাইবেরিয়ার আদি-বাসিন্দের উৎস ও ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

ভৌগোলিক পরিভাষার সংকেতজেবী বিজ্ঞান বা ঐতিহাসিকদ্ বিজ্ঞানীদের জন্য সমাধানকল্পে প্রণালীর একটি বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্র-ভাষার অনেক নিদর্শনই বিশাল আয়তনে ছড়ানো এ-রাজ্যের একটি বিশেষত্বের পরিচিতিসম্পন্ন হয়েছে। প্রায় হাজারখানেক সোভেত একটি মোটা ঐতিহাসিকদের মান কেন্দ্র। সাইবেরিয়ার বিশাল এলাকা জুড়ে এরা ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো। কেন্দ্রের পশ্চিমের সোভেত এক সময় থেকে একদা উত্তরাঞ্চলে এসেছিল, এটুকু বিজ্ঞানীরা জানতেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কখন কেন্দ্র ভাষা ছেড়ে এরা কেন ভাষা এসেছিল? এটা কি সম্ভব হয়, এদের ভাষার আদি বৈশিষ্ট্যগুলি হাজার হাজার বছরের ইতিহাসক্রমে একদা বিকাশের মতো মিশিয়ে হয়ে গিয়েছে?

সমাধানের এমন একটি বিজ্ঞান, যা ভাষার ধ্বনি-বিবর্তনের কালানুক্রমিক হিসাব রাখে। এর সাহায্যে ভাষার আগের পরি, পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্তন ইত্যাদির ভাষার বিশ্লেষণ করে এবং ভাষার বিশ্লেষণ করে ভাষার ভাষার ভাষার

— এবার —

মৃত্তিকায় পর্যবেক্ষণ করার কাজ শেষ।

বিছানার কাছ থেকে জয়ন্তী সরে এল। সুব্রত বলল,—'জয়ন্তীবাবু সঙ্গে আপনার আলাপ নেই তবুও ডাকা হয়েছে, তাই না?'

অমর মাথা নাড়ল, বলল,—'অন্বেষণ-পত্রিকার খবর সব সুযোগ তো এর আগে হয় নি।'

জয়ন্তী একটু হাসল। 'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি অমর বাবু। মিসেস রায় যখন মীনা দেবীকে নিমন্ত্রণ করেন।' অমর আলাপ-পরিচয় ছিল না।'

অমর নিরুত্তর।

পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে সুব্রত বলল,—'ইনি মিঃ জয়ন্তী সান্যাল,—পেশায় তিনি, তাই, মি ইন্সপেক্টর।'

অমর নমস্কার করল। জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'মীনা আত্মহত্যা

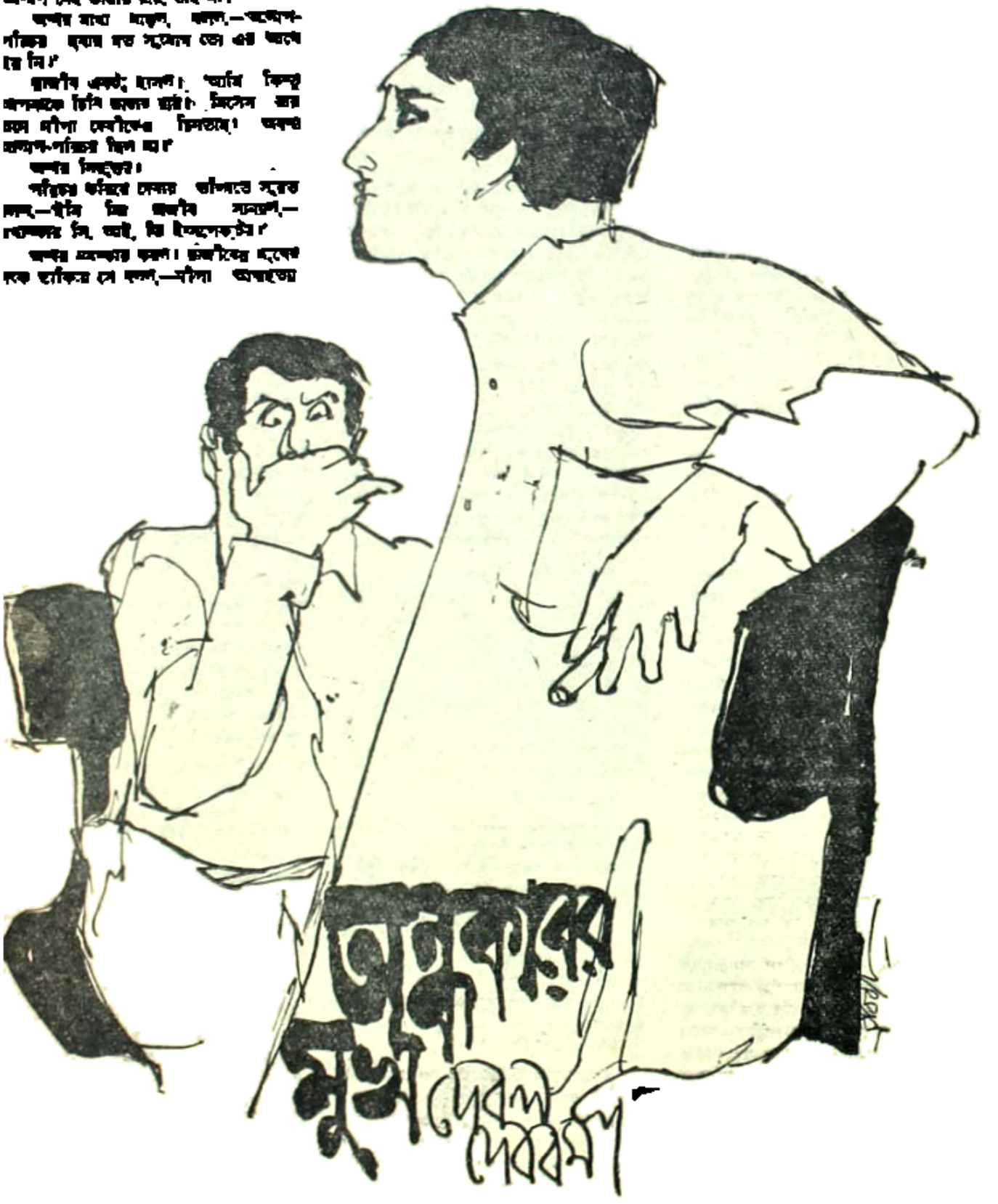

কলেজে বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু আপনাদের মনে কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে?'

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে রাজীব বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে বলল,—আপনার চলবে না কি?' পরে সুব্রতর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে মন্তব্য করল,—ডিসট্রাকশান সুব্রতর ছাড়ে খেলে সুব্রত। এত বয়স হল, এখনও খেলার ধরতে শিখলে না।'

অন্ধকার মুখে আঙুলের কৌশলে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে চেপে জ্বালল। স্যাইটারটা ছাদিনের রাজীব সিগারেটের ধুমে আচ্ছন্নযোগ করতে সাহায্য করল। সকল ধোঁয়া পর সে বলল,—পুলিসের বারণার কি লাগেন তাহার যায়? ওরাপড়া গরু, সিধুটে মেরে দেখলেই জানা। সাক্ষ্যপ্রমাণ যথাযথ না পেলে পুলিসের পক্ষে উল্টোটাই মনে করা স্বাভাবিক। অবশ্যকার প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনাকে আক্রমণের মত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিসের নাকগুলি এমন কেন ভাবে,—ভুল ভুল সন্দেহ ছিলনে।'

অন্ধকার সিগারেটে একটা ছোট টান দিয়ে বলল,—তা অবশ্য ঠিক, তবে একেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ যেন সাজানোই উপস্থিত। বাড়িদের ঠিক পাশেই নিলীম সিনেমার প্রায় পুরো সিলিটা না দেখতে পেলে সন্দেহের অবকাশ ছিল। যাক একটা কথাও ভেবে দেখতে হবে। আক্রমণের ঘটনা না হলে নিশ্চয় শরীরে আঘাতের চিহ্ন-টিহ্ন, বিছানা বালিশে রক্তের দাগ ইত্যাদি চোখে পড়ত। আ বলল তবে, তখন সুইসাইড ছাড়া, এটা আর কি হতে পারে?'

রাজীবের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। 'আপনার কথার যুক্তি অস্বীকার করা যায়। আমি তা স্বীকার করি।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল,—কিন্তু চোখের একনজরে দেখেই তো সবসময় আসল-নকলের বিচার করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে যা সুইসাইড বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা হোমিসাইডও হতে পারে। সুতরাং তদন্তের ভার একটু তাড়িয়ে দেখা দরকার।'

অন্ধকার কোনো মন্তব্য করল না দেখে রাজীব উঠে দাঁড়াল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। বলল,—আপনি এ মামলা কতদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে চাইবেন? হিসাবটিক কাওয়ার কথাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আসামি পরীক্ষার নিশ্চয় জন্য কিছু পাওয়া যাবে না, এবিষয়ে আপনার কি মত জানতে পারি?'

সুব্রত এতক্ষণ চুপ করে ছিল। রাজীবের কথা শুনে সে তাড়াতাড়ি বলল,—কথাটা আমি ওঁকে আগেই বলেছি রাজীবদা। ডেড-বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাতে হবে। কিন্তু তদন্তের ভার একটু ঘুরিয়ে দেবেন। অবশ্য এর পোস্টমর্টেম আমি করি, কিন্তু একেত্রে সুব্রতের পোস্টমর্টেম পাঠানো ছিল আর কি উপায় হতে পারে?'

অন্ধকার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পুলিসের এই টিকটিকি চোখেরও মনোযোগ তার আগে পায় নি। সুব্রতর কথা শেষ হলে পড়ল, মাথাটা নেড়ে-চেড়ে, কতকটা নিজের মনে হাঁ-মুখ, সিগারেটের মত তীক্ষ্ণ চাউনি। আড়চোখে সমাসর্বাই লোকটা তার মুখের উপর দৃষ্টির অনুসন্ধান সুতো বুলোচ্ছে। নইলে কথা ও এমন করে এদিকে তাকাবে কেন? আর একটা কথাও অন্ধকার অবাক্ষিত। লোকটা তাকে দিয়ে কথা বলাতে চায়। সুব্রতর কাঁচে কাঁচে প্রশ্নের মেয়েটি বাঘকে টোপ ফেলানোর মত কৌশলে তার মুখের সামনে ধরছে।

অন্ধকারকেও অন্ধকারে কথা বলতে হল। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে সে বলল,—পোস্টমর্টেমে আমার ঠিক আপত্তি নেই কিন্তু সময়ের। দীর্ঘ অনুসন্ধান করে থাকলে অটোপসী করে কিন্তু কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই অবান্তিলার মিছিমিছি মনে তদন্তের ভার এত তাড়াতাড়ি কাটাকুটি করে কি লাভ?'

রাজীব মাথা দিয়ে বলল,—হয়, একেত্রে পোস্টমর্টেম করলেই হবে তাহার যায়। আপনার মনের অবস্থা আমি অনুধাবন করতে পারি। এ ব্যাপারে আপনি কতটা খুব স্বাভাবিক, তবু আমি অনুরোধ করব। আপনি রাজী হন। আপনার স্ত্রীর রাজীব-স্বজনদেরও বুঝিয়ে বলবেন, পোস্টমর্টেম হয়ে গেলে পুলিসের সন্দেহটুকুও মিটে যায়। আর পুলিসেরই বা কি দোষ বলুন? যে অন্ধকারে কাজ তার একটা খোলসা করে দোষ অবান্তিলাকেও পাওয়া যেন না।'

অন্ধকার কোনো মন্তব্য করল না।

সুব্রত বলল,—তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। ডেড-বডি পুলিস-অর্ডার পাঠাবার ব্যবস্থা করি ছাড়াবিদা।'

—হাঁ তাই করো। রিপোর্টটা পাওয়া গেলেই তদন্তের ভার ফিরে এসো।' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রাজীব একটু চিন্তা করল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল,—কমপ্লেন হাজ, এখন আমার এখানে আসুন না। এই কটাদিনের মধ্যে। এখন ঘরে বসে কি করবেন আর? শুধু শুধু মন খারাপ হবে আর চিন্তা বাড়বে।'

—বেশ তো আপনার এখানে আমি যাচ্ছি।' অন্ধকার রাজী হয়ে বলল। 'কাজ-টাজেরও তাহলে নিশ্চয় সোরাহা।' কথা শেষ করে সিগারেটে সে একটা টান দিল।

বাইরে এসে রাজীব দেখল রীতিমত একটা ভাঁটা চলছে। অন্ধকারের কথাটা বোধহয় তার ঠাহর হয়নি। এখনও যেন হয় নি। মেঘলা আকাশ ঘন সুবিস্তারের মুখ আড়াল। মেঘের আর ঈর্ষা নেই। আকাশের চেহারা অন্ধকার না হলেও যেন অন্ধকার তার। এখুনি যা বাদলের শুরুর পড়াশোর আগেই এতদিনের জোর বৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। আশ্চর্য, অন্ধকারের এই চেহারা। জন্মদিনে দিন হলে তার মুখে ছিল না। সারে একজন ডি-ডি পড়ে যেত। সরকারী ডাক্তারের সুন্দরী স্ত্রী ঈষৎটা বীণা তার অন্ধকারের কারণেই। ফাঁকিদের ই-র কথা মনের মত ব্যবস্থা এতক্ষণ সবার দাঁড়িয়ে পড়ত।

সুব্রতকে মোড়-ঘুরে ঘুরতে হবে। খুব সম্ভব তাকে ওরা ছেড়ে। ছোট্ট হল চোখ রাজীবের যা দেখে একজন ওকে চুপ করল,—আ শুনেছ, তা সাঁতা নাকি ব্যাপারটা?'

বৃষ্টিমেদুর মত সুব্রত বলল,—যা শুনেছ, তা সাঁতা হলেও খুব সুখের। সুতরাং ও নিয়ে আপনার আর ভাবনা করবেন না। যে যার কাজে যান।'

দু-একজন দুঃখ চাওয়া-চাওয়ি করে এদিক-ওদিক গেল। কিন্তু কিছুটা পাওয়া হয়ে এল বটে, কিন্তু পুরোপুরি সকল না। মন্তুন মুখে এসে অবধি ছিপে ছিল, তবে ভাবনা চায় আসবে বলেই মনে।

অন্তীম ভাবে উঠে সুব্রতকে কাছে ডাকল। বলল,—ডেড-বডিটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করো। টেলিফোনে পুলিস হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছি। যা ব্যবস্থা করবার সেই করবে। আর হাঁ,—রাজীব কথা শেষ না করে সুব্রতর কাঁধে হাত রাখল।

কিন্তু তখনো কর্তব্যের সমাপ্তি টেনে।

'নইলে রাজীবদা এমন নির্লিপ্তভাবে কাঁচা হাতে ফেরে আসতেন না। সুব্রত নিজের মনে ভাবল।

রাজীব বলল,—'মিসেস ঘোষের বাড়ি পড়ানোর ব্যাপারে তোমাকে কথা বলতে বলেছি, সেইটুকু আর কাজে আসা বাকি আছে না।'

সুব্রত ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে বলল। 'পড়াতে হবেছিল-আপনি। তাদেরকে আজ দুপুরে খাওয়াতে বলেছেন?'

—'আমারও মনে আছে ছেলে।' রাজীব ওর কাঁধের উপর থেকে হাত তুলে নিল। 'তুমি আর আজকে ছাত্রের সিলেক্ট ফেল-ও নিয়ে আলোচনা শুরু করো না।'

সুব্রত কথা একটু হেসে পাশের প্রতিমূর্তি দিল।

এক ঘণ্টার কিছু পরেই অম্বর এসে পৌঁছল।

অভ্যর্থনা করে রাজীব বলল,—আসুন। আসুন। দেখি দেখে আমি ভাবছিলাম, আপনি বুঝি আর এলেনই না।'

চেয়ারে বসবার আগে অম্বর ঘরটা বিরীক্ষণ করছিল। দেখলেই বোঝা যায়, এটা অবিবাহিত ঘর। রাজীবের শিক্ষকসুলভ দেওয়ালের গায়ে একটা র‍্যাক নিজেদের উপস্থিত। জোলার ব্যাগ, ও পাশে একটা ছাইয়ের ট্রে'। পাশের একটা টেবিলের অপরদিকে বিভিন্ন নানা রকমের বই। টেবিলের উপর দু-তিনটে ফাইল, এর মধ্যে একটা খোলা। অম্বর ঘরে ঢুকেছে অবশ্য সম্ভবত সে এই ফাইলটাই দেখছিল।

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে রাজীব বলল,—আর একটা ব্যক্তির দিন আমার হয়। সকাল থেকে যা রোদের আকাশ অবশ্য ঠান্ডাভাব। একটু ঘুমোলে না করলে শরীরটা চাঙ্গা হবে না।

অম্বর স্মিতমুখে না করে সিগারেট ধরাল।

টেবিলের উপর ঝুঁকে বলল রাজীব। বাড়িতে এখন সবাই ভালো। ছেলে-বউ নিজের এড়ানের পুলিশ-ফলে পাঠানো হয়েছে। বর্ষাটা এখানেটার মধ্যেই খোলা-হাওয়া কিংশাই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল রাজীব। সম্ভবত শরীরটাকে সে চাঙ্গা করতে চাইল। একটু যেন হেসে ছেলে বলল,—কিন্তু দিন করে আপনার বাড়িতে বাকি ছেলে পড়াতে আসার কথা?'

অম্বর ছেলে উত্তর দিল,—হ্যাঁ আমরা সপ্তাহে আজ। আজ কিনেক হল-এই উপলক্ষে আছি। আমি বিশ্বিত দেখেছি, আসের ঠিক ন আসের তারিখ নাগাদ তিন পক্ষ পড়ে যায়।'

—প্রতিদিন আসেই কি তিন পক্ষত?'

—না, না।' অম্বর মাথা নাড়ল। 'আমার মনে তিন পড়েছিল আর একদিন। পরশীর দশটায় ইঁদের পর পর তিনটে তিন এসে ঠেকেছে পড়ল। আসলে আমাদের আমি দেখাম, সেটা কোনও নেই। আসলের আসে দুটো দেখেছে আজ। যার দুপুরে বিশেষ বাড়িতে তিন দুটো একটু করা আজ চায়। কিন্তু সে বাড়িতে তিন দুটো মানেই আর তিন পড়ল না। তিন পড়ল যেন পরের মাসে। ওই বস-বারো তারিখ নাগাদ। পর পর দুদিন ছাত্রে উঠোনে তিন পড়ার কথা হল। প্রতিবারেই তিনটি তিন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তারপর থেকেই তিন পড়া আসার কথা হয়ে গেল।'

রাজীব হেসে বলল,—তিন পড়ার ব্যাপারটা আপনি তখন বলায় আসিয়ে এলেন, তাই না?'

অম্বর একটু হাসল। 'ঠিক তখনই যাই নি। আমি দেখার তার পরের মাসে। দুবারি মাসে পর পর তিন দুবার উঠোনে তিন পড়ল। সেই একই ব্যাপার। তিনটে তিন। বেশীও নয়, কমও নয়। উঠোনের উপর সন্ধেবেলা আমাকে পড়ে টহলতে হয়ে গেছে। আপনার আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই যিঃ সান্যাল। পর পর তিন মাসির এই কান্ড। তিন পড়ার উপদ্রব বাড়তে দেখে, আমি নিজেও একটু ভয় পেলাম। ব্যাপারটা খুব ভাল লাগেনি আমার। বাড়িতে আমরা দুটি লোক। চারপাশটা চলে গেলে আমার সাথে একাই থাকতে হয়। সহরে আমার স্ত্রীর সৌন্দর্যের যথেষ্ট খ্যাতি। ঘরে আর কতক্ষণ ও থাকত? কলেজের একমাসকে চারটে ক্লাস করতে হয়। ছুটির দুদিন প্রফেসরের বাড়িতে কোচিং দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাছাড়া ফিজিক্স-মাইনের উপর নীলয় খুব কৌঝ ছিল। অন্যদের দোসারে ওকে যেন পাটি নিতে হয়েছে। এখন চাইল ট্রাবের মাইকে নীলা হিরোইনের রোলে অভিনয় দিয়েছিল।'

রাজীব বলল,—আমি জানি অম্বর রায়। শুধু অভিনয় নয়, সমস্ত সহরে মিসেস রায় ভীষণ পপুলার ছিলেন। আপনাকে হয়ত অনেকে চিনবে না কিন্তু নীলা রায়ের নাম শোনেনি এমন ছেলেমেয়ে এই সহরে নেই।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব ফের বলল,—তাহলে আপনার বাড়িতে শেষ তিন পড়েছিল এই মাসের বস-বারো তারিখ নাগাদ।'

কথা দিয়ে অম্বর বলল,—আপনাদের চেয়ারম্যান নেই যিঃ সান্যাল। তার তারিখ সঠিক আপনাকে বলতে পারব। পর সপ্তাহে পর পর তিন দিন আমার বাড়িতে তিন পড়েছে। সোম মঙ্গল আর বুধবার। তিন দিনই সকাল আর বুধবার। তিন দিনই সকাল আর বুধবার। তিন দিনই সকা

হয়। গতকাল সন্ধ্যারাত্রে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। তারপরই আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন এবং সেই ছুরি থেকে বাড়ির চাকরটিও নিখোঁজ হল। ঘটনাগুলিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না?'

অম্বর কোনো কথা বলল না।

সিগারেটটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। সন্ধ্যা একটা টান দিয়ে শেষ সম্পূর্ণ করলেন রাজীব। ধোঁয়া মুখ দিয়ে প্রায় বের করে দেবার কথা বলবার জন্য সে প্রস্তুত হল।

অম্বরের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'আপনাকে আর মোটা দুই প্রশ্ন করব তারপর যাব।'

—'বেশ তো, করুন।'

—'বলুন, নীপা দেবী সুইসাইড করেছেন, এই কথাটা আমরা মেনে নিলাম। তাহলে প্রশ্ন উঠবে কেন উনি আত্মহত্যা করলেন। এবিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

তীব্রতা এই দিকেই আসবে, অম্বর তা আন্দাজ করেছিল। তবু উত্তর দিতে দিতে তার জিভটা কেমন জড়িয়ে এল। বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থা। পুলিশের সামনে কিছু বলাও বিপদ। অথচ মুখ না খুলেও সম্ভবত উপায় নেই। ওপাশে লোকটা তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। এখন সিগন্যাল দেওয়ার পথ বন্ধ।

কোনোমতে অম্বর জবাব দিল,—'কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কথাটা আমার মনে আসেই এসেছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন কি সাহসে, নীপা হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করল, তা আমিও ভেবে পাচ্ছি না।'

রাজীব মনে মনে হাসল। কেন একটা সিগারেটে ধরাবে কিনা সে ভাবছিল। অম্বরের মুখে একবার অসহায়ভাবে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে সে বলল,—'আচ্ছা আসুন স্যার, নীপা দেবীকে দু-এক দিনের মধ্যে কি চিন্তিত মনে হয়েছিল? ডোমেস্টিক পুলিশদের, বিশেষ-ভাবে কিনা উকিলদের প্রায়ই দেখেছিলেন?'

অম্বর মাথা নাড়ল। 'ওকে বিশেষ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে আমার মনে হয় নি। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। বয়সটাই দেখে আমার কেমন খটকা লাগল। কিন্তু নীপাকে প্রশ্ন করে আমি কোনো উত্তর পাইনি। কথাটা সে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেয়।'

সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়িয়ে রেখে রাজীব মনোযোগী শ্রোতার মত সোজা হয়ে বসল।

অম্বর বলল,—বাড়ি-ফিরতি কথাবার্তা বলতে বলতে সকালে নীপার কথা এসে-ছিল। তার মনে সেই অনুভূতি। নীপা তখন আর কিছু বলছিল। বাইরের ঘরে আমি তাদের বসালাম।

রাজীব প্রশ্ন করল,—'সেই আফ্রিকান ভদ্রলোকের কি নাম যেন বললেন,—চন্দ্রবন্দনাদু আই না?'

যা ভদ্রলোককে খুনেরাই বলে মনে হল। বয়সটা কি আন্দাজ? নীপা দেবী চন্দ্রবন্দনাদুকে দেখে চমকে উঠেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম, চন্দ্রবন্দনাদুও অবাক হয়ে নীপার দিকে তাকিয়ে আছেন। পরে কথাটা আমি নীপাকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ও সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ সান্যাল? ওদের পূর্বে পরিচয় ছিল।'

হুম্‌। রাজীব চিন্তিত মুখে বলল, তার কপালে দু-তিনটি রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। ঠিক আছে অম্বর বাবু। আপনাকে এখন আর বিরক্ত করব না। সেক্রেটারীর রিপোর্ট টা পেলে ওরা আপনার সঙ্গে যোগা-যোগ করবে।'

অম্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজীব ওকে হাত মিলাতেই দিতে চাইল, কিন্তু অম্বর আপত্তি করল। 'না, থ্যাঙ্কস!' সে সবিনয়ে জানাল।

অম্বর চলে যাবার মিনিট দশেক পরেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

অন্য প্রান্ত থেকে সুব্রতর গলা ভেসে এল,—'রাজীবদা আছেন?'

—'হ্যাঁ সুব্রত, আমি কথা বলছি।'

—'একটা খবর আছে রাজীবদা। আপনি যাঁদের সেই ছুরিটাকে পাঠিয়ে ছিলেন। একটু আগেই সে রাঁচিথেকে ফিরে এসেছে। আমাদের অফিসের ডাকে করে আপনার পাঠিয়ে দেয়। টেলিফোনে সুব্রত বলল।

—'ওকে তুমি এখানে পাঠাও। আর কোরো না কিন্তু।' টেলিফোনটা না করে ছেড়ে রাজীব ফের চিন্তা করতে বসল।

থানার একজন সিপাই ছুরিটাকে নিয়ে এল।

রাজীব ওর মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। সবটা মুখেই রক্ত। জমাট রক্ত আরম্ভের চিহ্ন। দুশ্চিন্তার রেখাগুলি নেই। গায়ের রং কালো, মাঝারি স্বাস্থ্য, পরনে খাকির হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট। কমবয়সী বাড়ি-চোর। বয়স ষোল-সতেরোর মধ্যে হবে বোধহয়।

—'আচ্ছা ছুরিটা ফেলার দিন কে?' রাজীব সোজা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

সুরবল্লী কষায়

দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে
স্নায়বিক দুর্বলতা বা
অতিরিক্ত পরিশ্রম
জনিত অবসাদ দূর করে
যে কোন চর্মরোগ
নিরাময় করে

সুরবল্লী আয়ুর্বেদ অপূর্ব ঔষধ
ওষধিগুলী আয়ুর্বেদীয় মতে
জীবনকে আনন্দের উৎসাহ
শক্তিতে ভরিয়ে তোলে

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কবিরাজ হাউস, কলিকাতা-৯.

ছোকরা খুব ভয় পেয়েছিল বলে মনে হল। তার ঠোঁট দুটো থর-থর করে কাঁপছিল, মুখখানা শুকিয়ে আমসী। ভয়ে ভয়ে তার চোখ দুটো দুঁচিবার জল, মোছবার ছুটোছুটি হয় গেল।

—সব কথা খুলে বল। তোকে একটি টাকা দেব। রজনীর ওকে আশ্বাস দিল।

ভরসা পেয়ে ছোকরা মুখ খুলল। 'আজ্ঞে বাবু ছাড়িয়ে যাব খুনেরই মোকদ্দমা।'

আর অধীর রাহা পায়। প্রশ্ন অবশ্যের ছোকরা ওরই বলে।

—খুন খুনের ঝিরোঝিলি? কোথায় রে?' রজনীর প্রশ্ন করল।

—আজ্ঞে চন্দনবাগানায়। আমাদের বাসের পাশ। খুব বিশ্বি-বাবল, তাও লোক বসেছিল।'

—সেখানে তো টিকিট কিনে ঢুকতে হয় রে? তুই টিকে পেলি কোথায়? বিনি-পয়সায় দিয়েছিল?'

—আজ্ঞে, না।' ছোকরা বলতে লাগল। —ওরে টিকিট কিনলি কেমন করে?'

মুখখানেক চোক গিলে বলল,—টিকিট কিনি নাই। এক বাবু আমাকে মারা খুনের জেরে টিকিট দিলেক। সেই টিকিটখানা নিয়ে গেছলাম।'

—বাবু? কোন বাবু রে। অকে চিনিস তুই?'

—নাই, চিনি নাই তেনে? বাবু তো আমিতে কিন-চারবার এসেছে।' একটু ইতস্তত করে সে ফের বলল,—'সিনেমার বিবিবাবিকে মারবার জেরে বাবু ফরমার আমা-যাওয়া করল। আমি সব শুনিছি।' ছোকরা একগাল হাসল।

—'টিকিটখানা তোকে ফেলায় দিল?' রজনীর জানতে চাইল।

ছোকরা বলল,—'আমরা সেরে একটা বাহিরে আসবার যাবারে দেখেলাম। তা বাবু তখন হাতখা দিয়ে বাহিরল। আমাকে দেখে বলল, চলনবাগানায় তখন গান হচ্ছে। ভাল-আসর বসে, আসাপাছি পালা। তুই খুনতে যাবি?'

আমি বললায় যে তেনে যাব নাই। বাবু তখন আমাকে টিকিটখানা দিলেক। বলল,—রাত সাড়ে আটোই চলে যাস। নাইলে খুনতে দিবেক নাই।'

—'তারা তাড়ল কখন? তারপর তোকায় ঢুকলি?'

—আজ্ঞে যা বাবলা বলল আমিতে। গেল ঢুকলে আসবার সেই রাত একটার সময়। যখন তাড়ল, তখন সেব আসিল। কি সেব আকলে। আমি আর কিছুলায় নাই করে। একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চির উপর শুয়ে এক চটকা ঘুম দিলায়। সকাল হলে পর ঘরকে আসিছি।'

রজনীর খুব হাসল, 'ঠিক আছে, তুই এখন যা। দরকার হলে আবার ডেকে পাঠাব।'

পরদিন খুব ভোরে রজনীর জীপ এসে দাঁড়াল। কাল সন্ধ্যেবেলায় সেরেছে। খুনখারাপির দিনে এক পশলা ভারী বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আকাশ আজ পরিষ্কার। চোখ জুড়নো, ঝকঝকে নীল। একটু পরেই সূর্যি উঠবে। দূরে সেরা নীল আকাশে কালচে ছোপ ছেলে রেখেছে।

জীপের শব্দ শুনেই অম্বর বেরিয়ে এল। কাল সন্ধ্যে বিম একলাই ছেলে। পরীক্ষার হলে। মনের এবং শরীরের উপর চোখ চলে। তবু অম্বরকে প্রায় কিছুই বলতে হয়নি। পরের সকাল সন্ধ্যেটাই প্রায় ছেড়ে পাড়াছিল। অম্বরের চেনেদের, এবং ছেলে-মেয়ের দল। টাউন হলের সভা-সভায়। চেনা-অচেনা কত মুখ। সবগুলো খুশিমুখ, হাসিমুখ। অম্বরকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে।

আর ছেলে একটা মজলিস আসল। ভালো খাবা কিনে নিয়ে এল। খুব খুশি, হাসা চলনবিলাস। পুষ্প-সম্ভার সাজিয়ে রেখে বক্তার আয়োজন তারাই সম্পূর্ণ করল। মুক্ত আলো এক রজনীর মুখোমুখি। এমন সেই মুখোমুখি আলো মনে নৈরাশ্যের ভাব হয়।

অম্বরের চোখমুখে আজ সেই মুখোমুখি ফুটে উঠল। রজনীর দিকে তাকিয়ে সে নিম্নস্বরে কণ্ঠে বলল,—'আপনার কি লাগছে?'

ঘরে ঢুকে রজনীর চেয়ারে বসল। আজ রাত্রিরে আর আসিনি আমার জন্য। আপনার অপনি খুবই ক্লান্ত।—শুধু শুধু ডিসটার্ব করা হবে।'

অম্বর আনন্দমেশ্রর মত বলল,—হ্যাঁ। কাল সকাল থেকে কখন ফিরেছি, তখন আটটা বাজে। আমি আপনাকে বলেছিলাম কি মনে নাই। বীণা আমাদের করেছে। পোস্টমর্টেম করে সে কিছুই পাওয়া যায়নি। শুধু শুধু আপনারা—'

রজনীর একদৃষ্টে অম্বরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল,—'বীণা দেবী আত্মহত্যা করেন নি আমার মনে হয়।'

অম্বর প্রায় ছাদে উঠল। 'কি বলছেন আপনি কি সজ্ঞানে? বীণার নিশ্চিন্ত নিজ চোখে দেখেছি।'

রজনীর চুপ করে রইল। অম্বরই আবার বলল। 'আপনি কি সন্দেহ করেন কাউকে?'

রজনীর ধীরে ধীরে বলল,—'কাল রাত্রিরেই রিপোর্ট নিয়ে ফোন করিছে।' একটু থেমে সে ফের শুধু বলল,—

—'আমি আমার মনে কিছু রাখি না,—একটা দোষ-বাদ। কিন্তু আপনি আমার। এ সকল নিয়ে আমার চোখে ভাল দেখাবে। নিশ্চিন্ত নিজ থেকে খুন হলে প্রশ্ন কি পাওয়া উচিত ছিল আমার? কিসের মত-বিষ্ণুরেই ছোপটি ছিল? কিন্তু পরীক্ষা করে আমরা কোনকিছুই পাইনি।'

—'তবে? তার কি সেরে পরীক্ষা করে?' অম্বর প্রায় চীৎকার করল।

বিচারকের মত অবিচলিত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে রজনীর ফোনের করল,—'আমিনা বেগমকে।'

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এম এম ধাবান (মোবার সময় ইন্দো) ইন্দো ইন্দিরা ইন্দুজের পৌত্রিকায় আজ সকালে চাঁদের পাথর দেখছেন। তাঁর ধারে মাঝিম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীমতী গান্ধী।

দিওয়ানের কথা

গত দশকে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি

১৯৬০ সালে যে দশকের সূত্রপাত এবং ৬১ সালে যার শেষ, সেই গত দশকটি বিজ্ঞান তথা মানবসভ্যতার ইতিহাসে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ এই দশকের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে পদার্পণ করেন। শুধু বিজ্ঞানী মহলে নয়, বিশ্বে সত্যিকারের পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চাঁদের মাটিতে মানুষের এই পদার্পণ। অবশ্য তার এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন আর মিলনমেলা মহামানবেরা। এই ঘটনা বিশ্ব সভ্যতাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরিচায়ক। এই অভিযানের সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানত একটি দেশের হলেও এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে আজ পৃথিবীর বহু দেশের বহু মানুষের অবদান। এবং এই ঘটনাটিকে ঘিরে পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মানুষে নিজেদের মনে আশ্চর্যজনক যে নিবিড় ঐক্য অনুভব করেছেন তা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

এই ঘটনা দশকেই আমরা দেখলুম, বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণের গভীর জগৎ থেকে এক নব তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন যা কৃষির জটিল ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার রাসায়নসন্তান সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বিকশিত করেছে। আর এই জন্মে-উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ফলে আজকের এক কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান তার হৃদ্‌যন্ত্রবিশিষ্ট দেহাবয়ব পরিবর্তনের সন্তানসম্ভাবনা সৃষ্টিতে হয়েছেন।

এই দশকে কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম অন্তর্ভাগে আমাদের উৎপাদনবৃদ্ধির এক পথ্যাত্ত আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের ও আর্থিক সুরক্ষিত অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রের গর্ভ ও তার জলদেশ থেকে অফিস সম্পদ আহরণের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়েছে এই দশকে। মহাকাশের অনন্তলোকের রহস্যময় আবিষ্কারের কথাও আমরা ভুলতে পারি বিজ্ঞানী দশকের শেষে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দশকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ব্যক্তিগত। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই মিলনমেলায় এক নতুন দিক-নির্দেশ। যদিও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যায়নি, তবুও যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মানুষের দশকে পা দিয়ে আমরা আশা করছি, এই দশকে বিজ্ঞান একদিকে যেমন বিশ্বমানুষের নতুন নতুন দিক আমাদের সামনে খুলে দেবে, অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীর অর্থনৈতিক সুষমবণ্টন ভেঙে পড়া নিয়মনে এবং মানুষে সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

শনিগ্রহের বলয়ে অনুসন্ধানের সন্ধান

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, পৃথিবী, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লেটো—এই নটি গ্রহকে নিয়ে আমাদের সৌর পরিবার। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি, তারপরেই শনির স্থান।

শনির ব্যাস হচ্ছে ৭৫১০০ মাইল। শনি গ্রহের বৈশিষ্ট্য তার তিনটি বলয় এবং নটি উপগ্রহ বা চাঁদ। ১০০ মোটি মাইলেরও বেশি দূরে থেকে এই গ্রহটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর হিসাবে অনুসারে শনিগ্রহের সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে সাড়ে ২৯ বছর।

শনির ব্যাস সম্পর্কে আমাদের আগে যে ধারণা ছিল, এই নতুন উপগ্রহ আবিষ্কারের ফলে সেটা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার আরিজোনার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শনির বলয়ের গঠন সম্পর্কে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। এই নতুন তথ্য অনুসারে, পৃথিবী

একক-ইঞ্জিন বিশ্লেষকের 'বিক্রম-বন্দর'

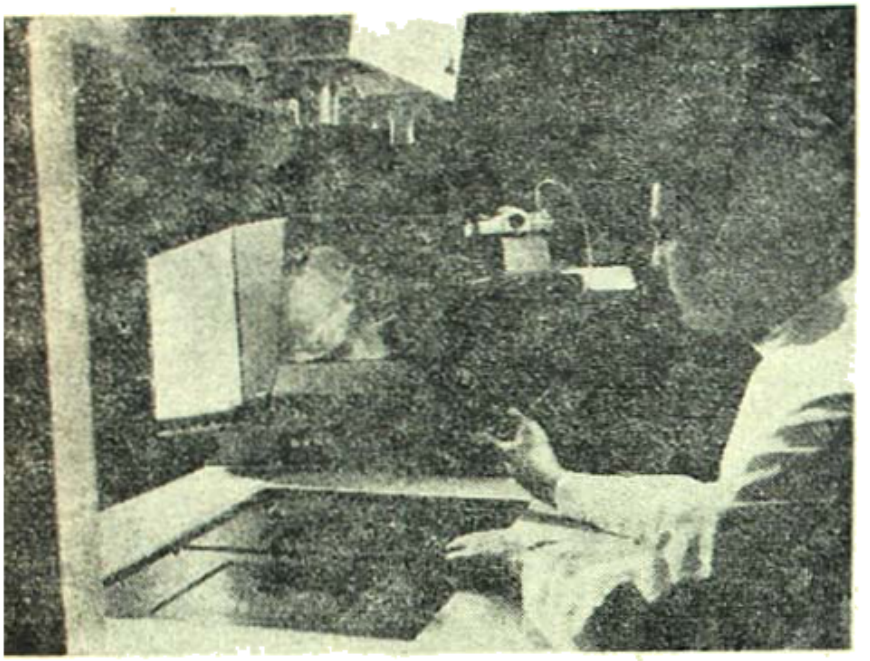

নিয়েছেন, এদের বেশির ভাগ অ্যামোনিয়ার তা দিয়ে গঠিত।

সম্প্রতি ধূমকেতুর বলয়সমূহের অবলোহিত রশ্মি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সব আলো সূর্যের আলো বিশ্লেষিত হয়ে যেসব অ্যামোনিয়া বরফের শরীর থেকে আসে। শনির বলয়ের ঐ অ্যামোনিয়া বরফ উৎসে যে কোথায় তা আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। অনেকে মনে করেন। এই দুটি গ্রহ তৈরির সময়ের তখন এর উপাদান অ্যামোনিয়া বাষ্প গ্রহের অভিকর্ষ টানে ঐ গ্রহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে সে এবং তা-ই এর চারপাশে বরফাকারে জমে গেছে। এই গ্রহের উপাদানের কথা অ্যামোনিয়ার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

তাহলে কোথা থেকে এল এই অ্যামোনিয়া? এর একমাত্র সম্ভাব্য উৎস মহাশূন্যে কণা ধূলি কণিকা বলে মনে করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে জানা যায়, মহাকাশের ধূলিকণাসমূহের মধ্যবর্তী যে অ্যামোনিয়ার মতো প্রচুর পরিমাণ জৈবিক পদার্থের পূর্ণ। কিন্তু মহাকাশীয় আবহাওয়া এলাকায় এরকম কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ও তদানন্তনী ডর্ক অ্যাডমেনসনের অবজারভেটরির প্রধান ডোনাল্ড কুইগলে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, গ্রহের বলয়সমূহে যে অ্যামোনিয়া ধরা পড়ার কথা এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ। কিন্তু সুনিশ্চয়ে কথা ঐ গ্রহ দুটির নিকটবর্তী অঞ্চলের এর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন। ঐ সকল বলয়সমূহের অ্যামোনিয়া বরফ যে উৎস থেকে এসে থাকুক না কেন, তাদের অস্তিত্ব বেশি দিন টিকে থাকার কথা নয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এদের ধ্বংস করে ফেলবে। তাই এদের অস্তিত্ব সম্ভবত কয়েক লক্ষ বছরের বেশি হবে না। তাহলে এদের উৎস কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর কথা ভেবেছেন। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকে বিজ্ঞানীরা বলেন তুষারাবৃত ধূলিকণা। ধূমকেতুর কেন্দ্রক যখন সূর্যের কাছাকাছি আসে তখন সূর্যের তাপে তুষার বাষ্পীভূত হয়ে ধূলিকণাগুলি মুক্ত হয়ে যায়। ধূমকেতুর কেন্দ্রকে যে পরিমাণ অ্যামোনিয়া বরফ আছে বলে মনে করা হয়, তা দিয়ে শনির বলয়ের মতো বিশাল বলয় তৈরি করা সম্ভব। ধূমকেতুর কেন্দ্রকে অ্যামোনিয়া বরফ ছাড়াও অন্যান্য জৈব পদার্থ আছে বলে মনে করা হয়। ধূমকেতুর কেন্দ্রকে যে পরিমাণ জৈব পদার্থ আছে বলে মনে করা হয়, তা দিয়ে পৃথিবীর মতো অসংখ্য গ্রহ তৈরি করা সম্ভব। ধূমকেতুর কেন্দ্রকে অ্যামোনিয়া বরফ ছাড়াও অন্যান্য জৈব পদার্থ আছে বলে মনে করা হয়। ধূমকেতুর কেন্দ্রকে যে পরিমাণ জৈব পদার্থ আছে বলে মনে করা হয়, তা দিয়ে পৃথিবীর মতো অসংখ্য গ্রহ তৈরি করা সম্ভব।

চন্দ্রশিলার প্রাথমিক বিবরণ

গত জুলাই মাসে অ্যাপোলো-১১ অভিযানের মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যেসব শিলা ও ধুলো সংগ্রহ করে আনেন, সেগুলির প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, চন্দ্রশিলার রাসায়নিক গঠন পৃথিবীর এ জাতীয় কোন কিছুর সঙ্গে মেলে না। চন্দ্রের ২০টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অবশ্যই শিলা ও ধুলোর গঠন একই রকম। এ থেকে বোঝা যায়, অ্যাপোলো-১১ চন্দ্রাভিযানের সমস্ত অঞ্চল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বিরাট এলাকার মৌলিকটাই এতদিনে বিজ্ঞানীরা। ঐসব নমুনার জৈবপদার্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এতেকে আরও বোঝা যায়, চন্দ্রে জীবনের অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে নমুনাগুলি পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে, পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিমাণ অনুসারে ঐ বলয়সমূহের তাপমাত্রা করেছিলে কিন্তুর হিসাবে হিমাঙ্কের ৩০৮ ডিগ্রী নিচে। কিন্তু মহাশূন্যের তাপমাত্রা হল ৩৬০ ডিগ্রী তার নিচে। সুতরাং মহাশূন্যের তাপমাত্রার তুলনায় শনির বলয় উষ্ণতর।

ঐ দুইজন এ প্রসঙ্গে বলেছেন। অ্যামোনিয়া বরফ থাকবে ঠান্ডা। তবে ঐ সকল কণার অন্যান্য বরফের আস্তরণের মধ্যে হয়তো ঐগুলি উষ্ণতর মনে হতে পারে। শনিগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলে আরও জানা গেছে। ঘোরি ঘোরি বলয় আগে পৃথিবীতে যেমন জীবসমাজ ও জীবিকরকার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক সেইরকম পরিবেশ ও পরিস্থিতি শনিগ্রহে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সেই পক্ষে আজও সৃষ্টি হয় এবং তা আর সম্ভব হয় নি।

চন্দ্রশিলার প্রাথমিক বিবরণ

গত জুলাই মাসে অ্যাপোলো-১১ অভিযানের মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যেসব শিলা ও ধুলো সংগ্রহ করে আনেন, সেগুলির প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, চন্দ্রশিলার রাসায়নিক গঠন পৃথিবীর এ জাতীয় কোন কিছুর সঙ্গে মেলে না। চন্দ্রের ২০টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অবশ্যই শিলা ও ধুলোর গঠন একই রকম। এ থেকে বোঝা যায়, অ্যাপোলো-১১ চন্দ্রাভিযানের সমস্ত অঞ্চল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বিরাট এলাকার মৌলিকটাই এতদিনে বিজ্ঞানীরা। ঐসব নমুনার জৈবপদার্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এতেকে আরও বোঝা যায়, চন্দ্রে জীবনের অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে জীবসমাজের ও জীবিকরকার অনুকূল কোন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নি।

পৃথিবী ও চন্দ্রের শিলার রাসায়নিক গঠনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে। চন্দ্রশিলায় ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইট্রিয়াম, ও জারকোনিয়ামের মতো পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ উপাদানের অস্তিত্বসমূহ প্রচুর পরিমাণে। এই সমস্ত উপাদানের যৌগগুলি হচ্ছে এগুলি আর উচ্চ তাপমাত্রায় বিশ্লেষিত হয়।

পৃথিবীর শিলায় যে পরিমাণে লোহিত পাওয়া যায়, চন্দ্রশিলায় তার তুলনায় অনেক বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। চন্দ্রের ফেল্ডস্পার জাতের শিলায় সাধারণ ১২ ভাগ টাইটেনিয়াম অক্সাইড থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আগ্নেয় শিলায় সাধারণ ৪-৫ ভাগের বেশি ঐ বস্তু পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে সীসা, রিবিডিয়াম, সেলিনিয়াম ও পটাশিয়ামের মতো কিছু অস্থায়ীদের উপাদান চন্দ্রশিলায় দুষ্প্রাপ্য। এতে বিজ্ঞানীরা বিস্ময় বোধ করেন।

এই সব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রাথমিক বিবরণীতে বলেছেন। এই জন্য গঠনপ্রকৃতির দিক্‌ভাবে হল, যুগ চন্দ্রশিলার গঠন পৃথিবীর শিলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যার যে প্রাকৃতিক তথ্য পদার্থের সৃষ্টি তা অনুসন্ধান পার্থিব প্রক্রিয়া থেকে পৃথক।

চন্দ্র ও পৃথিবীর রাসায়নিক পদার্থের পার্থক্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় পৃথিবীপিণ্ড থেকে চন্দ্র একদা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচ্ছিন্ন এই তত্ত্ব আর টেকে না।

তাহলে এটা হতে পারে—মহাকাশের অন্য কোন স্থান থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে তা ধরা পড়েছে, অথবা চন্দ্র ও পৃথিবী একই সময়ে ও একরকম পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যাপোলো-১১ অভিযানে সংগৃহীত মাত্র চন্দ্রশিলার বয়স জানতে পারা গেছে। অর্থাৎ একদা এগুলি গলিত অবস্থায় ছিল। এর এগুলি অগ্ন্যুৎপাতের উৎক্ষিপ্ত, এর উৎক্ষিপ্তদেহের সংজ্ঞাবাহিনীর তাপ থেকে সৃষ্ট। চন্দ্রের প্রকৃতিগত অভিজ্ঞতার (উৎক্ষিপ্তদের সংবেত অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত) চন্দ্রপৃষ্ঠে গঠনের ব্যাপারে মূলে ভূমিকা ছিল বলে যে অভিমত প্রকাশ, তার সমর্থন পাওয়া যায় এ থেকে। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে সংগৃহীত সব কয়-আকারী চন্দ্রশিলায় গায়ে গর্ত দেখা যায়। অন্য অন্য ধূলিকণার অভিঘাত ঘর্ষণের ফলে হয়তো এই গর্তগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

ইউরোপ ও এশিয়ার অর্ধাংশ জুড়ে ১৪টি বিজ্ঞানী চন্দ্রশিলাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেছেন। ১১৭০ সালের জানুয়ারি থেকে এদের পরীক্ষার ফলাফল জানা যেতে পারে। তা থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি, গঠন ও ক্রমবিবর্তনের আরও সন্ধান হবে।

মানুষগড়ার ইতিকথা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

বাংলাদেশে সম্ভবত আর কোন স্কুলে এতগুলো বিষয় পড়ানো হয় না। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় ছ-ছটি বিষয়। সাহেবদু, টেক-নিকাল, কমার্স, হিউম্যানিটিজ, এগ্রিকালচার ও আর্টস। জুনিয়র ও সিনিয়র দুটি সেকশন মিলিয়ে সাতশো চল্লিশটি ছেলে পড়ে এই স্কুলে। পড়ায় প্রায় আশী-বিরাশীজন শিক্ষক। কলকাতা থেকে পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ কোশ পশ্চিমে পড়িয়া-বারুইপুর বাস রুটের পাশে নরেন্দ্রপুরের সঙ্গে চমৎকার বিদ্যা জুড়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সুবিশাল কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের প্রায় চৌদ্দ-পনেরটি শাখা-প্রশাখা। ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু করে প্রাইমারি স্কুল, প্রায়োগিক শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শুরু করে পোলট্রি, কেমারী নানা রকমের নানা বিষয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে। সব কিছুর মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ের কথা বলেনি এমন শিক্ষিত মানুষ আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতের কোন প্রান্তেই খোঁজে পাওয়া যাবে না। সেকা থেকে গুজরাট, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা আজকের সব অফিসার প্রায়শই আসে পড়তে এই স্কুলে। আসে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্ট, শিখ, পার্সিরা, অন্তত সব ধর্মের ছাত্ররা। এক বিচিত্র বৈচিত্র্য বৈকবে সমৃদ্ধ এই স্কুল। তাই তিন বছর আগে যখন শুরুর এক শীতার্ত আসরাতে নরেন্দ্রপুরে সিলেবিলিশন তাঁবু খাটানো।

পঁচিশ থেকে প্রৌঢ়েরা আসে নয় তেরো পয়সার টিকিটে। সেখানে টিকিটের দামের কোন তারতম্য নেই, সেখানে সেদিন উঠিয়া-পাইকপাড়া-পাড়া। নরেন্দ্রপুরের কথা বলতে গিয়ে আবার উঠিয়া-পাইকপাড়া- এলো কোথা থেকে? কোথা থেকে কেমন করে এলো সে কথাই তো বলতে চাই।

সেদিন শিবরাত্রি মহাপুণ্যের সমারোহের কথা। ছেচল্লিশ সাল। মে মাস। পাড়ায় শিবরাত্রির ১৮ ঘন্টাব্যাপী রাত্রির ভোগে ছেলেরা রামকৃষ্ণ মিশন যাই এ রাত্রিতে অনুষ্ঠানের পরিষ্কার চেয়ারী হাসপাতাল জন্য একটি স্টেথোস্কোপ তোলা হবে। পাড়া শিবরা ও আশ্রম এই পবিত্র দেশের অধিন মহাপুণ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ভিন্নমুখো ধারা ও আশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাড়াগাঁয়ের বাসনে হাসপাতাল প্রয়োজনীয় যে যোগাযোগ ভিন্নে সাধারণ করাই ছিল এই ছোটোর উদ্দেশ্য। সেখানে যার তিনটি ছেলেকে নিয়ে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের পরীক্ষা এই মেলে। পরেরদিন হলেন কেন্দ্রে আসে সর্বভারতী সাধারণদিন। যে শুরু পর নিয়োগ আসে। আর সেই নিয়োগ আসেরদের আরো অনেকদিন-শুরুর সাধারণীয় ভিন্নে আসে, তারে ভিন্নে তিনে ভিন্নে পড়ে ছেলেরা তাদের সাধারণের।

শুরুর শেষ হওয়ার শুরুর স্বামী ভেদেকেশ্বরানন্দ এই আশ্রমের সম্পাদক হয়ে এলেন। স্বামীজীর অক্লান্ত সেবার ও পরিশ্রমে ধীরে ধীরে অর্থাভাব হয়ে ওঠে এই প্রেমে। ছাপ্পান্ন সাল নাগাদ ছেলের হাত সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় একশ ষাট। দুটি বাড়ী নিয়ে ছিল এই আশ্রম। একটি পাঠশালা, অন্যটি ছেলেদের।

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন সেদিনই অকল। বিশেষ করে খাদ্য ও পরিধানের অত্যাবশ্যকী মূলধন হিসাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ভয়ানকে আকার পাচ্ছে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু ছাত্রের খাদ্য ও শিক্ষা তো দূরের কথা মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। সব দেখে শুনে বয়স্ক হয়ে ওঠে স্বামীজীর মন। কিন্তু করবেন কি? টাকা কোথায়? কে দেবে সাহায্য?

সাহায্য চাই। আর সেই সাহায্যের আশায় একদিন বিরেটার রোডের কেন্দ্রীয় ত্রাণ দপ্তরের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন লোকেশ্বরানন্দ। দপ্তরের কর্তা কথার মধ্যে কথা এ বিষয়ে আগ্রহটা চেপে ঠিক এমনি সময় কেন্দ্র জানান যা গিয়ে খোঁজ করো সেখানে সমস্যার সোধানের উপায়ন্ত হবেন। টাকা যার সহজ, ইচ্ছা যার নয়, তাকে আটকায় কে। স্বামীজী নিরোহিতন হাজার তিন বাইশেক টাকার প্রার্থনা নিয়ে। সব শুনে কর্তাব্যক্তি তাৎক্ষণিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। একশরে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা।

শুরু টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ফান্ত হন নি নিরোহিতন যাত্রা। তাঁদের ঠিক করে দিলেন আশ্রমের জন্য। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে স্বামীজী তখন ছাত্রদের জন্য নতুন বাড়ী শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। যাদবপুরের ছোট-দের বাড়ী (যেখানে এখন উদ্বাস্তুদের স্টেনোগ্রাফি ক্লাস হচ্ছে) ও বরিষাদের বরিষাদের উদ্বোধনের ছেলে গাইনের সাধারণ বরিষাদের যাদবপুরীয়ের যে কোন একটিকে ছাত্র আশ্রম নতুন ভাবে স্থাপনের পরিকল্প চালু করে 'কলাবিদ্যালয়' স্থাপনের। কিন্তু সেখানেকের অনুমোদন পরিকল্পনা বলে গেল। যাদবপুরী কলেজ নতুন ভাবে ছেলেদের পরিবেশন আশ্রমের আশ্রম পড়ে তুলবে। আর সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব।

ব্যাপারটা করতে বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। উদ্বাস্তুদের সাল নাগাদ সেন্টাল গভর্নমেন্ট পড়িয়া-বারুইপুর রাস্তার ধারে উঠিয়া-পাইকপাড়া গাঁয়ে বিস্তীর্ণ জমি-জমা নিলেছিলেন। যাদবপুরের জন্য আবেদন করেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক যাদবপুর সেখানে গড়ে ওঠে নি। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট এখানেই একশ বিঘা জমি কেন্দ্রে গঠনের হাতে তুলে দিলেন পরিষ্কার প্রেমারী যাদবের জন্য একটি উপযুক্ত হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য।

জমি পাওয়া গেল, টাকাও মিলবে। এবার শুরু হল গড়ার কাজ। বাস পরিবর্তনের জন্য নিজেই কাজ শুরু হল। উঠিয়া আর পাইকপাড়া সংলগ্নাগাঁয়ে দুটি গড়ে। পাড়া দুটির যোগাযোগে গঠিত হয়েছিল যে সংগঠনের তারই নাম রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্সী—নরেন্দ্রপুর। স্বামী বিবেকানন্দের সাধ্যসাধনাকের সেবাকর্মী নামের কাজ শুরু করে কলকাতার উপান্তবর্তী পরিষ্কার কর্মিকরীদের অনুমতি এই গড়ন্তরাটি ক্রমোন্নতি বিকাশে হয়ে পড়ল।

ছাপ্পান্ন সাল শেষ হয়ে হয়। আশ্রমের উদ্যোগে নরেন্দ্রপুরে একটি ইন্দুর লীগার

ডি. সে. ব্রা. এ. ও প্রকাশ

(১) ইংলিশ এসি এন্ড কনস্ট্রাক্টিভ

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য—
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে
মূল্য—৩.০০ টা

(২) ইংলিশ ট্রান্সলেশান এন্ড গ্রামার

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য—
মূল্য—২.৫০ টা

(৩) টেলস্ ফ্রম টেন ফেমাস ইংলিশম্যান

পঞ্চম শ্রেণীর জন্য—প্রকাশ—১.২৫ টা
বাকি ভাগ শিগ্রই :—

প্রাণিক প্রকাশনী

৩১ কলেজ রো সেল, কলিকাতা-৯

শিশু ভারতী, অনুষ্ঠিত হোল। আনন্দের প্রয়োজনেই কয়েকটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদর্শনীগুলিকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কিছু ছাত্র নিয়ে শুরু হয়ে গেল অনেকগুলি স্টুডেন্টস হোম। আনন্দ আশ্রমে পাশ্চাত্যিয়ালী ছাত্রাবাসে থেকেও কিছু কিছু সেকেন্ড, থার্ড ও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রদের এখানে নিয়ে আসা হোল।

ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত সরকারী সাহায্যের (৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা) প্রথম কিস্তি এসে গেছে আশ্রমের হাতে। সেই টাকার সদ্ব্যবহার মানসে হোস্টেল ছাড়া একটি ছোটখাট বাড়ী তৈরীর কাজ আরম্ভ করে দিলেন লোকেশ্বরানন্দ। তখন এক নতুন সমস্যার সামনে বিচলিত হয়ে পড়লেন আশ্রমবাসী। শুধু একটি ছাত্রাবাস বাড়ী হোলে আর হবে উদ্দেশ্য নয়। আরো বড় কিছু করবার স্থান তাঁর মাথায় এসেছে। একটি আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা যেমন হয়? প্রেরণা জাগে ছাত্রাবাসের পরিচালনা নিয়ে প্রথম দিকের ছোটাছুটির মধ্যে। যোগদান করেছিলেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। যোগেশ্বর পূর্বপরিচিত প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী কাজে। যেমনি তাঁরা যেমনি পরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

অতীত সালের ১ এপ্রিল অবৈতনিক ছাত্রাবাসের (ছাত্রাবাসের তখন) এই নামে শুরু হয়ে গেল নতুন স্কুলের কাজ। রেজিস্ট্রেশনে প্রতিষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউশন অব এডুকেশন স্কুল। তিনটি ক্লাসে—নাইন টু টেনে—তিনটি শাখায় যথাক্রমে, হিউম্যানিটিজ ও টেকনিক্যাল) ছয়-পঞ্চাশজন ছাত্র নিয়ে স্কুল। কাজ আরম্ভ হল। ছাত্রদের পরেরো আনাই আশ্রমিক সোঁহিত উদ্বাস্তু পরিবার থেকে। উদ্বাস্তু ছাত্রদের বইপত্রের খরচ থেকে অবশ্যই ওদের জন্য আলাদা করে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হল। সে সব্বা আজও অব্যাহত আছে। তবে কিছু কিছু পরিবর্তন পরবর্তী সময়ে হয়েছে। যে আর শুধু উদ্বাস্তু শিশুরা নয়

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
খ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন।

পার্শ্ববর্তীগ্রামের বিভিন্ন ছেলেরা আসতে থাকলে ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র হারিয়ে ফেলবে এই আশঙ্কায় ওদের ভর্তি করা হয়। উদ্দেশ্য একটি—ছাত্রদের অন্তর্ম্মুখী ও অভিভাবকদের খরচাপত্রের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া।

নতুন স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন পার্শ্ববর্তিগ্রামী ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আবাসিক ছাত্রদেরই আর একজন। সেই সঙ্গে পুরোনো ছাত্রাবাসের প্রাক্তন আবাসিক ছাত্রদের অনেকেই, যাঁরা বি-এ, বি-এস-সি পাস করে কলেজের স্টুডেন্টস হোম থেকে এম-এ বা এম-এস-সি পড়তেন, স্কুলে পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে জড়িয়ে পড়লেন। শুরুতে জন্য সাহায্যক রূপে ইংরেজি টিচার হিসাবে স্কুলে। সে সময় স্কুলের ছয় শিক্ষক সকলেই বাস্তবিক বর্তমান সৌভাগ্য তখন যেখানে উঠেছে সেখানে বর্তমানের অভিজ্ঞতার শরীরের মাঝির সেরাদলের এক-চতুর্থাংশ।

ছাত্র ও শিক্ষক—এই দুটি শব্দ এবার আশ্রমের পরিপূরক। শুধু তাই নিজস্ব ধ্যান-ধারণার সম্বয়ে তাদের শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে গড়ে তুলবেন। ছাত্রও শিক্ষককে ভালবাসবার বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আধুনিকযুগে শত সহস্র উপায়ে শিক্ষার সম্প্রসার ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ-গুণ হয়ে পড়লেও এক কঠোর বিশ্লিষ্ট-কেন্দ্র হয়ে উঠল এই বিদ্যালয়। শুরুতেই জটিলতাবিহীন কিনা সেদিকে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক-ছাত্র দুই পক্ষের এক কঠোর বিশ্লিষ্ট-কেন্দ্র হয়ে উঠল এই বিদ্যালয়। শুরুতেই জটিলতাবিহীন কিনা সেদিকে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ছাত্র নিয়ে অনুক্ষণ অবহিত থাকতেন। তাঁরা জানতেন প্রতীয় আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথাগত প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অনিবার্য ফাঁকগুলো ঢেলে অন্যরূপ সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে তাঁদেরই। সামান্য অসাবধানতার যা অবহেলার সমস্ত প্রচেষ্টাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা যে হয় নি সেকথা তো আজ বলবার অপেক্ষা রাখে না।

পড়ার শুরুতে না শুরুতেই স্কুল আর একটি শাখা খোলার আয়োজন হোল। এইসময়ের শাখা খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে দু-দুটি হোস্টেল হয়েছে আর উঠেছে স্কুলের। ছাত্র ও শিক্ষকদের অবৈতনিক শাসনের একছায়া ছেড়ে বহির্নির্ভর যোগাযোগ ও প্রেমাকর্ষণ ভবনে উঠে এলেন। প্রেমাকর্ষণ ভবনের কাজও এগিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ঐ বছরই স্কুলের বর্তমান যোগাযোগ ছেড়ে বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের কাজ শেষ হয়ে স্কুল প্রেমাকর্ষণ ভবন ছেড়ে অর্থ-সমাপ্ত নতুন ভবনে উঠে এল।

পরের বছর অর্থাৎ ঐ সালে আরো দুটি শাখা খোলা হল স্কুলে—কমার্স ও সায়েন্স আর্টস। দুটি শাখায় প্রায় তিনশত ছেলে তখন স্কুলে পড়ছে। বর্ধিত ছাত্র-সংখ্যার স্থানাভাবের সমস্যা মেটানোর জন্যই নতুন ভবনে দুটি তখন পড়ে উঠল স্কুলের—শিবানন্দ ভবন ও তুরীয়ানন্দ ভবন। ঐ বছরই মেস বিল্ডিংয়ের নির্মাণকার্যের আরম্ভ হয়ে গেল। আর ঠাকুর চৌদ্দ বাঁচে পড়া এই ছোটখো বিদ্যালয় ভবনের সামনের সমুদ্র পর্যন্ত জুড়ে আজ শুধু খোলাদ ও ঝাউবনের অপরূপ শোভা যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা হয়ে আছে।

ঘাট সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠনের কাজ চলছিল। একবছর সালে বাংলা বিভিন্নমের পাশাপাশি ইংলিশ বিভিন্নমেও ক্লাস নেওয়া শুরু হল। এবং এই বছরই খোলা হল স্কুলের জুনিয়র সেকশন (সিক্স, সেভেন ও এইট)—রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। দুটি ইউনিট (তিনটি ক্লাস—সিক্স টু এইট—নিয়ে এক-একটা ইউনিট গঠিত) নিয়ে বাংলা বিভিন্নমে জুনিয়র সেকশনের ক্লাস শুরু হল বর্তমানে সিনিয়র সেকশনের হোস্টেল সারদানন্দ ভবনে।

সারদানন্দ ভবনে জুনিয়র সেকশনের বাংলা ইউনিট দুটির পাশাপাশি স্কুলের মেস বিল্ডিংয়ে ইংলিশ বিভিন্নমে আর একটি ইউনিটের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। পরের বছর (১৯৬২) জুনিয়র সেকশনের আর একটি বাংলা ইউনিট বাড়ানো হয়।

এখন জুনিয়র সেকশনই হয়ে উঠল সিনিয়র সেকশনের ছাত্রাবাসাবাসকারীর মূল-কেন্দ্র। কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষকরাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মোল উদ্দেশ্য হওয়ায় হায়ার সেকেন্ডারীর উচ্চ চাপসন্তুলিতে ধরের ছেলেদের সেকেন্ড ব্যাচের ছেলেদের তুলনায় অনেক খারাপ হয়ে পড়ল। কারণ অবশ্য স্পষ্ট। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যেখানে প্রাথমিকীকরণ খারাপ সেখানে হায়ার সেকেন্ডারীতে বেশী ছেলে দেওয়া হয় ডিভিশন উন্নয়ন এই অসন্তুষ্টিটুকু কর্তৃপক্ষের নজর এড়ায়নি। তাই প্রথমটি সালে সিনিয়র সেকশন ও হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল দুটি যেমনভাবে, তবে খুব ধরে পড়ে উঠল অবশ্যের ছাত্র-কৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়। হায়ার সেকেন্ডারীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই জুনিয়র-সেকশনের পঠন-পাঠনে প্রয়োজনীয় পরি-বর্তন ঘটানো হল। সেই সঙ্গে জুনিয়র সেকশনের ক্লাস এইটটি জুড়ে দেওয়া হল সিনিয়র সেকশনের সঙ্গে। সিক্স-সেভেন নিয়ে গঠিত জুনিয়র সেকশন উঠে এল তার নির্দিষ্ট ডেরালা নিজস্ব ভবনে।

এরপরের বছর বছর যেমন স্কুলের শিক্ষক শাখা ও ইউনিট বেড়েছে তেমনি শিক্ষকদের ঐকান্তিক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে থেকে অসংখ্য ছাত্রদের নজির রাখেও পড়ে তুলেছে। একবছর সালে স্কুলের প্রথম-ব্যাচের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য পড়ানো

হিরণ্ময়ীদেবীর পাশে দাঁড়াইল। বাবাইটের পাশের শরতদা হাত পূর্বাহ্নের তুলনায় লম্বমান আর হলেও ঐ সময়ই ফ্রেঞ্চিকিকলম স্টাইলে পরম এ এক্সিবিশনারের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এই স্কুলের ছেলেরা। ফেবারি পাশের শরতদা হাত ছিল হিরণ্ময়ীই। পরবর্তী ৫ বছরে এ স্কুলের কোন ছেলে হাজার মেকেন্ডারী পরীক্ষায় ফেল করেনি। শুধু যে ফেল করেনি তাই নয় ৫ বছর ধরে স্টাইলে ফোর্থ ফোরগুলি ছেলে স্টার্স করেছে হায়ার সেকেন্ডারীতে।

পরীক্ষার ফলাফলে শুধু নয়, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আবৃত্তি, বিতর্ক, অঙ্কন ও আরো প্রতিযোগিতায় বহু বহু ট্রফি পুরস্কার ঘরে নিয়ে এসেছে এই স্কুলের ছেলেরা। অবসরবিনোদনের পাশা-পাশি পুরোদমে স্বাস্থ্য চর্চার আয়োজনও করেছে স্কুল। সমাজের জিমন্যাসিয়াম নয়, যারা রীতিমত অনুশীলন করে। তবু ঘরে যে তার প্রমাণ মিলবে বহুবার, সাঁতার ও সেলাইংয়ের সিনিয়র আসরে। উপরন্তু অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে এই স্কুলের ছেলেরা তিনটি মেডেল ঘরে নিয়ে এসেছে।

যারা প্রশ্নকরে জেনেছে, জল নিয়ে পড়াশোনা করবে, এই তো সবার কাজ। কিন্তু সাঁতারকাদের জল-ত্রাস নিয়ে এ দুটি কাজ করার মত সুযোগ বা পরিবেশ কি জোটে আমাদের ছেলেদের? এদেশের কটা স্কুলে ছেলেরা খেলার মাঠে, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আরামাদের বা পড়াশোনার সর্ব-সুবিধাযুক্ত পরিবেশ পায়? এ বিষয়ে প্রশ্ন-কুশল বিদেশ বিভাগের প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় জানিয়েছে যে এসব সুযোগই তারা পেয়েছে। সম্পূর্ণ আবাসিক এই স্কুলের ক্লাস রুমের জানলা থেকে দু-দুটি বড় বড় বিল্ডিং। এ ছাড়া আছে বর্ণাঢ্য ছোটমাঠ। খানকয়েক ছোট-বড় খেলার মাঠ। সাঁতার শেখার উপযোগী প্রশস্ত জিল। আছে স্কুলের দুটি মেডিকেলের অফিস দুটি পরিচালনা। আছাড়া আছাড়ের সাইকিল হাজার খাঁচের বিশাল কেন্দ্রীয় পাঠাগারের সুবিধাও সবসময়ই ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত। আছাড়ের বিশাল হাসপাতালে ছাত্রদের চিকিৎসার সুব্যবস্থাও আছে। এ সবই হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও জনসাধারণের সাহায্যে ও সহযোগিতায়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে স্কুলে প্রশ্ন অধিক অভাব দেখা দিয়েছে।

সেই অভাবের কথাই সেদিন স্কুলের স্কুলটির বর্তমান প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ অমৃত চিত্তরঞ্জন জানান। একটি মাত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে সদা হিন্দিভাষী কেন মুখোপাধ্যায় এ আটি উপলব্ধি করিনি। এতদিন পরিচালনার চিত্তটি পদে মোহনদা অধিকাংশ শিক্ষিকা বাঙালী ছিলেন। স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী সকলের কাছে মুখ মহারাজ নামে পরিচিত এই মানুষটি নাম পর পর দুবার এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর আগে আরো পাঁচ পাঁচজন মেডেলপ্রাপ্তির এই স্কুল পরিচালনা করেছেন। পূর্বসূরীদের পরিচালন ঐতিহ্যের সার্থিক ইতিহাস মুখে মুখে বর্ণনা করে স্কুলের আর্থিক প্রসঙ্গে এসে মুখ মহারাজ বললেন, আমাদের ছাত্রাবাস্থ মাসিক বেতন একশ পনেরো টাকা (ইংরিজি বিভিন্ন হলে এই কি আরো পনেরো টাকা বেশী)। এই টাকার মধ্যেই স্কুলের ডিটেনশন ফি থেকে বোর্ডিং চার্জ সব ধরা হয়েছে। আর সব ছাত্রদেরই এই ফি পুরোপুরি দিতে হয় না। অথচ শরতদা আশীজন ছাত্রই ফুল-বেতন পেত, বর্তমানে সরকারী সাহায্যের বদৌলতে আটি ছাত্রদের স্কুলের সামর্থ্যের পূর্ণাংশ সীমিত হয়ে এসেছে। তবু শরতদা পাঁচশ ভাগ ছেলেমেয়েই আসছে ফুলবেতনে নিয়ে।

ফুলবেতন-উপবেতন বিয়ে বছরে অন্তে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা ছাত্রবেতন থেকে আসে। আর বছরের পাঁচশাল? অন্তে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা। এই বিপুল ঘাটতি এতদিন মিটিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুধু থেকেই এই স্কুলটি সরকারী অনুদান পেয়ে আসছে। স্কুলের কর্মসচিব-মণ্ডলীর অবশ্যই যাদের প্রধান অংশ বহন করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার তুলিয়েছেন সৌমাদ্দিক অন্তের সিংহভাগ। এইজন্য স্কুলের ছেলেমেয়ে অনুরাগী আলী-বিদেশীদের শিক্ষক মাইনে পাঠান। কিন্তু গত দু বছর ধরে ইদানিং সরকারী অনুদানের পরিমাণ কমে যাওয়ায় স্কুল পড়েছে প্রচণ্ড বিপদে। গত দু বছরে প্রায় আশীজন ছাত্রের টাকা সরকারী সাহায্য কম পেয়েছে স্কুল। ফলে প্রায় লাখখানেক টাকার কম আয় স্কুলের ঘাড়ে এসে পড়েছে। অথচ মেডিকেলের কোন পথ খোলা নেই স্কুলের সামনে।

স্কুলের এই অবস্থার মধ্যে যা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে অবশ্যই অবাধিত অঞ্চলের ছেলেরাই। এখানে পড়ার টু মানেই মিশিও-মেয়ের সব ঘরেরই ছেলে পড়তে আসে। তবে ছোট ছাত্রদলের পড়ুয়া পাঁচশালীরাই আসছে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। যেখানে অভিভাবকদের গড় আয় বছরে চার-পাঁচ হাজারের বেশী নয়। আর এই স্কুল তো সাধারণী-সাহায্যেই এতদিন চলেছে। কিন্তু আজ যদি সরকারী সাহায্যের হাত ক্রমশ কমে আসে, তাহলে আমাদিনের অনিশ্চিতদলের ছাত্রদের অন্ত-বেতন দেওয়ার সামর্থ্যও কমে আসবে। ছাত্রদের সংখ্যা তো কমবেই। তখন তখন পরিচালন-ভার মেডিকেলের জন্য ছাত্রদের বেতন-বহুলতা আরো আরো বেশী-বিশাল পথ স্কুলের সামনে খোলা রইবে? সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রেরা আরো একবার এই স্কুলে পড়ানোর সুযোগ। নিশ্চয়ই তা আমাদের আশা নয়।

আশিলক্ষ কিলক্ষ শিক্ষার মাঝারে এই ছোট ওয়েলিংটনদের আজো ফুল ফোটে, ফল ধরে, জীবন এখানে চঞ্চল। এই আমার ও'বিদের ছোট সাম্রাজ্যের মধ্যস্থানে চতু-দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদিনের ঘরে ঘরে আমাদের ছোট-আমার। এই স্কুলটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত না করে এই আমরা অন্ত উঠুক শত সহস্র বিলাসের এদেশের সমাজে সমাজে, গ্রামে গ্রামে, জনজীবনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে।

স্কুলের বছরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ট্রাস্টদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি জায়গার মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যেটুকু অভিজ্ঞতা সেদিন অর্জন করেছি, নিশ্চিন্তে বলব, ভুলনা তার নাই। শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা যদি হয়, চরিত্র গঠন, তাহলে এই স্কুলের তুলিকা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সার্থক। তাহলে মনে আশিবর্ষবর্ণনির্বিশেষে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ পড়ে তোলাতেও স্কুলের অবদান অসামান্য। ছুটির ছুটির মধ্যেই মনে হচ্ছিল যে এই বিশাল ভারতের ভাবসংহতির জন্য যুক্ত হয়ে উঠেছে এই স্কুল। সর্বস্তরে সমাজের আধুনিক ভবিষ্যতের জন্য এই অবদানের।

আর এই পরিচালনের দুরূহতার ভারমুক্ত হবার জন্যই কি বিদায় নিলেন ইন্দ্রজিৎ অমৃত?

—শশিবন্ধু

পত্রে সংবাদঃ বালিকাদের দুটিদের অভিজ্ঞানের স্কুল।

সকল অমৃতে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

ফেলবার সময় 'অমৃতকামনা' এই সব বিক্রয় কেন্দ্রে আসবেন

অমৃতকামনা টি হাউস

৭, চৌরঙ্গী স্কোয়ার (নীচে)

২, লালবাজার স্ট্রীট (দ্বিতীয় তল)

৪৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (দ্বিতীয় তল)

ও পাইকারী ও খুচরা অমৃতকামনা চায়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ও

অবিরাম চিন্তার মিছিলে

একটি প্রশ্ন ॥ শক্তিপদরঞ্জন বসু

সে কোনো কাজাই নয়,
হিসেবটে পাখির মতো
রাখ করে চলে যাওয়া
অথবা পালানো।
চারদিকে চৌকিদারি চোখ,
কোথাইবা রাখা নিরাপদে
হাতে পাওয়া সহজের পুতুলে?
সেইতো বিষম জ্বালা।
সমুদ্রের পদ্মাতের মতো দৃষ্টি
ঠিক যেন তীক্ষ্ণ বর্শাফলা।
আর কতো বিদ্ধ হবে
নির্বাক দাঁড়িয়ে?
অন্যের আঘাত থেকে
তোমাকে তো বাঁচতেই হবে।
চোখ-ধাঁধা-করা রূপ
রাজপথে মিয়ন আলোয়,
সে আলোর ছায়াপাত
অনায়াসে লাবণ্য খেয়ায়
তোমার হৃদয় ছুঁয়ে
অবিরাম চিন্তার মিছিল।
সেতো আর কিছু নয়,
জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন:
অসম্ভব মৃত্যুর সাধিনী।
পরিষ্কার স্বীকারোক্তি চোখে,
মরা তো সহজ—
বাঁচার মতন বাঁচা অনেক কঠিন।
সে বাঁচা কি কখনো সম্ভব,
যাদের তিন ঘরে
যেইখানে থাকে তেরোজন
সেখে ও পুরুষে?
তেমনি করেই এক স্বপ্নপথ খুঁজি,
তোমার চিন্তার প্রশ্ন—
ঐ রাজভবনেতে কজন ঘুমায়?

এমন মোরগ কি নেই॥ পল্লব গুহ

কণ্ঠনালে বেঁচে আছি, দ্বারজিত আমিষ
মুখে মাছি পড়ে আর গন্ধ ছুঁয়ে ঘেন্না উঠে যায়
কখনো কখনো মুখে দেবতার মতো হাসি
কখনো অশ্লীল ভাবে তার মুখে দোষ মেখে ওঠে
এরকমই কেটে যায় স্বপ্নহীন সততাহীন দিন
ঘুনে ধরে ধরে আসে
বিবর্ণ রক্তের স্রোত হৃৎপিণ্ডের তীর ছেড়ে ঠান্ডা ভিতরে
মনে পড়ে আলসেতে মা-ঝরা শালীর মুখ ভোমরাকীর্ণ
উদ্যান আঁধারে
শিশির ঝরার শব্দ ধানের শীষের কাঁকে
প্রতীক্ষিত সিঁদুর ফোটার
জীবনের আশা উঠে কখন যে বেলা পড়ে যেন্না
মনেও পড়ে না, মা—মনে করা অসম্ভব তোমায় কখন আমি ভুলে
ভুলে ভুল বলে ফেলে দিয়ে এসেছি অথবা
মনেও পড়ে না যাই
সোনালুর ভেবে কেন শহীদ মেনার মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছি

অথচ এমন করে জীবনের চালচিত্র আমার
কথা তো ছিলো না, কেন মনুষ্যে না ফুরাতে এলো
জীবনে শীতের ডিম মেয়ে
নিজেকেও ভালোবাসা জীবন বিরাজিকর মনে হয়, হায়
আইনাট্রি মহিলার মুখে চোখে থেকে
কেমন নিজের প্রতি ঘেন্না হয়, আমি
কী রকম যেন হয়ে গেছি, কেমন ভয় ভয় লাগে বুঝি
ঠুঁটো হয়ে সবকিছু কেমন হয়ে যাবে
অথচ এমন করে জীবনের চালচিত্র
আমার কথাই ছিলো না, কথা ছিলো
পাখীরা ডাকবার আগে ঘরের ভেতর থেকে
সবাইকে ডেকে তুলে দেবো
এমন মোরগ কি নেই আমাকে আগিয়ে দেয় যাত্রিকের দিনে?

নিজের হারায় খুঁজি

অতীন্দ্র চৌধুরী

(১১)

নতুন বাড়ীতে এসে আমার সর্বাধিক যেটাই সুবিধা হলো তা হলো চলে। বাড়ীটি ছোট হলেও আমার কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি পড়লো। তার ওপর মেহেরবাবুর মত একটা প্রতিবেশী পাওয়ার আমি একরকম নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

তবে মাঝে-মাঝে ঔষ্টার্ভিচ্‌এর কথা মনে পড়তো। শুধু যে বাড়ীভাড়ার চারশ'টাকার হিসাব-নিকাশের এসব আমার পক্ষে তো ছিলই সম্পূর্ণ নতুন জিনিস হয়ে এই বাড়ীর সৃষ্টি। শুধু সৃষ্টি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার জড়ানো আছে। এখানেই আমি মাইক্রো অপারেশনের বদিও অনুকরণেই তার বিকাশ ঘটলো। আমার এইখানেই পারিবারিক জীবনে এক নোতুনের সূচনা হতে পারতো, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় সাংঘাতিক কিছু ঘটে নি, সবাই বেঁচে গিয়েছিল। এইসব আজও সেকথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে।

বেশ মনে আছে একদিন রাতে অফিস-ফেরত বাড়ী ফিরছি বিকল্প করে। রাত তখন এগারো-সোয়া বারো হবে। বাড়ীর সামনে এসে পড়েছি, আর একটু এগুলেই হতাম। হঠাৎ লক্ষ করলাম মোতলার একটা ঘর থেকে আলোর সারা বেরুচ্ছে। অন্যদিন যা হয় তখন সে রকম বোঝা হয় সেইরকম বোঝা।

দেখে তো চমকে উঠলাম। রিকসা-ওয়ালাকে ভাড়া দিলাম। তাড়াতাড়ি চললাম। সে রাত্রিবেলা দুত্ত এসে কটকের কাছে দাঁড়াল, বাড়ি তাকিয়ে দেখলাম মোতলার যে-ঘরে সুবীরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শোয়, সেটাতে সেই ঘর থেকেই বেরুচ্ছে।

সর্বনাশ! দারোয়ানকে ডাকলাম—সে ছোকরা ঘুমিয়ে পড়েছিল এ ব্যাপারের কিছু-বিসর্গও আমাকে পারি নি। সে দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরে ছুটলাম। বসবার ঘরে গিয়েই সুবীরা এসে রুদ্ধ স্বরে বলল—ওপরে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

—কী ব্যাপার?

সুবীরা যা উত্তর দিল তা শুনে মুহূর্তের এই—সুবীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কি ঘুম-ভাঙ্গা এবং ধোঁয়া অনুভব করে ছেলে উঠেছে। আগেকার দিনে রন্ধ ভাড়াবার জন্যে যে সোডাওয়ার হুপ পাওয়া যেত তাই জানলা দরোজায় রন্ধ ভাড়াবার জন্যে। তারপর কিভাবে সেই অজ্ঞান হুপের সঙ্গে মশারীর এক প্রান্ত জড়িয়ে নিয়ে ওপরে ওঠে যায়।

তাড়াতাড়ি অনুজেলী নিয়ে মেলোছিল অবশ্য কিন্তু ধোঁয়াটা তখনও বেরুচ্ছিল আর তাই রাস্তা থেকে দেখে অমল ভীত, চকিত হয়ে উঠেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, একটা দুর্ঘটনাই ঘটতে যাচ্ছিল আর একটু হলে।

এই ঘটনার জন্যেই ঘোষদের ঔষ্টার্ভিচ্‌এর বাড়ীর কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

ঔষ্টার্ভিচ্‌এর বাড়ীতে ভাল লাগার মতো যে ছিল তিন ভাগিনেয়ের এ বাড়ীতে অবশ্য সে সব কিছু নেই। সারা নিস্তব্ধতায় ও স্তব্ধতা। বিরোটারের কাজে বাড়ী, লোক-জনের ভীড়ে সুতরাং সুবীরাকেও আর উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

কিছুদিন এই শান্ত নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রার পর হঠাৎ আবার একটা অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হল। আমার নিরুপদ্রব জীবনে হলো ঔষ্টার্ভিচ্‌এর। একজনের দিনে ঔষ্টার্ভিচ্‌এর মাসা ওষুধ বেরিয়েছে, চেয়ে আর তেমন তার পায় না। কিন্তু তখনকার দিনে 'ঔষ্টার্ভিচ্‌' শব্দটাই ছেলেদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করতো।

অনুর ঔষ্টার্ভিচ্‌এর ভীতিবেলী মেহেরবাবু যা করেছেন তার তুলনা হয় না। এক সেজন্য তিনি আমাদের করতেন না হলে মেহেরবাবু যান না। এ বাড়ীতে এসে তিনি অনুকে কোলে করে সারা রাত বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান তাঁহার রহিত হয়। নিজে ছিলেন একজন ভাল হোমিওপ্যাথ। যাহাদের পুরুষী পেয়েছিলেন তার কি। অনুভেলাকে একজন ভাল হোমিওপ্যাথ ছিলেন। অনুর এই অনুখে আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে গিয়ে পড়লাম। আমার খুব মনে পড়ছে সারা অনুরোধবরে ভরা — মহাবাবু নিস্তব্ধের ঘরের — একটু সাবধানে থাকাই উচিত।

হাঁ, যা বলছিলাম। একটি নিয়ের কথা মনিয়ে যেন মনে আসছে। সকালে কী একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে ছিলাম। ফিরে এসে দেখি মেহেরবাবু অনুকে কোলে করে ঘরে মনে আছেন, আমাকে দেখেই উনি একটু আশ্বস্ত হয়ে মনে উঠলেন—একেবারে যাব? এদিকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকার দরকার।

—ডাক্তার? কেন?

উনি বললেন—অনুর জ্বরটা বেড়েছে। আমি ভাল বোধ করছি না।

আমি তো বিশ্বাবিক আমলুম্বা হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম ডাক্তারের বাড়ী। ছুটতে-ছুটতে একেবারে ডাক্তার আঁকড় ঘরের বাড়ী আমি নিয়ে একেবারে মোতলায় নিয়ে ডাকাডাকি আরম্ভ করলাম।

ডাক্তারবাবু তখন স্নান করতে যাচ্ছিলেন—আমাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার? আপনি?

বললাম—আমার বড় বিপদ। ছেলের অনুখ, আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি যে এইমাত্র ফিরলাম, স্নান করতে যাচ্ছি যে।

আমার মনে হল যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি অনেক অনুনয় করে বললাম—দেখুন, ছেলেটা খুব সিরিয়াস। এখুনি না গেলে তো অনুকে বাঁচানো যাবে না। হলে আমি অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলাম।

ডাক্তারবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝলেন। বললেন—আচ্ছা তাহলে একটু, আমি যাচ্ছি। বলে তিনি আবার স্নান ঘরে গিয়ে তখুনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। আমি হাতে মিলার ডাক্তারী ব্যাগটা। মুখে তখন মাথার ওপর তাকিয়ে পাখিদের দিকে চলে পড়ছে—ডাক্তারবাবুর স্নান-আহার-বিশ্রাম কিছুই হল না।

বাড়ী পৌঁছে অনুকে ভাল করে দেখলেন, তখনও দেখি মেহেরবাবু অনুকে কোলে করে বসে আছেন। তাদের বয়স তখন বড় পাঁচের হবে।

ব্যাগ থেকে ইনজেকশানের সিরিঞ্জ বের করে অনুকে একটা ইনজেকশান দিলেন এবং বসে রইলেন এই ইনজেকশানের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে। ঘণ্টাখানেক বেশ ভাল ছিলটে পর্যন্ত বসে রইলেন, মেহেরবাবুও ব্যাগার-খাটার ভুলে বসে রইলেন ইনজেকশানের 'এফেক্টটা' দেখবার জন্যে। ঘণ্টাখানেক আর একটা ইনজেকশান দিলেন।

তার পর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ঘণ্টাখানেক আর একবার ভাল করে দেখলেন, দেখে বললেন—হ্যাঁ, এইবার আর ভয় নেই, আমাকে আর থাকতে হবে না।

বেলা তখন প্রায় চারটে। উনি একটা কাগজ নিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—ওষুধটা এখুনি আনিয়ে নিন ডাক্তারখানা থেকে। ওষুধটা আনার পর থেকে আমার আর দেখতে।

চলে গেলেন উনি।

ডাক্তার অনুকে এই বিপদজনক পরি-স্থিতিতে সুবীরা সমস্ত রাত অমানুষিক ধৈর্য নিয়ে বিরোধিল, আজিও আছে। বাই ছোক

ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্টি। তার গলায় ছিল সুরের ঝঙ্কার। সে ছিল একাধারে সুরকার, গায়িকা ও সুরশিল্পী। তাঁর 'সলো-পার্টি' নিয়ে একখানি রেকর্ড শীঘ্রই বাজারে বেরোবে। শুধু গায়িকা হিসেবে নয়, সুরকার হিসেবেও তিনি অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এইভাবে ছোটো পরদায়, ছোটো পরদায়, শচীন সুরের এমন কি অন্যের গানও অনুকূল হয়েছিল। ছবি শেষে যখন বিদায় নেবার তখন হলে তারি সুর। কিন্তু তখনকার সময় সব বিষয়েই ছোটো ছোটো।

এই সময় সিনেমা-জগতে এল এক বিরাট বিস্ময়। ছায়াচিত্রকে কথা বলা বা গাওয়ার সুযোগ। ছবির 'টকি' হবার খবর বিশ্বে এসে পৌঁছে ভারতে এসে পৌঁছল। কিন্তু তখনকার সময় সব বিষয়েই ছোটো ছোটো।

এই সময় সিনেমা-জগতে এল এক বিরাট বিস্ময়। ছায়াচিত্রকে কথা বলা বা গাওয়ার সুযোগ। ছবির 'টকি' হবার খবর বিশ্বে এসে পৌঁছল

আর একটা বিষয়ে আমাদের উভয় পক্ষে উৎসাহ ছিল—সেটা হল রেডিও অর্থাৎ বেতার মাইকে গানের অভিনয়। রেডিওতেই অভিনয় হত পাক্কা তিন ঘণ্টা। প্রতি শুক্রবার এই অভিনয় হত। আমাদের জমাটির ছিল তখন এই বেতার মাইকে গানের অভিনয়। ইদানীং সেসব রেডিও মাইকের ত্রিসীমানায় যেতাম না, কিন্তু সেকালে ছিল তার ঠিক উল্টো। প্রতি শিল্পীসংঘে অবসরকালে ঘিরে হাজির হতাম। সেদিনের কথা লিখি যি। তখন 'বেতার মাইকে গানের নাট্য-পরিচালক ছিলেন হীরেন বসু, পরে এলেন হীরেন-কৃষ্ণ দত্ত। এই হীরেনবাবুই পরে রেডিওতে এক সময় একচেটে প্রোডিউসার হয়ে পড়িয়েছিলেন মাইকের। যাই হোক, তখন যে 'পালা' আমরা রেডিওতে অভিনয় করেছি তার সেসবকথাটি লিখি, নেই।

এইভাবে প্রায়োজনের রেডিওতে অভ্যাসের ফলে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। এইভাবে প্রায় সেসব ফেব্রুয়ারীর আগমনে আলাপ হয়েছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়ক কে মল্লিকের সঙ্গে।

মল্লিকটি ছিলেন অত্যন্ত সমাজসেবী এবং বন্ধুবৎসল। মনের মতোন এঁর মুখে অপূর্ব সুন্দর সোনার। সোনায় বাঁধিয়ে যেকোনো সময়ে 'দাসখৎ লিখে দিলেও হার' স্বীকার না করে সমানে—প্রবৃত্তি যার অনাবাসন অর্থাৎ হয়েছিল।

আগেই বলেছি, মনের মাঝ-গগনে যে মল্লিকের কণ্ঠে যে সকল কথা উঠেছে, তা যেন মনের মতোন কথাই সম্বল। প্রায়োজনের ফেব্রুয়ারীর ত্রিসীমানা-মুক্তি প্রায়োজন করবার ওপর খুব বিশ্বাস করতেন তিনি। একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা মল্লিকমশাই, গলায় এত গয়না পরেন কোথায়?

উত্তরে মল্লিকমশাই বলেছিলেন, মনের মাঝ-গগনে গয়না যদি না থাকবে, তবে সে-গান গাওয়া কেন। সবই ভাবের ইচ্ছে।

সত্যিকারের গানবিলাসিক ছিলেন মল্লিকমশাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা, তাঁর বাড়ি ছিল কর্নওয়ালিস প্লেসের এক মেসেনজার-প্রধান গ্রামে। সেখানেই তিনি সঙ্গীতের সাধনা করতেন। হিন্দুর সেবা-সেবী ছিলে মাঝ-গগন করতেন, কিন্তু এ নিয়ে কেউই আপত্তি করেনি।

এই রিহার্সাল, রেকর্ড, রেডিও নিয়ে দিনগুলো আনন্দেই কাটছিল। তারপর ছিল ঠিকই পর্ব। চা-পানও মোটামুটি মন্দ আসছিল না।

এঁদের-ওঁদের অনেক কথা বলেছি। আসল ছিলে আসছি মিনার্ভায়।

আমি যখন স্টেজে ছিলাম, তখন মাঝে-মাঝে ভূপেনবাবু আমাদের একটি নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছিলেন। আমরা মন্দে পড়িনি, একবার চোখ বুলিয়ে ছিলাম মাত্র। ভূপেনবাবু আমার অভি-

শিক্ষা মনে যে যাই ছিল, তাতে 'ভাব আসা' মাত্র একটি আসর আসরে ঘিরে লিখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে আছে, একদিন ভূপেন-বাবু আমাকে 'এ আর আর কী লেখা' বলে একটি একাঙ্ক নাটকের লেখা আমার ঘিরে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

অভিনয়মঞ্চে বসে উঠেছিলাম, লেখা ফিরিয়ে দাও দাদা, নাটকের দরকার নেই আমার।

একথাটি আমাকে অভিমান করে বলে-ছিলাম, তোমাকে আমি রাজনৈতিক নাটক দিই।

সত্যি লেখাটা এমন, লেখাটা নাটকের পাণ্ডুলিপি বলা যায় না পড়লে, এটাই ভূপেনবাবুর আশা। যাই হোক, আমি পাণ্ডুলিপি আমি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে-ছিলাম, দাদা—আমি আর লিখে থাকতে পারি না, মিনার্ভায় আছি। কথাটা কিন্তু এখন আইকে বলবেন না। সেই জন্যে নাটকটার রেডিও আর দিতে পারিনি। তবে লেখাটি।

মিনার্ভার সঙ্গে ভূপেনবাবুর যোগাযোগ আজ নেই। ওঁর লেখা স্টেজরাইটের স্বত্বাধিকারী এক সময় মিনার্ভার খুব আর করেছিল। সেজন্যে চিত্তরঞ্জন দে-অফিসের লেখাপড়িতে ১১২২ সালে মিনার্ভা পুরো আসর আসে। নাটক সম্পর্কে খুব উঁচু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন দেশবন্ধু।

এই আলোচনা নাটক রচনার দেশবন্ধুর প্রেরণা পরোক্ষে কাজ করেছে; আর সে-কথা ভূমিকায় লিখেছেনও ভূপেনবাবু।

নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, স্টাইলের দিনের আগের পুরোনো সমাজী নাটক আলোচনায় যেন পুরোনের মতো একটি চরিত্রের অবতারণা করি।" বহু-চরিত্রের প্রথাই নাটক লিখতে আরম্ভ করি। তখন ইহার নামকরণ হইয়া-ছিল 'পুরী-যা কি পুণ্য'।

এই নাটক/ আমা করে তাঁর প্রথমে স্টেজেই অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভূপেনবাবু লিখেছেন—"পাণ্ডুলিপিটি আমার পড়া আলোচনার আমার হস্তান্তর হইয়াছিল। পুনরায় হস্তগত হইলে উহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া নাটকের নামকরণ করিলাম 'সপ্তপুলিকা'।

এই 'সপ্তপুলিকা' দেবেন্দ্রনাথ উৎসব মিত্রমশাই ছিলে রেখে বিরোধিলেন সুযোগ-মতো করবে অভিনয়ের বলে। কিন্তু করবে নামাতে অভিনয়ে কেউ যেন অনেকটা ঘনের।

আমার মিনার্ভার থাকতে নিয়ে আগ্রহ ছিল ভূপেনবাবুই খুব বেশী।

একদিন প্রথম সাঁঝেতে বসে মিনার্ভার সভ্যের সভায় যেখানে। রেকর্ডের (মধ্যে) পাইয়ে আসল ছবি নেইখানে, টাকাকড়ি নেইখানে। এই ধারণাটি প্রতিদিনের মধ্যে প্রবেশ উঠেছিলাম। পাশে বসেছিলেন ভূপেনবা। আমার মতো উনিও মেজাজে যে, অনেক বলার উপলক্ষের আলিন্দের সব সাঁই টপকে সাধারণ সাঁঝেতে চলে এলো—এক-ঘরে আমার পাশেই। একদিন আসলেও সে

ঘরেতে ঘিরে ভূপেনবাবুকে আলাপ—এ ঘরে পাশে বসেছে—সেই যা আমার আসল ওপরই চেপে বসে।

ভূপেনবা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

আলাপ—মিনার্ভার আসর যে কি ভয়ঙ্কর সেটা সেদিন বুঝে। আমি যে এখানে এসে ভরসা কি করবে পারব আমি না।

ভূপেনবা আশ্বাস—ভয় নেই, ঘরে ঘুরি এসেছ। আসর তো এখনো বসছেনাম হয়, সেজেগুজে সব নিজের ঘরের ঘর করে থাকে সেসে।

কথাটা মিনার্ভা ছিল তখন ঘরের মধ্যে স্বাধিকের আসর। এই ঘরের পরিবেশ দেখে আমার ভয়টা খুব খুব করতে লাগল, আর সেটা খুব অন্তর্যামিকও হয়। সে-সময় ভূপেনবা যদি আমাকে সেসবের উৎসাহ না দিতেন, তাহলে সেদিনই আমার মিনার্ভার আসা নিয়ে উৎসাহ সেখানে মিলা সম্ভবই।

আরও একটা বিষয়ের কথা মনে পড়ে। মিনার্ভার যেদিন প্রথম যোগদান করতে এলাম, সেদিন উপেনবাবু যখন আমার ঘরের ওপরের ঘরের দরজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনার ওপর বসলেন খুব আনন্দ করে, তখন সঙ্গে যাঁরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভূপেনবাও ছিলেন।

উপেনবাবু বললেন—এই হলে আপনার ঘর। এইখানে বসবেন, বিশ্রাম আরাম, রোজ-আসা করবেন।

তা হলো হল, কিন্তু এদিকে আরেক মহা এক বিপদ। এই ঘরখানার বসবার তখন-কার মিনার্ভার আর্টিস্টদের পরনে বন্ধ বলাই। মিনার্ভার তখন তাঁর প্রতিপত্তি প্রচুর। তিনি ঘিরে উপেনবাবুকে বললেন। উপেনবাবু বললেন—যা, এ-ঘরে আর্টিস-বাবুই বসবেন। আপনার মতো যাঁরা একটা ঘর নিজ করে বিরোধি—সেইখানে আপনি বসবেন।

এরে পরেনবাবু যেন কথাবন্ধ হয়েন। সম্মানে যা সম্মানে ঘিরে আমি না—তিনি অভিমানমঞ্চে মিনার্ভা ছেড়ে ছিলেন।

ঘরখানা খুলে আমি যেন একটু উৎসাহ হয়ে উপেনবাবুকে ঘিরে বললাম—ব্যাপারটা কিরকম হল আমিও এখন আর উনিও ছেড়ে চলে গেলেন?

উনি একটুও না ভাবছে বললেন—ঠিক আছে। আপনি তো রইলেন। পুরনো ঘিনে আবার আছে। বন্ধুরা করতে চায়, তাও করিয়ে নেবেন। তার ঘরো লোক আছে। আপনি আর্টিস্টে-এর ভেতর ঘিরে নাটক করিয়ে দিন। ঘরের আসর নষ্টিই যা হলো। আর ভাববার কি আছে? এটা ঠিক যে, স্টেজ আসরের ঘরো দৃষ্টি ঘিনিস আছে—এর আর্টিস্টে আর এ ঘর সমস্যাসমার অভিজ্ঞতায়। তা আমার সমস্যার সমাধান সেই—আর্টিস্টে তো রইল।

মিনার্ভার আসবার সঙ্গে সঙ্গেই এই রকম একটা ঘটনা। বলা, কি আর বলা যাবে?

(ক্রমশঃ)

প্রথম ভারতীয় আই, এম, এস্

সূর্যকুমার চক্রবর্তী বাইবেল সুসমাচার ও ধর্মপ্রচার কার্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন। পিতা রামকমল চক্রবর্তী ছিলেন তখন আলমডাঙ্গা আইনজীবী। সূর্যকুমার মাত্র ছয় বৎসর বয়সে মাতা-পিতৃহীন হন। গ্রামে আত্মীয়দের কাছে মানুষ হতে থাকেন। তখনকার অভিজাত কর্মচারী এই ছাত্র এলে ইংরাজী আমার ' দ্বারা তিনি গ্রামের জমিদার হতে পারেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। তেমন বয়স তিনি ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা লাভের জন্য এই বয়সেই পলাতক ও লোকের কুশিক্ষার হল, সঙ্গে ছিল মাত্র নিজের মু-চালানো পরিচয়ের ও আত্মবল বিশ্বাসে বুদ্ধি, হিম্মৎ ও চাল। কৃষ্ণনগর তিনি স্থানীয় আলমডাঙ্গার মেজোকাকার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে আশ্রয় নেন ও স্কুলে পড়বার সুযোগ পান। ইংরেজী শিক্ষালাভের বিনিময়ে তাঁকে শিক্ষকের পরিবারের কাজ করতে হয়। স্কুলে বৃত্তি পাওয়ায় লেখা-পড়ার খরচটা বেঁচে যায়। সেখান স্কুলে শিক্ষা লাভ করে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন।

কলকাতায় মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ খৃ স্থাপিত হয়। এন্ট্রান্স পাশ করার পর সূর্যকুমার ডাক্তারী পড়তে যান হন। ১৮৪০ খৃ তাঁর ঐ বৎসরে ভর্তি হবার চেষ্টা সফল হয় নি — ডাঃ৪ সিভিলিয়ান ডি ব্যাসকলাশার তাঁর জন্য চেষ্টা করে-ছিলেন এবং মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিতে স্বীকার করেন। পড়ার বছর (১৮৪৪ খৃ) সূর্যকুমার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রেমটাঁদ বৃত্তিদের সাহায্য লাভে সক্ষম হন এবং কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে তিনি মাত্র এক বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একজন মেধাবী ছাত্ররূপে খ্যাত হন।

১৮৪৫ খৃ অন্যান্য বৃত্তিদের মেধাবী মেডিকেল কলেজের চারজন কৃতী ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করবার ব্যবস্থা হয়। তদ্ব বৃত্তিদের এই ছাত্রদের নির্বাচনের ভার পড়ে, সেখানে দান ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা এবং এদ্দেশ ছাত্রের দায় বহন করবেন বলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্টঅফ ডাইরেক্টর্স রাজী হন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বদেশের ছাত্রদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন এবং চতুর্থ ছাত্রের জন্য দীর্ঘদিনের নবাব বাহাদুর চন্দ্রে কলকাতার মার্চেন্টরা আর্থিক সাহায্য করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার সম্মত হওয়াতে এই বছর ১৮ মার্চ 'ওরিয়েন্টাল' জাহাজে ডাঃ বৃত্তিদ ও চারজন মনোনীত বাঙালী ছাত্র—তোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু,* গোপালচন্দ্র শীল ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী বিলাত যাত্রা করেন। (শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ও এই জাহাজেই ইংলণ্ড যান।) সমুদ্রযাত্রা সেকালে হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল এবং জাতি ও সমাজচ্যুত হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। এ অবস্থায় হিন্দু ছাত্রদের পক্ষে বিলাতে পড়তে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচায়ক।

লণ্ডনে চারজন ছাত্র ডাক্তার বৃত্তিদের বাসভবনে থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ, অধ্যয়ন করেন। অল্প কয়েক মধ্যেই তোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু ও গোপালচন্দ্র শীল এম্ বা সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (২২ জুলাই, ১৮৪৬)। দুই বৎসর পর এই ডিগ্রীলাভ পাবার উদ্দেশ্যে

প্রতাপচন্দ্র মোলদুস্ত

বসন হলে সূর্যকুমার চক্রবর্তী বৃত্তিদের মৃত্যুর সংবাদ লাভ করেন (১৭ মে ১৮৪৮)। ডাক্তারী ছাত্রেরা সকলেই মেধাবী ছিলেন এবং কলেজের নানা পরীক্ষায় পদক ও বৃত্তিদের প্রাপ্তি লাভ করেন। এই সূত্রে তোলানাথ বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় ছাত্র যিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি পরীক্ষার বৃত্তিদের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (১৮৪৭ খৃ)।

ইউনিভার্সিটি কলেজে সূর্যকুমার অধ্যাপক গ্রাণ্টের বিশেষ স্নেহ লাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে ফ্রান্স ও জার্মানী ভ্রমণের সুযোগ পান। এই সময়ে তিনি ফরাসী, জার্মান, লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৪৭ খৃ তিনি লণ্ডনের এম-বি ডিগ্রির প্রথম পরীক্ষা প্রথম বিভাগে ও ১৮৪৯ খৃ সেই পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই বৎসরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি পরীক্ষার প্রথম ডিগ্রিলাভে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

সূর্যকুমার কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় লণ্ডনস্থ মিশনারীদের

* দ্বারকানাথ বসু খৃষ্টান হিলেন।

সহায়তায় লণ্ডনে ডাক্তারী পড়তে যান তখন উপাধি পরিবর্তন করেন। ১৮৪৮ খৃ তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন বিশ্ব করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুরা বৃত্তিদ কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানান যে, ধর্মান্তর গ্রহণে সূর্যকুমারের সম্পর্কে সম্পর্কাতীত। তাঁরা চক্রবর্তী তাঁর পিতৃকুলের অন্যান্য বৃত্তিদের উপাধি আপনার নামের সঙ্গে যুক্ত করে 'সূর্যকুমার বৃত্তিদ চক্রবর্তী' এই নাম গ্রহণ করেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি এম-ডি ও লণ্ডনের রয়াল কলেজ অফ সার্জনসের ডিপ্লোমা এম-আর-সি-এস লাভ করে তিনি সূর্যকুমার বৃত্তিদ চক্রবর্তী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিলাতে তাঁর যোগ্যতা ও শুভানুধ্যায়ীরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা তাঁকে আভিজাত্যের মেডিকেল সার্ভিস-এ মনোনীত করেন এবং মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কলকাতার কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী হলেন না কারণ সেকালে এই চাকুরী (যা পরে আই এম এস নামে খ্যাত হয়) কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার, চক্রবর্তীকে আসাম-বিভাগের মেডিকেল সার্ভিসে এবং মেডিকেল কলেজের সহকারী চিকিৎসক পদে নিযুক্ত করা হয় (১০ মে, ১৮৫০)। ১৮৫৪ খৃ পর্যন্ত এই পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও মধ্যে বিশেষ ছুটি নিয়ে ইংলণ্ড ও দ্বিতীয়বার চিকিৎসক নিযুক্ত হয়ে যান। এই সময়ে লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ইউরোপীয়-দের পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। এই সময়ে পাওয়া তাঁর চক্রবর্তী মেডিকেল-কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করে বিলাত যাত্রা করেন।

এই পরিবর্তনের মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত হওয়া সূর্যকুমারের দীর্ঘ-দিনের ইচ্ছা। তখন দেশে ভারতীয়দের উচ্চতর পদ পাওয়া-অসম্ভব, তাঁর নিযুক্তিই ছিল তাঁর কারণ। বহু অধ্যয়ন এবং অনেক অনুরোধের পর এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন

(ডিসেম্বর ১৮৫৪)। এই সময় তিনি লেখেন—যদি আমি সফল না হই, তবুও আমার এই সান্ত্বনা যে, আমার সমস্ত ক্ষমতা আমার দেশের সেবায় জন্য নিযুক্ত করেছি। এগারো মাস ঘোরের পরিশ্রম আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং তিন পথ থেকে বঞ্চিত করেছে।

অতঃপর সুচিকিৎসক ডেসপতী ক্যাম্বিলমাস্টের মেডিকেল সার্ভিসের প্রথম প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দেন ৮—১২ জানুয়ারী ১৮৫৫ খৃঃ। এই পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে ডাক্তার ও ইয়োর লেখকদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তিনি সুচিকিৎসক ডেসপতী প্রথম হয়েছিলেন। এডিনবরা মেডিকেল জার্নাল পত্রিকার ৮ মার্চ ১৮৫৫ তারিখে রেজিস্ট্রার লে. ফ্রেসপতী ও সুইডেন ইয়োর ডাক্তারী প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং এজন্য ঐ পত্রিকা আমাদের এখানে নগরের অধিবাসীকে সম্বর্ধনা জানায়।

ডাক্তার সুচিকিৎসক ডেসপতী ২৪।১।১৮৫৫ তারিখে কন্সোলমাস্টের মেডিকেল সার্ভিসে আসিস্টেন্ট সার্জন নিযুক্ত হন। তিনি এই সার্ভিসে সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বে প্রবেশ করেন এবং তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সরাসরি উচ্চ-পর্যায়ের পদে যোগদানের যৌথ অধিকার অর্জন করেন। কোম্পানীর মেডিকেল সার্ভিস বা সিভিল সার্ভিসে তাঁর পূর্বে কেহও ভারতীয় প্রবেশ করতে পারেননি। খ্রীস্টোফোর-মাস ঐতুল সুবেদারদের নয় বছর পরে (১৮৫৪ খৃঃ) প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান হন।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর ডাক্তার সুচিকিৎসক ডেসপতীকে তাঁহার পূর্বে পদে (আসিস্টেন্ট সিভিলিয়ান) নিযুক্ত করা হয়। তবে শিক্ষানবীশ হিসাবে তাঁকে কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে এবং কোনও টেলাসনে কাজ করতে হয়নি। কারণ ভারতবর্ষে আসা-মাত্রই আসিস্টেন্ট মেডিকেল সার্ভিসে অধিনস্থ নিযুক্ত থাকায় তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট বিজ্ঞতা লাভ করেছেন এইরূপ বিশ্বাসের জন্য হয়। ফলতঃ তিনি মাসিক (২৪-১-৬৭ খৃঃ) ও মাসিক-ভেতন (১-৭-৭০ খৃঃ) পদে উন্নীত হন।

১৮৫৭ খৃঃ-থেকে ১৮৫৮ খৃঃ মধ্যে অনেকবার তাঁকে অস্থায়ীভাবে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও স্থিতীয় চিকিৎসকের কাজ করতে হয়। ১৮৫৮ খৃঃ তিনি স্থায়ী-ভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের পদ ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। ডাক্তার সুচিকিৎসক ডেসপতীই প্রথম ভারতীয় যিনি এই পদ লাভ করেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কলিকাতা নগরীর জাস্টিস অফ পিস্ নিযুক্ত হন। ঘরীয় সোসাইটী ও তিনি রোগতত্ত্ব ও মেডিসিনসের বাংলাদেশীয় শাখার তিনি আজীবন সভ্যশ্রেণিয়া এবং এক বৎসরের জন্য সোসাইটীর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

ডাক্তার সুচিকিৎসক ডেসপতী মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও চিকিৎসকরূপে খ্যাত হন। তৎকালীন ছাত্রদের লেখা বিবরণে জানা যায় যে, তিনি সুচিকিৎসালয় ছিলেন এবং ছাত্রদের ও অনুসন্ধিৎসুদের ক্লেশের চিকিৎসায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

কর্মজীবনে তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতাল—বিশেষতঃ কলেরা ও বসন্ত রোগের হাসপাতালে চিকিৎসকের কাজ করতে হয়েছিল। সকল অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন রোগ ও তদানিন্তন পরিবেশ নানা পরিবর্তন এবং প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্বিলার ও অনেক বা বিশ্লেষিত —এই দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করে মুখোপাধ্যায় প্রকৃত প্রস্তাবিত করেন। কলকাতায় (এবং ভারতে) ঔষধিজগতের অগ্রিম তিনিই প্রথম নিযুক্ত করেন—যদিও এই কৃতিত্ব সাধারণতঃ তাঁর চার ৫০-৬০ বৎসর পরের ফেলও ইয়োর লেখকের উপর আরোপিত হয়। অনেক রোগে বিশেষতঃ রোগের লক্ষণ—সম্বন্ধে ডাক্তারদের সাহায্যে তিনি বর্ণনা করেন; এসব ডাক্তারীদের মধ্যে ইনিই এ-বিষয়ে প্রথম। এছাড়া অপর অনেক বিষয়ে তাঁর বহু সময় লিখিত প্রবন্ধ রোগ ও বিষয়ের বিষয়ক চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডাক্তার ডেসপতী সুচিকিৎসক লিখিত বিশ্ব-চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তকের একটি সংস্করণ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

রোগ নিরাময় সম্বন্ধে তাঁর সুচিকিৎসক ডেসপতী বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজে সুল স্থাপনের কমিটীর তিনি সভ্য ছিলেন। সেকালে শিক্ষা-ব্যবস্থার ঔষধির উপায় সম্বন্ধে ডাক্তারদের বিশ্বাস-সমাজে তাঁদের ও নানা প্রকল্প প্রকাশে তাঁর বিশেষ অনুরোধ পূর্ণ হয়। তাঁর মতে ইউরোপের জ্ঞান দেশীয় ডাক্তার তৈরীর জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। সে-সময়ে ইংরাজী বাঙ্গের শিক্ষা অনুমোদন ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত যে-কোনও স্থানে ডাক্তার লিপ্ত হওয়া যায় এ-কথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ডাক্তারের উপর বিশেষ ঝোঁকের যার করা উচিত যাতে বঞ্চিত দেশ-বাসীর সুশিক্ষার পথ সুগম হতে পারে। স্বাস্থ্যিক বিস্তারেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল।

ডাক্তার সুচিকিৎসক ডেসপতীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ, লেখনী ও স্বাভাবিক সরলতা সম্বন্ধে সেকালের ইংরাজ লেখকগণ লিখে গিয়েছেন। তাঁর মেডিকেল সার্ভিসের কার্যকলাপ-সম্বন্ধে তাঁর সুচিকিৎসক ডেসপতী থেকে জানা যায়, তিনি সুপরিচালক ছিলেন। তাঁর যে কয়েকজন মেডিকেল কলেজ কলকাতার ছাত্র, তা সৌভাগ্যের অধ্যাপকের।

সম্ভবতঃ ১৮৫০ খৃঃ তিনি শ্রীমতী সারা নামে এক খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁদের একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। তিনি পুত্র-কন্যাদের অকালমৃত্যু ও নিজের স্বাস্থ্যের অবনতি করেন। প্রথমা কন্যা লেডেডো কলেজে মারা যান; এবং পরে এই প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার সুচিকিৎসক, ডাক্তার মেকেঞ্জিকুট নামে পরিচিতা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংলিশম্যান সংবাদ বিশ্বাসিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেন। অপর দুই পুত্র—আর্থার ও আলফ্রেড আই সি এস হন। আর্থার সেকালের বঙ্গের প্রেসি-ডেন্সীতে (২।৩।১৮৮৭) ও আলফ্রেড বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে (৩।১।১৮৯১) নিযুক্ত ছিলেন। স্বিতীয়া কন্যা লিলিয়া ক্যেম্ব্রিজে ট্রাইপস অনার্সের গ্রাজুয়েট এবং তিনি বহু ভাষা জানতেন। এঁর বিবাহ হয় ব্যারিষ্টার পি এল ঘোষের সঙ্গে। এঁদের পুত্র মিঃ পি এল ঘোষ · অনেক আফ্রিকা নিবাসী এবং কলিকাতা পুত্র ইন্সিওরেন্স এবং ব্যবসা এজেন্সীর ডেপুটেশনাল্ট প্রথম বাঙ্গালীদের সঙ্গে আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্কে নিযুক্ত হন। কনিষ্ঠা কন্যা জন্মাবার বিবাহ হয় ডাক্তার ও তাঁর বিবাহের ৩৭ বৎসর পরে মি এল ঘোষের সঙ্গে। কনিষ্ঠ পুত্র অস্ট্রেলিয়াবাসী হন—তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৮৭৪ খৃঃ ২১ সেপ্টেম্বর, মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে মাসিক-রোগের সুযোগ্য সুচিকিৎসক ডেসপতী, ৭২ নং এবারক্রোম্বি রোড, ভেলোর-টেন, নগরে পরলোকগমন করেন। পরীর অসুখ থাকায় দুটী নিয়ে বিলাত যান। নগরে ফিরিয়াসে তাঁর অবস্থার যেন উন্নতি হয়। কিন্তু বিলাতের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যহানি ও দুরারোগ্যের পথে সাহায্যকর হয়। এই কৃতি ডাক্তারীয়ার বন্ধু-সমাজ নগরের বিশ্বাস চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা নগরেই এবং অন্যত্র প্রকাশিত হয়। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিরর ও ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে তাঁদের ও জীবনী ছাপা হয়। সুচিকিৎসক ও সুশিক্ষক ডাক্তার সুচিকিৎসক ডেসপতী দেশবাসী ও ছাত্রদের কাছে সম্মানিত ছিলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল—যেখানে তিনি কর্ম-জীবনের বহু অমূল্য বছরের যাপন করেন একটি ওয়ার্ড তাঁর সম্মানার্থে 'ডেসপতী ওয়ার্ড' নামে অভিহিত করা হয়।

---

*Sarah (Dyckemann) Dey। এই নাম কলকাতায় (Lascia Convent) মেয়েদের কনভেন্ট-এ লিখিত আছে; যাহার থেকে উপাধি ঠিক পড়া যায় না।

কলকাতার কাছেই

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার আর একটি এয়োজনী কি অন্ধকারে রাস্তাগুলোর ডানদিকে পাশের অন্ধকারের বিপরীত দিকে পাশাপাশি থেকে থাকে ঠিলিয়ে তুলল। অন্ধকারের মধ্যে আলোটা দিয়ে এদিক-ওদিক করে কি খুঁজছিল। একটা উঁচু ঢিপির মত জায়গায় আলো ফেলে অনেক মিনিট দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই আমাদের চোখ গাছের ফাঁকে একটা দীর্ঘস্তম্ভের আভাস পেল। অতি দীর্ঘস্তম্ভ কাঁচের সুনির্মাণ। এত মোটা ও এত দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘশ্বাস। তার সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধও পেলাম। অন্ধকার এয়ারকন্ডিশনড ঘুমুরের মত মাঝে উঁচু করে হাওয়ায় ঘুরোন ফিতোর মত গন্ধ শুকল। আগাপাছি আওয়াজটা মোটরে চেপে এল সোজা চৌ মেরে এগোল।

ততক্ষণে আলোটা বাঁধিয়ে পড়েছে। একটি এয়োজনী সোজি একটি বিরাট লম্বর মাটিতে শুয়ে আছে। আমরা কাছে যেতেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারল না। গলাটা উঁচু করে শুধু শুধু অবয়বের অবয়বে লাগল। চোখ দুটো সবুজ হয়ে জ্বলতে লাগল। বড় বড় টানা টানা চোখের চোখের পুতুলটা জল ভরে ছিল। আমাদের একটি সাদা থেকে সেই পুতুলটি দেখতে পেয়েছে। কাছে যেতেই সোজি, চোখগুলো চাপ-চাপ জলটাটাও ছিল, সেটি পুতুলি মেয়েছে। মাদী লম্বর ভালো দাঁড়িয়ে মত। একজন যে পুতুলিটা পাঠিয়েছে, সে হচ্ছে লম্বর। লম্বরের গায়ে বড় বড় লম্ব। জায়গা মেখা জখম হয়ে গেছে।

আমাদের সঙ্গীরা চারিদিক ঘিরে চারদিকে ঘুরে ঘুরে আমাদের মাদী ঠোঁটের একটা পুতুলি করে দাওয়ে, তবে মেয়ে হবে। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। লম্বরটার পেটে ছাই-মেশান পুতুলি একেক-একটি হয়ে বেরিয়ে পেল। ঝাঁড়িঝুড়ি মত বেরিয়ে গাছের তলায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। এ-পুতুলি মেখা যায় না। আমি পুতুল করতে পারলাম না। পুতুলগুলি থাকে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে মাদী উঁচু করা লম্বরটার কানের কাছে মাথাটা প্রায় ঠেকিয়ে পুতুলি করে দিল।

এল, কি পোয়া ছিল। উঁচু মাথাটা বন্দুক করে সোজা মাটিতে আছড়ে পড়ল। চোখের যে পুতুলিটা জল একজন ভিসের অন্ধকার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান ছিল, সেই পুতুলিটা জল গড়িয়ে গেল, এবং একটা শেষ দীর্ঘনিশ্বাস বেরুল অন্ধকার লম্বর করে কানের পাশ দিয়ে গল-গল করে রক্ত বেরুতে লাগল।

বন্দোপাধ্যায় বলল চল ফেরা যাক। জীপ নিয়ে যখন আমরা পুতুলি-পাড়ার ঢুকলাম, তখন বাঁচতে হাতে পৌঁচ ছিলটে। মোহাদীর ছাদের পুতুলগুলো ঝিলমিল খাল-খাল করে ছোঁ ছোঁ করে ছেকে উঠল।

আমরা ঘিরে পুতুল পড়লাম এই পাঁচ পুতুলের আসর।

[সত্য]

বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে জোরার উপর পা তুলে রাত্রিরানার বাড়ি থেকে যে-কটি বই এনেছিলাম, তারই একটি পড়ছি। রোদসেরারের কবিতার বই। ইংরিজী অনুবাদ। ফাওয়ারস্ অব ইভিল।

কবিতা পড়তে হলে আমার মুখোশ্চিত্র মত আসনা আর হয় না বোধহয়। বিরক্তি হয়ে কবিতার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় একটি জীপ হুলো উঁচিয়ে এসে বাংলোর হাতায় ঢুকলো। আশ্চর্য! মোহনা। মোহনা জীপ চালাচ্ছেন—রাত্রিরানা পাশে বসে আছে।

ওঁদের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে উঠে দাঁড়াতেই এত ক্লান্ত লাগল যে কি বলব। অনেকের পর শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে। কাল আসার কথা এসেছিলেন। মোহনা বললেন—আজ্ঞে লোক পাঠাবো দুটি। এমনভাবে একা একা অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে একটা কথা পর্যন্ত ছিল না। এমন তো-আসেনে মোকও সেখিনি।

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, তেমন গুরুতর কিছু ত হয়নি, আপনাদের সন্ধ্যাইকে তুচ্ছ ব্যাপারে বিরক্ত করতে চাইনি।

রাত্রিরানা কপট রাগ দেখিয়ে বলল—তা কেন? কিছু একটা হলে তাহলের খবর পাঠাতেন, অন্য লোকে আমাদের খারে খুব ছিল। বলল 'ছি ছি, এতগুলো লোক থাকতে তোমারই দেখতে.....।

আমি বললাম—আজ্ঞে না, মিথ্যা মোকে ছিলাম। সেইজন্যেই খবর পাঠাইনি। মোহনা বললেন—তোমার মোবিলে ও তোলেজনা চালান করেছি। আমি বললাম—সে কি? হঠাৎ? উনি বললেন—হঠাৎ-ই। ও'র মন খারাপ খারাপ হল, ঐজন্য তাই পাঠালাম। এখন ওখানে গিয়ে মোহনা পটা মেড়ে বসেছেন। বর্ষাকালটা আমরা ওখানেই আসবেন।

আমি হেসে বললাম—ভালই ত। তবে আপনার মিসরাই খুব কষ্ট হবে।

মোহনা জীপে উঠতে উঠতে বললেন, না না, কষ্ট কি? কষ্টের কি আছে? তারপর রাত্রিরানার দিকে ফিরে বললেন—তাহলে, রাত্রিরানা, আমি কিন্তু সন্ধ্যে নাগাদ সঙ্গে সঙ্গে আসছি। তৈরি হয়ে থেকো।

জীপটা স্টার্ট দিয়ে আমায় বললেন—রাত্রিরানা সারাদিন তোমার শুশ্রূষা করবে, আমি বাড়ি গাড়ুর মোজারের সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তা বানানো নিয়ে ওর সঙ্গে জরুরী কথা বলতে হবে। বেরার পথে রাত্রিরানাকে তুলে নেব। ভাল করে আরাম করে থাকো তোমরা। এক্ষুনি এসে পড়ছি। জীপের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পরে।

কি বলে যে রাত্রিরানাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। এই উদ্ভটতা, এই উদ্ভটতাই বা এতে বাঁধা কেন, এই বন্দুক, এই লম্বর মেরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েরা মনের ভালবাসে, তাদের সঙ্গে যোবনের সাঁতারকাদের বন্দুক মানতে পারে না, তারা, তাদের সঙ্গে সব সময় সেই পুতুলের বাঁচিতে পরিবাস্ত থাকে, সব সময় এরা ভয় পায়, পাছে বলা পড়ে—তখন ওরা সেই পুতুলের কাছে সব সময় উৎসবাকার দেখায় বা ইন্দ্রিয়সাড়ায় ভোগে। মনে মনে ভয়ে থাকে মনে।

আমি ওর বন্দু নয়। তবু কিছুটা নই। তবু, কি ভয়ে আশ্চর্যকর করি যে, মাঝে মাঝে আমারও বলতে হয়। পুতুলের ইনটেলেকচুয়াল বন্দুকে ভয় করতে চায় না। এই জঙ্গল পাহাড়ের নির্জনতা, এই সিটাসফুলের উগ্র গন্ধ, এই অন্ধকারের বর্ণচ্ছটা, এই সমস্ত কিছু আমাকেও অবাক করে তোলে।

দিন দিনে শরীর এসে মনের উপর অবসন্নতা নিচ্ছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এই একটা বড় অভিশাপ। এতে আশ্চর্যের কারণ উপায় নেই। পাহাড়ের সরলতা-সমৃদ্ধতার নিজের অজ্ঞাতে সবার উপর যে মোহ আচ্ছন্নতাই অভিভূতিলাভ এখানে, মেয়েদের চোখ-মুখের মত, প্রকৃতির পুষ্পোদ্যানে তাদের চিহ্ন রয়েছে—কেউই পড়ছে। সাধারণ, আমিও, প্রায়ই আমি মোহিত পড়ছি।

দিনে দিনে বড়ই অসহ্য হয়ে উঠছি। তবে এখনও পুতুলোপুটি হারিনি। উপায় উদ্ভাবনে এখনও তোমারে হলে বসে আছি। তবে যে-কোন মুহূর্তে তারা ঘুরতে পারে। সভ্যতার সমুদ্রের পরপারে সৌন্দর্যের এ-জগৎ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই মুখোশ্চিত্র চাকচিক্য আর অন্ধকারাচ্ছন্ন মোহটী আমাকে আদিমতম সভ্যতার ইতিহাসে

অনাস্বাদিতপূর্ব এক সুখ অনুভব করিতেছে। নতজানুতে আঘাতের স্থান ছিলিয়া গেলেও সে ব্যথা নাই। সুস্থতরীরের মেরুদণ্ড সোজা হইয়া গিয়াছে, অন্তরও সোজা হইয়াছে।

এমনসময়ে ডাক্তার মেয়ে ডাকিতে উঠে বলিল—ডাক, ডাকিতে ডাকিলে কেন? অনুপ। ডাকিলাম বলল, ডাকি, ডাকি। আপনি বাস্ত হইবেন না।

ডাকার উঠিল বলিলো ডাকিলাম।

একেবারে শাদা পোশাকে এসেছে ও আসছে। কুমারী মেয়েরা শাদা পোশাক পরলে আমার বড় ভয় করে। ঐকুর করে এক একটী কুলের কন্যাদায় পরিহিতা তখন ওদের এক্স অরোপিত হয়। তখন মনে হয়, এমনকি চোখ দিয়ে আমার ভয়ও ভয় করে।

অনুপ আছে না কি?

না। অনুপ একেবারে ছেড়ে গেছে। তবে বড় দুর্বল করেছে শরীর। হাটা-চলা করতে পারি না মোটে। হাঁটতে বড় ব্যথা। ব্যাথাটা ঠিক ঠিক নয়। তবু মনে হয় শরীর অস্থির লাগে।

ডাক্তারনী চুপ করে চোখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল—কি খাবেন আজকে?

—অনুপান যা চোখে দেয়। তারপর একটু ভেবে বললাম, কি খাওয়া উচিত?

ও বলল—আজ আমিই আপনাকে ডাকা খাওয়াব।

ডাকা মেন বললেন। এই প্রথম এলেন আমার অনুপানে, আর প্রথম নিজে রাঁধবেন।

বড় যে, তাতে কি হল?

অনুপ কাছে আমার অর্থাদিতি কেন বড়? বলে হাসল।

একটী হলদে পাখি এসে সামনের জানলে বসল। মুখের চোখ নাচাল। ঘুর-ঘুর করে পালক নড়ার কি যেন স্বয়ংবোধি বলল, তারপরই ডানা মেলে উড়ে গেল দূরে, বন নীল আকাশে।

অর্থাদিতি চোখ হয়ে এসেছে। অনুপের পড়েও পড়েও ৬৫ চোখেছে।

ডাক্তারনী বলল—নিশ্চিন্তপুরের সেই যে মেয়েটিকে দেখে এলেন না? আপনার-অনুপের সাথে চোখেছিল? মেয়েটী সেদিন বাস্ত ছিল।

আমি চমকে উঠে বললাম—সেকি? কি হয়েছিল?

ডাক্তারনী মুখে মৃদু হাসি পাশের মোমবাতী দুর্ব দিয়ে হাঁটিতে ধার ডাকিতে ডাকিতে বলল—খুব ডাকাল এক মোপল চোখ অনুপ।

ইস্। ডাকা যায় না। আমার সেই অনুপের আগী সম্বন্ধীয় কথা মনে হল। সেটী ঘটিল চোখেছে। ডাক্তার দিয়ে ডাকা করছে। ডাকা যায় না।

ও-ডাক্তার কি আপনি ডাকিতে ডাকা অনুপ ছাড়া?

ডাক্তারনী বলল—আমি ও ডাকার নই? তবে মনে হয়। অনুপের ডাকাল। আপ-ডাকার ডাকিলাম।

মেয়েরা ধনের আগের ডাকার ডেকে ডেকে আসছিল পাশের ডেকে। কি বিশ্রি সকালটা। অনুপের পর এই প্রথম সকালটাকে আমার ভাল লাগছে। বাঁচতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে আমি যেন কোন মোক্ষা অনুপের বাসনা, অথবা ডাকে যেন কথা আমার অভিধানে চোখ নেই, এত অভিধানে বাঁচার ইচ্ছা অনুভব মনে আসেনি।

ইস্। সেই সুন্দরী মেয়েটী সত্যিই মরে গেল?

ডিস্ট্রেক্ট অনুপেই চুপ করে রইলাম। বলবার—এ যাবেন না? সবাই কি যাবেন অনুপ?

ডাক্তারনী আস্তে হাসল, বলল, অনুপান না খাওয়াবে। হাসিটী এত ভাল লাগল যে কি বলব। আকাশের পরের ডাকে আমি ডাক্তারনীর মত কোন মেয়ে হয়ে জন্মাব। আমাকে অনুপেরনা মোক্ষাবার মত সার্থকতা আর কি থাকতে পারে? পুরুষের মত স্বার্থপর আর। মেয়েদের মোক্ষা সন্তান মেয়েদিন অবধি নিখল না।

অনুপান—এখন ও-ধারান্দায় মোম এসে যাবে। ডেকে উঠবে। চলুন আমরা সেখানে ডিয়ে খাবার মত ডেকে ডাকা পরের ধনের বসি। সেখানে এ কথা খুব অনুপ।

ডাক্তারনী হুইলচেয়ার টানার মত আমাকে বলার বলল, চলুন।

অনুপান আর ডাক্তারনীর মেয়েরাগুলো সৌম্য ছিল।

ও-বিকেলে আমি একা একা আসি এ ঘরে। অনেক গাছ অনেকগুলো। বিভিন্ন ছায়া হয়ে থাকে। এখান থেকে নীচের পুরো উপত্যকাটা চোখে পড়ে। সেই বহুদূরের ঘুঘুমালি অনেক কাশিটুকু, গাছগুলি মত হয়, এতদিন আমি অনাপাড়া-সবুজ ছিল, এখন গাঢ় সবুজ হয়েছে। তারো কিছুদিন পেকে হলুদ সোনালি হয়ে উঠবে।

ডাক্তারী ভালো ও ডাক্তারটী।

আমি বললাম—অনুপে? সুন্দর না? সুন্দর ডাক্তারটা অনেক কিন্তু আর আমি অন্য কিছু বলতে পারব না। আমার এখনও ভয় হয় অন্য বলতে। আপনি আর ডাক্তারনি অন্য বলবেন। আমি শুনব। আমার বলার মত কথা নেই।

ডাক্তারনী নীরব। ঘিনুতেছে। বুঝতে পারলাম মেয়ে এর ডাকা। তাই বললাম,—আমার মত কথা নেই এমন মোক্ষ আছে নাকি? আমি তো ঠাকুরের কথা শুনে দশ বছর কাটাতে পারি। আর আপনার সোনাকোর মত একজনের কথা নেই? আমার কিন্তু মনে হয় আপনার বলার

অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানি

চিকিৎসকদের বিজ্ঞান সংবাদ

সাহিত্যের মাসিকপত্র

চিকিৎসক সমাজ

সম্মেলন ও পর্যটন সংখ্যা

প্রকাশিত হয়েছে • দাম ৫০ পয়সা

লিখেছেন :

সাহিত্যে : শম্ভু মহারাজ, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ জ্যোতিষ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অমিয়কুমার হাটি, আঙ্কিত সরকার, ডঃ এন বি বন্দ্যুয়, ডঃ বঙ্কিম চাটার্জি, ডঃ টি রামবাম পাই, ডঃ সমরেশ পাল, ডঃ বিমল সরকার, ডঃ অরুণকুমার সরকার, ইন্দ্রজালী ও রবীন্দ্র ভাস্কর।

বিজ্ঞানে : ডঃ অরুণ চক্রবর্তী, ভাস্কর কুমারেশ ঠাকুর, ডঃ কে পাল ও হাফিজ সাহেব রহমান।

বিনোদনে : ডঃ বি কে বসু ও ডঃ সুহাস চাটার্জি।

বিবিধ বিভাগ : সুন্দর অন্ন কিন্ন, ছুটিছাটার বিজ্ঞান, অনুপান ও আসন-প্রাণায়াম।

প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা/বার্ষিক সডাক ৫ টাকা

১৪১ আচার্যপ্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৪/ফোন : ৪৪৭১০৪

মতো অনেক কথা আসে। হয়তো তোমার মত নেবার নেই। অথবা ইচ্ছে নেই বলার।

মারিয়ানা নিজেকে খুব গুটিয়ে এর সঙ্গের মাইলখানা বিভিন্ন মত প্রেমবন্ধুনির আমার চোখে ঝলক, কিন্তুকিন্ত করে উঠল চোখদুটি। অনেকক্ষণ চুপ করে আমার চোখে চেয়ে রইল। তারপর খুব নীচু করে নিল।

হাতে মাথে আমার অসম হয়। আমার মত নির্বোধ মানুষও বিড়ম্বিতদের মাটি-চলা ঘাসফড়িংয়ের ডানার মত হঠাৎ করে থর্থরিয়ে ওঠে। মারাত্মক ভালো লাগে-ভালোবাসি হয়ে ওঠে। তখন আমার সামনে বিশ্বের আর সাধ্য।

খুব্বান ডিমের সোনালী কুসুমটা নিয়ে এল। তখনো সেটা সেদ্ধ হয়নি। মারিয়ানা অবাক এবং বিস্মিত চিত্তে হয়ে বলল, এরা এই জঙ্গলে বসে থাকে? খাবার মত কি তাদের কাছেই আছে না আছে?

আমি বললাম—তাদের না কেন, তারা, তবে খুবই কম। বাইরে থেকে খাওয়ার মতো মনে আসে? এই যে আপনি আজকে, কাই-বিড়ালটা জোগাড়ের জাল থেকে ছেড়ে দেবেন। সেদ্ধ করে খাবার আগে ঝিনুকটা সুড়সুড়ি করে লোকে ভিজ বের করবে। হাজার পাখিদুলো আপনার এহেন অসাবধানী অসাবধানে দেখে সন্দেহে হয়ে যাও করবে, তার আপনি উপভোগের দিকে ছেড়ে বাঁধে বাঁধে থাকেন। কি মেজাজ করছে তো?

মারিয়ানা সেদ্ধটা হাতে তুলতে তুলতে বলল—আপনি একটা বন্য পাগল। আপনার দোষ নেই। অসভ্যজনদের মেলা মেশেন ত, আপনার উপায় হাতেও নেই তো।

খুব্বান টি সেদ্ধটাকে ঘরে রেখে ঝোল-ভাত নিয়ে এল। মারিয়ানা খুবোল—সত্যি অমন খুব্বান? খুব্বান মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

আমি সাহেবের জন্য খুব্বানের সঙ্গিনী খিচুড়ি রাঁধব। তুমি কিন্তু চোখে না। আমি বললাম—আজ মারিয়ানার মেজাজটের জন্য তুমি আজ করে রান্নার চেষ্টা করো খুব্বান ও খুব্বান। মেজাজ চেহারের ব্যতিক্রম যেন না হয়। একটু খেয়াল করে করো। খাবে মেজাজ আসবে খাবে।

খুব্বানের সঙ্গিনী খিচুড়ি যা রেখেছিল মারিয়ানা, কি করব। আমি কলাপাতার ঠোঙায় মধ্যে ঘন ঘন খাইনি। সেই উনুনা থেকে খাবারে মেজাজের মেজাজিলাম। তারপর মেজাজি বলে মনে পড়ে যায়।

মারিয়ানা আমি করল গলে গুন করে গান গাইতে গাইতে। আমি কলাপাতার ঠোঙায় মধ্যে মধ্যে এক খুব্বানমোদি খুবোলাম। আমার খাবারে আমি অমনিল পরে মেজ খাড়া হল। আমাদের সঙ্গেদ্ধি জল মেজা মেজে মেজে মর্যাদা দিয়ে, জন্য খাবারে মেজাজ পরিল দিয়ে, খাবারদুলোর জন্য দিয়ে বিদি মেজে এসে মেজাজের খাটে ঠাঁড়িয়ে মেজে। খাবার আবারদুলো ঘরে মেজে আমার ও খুব্বানি।

খাবার খরে খুব্বান করতে করতেই মেজাজ। মে ছাই মনে মনে আমাদের খুবের মতই নাচতো করছে খাবারটাই মেজে পর নিজের খাবারের, অথবা ভিন্ন দিনাদিনে পাহাড়ের ছবিই, একজন নয়ন মেয়ে না থাকলে সমস্ত অভিজ্ঞতাই যেমন ফোকে-ফোকো লাগে। আমার নির্জন খাবে আজকে মারিয়ানা এসেছে বলে খুব খুবতে মেজাম, কত বড় খুবোতা পূরণ করে তারা।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বারান্দায় মেয়েতে বসে রইলাম। একজন মনের-মেটানি খাবিক এসে নতা বলালো খাবেদের হাতায়। অনেকক্ষণ চোঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলা, হাত-পা নাড়া, তারপর মনে খুবোনো খাবনা নিশ্চিন্ত হবার পর, তখন খুবোর মনে কিচিরমিচির করতে করতে সুহাসী বাঁশির দিকে উড়ে মেল। একটু পরে এক ঝাঁক খুবো টিয়া এসে সামনের জেরী গাছটা ছেয়ে বসল। মিনিটখানেক মধ্যেই টাঁ-টাঁ-টাঁ করতে করতে উড়ে পালাল।

একটা নীলকণ্ঠ পাখিকে মেজে এই সময় এসে আমাদের-আশা গমগুলোতে বসতে দেখি। সে মেজে কথা বলে না। মোবারা মারিয়ানার মতই, তাদের মোকের অভাবে ওর কথা বলা হয়ে উঠেছে না। এ-ডাল থেকে ও-ডালে সাবধানী খুবোর মত কিছুক্ষণ হাঁটা-হাঁটি করে সে-ও উড়ে চলে মেল।

মনটা যখন খুব নিশ্চিন্ত থাকে, তখন মোবারে কারোই কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তখন চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করে।

মারিয়ানা চুপ করে সুহাসী নদীর দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

বেলা পড়ে আসছে। পাহাড়ি-ঝরা আর নদীনিজনদুলো খুবতে খুবতে অনেক উপরে উঠেছিল। এখন মেমে আসছে। সুহাসী বাঁশিতে বিভিন্ন ও বিভিন্ন নতা উচ্চারণে বাজছে। সুহাসীর পরের বাঁশি বজাইনিতে মেন করিন হল, একটা খারাপ্রাণ মেশিন বসেছে। বিদে চলে জানি না। বিদেশ হলেই মেটায় খুব-খুবানি মেলা খার পাহাড়ে দেখিয়ে। খুব-খুব-খুব-খুব করে একটি মাঝিনার খাব্ খাখির মত নতান চেয়ারটা ও বিদেশে খুবেরটা মে জানে। পড়ন্ত খোদ্দুরে এক একা খুবোতে মনে মেই খুব-খুবানি খুবের ভারী ভাল লাগে।

মেজতে মেজতে বিকেল গড়ালো। খুব্বান কফি দিয়ে মেল। সঙ্গে লালচেনের মেকে আনানো ইনবং মেওয়া বিস্কিট। কফি মেয়ে মারিয়ানা খরে নিয়ে চুল বেঁধে শাড়ি পালটে এল। খাল খুলে একটি পাতলা শাল নিয়ে এল।

সন্ধ্যা-নদ্যার মেন মিশা মাখে। নীড় আসতে মো মেরি মেই মেদি। মনে পাহাড়ে এ কি, শহর-মেজেন্ড-নীড়ে বড় একটা চোখে মেই খুবোতি। এখন সন্ধ্যকে মেখা যাবে।

তারাদুলো মেন বড় বড় হয়েছে। ঝুঁকে পড়েছে। মেন বিমেজে উপার খুবের অভিমানাভার আলো মনের আমার মাথার ঝাঁকির মেজে। মোল এক আমনা মেতারী হাওয়ার মেজাজন পরে, মেজে৷৷ আছুলে, আমার তারে তারে হলেদানি আমে আলাপ করছেন। মে কি বাঁড়। আলো আমার খুবের মধ্যেটা খুবতে খুবতে ওঠে।

মারিয়ানা আস্তে আস্তে বলল—আমি মেমন একাম, মেমন আমার কাছে ফিরে একদিন কাটিয়ে আসবেন। মৌখনিন থাকলে ত আরো নজা হয়। পরীক্ষাটাকে তাড়াতাড়ি এমেমারে ভাল করে নিন।

আমে হয় মারিয়ানার কড় একা একা এমনে, আমে মাঝে। আমার মতই। ওর এবং আমার সময়ের অনেকটা একরকম। অনুবিধের কথা এই, মে সময়ে মতো যা সমাধানের পথটা এত নয়। এবং আলো সমাধান আসে কিনা তাও অজানা। তবু এতবড় নির্দয় পৃথিবীতে আমরা খুজন যদি খুজনের একাকীত্বের ভৈরবটা বন্ধুত্বের উষ্ণতা দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারি, সেটাই বা কম লাভ কি? মেটা ত মস্ত লাভ। প্রেম যাড়া, বন্ধুত্বের মতো মহান অনুভূতি আর কি আছে?

এই একমেলায় মারিয়ানার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা মেন অনেকখানি এগিয়ে মেল। এতদিন মেন ক্লাস টিমে টপ্ পরিবারে জীপ চালাচ্ছিলাম, আজ হেলপ্ বন্ধবাজন মেই ক্লাচ্ থেকে পা-টা সরে মেছে। এক মনকে অনেকখানি এগিয়ে মেছি।

অন্ধকার হয়ে মেল।

মারিয়ানাকে বললাম—আপনার বই-খুলোর ট্রাঙ্ক সবকটাই পড়ে মেলেছি। আর নিয়ে যাবেন কিন্তু। আপনার অন্য নিয়ে নিয়ে অন্য উপায়ে আরো কটা বই আনিয়ে নেব।

মারিয়ানা খুবোল—আজ সকালে বারান্দায় বসে বসে মেয়েদেরদের বইটি পড়ছিলেন বুঝি? আমি বললাম—হ্যাঁ। আপনি নজা করেছেন মেখছি।

হঠাৎ মারিয়ানা বলল, আ নজার আজে কজার আজে? আমি উঠতে উঠতে বললাম, আছে; ঘরে টেবিলের উপর আছে, এনে দিচ্ছি। মারিয়ানা আমাকে হাত দিয়ে উঠতে মানা করে বলল— আপনি উঠবেন না, আমি নিয়ে আসছি। মারিয়ানা উঠে মেল।

ঘর থেকে, টেবিলের পরে কুমারী কণ্ঠস্বরের আহ্বান মেখা—বারান্দার আসে এসে পড়েছিল। মেই আহ্বানের মেখার একটি মায়া পড়ল। আমার অজান্তার মেওয়ালে আমনা হাতে খুজলাম, নিখুঁত সন্ধেবেলার মায়া মেমন করে ফোঁপে, বাগানের গাছে মারিয়ানার মায়া, মেমনি করে ফুঁপিয়ে নাগলো।

একটু পরে মোবারেদের বইটা নিয়ে ফিরে এল মারিয়ানা। বলল—বইটা আপনাকে নিলাম। আপনি করে বললাম, এ মেন করলেন? আপনার কাছে থাকলে পড়তে ত মেতামই। মারিয়ানা-সঙ্গ মেবার প্রয়োজন কি ছিল? মারিয়ানা আমার ইঙ্গিতেরাদের মাথার কাছে এসে বইটির প্রথম পাতা খুলে, খুবোতে বইটি আমার খুবের সামনে মেলে ধরলো। পড়লাম—খুজনের ঘনশ্যামকে নিবেদন —খুবোর্জন সম্বন্ধে সন্দেহ? —মারিয়ানা।

(ক্রমশঃ)

নজরুলের সঙ্গে কারাজীবন

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

(৬)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জমাদার আর পুর্ণবাবুর মধ্যে অনেক দূরত্ব হয়েছে। কলকাতার চেট আলোই জমে গেছেছিল। পরে কথাবার্তা মোটামুটি এল।

পুলিশ সুপার কজনকে বিদায়ের আগে থেকে কয়েকখানা অইবে চিঠি সবচেয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। পূর্ণবাবুর হেডোরাত থেকেও কয়েকখানা। মোক্ষম প্রমাণ। অইবে পাঠানো আগেই জেলের কানে তাজা। এবং তার পরিণাম যথারীতি সাজা।

জমাদার পূর্ণবাবুর এবং আমার মুক্তি আসন। পর পর। দু-চার দিন আগে পরে। তাতেই পূর্ণবাবুকে এই আমাদের। তবুও কেউই ঘটাকে তেমন গুরুত্ব গ্রহণ করেনি। হয়তো নামমাত্র সাজা যাবে। জমাদারের বৈধিবিক হবেন। এর চাইতেও বড় ছিল মুক্তির প্রশ্ন। দীর্ঘদিন পর বাইরে আবার দিন সমাগত। উন্মুখ ও উন্মুক্ত কল্পনায় মুখে ও রঙ্গ ধারা-প্রধারা বিস্তার করে ছুটে চলেছে দিগ্বিদিকে।

জমাদার-জীবিকার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে সমাজনৈতিক বন্দীদের। মুক্তি-বীণার তেই অনুরণিত অন্তরে স্পন্দন। ধৈর্য সময় মানছে না। মনে আসে, দুরন্ত আশার আসে। পড়ে ছেড়ে, খুন বাঁচার ছটফট করে মেন। জমাদারের-অন্তর হয়ে ওঠে।

তারপর একদিন দেখা দেয় ছুটি। স্তিমিত হয়ে পড়ে উন্মাদনা। জমাদার একান্তে নিজের কল্পনা আর স্বপ্নের জাল বুনে চলে ভবিষ্যতের কল্পলোকে। দুরন্তের প্রত্যেকের উন্মাদনা তখন চরমে। একেবারে ঘরে না। তারই প্রতিক্রিয়ার মন ছাড়া মেলার কল্পনায় জমাদার ধৈর্য-হারা।

জমাদার আর সকল আত্মীয়ের মুখ ঘরে ফেরার। পারিবারিক নিরন্তর জমাদারের সান্নিধ্যের আমরা নিজেকে ধন্য করবার জন্যে পরম ভাগ্য। বিদায়ে অন্তর্যামী আর কৃতজ্ঞতায় সম্ভাষণ প্রাণে আমার দুর্নিবার ও অবারিত প্রবেশাধিকার।

চারপাঁচ আগে থেকেই সমাগম। বন্দী-দায়ার জেলখানার পূর্বদিকে ছোটখাটো মুক্ত-মেলাপ্রাঙ্গণের মিলন অবসরে। এরা জমায়েত হতে শুরু করে। ঘরে ওঠে অনন্তর আর প্রত্যাশা।

হাসি, তামা, মান-অভিমান, আদর আর সমাদর সেদিন ছিল। কিন্তু ছিল বিষণ্ণতার ঘরে। বিদায়ের পূর্বক্ষণে দেখা বন্দিত্বের শঙ্কাকুল অবর, তাদু-সজল মন্ত্র তার স্থায়ম আনন্দ আলো ঘরে মৌনমুখে দৃষ্টির সহজ আকুতি মুখপানিরে ধরা দেবার দুর্বার জীবনে। কথা দিন মোনে। আমরাও শুনেছি। শুনেছি আছেও। শুনতে শুনতে এসে গেল ঘরোপুজো।

পুজোর ঠিক দুদিন পূর্বে সকালবেলা সেলাম বন্দলবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আফিসঘরে। একটু ভূমিকার পর আমার মনের কথা ওকে বললাম। পারিবারিক প্রথা কালীপুজোর পাঁঠা বলি দিতে হবে পরিবারের কোন পুরুষে। প্রথা, পালনে করলে, পরিবারের সকলেরই ঘরন্ত অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবিত অভাব—।

বন্দলবাবুর চোখ কপালে উঠল। বিস্ময়ে প্রথমটায় মুখ বোবা হয়ে গেলেন। জেলের ভেতর একজন বন্দী পাঁঠা দিয়ে বলি দেবে পরিবারের মঙ্গল কামনায়। তার এই প্রস্তাব নিয়ে একজন বন্দী সুপারের অনুমোদন চাইছে।

কথা খুঁজে পেল বেশ একটু পরে। অবিশ্বাস্য প্রস্তাবের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বন্দলবন্ধু বললেন,—আপনার মাথাখারাপ আছি হয়েছে দেখছি। কিন্তু তা কি সম্ভব?'

'কেন বলুন?'

'পাঁঠা কাটবেন?...জেলের ভেতর। না না, তা হয় না।'

'হয়।' আমার কণ্ঠে প্রত্যয় তখন পরিস্ফুট। বললাম,—সেটার সামনে, আর কেউ থাকবে না। শুধু থাকবে আপনার কয়েকজন সেপাই। আমাকে ঘিরে রাখবে। বলির পরই ওরা পাঁঠা নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু পাঁঠা—পাঁঠা?'

সে সবই পাওয়া যাবে সেপাইদের কাছে। আমি সেটা নিশ্চিত।'

স্তব্ধ হয়ে গেছিলেন কিছুক্ষণ বন্দলবন্ধু। বুঝলাম, মনে সন্দেহ জেগেছে। কালীপুজো। এবং সেই পুজোর জমায়েত উপলক্ষ, বলি। বন্দলবন্ধু বাঙালী এবং হিন্দু। যা করতে নিজেই বুঝে ফেলে ফেলেন। বন্দলবন্ধু,—আমি একটু ভেবে দেখি।'

দুদিন পরেই একটা ছুতো আমার মনে মেলা দেখাচ্ছিল। বিনা বিচারে এবং ধারা-নিয়মের পর সময় অপেক্ষা ছেড়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। জাতিভেদের সংস্কার উচ্চাসনের বাস্তু-দৃষ্টি মনে আমাদের হাসি পায়। মনস্তত্ত্ব যা কোনদিন পাশের সংস্কার আন্দোলন মনে আর কিছুমাত্রও রেখাপাত করে না। আমা অন্যদের চুলচেরা বিচার আমরা খুশে দোষ। জমজমাট তো খুনের মামলা, আন্তর্জাতিক বিবাদও আমাদের আমু চমকে তোর না। কিন্তু ওরা? আমাদের সংস্কার কতটুকু? কোন কিছু না ছোঁয়ে, না উপেক্ষা করে, জীবের সনাতন বাধা-নিষেধের পরেক বোঝা মনে নিয়েই ওরা চলবে নাকি আমাদের সঙ্গে? চলতে পারবে? মেজাজ তারে সহ্যে পড়বে না? প্রতিটি আদে না? ছোয়ে যাবে না?

হিন্দু আর মুসলমান। ধর্ম আলাদা। কিন্তু যাহোক ঐ। আমার-কিরকমভাবে? তাও কি হিন্দুদের ছেলে চলতে হবে নির্বিঘ্নের আর নির্বিকার হয়ে? ছোবেবলাটা এসে ছেতে ফলার হো আমাদের আটকায় না। বলির মাংস ওদের ছোটকে যাবে কেন? সত্যিই কি আটকায়? না, শুধু আমারই ভেবে নি?

মাই হোক, মনস্তাত্ত্বিকতা বলি হয়ে গেল। সকলবেলা স্নান করে, ধোয়া কাপড়ে পাঁঠার আগে হাতপায়ের বন্ধন ছিন্ন করে-ছিলাম। সেপাইরা ছিল আমাকে ঘিরে। ওয়ার্ডারের ওরা দূরদিয়ে বিরেছিল জমায়েতের মালা। শিশুদের ছোটদের লাল করে দিয়ে-ছিল পাঁঠার মাথা। ঝিড়-ঝিড় করে রক্ত পড়বার জন্যও আমাকে করতে হয়েছিল।

জমাদার আর জমায়েতের উৎসব ওরা আর কেউ মুসলমান বন্ধু সে মনে স্পর্শও করেনি। বিকেলবেলা বাজীকে নিয়েছে করেছিলাম। এতটুকু বিদ্বেষও কি জমে নি ওঁর মনে?

না।' উত্তর দিয়েছিলেন জমাদার; ছোট-জমাদার আর বলি,—না করেই ওঁকে হতো বন্ধ হোল, আসলে ওঁরা থেকে পাওয়া ভেল মানে। আমার তো ব্যবসাবার বন্ধ। তাই দিয়াই যা জানবে কেন?'

জমাদার আসি এসে দাঁড়িয়েছেন আমা-দের ঘরে। জমাদারের সঙ্গে নয়। অন্য কিছু। আমাদের এবং অনির্দিষ্ট দিনে। ছেলে তখন প্রায় বারোটা। আমার মুক্তির দিন স্থির হয়ে গিয়েছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। তারিখ সঠিক দিন ওরা জানায় না।

আমার সাজা হয়েছিল ৮ আগস্ট, ১৯২২। হিসেব মতো ছেড়ে বছরের মেয়াদ বাড়িয়ে মুক্তির দিন ধরা উচিত জমাদারের প্রশ্নে। সাজা আমাদের বছরের বেশি হয়ে বন্দীর আগে ছেড়েছিল, অর্থাৎ মুক্তি দিনের আগে দিন দিন, যাতে আমাদের আত্মীয় কেন বাঁধার না থাকে। আমার ছিল

জানো, রাস্তাঘাটে
আমার দিকে
তাকিয়ে কারো
পলক পড়েনা ...

তোমার দিকে না হাতি,
তোমার পোশাকের দিকে।
নির্মল বার সাবানে কাচা জামাকাপড়
নিখুঁত নতুনের মতো ধবধবে দেখায়
আর তাইতেই সবার তাক লেগে যায়।
অসলে, কেরামতি তোমার নয়—
নির্মল আর আমার।

পূর্ব ভারতে বার সাবান হিসেবে
কাটতিতে সবার উপরে —সবার সেরা বলেই।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

EPN 403

আর্তি জানালেন আমার মূর্ছার দিন। তাই কি দেখা করতে এসেছিলেন? আমি হেসেছিলাম তাই। কিন্তু তা নয়।

বালোর খরদাঁত লর্ড লিটন ছেলে দেখতে চান। দৃষ্টিভঙ্গী তাই আর্তির মনে লেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীরা ওঁকে অভ্যর্থনা করবে না তো? বলবেন আর্তি,—আপনারা কথা দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি জানি, কথা দিলে কথা আপনারা রাখবেন।'

আর্তির মুখের দিকে আমি চেয়েছিলাম। সত্যি সে মুখে ঔজ্জ্বল্যের ছায়া ছিল। বললাম,—আপনার সঙ্গে আমাদের আচরণ কি আপনি অভ্যর্থনাসূচক মনে করেন?'

'নিশ্চয়ই না। খুব হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনের আচরণ।'

'তবে? এ দুঃখ আপনার মনে আসলো কেন?'

'কারণ আপনার বলবার নয়। সাম্প্রতিক ঘটনা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি।'

না, ভুলিনি। লাখাবিয়োলার ঘটনা। এবং ওরই পরিপ্রেক্ষিতে যে ধর-পাকড় হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে, এ তাই ইঙ্গিত। খুব স্থির কণ্ঠে আমি বললাম,—'দিয়া আর্তি, আপনার মনের আমরা ভেবেছে কথা ঘটি, বিশি, সেইজন্যেই পক্ষপাতের কথা এবং আমাদের অভ্যর্থনও হবে অপমানই। আর কম নয়, বেশিও না।'

'আমার, এমাক। ওর মৌন কিছু করবার নেই।' উজ্জ্বলিত স্পন্দিত আর্তি বোঝে পড়েছিল আর্তির মুখ থেকে। আমি একটু থামা দিয়ে বললাম,—'তবে তিন আর্তি একটা কথা। আমরা অকারণ সৌজন্যে অভ্যস্ত নই। আপনাদের ঐ সব 'ইয়োর একসেলেন্সি, ইয়োর অনার' ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করতে পারিনি। হয়তো কখনো প্রয়োজনে দু-একবার বাধ পড়েও যেতে পারে।'

বরফের ফলার মেলে উঠলেন আর্তি। বললেন,—ভেরি ফানি। খুব চমৎকার আপনার কথা। ওজন কিছু নয়। আমাদের অভ্যর্থনের সঙ্গে আমি যে থাকবো।'

চলে গেলেন আর্তি।

কথা রেখেছিলেন বোর্ড। সেদিনই। বোর্ডবাবার প্রথম দিন। নিজের কক্ষ ছেড়ে বোঝে আমাদের, সিঁড়ির কাছে আসতেই দেখা হল। পরনে খাকি ব্রিচিস, তার ওপরে হাফশার্ট পরি. পায়ে চকচকে বুট। গায়ে খাকি কোট, গলায় টাই। আমার বেশবেশন দেখেছিলেন পালটি, কিন্তু সোলাপী অভ্যাস। পালটির একপ্রান্ত দেখালে খোলাপে, ওপরের আংশ কড়কড়ে কুঁচি উড়ানো। দেখিয়েছিলো চুলে নিজেদের ব্রুশ চালানো করে। অন্যদের দেখাদিল বাজীকে। মতোয়ালা) আগা পায়ে জমায়ে সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু হাসি ছাড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের দুপাশে। আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

'আসীন!' বললেন জমাদী।

হাত ধরে বললাম,—'কিসে আসবে?' চলে গেলেন জমাদী। অপলকে আমি তাঁর দিকে চেয়েই রইলাম। বাঙালী আমি।

বিকেলবেলা একজন সেপাই এসে বরফ-বাক্সের ব্যবস্থাটা দিয়ে গেল। তখনো ঘামছি আমি। বুকপকেট সপ্তম-সেপাই। নতুন সুপার এসে গেছেন।

বরফবাবু যে সুপার ছিলেন, আমরা একদা আমাদের মনে থাকত না। সকালবেলা নটার মধ্যে উনি আমাদের দেখতে। সবাই মিলে ওঁকে আমরা ঘিরে দাঁড়াতাম। গল্প-গুজব হত, হাসি-ঠাট্টাও বাদ যেত না। আমরা অভ্যস্ত হবার পূর্বেই অকস্মাৎ উনি সমস্যার আমিয়ে ফেলেছিলেন। এক্ষেত্রে ঘরোয়া পরিবেশ।

পরদিন নতুন সুপার এসে দাঁড়ালেন আমাদের ঘরের মধ্যে। অভ্যাস মতো আমরা সবাই ওঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাদের হৃদ্যতা ও সমাদর দিয়ে প্রথম দিনেই ওঁকে কথা করে ফেলব, এমন একটা মনোভাব অন্তত আমার মনে ছিল। বেশ প্রফুল্ল করে লালিয়েছিলাম সুপ্রভাত। সুপার নিরুত্তর। স্থির। গম্ভীর।

দোহারা। সুগঠিত দেহ। বলবান্ত। একটু চুপ করে থেকে সহসা বলে বসলেন,—'আর যার নির্দিষ্ট স্থানে সবাই দাঁড়িয়েছে, আমি দেখতে চাই।'

কঠিন পাকল না। মেজাজের ঘর ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চুপচুপ হলাম। উত্তেজনাবোধ হচ্ছিল মনেতে। এবং চকিত খানিকটা হয়ে পড়েছিলাম। আমরা একটা অপরিচিত আভাস পাচ্ছিল। মেয়াদে মনে কই-এর ওপর দৃষ্টি রেখে পড়বার ভান করতে লাগলাম।

আমার পাশে ছিল মুকু। বরদা বিহার তামনে। সৌমন বাসনা মিত্রা অবশ্য পরিচিত বাড়ি ছিলেন। মুকু সেদাইই তখন বাচ্চা। মুখে অল্পের পড়তে মুকু করেছিল। চশমাকি একটা ভঙ্গি করে মুকু দাঁড়িয়েছিল। নিজের খাটের পাশে। সুপার এসে তার চাঁদ দুটো ধরে ঠেলিয়ে বলে উঠলেন,—'আমার কথা মন। দাঁড়াতে হবে এমনি করে।' অর্থাৎ অভ্যাসনৈতিক সামরিক কায়দায় সোজা করে দাঁড়াতে হবে।

মুকুকে বাঁচা করিয়ে সুপার এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সামনে। পরনে ধুতি-এবং পাঞ্জাবি আমি তখন নিরাভরণ। সুপার বলে উঠলেন—'ইয়েস—'

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখে বলেছিলাম,—'সুপ্রভাত।'

কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে সুপার সহসা বলে বসলেন,—'ঐদিকে চেয়ে দেখ। আমি কথা দাঁড়াতে হবে।' মুখ, তখনো দাঁড়িয়েই ছিল।

'না।' বলেছিলাম আমি।

'তা আই নো, ফোরার?'

'আইনে ওভাবে দাঁড়াতে বলে না।' সেপাদের ক্লাস কর্মীদের জন্য নতুন আইনে তৈরি হয়েছিল, যাতে অন্যান্য সাধারণ কয়েদীর মতো ওইরূপ করে দাঁড়াবার বাধ্যতা তৈরি দেওয়া হয়েছিল। (অন্যদিনের এক-কথা করে ঠিকমতি থাকত। তাতেই চোখ আমার তার ইতিহাসের জেরাটুকুই সাজালে। ওঁরও নামও ছিল ফিলিপি ডিকো। ঐরো হাতে নিয়ে আমেরিকার অধিবাসে দাঁড়াতে হত সুপার এসে। এবং দাঁড়াতে হত সারি-বদ্ধ হয়ে। এখনো বলা হয়ে ভাইনে আর বাঁয়ে।)

আর কথা নয়। মুকুমার হেসে উঠলেন সুখের নিয়ে—ফেলার, একে আমাদের হারিয়ে হচ্ছে।'

সুপার বেরিয়ে গেলেন। পূর্বাহ্নের মতো আর কথাও হল না। মধুর সকালের থেকে ওঁরা বেরে গেলেন। একটু বাদেই বড় জমাদার আমাদের সঙ্গে করে সুপারের সামনে পৌঁছে দিল। সুপারের আজ-যেন বিষণ্ণই লাগা ছিল না। মুখ ভারে এসেছিল উনি আইরিশ। পুরো নামটাও আর মনে নেই। পোকাটার, পোকরান, না পাকরান; এমনি একটা কিছু হবে। নিজের ঘরে চেয়ারে বসে ছিলেন। আমি ঘরেই আসতে তাকাই ঈষৎ স্বরে বলে উঠলেন,—'তোমার আচরণের জন্য দুঃখ কি যথেষ্ট?'

একই স্বরে আমি জবাব দিয়েছিলাম,—'দুঃখ তোমার আচরণের জন্য যথেষ্ট ছিলো, আমার তাই জিজ্ঞাসা।'

'আমি কী করেছি?'

'অহেতুকভাবে অপমান করেছো।'

'মাই। আমি তোমার তিন দিনের রেশিমন বারেন্ডান্ট করলাম।'

আমি উত্তর দিতে চাইছিলাম। কিন্তু অবকাশ দেলাম না। সঙ্গে সঙ্গে সুপার বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ফেলাকে ডেকে আমাকে যথারীতি পাহারায় রেখার হুকুম দিয়ে গেলেন। চলে গেলাম।

পূর্বাহ্নে বিকেলবাবু আর জমাদী আমাদের ঘরে বসে উত্তেজিত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। উত্তেজনা ওঁদের কারণই ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে পর পর ঘটনা ঘটাই দেখা দিয়েছিল। তার হয়তো পূর্বাভাস। পরামর্শ সভা বসে গেল তখনি। এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি কী হবে সেই তারও বিষয় ও পূর্বাপর আলোচনা হল।

আমার মুক্তির দিন ছিল এ ডিসেম্বর। আমি সেই কথাই জানালাম। এর আগে যেন অনেক। আগে যেন ছিল দিন। অর্থাৎ আর তারিখের পরে মুক্তি যেন হয়। কিন্তু আর তারিখে যে হবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? যদি এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে?

পরদিন খুব সকালে উঠেই তিনি লিখছিলাম কাঁচিতে। দরজা—বিশেষ করে বাথা-রুম দেড়-ঘন্টা ধরে এই বিশেষটি জন্য ভেবেছিলেন। তাঁর নিরাশ হবেন। সময়ে না জানাতে পারলে জন্য বিশেষ আপনজন করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব স্বাভাবিক। দরজী এসে ঘরে পরদেশ পাশে। আমার ওপর। তিনি তিন ঘন্টা ধরে ফিতে ফলায় মাপজোক নিলেন।

দরজীর মুখে কথা নেই। কিন্তু নিশ্চিত দরজীর দর্শনে ঘরে ঘরে অনেকে কথা বোঝাতে আসতে চাইছিল সেইক্ষণে। তিনি-চেনা দরজীর এই তেল সাহিত্য মেলিন আমাকে ঘেরে নিশ্চিন্তভাবে 'লক' করেছিল, সুদীর্ঘ বছরাভাবে পর আজও—তাঁদিনের এই অপমানের তা ভুলতে পারেনি।

জেল সিনিয়র সুপার [illegible] ছিলেন। তবু আসিই আগে জানিয়েছিল,—আমি জানিয়ে দিলাম।

কাজী আমার মুখের দিকে সোজা দিকির তাকিয়ে রইলো আর সজল চক্ষু দুটি ক্রমে লাল হয়ে উঠলো,—না...' হঠাৎ স্বগতোক্তির পরে নিজে জেলে ফিরে গেলেন। তাঁর সাদা-সিধে ভাবভঙ্গীটুকুর দিকে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

হাত ধরি, হাত ধরে, কিন্তু উপরে মুখের কথা যেমন আর একটি কথাও ফুরোয় পড়েনি। কথার ছাইয়ে এ কথা কথা কথা যেন সবার চাইতে ইঙ্গিতে দিয়ে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলে। এতো দুঃখ সান্ত্বনার নয়, এ যে চিরন্তনের আর সত্যেরও।

ফাঁসীর আগের দিন যেন কয়টার সময় আসির সঙ্গে আমাদের ওয়ার্ডে ডাক্তারখানে এসে দাঁড়ালেন পরদর্শক সাহেব। সঙ্গে ডেপুটি। হিপাহিলে দাঁড়িয়ে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। মোটা অবয়বে আতিজাত্যের লক্ষণ।

একটুখানি সময়ে দাঁড়ালেন সিনিয়র। জিজ্ঞেস করলেন নিচু স্বরে আসিকে—'তার সঙ্গে আমি কথা কইতে পি আসি?'

আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে আসি বললো—আমার পরিচিত এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললে মহামান্য পরদর্শক খুশি হবেন। উনি আমাদিগকে জেল থেকে মুক্তি পাবেন।'

এগিয়ে এলেন সিনিয়র। সুপারের দিকে-তাকিয়ে পরই জিজ্ঞেস করে বসলেন সিনিয়র—'বাইরে নিয়ে কেন কল আপনি দেখা দেবেন? কি আপনি, না কি মার?'

কিন্তু দেখে ছুটে কথা আমার মনে এল। পরিচিতিটার সঙ্গে স্বাধীন পার্টি সম্পর্কে এদের ধারণা আর উৎসাহ নেই। এক মাত্র: দু মাত্র। আসি ভরসাপূর্ণ সংবেদনশীল ছিলেন, কিন্তু সংবেদনশীল নিশ্চিন্ত। অতএব—।

আমরা সংবেদনশীল পাইবে। বাইরের ঘটনা আমাদের একেবারেই অজানা। বাইরে না দেখে—' শেষ কথা আমার হল না। 'নাইট' বলেই সিনিয় বিদায়ান্তরে চলে গেলেন—' আপনি আমাদিগকে মুক্তি পাবেন?'

'সেই কথাই ছিল। কিন্তু—পরদর্শকই ছিলেন সুপার আর সেই পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপারের মুখে মৃদু হাসি। জেল সুপারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে আমি বলেছিলাম,—কিন্তু আপনার ঐ জেল সুপার মহাশয়ের অনুরোধ আমার প্রাণ রক্ষিণ জেলে নিয়েছেন।'

'হোয়াই, হোয়াই?' আশ্চর্যান্বিত সমস্ত মুখময় আমি বলে গেলেন।

'ডাক্তারিতে দেখেন আমি। দুদিন পূর্বে তিনি জেলে গেছেন আমার খোঁজ নিয়ে। কত কথা বলেছেন। পুনর্জন্মও। এর অধে কী বাকি? আশ্চর্যান্বিত রেখা ফুটে উঠল আসির মুখে-চোখে।

সিনিয় দুজে দাঁড়ালেন আসির দিকে। বললেন,—কী বলেছে মি আসি?'

আমার আমার কাছে আসি যা বলেছিল, তার সারমর্ম হল যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় সংসদী আন্তরিক রাজনৈতিক বন্দীর চলে জেলের শৃঙ্খলা অবজ্ঞাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নাই। সুপার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান।

ফুটিয়ে তোলেন প্রবল প্রতাপ বড়-সাহেব। (জেল পরিচালনায় সুপারকে সবাই বড়সাহেব বলত)। একজন অজানা মুক্ত সৈনিক করে জেল-সুপারের বিরুদ্ধে এমনি ভাবে গভর্নরের কাছে তাঁর কাজের ম্যালোচনা করবে, আর গভর্ণর—যাদের ভেতে রাজ-পুরুষে, মনোনিবেশ সহকারে তাই শুনবেন এবং মৈত্রিকরও চাইবেন,—কল্পনাতীত।

ডেপুটিসাহিব মনে সিনিয় অত্যন্ত সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে আমার বিবরণ্তরে জেলেন। বললেন,—আপনাদের মধ্যে একজন কবি আছেন না?'

'আছেন।'

'কিন্তু কবির পক্ষে জেলে আসা তো ভাল না।'

'সেটা নির্ভর করে দেশের অবস্থার ওপর।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' শেষ হয়ে গেল সিনিয়র কথা। হাসিমুখে দু পা এগিয়ে এসে নিজের হাত থেকে আমার ছোট্ট পোস্টকার্ড খুলে নিয়ে আমার হাতে দিলেন। জোড়হাতে মুখে বললেন, 'নমস্কার।'

তাঁরা চলে গেলেন। পরদর্শকই মুখে খুল, কুপনটা হাতে নিয়ে দেখার দেওয়া উচিত ছিল। ভুল হয়েছে।

'হি-হেলেদের পড়ে গেল। কাজী ছুটে এসে বন্ধুদের ঘেরে নিলেন। পরদর্শকের খান ফুটে উঠল কথায়। 'ওল-ইন্ডিয়া-রেডিও-বলে-কুর্তে, ছুটিয়ে কথা বলা যে!' পূর্ণবাবু চিত্ত-কিশোর সান্ত্বনাবাক। বীরু কণ্ঠে বললেন—দেশবন্ধুর সন্তানরা কেউ আর বাইরে যাবে না।'

'আল মোটরের অপেক্ষা যায়।' কাজী আসির মুখে থেকে বেরোবার পরদর্শকেই বড় জমাদারকে ডেকেন এবং প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। 'বড়া সমঝে লেনা।' ঠোঁটের কোণে তার মুচকি হাসি না।

'আমরা সবাই সজ্ঞা অবাক হয়েছিলাম। প্রথম দিনের সেই 'আমিনে হাজির আছে,' আর আজকের লেনা।

লেনদেন। সুপার আর ছিলেন তাঁর মতোই। কিন্তু মুখে ও ব্যবহারে ধরন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ঠোঁটের ওপর মুচকি কাজী হাতে কলমটা ফেলে বলেছিলেন সুপার। নিয়ে এস, মুখে। ছিলাম।

বললেন,—আমার দিকে না তাকিয়েই, 'মহামান্য পরদর্শকের ইচ্ছে যে, এখুনি আপনাকে মুক্তি দেওয়া হোক। আপনি মুক্ত। কখন যাবেন?'

এইবার আমার দিকে চাইলেন সুপার। বললেন,—এবেলা তো সম্ভব নয়। কয়েদে কাজী হবেন না। ওবেলা যাবে।'

'বেশ। যখন ইচ্ছে। জেলারকে সেই-মতোই আমি নির্দেশ দিয়ে যাবে।'

একটুক্ষণ সুপারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ইতস্তত করে বলে ফেললেন,—আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'মোর এয়েলকম' বলে সুপার বসলেন, বললেন,—বলুন।'

'আমি জানতে পেরেছি, আপনি আইরিশ। আপনি ক্যাথলিক না প্রোটেস্টান্ট?'

'এতথা কেন?'

'এ থেকে আপনাকে বুঝতে আমার সুবিধে হবে।'

'ক্যাথলিক।'

এই উত্তরের আমি প্রস্তুত ছিলাম। বললাম,—তবুও রাজনৈতিক বন্দীকে চিনতে আপনার এত দেরি হল!'

'যথার্থ রাজনৈতিক বন্দী হলে দেরি হত না।'

'মানে?'

'চারজন ধিরে যারা ইংরেজ আইনের সঙ্গে খেলে, তারা কতটা আইরিশ হোক রাজনৈতিক বন্দী নয়।'

'রাজনৈতিক নয়?'

'ওটা—'

'বলবেন, বাধিবেন। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর ডিফিকাল্ট?'

হাসতে হেসেন সুপার। আমি বললাম—'প্রকৃত রাজনীতির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই। আপনি বুঝবেন, পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রাম ফেলেমিনই ছক-বাঁধা পথে চলে না। চলতে পারেও না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা (স্ট্রাটেজি) অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

'তেরি ইন্টারেস্টিং। বলুন।'

'আমাদের অন্তরঙ্গ হিসেবে আপনি ভুল বুঝবেন না। পূর্ব বাংলা, বিহার চাটার্জি আর কাজী নজরুল ইসলাম। পূর্ব বাংলা সাম্রাজ্যবাদের অনুগত অঞ্চল, (অবশ্য ব্যতিক্রম) বিপ্লববাদ ধুর্তি আন্দোলনী, আর কাজী আসির একজন চারণ কবি, যাঁর কলম থেকে বেরোয় অগ্নির লাভা।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি বলে রাখতে চেষ্টা করছে।'

আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত বাড়িয়ে দিলেন সুপার।

দরিত্রের এক দিনের আনন্দে মহাকাব্যের জেল থেকে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম।

বলা বাহুল্য আইন পরিচালনের অজুহাতে আমার এক বছরের এবং পূর্ণবাবুর তিন বছরের সাজা হয়েছিল। পূর্ণবাবুর এক-খানা চিঠির গায়ে সাধারিটোলার একটি সুন্দর গন্ধ মাখি দৃষ্টিসের সময়ে পেয়েছিলাম।

(সমাপ্ত)

[illegible]
[illegible]

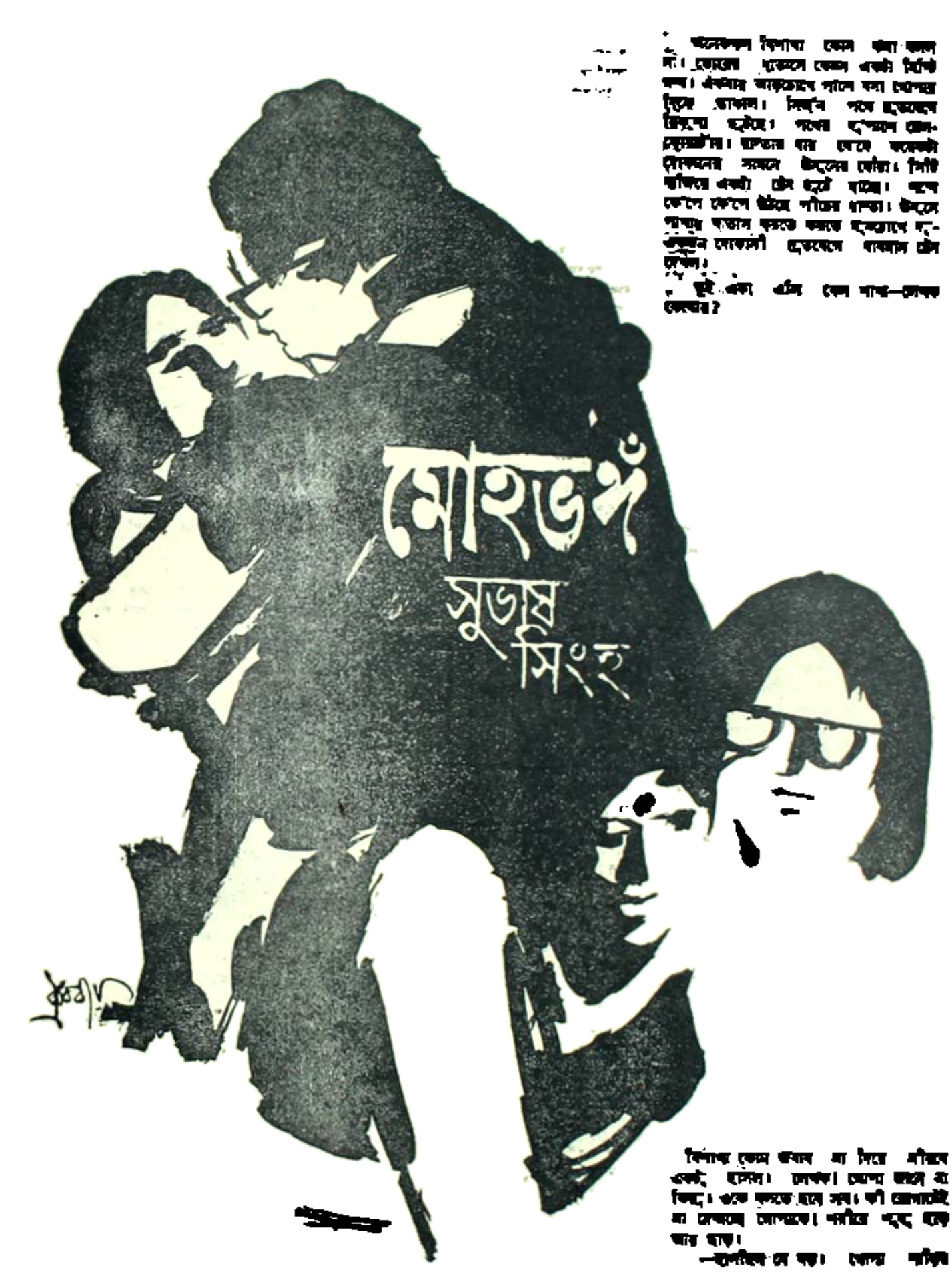

অনেকক্ষণ কিশোর কেমন কথা বলল না। ছোকরা হাওয়ায় কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। একবার আকাশের পানে তাকা যেখানে চিতল ডাকছে। নিস্তব্ধ পথে হুড়মুড়ে ঝিমুচ্ছে ঘুমুচ্ছে। পথের দুপাশে ঘোর-ঘোরান্ধার। ঘাসজমির ধার ঘেঁষে অনেকগুলি গোরুমোষের সামনে উনুনের ধোঁয়া। নিচু ছাদিয়ে একটা ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। ধোঁয়া ফেলে ফেলে উঁচুতে পাঁচিল বাড়া। উনুনে গামছা ঘাতাস করতে করতে হুড়মুড়ে দু-একজন মেয়েলী হুড়মুড়ে বাবুদের ট্রেন দেখল।

—তুই একা এসি কেন মাঠে—ছোকরা মেয়ের?

কিশোর কেমন জবাব না দিয়ে শরীরে একটু হাসল। ছোকরা মেয়ে ঘাড় নিচু। ওকে বলতে হবে সব। কী ছোকরাটাই না মেয়েরা মেয়েরা। শরীর শুদ্ধ হয়ে আসে ঘাড়।

—হাসলি যে বড়। মেয়ে শরীর

ঘাটল দিয়ে মুছে ফেলল। একটু শীত শীত করছিল ওর। সেপ্টেম্বরের শেষ হয়ে এসেছে। পাখার সাফিস্ত চিঠি পেয়ে সে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। 'আসছি। দৌড়ানে থাকিস।' আসতে বলেছিল বটে ওকে অনেকবার। মাথা ঠাণ্ডা-রাখার বন্দুবিধের জন্য অনিচ্ছেয়। তবুও এর এই হঠাৎ আসাটা যেন তেমন তেমন ঠেকল সোপার কাছে।

—এসো। বিশাখা ভীষণপ্রেমে সোপার দিকে তাকাল, যেন অন্য আর কারো হবে না। তাকানোর কী? কিছু কিছু বন্দুবিধে মানিয়ে। আসলটাই যেন স্বাস্থ্যকর মনে হচ্ছে।

—আমার স্বাথা আর আর হবে না। সোপা শুকনো মুখে হাসল, আমার কথা থাক। ভেতর চলো। সেখানকে সঙ্গে আনলি না কেন? বাকাকথা হয়েছে?

—যাচ্ছে বাঁচল না। বিশাখা মাথের ওপর ছেড়ে-রাখা সোপা চিরুনিটা তুলতে তুলতে বলল, ওসব হয়নি, ছেড়ে দিছি। নইলে...। সে হঠাৎ গম্ভীরমুখে অন্যদিকে তাকাল। চোখ দেখে সোপা ভয়ন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল। একে জানাতে হবে। কিন্তু এখন নয়। যথাসময়ে।

ভোতলার সবচেয়ে খেলাখেলা ঘর সোপার। একপাশে সোফার ঘর—অন্য লাগোয়া ছোট্ট বারান্দা। স্থানীয় স্কুলে সে পড়ায়। এখানে এসেছে আজ-পাঁচেক হল। পাঁচ আর পঞ্চ মুই বাদবাকী পঞ্চপাণ্ডব মুখোমুখি।

দুন্দুভেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে মুজনে খাটের ওপর বসল। বিশাখার লাল পিঠে দীর্ঘ একমেলা চুল। বড় বড় ভাসন্ত দুটি চোখ। কথায় চন্দ কথা। নাকটা একটু চাপা। পাতলা দুটি ঠোঁট। ডিভিসনের ভাষা-ভাষি করল। সোপার পড়ল ডিপার্টমেন্টে। সোপার চন্দ কালো। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে চশমা। মুখে সব সময় এক রকমের বিষণ্ণতা।

বিশাখা লম্বা একটা হাই তুলে শুতে যাবে বলল। বড় ক্লান্ত পাচ্ছে। সারারাত ট্রেনে এসেছে। বলে সে ঝিম ধরে শুয়ে পড়ল। সোপা ঘরে বসে স্বীকার করল যে, এখনও সে আগের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য সব আছে। ওর কপালে সিঁদুর নেই। এটা কী ভালো? ভেবেদুরে হয়নি তাই অমন ডিভোর্স করেছে। তাই অমন সুন্দর চলেছে বরবের পর বছর। সোপার বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

—এই শাখা মুমোলি? সোপা বিশাখার চুল ধরে নাড়া দিল, এবার ওঠো বলা বল। সেই তখন থেকে গল্প জমিয়ে যাচ্ছিস। হি-হি-হি। কপালটা আজ বন্দুবাবি ধরে রেখেছিস কেন?

—উঠি হাত মুখটুখি। বিশাখা আড়মোড়া একটা টান দিয়েই সোপা মুখোমুখি হয়ে পড়ল ওর পাশে। কী লম্বা হচ্ছে! যেন মেয়ে দিয়ে যাবে। বিশাখা সামান্য সরে যায়। মুখে মুখোশ কাঁচিয়ে আসছে। জানালা দিয়ে মুক্তরের হাওয়া আসছে। বাওয়া হয়েছে একটু বেশি। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নেবে। মুটি নিয়ে এসেছে। খাবে আর মুমোবে। এবার-ওবার মুছবে।

সোপার মানারকম প্রশ্নের উত্তরে বিশাখা অন্যমুখোমুখি জানাল যে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অন্যকার ঘরে পাশা-পাশি শুয়ে সব সে বলবে। সবাই যখন জানে ব্যাপারটা—সোপার জানতে বাধা নেই। এখন থানিকটা মুমে। অন্তত সোপা চুপ করে শুয়ে রইল। বিশাখা মুমের ঘোরে একবার কী যেন বিড়বিড় করে বলে উঠল।

অন্যকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পেল না। বিশাখা হাত বাড়িয়ে সোপাকে স্পর্শ করল। আজ সব খুলে বলা দরকার। জানালার পর্দা কাঁপছে হাওয়ায়। সোপাকে জানাতে পারলে মন হালকা হবে।

—মুমোলি?।

—না। মুই বিয়ে-টা করলি না যেন?

—আমার কথা থাক। সোপা খিলখিল করে হাসল, প্রসঙ্গ বদলে কথা বল। চোখের সামনে—তাকে সঙ্গে আনলে কী আনন্দই না হোত।

বিশাখা হঠাৎ কান্নায় মুয়ে পড়ল, সে ভয়ানক নিষ্ঠুর স্বার্থপর মানুষ। সোপা, তার কথা আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

সোপা, চুপ করে শোন। মাতলামি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না। আমাকে সব বলতে দে। তোরা চেনক চেনক করে পাগল। চেনক, না হাই। এর চেয়ে সাধারণ কাউকে বিয়ে করলেই ভালো ছিল। সেই ভোরাই হয়ত সেক্রেটারীর চাকরী করত। আর পাঁচজনের মত আমাদের মেয়ে-দেরে বাবারাও বলি হাতে বর খিজত। আমি বাবা মুলে দিয়েছি। আমার বাবারা করলাম।

কিন্তু চোখের ঐ লোকটিকে কী দেখেই ভালি হয়েছে দেখেছিলাম? কবি হাইসেই একদিন আলাপ হয়ে গেল। দেখা ছিপাছিলে চেহারা। একমাথা কুচ কুচ। মুখে দাড়ি। পরনে ভোপা পাজামা আর ঝিলে ঝড়ের পাঞ্জাবী। মুখে লম্বা মুইটে। চোখে চশমা।

অন্দুজকে মুই তিনটি মা। ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড। চোখের লেখক আমার ওর বিষয়ে যেন আগ্রহী। সে যাই হোক, অন্দুজার কাছে চাওয়াই একজন লেখকের চলনো ক্ষমতায়। বাড়িয়ানুষের নয়, তার লেখার।

—তোর মুবীরদা। অন্দুজা এক হাত ধরে টেনে এনে আমাকে একটা চেয়ারে বসাল, আমার বান্ধবী। তোমার একজন ভক্ত পাঠিকা।

চশমার ফাঁক দিয়ে মুবীর ভীষণপ্রেমে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল। ওর দৃষ্টির সামনে মাথা নত হয়ে এল। মুই তো জানিস, মুখে একটা ফালতো ভেতর এই আছি। কলেজে পড়ার সময় ভেতরের সঙ্গে অনেকটা মেলামেশা করেছি। কিন্তু সব সময় নিজেকে গুটিয়ে। সুতরাং মুবীরের সামনে, বাবিক এই ভাবনেসের ভূমিকাটা মোটেই ভাল লাগছিল না; মনে হল ওর ভীষণদৃষ্টির সামনে ভয়ানক নগ্ন হয়ে গেছি, তবুও অন্দুবন্দু হয়ে বসে থাকাটা কী যোক্তিক নয়?

—আপনি অন্দুর বন্দু। বেশ বেশ। একটা ভাতিতে দুটি মুজনে কাজ করেন? আমার কোন্ কোন্ লেখা আপনি পড়েছেন?

অন্দুজার মাকখানে হঠাৎ অন্দুজা উঠে দাঁড়াল, মুই তুমি বলা মুবীরদার সঙ্গে। আমি আসছি।

অন্দুজা আর ফিরে আসেনি। পরে মুবোছি আসলে অন্দুজার মতলবটা কী ছিল। যাই হোক, মুবীর নয়, ওর আরও অনেকগুলি বন্দু-বান্ধবের সঙ্গে পরিচয় হল। কবি দেখলাম। সিগারেটের ধোঁয়া আর চারিদিকে মুবক-মুবতীদের ঠোঁট নাড়া হাসি চোখে চোখে কথা ইত্যাদি...আমার মাথা মুরছে থাকে, বাঁধ আসতে পারে ভেবে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে এলাম। এই পরিবেশে নিজেকে বেমানান লাগছিল।

—কী রে মুবীর! ফালতোটোলায় যাবি না?

—তোরা যা। আমার একটু কথা আছে।

—ওহো আপনাদের কী কথা। বন্দু একজন বন্দুর বিয়ের ভোজে যাচ্ছে, বিয়েবাড়ি যেতে আমার বিয়ে আসে, দিন দিন কী হচ্ছে চারিদিকে বাড়িয়ে। শালা, তোর আসলে বাসনে।

কথা কথনম, মুবীরের চোখমুখে লালের আভা ফুটে উঠল। ওর অন্দুজা মুখে মালাদী-টোলার দিকে চলে যায়। পরে জেনেছি ওখানে মধ্যপান হয়। কবি-লেখকদের মুখে মুখে ওই স্থানের নাম সোনার।

মুবীর হল আমাদের যাত্রা। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ফালতো লেখা-লেখির মুখে

হাওড়া
কুষ্ঠ কুটির

[illegible]

লাগল। আমরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলাম। অন্তরা জানতে পারলে ব্যাপারটা সহজে। বাড়িতে সবাই জানল। বাবা খুব মেজাজ দেখালেন। মা শুধু চোখের জল ফেললেন। কিন্তু ওঁরা বেশি বাড়াবাড়ি করলেন না।

অন্তরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, জল করে ছেড়ে দাও। প্রেম আর বিয়ে এক জিনিস নয়।

—আচ্ছা। আমি কিন্তু ভয়ে ভেসে যাব, যেয়ে কাকে আর ছেলের ডোকলেশান শুনতে চাই না।

—কিন্তু সুবীরদা ছেলে অসভ্য নয়। আর যথেষ্ট আর্নিং ছো।

—সব জানি। লোকে বলবে—বড়লী-পড়ীকে কলম পিষবে কেন? আমি ওকে সাধারণ ছেলেমানুষ ভাবি...হাসিস না... প্রেম্বাস পাবি কিনা।

ও নিয়ে লোপা, মিতে বড়লই ভাবিনি অন্তরার কাছে। সাঁতা সুবীরের জন্যে মনটাকে তোল করলাম। অন্তরাদের সাথী বলে ছেলেটাকে ভালই লাগত। মধুর ছাড়া ওঁর এলাম আমরা। যত সাজলাম ততই মন্ত। আজ ভাবলে একটু অবাক লাগে। সেদিন ওর সাহস পেয়েছিলাম কিভাবে?

শুধু আমি নই, সুবীরও সবাইকে খুশি করে চলে এল। ওর বাড়ির ভাইকে আমি দেখিনি। শুনেছি ওর বাড়ির অবস্থা ভাল। বাবা মা ভাইবোন সব আছে। ওই লোপা পর্যন্ত। ওদের কথা বলতে সুবীর বিষণ্ণ হয়ে উঠত। তখন চুপ করে যেতাম। ধ্বনিও মনে মনে দুঃখ পেতাম।

লপোদের ছেলে বাড়ির এর কাছে ছাপাতাম না। তুমি শুধু লিখবে। তোমার আরও নাম হবে। একদিন তোমার নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। লেখার বদি অর্থ আসে তখন নয়। মা এলেও ক্ষতি নেই। তুমি আমার জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিতে যা। সংসারের সব ভারতব আমার।

এইসব কথাতার সুবীরকে। ও মিষ্টিটি করে হাসত। আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতাম। সুবীর তার নিজেই গভীর রাতে বাড়ি ফিরত। এসেই পরিশ্রান্ত শুয়ে পড়ত। এর অন্যথা আমার। সব হাসিমুখে সহ্য করতাম। শুধু একটা জিনিস আমার ভাল লাগত। ওই আর্তিতে মন ওঠানোর ব্যাপারটা ঠিক সহ্য করতে পারতাম না।

সময়-অসময় নেই, একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘরে ঢুকে হৈ-হুল্লোড় করত সুবীর। চা-টা তৈরি করা, ছেলেমেয়েদের এনে দাও। তারপর সবাই মিলে চলে যাওয়া। অসহ্য লাগত আমার। মনে হত, ছেলে-মেয়েদের ওইসব উদ্দাম জীবনযাত্রা আর পরিবেশের চেয়ে আমি নীচুস্তরে পড়ে আছি।

—দাদা, ওই ঘরটা খালি হবে।

—সে কি। তোমরা চলে যাবে?

—আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। সুবীর খুব বিনয় করল, বড় বোন পড়াশুনোর জন্য ভিতর ঘরে। ওই ছোট ঘরে—তাদের ভাবিয়ে ইনসাল্ট করলে। আমি বলে যাই, কাল-পরশু মিলে ট্রাই-ব্যাগ করি...আর দাদা, এত বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে আমরা ছাড়া আর কোনো ফ্যামিলি নেই, ভাল লাগে না।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার জন্যে বললাম, তুমি যাও না, অন্তরা তোমাদের বন্ধুর পাও ফিরে। কথাটার মানে। আমি ভেবে। লক্ষ্যটি ওইসব জিনিস একটু কম ভেবো।

—আর দিদি। সুবীরের হাসি খুব খারাপ লাগল, এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব সবকিছু।

—যাও ভাই। তোমার ভালর জন্যেই বলছি।

এরপর আর সুবীর কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করল না। অন্তরাদের ছেলে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পড়ার টেবিলে পিছন ফিরে বসল।

জানিস লোপা, মনে মনে খুব আঘাত পেলাম। বাইরে কিন্তু প্রকাশ করলাম না। তখনও আমার আত্মসম্মান খুব প্রখর। ছেলেটি তোমাদের মেয়াদ ঠিক সাধারণ অন্তরাদের মত নয়। ওর খেয়াল। অতএব নীরবে আমার কর্তব্য করে-যেতে থাকি।

অর্তিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এক হাতে সব করতে হোত। রান্না থেকে শুরু করে অন্যান্যদের। তারপর অসিম। সুবীর এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়ে খেত না। এসব কথা আমি হাসিমুখে সহ্য করতাম যদি সুবীরের ইনসাল্টটা ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে না যেত।

অসুখের ফলে আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। সুবীর শুধু বলল তাই তো, এখন কী হবে। মেয়ে যা রান্না করবে। জান দাদা, অন্তরাকে এখানে কয়েকদিন থাকতে বলি—যতদিন তুমি ভাল না হয়ে ওঠ।

অর্তিতাড়ে নিজেকে সংযত করলাম। তীব্র জ্বালা পাচ্ছিল। সুবীর কী আমার জন্যে একটুও সহানুভূতি অনুভব করে না? আমি অসুস্থ হওয়াতে যেন ও বিরক্ত। অন্তরাই বা আসবে কেন? ওর সম্পর্কের আত্মীয়া। অন্তরার মা-বাবাই বা আসতে দেবেন কেন?

আমাকে ওই অবস্থায় ফেলে সুবীর চলে যায়। ওর যাওয়ার পরে ঘর অন্ধকার হয়ে উঠে। কতক্ষণ পর জানি না, চোখ খুলে চেয়ারের পাশের মেঝেয় তাকাই। ঊর্মি অন্তরার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

সেদিন মাসীমার মুখে সবকিছুর কথা শুনে নিজেকে সামলাতে পারিনি। আমার দুচোখের কোল বেয়ে অবিরল জল গড়িয়েছে। উনি কতটা কী বুঝেছিলেন জানি না। বার্লি খাওয়ার দিয়ে গিয়েছিলেন।

—কেন মা মা। আমরা ভেবেছি, তোমার ভয় কীসের? একা লক্ষ্মী মেয়ের মত থাকো।

সেদিন বিকেলেই অন্তরা এল। সঙ্গে সুবীর। অন্তরা দেখতে ঠিক সুবলা ছিল না। কিন্তু ওর চলাফেরার সপ্রতিভ ভাব, মিষ্টিমুখ স্বাস্থ্য এবং সুন্দর করে সেলোয়ার পরার মধ্যে আকর্ষণ ছিল। আমি ওর সেলোয়ার কামিজটার প্রোডেমের সময় অনেক পুরুষের সুন্দর দর্জি অন্তরার নজীর ধারের ছেড়। কলে ওদের দেখে, বিশেষ করে সুবীরের হাসি মুখ, আমি মনে মনে জল পেয়ে গেলাম।

—সেদিন কতটা ভয় পেয়ে। অন্তরা আমার কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করল, থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছিস জ্বর ওঠে?

আমি কোন জবাব দিলাম না। সেই মুহূর্তে অন্তরাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। সুবীরের চোখের দিকে সোজা তাকালাম। ও আমাকে চোখের ইশারা করল না। অন্তরার কাঁধে হাত রেখে বলল, দেখো তো শাশুড়ি এই অন্তরা। কাঁদিনে রাজা হয়ে উঠবে ঠিক নেই। তোমার অবহেলাটি এখানে কাজ করবে। সবাই তোমার অন্তরাকে আমাকে। তুমিও কী হবে করবে?

আমি চোখের সামনে এসব দেখতে পারলাম না। দুচোখ বন্ধ করলাম। কেমনই মনে হতে লাগল, এ ভাষা অন্যায়। আমাকে এইভাবে কষ্ট দেওয়া সুবীরের পক্ষে ঠিক হচ্ছে না। যদিও সুবীর যা অন্তরার আচরণের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা আপত্তিকর। অন্তরা তো এর সম্পর্কে জানে। তোমার কাঁধে হাত রাখা এমন কিছু নয়। কিন্তু তখন আমি এসব যুক্তিতর্কের কথা ভাবতেপারলাম না। মনে হচ্ছিল, এরা আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাক, যা-কিছু অন্তরা চোখের আড়াল। আমি যেন কিছু না জানতে পারি।

সারাদিন আধাআধি ছিলাম আমি। মিতে বলব না, অন্তরা অনেকটা কমেছে

জন্যে। এ ছাড়া [illegible] সলতের ধার্মোমিটার ব্যবহার [illegible] করেছে। তবুও এর প্রতি আমার কম টান হল না। পড়ন্ত বয়সে একটা কিছুর অবলম্বন হারার আশঙ্কায় সর্বদা শঙ্কিত।

মাঝে মাঝে পাড়ার কয় ছেলে এসে হাসির ইঞ্জেকশন আমার কাছে এসে ভিড়তে পড়ত। সুবীর আমার কাছে বড় একটা আসত না। তার অনুযোগেরও শেষ ছিল না। শুধু কয় মুহূর্ত হাসিমুখে ছেলে থাকত। আমি তখনকার কাজ প্রার্থনা করতাম—আমার যেন অসুখ না করে। আমি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য করতাম।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের অনুরোধে সলতে কমাতে যেতে কথার জবাব। সুবীরের পক্ষে তার ওকালতী এখন সহ্য করতে পারলাম না।

—চুপ কর। চোখের মাথা কে কী। ও আজকাল বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

অনুরোধ ছেলেরা চোখে হাসল, এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিল। মনে আছে কী অভিমান—হেসে আর কিছু এক ভিন্নির নয়। সেদিন কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

—আজকাল চোখও বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু কানের বাসা পুরোটাও। এর সহজ নয় বাসা পালটানো। আমি আর পারছি না অনু।

সুবীরের এই ধরন। একেবারে ছেলেমানুষ। ওর মায়ার কথন কী খেয়াল হবে কথা বলা। সেদিন আমাকে টেলিফোনে কী বলল জানিস? আমি, অনু, তুমি কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি। ছেলেমানুষ আর ভাল লাগছে না। আমি বললাম, আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? তোমার বউকে নিয়ে যাও।

অনুরোধ বলল আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি হেসে চুপসে ফেললাম। অনুরোধ কথা ছেড়ে পালিয়ে এলাম বাড়িতে। তাড়াতাড়ি না ফিরলেই ভাল হোত। কেন যে ছেলের সামনে সে কথা বলেছিলাম...।

ইমাদীন সুবীর পড়ার ঘরে ঘুমিয়ে আছে। অনুরোধ ঘুমে কয় ছোট আমাদের ঘরে। ওর ব্যবহারে আমি এত আহত হয়েছিলাম যে, কিছু বলতে ফেলে আমার চোখে জল আসত। ওর অদ্ভুত ধরনের নিস্পৃহতা, আমার কাছে আসলেই গম্ভীর হয়ে, অথচ আমাদের সঙ্গে রীতিমত হাসি-ঠাট্টা—ঠিক বুঝতে পারতাম না আমার অপরাধ কোথায়, শুধু নাই দিয়ে ছেলে করেছে নিজেকে প্রশ্রয়দান সবের জন্যেও।

বাড়ি ফিরে ফেলা সুবীরের পড়ার ঘরে ঢুকলাম। ওরা আমাকে দেখে ঘুমাবে ছিটকে ঘর। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। সমস্ত শরীর থর থর কাঁপছে থরে। কী করবে বুঝতে পারছিলাম না। সুবীর একটি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, বাড়িতে মেয়েছেলে এনে...। কে মেয়েটি? আমি স্পষ্ট দেখেছি সুবীরের কোলে বসে মেয়েটি। সুবীর বাঁ হাত দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে কী যেন পড়ছিল। ওদের সামনে ছোট্ট মোড়া টেবিলের ওপর খুব খোলা ছিল।

—আস্থ, শুনে যাও।

আমি চুপ করে কয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুবীর আমার নাম ধরে ডেকে ডাকল। এখন আমি কী করবো? এখনই চলে পড়ল না আমার কথা। সঙ্গে সঙ্গে চলে আমার ছেলের পড়লাম। লাইট নিভিয়ে বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

●

বিকেলে নদীর পারে দুজনে বেড়াতে এল। বিশাখা অন্তগামী সূর্য দেখল কিছুক্ষণ। আকাশে মানুষজন বড় বেশি নেই। এখন নদীতে জল জলে। এক নদী না জল খাল জলই জল। সোনার মুখে অনেক কথা জমে ছিল। কিন্তু কোথায় যেন হারিয়ে যায়। হিজলের বাদল ঝরে। ভোরবেলা হয়ে ওঠে।

চারিদিকে পরিপাটির সমারোহ। নিখিল সবুজ গাছের ছোপ। দুজনে নদীর ধারে হাঁটতে থাকে। বাতাসে জলে শরীরের আমেজ। সোনা ঝুলনাতের সোহাগের পরশে। গলায় মাতলামি। বিশাখার কাঁধে আলতো লাল।

—তোর বুকি ভর সইছে না। বিশাখা জল হাসল, যা কালকে সুনীল এর পর আর বাকি আছে কি বলবার। হ্যাঁ, পরীক্ষা সকালেই চলে গেলাম সুবীরকে ছেড়ে। বাবা গলাগাল করলেন। মার সহজ প্রশ্ন। কেন চলে এলি? একেবারে চলে এসেছিস? কেন, জামাই-এর কী অসুখ-বিসুখ..... বুঝলি সোনা, সে এক অসহনীয় অবস্থা। একেবারে খুব মেরে গেলাম। অনেকদিন অফিসে গেলাম না। কথা বললাম না কারু সঙ্গে। নিজের ছোট্ট ঘরে লুকিয়ে থেকেছি। তার অবশ্যই চোখে জল এসেছে। অনেক কথা মনে পড়েছে। বিশেষ করে অনুরোধের কথা। প্রেম আর বিয়ে এক জিনিস নয়। ছেলেখেলার আর মানা ভুলে দাঁড়াতে পারবো না। এই ছোট্ট করে চিরজীবন কাটিয়ে দেবার। মানে অসহায়তা...। হ্যাঁ, ওর ছেলেছিলাম। ছেলে খুব ভাইকে ফেলেছে। অনুরোধের সামনে দাঁড়াব কিভাবে। ওর মুখোমুখি কী বিদ্রূপ বলবে উঠবে না।

এক সঙ্গে এত কথা বলে বিশাখা হাঁফাতে থাকে। সমস্ত মুখে উত্তেজনার রক্ত এসে ভরে গিয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিয়ের আগের রূপ ফিরে এসে আসছিল। গঙ্গাস্নানার্থীদের নানা জাতের পাখীর বিচিত্রমিচিত্র শব্দ। ওদের জলা ঝাপটানোর শব্দে মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল সোনা।

বিশাখা বিবাগী সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়া সরে বলে, জানিস সোনা। প্রথমে যা ভাবি সব সময় তা হয় না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাদের চলতে হয়। জীবন এ রকমই। বড় নিষ্ঠুরে। বড় কঠিন। আমিও একদিন সব দুঃখকে ফেলে আবার সবে বেরোলাম। ফের শুরু হোল আমিন। শুরু হোল অনুরোধের সঙ্গে। লম্বা আছে, ছেলে এর বিদ্রূপ হাসি, হাত ছেড়ে কথা ঠাট্টা-তামাশা। শুরুতে হোল ক্লাসিকের অভিনয় উপলক্ষে। তারপর দেখতে দেখতে সব ঠিক হয়ে গেল। সব স্বাভাবিক। সেই অফিস সেই বাড়ি। সেই পরিচিত মুখের মিছিল। আমিও চেষ্টা করলাম ফিরে যেতে পুরনো জীবনে। ভুলতে চেষ্টা করলাম আমি বিবাহিত মহিলা। এইভাবেই দিন কেটে যেতে থাকে। না, আর কোনদিন সুবীরের মুখোমুখি হইনি। ও যে স্বাধীনের স্বাদ-আহ্লাদ পেয়েছে তা আমার পরম জানা। আমি এখন বেশ আছি। সোনা, বেশ আছি বোন। [illegible]

সোনা কী বলবে ভেবে পায় না। বিশাখাকে সে এইভাবে অনুরোধ করল। মেয়ে জামাকে অন্তরায়। শিশির পড়ছে। বিশাখার মুখ ভোর। হ্যাঁ, আমরা যেতে আছি। কিন্তু কী ভিন্নির এই ঘটনা

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

৮২

চিত্রকল্পনা - প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে - চিত্রসেন

অনেকদিন তারপর কেটে গেল। রাজপুতানাকে নিয়ে মহাসংগ্রামের যাঁরা নায়ক ছিলেন একে একে তাঁরা পৃথিবী থেকেই বিদায় নিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রাণা প্রতাপ, তার প্রায় আট বছর পরে সম্রাট আকবর। মেবারের অধিপতি হলেন রাণা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ। দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর
পুত্র যুবরাজ শাহজাহানকে দিয়ে তিনি মেবারে বলে পাঠালেন –
বোলো যে – আমি শুধু মহারাণার বন্ধুত্ব চাই।
কিন্তু বন্ধুত্ব করতেও দিল্লীশ্বরের মনস্কাম নিতে হয়। অমরসিংহ পুত্রকে রাজসিংহাসন দিয়ে রাণপ্রস্থে গেলেন।

ভীলদের পার্বত্য রাজ্যে একটি অদ্ভুত কিংবদন্তী লোকমুখে তখন গড়ে উঠেছে। বিরহিনী ধরণীরই কান্নার বোলের মত আশ্চর্য এক সঙ্গীত লহরী অরণ্যে পর্বতে নাকি মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়। সে কান্নার সুরকে মূর্তি নিতে কেউ কেউ নাকি দেখেছে।
শুনতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ, সেই গান

আঙ্গিনা

বৃত্তি-শিক্ষা

এক-একটা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমরা কলেজপরিমুখে দৌড় দিতে পারি। বিলম্ব হয়ান হতে হবে। তাই রেজাল্ট বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই সাজ-সাজ রব। এত তাড়াহুড়োর করেও হতাশ হতে হয়। অনেকেরই কলেজের দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে হয়। প্রতি বছর একই ঘটনা। এ নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। বছরের কলমের পর্যায় পাতায় সাংবাদিকরা কলেজের ফাঁকি নিয়ে লেখা করেছেন। সমস্যার সমাধানে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। উত্তর সেই এক ; স্থানাভাব। বিভিন্ন পরীক্ষায় যে হারে সফল পরীক্ষার্থী বেড়ে চলেছে সে হারে কলেজ বাড়ানো সম্ভবপর হয়নি। এ-কথা আমাদের সকলের জানা। অনেক পুরোনো হয়ে গেছে।

তবু পুরনো কান্নাটির আমাদের অভ্যেস আনন্দ। ইতিমধ্যে অনেক নতুন-নতুন কলেজ হয়েছে। কিন্তু সমস্যার তৈল চিত্রে অবস্থা অপরিবর্তিত। অর্থাৎ কলেজ যেমন বাড়ছে, ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে সেই অনুপাতে। তাই ঘিঁচি কিছুই হচ্ছে না। সবার এই নেই এই নেই ভাব। অনাবাসনকে বার্থ মনোরথ হতে হচ্ছে। যারা চান্স পেল তাদের আনন্দকে ঈর্ষা করতে করতে আরা রবে ভঙ্গ দিল।

আগামীবছর কলেজে ঢুকতে হবে ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো-আছাড়ায় কলেজ পরিসরে ঘোরে। কলেজে পড়ার আনন্দ এরা উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু এ আনন্দ চোখে না দেখিয়ে। অনেকেই মিইয়ে আসে। তবুও, কলেজে ভর্তিবাদই আনন্দ। পাস করে বেরোনোর পরই কঠিন বাস্তব। সেখানে অপেক্ষা করে আছে অনেক বেকার-বেকারের। একদল সে-সবের সঙ্গে মোকাবিলার পালা।

আমাদের মধ্যবিত্তের পড়াশোনার উদ্দেশ্যই চাকরি। ভদ্র ভাল সিটে পৌঁছনো যেন আর কোন কথা নেই। সে সম্বন্ধে আলাদা। কিন্তু সেরকম ভাগ্যবান কজন? আঙুলে গুণে শেষ করা যায়। আর সবাই ওয়েটিং লিস্টে। ফলে ভাক আসবে কেউ জানে না। ফলাফলের উপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় কোন উপায় থাকে না। চাকরি পেলেও পরবর্তীতে হতে অনেক কষ্ট-কর পেরুতে হয়। এভাবেই আমাদের জীবন কাটে। এর ব্যতিক্রম আমাদের জীবনে বড় একটা ঘটে না।

প্রতিটি পরীক্ষার শেষ দিনে সবাই প্রায় দিবসে মেতে ওঠে। ভিন্ন থাকলেও কোন ফলের নেই। আর বাবের ভিড়ে সেই ভাবের কথা তো বলাই বিলাস। এই সমস্যাই এখন প্রাবল্য পাচ্ছে। লেখা-পড়ার পর বেকার জীবন বড় পেয়েছে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত। ফলের আশায় পুরোদমে ছোটে পড়ে শিক্ষিত বেকারের সেন মেতে ওঠে। একে তো শিক্ষার সমস্যা তার আবার চাকরির সমস্যা। এতো সমস্যার মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সমস্যার জোলক-ধাঁধায় পথ হারিয়ে যায়।

দুটো সমস্যাই এখন পাশাপাশি চলেছে। যেমন শিক্ষা সমস্যা তেমনি চাকরির সমস্যা। দুটোই প্রবল। একের চৌকাঠ পেরোলে যার তো আরেক প্রতিকূলে। সবাই এখন এ-দুটো সমস্যা নিয়ে ভাবিত। পথের হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। আর তবে পাওয়া যাবেও জানা যায়নি। সবই অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

সাধারণ শিক্ষার এই হাল। আর এজন্যই আমাদের কত না ঘাম ঝরে যায়। ফলেজী শিক্ষা বলতে সম্ভবত আমরা এটুকুই জানি। এর বাইরেও যে ভোকেশনাল শিক্ষা আছে এবং হতে পারে তবুও খোঁজার আমাদের আগ্রহ নেই। জানা থাকলেও আমরা সে পথ বাড়াইনে। অনেকখানিই স্বভাব বলে।

আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষিতের হার খুব টেকনিক্যাল হ্যান্ডের সংখ্যা তার কম। মহিলা ডাক্তার থাকলেও আমাদের দেশে দেখা যায়, মহিলা ইঞ্জিনীয়ার সে তুলনায় খুবই নগণ্য। আর করে দেখা নিজে দেখা যাবে হয়তো সকল বিভাগের মুক্তী ইঞ্জিনীয়ারও আমাদের দেশে নেই। অনেকখানি আগ্রহের উৎসাহ ছিল মুক্তাক্ষরে হলো। অবশ্য একটা কথা আমার মাঝেই আছে। উনিশ তো পড়াশ কি যাদুর সাথে প্রথম মহিলা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শিবপুরে ডিগ্রি ফলের দেখে পাস করে বেরুনোর পর অবে ডিগ্রি তা জানা যায়।

অথচ দেশে দেশে মহিলা ইঞ্জিনীয়ারের কত ছড়াছড়ি। রাশিয়া, আমেরিকা এমন অনেক পশ্চিমী দেশে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহিলা ইঞ্জিনীয়ার দেখা যায়। ফ্রান্সিসকী বিদায় যে দেশগুলির উন্নতির মূলে আছে এই মোর প্রমাণ। যারা-পুরুষ সবাই ফ্রান্সিসকী বিদায় হাত পাকাচ্ছে। সমাজের আছে কথা, চলাফেরা আমাদের মতো হা-চাকরির ঘর খুলে শিক্ষিতের দল ঘরে বেরুয় না। সবাই চাকরি পায়। খোলামা অনুপাতে। সাধারণ শিক্ষাও সেবন দেশে কদর আছে। তবে আছে যথোপযুক্ত নেই। যেমন সাধারণ শিক্ষা তেমনি কারিগরী শিক্ষা। নিজের আকর্ষণ এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আমাদের আছে। উন্নত শিক্ষা হাত বাড়াবাড়ি করে স্বয়ম্ভরে এগিয়ে চলেছে। আর ছেলে মেয়ের কথা, শিক্ষালাভের জন্য এদেশে আমাদের হাত বাধা ছুটি আছে হয় না। শিক্ষা এবং চাকরির সুযোগ সেখানে আছে। তবু বলবো, আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষার বড়খানি কদর বা ভোগরাজ কারিগরী শিক্ষার তত্ত্বখানি গড়ে ওঠেনি। ভোগরাজ যেমন ছিল না সুযোগও তেমনি কম। পলিটেকনিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক নাম আমাদের সমাজে এর আগে মোটেই সুযোগ সুবিধা ছিলনা। নিশ্চয়ই আসনসংখ্যা পুরোদমে কোন আবিভূত হবার কথা নয়। হয়তোও না। সেখানেও নিশ্চয়ই কেউ না কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যেতেন। স্থানাভাবে ইঞ্জিনীয়ার হবার সাধ তার জন্মমৃত্যু থেকে যেতো। হতাশ হবে তিন পুনের যখন স্থানাভাবের জন্য তার উত্তরাধিকারীরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দোর থেকে ফিরে আসবে না। আর সেদিন শু-একজন নয়, আসবে ঝেরে কারিগরী শিক্ষার উৎসাহী হবে। উৎসাহ বাড়বে, সুযোগও বাড়বে।

কিন্তু এই সুযোগের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকদিন। দেশ স্বাধীন হবার ঘটনা তখন অনেকটা পুরোনো। কেন্দ্রীয় সরকার মেয়েদের কারিগরী বিষয়ে উৎসাহী করার জন্য দেশের চারটি জায়গায় পলিটেকনিক খুলে করার পরিকল্পনা নেন। মাদ্রাজ, পুরোদস্তুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নয়। দিল্লী বিহারে ডায়প্লোমা উৎসাহ। তবু এ-প্রোজেক্ট এগারোজন এগিয়ে এলেন পড়াশুনা। আর এই কুপমণ্ডুকি থেকে আমাদের এবং আমি কথার পরিচয়ও হয় পড়েছে না।

সেটা ১৯৬৩ সাল। সেশনের মাঝামাঝি। কলেজেই মেয়ে মহিলাদের একটি বিভাগ পলিটেকনিক চালু হলো। নাম, উচ্চতর পলিটেকনিক। সংগঠকরা ভুলে আসনা সেন অবস্থা তার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই নিজেরাই প্রচারকার্যে

মেয়েটার কালকাটা পলিটেকনিক-এর দরজায় প্রথম পদক্ষেপ হলো। আলাদা লাবরেটরী এবং আলা সবকিছুর ব্যবস্থা হলো। আশা রাখলো, ভবিষ্যতে সব ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দ হবে। প্রথম মহিলা পলিটেকনিক কারো অপেক্ষারী হয়ে থাকবে না।

পোড়ার পরিকল্পনা ছিল বিরাট। চারটি কোর্স চালু হবে। যার মধ্যে থাকবে আর্কিটেকচার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্সিয়াল, লাইব্রেরীয়ানশিপ এবং সেক্রেটারিয়াল কোর্স। পরিকল্পনা বিরাটই ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা অনেকখানি সংকুচিত হয়ে গেল। কারণও ঐ একই, টাকা নেই। এখনও পুরো কোর্স চালু সম্ভব হয়নি। আর কবে যে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলাও সম্ভব নয়।

পলিটেকনিক শুরু হলো। মেয়েদের জন্য। কিন্তু সাড়া কিসের পাওয়া গেল না। প্রথমের অবস্থা সেই একই। এখন সাধারণ সম্ভবত খোঁটা-বাঁটার পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি না। এখানে এসে আমরা সম্ভবত আসল সেই অবহেলার জায়গাটায়। কারিগরী বিষয় এরা এখনও আমাদের মেয়েদের জন্যে ভেবে দেখেনি। ১৯৬১ সেন্সাসে '৭০-এ প্রবেশ করেও তাই উত্তরপ্রদেশ পলিটেকনিক কলকাতা শহরের সংখ্যা নগণ্যই হয়ে রইল। নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু ব্যবস্থার কোন কোন দুটি রাখা হয়নি।

১৯৫১ সালে শিবপুর বি-ই কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রিধারী প্রথম মহিলা শ্রীমতী ইলা ঘোষ এই পলিটেকনিকের প্রধান। সম্পূর্ণ ঘোষা পাবেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পড়েছে, সন্দেহ নেই। তিনি যে শুধু প্রথম মহিলা মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও সুপটু। শিবপুর থেকে পাশ করার পর তিনি লন্ডনমেলা যান। সেখে ফেরে ১৯৩৩ সাল নাগাদ। তারপর চাকরীর শুরু করেন মেয়েদের জন্যে অভিপ্রেত কলকাতায়। কিন্তু চাকরীতে মন বসলো না। চলে এলেন ডিটিস লাইনে। নিজে পলিটেকনিকে যোগদান করেন। তারপর আসেন ইন্ডিয়ান জুট টেকনোলজিতে। সেই শিক্ষকতা।

শিক্ষকতাই শ্রীমতী ঘোষকে সেরা বলেছে। তাই উত্তরপ্রদেশ পলিটেকনিক থেকে যখন ডাকির ফেরবার ডাক এলো, তখন আর তিনি দ্বিরুক্তি করেননি। এই প্রতিষ্ঠান অনেকখানি তাঁর নিজের হাতে গড়া। সামান্য কিছুদিন বাদ দিলে তিনি প্রায় গোড়া থেকেই এখানেই আছেন। যদিও অসুবিধা কিছু হচ্ছে। একসময়ে দুটি বই লিখে তিনি যেন যথেষ্ট অর্থ করেছিলেন এবং এই মহিলাদের জন্য চলে গেছে। কিন্তু ডিপ্লিপ্রদানের তারিখ ফেরার পর ফেরবার আর এসেছেন।

শ্রীমতী ঘোষ পলিটেকনিকের সব কথা বলে যাচ্ছিলেন। তারপর বললেন, এখনকার ডিগ্রীটা আজ সেই ডিপ্লোমার মত দেখাচ্ছে। এরা সকলেই ডিগ্রীকামনা করছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ কলেজে এসেছে। তারিখারী বিষয়ের মেয়েদের আগ্রহের কোন অভাব নেই। সবাই খরচার অনেকখানি নিজে পড়াশোনা করে। প্রথমদিকে এ মেয়েদের মধ্যে আসছে। আর এজন্য খুব একটা চেষ্টাচরিত্র করার দরকার হয় না। সমাজের মেয়ের মেয়েরা সহজেই পলিটেকনিকে ভর্তি হতে পারছে। আর পাশ করার পর চাকরির জন্যও খুব একটা ভাবতে হয় না। হাতের কাজ আজ অবধি তার কদর সকলের আগে। তাই সাধারণ শিক্ষার বদলে তারিখারী বিষয়ের মেয়েরা আজো বেশি উৎসাহিত হচ্ছে। তারপর তিনি লোকেদের পলিটেকনিকের মেয়েদের তারিখারী বিষয়ে অপরিসীম উৎসাহের কথা।

এরপর তিনি জানালেন, প্রথম মহিলা পলিটেকনিক হিসাবে আমাদের সমস্ত স্থান নির্ধারিত হলে ভালোভাবে শিক্ষাই আরো বাড়বে। আমরা তখন সকলেরকমের আমরা ছাত্রদের ভর্তি করতে পারবো।

—প্রবীলা

ভৌতিক সমাধি

আমাদের দেশের বেশীরভাগ লোক শুধু মিশরের মমির কথাই জানে, কিন্তু এক আফ্রিকাদেশেও 'ইনকা' নামে এক প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে মৃতদেহকে মমির মত তাজা ও অক্ষয় রাখার পদ্ধতি ছিল। একথা আজ অনেকেই জানেনা। আজ 'ইনকা' জাতি বিলুপ্তপ্রায় হলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইনকারা একটি সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্যবান জাতি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল আন্দিজ পর্বতমালার কোল ইন্ডিয়ান অঞ্চলগুলিতে ইনকা সভ্যতার অনেক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এরা শিবলিঙ্গের মত কোঁকড়ান লোম-রেখাকে উপাসনা করলেও মূলতঃ সূর্য-দেবতার উপাসক ছিল। সূর্যদেবতার মন্দির-গুলির ভেতর ইনকাদের মৃতদেহগুলি মমির দিয়ে রক্ষা করে রাখা হত। এদের বিশ্বাস ছিল আত্মিকদেহেই ইনকা কুমারীদের সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হোত। এরা সকলেই কাঁচের আবরণে সূর্যমন্দিরে দেবদেবীর সমস্ত জীবন কাটাত বিনা, একবার দেবের প্রসাদ লাভ আর কারো এদের সঙ্গলাভ করার অধিকার ছিল না। জনসাধারণের নিবেদিত সূর্যের পূজো এই কুমারীদের মাধ্যমেই দেবতা হোত, এরা দেবতার আসন-প্রতিনিধি এক মধ্যবর্তী, তাদের 'ইনকার' পরিচয়ে পরিচয়। এক কথায় এরাই ছিল দেবতার ও জনসাধারণের যোগসূত্র। এদের বলা হোত এক্লাকুমা।

মন্দিরের মূর্তিগুলো এরাই ছিল সাধারণ লোকের কাছে দেবী। এক্লাকুমারা যারা দেবে যাবার মেয়েদেরকেও বাছাই করে মন্দিরের মতো রাখা হোত, এবং লোকের বিশ্বাস ছিল এদের মৃত্যু নেই, সমাধিকক্ষেও ঘুমিয়ে থাকে। কখন কত ওঠে, প্রকৃতি তাদেরকে দেবে ওঠে, তখন এরা জীবন্ত হয়, এবং এই সময়ে সেই মন্দিরে যদি কেউ ঢুকে সেই শূন্য দেখে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এই বিশ্বাস এত বদ্ধমূল করে লোকের মনে প্রচলিত থাকায় স্থানীয় মেয়েদের সাহস করে কেউ মন্দিরের ধারে কাছে যেতও না। ফলে সমস্যার পরিত্রাণ হয়ে মন্দিরগুলোর অস্তিত্ব কয় জনগণের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল কেউ তার খোঁজ রাখল না।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যখন ফরাসীরা এই দক্ষিণের একাকুমাদের মন্দিরগুলোর উদ্ধার করবার জন্য অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, যেসব অভিযাত্রীরা এই ধরণের অভিযান চালিয়ে গেছেন, তাঁরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেননি। ফলেই এই একাকুমারা সবার সমস্ত থেকে রহস্যাবৃত হয়ে ওঠে, সেটাই যা এই অভিযানে যাবার প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেন না, এর ইতিহাস কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি।

সেদের বিশ্বাস ফরাসীরা অতি সাধারণ মানুষের মত, পরিচালনায় ও ফরাসীদের অভিযানে চালিয়ে আন্দিজ পাহাড়ের গভীর জঙ্গলের মধ্যে এইরকম একাকুমাদের সমাধি-মন্দিরের সন্ধান পান। তিনি এই অভি-যানের মূখ্য কারণ হলো এবং মন্দিরের নির্জন সমাধিমন্দিরের ভেতরে পরিস্থিতি দেখেই কেন্দ্রকরণে প্রাণ নিয়ে সন্তর্পণে পালিয়ে আসে, তাঁর পরে বহুদিন আর কেউ এদুকম হতে সাহস করেনি। তিনি তাঁর অভিযানের অভিজ্ঞতা বেতারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং তাঁরবারো উপলব্ধি করে তাঁর বহু সাহসী লোকও আর এইরকম অভিযানে ব্রতী হতে এগিয়ে আসতে পারেনি।

পরবর্তী যুগে এ্যালোইন নামে আর একজন ফরাসীদেশের অভিযাত্রী যুবক ইন্ডিয়ান সঙ্গী নিয়ে বহু অনুসন্ধান চালিয়ে এইরকম একটি ভূগর্ভস্থ সমাধি-মন্দিরের সন্ধান পান। অভিযানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, তাদের অভিযান ছিল নির্জন, ভয়ানকভাবে, সঙ্গে অফুরন্ত মালপত্র সরঞ্জামাদিও। এখানে প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। প্রাচি-দিনে ছিল জঙ্গল অনুসন্ধান, সমস্তদিনের

অন্ধকার। জীবন্তকুমার অন্ধকারে ইতিহাসবর্ণিত, মন ও তথ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ তাদের মনকে খুব ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। অথচ সাহস ও মনোবল নিয়ে তাঁরা চলতে চলতে এক বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন এটাই একটি কোন একজনের সমাধিমন্দির, হয়তো হাজার বছর ধরে মানুষের কাছে অবহেলিত হয়ে এই জঙ্গলে পড়ে আছে।

অসীম সাহসে ভর করে তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি প্রকাণ্ড হলঘর দেখতে পান। হলঘরের মধ্যখানে লম্বা বেদীর ওপর মাঝারি করে ঢোলাই একজনের মৃতদেহ মাঁস করে উপরে কফিনে শায়ন অবস্থায় দেখা যায়। ঢোলাই কুমারীর বহুকালের মৃতদেহ, তবুও কি জীবন্ত তাদের দৃষ্টি। অতি সন্তর্পিতে সাহে তারা যেন সবা দৃষ্টিতে পড়ছে, একটু নড়া হলেই এখনি যেন ফেলে উঠবে। এই নিস্তব্ধ জনমানবহীন হলঘর কাঁপিয়ে এই দৃশ্য দেখলে অতি বড় সাহসীরও বুকে কাঁপনের শব্দ। এলোটাইন এসবেই জীবন্ত হওয়ার দৃশ্য যা দেখলে আজি কেউ বেঁচে ফেরে না, তাইই জন্য উত্থালি করতে এসেছেন, তাইই তিনি বিচলিত না হয়ে প্রতিমূর্তির পাশে গিয়ে গভীর মনোযোগে নিয়ে দেখতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বাইরের প্রকৃতিতে যেন উঠেছে তাণ্ডব লীলা, ঝড় ও বৃষ্টি এবং বাজের ঘন-ঘন আওয়াজ জীর্ণ মন্দির কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরের অসীম জন্তুরা এসেছে মন্দিরের এইজনের পরিত্রাণকে রক্ষা করতে, এ ভেবেছে তারই বিশ্বাস। মন্দিরের একমূর্তি সমাধিতে আজ যারা একদিন জীবিতকে পাহারায় দিয়ে এসেছে বাইরের প্রলয়ের স্পর্শ থেকে আজ তারা যেন সমবেতভাবে প্রকৃতির হুংকারের মধ্য দিয়ে এই তিনটি বিদেশীদের অসীম সাহসকে তাদের প্রবল জোরে অপমান করে উঠতে চাইছে। মন্দিরের জানালা দিয়ে বৃষ্টিফোঁটা জলো এসে মমিগুলোর ওপর পড়ছে। একমূর্তে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এলোটাইনের মনে হল মমিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে। তাদের ঘোলা চোখে যেন দৃষ্টি ফিরে আসছে। ওষ্ঠাধরগুলো ঈষৎ চিকচিক করছে এবং আর্দ্র বাতাসের স্পর্শে সেগুলো যেন ধীরে ধীরে কাঁপছে। অল্প-পরেই একটা বিকট দুর্গন্ধময় হলঘর-মধ্যে সমস্ত মন্দির ভরে উঠতে লাগল। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও যেন কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন এলোটাইন। যদিও সাহসী হলেও তিনএই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধি যেন লোপ পেতে গেল, তাহলে সত্যই কি এই মন্দিরে থাকলে আর প্রাণ নিয়ে ফেরা যাবে না? আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে তাঁরা তিনজনেই তাড়াতাড়ি মন্দিরের বাইরে ছুটে চলে গেলেন।

এতক্ষণ একটা বিরাট গ্যাস তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন বন্দি করে নিচ্ছিল। মুক্ত বাতাসে এসে তাঁরা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলেন। তাঁর যেন ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞাহীন এই স্থান পরিত্যাগ করতে চাইল। অলো-টাইন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সমস্ত পরিস্থিতিটা পর্যবেক্ষণ করে মমিদের জীবন্ত হওয়ার রহস্যটা উদ্ঘাটন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু তাঁরা মন্দিরের ভেতরে মন্দিরের উপযুক্ত পরিত্র ধরনের নিয়ে যে গ্যাস তাঁর যোগে বেরিয়ে আসছে, অর্থাৎ বাইরের তাদের কষ্ট নেই। প্রায় ঘন্টাখানেক পরিশ্রম-সহন করে অভ্যন্তরের থাকার তাঁরা সকলেই সেইস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

বেরিয়ে ফিরে বহু রাসায়নিক বিষয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি এই জায়গার সন্ধান পান, এমন এক গ্যাসের যার অল্প মাত্রা যা জল বাতাসের স্পর্শে এসে বিষাক্ত দুর্গন্ধময় গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই থেকে তিনি বুঝতে পারলেন এই মমিগুলোর দেহে এই জাতীয় কোন বিষাক্ত গন্ধের ও অক্সাইড লিপ্ত করে সজীব করে রাখা ছিল, এবং মৃত্যুর সময়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে সৃষ্ট প্রবল বাতাসের স্পর্শে এসে ঐ দেহগুলোর থেকে এক মারাত্মক দুর্গন্ধময় বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এতে মন্দিরের যারা যে কারণে অন্যান্যদের আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে সেই সময়ে মন্দিরের উপস্থিত কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারবে না তাদেরই মমিগুলো যা এক্সকুমারের মন্দির দেখতে এসে কেউ যে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না এ বিষয়ে-নিশ্চয়ই এতেবারে অসীম নয়। এবং এই সম্ভাবনার গ্যাসের প্রায় ভিন্ন ধরনের সব-কিছুই কাঁপতে থাকায় মমিগুলোরও চোখ-মুখ কাঁপছে, এ চোখের ভ্রমও অস্বাভাবিক নয়। এ সব কিছু তিনিকে এমন একটা বৈজ্ঞানিক রহস্যের প্রবল কৌতূহল এক লড়াকার রূপে-রূপে ধরে দেখি এসে সমস্ত যে এক্সকুমার সব সন্তাপের থেকে প্রায় নিশ্চিন্ত হোয়ে। এক্সকুমার রহস্য সম্পর্কে অজানা থেকে গেল।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

সুবোধ মল্লিক ও রামকুমার বসাকের ছবিতেই শিল্পী অবনীন্দ্র তাঁর আঁকা-এর শিক্ষা-লাভ করেছেন। প্রথম বর্ষের ১১৬৭ সালে এম ফিজিক্সের ১১৬৯ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করে বেরিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ইতিমধ্যেই বহু ছোট প্রদর্শনী এবং একটি করে একক প্রদর্শনীও করেছেন। মাত্র ৬৭ কিলোমিটার থেকে ২ জানুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে এঁদের আঁকা ২৩ খানি তৈলচিত্রের একটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এঁদের দুজনেই আঁকা ফিগারেটিভ এবং ডেকরেটিভ শিল্পের চর্চা করছেন। এর মধ্যে রামের ব্যানার্জির আলপনাচিত্রে গতিপ্রকৃতি এবং রঙের কাঠামো নিয়ে কতকটা জ্যোমিতিক ছন্দের সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। অনেক ছবিতে গাইপালার গঠনে মানবাকৃতি আরোপ করে এই মডে সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন 'আপারিশনস' 'স্প্লেটড হ্যান্ডস' 'বিহাইন্ড দি মেসেজেস' ইত্যাদি ছবিতে। 'ফর্মবিডন ফ্রুটস' ছবিতে নর ও নারী-আকৃতি নিয়ে কতকগুলি জ্যোমেট্রিক ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। অনেক ছবিতেই তাঁর ছবি বিশ্লেষণ করা মুশকিল। তবে কম্পোজিশন বা রঙ যেমনটাই হোক না কেন পরিচ্ছন্ন নয়। তুলির টানেও আড়ষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নিজে পরিচিতি প্রতিকৃতি ছবি বা হলেও ভাল লাগে। 'ব্রেকফাস্ট' 'আর্ট' এবং 'ফুটবলার' ছবিগুলির গঠন ও বর্ণ পরিচালনা প্রশংসনীয়।

কিশোরদের মধ্যে সরকারি চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল, পরিচালনার ওপর ভার ছিল, ছেলে ছিল, আলঙ্কারিক বিন্যাস ও বিভিন্ন ধরনের কারু-শিল্পের বিভাগও প্রদর্শিত হয়েছিল।

এবারে ছেলে ছাত্র-এর বিভাগে কি-ভেরেছেন্টেশনের আঁকা প্রায় সমান সংখ্যার দেখতে পাওয়া গেল। কিভেরেছেন্টেশনে আলঙ্কারিক রূপের পরোক্ষে কৃষ্ণ আঁকা ধরেছে 'সেমিটারি' এবং কাঁচা আঁকার সেই ধরনের অ্যাবস্ট্রেক্ট ধারা বিশ্লেষণে মাইকির 'ডেপার্টচ' ও 'লাইফ স্টাডি' এবং উৎপলেন্দু সে আর রামকুমার বসাকদের দুখানি লাইফ স্টাডি উল্লেখযোগ্য আঁকা। আঙ্গিকের ধরনের আঁকার ধারা রামকুমার বসাকদের ৪নং কম্পোজিশন, সোমনাথ হোরের ৩নং কম্পোজিশন এবং বিশ্লেষণে মাইকির ১নং কম্পোজিশন সুন্দরভাবে আঁকা। রঙের ব্যবহারও প্রশংসনীয়। অলঙ্করণ ছাঁদের নানারকমের ও পরিচয়ের দুখানি ছবি। এর মধ্যে অনিমেষ মাইকির পরিচয়ের ছবি 'ফাইন' এবং রামকুমার বসাকদের 'বিবর্তন' ছবিতে নানারকমের ও পরিচয়ের পাওয়া যায়।

ডিজাইনের রীতির ধারিতে অপর্ণা সেনের ডিজাইনের ওপর ধরনের আঁকা হিসেবে পরিচয়। এর পর নাইন্থারাজীর স্কেচিংস কল্পনা, রৌনকের ফর্মের ধরনা নিয়ে কম্পোজিশনের উল্লেখ করতে হয়। পরীক্ষামূলক আঁকার মধ্যে দীপ্তি পালের লিয়ার ছবিটি ভাল হয়েছে। ডেকরেটিভ ধরনের 'অবনীন্দ্র' ছবিটিও এধরনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিভিন্ন মিনিয়েচারের অনেকগুলি ছাপও প্রত্যেক বছরের মতই এবারও উপস্থিত। তবে এই বিভাগে লক্ষণীয় ছবি বিশেষ চোখে পড়ল না।

গ্রাফিক ও স্কেচ বিভাগে আরেকটু ভাল কাজ দেখা গেল। বরুণ ধাড়াজি, সুবোধ মল্লিক, সুনন্দা সিংহ, মার্কণ্ডী ভরদ্বাজ উৎপলেন্দু সে, বিশ্বপতি মাইতি প্রমুখ কয়েকজনের কাজে অঙ্কনের তুলির ও সাবলীল ছন্দ চোখে পড়ল। গ্রাফিকের মধ্যে ছোটদের, সুবোধমল্লিক ও বিশেষ করে শীলভদ্রের লালের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। অঙ্কন ও স্কেচের বিভাগে কাঠপেন্সিল ও কলমের সাহায্যে কাজ ও ব্যবহারের ক্ষমতাবিশিষ্ট অনেক কয়েক বিশ্বপতি মাইতি ও সুবোধের কাজ উল্লেখযোগ্য।

অলঙ্করণের এবারে মধ্যমমানের প্রদর্শিত হয়েছে। ফোটোগ্রাফির বিন্যাস ও রঙীন-ফুলের কাজের সৃষ্টি লাইফ স্টাডি এবারে। অন্যান্য নিবেদনীয় কাজের অলঙ্করণ এবং ফোটোগ্রাফির বিন্যাসের আবেদনটুকু এবার ১ নং অলঙ্করণের চেয়ে সমধর্মী হয়। মধ্যে অলঙ্করণ কাজগুলির রূপ যেন খুলতে চায়নি।

আর্কিটেকচার বিভাগে দেওয়াল, ফ্লোর আয়রন, গ্লে কার্ড, ফিবেরগ্লাস ফোম, ফোমকার্ড, রেজিন কাস্টিং, পার্সপেক্টিভ কাঠের কাজের ও নিজেদের আইডিয়ার অনেকগুলি বিভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠানের মত এবারেও দেখা গেল। তবে পেন্সিল ও ফোমকার্ডের কাজগুলিই বেশী ভাল হয়েছে বলে মনে হল—বিশেষ করে ফোমকার্ডে পেন্সিল। কাঠ, সিমেন্ট মাটা ফলক, মাটির এবং কাঠের কাজগুলির ব্যবহারের মতই সুন্দর হয়েছিল।

●

রেখা ছোট সম্প্রতি (৩ থেকে ১৩ জানুয়ারী) কেন্দ্রীয় গ্যালারিতে ১৪খানি তৈল চিত্রের প্রদর্শনী করলেন। অভিমানের সরলীকৃত বিন্যাস নিয়ে করা এই অলঙ্করণের পার্শ্বদৃশ্যগুলি ভোতাকা এবং সঞ্চালন তুলির চলনের সুন্দর তবে বৈচিত্র্য বেশী নেই। ছবির প্রায় একই ধরনের সবুজ, নীল, লাল ও বাদামীর প্রাধান্য থাকায় একঘেয়ে লাগে। তেলীয় ভাব ছাড়াই ছোট কিন্তু সৃষ্টি অলঙ্করণের বড় অলঙ্করণ ছবি কয়েকটা ফোমকার্ডের বিভিন্নভাবে সুন্দর হয়েছে—উৎপলেন্দু এবং 'অলঙ্করণ ১' ১৬ নম্বরের ছাইট ছবির উৎকর্ষের অলঙ্করণের এবং লাল, বাদামী ও নীলের ব্যবহারে বেশ বৈচিত্র্যময়ী হয়েছে।

—চিত্ররসিক

চিত্রশালী ও রামকিঙ্কর সিং

দেখার শক্তি

বিশেষ বিশেষ ছেলেমেয়ের উদ্দেশে প্রচারিত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানসূচির মাঝ খানটায় বয়স্কদের এবং এইসব এক বিশেষ ছেলেমেয়ে শিক্ষিকাদের উদ্দেশে প্রচারিত শিক্ষামূলক বিষয়ে আলোচনাও করেছি।

এইবার আর একটি বিশেষ ছেলেমেয়ে হলো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের জন্যও নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা-হয়। ইংরেজীতে এই অনুষ্ঠানের নাম "স্কুল ব্রডকাস্ট"।

"স্কুল ব্রডকাস্ট"-এই আজ ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক বিশেষ 'ছেলেমেয়ের উদ্দেশে প্রচারিত প্রথম অনুষ্ঠান। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাই কেন্দ্র স্কুলের ছোটো ছোটো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক সব অনুষ্ঠান প্রচার করতে সুরু করেন। তারপর ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ কেন্দ্রে এক ব্রডকাস্ট সার্ভিস চালু হলেন, তবে স্কুলের বিশে বেশী ৫৫ থেকে সাড়ে ৫৮ বছরের শিক্ষা কার সঙ্গে তাদের আলাপ করত। এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য অপারেশনের তাঁদের ক্লেশটি স্কুলকে রেডিও-সেট বিতরণ করেন। তাদের রেডিও কিন্তু তখনও তাল ইণ্ডিয়া রেডিওর অধীনে আসে নি। তাল ইণ্ডিয়া রেডিও আমার কেন্দ্রটি নিয়ে নেবার ফলে বহু অনুষ্ঠানের কথা এই।

তাল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রে "স্কুল ব্রডকাস্ট" চালু হয় ১৯৩২ সালে। তখন এটা নিয়মিত অনুষ্ঠান ছিল না। স্কুলের ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলকাতা কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার সুরু হয় ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে। সপ্তাহে তখন দুটিমাত্র অনুষ্ঠান করে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হত।

এই অনুষ্ঠানকে তখনও সর্বভারতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে "স্কুলকাস্ট" বলা হত। প্রায় এই সময়েই তাল ইণ্ডিয়া রেডিও এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন, এবং দেশের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করতে আরম্ভ করেন এই অনুষ্ঠানে বলার জন্য। তাল ইণ্ডিয়া রেডিও মনে করলেন, "স্কুল ব্রডকাস্ট"-এর মান আরো উন্নত হওয়া উচিত। এর উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁরা বিশ্লেষণ করলেন। এবং অবিলম্বে এই অনুষ্ঠানটিকে একটা বিশেষ রূপ দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

সারা ভারতের সমস্ত কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠান প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে। ঠিক হল, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বশে সমস্ত কেন্দ্রে এই সময়ে এই অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হল না। দেখা গেল, নানান ও অসুবিধার এই অনুষ্ঠান সুরু করতে প্রায় সাত-আট বছর দেরি হল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এখন প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এবং ছোটো ছোটো কেন্দ্রগুলির অধিকাংশ থেকে ঐ অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রগুলির অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার (রিলে) করা হয়।

একদা এই অনুষ্ঠানগুলি শুধু স্কুলের ছাত্র ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে প্রচারিত হত না, এখন প্রবেশের উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রচারিত হয় এই অনুষ্ঠান। এবং এইসব অনুষ্ঠান পরিকল্পনার "গ্রহণ" নেবার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করে কনসালটেটিভ প্যানেল বা উপদেষ্টা পর্ষৎ আছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই অনুষ্ঠান প্রচলনের গোড়াদিকেও যেমন কোনো কোনো মহলে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও পরিধি সম্পর্কে তাঁদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, এই অনুষ্ঠান হয়তো পরিণামে শিক্ষকদের স্থান দখল করে তাঁদের পরিহার করে তুলবে এবং তাঁদের অকর্মণ্য করবে। এই অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য যে শিক্ষকদের স্থান দখল করা নয়, তাঁদের কাজ সম্পূরণ করা তা তাঁরা তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, স্কুলের পাঠক্রমে যেসব বিষয় সমাবেশ, গ্রহণ করা হয় না, সেইসব বিষয়ে আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের মনের দিগন্ত প্রসার করা। এবং দ্বিতীয়, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিসাবতো পেশাদার বাদ্য না, এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্কুল ব্রডকাস্টের জন্য বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচী চলন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠানসূচী নিয়ে কয়েক পক্ষিকা তৈরি করে আগে থেকেই তা স্কুলগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সেইমতো যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এদিক দিয়ে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু নিয়মিত এই অনুষ্ঠান শুনবে ছিলাশীল শ্রোতাদের এই বলাই হবে যে, এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় কল্পনাশক্তির বিশেষ ছাপ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুল ব্রডকাস্ট অতীতে সাধন করতে অসমর্থ। সেগুলি শিক্ষামূলকও নয়, আনন্দদায়কও নয়। কিন্তু আনন্দের বিষয়, এ নিয়ে বেশি লোকে বড়ো মাথা ঘামান না। এমন কি, স্কুল কর্তৃপক্ষও না। যা প্রচারিত হচ্ছে তাতেই যেন তাঁরা সন্তুষ্ট এই বিষয়ে প্রায়শিক কোনো দাবি নেই, তাই এই পরিতাপজনক অবস্থার কোনো আশায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই কথাটা বোধহয় বলা যেতে পারে যে, আমাদের সব অনুষ্ঠানের মতো এই প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটি সম্পর্কেও অনুষ্ঠান-প্রযোজকরা উদাসীন—বেশি করে উদাসীন। সম্ভবত অধিকাংশ স্কুলে রেডিও-সেট নেই বলেই এই উদাসীনতা। অনুষ্ঠান-প্রযোজকরা বোধহয় মনে করেন, এই অনুষ্ঠানের শ্রোতৃ-সংখ্যা যখন বেশি নয় তখন এর পিছনে পরিশ্রম করে লাভ কী?

কিন্তু তিরিশ বছরেরও বেশি আগে তাল ইণ্ডিয়া রেডিও যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারের সঙ্কল্প করেন তখন তাঁর স্কুলে রেডিও-সেট আসার সম্ভাবনা কল্পনা করেন নি। তাঁরা তার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তাঁরা অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা উপলব্ধি করে স্কুল কর্তৃপক্ষরা নিজেরাই রেডিও-সেট সংগ্রহে আগ্রহী হবেন। কিন্তু তাঁদের সেই আশা সত্য হতে পারে নি। ১৯৫৪-৫৫ সালে যে দুটি সমীক্ষা করা হয়েছিল এই বিষয়টির উপর, তাতে কিছু আলোকপাত হবে।

বিহারী অঞ্চলের ৩২০টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১২টি স্কুলে তখন রেডিও-সেট ছিল —এই ১২টির মধ্যে ৩৭টি শহরাঞ্চলের আর ৩৫টি পল্লী অঞ্চলের স্কুল। শহরাঞ্চলের এই ৩৭টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১৩টিতে সমবেতভাবে রেডিও শোনার ব্যবস্থা ছিল, আর বাকি ৪৪টিতে শুধু রেডিও-সেট। অবশ্য হতাশার কথা, মাত্র ৭টি স্কুলে নিয়মিত এই অনুষ্ঠান শোনার ব্যবস্থা ছিল।

বোম্বাই রাজ্যে তাকযোগে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তাতে দেখা গেছে, ৮০০টি স্কুলের মধ্যে ৪০২টিতে নিয়মিত রেডিও

পানা হত। ১২৫টি স্কুলে প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। ৪০টি থেকে উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। এদের মধ্যে নির্বাচিত ছোট-বড় পনেরো পরিবার হিসাব করা হয়েছিল মাত্র ৩ সপ্তাহে।

কতকগুলি সমস্যা ছাড়া স্কুল ব্রডকাস্ট এখন অনেকখানি আগানো গেছে। আকাশবাণীর মাধ্যমে কেন্দ্র কিন্তু স্কুল ব্রডকাস্ট পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। এখন যাদু বলা হচ্ছে, শিক্ষা বিভাগ এবং প্রধান শিক্ষক ও তাঁর শিক্ষকদের অনেকখানি হাত আছে। মহাকালী ও অন্য কয়েকটি স্কুলে ছাড়া আর সব স্কুলেই অনুষ্ঠানটির গতি একটু মন্থর লক্ষ্য করা গেছে। এটা যেন যাদু আলোর ছোঁয়া পেয়েছে। মহাকালীর মতো স্কুলের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ স্কুলের রেডিও সেটের ব্যবস্থা ছিল না, তাদের ৬৮ ভাগ শিক্ষক এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন যোগ রাখেন না, এবং শতকরা ১৫ ভাগের আলো-আঁধারি ক্লাসে যাবার আগে "ব্ল্যাক-আউট আর্টিফিসিয়াল" বলা যায়) সময় বাড়ান হয় না।

১৯৫১ সালের ১৯শে জুলাই আমিনের "ইংল্যান্ড রিবিল্ডস" পরিচয় শ্রীযুক্তা পিয়ার্সন তাঁর আলোচনার পরিচয়টি দিয়েছিলেন।

শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে (এডুকেশান ব্রডকাস্ট) যেসব সমস্যার উপর গুরুত্ব পাওয়ার জন্য অনুষ্ঠানের নির্বাচিত-কুল লাভ ও উৎসাহ সাধনের জন্যে আলোচনা করা দরকার। এবং ব্রডকাস্টারের সহযোগিতায় শিক্ষকদের উচিত নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা।

ক) বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানে উপযোগিত প্রশ্নগুলির উপর ক্লাসে একটা আলোচনা করা;

খ) আলোচিত প্রশ্নটি সম্পর্কে ছাত্রদের নিজ নিজ গ্রন্থের তা পরীক্ষা করে দেখা;

গ) ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ উদ্রেকের উপযোগী ছাত্রদের বাছাই করে নিয়ে তাদের ভার উপর অনুসন্ধান করা; এবং

ঘ) অনুষ্ঠান সম্পর্কে পত্র আলোচনার পরীক্ষা চালানো।

কিন্তু মূলসমস্যাগুলির যদি অবিলম্বে সমাধান করা না হয় তাহলে এই সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না। এবং অনুষ্ঠান উন্নত না হয় তাহলে তা স্কুলে ও আলোচনা চালানোও যেসব শিক্ষক-ছাত্র

ব্রডকাস্টিং ক্লাস-রুমে একটি ভাল লাউড স্পীকার থাকা দরকার, যাতে সকলেই যাতে শিক্ষকের পড়া-লেখার মতো সব ভালো করে শুনতে পারে। কিন্তু সব স্কুলে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান শোনার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে সেই ঘরে একটি লাউড স্পীকার রাখা যেতে পারে। অনুষ্ঠান শোনা যাতে ছুটির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা পাঠ্যক্রমের একটা অঙ্গ বলে পরিগণিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের আগে থেকেই এই অনুষ্ঠানের জন্য 'ব্রডকাস্টারের হৈরি' করে রাখতে হবে এবং পরবর্তী আলোচনার জন্যেও সময় মতো করে দিতে হবে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

পণ্ডিত মদনমোহন যে "মালবিয়া" ছিলেন না, "মালবীয়" ছিলেন—এ কথা বহুবার লেখা হয়েছে। তবু আমাদের অনেকে তাঁকে "মালবিয়া"-রূপেই ঘোষণা করছেন। এই ধর ৪ঠা ডিসেম্বর রাত ১০টার সংবাদ পরিক্রমাতেও হয়েছে। উচ্চারণের ব্যাপারে ও কংগ্রেস সম্পর্কে বলতে গিয়ে "পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া" বলা হয়েছে। আসল থেকেই তো কথাটির উৎপত্তি। ভারত থেকে যেমন "ভারতা" না হয়ে "ভারতীয়" হয় তেমনি মালব থেকেও "মালবিয়া" না হয়ে "মালবীয়" হবে।

এই সংবাদ পরিক্রমাটি কিন্তু সুন্দর হয়েছিল। যেমন ইতিহাসের কথায় সুর তেমনি সাহিত্যমূলে নিয়ে।

এইদিন পরে রাত সওয়া ১০টায় ইংরেজী নিউজ রিলিজের সারাংশ-করণের মনোজ্ঞ। এর বিষয় ছিল পাঁচটি। তার মধ্যে কোনটি ছিলমাস ফরাসী আর কোনটি পোপ উৎসবই সম্বন্ধে ভালো লাগল। ছিলমাস ফ্রান্সের ছিল খুষ্টি—খ্রীষ্টিবিবেকের ফেস্ট করা। এবং তাদের খ্রীষ্টিনিবেদনের ফ্রান্স ফেস্ট ছিল কিছুটা। পোপ উৎসবের চিত্রটি বর্ণিত, তবু তাতে পোপের ছোঁয়া পাওয়া যেত। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বিষয় ছিল

[illegible] এই-সব [illegible] ইংরেজদের [illegible] হয়েছে। না, যেমন খুশি হবার ছিল না এটিতে। রেকর্ডিংও খুব ভালো নয়। সমুদ্র বিষয়, আর ইন্দিরা অবতরণের আর ফ্রান্সের আকাশচারীদের ট্রেনিংয়ের বক্তব্যের ভাষণ। শুধু তাদের, বক্তব্যের মধ্যে পড়া ছোঁয়া। এটি এর তেমন আকর্ষণ ছিল না।

২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৮টার ঘোষণা শোনা গেল, "ফ্রান্সিসকানীয় মোনাস্টেরি ট্রিবিউনিস বিষয়ে।" কিন্তু তখন তাঁর ফ্রান্সিসকানদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে, এবং "ফ্রেঞ্চ্যুনীতি" ঘোষণার সময় এল।

২৯শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১টার ছিল বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান। কৃষ্ণবিদ্যালয়ের আশ্রমে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা সম্পর্কে একটি "আলোচনা-চক্র"। কিন্তু এটিকে "আলোচনা-চক্র" না বলে "বক্তৃতা-চক্র" বললেই বোধহয় ভালো হত, কারণ সভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে এক-একে সবাই এতে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। এই "বক্তৃতা-চক্র" হাত-হাতীদের আমাদের শিক্ষার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু অনুষ্ঠানটি সামগ্রিক-ভাবে চিত্তাকর্ষী হতে পারে নি। যাদুলি হয়েছে অনুষ্ঠানের মতো লক্ষণ এটি।

২৯শে জানুয়ারী সকাল ৮টার ঘোষণা-পরিচয় পাইলেন শ্রীযুক্তা নির্মলা ঘোষালী। কিন্তু ঘোষণাটির সেই ঘোষণা কই? সেই সুর? সবে সওয়া ৮টার আধুনিক গান ঘোষণাতে শ্রীযুক্তা দীপ্তি মিত্র। ভালোই লাগল।

এইদিন রাত ৮টার নাটক শ্রীরবীন্দ্রনাথের ঘোষ রচিত "শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য", কিন্তু ঘোষণাতে বলা হয়েছে "শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্যে"। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়।

নাটকটির আইডিয়া সুন্দর। অভিনয়ও পরিচ্ছন্ন। দৃশ্য-সংযোজনাও ভালো।

এই নাটকে পর্যালোচনা সভাপতির মোহনের বিশেষ সভাপতির মোহনের কৃত অপব্যয়ের যে চিত্রের অবতারণা সেই চিত্রের যে একদিন সত্যি সত্যিই হবে না, এখন কথা জোর করে বলা যায় না।

—রূপদক

শ্রীরাম সেবা-সমাজের উৎসবে কমলালক্ষ্মণের নিবেদন উষা মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরাম সেবা-সঙ্ঘ ও আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুনন্দা পট্টনায়ক।

জলসা

শ্রীরাম সেবা সমাজ নিবেদিত নৃত্যগীতের আসর

গত সপ্তাহে রবীন্দ্রসদনে শ্রীরাম সেবা-সমাজ তথা দক্ষিণ ভারতীয় এক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিনোদনমূলক নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের এক আসর বিভিন্ন রস আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রথম দিন (৩ ফেব্রুয়ারী) ছিল ভরত নাট্যম, কর্ণাটক সঙ্গীত বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রোতাদের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হয়। পপ্-সঙ্গীতের শ্রোতা না হলেও সাধারণভাবে এইটুকু বলা যায় শ্রীমতী আয়ারের কণ্ঠ পরিষ্কার, আওয়াজ গম্ভীর এবং সুর ও কথার স্পষ্টতা প্রশংসনীয়। ও ডার্লিনেস্ মাই ডেয়ার, আই হ্যাভ্ অল্ টু বি এমেন" —রামাই যেন তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতার ভাবাত্মক দিক্ ফুটে তুলেছিল এবং এ ধরনের গানগুলির অনেক গায়কের চাইতে এইটুকু গায়কীই মনে বেশী রেখাপাত করে।

দ্বিতীয় দিন ছিল সঙ্গীতালেখ্যের সুনন্দা পট্টনায়কের দেহাল আয়োজন ও উদ্যম। দক্ষিণ ভারতীয় ভোজ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতশিল্পীর অনুষ্ঠান সেটাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা বৈ কি। কর্ণাটক সঙ্গীত এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আঙ্গিক সম্বন্ধে পরিবেশনা পদ্ধতি এবং সুরের বিন্যাস সম্পর্কে আমা করেন। কিন্তু সেবা ভেদ আপাত ব্যবধান থাকলেও সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ঐতিহ্যসাধন আশ্রিত যে কোনো রসিক শ্রোতাকে আনন্দিত করতে পারে শিল্পী যদি হন সংবেদনশীল—এবং শ্রোতা যদি হন সমঝদার যোগ্য ও সুরসিক (তিনি সেটি হলেও)।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীএল কৃষ্ণন শিল্পীর পরিচয় প্রদানকালে বলেন "উত্তর ভারতের এই প্রতিভাবান শিল্পী আমাদের শ্রোতাদের কাছেও সাদর গৃহীত হবেন এ বিশ্বাস আছে বলেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।"

শ্রীকৃষ্ণনের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নয় শ্রীমতী পট্টনায়কের শ্রোতৃ-চিত্তজয়ী অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। ইনি প্রথমে গাইলেন "অন্নমাচার্য"—। প্রতিটি পদ্য ধরে সুরের সুললিত বিস্তার, ছন্দের সুষমা ও রাগের অন্তর্নীন ভাবগুলি শিল্পীর অসাধারণ কণ্ঠমাধুর্য—আবেগ-রঞ্জিত পরিবেশনা ও হৃদয় সংবাদী আবেদনে এক নিমেষে শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছে। গান থেকে তার সন্তানের সব কটি পর্যন্ত অনায়াস সঞ্চরণ এবং গান থেকে গানান্তরে বিশ্লেষণটিকে তার গায়কীর পর্যায় সুস্পষ্টতার কথা কারণটি পর্যায় অভিনন্দিত হয়। তারপরের সময়ে শ্রোতাদেরও উৎসাহের অভাব অবশ্য ছিল।

দ্বিতীয়দিনে ইলি আয়ারও তাঁর নিবেদন সমাপ্ত করেন। সুনন্দা পট্টনায়কের তরুণ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন কিন্তু ওস্তাদ জেয়াদুল্লা খান গ্রামোফোন সরোদ্বাদন এবং বাসুদেব চক্রবর্তী তবলা, নাদস্বরী ও হার্মোনিয়ম সঙ্গতের প্রসঙ্গ উত্থাপন একান্তই প্রয়োজন। জেয়াদ ও সগীরের মত উচ্চাঙ্গের শিল্পী। ছন্দ ও সুরের সঙ্গতে না গেলে শিল্পীর অনুষ্ঠান এমন জমে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। শিল্পী বরাট পরিষ্কারী হোন্ তার 'কৃষ্ণ' অবাধিত রাগের মত সঙ্গতিরও অনিবার্য প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দিন বিরক্তিকর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ও জনৈকা ভদ্রমহিলা শ্রীমতী কমলা

সম্মেলনের শিক্ষা কুমারী ঈষার অভ্যর্থনাসূত্র দেওয়া নিয়ে। শিল্পী কুমারী ঈষা কুমারীতি' রীতি সাত বছর ধরে আমরা-সম্মেলনের শিক্ষা-রীতে আসছেন। বিশেষজ্ঞ শিল্পীর নিয়ে পরিচয় ও উপস্থিত নিজের আসন তার রীতি অনুষ্ঠানে বর্ণিত। অনুষ্ঠানসূত্র ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু; তারপর জাতি-সঙ্গীত, পদম, বর্ণম, পদার্থবিজ্ঞ সুরম, তিলানা শ্রীরঙ্গ প্রসঙ্গের পর থেকে যখন কুমারী কুমুদরেণ শেষ হয় তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর আসনসমূহ পূর্ণ হয়ে গেছে। ইতি যে এত উপস্থিতি প্রতিশ্রুতি সে সম্বন্ধে কারোরই তা ছিল না।

—সঙ্গীতজগতে উদ্ভাসমান শ্রোতা কৃতিত্বের পরিচয় শিল্পীরা নিজে না পাওয়ায় সম্মেলনের কার্যটি যথার্থ রূপে হতোদ্যমদীকে সহায়তা করেছেন।

ইন্দ্রজিৎবিদেহের স্মৃতিবার্ষিকী

গতকাল এক রবিবার সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সাধুচরণ রোডস্থিত গৌরীপুর-ভবনে ভবনের সভাপতি লোকের এক অনুরাগী বাড়ির 'ইন্দ্রজিৎদেবের রায়চৌধুরী স্মৃতি-সভার অতীতের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রেখে উপস্থিত সুধীবৃন্দের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়। সভা ইন্দ্রজিৎদেবের রায়চৌধুরী প্রসঙ্গের একটিক বাজনে। উদ্যোগসঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষায় স্তবমন্ত্রে তাঁর অকৃপণ অর্থানুকূল্য ধারণার অভিনন্দন করা এবং ছিলেই খেলার প্রয়োজনে অকাল্প চেষ্টা এবং এতদুদ্দেশ্যে নাটমন্দাই নির্মিতদের যোগের নিয়ন্ত্রণে অভিনয়-কুশলতা —সুধীসমাজে সর্ববিদিত। স্বর্গতের জনপদ্ধ ছিলেন্দ্রজিৎ-দেব 'ইন্দ্রজিৎদেবের জন্মতীর্থ নিবিষয়-আজাই বৃন্দাবনের। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ও চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী। সেদিনের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন নিখিলরঞ্জনের সঙ্গীতাচার্য শ্রীঅমীয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরম্ভ বক্তৃতিদেবের প্রথা ছিলেন দেবতা ঠাকুর চন্দ্র, চন্দ্রদেবের মার্কা, সুরেন্দ্র মজুমদার ও তার বিমল রায়, শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী ও অন্যেরা বক্তৃতা। এ. বছর বার্ষিকীর পর থেকে যাদের প্রথম করা হয় 'সঙ্গীতাচার্য' সভাধিপতির বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁ এর মধ্যে।

শ্রীরঙ্গলালী ভট্টাচার্যের দেবতা পাঠ ও আলিঙ্গনের পরে এক সুধীসভার পরিচয় রচিত হয়। সভা উদ্বোধন করেন শ্রীবার্ষিকাধার মুখোপাধ্যায়। এক সাধিকার কিন্তু সুচিন্তিত ভাষণে অভিভাষণ বলেন, 'ইন্দ্রজিৎদেবের রায়চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষার বাহির এই সমিতির একার নয়, এটি একটি জাতীয় কর্তব্যসূত্রে পরিবর্ধিত হওয়া উচিত। তার বিমল রায় এবং অমীয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতের দ্বারা ইন্দ্রজিৎদেবের স্মৃতির অবমাননা করা উচিত বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

সভাপতির অনুরোধের সূত্রে ইন্দিরা-সঙ্গীত থেকে দেবতার 'ইন্দ্রজিৎদেবের সোহিনী শ্রীমতী কমলাদী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বিদেশের বাজনার প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ দুজন পাশ্চাত্য শিল্প-সংগ্রহক দেবে দেখান। ভারতীয় কলা-শিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী দেবতা নামের কন্যা শ্রীমতী রাজ্ঞী বাস লিলীপকুমার রায়চৌধুরীর 'সুরের ঝরনার তলায় এবং রাজ্ঞী সঙ্গীত সম্মেলনের অন্যান্য দেশ কর্মীদের তলায় পরিচয় করেন। সঙ্গীতজগতী কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর শিল্প পরিচালনা রায়-চৌধুরীর বাঁশরীসংগীত শিল্পীবন্দের তলায়ী অনুষ্ঠানসভার ও নিখিল বঙ্গের প্রাচীন রীতিতে পরিবেশিত দুজন গানে তাঁর প্রসাদের অর্জন করে। পরবর্তীকার সম্বন্ধে ছিলেন প্রতাপ-নারায়ণ সিংহ। ইত্র সমবয়ের ইমনকল্যাণ রাগের খেয়াল এবং ন-সমবর্তিনী বাঁহিয়া-ঠুমরি দেবতার পর বিদেশের তলায়ার শিল্পী সঙ্গীতাচার্য সভাধিপতির কুমার-পরিচয়ের দুজন ভাষণসমূহকে গ্রহণীয় হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্মেলন

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্মেলনের সহ-যোগিতায় গত ২৩, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরেন্দ্রনাথ উদ্যোগে তিন দিবসব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধন-সঙ্গীত, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, হিন্দুস্থানীগীতি, বন্দেমাতরম্‌গীতি, পল্লীগীতি, অনুকূলচন্দ্রনাথের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের শিল্পী-দের মধ্যে ছিলেন অনিল চৌধুরী, দেবীর বসাক, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, নিত্য দাস (বেহালা) ও বেণু চট্টোপাধ্যায় (বাঁশী)। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীতের পরিবেশনার ছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুনিতা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়, সুধী মিত্র, সুনিতা রায়, সুনিতা বসু, শ্রোতম বসু, রবীন মুখোপাধ্যায়, রবিদা মুখোপাধ্যায়, শান্তনী গুপ্ত, পলিমা গুপ্ত, আলো বসু, সুনিতা রায়চৌধুরী, মুন্না সেনী, আরতি দত্ত, মালা ঘোষ, দীপ্তি হুড়, শ্যামা দাস, সুনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমিতা চক্রবর্তী। যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন অনাদি দাস্তিদার, আলো বসু-রায়, হরিদা চক্রবর্তী ও অমৃতা চট্টো-পাধ্যায়। সভাপতি ছিলেন বিশেষ সভী ও সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানসূচিতে সহযোগিতা করেন হরিদা, মুখোপাধ্যায়, অমল মুখো-পাধ্যায়, উমা দে-শীল, সুধীর দে-হোরিক ও নন্দু পাল। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রবীন চৌধুরী।

হিমাদ্রি সঙ্গীত সম্মেলন

গত ০০শে ডিসেম্বর বালিগঞ্জস্থিত রবিবারীর ভবনে হিমাদ্রি সঙ্গীত সম্মেলন-এর উদ্যোগে এক রজনীর সঙ্গীতের আসর বসে। আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন কাশিত চৌধু। ইনি প্রথমে সভাসভী জনাবাক্ ও পরে সোহনী বলাবন রাগে খেয়াল গেয়ে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করেন। এর সঙ্গে তবলায় ও হারমোনিয়মে সহযোগিতা করেন যথাক্রমে সুবোধ ভট্টাচার্য ও নিখিলেশ চৌধুরী। আসরের অন্য শিল্পী ছিলেন অমল মুখোপাধ্যায়। ইনি তাঁর স্বাভাবিক সরসতা দিয়ে অনেকটি পল্লীগীতি গেয়ে এই নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

রেকর্ড পরিচয়

সম্প্রতি এলাসিয়ন রেকর্ডের ৪৪ আর পি এর ডিস্কে ছায়াদেবীর শ্রোতৃমণ্ডলী সঙ্গীতাভিনয় সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এক অনবদ্য রেকর্ড নিবেদনে। আভিনয় অনুষ্ঠানসমাজের কথা ও সুরে সুরে আধুনিক গান শ্রোতৃমণ্ডলীর মুগ্ধকরণ করবে। একটি গানের কথা চলন ছোল পার্থক্য করে শ্রোতৃমণ্ডলীর কবিতা অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দদিয়েছে। রেকর্ডে এই প্রথম। কিন্তু নিবেদনীয় পরিবেশনা প্রথম উপস্থিতিতেই অনবদ্যবাহিনী। অভিনয় শিল্পী ছায়াদেবীর আসন শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে চিরস্থায়ী হয়ে রয়। নিবেদনীয় আভিনয় সুরের কণ্ঠের গান দুটি সুরে সেই আনন্দই মনে হোল। আর একটি প্রতিশ্রুতি-দীপ্ত কণ্ঠে শোনা গেল হিন্দুস্থানী ভিন্নে। শিল্পী অরুন্ধতী সেন। সুরের অনুরোধনাথের রচিত এবং সাধারণ বাক্যসূত্রে সুরেন্দ্রনাথিত, গানদুটি হোল অনুরূপে অনুরূপে কবিতার ও কি হবে এ মন 'ভিন্নে' সুরেন্দ্রের কণ্ঠে ছায়াদেবীর ও সুরেন্দ্রনাথে দুটি বিভিন্ন ধরনের আনন্দ পরিবেশন পরিচালনায়-অরুন্ধতী সেনের সফলতা, নিপুণ ও রেকর্ডনের পরিচয় হোল।

—বীরেন্দ্রনাথ

ওস্তাদ আলাউদ্দীন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

(ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালচারাল রিলেশন্স অনুমোদিত)

ভর্তির নিয়মাবলী—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

নিম্ন প্রতিষ্ঠান উপরের প্রতি বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা

আসছে জানুয়ারী মাসে সঙ্গীতজ্ঞ-সম্মেলনী

শ্রীঅন্নপূর্ণা সিংহরায়—ভোপালী

শ্রীহরিপ্রসন্ন বিশ্বাস—সেতারী

ভৌতিক হেয়ার মার্সারি এন্ড কিওস্ক পার্টনার্স

২০৫, মেছুয়াবাজার রোড, মধ্য পল্লী, কলিকাতা, পাকুড়, ঝালিয়ানা—১৮

৫৭-৩৫৫০

প্রেমগ্রহ

অতৃপ্ত জীবনবোধের কাহিনী

এই যে মেয়েটি, সুনীতা নাম যার নাম, তার জীবনেও তো হয়ত ছোটো ছোটো, পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাওয়া হল কত বারে? কখন বাঁচাল? ছিলনাথ বাবু? না, ছোটো বাঁচার মোহে নয়, আধুনিক জনকল্যাণ প্রচণ্ড বিজ্ঞানী সমাজের অপূর্ণ ব্যবস্থাগুলো মেয়েটি তার অল্পপরিসর জীবনে খুব খুব কাছে পেয়েছে, সাঁতারের সুখ কি তা জানবার আগেই মাদুরের কবলিত হয়ে অকালে প্রাণ হারাল।

এইটিই হচ্ছে আর কি ছোটোগল্পের বিশেষত্ব ও শক্তির মূল পরিচালিকা ঘটনা অপরিচিত-এর আসল মজা। আধুনিক শহুরে বিজ্ঞানী সমাজে সুনীতা-নাম নিয়ে নিশ্চয়ই একটি অসংখ্য—অপরিচিত মেয়ের সংখ্যা বলা হয় না—চাঞ্চল্য কিন্তু সুনীতার জীবনে অবশ্য জীবনেরও সঙ্গে অসংখ্য সুনীতাদের এই ঘটনা আদৌতেও একক নয়, কাহিনী আবর্তিত হচ্ছে কিন্তু সুনীতা নামটিকে নিয়ে। এবং এই কাহিনীই ঘটনার সাধারণ চিরন্তন সূত্রে গ্রথিত। অপৌরোহিত্যের ইতিহাস কাহিনী আমরা সুনীতানাথ চৌধুরীর আত্মকাহিনীতে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। অথবা ঘটনা সোজাসুজি সুনীতানাথের সংলাপ ছাড়া সাহায্যের পরিপন্থী।

ছোট্ট ছিলনাথ বাবুর সঙ্গে অল্পবয়সী সুনীতার সাহিত্যিক সম্পর্ক সম্পর্কে বড়াই সন্দেহের আরও ঊর্ধ্বে মানুষ না কেন (যদিও সুনীতা একটি বেসামাল মুহূর্তে নিজেই স্বীকার করেছে, সে প্রীতিমতো প্রেমিকা), তবুও সেই লম্বা চওড়া সোজা সোজা বিশাল সাধারণত্ব-মার্কা পৌরোহিত্যসুলভ চেহারাটা নিয়ে বাইরের সঙ্গে ছিলনাথের আসল ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বড়ো খুব বড়ো একটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। নিশ্চিন্তে বৈজয়ন্তী পরা হবার মতো প্রীতিময় কি এর আগে নিজের সাহসে অসংখ্য মুহূর্ত কাটাতে এবং ঐ সঙ্গে সমাজসংস্কার-পরিচালক বীরেন্দ্রকিশোরকে নিজের হাতের মুঠোয় ধরতে চেয়েছিলেন? বাঁধ ভাঙা হয়, তখনো এই উপেক্ষাটি ছবির মানুষের যথাযথরূপে ধরা পড়তে পারেনি।

এবার আসা যাক? আসা নিয়ে এখন কুসংস্কার আমাদের আমাদের ছাড়ে সেকেলে পাওয়া যায়। আমার ভাই—এইটুকু বলে আমরা এদের পাশে আসছি। এরা সব আমাদের সুপ্রাচীন শ্রেণীর অত্যন্ত পরিচিত হয়ে ওঠে বলে এরা সুপ্রাচীন নয়। সুনীতার চরিত্র এর ব্যতিক্রম আমাদের অবাক হয়ে যাবার (হোক্ষার সম্ভাবনা; তাই অমনই সে আবিষ্কার করল, সুনীতা মনোযোগ সুনীতাকে চায়, তখনই সে হাতে নিজের হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বিচলিত আসল না। কোথা সুনীতা। বীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সোনা এবং ছিলনাথ বাবুর ভাগিনেয় (রবিদা?) সুনীতা মার্ক—মুহূর্তেই আসল—

এই সাহচর্যেরও প্রশংসিতর অনুকূলেই আলো-বেসেছিল। কিন্তু সুজিতের ভোঁতাই ছেল সুনীতার প্রতি বেশী; সুনীতা যে বেশী অসহায়, তার আত্মবঞ্চনা যেমন ভেল অসহায় আর দুর্বল।" তাই তার মনের যে অন্ধ-সাম্রাজ্যে অন্যের ভোগ বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে ভিড়িয়ে এনেছিলেন, সেই সাম্রাজ্যকে সে আবার হাঁড়িয়ে কেবল সুনীতাকে ভোগদীপ্ত-ভাব নিয়ত ভেগে

ভাস্কর্যটিকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ছবির প্রযোজনার্থে ভিন্নমাটিকার-পরিচালক সলিল দত্ত; চলচ্চিত্রায়ণে চরিত্র-গুলিকে তিনি তাদের পরিবেশের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন ঘটনাবলীকে দ্রুত লয়ে বিন্যাসায়ণে ঘটাবার সংলগ্ন সংখ্য। কিন্তু ছবির দ্বিতীয়ার্ধ প্রযোজনার মতো মসৃণ-সুন্দর নয়, অনিবার্য যেন বিলম্বিত হয়ে পড়েছে এবং বহু পরিস্থিতিই দুর্বিনীত লেগে গেছে। সুনীতাকে কালোবাজারের মতো অনুসরণ করবার দিয়ে রজন মল্লিক যেন বাস্তবে মতো অবাস্তবায়িত হয়ে পড়েছে। রজন শেষ পর্যন্ত সুনীতাকে স্বাভাবিক করে রাখতে—এই ঘটনাটি ঘটাবার জন্যে চিত্র-নাটকার-পরিচালক যেন নিবাকভাবে উপস্থিত প্রমন করেছেন।

ছবির তিনটি প্রধান চরিত্র—সুব্রত, সুনীতা এবং রজনের ভূমিকায়—যথাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন এবং উত্তমকুমার। সত্যেন্দ্র অন্য সুজিতনাথের চরিত্রটিকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যেন অপনত করে নিয়েছেন; জীবন্ত অভিনয় দ্বারা দর্শকচিত্তকে তিনি সম্পূর্ণ জয় করে ফেলেছেন। সুজিতনাথের ভূমিকাটিকে তাঁর চলচ্চিত্রজীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সুনীতা নামের সুকঠিন ভূমিকায় অপর্ণা সেন তাঁর সহজাত নাটকীয়তার প্রতিযোগ পরিচয় দিয়েছেন। অন্তরে তাঁর বেদনাবাহ, বাইরে ভোগের প্রাচুর্যের মধ্যে অন্তোষনাবিত উপলব্ধি—দুটিকেই তিনি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। উত্তমকুমার অল্প অভিনয়-কলার এমন স্তরে উন্নীত, যেখান থেকে তিনি অভিনয়ের চরিত্রের প্রাণচুকু সহজেই ধরতে পারেন; তাই এমন রঙ্গিকের মতো এমন একটি দর্শক-সহানুভূতিহীন চরিত্রকেও তিনি সহজ সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। সুজিতের প্রতি ভালোবাসার ওজস্বী খেলায় মিশি চরিত্রকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন সন্ধ্যা রায়। চিত্রনাট্য এবং ও ভূমিকাগুলির চরিত্রগুলিকে আন্তরিকভাবে দর্শক-উপযোগী করে তুলেছেন নবীন দুজন অভিনেতা—উৎপল দত্ত ও বিকাশ রায়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন হরাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (বীরেন্দ্র-নারায়ণ), নিলীপ রায় (দিবেন), ছিবির ভট্টাচার্য (হরিদ্র মল্লিক), তরুণকুমার (জয় ঘোষ), কমলা চৌধুরী (মিসেস চৌধুরী) প্রভৃতি।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে অপরি-চিত ছবিটি অনেকটা উন্নত। সত্যেন রায়-চৌধুরী বিভিন্ন দৃশ্যপরিকল্পনার অনেক বাস্তবানুগের পরিচয় দিয়েছেন; ফলে সেটে যে দৃশ্যগ্রহণ হয়েছে, এ-জন্য অনেক সময়ে বোঝাই যায় না। চলচ্চিত্রগ্রহণে আলো-ছায়ার সুষ্ঠু সন্নিবেশ দৃষ্টি আকর্ষণকারী। ছবিটির গানের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না; তবু কল্পসঙ্গীতের সাহায্যেই বিভিন্ন দৃশ্যের অন্তরকে সুসংহতরূপে করে তোলবার অবশ্যই অবসর ছিল। চলচ্চিত্রে ছবির গতি অবশ্যই সহজ ও সুষ্ঠু, দ্বিতীয়ার্ধের যা কোথাও অসম, কোথাও আড়ষ্ট—এ-আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

চলচ্চিত্রটি ছিন্নভিন্ন পরিবেশিত, আর তা প্রেক্ষাগৃহগুলি নিবেদিত এক্স সলিল দত্ত পরিচালিত অপরিচিত দর্শক-মনের যে ইতিমধ্যেই জয় করেছেন, তার অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহ সুজিতনাথের চরিত্র সৌম্যিত চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক সংবেদনশীল জীবন্ত অভিনয়।

পুত্ত চরিত্রের আলাপচারিতা

উনবিংশে শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সহর কলকাতায় হিন্দুসমাজের একটি মুহূর্ত অংশ যখন ভেঙে চুরমার হয়ে অনাগতের দিকে যাবার উপক্রম করেছিল, তখন যে-নূতন অভিমানবের হিন্দুসমাজ এবং অন্তপ্রতিরোধ প্রবাহ আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠকে আমাদের হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট করেছিল, তার একজন হচ্ছেন রামমোহন রায় এবং অন্যজন হচ্ছেন ডিরো-জিয়ো। রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের আশ্রয় পুজারীর বড় ভাই, বড় পুত্ত—রামকৃষ্ণদেবীর এই উদার ধার্মী সমাজে হিন্দু ধর্মকে সম্পূর্ণ নে'ক্যমন্ত্রে করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল বলেই তাঁর চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিলেন সে-যুগের বহু জ্ঞানী। এই আশ্চর্য পুজারীর বালকসুলভ সম্পর্কিত বহু অলৌকিক বিশ্বেষণীক আমরা করে পড়ে উঠেছে ভারতীয় চিরন্তনের স্বামক ধর্মবোধ-এর প্রাণ মন্ত্রই আজ আমা-দের মন আজ আমে আমে বাঙ্গালোরের রসিক-চালায়ে শিবপুজোরী রামকৃষ্ণের 'ভবতারিণী মন্দির পুজারীর নাম এবং বিবেকানন্দ-পরমহংসদেবের মিলনকথা।

ভিন্নু ছেড়ে গ্রাম থেকে পলাবার-পিতা কুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বিতাড়ন-পর্ব থেকে সুরু করে উপনয়নের পরে রাজের সন্ধিবর্ষে তত্ত্বালোকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সঙ্কল্প তাগ করে চলে ভাগীর তীরে পর্যন্ত ঘটনা-গুলিকে চিত্রিত উপস্থাপিত করা হয়েছে মূল তত্ত্বচিত্রিকভাবে—রামের মধ্যে যেমনি আর্কষণের সম্পর্ক স্থাপন বা যেমনভাবে নির্দিষ্ট করার যেমনি প্রয়াসই অবলম্বিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যকারিতা এবং পরিচালনা বিভাগের নেয়। ফলে ছবিটি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণভাবে দর্শকবর্জিত যা এটিসোসি-আল এবং সেই কারণে দর্শক-কৌতূহলকে উপভোগের জন্যে তারা আর আকৃষ্ট-হলকে বস্তুত অবাধ সম্ভব হয়নি ছবিটির।

নিছক দিনরাত্রির গল্প নয়। আধুনিক অস্তিত্বের দিবা রাত্রির দাহ

দিবা রাত্রি কাব্য

শুভমুক্তি ১৬ জানুয়ারী বীণা·বসুশ্রী মিথা ও শ্রীনাথ

মূল কাহিনী শ্যামলিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা বিমল ভৌমিক | নারায়ণ মুখার্জী
সুরকার। ভীষ্মদেব
পরিচালনা। অনুপম ঘিলাস
প্রযোজনা। মানিক ভৌমিক

ছবিতে বাচ্চাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সাজনা বসু, সুচিত্রা সান্যাল এবং দিলীপকুমার

ছবিটির মধ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সাজনা বসু, সুচিত্রা সান্যাল এবং দিলীপকুমার

ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাজনা বসু। ছবির পরিচালক ছবিটি তোলার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ন'বছর। এই বয়সে অভিনয় করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু সাজনা-র অভিনয় দেখে মনে হয়েছে, এ-ব্যাপারে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। ছবিটির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সান্যাল, দিলীপকুমার, অনুপকুমার, অসিতবরণ, নবদ্বীপ হালদার, তরুণকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শ্যামল ঘোষাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী, রেবা, অনুভা গুপ্তা, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, সন্ধ্যা রায়, শান্তি গুপ্তা, রমা গুহঠাকুরতা, রেবা দেবী, শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা দেবী, শিপ্রা মিত্র, শিপ্রা বসু, শিপ্রা চক্রবর্তী, শিপ্রা সেনগুপ্তা, শিপ্রা ঘোষ, শিপ্রা ব্যানার্জী, শিপ্রা ভট্টাচার্য, শিপ্রা চৌধুরী, শিপ্রা সরকার, শিপ্রা ঘোষাল

একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে সুচিত্রা সেন সোমা, সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার।
—ফটো । অমৃত

বড় বড় কথা। আজের বেলায় সব উল্টোটাই।' তাঁর বলবার, 'আপনার কথা আলাদা, কিন্তু পরিচালকদের কথা আসে তিনি যেই এটা আপনে পারছি না। কথাও তথা যায় ছিল। আলোচনের অন্তরঃ ৫০ জন পরিচালককে আমি তাঁর অবশ্যই অভিনেত্রী সুবিধার কথা সারসাইজ করে তথাই তাঁদের এ লেখা দেওয়া। যে তখন এদের থেকে আলাদা তাঁদের ইঁদুর কোয়ালিটিও আলাদা [illegible]। আর পরিচালক তথা কথেন— আরো চিন্তা করতেই হবে। এটা অবৈধিক ইমোশনও নয় যে ক্যামেরা দেখে ছবি আঁকার মত ছবি তোলাও একটা লেখা হবে কেমনের?

আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনচিত্রে অভিনয় প্রফেশনাল (পেশাদারী) কথাটা যেন ব্যবসায়িক অর্থে হয়। অপ-প্রফেশনাল ক্যাটাগরী কিছু করা যায় না। সবাই-ই প্রফেশনাল। প্রযোজক পরিচালক পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রফেশনাল নয়?

আর সব কিছুরই হয় এক রূপ।

প্রফেশনাল মানেই কমার্শিয়াল অপকৃষ্ট অপবাদ। তাই প্রফেশনাল অভিনয় মানে কমার্শিয়াল কথাটা আপনা থেকেই আসে। আমাদের দেশের সিরিয়াস অভিনয় অপেশাদারিত্ব কথাটা বিভাজনই অর্থবহ। ব্যাটসের অভিনয়ে এখনও ঐ কথাটা চলে। অথচ অভিনয় প্রযোজনার আজ বিদেশের কৃতিত্বের অধিকারী।

উদাহরণ দিয়ে বলেন—এই তো আমি এখন বাঁচি আমার যে ছবিতে কাজ করেছি তার সারক্ত আলোকচিত্রের সাধারণ একজন। আমিও অভিনয় করেও অভিনয়ের ছবি তাকেই ভাবছি। যে ছবিটিতে ঐরকম সম্ভবতঃ আমার দুটো ছবি সুপারহিট—সুতরাং তাঁর কমার্শিয়াল ব্রান্ড অভিনেতা আমার।

সৌমিত্র যেমন সেদিন বলছিল যে সে সত্যজিৎ রায় কমার্শিয়াল নয়। এই পার্থক্যের মূল কারণ আমার চিন্তা ও প্রকাশের পার্থক্য এবং সে সবের অবশ্যম্ভাবী ফল।

আর কোনো কথা তুলব না সেই সহকারী পরিচালক ভদ্রলোকের। সেটে যখন কাজও করছিলাম তাঁর। আমার সময় হলে দেবেন কমার্শিয়াল আর প্রফেশনাল হওয়ার কথা পার্থক্য আছে অনেক, এবং কি চরিত্রের কারণও আছে তুলে ধরবে।

সেটে আমার কথা ছিল অনেক। কিন্তু ইচ্ছে করল না। তাঁর কথাগুলোই ভাবতে লাগলাম। আর তুল এটা বিশ্বিত হয় কথা-শিল্পের ছবির দেশে বিশেষ কতকগুলো গুণের প্রয়োজন। প্রথমতঃ পরিচালকের মত এক বিরাট অভিনেতাকে দেখা। দ্বিতীয়তঃ অভিনেতার সঙ্গে নাটক পড়ে ছবির দেখা। তৃতীয় ক্ষেত্রে পরিচালকদেরই এ অসুবিধে অভিনেতা থাকার প্রথম ছবি যাঁরা না করেন তাঁরা বিশ্বাস, দ্বিতীয় ছবির বেলায় তখন সময়ের দেখা দিল। অভিনেতা কাঁর পরিচয়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু নাটক আর অভিনেতা বিশ্বাস করেছেন—এ ক্ষেত্রে অভিনেতা পরিচয় প্রয়োজন হয়।

এটা যে অভিনেতার অভাব ছবির তাতো আমার তা নয় পরিচালক অভিনেতার এক চলচ্চিত্র সব অভিনয় এই একটি কারণে। আমি অভিনেতা অভিনেতা তাঁদের কাজের কথা তথা অভিনয় সম্পর্কিত তাঁদের মূল্যায়ন হাতে তোলা অভিনেতা। এক দেখেছিলাম বহু দামী পরিচালক ছবির অভিনয়ে খাঁটি অভিনেতা ছবি তাঁরে ছোন? একজন বিশেষ দেশের পরিচালককে বিশেষ অভিনয়ে দেখে ছবি করার পরিচয় দেখাতে পারে দেন না। যা আমি অভিনয়ের মত উপযুক্ত নেই, যা আমি এক্সপোজারের মত কোনো নাইটীর পরিচালক, যা আমি ডুবেনের মত অভিনয় ছবির পরিচালক, যা আমি বিদেশে ছিচকেদের মত একজন চরিত্র তুলিয়ে। আমাদের পরিচালকদের দেশ দেখে ঐরকমই নেই। অভিনয় দেখেই আমি অভিনেতা তাঁদের সব কাজ তাঁরা করেছেন অভিনেতা। আমি যে তুলনা অন্য কমার্শিয়াল আমাদের আমি-মাঝে তাঁদেরই আমার আমার হয়েছে 'অপ-প্রফেশনাল আর্টিস্ট' আমার আমার 'নিশ্চয়ই'। আমাদের পরিচালকদেরও সেই একই কথা। নিজেকে দেখার জন্য নিজেরই এই ধার্য প্রয়োজনের চেষ্টা নয়? তবে কি আমারসাইজ করেই এই চেষ্টা? যদি তাই হয় তবে কমার্শিয়াল ছবি আর কিছুই হতে পারছেন কি?

অভিনেত্রী দেবী পরিচালিত সুচিত্রার সময় রায় এবং বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
—ফটো । অমৃত

অবলম্বনে আলোকচিত্র/সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

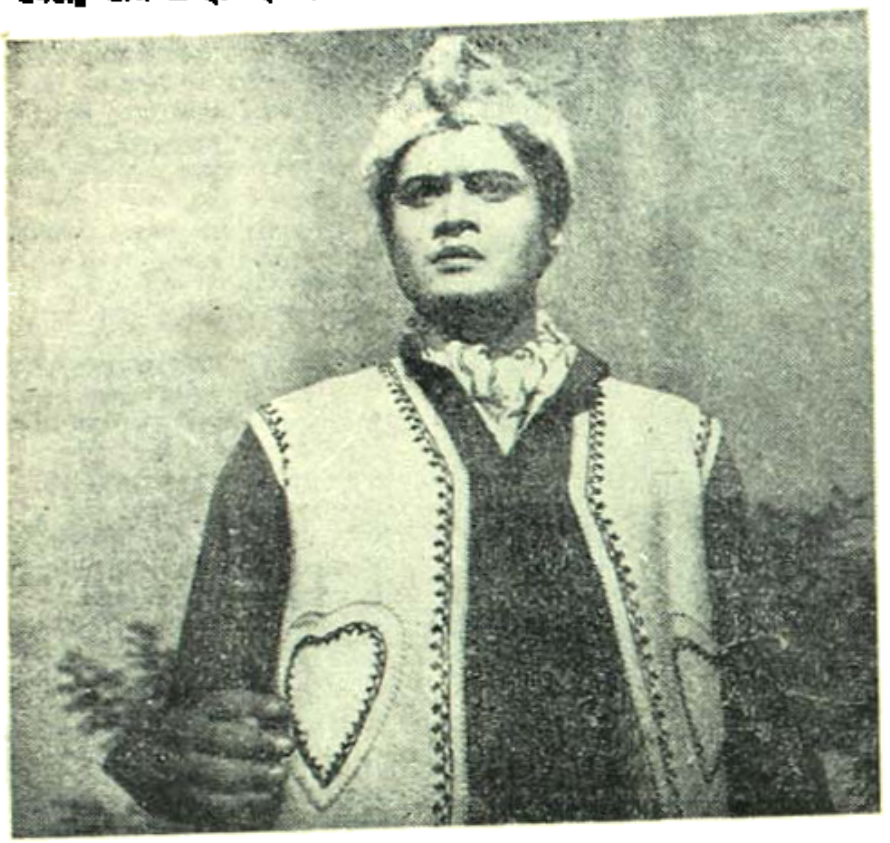

অবশ্যই চেহারাখানা আর রূপসজ্জার ধরণের জন্যে অনেক আগে। আর সে কারণে চিরদিনই থাকবে।

× × ×

মাত্র দশ বছরে এরকম অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখা যায় নি কোথাও। হেথেন ছোট্ট একটি ছবির সুটিং করছিলেন গত বুধবার। টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রীশিয়ান সব মিলিয়ে কটাই বা। আর রিহার্সাল-এর জন্য চলছিল অবশ্য ইন্দ্রপুরীতে। সকালবেলা সেদিন স্টুডিওপাড়ার জন্য খুশির খবর। ছবির ছোটো বিভাগের দিকে এখোবার মুখেই সাউণ্ড-ফ্লোর থেকে 'প্রতিদ্বন্দ্বী—ইট মাস্ট বি'... ইত্যাদি কিছু কানেকানে সংলাপ কানে এল।

বলা বাহুল্য, হেমন্তের বেশীর ভাগ ছবি না করলেও আউটডোরের অনেক ছবির কাজ করেছে। আজ তার 'আমন্ত্রণ' (কাহিনী রবীন্দ্রনাথ) ছবির মেন কিছু অংশের কাজ করছেন মৈনাকটীরে, তারপর যেতেন শিলিগুড়িতে। 'দুরন্তের কাজের জন্য রক্ষিত ফুলদুলী চলে গেলেন পরিচালকের দিকে আসন নিয়ে। ডেপলের ক্লাপার বর্ণিমা আগে আসতেই সুরেন্দ্র 'প্রতিধ্বনি' ছবির মেন কিছু অংশের ছিত্র গ্রহণ করছেন। সুশীল মুখার্জি আলোকচিত্রের 'মেঘ কালো' ছবির ছিত্রগ্রহণ করে আসা ছিত্রে একেবারে কর্মিন আগেই।

বোম্বাই থেকে

বোম্বাই ছিত্রজগতে একটি নতুন বছরের আগমন সুসংবাদ। অন্য বার কিন্তু তা ঘটেনা। একটি উঠতি নায়ককে একদিন অনেক নায়কের নায়িকা স্টুডিওতে দেখতে পেয়ে কাছে আসলেন। একজন ছেলে নায়কটি কাছে আসতেই নায়িকা সোহাগে সেই যুবানাথা পালে এক চলচ্চাম্বন করলেন। স্টুডিওর সবলে হা-হা করে হেসে উঠলেন। কিন্তু নায়িকা তখন কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের মেক-আপ ঠিক করে নিতে লাগলেন। আহত নায়ক সজল হাত মুখোমুখি মুখোমুখি সরে পড়লেন। ব্যাপারটা কি তাকবার জন্যে সবাই উৎসুক হলেন—বিশেষ করে এই ছো ছোক ছবির সুটিং নয়, উপরন্তু এই নায়িকার সঙ্গে একটিকে ছবিতে নায়ক ছবি করছেন। ব্যাপার কি ব্যাপার? পরে অবশ্য নিজে জানা গেল নায়িকার স্বামীও একজন ছিত্রপরিচালক। তাঁর পরের ছবির নায়িকাও এই মিলনটি। স্বামী খবর পেয়েছেন যে তাঁর স্ত্রীটি নাকি এই নায়কছবির সঙ্গে রাত্রেতে এবং ছেলেবেলা মেন একটু ঘোরাঘুরি করছেন। এই জিনে কর্তাগৃহে চলছে অনেকদিনের এবং ছোট ছোট ঘরোয়া মে রাত্রেরেও নাকি ফাস হয়ে গেছে। তাই অনের ভাল হোটেলে এই চলে তাঁর গৃহিনের চুম্বন। সবাই-ই নাকি সন্তুষ্ট। ...তবে এখন এই পরিস্থিতিতে উৎসব হয়েছে যে এই নায়িকাটি আর এই নায়কের সঙ্গে অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, যতক্ষণ না স্বামী সেবারটি বন্ধ দিচ্ছেন। এদিকে ছিত্রপরিচালকরা পড়েছেন মহা ফাঁপরে —তাঁদের ছবির সুটিং আটকে গেছে। এই নতুন বছরের কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নাম প্রকাশ করতে পারলুম না বলে দুঃখিত, মাপ করবেন।

●

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজের আপনজনের কাছে অপরিচিত নয়—বিশেষ করে যাঁরা আপনি ছিকেট অনুরাগী হন। তাঁকে এবার আপনারা সবুজ মাঠ ছেড়ে চুনোপুটী পর্যায় দেখবেন। ছিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ছবিতে (এখনও নামকরণ হয়নি) তাঁর প্রথম ছিত্রাবতরণ ঘটবে। তাঁর বিপরীতে নায়িকা হচ্ছেন সুপ্রিয়া দেবী। লেখক-প্রযোজক-পরিচালক হচ্ছেন অনাদি।

এটি ছাড়া আর একখানি ছবিতে আপনারা চুনোপুটীকে দেখতে পাবেন সৌমিত্র নাম আর অন্নপূর্ণা, আর কিশোর। এর প্রযোজক হচ্ছেন প্রভা সোমি। এ ছবিরও নায়িকা হচ্ছেন লক্ষ্মীছায়া, পরিচালনা করছেন অগ্রদূতের মেঘাই। সুর-সংযোজনা করছেন রাকেশ এবং রবিশঙ্করজি।

●

অপর্ণা পরিচালক অমিয় চক্রবর্তীর আই আজিত চক্রবর্তী একখানি ছবি প্রযোজনা করছেন—তার নাম 'পালানা কাহিনী'। নায়কের ভূমিকায় কে অভিনয় করছে জানেন তো?... হাঁ ঠিক ধরেছেন—শান্তি রঞ্জনকে। তাঁর সঙ্গে আরও আছে অনেক। পরিচালনা করছেন শক্তি সামন্ত। ছবিটির সুটিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে। কাহিনী চলে ছয়ন বোসের।

অরোরা ফিল্ম ছবি ছুই'শুকে আপনারা ছেলেন মিলনে। তিনি সম্প্রতি পরিচালনার আসনে বসেছেন এলাহাবাদের কলীকার্তিক রোলস খাঁর ছেড়ে ছুলন আমার সঙ্গে।

প্রযোজক বি আর চোপড়া ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে কয়েকখানি ছোট ছবি করছেন বলে জানা গেছে এবং বি আর ছিলমের পরবর্তী ছবিখানির পরিচালনা তিনি নিজেই করছেন।

●

মাদ্রাজী পরিচালকদের ছবির বর্তমানে এ সুযো যা খুব বেশী মানুষ। তাঁর একখানি হিন্দি ছবি 'দর্পণ' (মেহবুব খান ওরাহিদা রেহমান ভারকাছিত) মুক্তি প্রতীক্ষায়। এ ছবিখানি প্রযোজক তিনিই, সুর নিয়োজন করছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। আর একখানি হিন্দি ছবির কাজও তিনি ইতিমধ্যে সুরু করে দিয়েছেন—তার নাম হল রাজকুমার অভিনীত 'হমরাজ'। বাহাদুর চেমাস স্টুডিওতে এর মুহূর্তের প্রয়োজনায় এ ছবিখানি নির্মিত হচ্ছে। অরোরা ও নবীন চন্দ্রচূড়ানন্দ এর নায়ক-নায়িকা এবং কল্যাণজী আনন্দজী এর সুরকার।

একথা বিশ্বাস প্রযোজকদের এখন আর বিশেষ নাম শোনা যায় না। সৌমিত্র তাঁকে দেখা গেল ছবির স্টুডিওতে বসিয়া-

কুমারীর সুন্দর নাচ থেকে ছবির সেরা। ছবির নির্মাতা হলেন কিশোরকুমার প্রোডাকসন্স, পরিচালনা অমরনাথ বহেন। সাত দিন ধরে নাচ দেখার সাক্ষীরা চলল ছবির স্টুডিওতে এবং দেখাদের আগে-পাছে অনেকেই আসছেন, যেমন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এবং ডিপ্লোম্যাটিক লজ, চেম্বুরে যৈন বসিয়ে, পরিচালক অমর নাচের টেকনিক।

বোম্বাইয়ের হিন্দিবিভাগের পৃথ্বীরাজ কপূরই এখন ওঁদের ছবির ডেকোরেশন করছেন বেড়াচ্ছেন। নাচের, ঐতিহ্য ঐতিহ্যের পটভূমিকায় অনেক ছবি হয়েছে কিন্তু অতুল আইটেমের মাই নাচ ছবির বিষয়বস্তু হোল বলে আশিকার মতীয় জনসাধারণ—যে স্পর্শটাইটে আর কোনও ভারতীয় ছবি-নির্মাতাই এর আগে বসে নি। এতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শশীকাপুর ও শর্মিলা ঠাকুর। পরিচালনা করেছেন এস সুখদেব। সুর দিয়েছেন নাম সিং।

কাহিনীকার হিসেবে দুবে রহীমসাহেব নাম হিন্দী ছিত্রজগতে সুপরিচিত। তাঁর ছিত্রীজীবনে ছবির নাম হল 'কল? কিনী? আজ কাঁহা?' নির্মাতা হলেন কাশ্মীরমন্দির কিশোর। নায়কের ভূমিকায় অভিনেতা এবং নায়িকার ভূমিকায় মমতা, পরিচালনা করছেন আমীন হিলেছেরী। সুরকার কল্যাণজী আনন্দজী। সম্প্রতি প্রায় ২৪ জন অভিনেতা-নেত্রীকে নিয়ে একটি সুন্দর ছিত্রায়িত করা হয় অজন্তা প্যালেস হোটেলে।

সুন্দর শিবরঙের মন কি আবের ছিত্রায়ণে শেষ হয়েছে। আগামী জানুয়ারী মাসে ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে। এতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ও ওয়াহিদা রেহমান। পরিচালক হলেন মনোজ কুমার।

—প্রবাসী

মঞ্চাভিনয়

অভ্যাচারের প্রতিবিধানের আজ দুনিয়ার মানুষের এক হয়েছে। জনসাধারণকে অত্যাচার ছেড়ে বেপরোয়া অত্যাচার চলানোর ওপর মুখ হয়ে পড়ে মার খাবার দিন আজ বিগত। দেশের মানুষ হারানো স্বাধীনতা দখলকারী শত্রুর মুঠি থেকে ছিনিয়ে আনতে আজ বদ্ধপরিকর। অত্যাচারিত মানুষ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে থাকে চরম আঘাত হানবার জন্যে।

এই কথাই শুনিয়েছেন উৎপল দত্তমশাই তাঁদের আধুনিকতম প্রযোজনা অমর মহাদেশাখ্যায় রচিত "অঙ্গারপর্ণার" মারফত। পৃথিবীর যেখানেই অত্যাচারিত শোষিতশ্রেণী আছে, সেই টোল সম্পর্কেই এই নাটকের অঙ্গারপর্ণারিদের মতন সোচ্চারভাবে ঘোষণা। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে, দেশের একদিন বিনা প্রতিবাদে জমি সমেত কাজ আত্মসমর্পণ করল, সেই শহরের মানুষেরা তার জাতিবিদ্বেষের ওপর নির্ভর করে দেশলাভার জমিদারের বাড়ি, মন্দির অন্যান্যদার (জয়-চৈতন্য), নায়ক ভট্টাচার্য (জ্যোতিন বোস-চৈত) এবং প্রতিবেশকর্মীদের বিরে ছবি দাস (দেবাশিষ), রাজু রায় (মানস দাস), রত্নাবলী চৌধুরী (অনু), ছায়া বসু (অনুপম মুখার্জি), ছবির দাস (মেরি আর্চার), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অন্য ঘোষ), পরিমল রায় (অনুপম নিয়োগী) এবং দেবী মুখোপাধ্যায় (অন্য মহান) নাম নাম ভূমিকায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নাটকটির উপস্থাপনা পরিচালক। অভ্যাচার ও প্রতিবাদের দৃশ্যগুলিতে আরও বাস্তবধর্মী এবং নাটকের বিষয় বিষয় সমাধানের সহজতর করা আরও বেশী সাবলীলতা আনে ভূলতে পারলে নাটকটি পরিচালক নিঃসন্দেহে হয়ে উঠবে।

অমীন সময়ে প্রযোজনা-নির্দেশনায় পরিচালিত প্রযোজনা সমূহ প্রযোজনা হোল ঐতিহাসিকদের অন্যান্যদারের সমাধী অন্যান্য। নাটকটিকে ঐতিহ্য হোল।

প্রযোজনা অন্যান্যদারের হাসি, মমতা, আনন্দ হোলো, সমাধান ও অন্যান্য ঐতিহ্যের সমাধী অন্যান্য। এরা এই ঐতিহ্যের অন্যান্যদারী দৃশ্যগুলির জন্য দর্শক ও সমাধান হোলো। অভিনয়ে ও আবহসংগীতে অন্যান্যদার ঐতিহ্যের ভূমিকা।

একাধিকের মাঝে পরিচালিকা ও সংগীত পরিচালিকার কাজ ছবি অন্যান্যদার হোলো। সমাধান পরিচালিকা সবিতা অন্যান্যদার। অন্যান্যদার ভূমিকায় ছিলেন বীরেন্দ্র হোলো। অন্যান্যদার ঐতিহ্যান্যদারী, সংগ্রহযোগ্য অন্যান্য, আবহসংগীতে অন্যান্যদার ঐতিহ্য ও অন্যান্যদার পরিবেশন অন্যান্য সমাধী হোল ও সমাধান সমাধান, অন্যান্য সমাধান হয়ে অন্যান্য অন্যান্যদারী সমাধানের হোল সমাধান অন্যান্য সমাধান ঐতিহ্য বিশেষ যে ছিনি নাটকটিকারী।

ঈশারা [পরিচালনা-নির্দেশক অন্যান্য]

নতুন নাটক

কান্নামিলা

• অন্যান্য নাটকের অন্যান্য হোলো
প্রতি অন্যান্যদার ও সমাধান : ৩০টি
প্রতি ঐতিহ্যের ও ঐতিহ্য দিন। ৫টি ও ৩০টির
।। অন্যান্য ও সমাধান ।।
হোলোহোলো হোলো
।। হোলোহোলো ।।
অন্যান্য অন্যান্যদার, অন্যান্য হোলো হোলোহোলো, সমাধান হোল, অন্যান্য হোলোহোলো, অন্যান্য অন্যান্য, হোলোহোলো বিমান, অন্যান্য সমাধান, হোলোহোলো, বসু, অন্যান্য হোলোহোলো, বিমান অন্যান্য ও সমাধান হোলো।

ভারতী অপেরার চতুরঙ্গী সুধা সেন বাচ্চাপালার একটি দৃশ্য

মোহাবদ্ধ দুর্বল চিত্তের অসংযত আত্মসমর্পণ, পরিণামে শোচনীয় জীবন-যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানির মধ্যে মহত্তর প্রীতি অকপট প্রেমের কামনা মনে মনে স্বাভাবিক প্রতিক্রমসহযোগে অভিনয়ের দর্পণে মূর্তমান হয়ে ওঠে।

আরতীর নীরব ভালবাসা। আত্মসমর্পণ এবং প্রত্যাহিত হওয়ার স্বপ্ন অসাধারণ সংযম ও আত্মসম্মানবোধে ছন্দা দেবীর অভিনয়ে সুপরিস্ফুট। এছাড়া বাদলের ভূমিকায় কমলী চৌধুরী রমেশবাবুর ভূমিকায় সরলা রায়চৌধুরী সহজ, সুন্দর।

কিন্তু যার অভিনয় সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহিতায় মুগ্ধতার উদ্রেক করে তিনি হলেন মেসোমাশাইয়ের ভূমিকাভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী। মেজাজখারী নারীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী বেশ মানানসই।

মঞ্জিত ও সমন্বয়ী পরিচালিত পরিমলকুমারী আপন জনপ্রিয়তায় যে অঙ্গন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তার প্রমাণ—বিশ্বনাথ, মেসোমশাই, চন্দন, স্নেহ ও তরলতা ও ক্ষমা বিচিত্র মুখরূপে প্রকাশ করে তুলেছেন যথাক্রমে অনিমা দেবী, অনুজা গুপ্ত, বাসবী নন্দী, কমলী ও সুলতা চৌধুরী, কাননবেহারী, শান্তিশ্রী দেবী, চন্দ্রাবতী, ইরা চক্রবর্তী এরা অন্যান্য সবাই। বহুদিন বাদে কাননদেবী ও চন্দ্রাবতী দেবীকে—একাধারে দুর্লভের আনন্দের কারণ হয়েছে।

শিল্পসাহিত্যে এমন কিছু সৃষ্টি আছে যা কালের আবর্তনেও চিরন্তনের মাঝিয়ে ফেলে না। নীলদর্পণ মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এমনি একটি কালজয়ী দৈবিক সংযোজন। সম্প্রতি কলকাতা আকাদেমী রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা এই নাটকের নিষ্ঠাজ্ঞানো অভিনয় করে এর সর্বজনীনতাকে আরো গভীরতর অর্থে মহিমান্বিত করে তুলতে পেরেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে তৎকালীন বাংলার সমাজচিত্র ও চিরকালের সর্বহারা মানুষের দুঃখ ও সন্তাপের যে ছবি আছে তার সঙ্গে শিল্পীদের আন্তর পরিচিতি গড়ে ওঠার সর্বাত্মকভাবে প্রয়োজনাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে শিল্পীদের আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালক পিনাকী বসুর শিল্পবোধ সুসংযমের প্রশংসার দাবী রাখে।

চরিত্রচিত্রণে আশুর নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন 'গোপী গেওয়ান', 'তোরাপ', 'ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় যথাক্রমে বিমান সরকার, বীরেন দে ও হিমানী মুখোপাধ্যায়। 'আদুরীর ভূমিকায় রেবা রায়চৌধুরীর অভিনয় সমস্ত প্রশংসার একটি বলিষ্ঠ সম্পদ। সৌমেন চৌধুরী, অজিত মুখোপাধ্যায় ও দুলাল মুখোপাধ্যায়ের নবীনমাধব, উডসাহেব ও রোগসাহেবের চরিত্রচিত্রণ সব সময়ে স্বাভাবিক হতে পারেনি। অন্যান্য অনেকেই চরিত্রে অংশ নেন—সুকুমার মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন বসু, বিমল চট্টোপাধ্যায়, বিমলীন ঘোষ, গীতা দে, সান্ত্বনা বসু, অরুন্ধতী চৌধুরী, শান্তশ্রী রায়, রেকা মিত্র।

সুকুমার 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে দীর্ঘ-পরিচিতি দেবার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি না। 'নীলদর্পণ' এমন নাটক যা আর পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে আকাশবাণী কলকাতার অধিকর্তা মিঃ পি. জি. কৃষ্ণমূর্তি বাংলার জীবনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক পরিচয়ের কথা প্রদ্ধা আর ভালোবাসার সুরে উচ্চারণ করেন। প্রবীণ নাট্যপ্রযোজক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মিঃ কৃষ্ণমূর্তির প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারের কথা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন—অপরূপ মুখার্জি, সন্তোষের মুখোপাধ্যায়, নিখেশের মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতানুষ্ঠানের একটি গানা রচনা অপূর্ব তেজস্বিতা ও কমনীয়তায় মণ্ডে শোনান দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের 'কিন বছর আগে' নাটকের প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিকৃতিকে কিছুদিন আগে আরো উচ্চমানের করে তুলেছেন আমাদের শিল্পীরা। কিছু সংলাপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এই নাটকটি পরিবেশন করেছেন এঁরা স্টার থিয়েটারের মঞ্চে। এই পরিবর্তন শিল্পীদের বিশেষ করে পরিচালকের সুনীতি মনের সুস্থ-সচেতনতার সুস্পষ্টতাই প্রমাণ করে। সংবাত-সমৃদ্ধ নাটকের প্রতিটি চরিত্রকেই স্বাভাবিক-ভাবে প্রাণবন্ত করে তুলতে শিল্পীদের নিষ্ঠার অভাব চোখে পড়েনি। মুগ্ধ করেকটি ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেন। অরুণকুমার সেনগুপ্ত (বীরেশ), মুকুল রায় (প্রবীণ), শিপ্রা সাহা (তরুণ), প্রতিমা দাশগুপ্ত (মনীষা), পূর্ণচন্দ্র শীল, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুনীত দাস, অরুণেশ ঘোষ, কেষ্ট দে, কল্পনা মুখোপাধ্যায় বন্দনা রায়চৌধুরী।

মর্ড সুবোরন হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্স এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপলক্ষে সম্প্রতি রঙমহলে অনুষ্ঠিত একটি পরিবেশিত হয়। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নেন অমল বসু। করেকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রাণতোষ পাল, হারাধন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, গজেন্দ্র রায়, প্রফুল্ল ঘোষ, সুধাংশু রায়, শঙ্কর মুখার্জি, তরুণ ঘোষ।

ই এম সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের (কেমল ওয়ার্কস) শিল্পী-সভ্যরা কিছুদিন আগে 'বিশ্বরূপায়' মঞ্চে বীরু মুখার্জির 'সংক্রান্তি' নাটকটি পরিবেশন করেন। নাটকটির নির্দেশনার ইন্দু রায় মোটামুটি-ভাবে শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। শিল্পীরা প্রায় সবাই চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন বলে সবেষক্ষ অভিনয়ে কোন সময়ে দৈন্যতা আসেনি। ক্ষৌনিল করের 'ফতন', রমা গুহ-র 'দুর্গা', দীপালি চক্রবর্তীর 'নিস্তারিণী'

রূপায় রায়/ফটো : অমৃত

উল্লেখযোগ্য তিনটি চরিত্রচিত্রণ। এছাড়া করেকটি ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেন অনুপম গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, মৃণাল চৌধুরী ও সন্তোষ ব্যানার্জি।

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জের (মুর্শিদাবাদ) 'মিলনী' সংস্থার উদ্যোগে রতন ঘোষের 'সিঁড়ি' ও কিরণ মৈত্রের 'কথা ছায়া' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করা হয়। নাটক দুটি বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে পরিচালনা করেন ভানু রায় ও সুধাংশু চক্রবর্তী। অভিনয়ে দক্ষতার সঙ্গে রূপায় দীপিকা সরকার, রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর পালা, বিমল মিত্র, কৃষ্ণ রায়, কুমার ঘোষ, সুকুমার মিত্র, অজিত ভট্টাচার্য, পরমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু চক্রবর্তী, জয়দেব দাস, বিশু দাস, বিশ্বনাথ দাস।

রূপশ্রী নাট্য সংস্থার আগামী নাটক মুলাটো। বিশ্রে নারীর গর্ভে অত্যাচারের দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ক্ষেত মালিকদের ঔরসজাত মুলাটো অর্থাৎ বর্ণসংকর নিগ্রো নরনারীর দাসজীবন ও দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের মোহময় কাহিনী নিয়ে রচিত নিগ্রো নাট্যকার লাংস্টন হিউজেসের নাটক মুলাটো রঙ্গওয়ে থেকে ও পৃথিবীর আরো অনেক দেশে বহুবার অভিনীত ও প্রচুর প্রশংসিত হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধবাণী মুলাটো নাটকের রূপান্তরণে করেছেন রঞ্জন লাহিড়ী। তাঁরই নির্দেশনায় ও নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের উদ্যোগ করেছেন রূপশ্রী। মুখ্য নারীচরিত্র ক্যেরার ভূমিকায় অভিনয় করছেন রেণু ঘোষ।

কলকাতা প্রসেনিয়াম নতুন আওয়াজ নাট্যসংস্থার কিশোরা সম্প্রতি স্থানীয় জাতীয়নিটি হলে অভিনয়ের একটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে সবার প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটির নাম হোল 'সে আসবেই হোল না'। সংস্থার দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পরিবেশিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কল্যাণ গুপ্ত, দীপক ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র, মৈত্র, অমল সান্যাল, অবীর মজুমদার, দিলীপ রায়, সুরেন বসু, জয়ন্তী চক্রবর্তী, রঞ্জিত সান্যাল, সুহাস ঘোষ। নির্দেশনা ও আবহসঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রেণু সুরেন্দ্র বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ দাস।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালের চৌকাঠ' নাটকটি কিছুদিন আগে চন্দননগর মুখ নাট্যসমাজের শিল্পীরা স্থানীয় মুক্তাঙ্গনে মঞ্চস্থ করেছিলেন। নিখুঁত পরিবেশ সংগঠিতে গত ৩৯ এই নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অরুণ নন্দী, মায়া মৈত্র, শান্তি নন্দী, নির্মল মুখোপাধ্যায়, বাবু নন্দী, রবীন দত্ত, উমারেখা দত্ত।

বেলুটিন নাট্যসংস্থা কিছুদিন আগে অমিক ঘটকের 'জ্বালা' ও অমর বসুর 'আমরা কেন' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন। কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেন হরিপদ মুখার্জি, গণেশ দে, নির্মল ভৌমিক, নকুল দাস, বিজন সাহা, অমর ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু, সুশীল সাহা, সুশীল বসু।

ভারতীয় শিল্পী পরিষদের সার্থক মঞ্চসৃষ্টি বাবলু ভট্টাচার্য রচিত অভিনব ধারার পরিকল্পিত নতুনতম প্রযোজনার অভিনয় হবে ১১ জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে। প্রযোজনার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মুকুল চট্টোপাধ্যায়, অশোকনাথ, নির্মল মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, মন্মথ ভট্টাচার্য, অনাই মজুমদার ও মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া মুখোপাধ্যায়, বীরেন গুহ, শ্যামল দাস ও টুলটুল দাস। সঙ্গীতে কানাই মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, শ্যামলী দাস, কণা গুহ। রূপসজ্জায় বীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, অজিত নন্দী, প্রকাশ বিশ্বাস, ভানু চট্টোপাধ্যায় ও প্রকাশ দাস অংশ নেন। আলোক-সম্পাতে ছিলেন অনিল সাহা।

রবিবার ১৮ই জানুয়ারী ৬।৩০টায়
সারারাত্তির
প্রযোজনা || ভানু ও নির্দেশনা
শতাব্দী || বাবলা সরকার
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
টিকিট : অমৃতবাজার ও রবিবার হলে
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল—২৬শে জানুয়ারী

মাল্যদান/পুষ্পাঞ্জলি : অরবিন্দ মহাত্মা। অমল সরকার, বিমলাংশু রায়, সাধন সেনগুপ্ত এবং অন্য দাদা।

বিবিধ সংবাদ

বাঙলার লোকসংস্কৃতিচর্চার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হয়ে রবীন্দ্র সদনের কর্তৃপক্ষ আগামী ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী, শনি ও রবিবার যে-লোকসংস্কৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ অভিনব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিদিন সৃষ্টি করে যুগ-যুগান্তের অন্ধকার ভাঙা সুতরাসিক ছুঁচিবান সুবিনয়কে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য এবং বাঁকুড়ার জেলার সোপালী, ন্যাপড়ো, ভাদু, ঝিমড়ী প্রভৃতি লোকনৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। এই উপলক্ষে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ (মন্ত্রী জ্যোতি-ভূষণ ভট্টাচার্য), পঞ্চায়েত বিভাগ (মন্ত্রী বিভূতিভূষণ মাজমদার), উপজাতি কল্যাণ বিভাগ (মন্ত্রী সেওফুলি হাঁসদা) এবং লোক-সভা সদস্য অধ্যাপক ঘোষ সাহিত্যের সহায়তা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই অভিনব লোক-নৃত্যোৎসবে আগ্রহের পরম কলকাতার নৃত্যোৎসাহীদের মধ্যে যথারীতি সাড়া জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হবে এবং দর্শকদের কাছে চিত্তাকর্ষক বলে বিবেচিত হবে। রবীন্দ্রসদন কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক অধীর বসুর দপ্তর থেকে সংবাদে জানা যায়, পুরুলিয়ার ছৌ ও নাটুয়া নৃত্যের মধ্যে থাকবে : গণেশ বন্দনা, রাধিকা-সুর বন্দ, ভিরাড-অর্জুন কথা, ইন্দ্রা-পরমেশ্বরের যুদ্ধকাহিনী, প্রসেন রাজার মৃগয়া-হরণ, ত্রিপুরাসুর বধ, ভারতসাবিত্রী কথা, জাম্বুবতী-কৃষ্ণ বিবাহ কথা, বলরামের রাস, লো-সিংহ কথকথা, পাহারাদারের নৃত্য, শিকারী নৃত্য প্রভৃতি। সোপালী লোকনৃত্যগুলি হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডী, দেবী, পশ্চিমে সোহায়ী, পশ্চিমে ফুটক, সন্ধ্যা, দাঁড়েকারী ও কাঙ্কড়ি। এবং সোলটা লোকনৃত্যগুলি

মহাত্মা গান্ধীর ১৮২ তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন অরবিন্দ মহাত্মা, অমল সরকার, বিমলাংশু রায়, সাধন সেনগুপ্ত এবং অন্য দাদা।

শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের একত্র আলাপ

বাংলার মঞ্চনাট্য আন্দোলনের আলোচ্য পরিধি চতুর্মুখে গেল ১৮ ডিসেম্বর থেকে ছাওড়ার একমাত্র স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ শ্রীরামপুরে প্রতোক বৃহস্পতি শনি রবি ও সরকারী ছুটির দিনে বাঁধার মনস্তমন আনবিবাহনা অনেকের মন্তব্য-র অভিনয় চলিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি নাটকটি দর্শকের হৃদয়ী অভিনন্দন করে ঘোষিত হয়। এই উপলক্ষে আসন্ন অন্তর্বর্ষাদের অবসানে চতুর্মুখ নাট্যসংস্থার একটি স্মরণ উৎসব পালনের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। বহুজনের বাবে বহু উৎসাহে বহু নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঐতিহ্য হয়ে এঁরা সম্প্রতি কিছুদিন শ্রীরামপুরে একটেনা অভিনয়ের ব্যবস্থা করায় হাওড়া-বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন নিঃসন্দেহে।

উদ্বোধনী দিবসে মঞ্চস্থ হয়েছে অমীম চক্রবর্তী (নাটকার-নির্দেশক-অভিনেতা) সংকলিত সমকালের নাট্য আন্দোলন ও মঞ্চের পরিচয় তুলে ধরার পর তাঁরা মেলে। ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (মঞ্চসচীব) নাটকের মঞ্চস্থ ছাড়া ও আঁ অভিনয় মনোজ্ঞ-পাঞ্চায়। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের অভিনেতা অপ্তি মনোপাধ্যায়, পরিচালক পুলক মনোপাধ্যায়। শ্যামল ঘোষাল, অধ্যাপক হিরিপ্রসাদ রায় এবং অমলেন্দু ভট্টাচার্য।

মহাত্মার বিচিত্রমুখের স্মৃতি জন-মানসে জাগ্রত রাখার জন্য এবং তাঁর আদর্শের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি নাট্য সংসদ-এর উদ্যোগে শিলিগুড়ি আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করতে সমস্তকে সাদর আহ্বান জানানো হয়েছে। বিষয় : অবশ্যই মুখ্যভাবে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে 'পাশুব গৌরব' নাটক থেকে 'টীকা ও ভাষ্য' দুখানি। সম্পাদক : শিবিন্দ্রনাথ 'মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্র' নাটক থেকে 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই'; সুরে। বাদি মিশ্র একতালা।

সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। কোন প্রবেশমূল্য নেই। বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যোগ-দানের শেষ তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩। যোগাযোগের ঠিকানা : বীরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী, সাঁচর; ১৩নং লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা—৩।

হচ্ছে। অনুমান, বাল বাল পুঁজিমাল, কিন্তুম অবশ্য এবং সে সাদুই সাজ।

সেল ৮ জানুয়ারী নেহাটী অঞ্চলী চিত্রগৃহে গিয়ে ভাব অব নেহাটী তাঁদের পক্ষবর্ধন পূর্তি উপলক্ষে ও চিত্রশিল্পের বহু বছরে স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আয়োজন করেছিলেন। এই উপলক্ষে সভাগৃহ বহু বহু পরিচালিত চিত্রগৃহের সঙ্গীতজ্ঞদের চিত্র 'আলিবাবা' প্রদর্শিত হয়। চিত্রপ্রদর্শনীর প্রবর্তিতের সময়ে প্রথম অভিনেতৃদের পক্ষপাতি চট্টোপাধ্যায় বহু বছরে স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন উপলক্ষে বলেন, পরলোকগত বন্ধুর একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর বন্ধিমচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে একটি ডকুমেন্টারি এবং একটি আঁকুনীচিত্র নির্মাণ করবেন। এ ব্যাপারে তিনি দুটি চিত্রের জন্যেই চিত্রনাট্য রচনার কাজও সমাপ্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য দপ্তরে রয়েছে।

সভাজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক-কিশোর ও কমলাটাস ক্লিনের সংস্থা পঞ্চম বছরের পদার্পণেই একটি ছবিন চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছে প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে দশটায়। নিম্নোক্ত ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। বারবারেলা—১১ জানুয়ারী মাত্রোস্টিক টকীজে; ওয়ার্ল্ড ঔইদাউট সান—১৮ জানুয়ারী মাত্রোস্টিক টকীজে; ব্লাক্সুলা—ছিন্নক অব ক্লার্কনেস—২৫ জানুয়ারী প্রাচী সিনেমায়।

গত ১১ই জানুয়ারী সকালে বিশিষ্ট-৮০, মনসাতলা লেনে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের স্মৃতিবিজড়িত এক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠানে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের চিরোধাম বিরল পালন করে। এই উপলক্ষে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং সঙ্গীতজ্ঞের বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরবীন্দ্র বসু 'বৈষ্ণবচূড়ামণি শিশিরকুমার' শীর্ষক মনোজ্ঞ ভাষণে শিশিরকুমারের বৈষ্ণবভক্তির বিষয় বলেন।

সমবয় কলকাতার ভারতী সঙ্ঘ ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতী স্কুলের হাউ এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ রাস বিহারীদের 'মা' ও 'ভারতের ঐক্য' ভারতীয় কলাকাটি সঙ্ঘ কর্তৃক নাটকাভিনয়। কলকাতার বয়স্কাদের সঙ্গীতশিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর বসবে ২০ জানুয়ারি।

ভবানীপুরে পাঠাগার পরিচালিত বিভিন্ন বয়স সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার কলা, কবিতা, প্রবন্ধ, একাঙ্ক নাটক রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও একাঙ্ক নাটক-অভিনয়ে যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী। প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশ মূল্য নেই। বিষয় বিবরণের জন্য সম্পাদক ভবানীপুর পাঠাগার, ৬৩ শাখারীপাড়া রোড, কলি-২৬, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

বিগত ৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন পীতাম্বরি সঙ্গীত কলকাতা শাখার দুই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রাসবিহারী এভিনিউস্থ সঙ্গীতায়তনের হলঘরে সঙ্গীতাচার্য শ্রীমতীকুমার সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে। সভাপতির ভাষণে শ্রীসান্যাল 'পীতাম্বরি সঙ্গীতায়তনের শিক্ষা-পদ্ধতির ও কর্মোদ্যমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতায়তনের প্রথমেই নাম করতে হয় বিশিষ্ট খেয়াল-শিল্পী কালীদাস দের। ইনি অনেকটি দুরূহ ও জটিল পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। সেতারে 'মালকোষ' ও খেয়ালে 'মালগুঞ্জী' রাগ পরিবেশন করে প্রশংসার দাবি করেন অকালপ্রয়াত অজয় মজিক ও তরুণ রায়। শিবনাথ সাহার গীটার সকলের সমাদর লাভ করে। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পীতাম্বরির সহযোগিতার ও খেয়ালগীতির ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক 'কাজরিগান'। অংশগ্রহণ করেন শীলা মজুমদার, মীরাবিহার কুন্দু, শান্তা সাহা, সত্যনারায়ণ হালদার, তপতি রায় ও পদ্মজা সাহা। গুরুমা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন মধুছন্দে অমল সাহা ও পদ্মজা সাহা। শান্তা সাহা 'খেয়াল' গানে খেয়াল পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে সাহায্যের ও তবলায় সহযোগিতা করেন মধুছন্দের সঙ্গিতানন্দ লোদ্দারী ও মোহাচার্য অধিকারী।

ভৌগোলিক অনুকূল নাইজেরিয়ার আক্রমণে সম্পূর্ণ পঙ্গু আফ্রিকার অসহায় মহা-লোকী অধিবাসীদের নিরাশ্রয়ীরা মর্মান্তিক দুর্ভোগের অবসান খানিকটা ঘোরা মাইকেটি সার্বজনীন সাহায্য করেছেন। সাহায্য-সম্ভার ও ত্রাণকার্যে ভারত মাইকেটির অন্যতম ভূমিকায় আগে নেন সৌম্য সোম, দেবিকা গঙ্গোপাধ্যায়, সমর মিত্র, শীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুরাণ। নাইজিরিয়ায় ছিলেন দেবিকা গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৩৫-৩৬ সালে যে-সব বাঙালী চিত্রকলানুরাগী প্রয়াস যাত্রা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চলচ্চিত্রশিল্পের বাঁধনে মানবদৃষ্ট সেখানে নিজের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছেন। তাঁর 'সাহায্য নিয়ে লায়ন্সোরী' এখানকার একটি অবশ্যির প্রতিষ্ঠান। শ্রীমানদৃষ্ট সম্প্রতি কলকাতায় একটি বাঙলা ছবি প্রযোজনা করবেন বলে জানিয়ে গেছেন। পার্ক হোটেলে অনুষ্ঠিত একটি চা-চক্রে কলকাতার চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি জানান, তাঁর ছবিটি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যখের ধন" অবলম্বনে নির্মিত হবে এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন উমাপ্রসাদ মৈত্র।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনপ্রাঙ্গণে সঙ্গীতের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আমাদের সবচে। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতার নামী গায়করা অংশ গ্রহণ করলেও সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল কলকাতার দুর্ভাগ্যের দুর্ভোগিতেরা সমবেতকণ্ঠে রবীন্দ্র দুর্ভোগিতের। শ্রীমতীকুমার সেদিন মোট ৮টি বিষয়ের উপর দুর্ভোগিতের পরিবেশন করেন। তাঁর অভিনয়ে উপস্থিত দর্শকরা যেন কিছুক্ষণ মুখ্যবিস্ময়ে মুক হয়ে থাকেন। বিদেশীয় প্রতিনিধিরা বিদায়ের উক্ত কলকাতা পরিচয় পাওয়ার বিভোর। অনুষ্ঠানে অংশ নেন শ্রীমতীকুমার।

গত ১৫ নভেম্বর বাঘবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রীমানস চক্রবর্তী (খেয়াল) এবং শ্রীমতীকুমার মানবদৃষ্ট (সেতার)। প্রথমে শ্রীমানস চক্রবর্তী খেয়াল পরিবেশন করেন। শিল্পী তাঁদের রাগে সুন্দরভাবে পুরিয়াধানশ্রী রাগটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সঙ্গে শ্রীযোগিনী তবলা উপযোগ উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রীমতীকুমার মানবদৃষ্ট যখন ঝালাপ সুরু করেন তখন মনে হোল একটা সুন্দর রাগ-মূর্তি যেন ধ্যান ভাল হয়ে শ্রোতাদের মনকে হরণ করতে থাকে। শ্রীমানস গঙ্গোপাধ্যায় এঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এই ধরনের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আয়োজন করার জন্য বাঘবাজার রীডিং লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ সকলের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

কিশোর কলাম পরিষদের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দিন দিন দিন উৎসবে গত ১৪ নভেম্বর রামমোহন লাইব্রেরি হলে একটি প্রযোজ দিন ও কিশোর সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দিন ও কিশোর প্রতিনিধিরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, দুর্ভাগ্যিনয় এবং নাগরিক ফ্রিক্যোলিয়াল প্রদর্শনী দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে দুজনে দলিল ও ইলা বাস; সঙ্গীত পরিবেশন করে কাবেরী কর, তপন মুখোপাধ্যায়, শীতাংশু ভট্টাচার্য সন্দা চৌধুরী এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত বিদ্যা-লয়ের ছাত্রীবৃন্দ। দুর্ভাগ্যিনয় পরিবেশন করে প্রথম দল। বিদ্যালয়ের বাণী অম্বরের ছাত্রীবৃন্দ পরিবেশিত ফ্রিক্স-নরেনের একটি অনুষ্ঠান সকলের প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতীকুমার মানবদৃষ্ট এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মাননীয় দুর্ভাবাসের দিন ডানবন্দ দম্পতি।

বরাহনগর সাংস্কৃতিক সম্মেলন পরি-চালনায় এবারে বর্ষশেষ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি। যোগাযোগের ঠিকানা—অজয়াল, পালপাড়া, অনন্তবসাক, চুঁচুড়া, হুগলী।

জনপ্রতি সন্ধ্যা আন্তরিক ১৪ বার্ষিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা সুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারি। যোগদানের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, আন্তরিক, ১৩৯ চেতলা রোড, (ব.দ্বারী), আকন্দে, ২৪-পরগনা।

খেলার কথা

বাস্কেটবলে ভারতের স্থান

বাস্কেটবলে ভারতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বিগত প্রতিযোগিতার সব খবর দেয়া হয়েছে। সার্ভিসেস দল আবার উল্লেখ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা পুনরুদ্ধার করে সবার সেরা ৫৩ বছরের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে ৩৩ বার ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন হল এবং গত দেড় বছরের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে তারা একটিবার ছাড়া চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। অবশ্য রেলওয়ে দল ফাইনাল পর্যন্ত তাদের প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানের অংশগ্রহণকারী বিজয়ী করে দেয়। এবার কিন্তু রেল দল সেই সম্মানের অংশ দখল করতে পারে নি।

এবারকার চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চ্যাম্পিয়ান হল। আরেক ৩ পাঞ্জাব অবশ্যদের প্রাথমিক খেলাটি রেল দলে ৫৩ এবং চ্যাম্পিয়নের ৬৬ পয়েন্টের উত্তরে রেলদল ৮৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে জয়লাভ করে। সার্ভিসেস দলের এবারকার তিনটি ম্যাচে মোট ৯৯ জন খেলোয়াড় খেলার সুযোগ পেয়েছে এবং ৮জন খেলোয়াড় ৩ প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে দলটি সুসংগঠিত।

এই দলের ৯.৮ ফিট ও ৬ ইঞ্চি লম্বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় এবং ৬ইঞ্চি পর্যন্তলম্বা তরুণ খেলোয়াড়েরা অন্তর্ভুক্তি হয়ে খেলেন। এই তরুণ দলের খাঁটিখেলা এমনকিল যে ফিলিপাইন পরিচয় যেন তাদের অভীরাই ভারতীয় দলে তার স্থান সুনিশ্চিত বলে মনে হয়।

৪ জনদের দলটি করেন বছরের তরুণ বাস্কেট বলে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বর্তমানে চার-চারটি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় বলে অভিহিত। এই দলের ফিলিপাইন ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ বাস্কেটবল খেলোয়াড়। ফাইনালে পরাজিত হলেও চ্যাম্পিয়ান এক সময় এমন আক্রমণ ধারা শুরু করে যে তাদেরই জয় সুনিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল। এই আক্রমণের সূত্রধারক ছিলেন এই ফিলিপাইন। এই নিয়ে খেলাতে তিনিই সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট (২৮) সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।

শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ফিলিপাইন ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেটবল ফেডারেশন সুপ্রতিষ্ঠিত। গত নভেম্বর মাসে বয়স্কদের যে এশীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। তাতে ফিলিপাইনই হয় সবচেয়ে ওপরে। পঞ্চম এশিয়ান এই প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ৭৪৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই পয়েন্টের মধ্যে একা ফিলিপাইন ২৭৭ পয়েন্ট অর্জন করেন এবং সকল দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ফিলিপাইনই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পান। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় ফিলিপাইনের নাম সকলেরই জানা আছে। গত ৮ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার নেবার পর ফিলিপাইন ভারতের খুশী হয়েই বলেন যে, এই তিনটি তার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। বাস্কেটবলই যার ধ্যান-জ্ঞান ছেলে এমন খেলোয়াড়ের মুখে এই কথাই শোভনীয়।

আন্তর্জাতিক বাস্কেটবলে ভারতের অভিষেক বেশি দিনের নয় এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যেভাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে খেলার জগতে অবশ্য একটি নব দিগন্তের সূচনা করেছে বলা যেতে পারে।

বাস্কেটে অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও এশীয় প্রতিযোগিতায় ফৌজিরা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। জাপান অর্জন করেছে দ্বিতীয় স্থান, কৃতীয় স্থানে ফিলিপাইন, চতুর্থ স্থান চীনের এবং পঞ্চম স্থানে ভারত।

অক্ষয় বিজয় মিত্র

ভারত পঞ্চম স্থান অধিকার করলেও এই প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চ্যাম্পিয়ান দল ফৌজিরার বিরুদ্ধেও ভারত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে সমর্থ হয়।

ভারতের প্রথম খেলা পড়ে ১৯৬৭ সালের চ্যাম্পিয়ন ফিলিপাইন দলের বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধে ভারত এক পয়েন্টে এগিয়ে থাকে (৪০-৩৯)। সব বিভাগেই ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় — তাদের সৃষ্টি সমতের দলগঠন হয় এবং তাকে ফিলিপাইন ও ইরি দলের নৈপুণ্য সকলের প্রশংসা অর্জন করে। খেলার শেষ দশ মিনিটে ফিলিপাইন দল তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্যের জোরে ভারতের হাত থেকে ম্যাচটি ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় খেলায় ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চীনের সঙ্গে। খেলা পড়ে হলে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য ফিলিপাইন ও ইরি অভিযানের চেয়ে অনেক পয়েন্টে অনুন্নত হয়। খেলার দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে দুটি ফাউল সেওয়ায় তারা হয়ে যায়ের বাইরে যায়। এই খেলাতে পরাজয়ের ফলেই ভারতকে পঞ্চম স্থানে নেমে যেতে হয় এবং চীন চতুর্থ স্থান দখল করে নেয়। জাপানিদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থানে ফৌজিরা ও ইরি দলের সৃষ্টি বিশেষ সহায়তা করে।

ফৌজিরা দলে আইনল অলিম্পিকখ্যাত খেলোয়াড় স্থান পেয়েছিলেন এবং এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলোর আগে এই দল আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ বাস্কেটবল দলগুলির সঙ্গে ২৩টি ম্যাচ খেলে। এই অভিজ্ঞতা তারা এখানে কাজে লাগায়। তবু ভারতীয় দলের সঙ্গে তাদের প্রাণপণ লড়াই করে মাত্র এক পয়েন্টে জিততে হয়।

দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জাপানের বিরুদ্ধেও ভারত সমান পাল্লা দিয়েছে। তবে বয়স্কদের চ্যাম্পিয়ান দল ফিলিপাইন দলকে পরাজিত করে জাপান ফেবারিট ভারতকে পরাজিত করাও খুব কি সহজ হবে। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের দৃঢ়তা ও ঐক্যতা শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে। শেষ পাঁচ মিনিটের খেলায় জাপানিদের নিষ্পত্তি হয়। জাপান ফাউলের ফলে ভারতকে পরাজিত করে।

পঞ্চম এশিয়ান প্রতিযোগিতার শেষে ভারত পঞ্চম স্থানে থেকেও বাস্কেটবলে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অনেক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, চার বছরের মধ্যেই ভারত বিশ্বে একটি শ্রেষ্ঠ দলরূপে পরিগণিত হবে। এই স্থান নিতে হলে ভারতকে অবশ্য বর্তমান খেলার ধরনে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ আজকে এশিয়ার সেই পুরনো ধারাতেই খেলা চলছে। কেন ধরনে একটা মাত্র খেলোয়াড় করে দুপক্ষের দুটো বোর্ড ধরে রাখলে বাকিরা বলে ধরাধর পেটাপেটি করে খেলা চলে। আগে খেলোয়াড়েরা অবশ্য একটু উঁচুতে ধরবার সুযোগ পায়। তবুও লম্বা ও উঁচুদের বোর্ড, রাইবল রাইবার বল কিংবা উঁচুতে ফেলবার পাঁচখেলা এসবও আজকের আন্তে সুপ্রচলিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যখন বিদেশে খেলতে যায় তখন আগ থাকতেই নিজেরা সাবধান হয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আসরগুলোর কোনোর সময়ও যদি সকল ভারী প্রতিযোগিতা খেলোয়াড়দের নিয়ে পূর্ণ পরিচালিত করে তৈরী করার

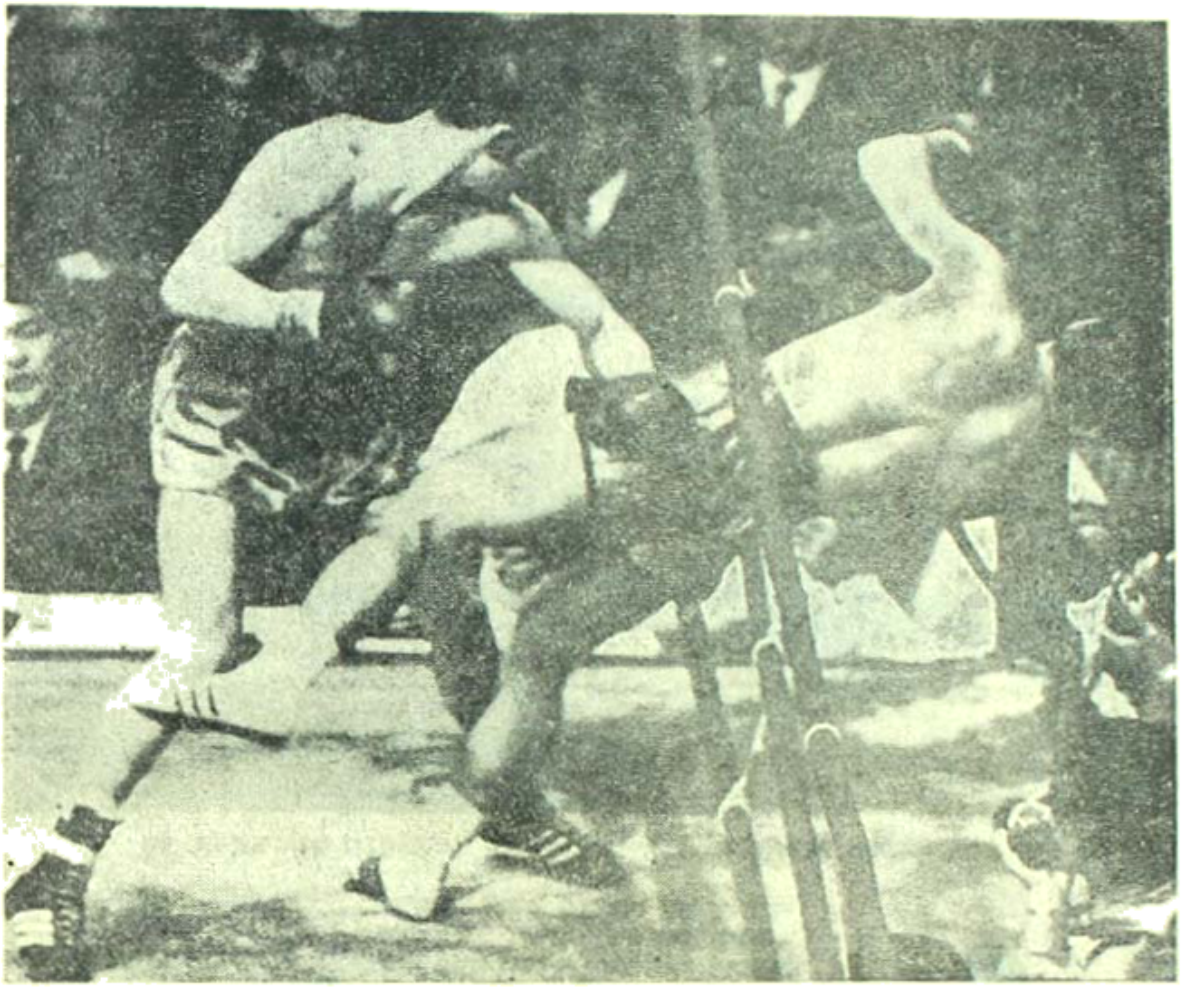

বিশ্বের খেলোয়াড়েরা অভিবাদনের জন্য দাঁড়ালেন (বসেছে) জাপানের হারাদা (চতুর্থ থেকে) হাতের ওপর চ্যাম্পিয়ন অন্য সবাইকে রেখেছে।

স্বল্পতার কারণে। এদিক দিয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু কাজ হয়েছে তবে তা যথেষ্ট নয়।

জনসাধারণের দিক থেকে বাস্কেটবল এখনও অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। ফিফো খেলা দেখতে যেখানে হুড়োহুড়ি লেগে যায়, বাস্কেটবলের খেলায় সেখানে দর্শকদের আসন বহুলাংশে খালি পড়ে থাকে। দর্শকদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন খেলাকেই জনপ্রিয় করা সম্ভব হবে না। সুইডেন তার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা স্থান নিতে পারে নি তবুও এর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। যে হকিতে ভারত একদা বিশ্বের সেরা বলে গণ্য হত সেই হকি খেলা দেখতে কিন্তু এখন দর্শক সমাগম কখনও হয়নি। ফলতঃ হকি খেলাতে যে অনগ্রসরতা এসে তা খেলার জন্যে নয় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের আকর্ষণেই হয়ে থাকে। যেমনি বাস্কেটবলে ভারত অধিনায়ক বাদি আজি কারোরও দর্শকদের মন একদম তার দিকে টানতে পারে নি। আন্তর্জাতিক পরিচালকমণ্ডলের যে কমিটি খেলার এমন কতকগুলি নিয়ম করে চলেছে যাতে দর্শকদের আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। পরে অবশ্য আসল রহস্যটি তাঁরা খেলা দেখতে আসলেন। খেলে কৃত্রিম ধরনের খেলোয়াড়ের উৎকর্ষ লাভ করতে হলে প্রয়োজন যেমন জিমন্যাসিয়ামের যেমনি ফুটবল ও অন্য খেলায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে প্রয়োজন হবে বাস্কেটবল ও অভিনয়ের খেলার।

আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল সংস্থার যেমনেরা সেক্রেটারী জেনারেল কোল বলেছেন, চার বছর আগে তৃতীয় এশীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় ভারত প্রথম যোগ দেয়। এই চার বছরে ভারতের খেলার উন্নতি বিস্ময়কর। ভারতীয় খেলোয়াড়দের দীর্ঘদেহের প্রসার ও পাশ্চাত্য খেলোয়াড়দের তুলনায় কম নয়। বিশেষ করে তাদের এই পর্যায়কে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়কে প্রতিহত করতে তাদের মাস্তানাবুদ হতে হয়। আগামী এশীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা কিছু বিচিত্র নয় এবং তার ফলে বিশ্ব এলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারত বাদ পড়ার দুঃখ হবে। পরে অবশ্য আসল রহস্যটি তাঁরা খেলা দেখতে আসলেন। খেলে কৃত্রিম ধরনের খেলোয়াড়ের উৎকর্ষ লাভ করতে হলে প্রয়োজন যেমন জিমন্যাসিয়ামের যেমনি ফুটবল ও অন্য খেলায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে প্রয়োজন হবে বাস্কেটবল ও অভিনয়ের খেলার।

আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল সংস্থার যেমনেরা সেক্রেটারী জেনারেল কোল বলেছেন, চার বছর আগে তৃতীয় এশীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় ভারত প্রথম যোগ দেয়। এই চার বছরে ভারতের খেলার উন্নতি বিস্ময়কর। ভারতীয় খেলোয়াড়দের দীর্ঘদেহের প্রসার ও পাশ্চাত্য খেলোয়াড়দের তুলনায় কম নয়। বিশেষ করে তাদের এই পর্যায়কে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়কে প্রতিহত করতে তাদের মাস্তানাবুদ হতে হয়। আগামী এশীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা কিছু বিচিত্র নয় এবং তার ফলে বিশ্ব এলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারত বাদ পড়ার দুঃখ

খেলার উন্নতি হতে পারে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন পাঁচশত মাঠ-সজ্জা, অভিজ্ঞতার প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার মাঠে, চলবার বলে ও কাঠের বোর্ডের সাহায্যে খেলতে হয়। ফলে বাইরের বোর্ড ও শাল বাইরার বোর্ডে খেলতে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পদে পদে ঠকতে হয়। কাজেই তাদের এখন থেকে আগামী এশিয়ান খেলোসের আসর ও ১৯৭১ সালের কবে এশীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার জন্য তৈরী হতে হবে।

ভারতে বিদেশের সেরা বাস্কেটবল দল সমূহকে আহ্বান করে তাদের সঙ্গে খেলার ব্যবস্থা করা এবং বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা খেলোয়াড়দের তৈরী না করলে উচ্চ পর্যায়ের খেলা সম্ভব নয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের কর্মকর্তাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাইচ প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

খেলাধুলা

ধর্মপদ

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুর ডিফেন্স ক্লাবের টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে আলেকজান্ডার মেদ্রেজেলী পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে ত্রিমুকুট সম্মান লাভ করেছেন। চারটি খেতাবের মধ্যে রাশিয়া পেয়েছে তিনটি খেতাব এবং ভারতবর্ষ পেয়েছে একটি।

পুরুষদের একক সিঙ্গলস খেলায় রাশিয়ার মেদ্রেজেলী গত বছরের চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। অপরদিকে সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের প্রেমজিৎ লাল রাশিয়ার কার্পভকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের মুখরক্ষা করেন। কিন্তু তিনি ফাইনালে মেদ্রেজেলীর হাতে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে শ্রীমতী অ্যালবনেজে (রাশিয়া) অস্ট্রেলিয়ার ২নং খেলোয়াড় কুমারী আইভানোভাকে পরাজিত করেন। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে অবাঙ্গাই জুটি নায়ার মিনেত্রা এবং শিবপ্রসাদ মিত্র গতবারের চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের মুখরক্ষা করেন। মিকসড ডাবলস ফাইনালে কুমারী আইভানোভা এবং আলেকজান্ডার মেদ্রেজেলী (রাশিয়া) ৬—০ ও ৬—০ সেটে পুলিয়ানী (ইতালী) এবং কিরণ দেশপাণ্ডেকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : আলেকজান্ডার মেদ্রেজেলী (রাশিয়া) ৬—০, ৬—৪, ২—৬, ০—৬ ও ৬—০ সেটে প্রেমজিৎলালকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতে ১০৬ মিনিট সময় লেগেছিল।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী ক্লেয়া অ্যালবানেজ (রাশিয়া) ১—৭ ও ৬—৩ সেটে অস্ট্রেলিয়ার কুমারী আইভানোভাকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নায়ার মিনেত্রা এবং শিবপ্রসাদ মিত্র (ভারতবর্ষ) ৬—২, ১—৭ ও ৬—৪ সেটে গতবারের চ্যাম্পিয়ান জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : কুমারী আইভানোভা এবং আলেকজান্ডার মেদ্রেজেলী (রাশিয়া) ৬—০ ও ৬—০ সেটে পুলিয়ানী (ইতালী) এবং কিরণ দেশপাণ্ডেকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি

ফাউকেরার ইস্পাত স্টেডিয়ামে আয়োজিত বাংলা বনাম উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট খেলায় বাংলা এক ইনিংসে এবং ৪৮ রানে জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় উড়িষ্যার প্রথম ইনিংসে ১৫৬ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা ২ উইকেট খুইয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন বাংলা তাদের প্রথম ইনিংসের ২৮৭ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে বাংলা ১৫১ রানে এগিয়ে যায়। বাংলার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩য় উইকেটে জুটি জীবন ঘোষ (১৪ রান) এবং গোপাল বসু (৬০ রান) মলের ১১৯ রান তুলে দেন। জীবন ঘোষের ১৪ রানের মধ্যে ১১টা বাউণ্ডারী ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় উড়িষ্যা দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১০ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইনিংস ১০০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন মাত্র ১৫ মিনিট খেলা হয়েছিল।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বাইচ প্রতিযোগিতা

কলকাতার উপকণ্ঠে রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাইচ প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিভাগের ফাইনালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম জয়ী হয়ে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছে। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় দল আলোচ্য বাইচ প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৭৪ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে শামসুল হুদা ট্রফি জয়ী হয়েছে। এ-বছরের প্রতিযোগিতায় মোট ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় দল অংশগ্রহণ করেছিল—কলকাতা, যাদবপুর, পুণা এবং মহেন্দ্রী বিশ্ববিদ্যালয় দল।

ফাইনাল

সিঙ্গল ঃ এস কে দুবড়া (কলকাতা 'এ' দল) ৩ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডে এ এস বন্দ্যোপাধ্যায়কে (কলকাতা 'বি' দল) পরাজিত করেন।

ডেবল ঃ এস কে দুবড়া এবং আর এস কাপুর (কলকাতা 'এ' দল) ৩ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ডে এস হুদা এবং আর সেনগুপ্তকে (যাদবপুর) পরাজিত করেন।

ফোর ঃ কলকাতা 'এ' দল ৩ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ডে যাদবপুরকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

উদয়পুরে আয়োজিত অষ্টাদশ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সূত্রে 'মিনার্ভা' সম্মান লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব এই নিয়ে ৮-বার খেতাব জয়ী হল, এর মধ্যে উপর্যুপরি ৩-বার। পুরুষ বিভাগে বাংলা ৮ম স্থান পায়।

ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ ঃ পাঞ্জাব ১৫—৪, ১৩—১৫, ১৪—১৬, ১৫—৭ ও ১৫—৩ পয়েন্টে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ ঃ এই বিভাগের সুপার লীগ খেলায় পাঞ্জাব, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সমান সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করে। পয়েন্টের গড়পড়তায় কেরলকে পাঞ্জাবকে চ্যাম্পিয়ন এবং কেরলকে রানার্স-আপ ঘোষণা করা হয়।

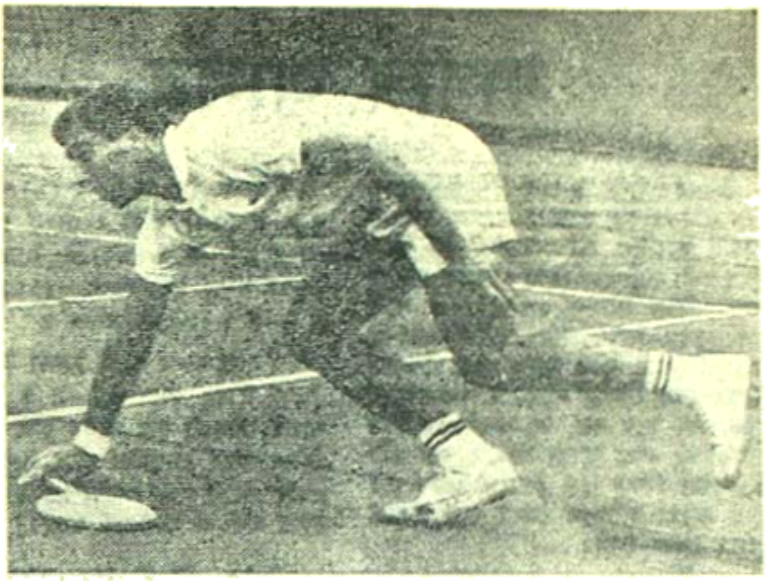

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্ডার মেদ্বেডেভ (রাশিয়া)

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা

ডোলমাইটে যে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছে, তাতে অংশগ্রহণ করেছে সাতটি দেশের ৮টি দল—ভারতবর্ষের ২টি (বম্বে সীনিয়র এবং কিকে সীনিয়র) এবং একটি করে দল পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালী, জাপান এবং আর্জেন্টিনার। গত ১১৬৮ সালের অলিম্পিকে ভারতবর্ষের হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক বিজয়ী পাকিস্তান এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মেক্সিকো অলিম্পিকের ব্রোঞ্জপদক বিজয়ী ভারতবর্ষ এবং চতুর্থ স্থান অধিকারী পশ্চিম জার্মানী আসরে প্রতিযোগিতার প্রধান আকর্ষণ। শক্তিশালী খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতবর্ষের দুটি দল মোট দলটি গঠন করা হয়েছে। এই দলটি এপর্যন্ত ৪টি খেলায় ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে। হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের দুই দল ৩-৩ গোলে ড্র করে একটি যুগ্মমান পয়েন্ট লাভ করেছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পশ্চিম জার্মানী ভারতের দুই খেলায় ৩—১ গোলে খেলোয়াড়কে পরাজিত করে ভারতবর্ষের দুই দলীয়দের সম-সংখ্যক ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

সম্প্রতি আয়োজিত পঞ্চদশ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের আন্তর্জেলা স্পোর্টসের ছাত্র বিভাগে পাঞ্জাব এবং ছাত্রী বিভাগে কেরল দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

বাংলা ছাত্রী বিভাগের আন্তর্জেলা স্পোর্টসে ২য় স্থান এবং ছাত্রী বিভাগের ক্রিকেটশিল্পে ১ম স্থান পেয়েছে।

আন্তর্জেলা স্পোর্টস

দলগত চ্যাম্পিয়ন

ছাত্র বিভাগ ঃ পাঞ্জাব (৪১ পয়েন্ট)

ছাত্রী বিভাগ ঃ কেরল (৩২ পয়েন্ট)

ছাত্রী বিভাগে বাংলা ১৬ পয়েন্ট পেয়ে ২য় স্থান পায়।

ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন

ছাত্র বিভাগ ঃ মহারাষ্ট্র দল (রেজুলেন), ১৩ পয়েন্ট

ছাত্রী বিভাগ ঃ মুম্বাই সুমন (রেজুলেন),

কলকাতার ২০তম জাতীয় বীচসকার দল চ্যাম্পিয়নশিপের বাবদ বিজয়ের ট্রফিসহ একটি দল

দাবার আসর

এবারে সমাধানের জন্য দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা থেকে ১টি খেলা দিলাম। খেলাটি হয়েছিল ফ্রীমেসনস্‌দের মধ্য অনুষ্ঠিত দাবা চ্যাম্পিয়ন ফ্রীমেসনস্‌দের মধ্যে। ফ্রীমেসন ইতিহাস খুবই বিচিত্র। খুব অল্প কিছু মানুষ (দুটি দলকেই যোগ করে ২ থেকে ডজন হবেন) ছাড়া খেলাটি খেলেন, কেন খেলার খুঁটিনাটি অনেকগুলি অদ্ভুত চাল ভরে আছে, যা অবাস্তব। প্রথম ১টি চালের মধ্যে অন্তত বিশেষত্ব আছে ৩টি অদ্ভুত চাল কিন্তু সাদা বিশেষত্ব আছে ৬টি। এই রকম অদ্ভুত পরিবেশ তৈরী করে খেলার সুযোগ পেয়ে খেলুন।

সাদা—ফ্রীমেসনদের দল
কালো—অন্যান্যদের দল
দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ, ১৯৬১।
ইতালিয় ওপনিং।

(১) ঘ—ঘ ম ৪ । ঘ—ঘা ৪ (২) ঘ—ঘ ম ৩ । ঘ—ঘা ম ৩

(৩) ঘ—ঘা ৩ । ইতালিয় ওপনিংয়ে সাদা অনেক সময় এই চালটি দেয় এই আশা করে যে কালোর কালো চৌখুপিক না খুঁড়েই আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু কালো ওসব কিছু না করে যদি খুব খুঁটিনাটির সাহায্যে সমাবেশ করে ফেলে যায়, তাহলেই মুস্কিল। যেমন (১) ঘ—ঘ ম ৪ । ঘ—ঘা ৪ (২) ঘ—ঘ ঘ ৩ । ঘ—ঘা ম ৩ (৩) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘ ৩ (৪) ঘ—ঘা ৩ । ঘ—ঘ ৩ (৫) ঘ—ঘা ৩ । ঘ—ঘ ৩ (৬) ঘ—ঘ ৪? । ঘ—ঘা ৩! (৭) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (৭) ঘ—ঘ ৪ । ৩—৩ (৮) ম—ঘা ২ । ঘ—ঘ ৪ এবং কালোর খেলাই বেশী ভাল থাকে। অথবা, ওপরের ভ্যারিয়েশনে (৪) ঘ—ঘ ২ । ৩—৩ (৫) ঘ—ঘা ২ । ঘ—ঘা ১ (৭) ৩—৩ । ঘ—ঘ ৩ (৮) ঘ—ঘা ১ । ঘ—ঘা ৩ এবং শেষ পর্যন্ত...ঘ—ঘ ৪ চাল দিয়ে কালোর খুব সুন্দর খেলা থাকে। ঘ ইয়োক, সাদা ঘ—ঘ৩ চাল দিলে এর পর ঘ—ঘ ৪ চালটাও দিতেই হবে, যা এ খেলায় ফ্রীমেসন করেন নি। অদ্ভুতক ১৮ই জুলাই, সন্ধ্যের আসরে—স্পানকীর এই খেলাটি খেলা হয়েছিল, তার চোদ্দার চালগুলি এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে। (১) ঘ—ঘ ঘ ৪ । ঘ—ঘা ৪ । (২) ঘ—ঘা ঘ ৩ । ঘ—ঘ ঘ ৩ (৩) ঘ—ঘ ২ । ঘ—ঘা ঘ ৩ (৪) ঘ—ঘ ম ৩ । ঘ—ঘ ২ (৫) ঘ—ঘা ৩ । ঘা ঘ—ঘা ২ (৬) ঘা ঘ—ঘা ২ । ৩—৩ (৭) ৩—৩ । ঘ—ঘ ৩ (৮) ঘ—ঘ ৪ । ঘ×ঘ (৯) ঘ×ঘ । ঘ—ঘ৩ ইত্যাদি।]

(৩)...ঘ—ঘ ঘ ৩ (৪) ঘ—ঘ ঘ ৩ । ঘ—ঘা ঘ ৩ (৫) ঘ—ঘ ২ । ঘ—ঘ ২ (৬) ঘ—ঘা ঘ ৩ । ঘ—ঘ ৪ (৭) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (৮) ঘ—ঘ ২ । ঘ—ঘা ৩ (৯) ঘ—ঘ ম ৩ । ঘ×ঘ (১০) ঘ×ঘ । ৩—৩ (১১) ঘ—ঘা ২ । ঘ—ঘ ২ (১২) ৩—৩ । ঘ—ঘ ৩ (১৩) ঘ—ঘ ২ । ঘ×ঘ (১৪) ঘ×ঘ । ঘ ঘ—ঘ ১ (১৫) ঘ ঘ—ঘ ১

[সাদা ঘ—ঘ ঘ ২ চালটা দিতে চায়। কিন্তু উচিতে কালো৩ ঘ—ঘ ৩ চাল দিলে সাদার ঘোড়াটা ধরা পড়ে। সেইজন্যে সাদা কালো দিয়ে ঘোড়াটার জোর যাচাই করে নিল। কিন্তু একটু পরেই সাদা পস্তাবে বলেছিলো। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সময় নষ্ট হচ্ছে।]

(১৬).....ঘা ঘ—ঘা১ (১৭) ঘ—ঘ ২ । ঘ—ঘা ঘ ৪ (১৮) ঘ—ঘা১ । ঘ—ঘ ৪ (১৯) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘ ৬ (২০) ঘ—ঘা ৩ । ঘ—ঘ ঘ ১

[সাদা (১৯) ঘ—ঘ ৪ চালটা৩ করতে চেয়েছিল কিন্তু তা হলে (১৯).....ঘ×ঘ।

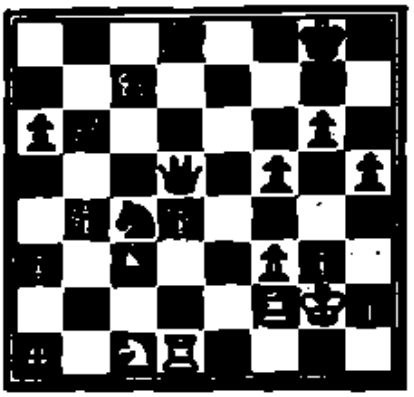

সাদার ২৯নং চাল ঘ-ঘ ১-এর পরের অবস্থা

এরপর (২০) ঘ×ঘ । ঘ—ঘ ২ (২১) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘা ৭ (২২) ঘা—ঘ ১ । ঘ×ঘা ঘ (২৩) ঘ ঘ—ঘা ১ । ঘ×ঘ ঘ (২৪) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৫) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৬) ঘ×ঘ । ঘ ঘ—ঘ ৪ এবং সাদার অবস্থাটি খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সাদা (২৩) ঘ×ঘ চাল দিতে পারে না তাহলে (২৩)...ঘ×ঘ। অথবা (২৩) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ।]

(১৯)...ঘ—ঘ ২ (২০) ঘ—ঘ ঘ ৪ । ঘ—ঘ ম·৩ (২১) ঘ—ঘ ঘ ৩ । ঘ—ঘ ঘ ৩ (২২) ঘ ঘ—ঘ ঘ ১ । ঘা ঘ—ঘা ৩ (২৩) ঘা ঘ—ঘ ২ । ঘ—ঘা ঘ ৪ (২৪) ঘ—ঘ ৪!

[এখন যদি (২৫)...ঘ×ঘ, (২৬) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৬) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৭) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৮) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৯) ঘ×ঘ এবং সাদার খেলাটাই সহজ হয়।]

(২৫)...ঘ×ঘ (২৬) ঘ×ঘ । ঘ—ঘ ৪! (২৬) ঘ ঘ—ঘ ১ । ঘ—ঘা ৩! (২৭) ঘ—ঘ ঘ ১·। ঘ—ঘা ৪

[সাদার ঘা ঘ—৩ ঘরটার ওপর তিন জোড় করা হোল। এখন যদি (২৮) ঘ×ঘ তাহলে (২৮)...ঘ×ঘ এবং কালোর জিতে যায়।]

(২৮) ঘ—ঘ ২!!

[একটি জোরা চাল। এখন কালো সৌকা দিয়ে সাদা একটা গজ মেরে দিতে পারে, কিন্তু তাহলে কালোকে হারতে হবে। যেমন, (২৮)...ঘ×ঘ (২৯) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (৩০) ঘ×ঘ+ । ঘা—ঘ ২ (৩১) ঘ×ঘ এবং সাদার একটি সৌকা বেশী থাকে।]

(২৮)...ঘ—ঘ ৩! [গজটিকে না মারার ফলে কালোর অবস্থা খুবই ভালো হয়ে গেল। এখন সাদার খেলাটি বেশ খাপছাড়া হয়ে গেল। সাদাকে এখন গজটি খাঁচাতে হবে, কিন্তু কিভাবে? যদি (২৯) ঘ—ঘ ২ তাহলে (২৯)...ঘ×ঘ এবং একটি মারাত্মক ডবল-কিস্তি এবং তাৎক্ষণিক হারাত্মক একটি ঘোড়ার কিস্তি আসছে। যদি (২৯) ঘ—ঘ ২ তাহলে৩ (২৯)...ঘ×ঘ ঘ (৩০) ঘ×ঘ । ঘ—ঘা ৬+ (৩১) ঘা—ঘ ২ । ঘ×ঘ- (৩২) ঘা—ঘ ২ । ঘ×ঘ (৩৩) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ এবং কালোর একটি গজই বেশী থাকে। (২৯) ঘ—ঘ ১ চালটা৫ সম্ভবও নয় কারণ (২৯)... ঘ×ঘ ঘ (৩০) ঘ—ঘ ১ । ঘ×ঘ ঘ এবং উল্লিখিত বিপদগুলিই সাদার জন্যে অপেক্ষা করছে।]

(২৯) ঘ—ঘ ১ । ঘা ঘ×ঘ (৩০) ঘা—ঘ ১ । ঘ—ঘা ৬ (৩১) ঘ ঘ—ঘ ২ । ঘ×ঘ (৩২) ঘ×ঘ । ঘ—ঘ ৮ (৩৩) ঘ—ঘা ২

[সাদাকে জিতবেলা জোড় মেরে রাখে কারণ যদি সাদার সৌকাটি ঘ ঘ ২ ঘর ছাড়া ৭ম সারিতে অন্য কোন ঘরে যায় তাহলে কালো ঘ×ঘ চাল দিয়ে সাদার একটি গজকেই মেরেফেলে জেরে যেবে। সাদা ঘ×ঘ চালটা দিতে পারে না কারণ পরের চালে কালো গ×ঘ+ চাল দিলে সাদার রাজাটাই চলে যায়। এবং যদি সাদার সৌকা ঘ ঘ ২ ঘরে থাকে, তাহলেও কালোর চাল হবে ঘ×ঘ এবং এখনো সাদা তার রাজা দিয়ে ঘোড়াটিকে নিতে পারে না কারণ তাহলে কালো ঘ×ঘ+ চাল দিয়ে পরের চালে একটি ভারী সৌকা বেশী করে নেবে।]

(৩৩)...ঘ×ঘ। (৩৪) ঘা×ঘ । গ—ঘ ৩ (৩৫) ঘ—ঘ ১ । ঘ—ঘা ১ (৩৬) ঘ—গ ৪ । গ×ঘ (৩৭) ঘ×ঘ । ঘ—ঘ ৭+ (৩৮) ঘা—ঘ ৩ । ঘ×ঘা ঘ ঘ (৩৯) ঘ—ঘ ৩+ । ঘা—ঘ ১ (৪০) ঘ—গ ৪ । ঘ—ঘা ঘ ৩। সাদার হার স্বীকার করায় সাদা জিতেছেই কালোর ঘ—ঘ ৩ ফিগিওরে চালটি টেনেতে পারে না।

—গজানন ঘোষক

আজই পত্রিকাসমূহ রাইটার্স লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুবীর সরকার কর্তৃক পরিষদ প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এতো সহজের মূল্য অনেক।
বিদেশের সৌন্দর্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকার জন্য
এর প্রস্তুতির যুগ।

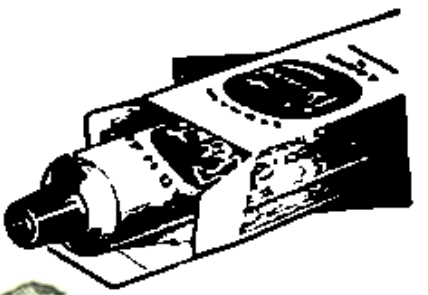

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা ◆ কলিকাতা-৮

; Regd. No. C-4352
Gram : AMRITA, Calcutta-3

AMRITA

Friday, 16th January, 1970
Phone 55-5231 (14 lines)

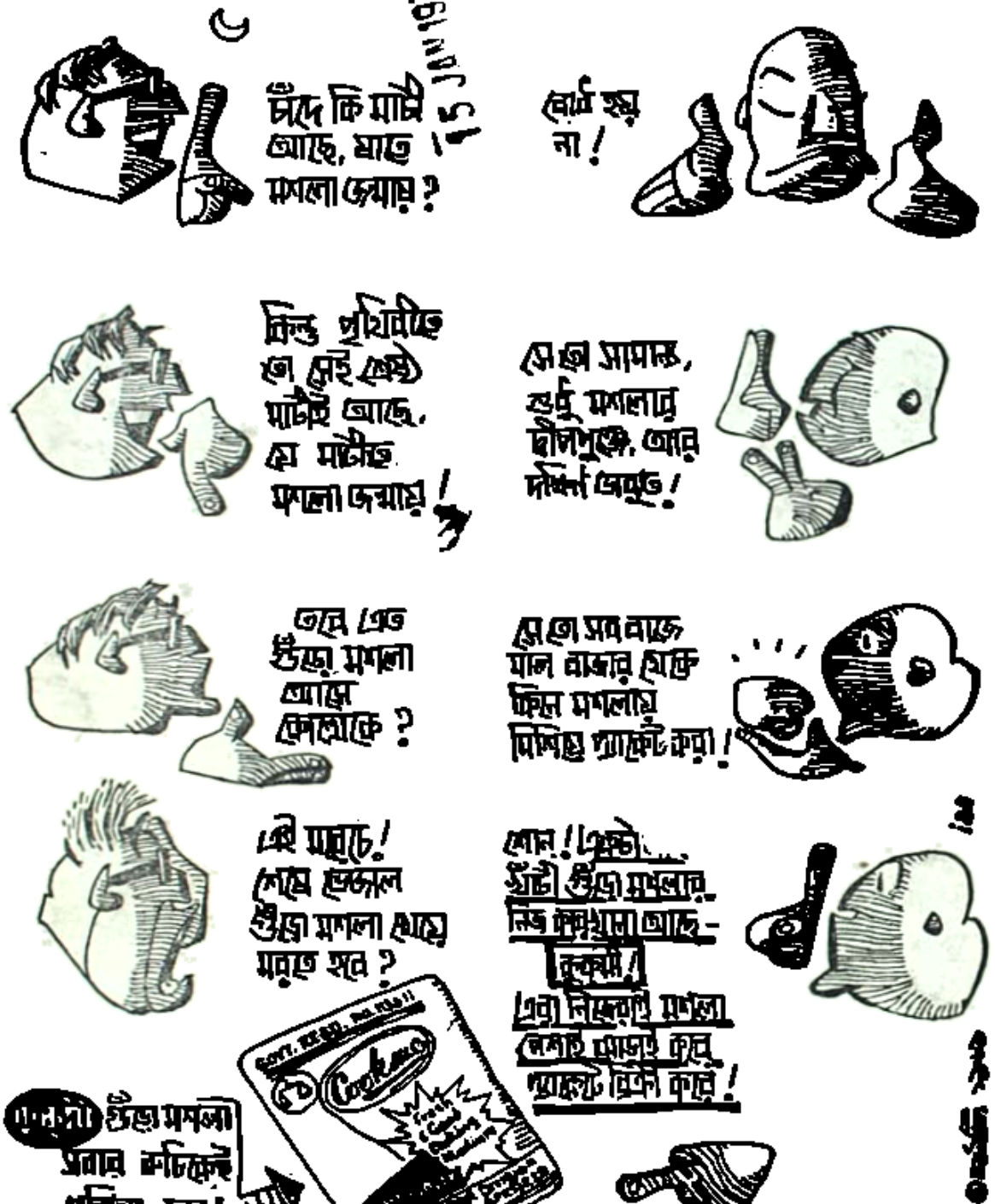
15 JANUARY 1970
চাঁদে কি মাটি আছে, যাতে মশলা জন্মায়?
বোধ হয় না!
কিন্তু পৃথিবীতে তা যেই যেই মাটিই আছে, সে মাটিতে মশলা জন্মায়!
সে তো সামান্য, শুধু মশলার দীলপুকে, আর দার্জিলিং জন্মুত!
তবে এত গুঁড়ো মশলা আসে কোত্থেকে?
সে তো সব বাজে মাল বাজার যুক্ত কিনে মশলায় মিশিয়ে প্যাকেট করা!
এই মারছে! শেষে ভেজাল গুঁড়ো মশলা খেয়ে মরতে হবে?
দাঁড়াও! একটা... খাঁটি গুঁড়ো মশলার নিজ কারখানা আছে- কলকাতা! এরা নিজেরাই মশলা বেছে গুঁড়ো করে, প্যাকেট ফিল করে!
গুঁড়ো মশলা প্রয়োগ রুচিকেই পরিতৃপ্ত করে!
Cookme

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত কুকমি—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলায় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ, ২৩৫, মহর্ষি

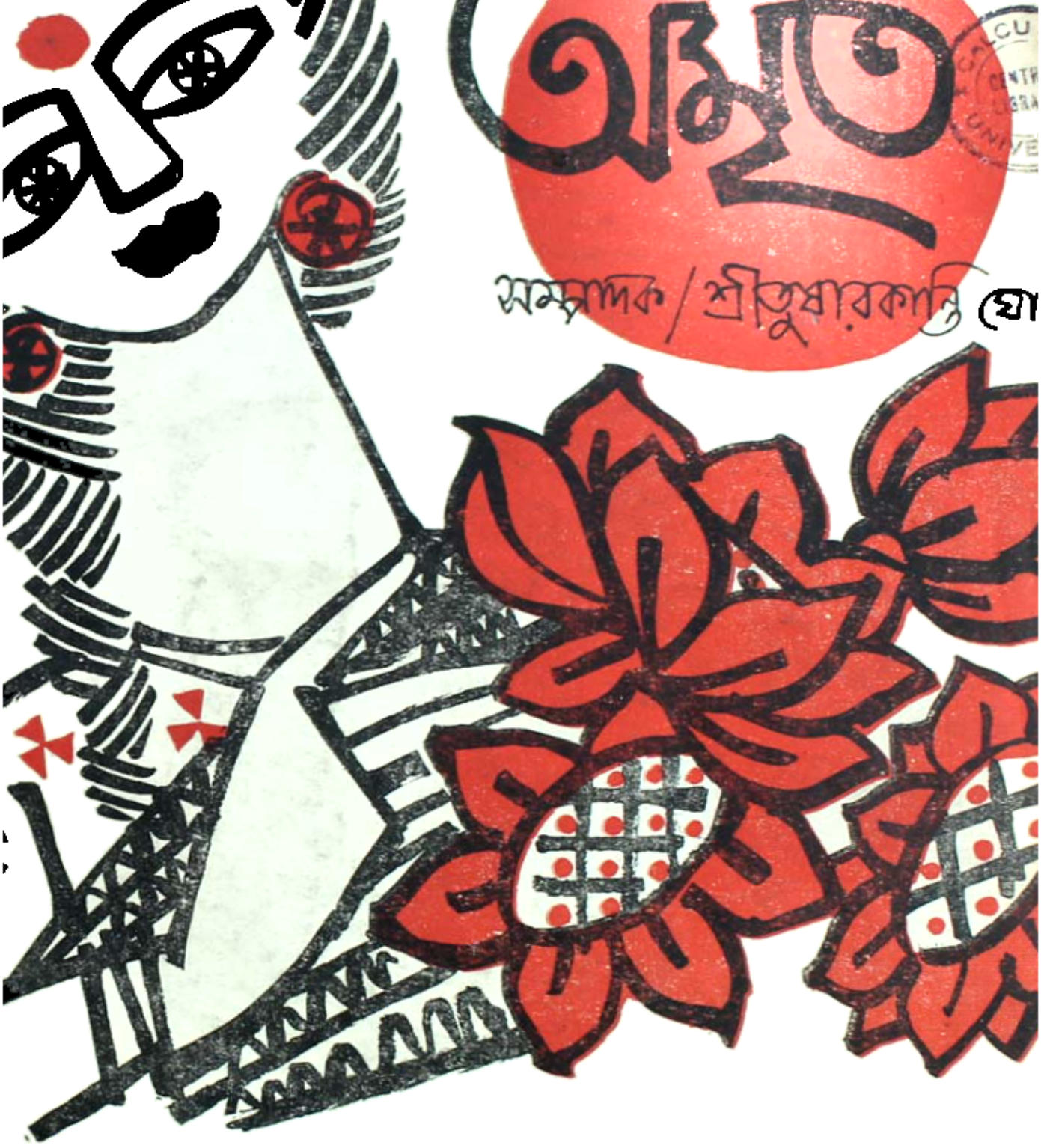

বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৭শ সংখ্যা] শুক্রবার, ১৫ মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০

শীত
বোরোলীন
অ্যান্টিসেপটিক সুরভিত ক্রীম
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে।

আপনিও ব্যবসায়ী!

আপনি আমাদের ব্র্যাণ্ডগুলি স্টকে রেখে বিক্রী করুন এবং এইভাবে আমাদের ব্র্যাণ্ডগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করুন। ক্রেতা ও প্রস্তুতকারকদের মধ্যে আপনিই মুখ্য যোগসূত্র।

দেশের সিগারেটের বাজারে বিদেশী এজাতীয় ব্যবসায়ীদের প্রথম আবির্ভাবের ফলে দেশীয় সিগারেট শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আপনাকে কিছুটা অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, এই অসুবিধাগুলি আপনাকে নিরস্ত করে না, বরং উল্টোদিকে উৎসাহিত করে। আর, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি সমস্ত বাধা ও প্রলোভন সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পেরই সহায় হন। আপনার সচেতনতা ও অন্তরের সাড়া, আপনার চেষ্টা ও বাসনা আপনাকে করে তোলে দেশীয় শিল্পের শুভস্বরূপ। আপনার ক্রিয়াশীল সহযোগিতা এই শিল্পকে গড়ে তুলতে ও এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করবে।

দেশী সিগারেট বিক্রয় করে
ভারতের বিদেশী মুদ্রা রক্ষা করুন

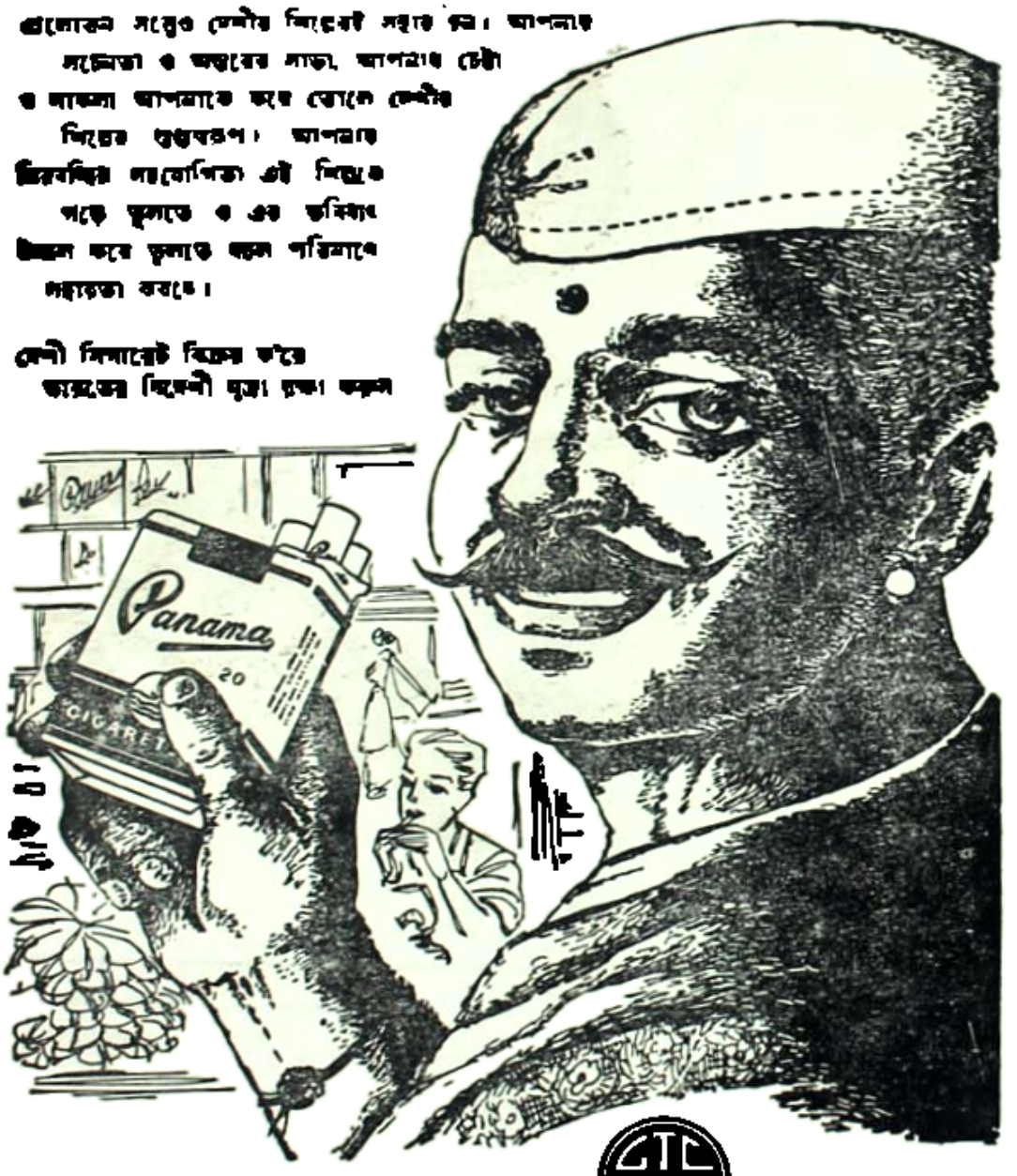

মোহনলাল টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই বহুলের ব্যবহৃত জাতীয় উৎপাদ

অমৃত বই ॥ নব লেখক

॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥
পরশুরামের শ্রীশ্রীসমাস্ক (১ম—৩, ২য়—৩, ৩য়—৩, ৪র্থ—৩) মৌরাল পরিমল ১৩ ভক্ত হিরেকনাথ ৩৷৷০

॥ অজিতকৃষ্ণ বসু (অকৃত) ॥
মহিলা ক্যাণ্টিন ১৩

॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥
বাংলাদেশে ছাত্রাবস্থা ১৩

॥ অবধূত ॥
মহাতীর্থ হিংলাজ ৬ হিংলাজের পথে ৫ কৈলাসতীর্থ হিমালয় ৮৷৷০ কলিতীর্থ কালীঘাট ৩৷৷০

॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥
প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৫ সুবর্ণলতা ১৩ সোনার হরিণ ৩ উত্তরাপথি ৩৷৷০ বিজয়ী বসন্ত ৬

॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥
নদের পারে মুখোমুখি ১৫ কাল তুমি আলেয়া ১২৷৷০ পঞ্চতপা ৭ বিদ্যাসাগর লেখা ৮

॥ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥
হিমালয়ের পথে পথে ৭ বনপাংশুল ৩

॥ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ॥
উপেন্দ্রকিশোর গল্পাবলী ১৩

॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥
উপকণ্ঠে ১৩ আর কত দূরে নই ১৫ একদা কী করিয়া ১৩ রাত্রির তপস্যা ৮ জ্যোতিষী ৩৷৷০

॥ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ॥
ইষ্ট ইণ্ডিয়াম্যান রোড ৮

॥ জহর সেন ॥
লৌহ কপাট (সম্পূর্ণ) ৫০ ছায়াটীর ৩ ঘাঁটি ৪

॥ তারাশঙ্কর ॥
গল্পবেদের ৮ পঞ্চগ্রামী কথা ৮৷৷০ আঁধারমাণিক ৬ ঝড় ৬ রাধা ৮ যোগভ্রষ্ট ৭

॥ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥
ডমরুচরিত ৩৷৷০

॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥
উপছায়া ৩ শৈব সম্পাত ৩১০ ত্রিনয়নের ৬

॥ নলিনীকান্ত সরকার ॥
গান্ধী ঠাকুর ৩৷৷০ হাসির অন্তরালে ৬

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥
ঝড়যদনি ৪৷৷০ নূতনের ডাকে ৪৷৷০

॥ নির্মলকুমারী মহলানবিশ ॥
বাইশে শ্রাবণ ৬ কবির সঙ্গে ইয়োরোপে ১৩ কবির সঙ্গে দক্ষিণভারতে ৩

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥
বহ্নি মিলিত ১৩ স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ২ ছায়াপথের পূর্বাশ ১৩ অগ্নি ভাগীরথী তীরে ৭৷৷০

॥ প্রফুল্ল রায় ॥
যুদ্ধ ৩ পটলীর অন্তরে ৬ প্রথম প্রহরের আলো ১৩ পূর্ব পাবতী ১২

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥
উত্তর হিমালয় চরিত ১২ মহাপ্রস্থানের পথে ৬ আরণ্যকা ৩৷৷০ দূরন্ত ৪৷৷০

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥
লাল দেওয়া ১৫ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷০ বিপ্লবী সমুদ্রে তৃমি যে ৭৷৷০

॥ প্রশান্ত চৌধুরী ॥
আলোকের বন্দরে ৪৷৷০ বন্দীবন্দিক ৫

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
পা বাড়ালেই রাস্তা ৩৷৷০ সপ্তডঙ্গা ৩৷৷০

॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥
স্বর্ণমাধুরী পরীরানী ১৩৷৷০ অপ্রাপ্ত বয়ঃ ৬ মেঘমল্লিকের অন্তরা ৬ মিলনান্তক ৪৷৷০

॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
পথের পাঁচালী ৬৷৷০ অপরাজিত ১৩ অনুবর্তন ৬ আরণ্যক ৩৷৷০ দেবযান ৮

॥ বিমল কর ॥
সীমারেখা ৪৷৷০ ঘাট বদল ৫

॥ বিমল মিত্র ॥
সখী সমাচার ৬ একক দশক শতক ১৫

॥ মনোজ বসু ॥
পদ্মা কদম ৩৷৷০ বন বেটে বসত ১৩

॥ মহাশ্বেতা দেবী ॥
আধার মানিক ১২৷৷০ সন্ধানের অপরাহ্ণ ৩৷৷০

॥ সুবোধকুমার ঘোষ ॥
অযান্ত্রীলীলা ৭ নীলাঞ্জনা ৭৷৷০

॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥
দেশে বিদেশে ৭ খয়াম ৭

॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥
ছদ্মবেশী ১২ পুরোহিত ১২ চন্দন বাটী ৩ সাহেব বদলে ৪৷৷০

মিত্র ও ঘোষ ঃ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জলে 'ডেটল' মিশিয়ে দাড়ি কামানো কেন ঢের বেশী নিরাপদ?

আপনি হয়ত বুঝতে পারেন না, কিন্তু দাড়ি কামাতে গিয়ে আপনার চামড়া চটে যায়। তাছাড়া, কেটে যাওয়া ছড়ে যাওয়া তো লেগেই আছে। এসব ব্যাপারে হেলা ফেলা করলে সেপ্টিক হতে পারে।

বিপদের ঝুঁকি নেবেন না। দাড়ি কামানোর জলে একটুখানি ডেটল মিশিয়ে নিন—ব্যস্, তাহলেই আপনি নিশ্চিন্ত।

এছাড়াও, বাড়ির আরও নানা নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে ডেটল ব্যবহার করতে পারবেন—কেটে গেলে, ছড়ে গেলে, গার্গল করতে, চুল পরিষ্কার করতে এবং স্নানের জলে।

এক বোতল ডেটল আজই বাড়ি নিয়ে যান।

DAG-9 BEN

ঘরে ঘরে দরকার ডেটল নিরাপত্তা

ডেটল

বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত জীবাণুনাশক

বিনামূল্যে নিরাপত্তা পুস্তিকা

বিনা মাশুলে আমাকে এক কপি সচিত্র ঘরে ঘরে দরকার ডেটল নিরাপত্তা পাঠিয়ে অনুগৃহীত করবেন।

নাম_____

ঠিকানা_____

১২৩ এই আবেদন খুলে কার্ডে পাঠিয়ে দিন: জি.পি.ও. বক্স নং ১, কলিকাতা-১

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

১৯ বর্ষ
৩৫ সংখ্যা

অমৃত

৫২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 23rd January, 1970 শুক্রবার, ৯ই মাঘ, ১৩৭৬ 40 Paise

নিয়মাবলী

চেকবইয়ের প্রতি

১। আমাদের চেকবইয়ে মোট পঞ্চাশটি চেক থাকে। চেক বইয়ের আবেদনপত্রে আমাদের কাছে পাঠান আবশ্যক। আবেদনপত্রে আপনার পুরো ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন

চিঠিপত্র

সাহিত্যিকের চোখে : সাংবাদিকতার রীতি

অমৃতে কেন কিছুকাল ধরে 'সাহিত্যিকের চোখে সাংবাদিকতা' নামে একটি বিভাগ চলছে। বিভাগটি খুবই কৌতূহল নিয়ে পড়ছি, এবং এ ধরনের বিভাগ চালু করার জন্য সম্পাদকীয় পরিকল্পনার তারিফ করছি।

কিন্তু এই ব্যবস্থার জন্য একটি সাংবাদিক অমৃতের এই বিভাগটির বিষয়ে মূর্খামি এক আলোচনায় দেখে অবাক হলাম। ঐ আলোচনায় ট্রিপুরাকে যে সরকার যা বলেছেন, তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কারণ যে কোনো আলোচনা নিজের মত পোষণ করতে পারেন এবং প্রকাশও করতে পারেন। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, সাংবাদিকতার একটি প্রচলিত রীতি হল—কোনো কাগজে কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে পাঠকের যা কিছু বক্তব্য তা সেই কাগজেই জানাতে হয়। তারপর যদি সেই কাগজ প্রতিবাদ বা আলোচনা প্রকাশে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, তখন অন্য লেখক অন্য কাগজেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ট্রিপুরা সরকার কি তাঁর ঐ আলোচনাটি আপনাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন? এবং আপনারা তা ছাপলেন না জানিয়েছেন?

যদি তাই না হয়ে থাকে, তাহলে ট্রিপুরা সরকারের পক্ষে এইভাবে অন্য কাগজে অমৃতের বিচার এবং (তার লেখকদেরও বটে) উপর কটাক্ষপাত করা কি সাংবাদিকতার রীতি-বিরোধী এবং রীতিমত অনৈতিক আচরণও (অন-এথিকাল) নয়?

হাসান মুখোপাধ্যায়
দুর্গাপুর

[ট্রিপুরা সরকার 'অমৃতে' পূর্বোক্ত বিষয়ে কোনো লেখা পাঠান নি, আমরাই 'অমৃত' কর্তৃক তা প্রকাশ করছি। আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।]

অ-স

'বইকুণ্ঠের খাতা'

'অমৃতে' আমার বই-এর সমালোচনার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও প্রীত। তবু দু-একটি ভুল সংশোধন না করে পারছি না। Children's Book Trust যাদের যে বইটি প্রকাশ করেছেন, তার নাম Tiger Tales. ছোটদের জন্য সাহিত্যের মানের গল্পের বই। ট্রিপুরা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের আছেন। National Book Trust, India-র সভাপতি হলেন ডঃ ভেলেরু। এঁরা কিন্তুপ্রতি প্রকাশনী সম্পাদনার জন্য জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে নেহরু বাল পুস্তকালয়ের পরিকল্পনা করেছেন। এঁরাও Children's Book এর মতো বুলোবাবিহীন বাদ যাবেন। এইবারই যাঁ একটি layout দিয়ে, এঁরাও সব ভারতীয় ভাষার প্রকাশ করবেন। ইংরেজীতে এই পরিকল্পনার নাম হবেছে Nehru Library of Books for children. এইপরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে ১৯৮৮-এর শেষ দিক থেকে। এখন প্রথম কয়েকটি বইয়ের ছাপার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

প্রথম বইগুলি হবে ১২—১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য, তুলনামূলক অবশ্য সহজ। পরে এঁরা সব বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য সব ভাষায় বই সম্পাদনা করার ইচ্ছা রাখেন। আমার River story এঁরা প্রকাশ করেছেন। উভয় ভারতের নদী সম্বন্ধে বই। একটি বড় আকারের, ৬৪ পৃষ্ঠার বই হবে। ছবি থাকবে প্রচুর, দাম হবে কম। সব বই-ই সেটাপ্রটি এই রকমের হবে। ভারতের সব ভাষার ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন, এঁদের এঁরা আহ্বান জানিয়েছেন। এ পরিকল্পনা সুসম্পন্ন হলে ছোটদের জন্য একটা ভারের মতো কাজ হবে।

আমার এই চিঠিখানি যা তার অংশবিশেষ অনুগ্রহের পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করবেন।

লীলা মজুমদার

নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং বিসর্জনের মূর্তি

অমৃতের ১২ই জানুয়ারি, ১৯৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং বিসর্জনের মূর্তি' শীর্ষক রচনায় বহু বিদ্যাপিপাসুর তৃষ্ণা শান্ত হয়েছে, কেননা সংবাদের প্রকাশ হওয়া একান্ত দরকার। সংক্ষেপে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

যেমন, লেখকের অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ নাটকের নাম বিকৃতরূপে পরিবেশিত হয়েছে। যেমন ও যমী, ধরেছ, ভিক্ষিরা, সপ্তপ্রতিমা, অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং সুভদ্রাহরণ নাটককে যথাক্রমে রুমা ও যমী, রত্নাকর, ভিক্ষিরা, সপ্তপ্রতিমা, অভিজ্ঞানশকুন্তল ও সুভদ্রা।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় বিদ্যাপতির এবং বচনসমুচ্চয় বাল্মীকির কোথাও কোথাও ভিন্নোক্তি-চলন, সংযোগসমাস এবং বহুপদসমাস ভেঙে লেখা হিয়েছেন।

'তুলনালোকের সঞ্জীবনের' এবং বচনসমুচ্চয় 'মাঝের বাল্য' কবিতা দুটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।—রাবণবিনাশের এই রকম অভিনব এবং ধারাবাহিক। কেন না, প্রথম নাটকটি সেক্সপীয়রের Merchant of Venice এর ভিন্নধর্মীয় ভাবানুবাদ (অবশ্যই নাম পরের অনুবাদের অনুসারে), দ্বিতীয়টি মাইকেলের নাম-না-জানা এক অজ্ঞাতকুলশীল নাটক এবং সবচেয়ে বড় কথা সমালোচক ও সাধারণ পাঠক কেউই এঁদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায়ের স্বীকৃতি দেন না।

নাটক সম্বন্ধে লেখকের শোচনীয় অজ্ঞতার জন্য, বাংলা ভাষার প্রথম একাঙ্ক মূর্তির জন্যে অপরেশচন্দ্রের নাটক-তালিকাকে অবশ্য দায়ী দিতে বাধ্য। স্টারে তথা বাংলা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত এবং প্রথম চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নন্দলাল ইসলাম প্রভৃতি কর্তৃক মৌলিকতায় তারিফ উচ্চ প্রশংসিত ও বিখ্যাত এই একাঙ্কটি রচনার কৃতিত্ব ঈশ্বরে সম্বন্ধ আছে, সৌভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

'নিঃসম্বলে' বাংলা সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য কিনা, এবিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে নাটকের কোনো তুলনা নেই।

পরিশেষে সাংবাদিক বলেছেন, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মাইকেল' লিখেছিলেন। তাহলে এতকাল যে সমালোচকরা বলে এসেছেন নাটকটি Sign of the cross গল্পের বাংলা ভাবানুবাদ, তা কি ভুল?

শিশির বসু
কাঁচরাপাড়া
২৪ পরগনা

ছোট পত্রিকা প্রসঙ্গে

গত ১৯শে ডিসেম্বরের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীসুনির্মল চট্টোপাধ্যায় লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, শ্রীবিনয়ভূষণ বসু তা সমর্থন করেছেন (১ই জানুয়ারী, ৭০)। আমিও এঁদের সঙ্গে একমত।

একথা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে গেলে যে কি ধরনের বাধা অনুবিধে এবং দুঃখ-বেদনার ভিড় জমিয়ে হয়, তার খবর অনেকের মতো আমারও জানা আছে। বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা তাঁচা পড়ুক, এরকম অভিপ্রেত অবশ্যই কারও থাকতে পারে না।

আছে। এই অবস্থার জন্যে দেশের সর্বস্তরের নৈতিক, সামাজিক এবং শাসনব্যবস্থাকে দায়ী করা যেতে পারে।

প্রবাসী বাঙালীরা তবুও নত মাথায় বিপত্তি সত্ত্বেও অনেকেই লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছেন। জীবনময়বাবু খুব সম্প্রতীপার পাঠিয়েছেন—সম্পাদক-সূত্রে।

কিন্তু এমন তো অনেকেই আছেন যাঁদের এই লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করার আগ্রহ ও উৎসাহ আছে, অথচ নানারকম প্রতিকূলতার চাপে পড়ে তাঁদের ইচ্ছা কাগজে রূপায়িত হতে পারে না। তার ওপর আছে, ভাতীয় ভাষার দাপট।

সুতরাং অফিস-কাছারির শেষে, কর্ম-ক্লান্ত অবসর মুহূর্তে সেই উৎসাহী মানুষ গুলো যখন মুহূর্তের উন্মেষণের পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে বাংলা পত্র-পত্রিকাতে পাঠান, পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা অযাচিতভাবে রূপ মেরে ফেরত পাঠান। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলোর চেয়ে ফেরত পাঠানো গল্পগুলো কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়, অনেক সময় উৎকৃষ্ট হয়।

আজকাল প্রায় চোখে পড়ে, প্রবাসী বাঙালীর মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষা পড়ছে। খুবই দুঃখ হয়। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীরা কেন যে, মাতৃভাষা শিখছে না, এ প্রশ্নের সঙ্গে বাংলা পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যও জড়িত।

সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি যে আরো সংকটপূর্ণ হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও সন্দেহ নাই।

কল্যাণ সিংহ
পাটনা-৬

পশ্চিমবঙ্গে আসুন

অমৃত ছুটি ও বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'পশ্চিম-বঙ্গে আসুন' প্রবন্ধটির জন্য লেখক এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই প্রবন্ধ বেশ সময়োপযোগী তেমনি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অমৃতের মতন একটি বহুল পঠিত পত্রিকার মাধ্যমে এই যে চেষ্টা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থানগুলির ওপর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে এর জন্য সমস্ত বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ থাকবে।

বর্তমানে সর্বত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, লালদেশকে হীন করার চেষ্টা। কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগেরও রয়েছে বিশেষভাবে দায়িত্ব। এমন সময় এসেছে আমাদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার। ভারতবর্ষের যেখানেই যাওয়া যায় দেখতে পাওয়া যায় পর্যটন বিভাগের নানা ধরনের বিজ্ঞাপন। কিন্তু কোথাও আপনার চোখে পড়বে না পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপন। কিন্তু সত্যিই কি পর্যটকদের দেখার মতো পশ্চিমবঙ্গের কিছুই নেই? শ্রীভৌমিকের এই অল্প পরিসরে লেখার মধ্যে বিশ্লেষণভাবে লেখক দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ।

প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গকে অকৃপণভাবে দিয়েছে সত্য, কিন্তু আমরা কি যথার্থভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করছি? লেখক আক্ষেপের সুরে যে ক্ষমতাদেশ বলেছেন সেগুলো কি খুবই কষ্টসাধ্য? এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার, কলকাতা পৌরসংস্থা এবং রাজ্যের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি কি একেবারেই কিছু করতে পারেন না?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায় পর্যটনকে রীতিমত শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে অন্যান্য রাষ্ট্র। আর ফলস্বরূপ সেসব দেশ পাচ্ছে বিদেশী মুদ্রা এবং পর্যটকরা পাচ্ছে সুখ-সুবিধা এবং আরাম। পর্যটকরা দেখছেন ও জানছেন পরের দেশকে নিজের মত করে। দেশে ফিরছেন বিদেশের সুখ-স্মৃতি নিয়ে।

কিন্তু যত অভিযোগ ভারতবর্ষের দেশের; বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। সেই জন্য আজকের দিনে প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকার উচিত বিশ্বকবির কথায় বাংলা-দেশের প্রকৃত ছবি তুলে ধরা। পরিশেষে অমৃত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন এই ধরনের ছোটখাট প্রবন্ধগুলিই ক্ষান্ত না হন, প্রকাশ করুন ভ্রমণ ও বিনোদন সম্বন্ধে এত পর্যটন সংস্থা যার মাধ্যমে বিভিন্ন লেখক প্রকাশ করতে পারেন নানা রকম পরিকল্পনা এবং তার ফলে খুলে যাবে নতুন দিক।

সুভাষ বসু
কলকাতা-২৫

কলকাতার ট্রাম

বেলজিয়ামের রাজধানী শহর ব্রুসেলসের পরিবহন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত চার ফ্রাঙ্ক মূল্যের ০-০৮ সালের একটি পুস্তিকা কিনতে পাওয়া যায়। ট্রামের বিভিন্ন রুটের ম্যাপ তো আছেই, তাছাড়া এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য কোথায় কত নম্বর ট্রামে উঠতে হবে এবং নামতে হবে কোথায়, যদি ট্রাম বদল করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোথায় ট্রাম বদল করে কত নম্বর নতুন ট্রামে উঠতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ আছে সেই পুস্তিকায়। ট্রামের পুরোভাগের বোর্ডে কেবল যে বিভিন্ন রুটে নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন নম্বর ও গন্তব্যস্থানের নাম থাকে তাই না, ভিন্ন ভিন্ন রঙও হয় তাদের।

অবশ্য এসব ব্যবস্থাই একসময়ে ছিল কলকাতাতেও, কিন্তু আমাদের কলকাতার ট্রাম কোম্পানী, কি যে কারণে জানি না, যাত্রী-দের প্রতি বিমুখ হয়ে সেসব ব্যবস্থাই নির্বাসিত করেছিলেন বাতিল করে। তাই আপসোস হয় অন্যান্য বহু দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে আমরা ছোট বড় সব ক্ষেত্রেই তখন পেছনে হটছি।

আমরা একজন ট্যুরিস্টের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমাদের কলকাতার ট্রাম সর্বাপেক্ষা দেখার ও আকর্ষণীয়। প্রতিবছর হাজার হাজার বিদেশী পর্যটক কলকাতায় আসেন। সুতরাং ট্যুরিস্টদের সুবিধের জন্য কলকাতা ট্রাম কোম্পানী যদি ব্রুসেলস পরি-বহন সংস্থার মত ট্রামের মাধ্যমেও সব দর্শনীয়তার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তবে ট্যুরিস্টদের অনেক সুবিধা হয়। ট্যুরিস্টদের আর আপসোস থাকবে না।

নারায়ণচন্দ্র অধিকারী
হিরাকুদ, ওড়িশা

অন্ধকারের সুখ

শ্রীদেবেশ দেবশর্মা লিখিত 'অন্ধকারের সুখ' শীর্ষক রহস্যোপন্যাস 'অমৃতে' পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। এই লেখকের অন্য রহস্য-কাহিনী যথা 'রাত তখন দশটা' ও 'অথৈ জলে মানিক'ও পড়েছি। এই নবীন লেখকের রহস্য-কাহিনীগুলিতে রহস্যের ও ঘটনাস্রোতের জাল সুদৃঢ় বিস্তৃত এবং এগুলি বাজারে প্রচলিত জেমস্ রহস্য-কাহিনীগুলি থেকে স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। শ্রীদেবশর্মার কাহিনী-গুলিতে ঘটনা-প্রবাহের মন্থরতা নেই—ঘটনাগুলি রহস্যকে ঘনীভূত করতে করতে শেষ পরিণতির দিকে সাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। তাঁর রহস্য-কাহিনীগুলি পড়তে সুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না। একজন নবীন রহস্য-লেখকের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের বিষয়। এঁর লেখার সব-সামগ্রিক সমাজ-চিত্রের প্রতিফলনও সুন্দর-ভাবে হয়েছে। লেখককে ভাবাও করছি। ভবিষ্যতে ভাল ভাল আরও রহস্য-কাহিনী এঁর কাছ থেকে পাবো—এই আশা করছি। পরিশেষে, এই লেখক ও অমৃতের সম্পাদক-মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নীলমাধব গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৪৩

শান্তিচোখে

পশ্চিমবঙ্গের অধুনাতন রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি আন্দাজ নেবে ১৪ই জানুয়ারীর রাত শান্তি ট্রিবুনের নগরীর উপান্তিকে চিত্র পরিচালকটি অকস্মাৎ তার পূর্ব-আস পত্তের ছবি। "সমাপ্তি" এর আগে সবসাধারণের অবধারিত জন্য শান্তি-শিবিরের যে চিত্র হাজির করেছিল মুখবন্ধের দুই অনুচ্ছেদ দুই লম্বা তার সাক্ষী দিচ্ছে। যেটুকু কাটিকুটি দেখা যেত তা আর কিছু নয়, বিরোধী শিবিরের ভুল ও কৌশল আলোচনার জন্য সাময়িক অন্তরোধের মাত্র।

গত অন্তত সপ্তাহ ধরে যাঁরা সংবাদ-পত্রের কলমে দৃষ্টি রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, শান্তি বৈঠকের দিন নির্ধারণ করার জন্য দুই শান্তিদূতের সর্বশেষ বিবৃতি বলদুপ্ত ও ভাষা পাল্টি কি রকমটাই না হয়েছিল। যে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই দুই পুরুষের মিলিত সভা থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৪ই জানুয়ারী বৈঠক বসবে। কোনো শর্তের কথা সেদিন বলা হয় নি।

উল্লেখ্য, সেদিন থেকেই দুই শান্তি-দূত একটি সর্বসম্মত আলোচ্য বিষয় নির্ধারণের কাজে তৎপর পরিশ্রম এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম অন্যতম শ্রীসুবোধ কুমার ঘোষণা করলেন, শান্তি বৈঠকের কোনো বিষয়সূচী থাকবে না। সমস্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে আলো-চনা করে স্থির করবেন আলোচ্য বিষয়বস্তু কি হবে। কিন্তু শ্রীকুমারের ঘোষণার আগেই জ্যোতি যে বৈঠক বসিয়েছিল তাতেই ঠিক হয়েছিল জ্যোতি সাধারণ সমস্যা নিয়েই শান্তি বৈঠক বসবে।

শ্রীকুমারের ঘোষণার কথা শুনে সাধার-ণজনতা থেকে কেন কয়েক মার্কসবাদী শ্রীমাখন পাল একেবারে যা বলে ফেলেন। সংবাদে প্রকাশ করলেন, জ্যোতির কাজ একাকারেই চোরে!

বাঁধও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের জন্যেই জ্যোতির এই মরণপণ অবস্থা, কিন্তু নেপথ্যেও অনেক দলের এতে ভূমিকা রয়েছে। তার সেই ভূমিকা নিয়ে থেকে জনযুদ্ধীদের মতের সঙ্গেই সমস্ত রাজ্য অভ্রান্তলিপ্তা হয়ে পড়ে চলেছে। মার্কসবাদীদের দল বড়ানোর জন্যে হিসেবের অর্থকরণ ও পরিকল্পের প্রশাসনিক কলকব্জা থেকে উচ্ছেদের চক্রান্তের পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছিল বলে অভিযোগ করে বাংলা কংগ্রেস মুখে পড়ছে। এবং তাদের সেক্ষেত্রে প্রতিবেদ প্রজাতন্ত্রী দল-জনসাধারণের মাঝারি প্রতি-ক্রোধের মুখে নেয়। তারপর জ্যোতির মত আসলে মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি, যার অন্তরালে ইন্দিরার অনেক ব্যক্তিদের অবদান। এই সব মিলিয়ে যে দুর্বিপাক সৃষ্টি হয়ে আছে আরও প্রচণ্ডতর করে তোলেন শ্রীসুবোধ কুমারদের। শ্রীমাখনদের বল এবারের কিছু পরিবর্তে জোতদারের বাগান, বড়লোকদারী আশা নিয়ে যে রাজনৈতিক বল দুর্বার থেকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাতে ইন্ধন দিয়ে সেক্ষেত্রে চলে পড়েন বিলেন। শ্রীমাখনদের ঘোষণা করলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে যথার সরকার বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা শান্তি বৈঠক হবে না। এই দ্বিতীয় ধাক্কার উপর শ্রীমাখনদের এত বেশী জোর দিতে লাগলেন যে মনে হচ্ছিল চলতের আসল সমস্যা কেবল মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্য, আর কিছুই নয়। জনমের স্মৃতিশক্তি অতীব দুর্বল। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী কেন যথার সরকার বল-লেন সে কথা আর কিরে দুর্বে ঐ কথার উপর প্রতিনিয়ত জোর দিতে থাকলে পট-ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে লোকে বলবে, সত্যিই তো, এ রকম অন্যায় কথা বললে কি করে এককালে চলা যায়। কিন্তু কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীভূপাল মুখ্যত অতীব নিপুণতার সঙ্গে এই কথা একটা ঘোঁয় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, মুখ্যমন্ত্রী ও রকম উক্তি করেন নি। ফলে, ঘটনার জোড় হয়ে গেল।

এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে শান্তিদূতেরা চেষ্টা করলেন ছলের ৩২ দফা কর্মসূচী মুখ্যমন্ত্রীর উপর জোর দিয়েই যাতে শান্তি আনা যায়। অন্যান্য শরিকদের সঙ্গেও এই মর্মে আলোচনা হল। অনেকেই আশা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অন্তর আসা করে দুর্বিপাক বলবেন, কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই উক্তি করলেন।

অবস্থা যখন এমনি একটা, স্বাভাবিক হয়ে পড়ে থাকল, বাংলা কংগ্রেস তখন এক বড়যন্ত্রের চৌকস্ত অধিকারী বজায় রাখলেন। এই চৌল কেমনটার আসলে আছে, কি করে মার্কসবাদী ও অন্য এস পি সেনাদের বাংলা কংগ্রেসের লোকজনদের সঙ্গে খোপনে আঁতাত করে শ্রীযুক্ত মুখার্জি ও শ্রীমতীলাল যাদুরাজ যার দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য পরিকল্পনা করছিলেন। আর পরিকল্পনাটা কম্যুনিস্টরা ফেরোধিতা করলে বাংলা কংগ্রেস ভেতর চৌকস্ত করার ক্ষমতা নাকি এই চৌল কেমনটা বলে পড়ছে। এতদিন চুপ করিতে হওয়ায় আর বলমুক্ত জন্য যায়, সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীজ্যোতি বোস এ খবর জানালেন। যাহোক এই মিনি চক্র পরিকল্পনা 'ফাঁস' হবার পর মার্কসবাদী নেতা শ্রীভূপাল মুখার্জি বলেছেন, "আমরা কখনো এমন কোনো এ সব আলোচনা করেছিলাম।" শ্রীমুখার্জি অবিশ্য আগে এ খবর বলেন নি, তবে তাঁর অবশ্যের কোন বিকৃত ব্যাখ্যা না করেই বলতে বলা যায়—"অস্বীকার করা" আর "ভাগ দেওয়া" নিশ্চয়ই এক কথা নয়। আসলে ভবিষ্যৎ সংবাদের আসল ভাবনা তাই যে ভেতরে ভেতরে চিন্তাভিত হয়ে উঠেছিল, এটা বলাই বাহুল্য। এতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। কারণ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট-দের ঘর ভেঙে দেওয়ার জন্য কেউ যদি ষড়যন্ত্র করতে পারেন,—পাল্টা ষড়যন্ত্র করবার পূর্ণ নয়ন্ত্রসঙ্গত অধিকার মার্কসবাদীদেরও আছে।

এ ষড়যন্ত্র আলোকে আসার পর শান্তির দূতেরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আপসের সূত্র নির্ধারণের চেষ্টা করছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে একটু সৌজন্যতা দেখালেও শেষে নাকি গরম উঠে বলেছেন, "আমি ওদের suppose করে ছাড়ব।" শান্তিদূতেরা এতে প্রমাদ গুনে-ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা আশা করছিলেন, সব দল জোর করে বললে হয়ত "সজ্জনতা" নির্ধারণ হতে পারবেন। কিন্তু সকল দলই হতচকিত হয়ে উঠলেন যখন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পত্র এলো সকলের সম্বন্ধে। স্বাধীনতা ভাষায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বলছেন, দুঃখের বিষয়, এবার একেবারে কংগ্রেস বলায় বলিষ্ঠ বৈঠার করে মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি প্রত্যাহৃত না হলে আলোচনা-আলোচনায় আবশ্যকতাই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি, মার্কসবাদী দল বলছেন, জনসাধারণের পক্ষে অবমাননাকর। মুখে এ কথা বলে তাঁরা কান্ত হন নি বাংলা কংগ্রেস ও মুখ্য-মন্ত্রী কিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আসছেন তার একটা ইতিহাসও ঐ লিপিতে তাঁরা সংযোজন করে দিলেন। ফলে এই পত্রাঘাতের উপেক্ষা করা করে রাজনীতির অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন, চৌল কেমনটা বরং-পক্ষ চক্রান্তের অস্তরকে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্যই মার্কসবাদী দল লিখিত বক্তব্য পেশ করলেন। মুখে বললে সে কথার গুরুত্ব কমই হয়। কাজেই লিখিতভাবে বাংলা কংগ্রেসের চক্রান্তের অভিযোগ করে মার্কসবাদীরা ঘটনার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। অভিযোগ করা ঠিক হয় কিনা অতীব সন্দেহ। তারপর যত দোষ নন্দ ঘোষ "অযোধ্যা" সংবাদপত্র তো আছেই। ফলের কি হবে জানি না—বাংলা কংগ্রেসের ও সি পি এমের লিখিত বক্তব্য থেকে এবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল, সাংবাদিকরা মিথ্যা কথা লেখেন না। যাহোক, সি পি এমের এই পত্রাঘাত অন্যান্য শরিকদের অনে-কটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ফরওয়ার্ড ব্লক, চলতের সি এস পি এই ঘটনা আসল এই

সভা কৌশলের নিন্দা করল। এমন কি এস ইউ সি ও বিষয়ে হতবাক হয়ে গেল।

এমন একটা প্রায়ুখী অবস্থার শান্তি বৈঠকে যে অশান্তি আরও তীব্রতর হয়ে উঠবে, এবে আর সন্দেহ কি? কাজেই কেবলে কেবলে একটা নতুন মুক্তাঞ্চলের ধোঁয়া আর নাড়াই সেই অধ্যায়ের বিষে কোন দল কোন নিষিদ্ধে থাকবে তা পুরো-পুরি জানে ফেলে নেবার জন্যে একটা চাপ দেওয়া হল। যাতে বাজে সেরানে সেরানে কোলাকুলি, ১৩ই জানুয়ারীর বৈঠকে তাই ঘটল।

বামিলপন্থী কম্যুনিস্টদের ঘোষণাপত্র অফিসে সাজানোর ভারটা আমার। সেখানে ঘিরে হাজির হলেন বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, সুখী লীগ ও এস ইউ সির প্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সর্বশ্রী অমর মুখার্জি, সুশীল ধাড়া, তরু কুমার সেন; হিমাংশু মুখার্জি, নিরোদ বসু, ভূতি বল্লভ, দেবপ্রসাদ রায়, সুবোধ ব্যানার্জী আর সীতার মুখার্জি।

অন্য লোকসেবক সঙ্ঘ অফিসে গিয়ে হাজির হলেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল, আর এস পি, লোকসেবক সঙ্ঘ, ওয়ার্কার্স পার্টি। তাঁরা উপস্থিত ছিলেন—মহাকুমার সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জি, রামদেব পাল, বঙ্কিম চক্রবর্তী, নিখিল দাস, বিশ্বনাথ দাসগুপ্ত, অনুদেব ঘোষ, জ্যোতি ভট্টাচার্য।

মুক্তাঞ্চলের দুই আহ্বায়কের মধ্যে শ্রীকল্যাণ মুকুটমণি ছিলেন সি পি আই অফিসে, আর শ্রীসুবীন কুমার ছিলেন লোক-সেবক সঙ্ঘের অফিসে। এস এস পির বিমান মিত্র ও সৈফুদ্দিন আহমেদরা ছিলেন সি পি আই অফিসে, আর নরেন দাস ও কৃপাল বসু গিয়েছিলেন লোকসেবক সঙ্ঘের দপ্তরে। এস এস পির নেতাদের উপস্থিতি দেখে হয়ত অনেকে বলে বসবেন সঙ্গতি রক্ষার সভার আসন সম্পর্কে ভুল বোঝার জন্যেই এঁদের অনুপস্থিতি ঘটেছে। কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। পুরো পার্টিকেও জানেন, তাদের এস এস পির দুই দলে ভাগড়া আছে। ইদানীং তাদের ভাঙাটি জোড়া দেওয়ার পর বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। তা কৃপাল ঘোষ মার্কস-বাদীদের একজন অতীব সমালোচক এবং তিনি বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি আহ্বা-য়কের একজন সৈনিকও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সি পি আই অফিসে না গিয়ে লোকসেবক সঙ্ঘ অফিসে গেলেন কেন? উত্তর হচ্ছে, শ্রীনরেন দাস কৃপালবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীদাস কৃপালবাবুর সঙ্গে সব আলোচনা সমন্বয় সেরেন করে। শ্রীনরেনের হাতের লেখেরা বলেন, শ্রীদাস মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদেরই। অর্থাৎ দলে তিনি কৃপালবাবুর সঙ্গে হলেও দলের বাইরে তিনি আমাদের। তাইতো তিনি লোকসেবক সঙ্ঘ অফিসে গিয়েছিলেন। এবং আমার সঙ্গে কৃপাল বসুকেও তিনি সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর শ্রীবিমান মিত্র ও শ্রীসৈফুদ্দিন আহমেদরা সি পি আই অফিসে গিয়েছিলেন। ছুটে আসেন শ্রীমিত্র ও আহমেদরা যখনই ফোন দিতে যাবেন সেই তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ঠিক করবেন বলে তাঁদের দলের ঘনিষ্ঠমহল থেকে খবর পাওয়া গেছে।

সি এস পির শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্য ছিলেন সি পি আই অফিসে। ভট্টাচার্য-মশাই এখন মহাবন্ধুর জন্মা যার বলার বন্ধুরা জানেন। আর শ্রীবন্ধুবর বসু ও শ্রীঅমলেন্দু বাগচীরা ছাড়াও শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি, যাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকের, তাঁরা লোকসেবক সঙ্ঘের দপ্তরে হাজির ছিলেন। যদি কথাবার্তা বা অন্য সভা হয় তবে তাঁরা ওয়ারেন্যাল থাকতে পারবেন। এমন এস এস পি—বিশিষ্ট মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক লোকসেবক অফিসেই দুই নেতা শ্রীরঞ্জিত চাটার্জি ও শ্রীসুবোধ মল্লিককে পাঠিয়ে-ছিলেন। ওঁদের দলের যিনি সি পি আই অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি কৃপ করেই গিয়েছিলেন ঐ দিকে। এবার বলুন এস এস পি বিহীন আর সি পি আই সভার কথা। এই সবেতেই শ্রীসুবীন কুমার ছিলেন একজন আহ্বায়ক। এবং তাঁরই সহযোগী মুকুলবাবু অন্যের শ্রীবিমলানন্দ মুখার্জি গিয়ে উপস্থিত হলেন সি পি আই অফিসে। অতএব কি ভাবে করবে, সুবীনবাবু তাঁর দলের সহযাত্রীই লোকসেবক সঙ্ঘের অফিসে বৈঠক বসবে এ খবর তাঁরা কি?

সুবীনবাবু আবেদিকদের বলেছেন, চেনের জন্য আহ্বায়কশ্রীবয়ন মুকুটমণিকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু কিন্তু অফিসকে সভার স্থানপরিবর্তনের কথা জানাতে। অন্য শ্রীমুকুটমণির সঙ্গে ছাড়া ও অন্যের জন্য তিনি সর্বদা বিরাজ করেন সেই তাঁরই দলের শ্রীসিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয়ের লোকসেবক সঙ্ঘ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আরও জানা গেছে, মুকুটমণি জানান কিন্তু বলতে ঐ জায়গা অবশ্য বিরো-ধিতা করেন। উল্লেখ, সুবীনবাবুই সব সময় চেনের ব্যবস্থা চালান। মুকুটমণিকাকার বর্ষিয়ান হওয়ায় সেভাবেই করেন মনু। সুবীনবাবু বলেছেন তাঁর বাড়ীর টেলি-ফোন বন্ধ থাকা ছিল। তিনি টেলিফোন করতে পারেননি না। তাই মুকুটমণির উপর ভার দিয়েছিলেন। আর মুকুটমণির দেখা আজ সব কুক্ষণেকণ করে উঠতে পারেননি। মধুর শান্তি বৈঠক বসবে। হরতো শান্তির পায়রাও উড়বে। আর মুক্ত-ফ্রন্টের ঐক্য আসে, ঐক্য থাকবে, হয়ত এই ঘটনা উঠে বিতর্কিতও মুখরিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু মোদ্দা বিষয়টা রয়েছে, এখন ওঠে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার কে—? সমস্বরে সবাই বলেছেন, অদৃশ্যশক্তি শ্রীমুকুটমণি—আবার কে। কিন্তু আসলে কি তাই? মোটেই তা নয়। বৈঠক বসবার বহু আগেই মহাকরণে খবর পাওয়া গিয়েছিল,—যুক্ত ফ্রন্টের দুটি বৈঠক বসবে। আইনে ফরো-য়ার্ডের আর সাংবাদিকদের বিরক্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ের মধ্যেই দুই অফিসের সামনে বসা বিদায়নে। আর ঐ দুই বৈঠকের খবর দিয়েছিলেন, স্বয়ং একজন মন্ত্রী।

তারপর নির্দিষ্ট সময়ের আগে দুই অফিসে জমায়েত হওয়ার নেতারা এত তাড়া-তাড়ি কেন হতে পারলেন না বলেও তাঁদের যুক্তি ছিল। অর্থাৎ প্রথমে তাঁরা অফিসে ফোন করেন। আর তবে তবে সি পি আই অফিসে একজন ও ফোন পেয়ে, আর লোকসেবক অফিসে অন্য দল ফিরে আসা ও ফোন আসা পেয়ে সবাই সভা আহ্বানে অফিসে গিয়েছিলেন। তবে মূলের কথা এই, শ্রীমিত্রদের কথাবার্তা অন্য দুই দলের মধ্যেই মূলতঃ যোগাযোগ করেন—আসলে আমার মনে। সেই একই আহ্বায় যোগাযোগ ওঁরা সৌজন্যতা রক্ষা করে কি মুখোস পরেন। অতএব, বিষয়ে হয়ত অন্তরঙ্গ জানা না।

কিন্তু ঘটনার পরিবেশ থেকে কি বোঝা যায়? প্রকৃতিতে যেমন আপাতদৃষ্টিতে একটি ঘটনার পেছনে যায় অন্য প্রকৃতি নিয়মের সূত্রধরে বাঁধা, অন্তরঙ্গতেও সেই নিয়মমাফিক সবই ঘটছে। ঘটনার সমীকরণ করলে সহজ দাঁড়ায়, মুক্তাঞ্চল+বাংলা কংগ্রেস+ সি পি আই-ফরওয়ার্ড ব্লক—এস ইউ সি+ সুখী লীগ+পি এস পি+] এস এস পি+ বামপন্থীরা— সি পি এম+ আর এস পি+ লোকসেবক + ওয়ার্কার্স পার্টি + আর সি পি আই + কম +]এস এস পি। অবশ্য এর মধ্যে একটু হেরফের ঘটতে পারে। কারণ, রাজনীতি একেবারে ফরমুলা মত চলতে পারে না।

অবশ্য অনুকূল করবার উদ্দেশ্যে যদি এ ভুল বোঝাবুঝি হয় তবে আবার নতুন করে অনুরোধের পালা শুরু হয় না। বাংলা কংগ্রেস প্রসেনবাবুর চিঠির জবাবে আবার তাঁদের অফিসযোগের পুনরাবৃত্তি করছেন। আর প্রসেনবাবু সুবীনবাবুকে এড়াই যেন মনে করছেন যে উত্তর দেবার যোগাযোগ হিসাবে বিবেচনা করবেও চলতে পারে।

এদিকে মুক্তির সান্ধ্যায় কলহ মুখর হয়ে উঠেছে সি পি আই, সি পি এমের মধ্যে। মার্কসবাদীরা তাদের ফোপানীকে ওঁদের ভাষায় বলছেন—কমিশনার্স অফ-কারী শ্রেণীবিরুদ্ধবাদী। আবার ফরওয়ার্ড ব্লক সিদ্ধান্ত করে আছেন, এ আই টি ইউ সি স্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেই সি পি আই অবশ্যই অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লক তার শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ছিনে পড়বেন। আবার শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রেও নিজের কথা যখন পুরোদমে চলছে তখন অনুকূল ধারা যে চারিদিকে পরিবর্তিত হয়ে সমস্ত অনীহকে করে তুলছে এবে আর সন্দেহ কোথায়?

শুধু এবে অবশ্য ধারের এই আলোচনার অবসরে দিন কাটিয়েছেন। তবে কখন যে তা ঘটে যাবে কেউ টের পাবেন না। নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে অনেকে আশার কথা শুনবার ভেতর বেশী বাঁচ, শুভ-ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ যে শুন্য।

—সাধারণী

দেশে বিদেশে

কেরলে সি পি আইয়ের নেতৃত্বে গঠিত 'বামপন্থী মন্ত্রিসভা' বাজেট অধিবেশনের প্রথম পরিসংখ্যায় সন্তোষের মধ্যেই উত্তীর্ণ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ১৪ই জানুয়ারীর যে মধ্য-নির্বাচনিক বৈঠক রাজ্যকে এক নতুন সংকটের সম্মুখীন করবে বলে প্রায় সকলেই আশঙ্কা করেছিলেন, ফ্রন্টের নেতারা সম্ভবতঃ সুচিন্তিত অভিযানসভার আহ্বান নিয়ে আসবেন। নিতান্ত নির্ভরযোগ্য তা এড়িয়ে গিয়েছেন, উদ্বেগ প্রকাশের সি পি যুক্ত মন্ত্রিসভা এবং পশ্চিম বাংলা রাজ্যের জন্যতাকে আশ্বাসন করেছেন, পরস্পরে সম্ভব করে সি-পি-এর আশঙ্কাগুলির যুক্তিকে সামনে রেখে চন্দ্রশীঘ্র সমাধানের অর্থাভাব যে এখিয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই এবং বিধায় রাজ্যে কংগ্রেসের উজ্জীবনকে এবং এস এস পি বিরোধী দলই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তোড়জোড় করায় রাজ্যপালের শাসনের অবসান এমোবার বদলে বরং পিছিয়ে যাচ্ছে। বিধানসভায় অধিবেশনের অন্তে যা রাজ্যপাল ভাষণের পক্ষিম, পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি সমস্যাকণ্টকিত রাজ্যের অবস্থা মোটামুটি এই। এর ওপর আসামেও নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে চাঁদিহার পদত্যাগের ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করে।

হরিয়ানায় রাজ্যপাল শ্রী বি এন চক্রবর্তী ১৬ জানুয়ারী হাইটাল বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কেরল

নাম্বুদ্রিপাদ তাঁর দলের পিছনে যে সমর্থন লাভের আশা নিয়ে রাজ্যপালের কাছে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের জন্য দুবারের দাবী জানিয়েছিলেন তা অন্ততঃ সাময়িকভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং বিধানসভার রাজ্যপালের ভাষণের ওপর মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের যে সংশোধক প্রস্তাব এনেছিল তা ১৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। মার্কসিস্টদের প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের দল ছাড়া শুধু চারজন এস এস পি সদস্য ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেসের দুজন সদস্য অবশ্য সমস্ত বলাই (এঁদের মধ্যে আছেন ৬ জন আর এস পি সদস্য যাঁরা সরকারে যোগ না দিলেও বর্তমান ক্ষেত্রে মার্কসিস্ট সংশোধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন এবং দুজন এস.এস পি সদস্য যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের আইনসভা দল কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে) মার্কসবাদীদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। ভোটের ব্যবধান থেকে মনে হয় বিধানসভার বর্তমান অধিবেশন অন্তত কেরলের মন্ত্রিসভার পক্ষে খুব সংকটময় নাও হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাও কৌশলে অথবা কৌশলে তাদের ১৪ই জানুয়ারীর সংকট উত্তীর্ণ হয়েছে তাতে মনে হয় বাজেট অধিবেশনেও তারা নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হতে পারবে, যদিও মন্ত্রিসভার মধ্যে দলগত সংঘাতের অবস্থার কোনো উন্নতি হবে এরকম আশা আপাতত করা যায় না। তবুও ফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ অনেকাংশে থাকলেও এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে ফ্রন্ট চলছে এবং চলবে। ফ্রন্টের পটভূমিকা যে দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকারের আভাস তার মধ্যে বোধহয় এইটুকুই শুধু আশার বিজলীরেখা।

তবুও ফ্রন্ট চলার বর্তমান আশা ও ভবিষ্যৎ আশ্বাসের সঙ্গে, ফ্রন্টের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাটা জনসাধারণকে কতোখানি উৎসাহিত করবে সে বিষয়ে ভিন্নপ্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, রাজ্যবাসীদের সামনে সমস্যা কম নয় এবং ফ্রন্ট চলার অর্থ এই নয় যে

তাদের সমস্যাগুলিও অচিরে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে। বাসস্থানের বিরোধ দায়ী সত্ত্বেও ও কিছু উদ্বাস্তুদের দলা ছিরে হেটোর জলেই যে অন্নের বাসের সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলো এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং বাসের সরবরাহ যদি না অব্যাহত থাকে তাহলেও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-প্রভৃতির মূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবিকাকে প্রায়শই উৎপীড়িত করে তোলে। ফলের প্রত্যাহতির ফলে সরকারী কর্মচারী এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হলেও রাজ্য যে গুরুতর বেকারী সমস্যার সম্মুখীন তার কোনো সন্তোষ সমাধান দৃষ্টির গোচর নেই। বহু কারখানার এখনো কর্মচারী বা লক আউট বিদ্যমান। শ্রমিক অশান্তি পূর্বের তুলনায় কম হলেও লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পায়নি। ফলে রাজ্যে যে পরিমাণ বেকারী, সেভাবে নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠছে না, বরং চালু কল-কারখানাও কিছু কিছু অসুস্থতার চেষ্টা চলছে। চারটি বড় কারখানা নাকি ইতিমধ্যেই বহরাদের চলে গেছে এবং দুটি কারখানা গুটোচ্ছে। আরো অনেকেই বিলুপ্তি-প্রতিও নাকি বহরাদে, দিল্লী বা হরিয়ানায় কারখানা স্থানান্তরিত করার জন্য পত্র কেন্দ্র সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্যগুলো বিতর্কিত হলেও রাজ্য-পালের ভাষণে তার গুরুত্বের আভাসের উল্লেখ সম্পর্কে নাকি একমত না হয়ে পারেননি। রাজ্যের এই সামগ্রিক চিত্র জন-সাধারণকে রাজ্যের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতোখানি আশান্বিত করবে সে বিষয়ে সন্দেহ অবকাশ নয়।

অন্যান্য রাজ্য

কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রতিক বিরোধ ও বিভাজনের পরিণতিতে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি কি রূপ পরিগ্রহ করে, তা বিধানসভার অধিবেশন বসার আগে বলা সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধে নি বি মুক্ত যে জনমতে এস এস পির সমর্থন বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, তা প্রায় সুনিশ্চিত।

বিহারে চন্দ্রশেখর প্রসাদের মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে তৎপরতা বিদ্যমান থাকলেও সেই সিদ্ধান্ত অবে আসে আজ, যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমনি সেই সিদ্ধান্ত উপযুক্তভাবে কার্যকর করতে পারবে এমনও কোনো আশ্বাস নেই। একদিকে মন্ত্রী করতে সিং-এর আত্মাভিমানের সংকোচের মধ্যেই দাঁড়িয়ে অকালী দলগীয় সদস্যের হাতে পদত্যাগ পত্র পেশ করার পুরনো সিং-এর অভিপ্রায়ের সংকেত যেমন আশার হয়ে উঠেছে, তেমনি হরিয়ানাও সরল বন্ধের দাবী নিয়ে পাঞ্জাবের আন্দোলনের জবাব দিচ্ছে। এই দুই দুর্মুখির সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রশেখর সম্পর্কে যে কোনো সিদ্ধান্ত জন্তত আপাতত বার্থ হতে বাধ্য।

বিভিন্ন রাজ্যের এই সমস্যার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে এবারও নিরাপদ রাজ্য আসামও চাঞ্চল্যের পদধ্বনির সম্ভাবনা নিয়ে নতুন এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। চাঞ্চিয়া যদি স্বাস্থ্যের কারণে সত্যিই বিরত থেকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্য দুজন প্রার্থী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন, তার একজন বর্তমান আইনসভা দলের উপনেতা ও রাজস্বমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং অপরজন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজয় ভাস্করী। মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী বোম্বাই বা আমেদাবাদে—কংগ্রেসের কোনো সভাতেই যাননি বলে তাঁর চাঞ্চিয়াই এখনো প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর কাছে বহুলাংশে। অপরপক্ষে বিজয় ভাস্করী কংগ্রেসের বিরোধে শ্রীমতী গান্ধীকেই সমর্থন করেছেন। আসাম যাতে অবিলম্বে সংকটের মুখোমুখি না পড়ে তজ্জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে পি তিপাঠী তাদের এক নতুন ফরমুলা বার করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, চাঞ্চিয়া বর্তমানে পদত্যাগ পত্র গ্রহণের জন্য পাঁচ পাঁচি না করে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে যান। তা হলে আসামকে অন্তত অবিলম্বে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়নের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। চাঞ্চিয়া গত এপ্রিল মাসেও একবার অসুস্থ হয়ে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবার তিনি তাতে সম্মত হবেন কিনা তার ওপরই রাজ্যের রাজনীতির স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে।

সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

রুদ্ধ যাযাবর ৮·০০

জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র পুরস্কার ও আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

আরোগ্য নিকেতন ৭ম মুদ্রণ ১০·০০

নেপালচন্দ্র রায়-র নতুন উপন্যাস

বজ্র বন্যা ৬·০০

নাগ চম্পা ১·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

মনমধুচন্দ্রিকা ৭·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

মানব কন্যাপে রামায়ন ৭·০০

নবেন্দু ঘোষের

দম্পতি ২য় মুদ্রণ ৬·০০

শক্তিপদ রাজগুরু

সমুদ্রের চূড়া ৭·০০

তারাপদ রায়

জেনানা ফাটক ৬·৫০

শিবরাম চক্রবর্তীর

সিরাপসঙ্গ ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যনাথ বিচিত্রা ৮·০০

দিগভ্রান্ত ৯·০০

জাগরী ১১শ মুদ্রণ ৫·৫০

সমরেশ বসু-র

প্রথম রেখা ছলনা ম্যাকবেথ লৌহ কপাট

২য় মুদ্রণ ২·০০ ৭ম মুদ্রণ ৭·০০ ৫ম খণ্ড ৫ম মুদ্রণ ৬·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

বরযাত্রী ৫·৫০

রূপ হল অভিশাপ ৫ম মুদ্রণ ৭·৫০

নব সন্ন্যাস ৩য় মুদ্রণ ৮·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

প্রথম কদম কুল ১৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

অগ্নিসাক্ষী ৪·০০

স্বাগতম্ ২·০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আজ ভারত পক্ষীকন্যা

প্রফেসর পুরুষোত্তম
অধ্যাপক অর্থনীতি, [illegible]

বিয়াফ্রার আত্মসমর্পণ

বিমানের আত্মসমর্পণের ফলে আধুনিক ইতিহাসের এক দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটলো, যাতে স্বাধীনতাকামী বিয়াফ্রার প্রায় দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অগণিত লোক খাদ্যাভাবে ও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ পুষ্টির অভাবে রুগ্নতা বরণ করেছে।

প্রায় তিন বছর আগে নাইজেরিয়া ফেডারেশন থেকে স্বাধীনতার দাবী নিয়ে বিয়াফ্রার লোকেরা এক অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বৃটেন অবশ্য নাইজেরিয়ার সমর্থনে ও যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা বিয়াফ্রার লোকেরা সমর্থন করে। এছাড়া, সুইডেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল থেকেও নাইজেরিয়ার জন্য বিমান প্রভৃতির সাহায্য লাভ করে। এই দীর্ঘ বিস্তৃত যুদ্ধে বিয়াফ্রাবাসীরা যে অভূতপূর্ব মনোবল ও সাহস দেখিয়েছে তা তাদের পরাজয়কেও গৌরবান্বিত করবে। যুদ্ধে নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা যে বর্বরতা দেখিয়েছে সমকালীন ইতিহাসে একমাত্র ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছাড়া তার আর তুলনা মিলবে না। বাইরের সাহায্য বঞ্চিত বিয়াফ্রার পরাজয় প্রায় অনিবার্যই ছিল।

বিয়াফ্রার পরাজয়ে নাইজেরিয়ার শান্তি এলো বটে কিন্তু সেই শান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা যতোখানি স্থায়ী করতে পারবেন তা তাঁর ক্ষমতাসীন লোকদের ওপরই নির্ভর করবে। তবে যদি তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ সেনানায়কদের দ্বারা চালিত হয়ে বিয়াফ্রাবাসী ইবোদের দমন করেন তাহলে নাইজেরিয়াকে একসূত্রে গাঁথার স্বপ্ন তাদের লোকেরা বাস্তবায়িত করবে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বিয়াফ্রার খাদ্য, আশ্রয় ও ঔষধের সংস্থানই হবে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের ওপরই নাইজেরিয়ার শান্তির পথের সন্ধান নির্ভরে।

●

লেখক ও সমবেদনা দুই কিস্তির পর ১৭ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন।

৭০ বছর বয়স্ক দুই কিস্তির ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাঁচ ১৪ বছর রাশিয়ায় ছিলেন। লেনিনের যুক্তি সংবাদ ও স্টালিনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সোশ্যাল সংবাদ পরিবেশন করে তিনি চমকপ্রদ সৃষ্টি করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি অনেক বছর ভারতে ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর লেখা ৫০টি বইয়ের মধ্যে "দক্ষী [illegible]" অন্যতম।

সম্পাদকীয়

প্রতিবেশীর সঙ্গে মৈত্রী

তাসখন্দ ঘোষণার চতুর্থ বার্ষিকী হয়ে গেল জানুয়ারির ১০ তারিখে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালে যে-সংঘর্ষ হয়েছিল তা বন্ধ করার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে মিলিত হয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী আর মহম্মদ আয়ুব খাঁ। এঁদের দুজনের কেউই আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই। লালবাহাদুর তাসখন্দ থেকে আর ফিরতে পারেন নি। তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করার কয়েকঘণ্টা পরেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে অপসৃত। সশস্ত্র সংঘর্ষ না থাকলেও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। এই দুই দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। কূটনৈতিক সম্পর্ক বলিও বা আছে তা মোটেই মধুর নয়। অথচ একই উপমহাদেশের ভাগ করে তৈরী হয়েছে দুটি রাষ্ট্র। একই জাতিগোষ্ঠির বাস দুই দেশে। যে ভাষাগোষ্ঠি নিয়ে পাকিস্তানের অধিবাসীরা গঠিত, ভারতেও সেই ভাষাগোষ্ঠির অধিবাসী আছে। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হল না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাসখন্দ ঘোষণা বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে যে-বাণী পাঠিয়েছেন তাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তাসখন্দ ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে ভারত অবিচলভাবে কাজ করে যাবে। অনুরূপ বাণী তিনি পাঠিয়েছেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। পাকিস্তান আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তার সঙ্গে ভারত গোড়া থেকেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে আসছে। তার জন্য ভারতকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিদান পায়নি ভারত। বরং দুই দুইবার পাকিস্তানের কাছ থেকে পেয়েছে সশস্ত্র হামলা। দেশভাগের অব্যবহিত পরেই হানাদার লেলিয়ে দিয়ে পাকিস্তান ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশে অবরদখল করে নেয়। এখনও ভারত তা উদ্ধার করতে পারেনি। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে আবার তারা একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ চালায়। ভারতীয় বাহিনী তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করে যখন লাহোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ আলোচনা এবং সংঘর্ষের সমাপ্তি।

চার বছর পার হবার পরও কিন্তু পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার কোনো চেষ্টা হয়নি। ইতিমধ্যে আয়ুব খাঁ বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনিও ক্ষমতায় এসে পুরনো ভারত-বিরোধী জিগিরই তুলেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান বাধা হচ্ছে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি। স্বাধীনতালাভের পর কিছুকাল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানী জনগণ এখন পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সংবিধান পায়নি। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারও স্বীকৃতি পায়নি পাকিস্তানী নাগরিকদের কাছে। গত বারো বছর ধরে পাকিস্তানে চলেছে সামরিক শাসন। পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের ইচ্ছা কোনোদিনই তার রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হবার সুযোগ পায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জননেতা শেখ মুজিবর রহমান সম্প্রতি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা হোক। এই দাবী পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দীর্ঘকাল ধরে স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামরত। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবি স্বীকার করছেন না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে আগ্রহী। একই ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে দুই বাংলা পরীক্ষাম। রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ হলেও দুই বাংলা পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। আজ দুই জার্মানীর মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলছে। দুই ভিয়েতনাম ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতায় নিজেদের জাতিগত ঐতিহ্য বজায় রাখতে চায়। অথচ দুই বাংলার মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। এই প্রাচীর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির স্বার্থে তাদের দ্বারাই সৃষ্টি। কারণ, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনই ভারতের উদ্দেশ্য। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও তাই চায়। আজ পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তাকে স্বাগত জানায় ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ। এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে দুই দেশের মানুষই উপকৃত হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা যে কত প্রয়োজন তা পাকিস্তান সরকার কি জানেন না? ভারতের দেওয়া অধেই পাকিস্তান বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরবরাহের বিরাট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে ভারত পাকিস্তানকে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে তার অর্থনীতিকে চালু রেখেছিল। এখনও অবিভক্ত ভারতের দেনার যে-অংশ পাকিস্তানের দেয় তা পাকিস্তান ভারতকে দেয়নি। ভারতই বছরের পর বছর সেই অংশ মেটা বহন করে চলেছে। এ সবই ভারত করেছে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য। তাসখন্দ ঘোষণা তো শুধুমাত্র কতকগুলো নীতিবাক্যের প্রকাশ নয়। তাকে রাষ্ট্রনীতিতে প্রয়োগের সুযোগ না করলে এ ঘোষণা অর্থহীন। পাকিস্তান সরকার যদি তা না করেন তাহলে একতরফা ভারতের পক্ষেও কার্যকরী হতে পারে না। পাকিস্তানের জনসাধারণ যাতে তাদের সরকারকে শত্রুতাবুদ্ধি থেকে ফিরিয়ে এনে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে বাধ্য করতে। নতুবা কোনো উপায়ান্তর নেই।

নতুন দশক, নতুন সূচনা

সুবীরকুমার সেন

যে দশক শুরু হচ্ছে তার শেষে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১০ কোটি টন বাড়িয়ে যাবে, এইটাই ছেড়ে হয় নতুন দশকের সূচনায় সবচেয়ে বড় সুসংবাদ। বিগত দশকের শেষার দিকে উৎপাদন দাঁড়ায় আট কোটি টনের মতো। ভারতে পারেনি এর ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে। '৬০এর উৎপাদন ধরা হয়েছিল— ৮ কোটি ১০ লক্ষ টন। কিন্তু তার পরের বছরটি আমার প্রথমেই ধরার জন্য শস্য উৎপাদন আসলে ভারতে দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন কম হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, শিল্পোন্নয়নের দিক থেকেও ষাটের দশক ব্যর্থতার ছেয়েছে। পাঁচের দশকে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির যে হার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা পরের দশকে এক গভীর সংকটের আবর্তে পড়ে। ফলে ছেয়ের দশক প্রায় শুরু হয়ে যায় এমন কোনোকারী শিল্পপ্রকল্পের বেশির ভাগ পরিকল্পনাবিদদের কাছে সেগুলোও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে। বাণিজ্যসম্প্রসারণে ব্যর্থতার সঙ্গে শিল্পসংকট মিলে দেশজোড়া যে হতাশার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল ১৯৬৭ সালে। এই বছরে ভারতে শিল্পোন্নয়নের হার ৬ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। এর আগে ষাটের দশকের গোড়া থেকেই ভারতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বছরে তিন শতাংশ। এই অবস্থা ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত চলে। অবশ্য এই সাময়িক উৎপাদনের তুলনায় শিল্পোন্নয়নের হার অনেক বেশী ছিল। ১৯৬০এর শিল্পোৎপাদনকে ১০০ ধরে ১৯৬৬ সালে এই উৎপাদন বেড়ে ১ শতাংশ হয়ে ১৫০·৭এ দাঁড়ায়। এর পরের দুবছর শিল্পে মন্দা আসে, বেড়েছার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারত এক নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সময় শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়ে ১৫১·৪ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৬৮ থেকে আবার উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং পর পর দুবছর ৬ ও ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

এখানে লক্ষণীয় যে ১৯৬০ সাল থেকে ৬৭ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থ শতাংশের ৩ ভাগ হিসেবে বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় বছরে অর্ধ শতাংশের বেশী বাড়েনি। ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভর বলেই ভারতীয় উৎপাদনের হারের সঙ্গে মাথাপিছু আয়ের হারে এই অসামঞ্জস্য। শুধু গত দশকে নয়, তার আগের দশকেও—যখন ভারতীয় অর্থনীতির ভিত অনেক মজবুত ছিল, শুধুই বেশের মোকদের মধ্যে বিশেষের মধ্যে ছিল, তখনও শিল্পোন্নয়নের হার ও মাথাপিছু আয়ের মধ্যে এই বৈষম্যকে দেখা গেছে। তার কারণ, আমাদের দেশে ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই কৃষিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথমদিকে শুধু ভারতকে দ্রুত একটা শিল্পায়িত দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। শিল্পের এই অংশ দ্রুত পৌঁছনোর চেষ্টার ফলে অবধারিতই কৃষি অবহেলিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন, কলা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের প্রসারের উদ্দেশ্যে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোয় যে বিরাট বিরাট বহুউদ্দেশ্যসাধক প্রকল্পগুলোতে হাত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর ফল খুব অল্প সময়ে দেখতে পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। ফলে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে ছোটো-খাট সেচ প্রকল্প, সার উৎপাদন এবং উন্নত ধরনের বীজের মোকাম প্রবর্তনে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারত সেগুলো বিরাট বিরাট প্রকল্পের তলায় চাপা পড়ে যায়।

প্রায় একই সময়ে ভারতে উন্নতধরনের ধান ও গমের বীজ উৎপাদনে যে বিরাট প্রচেষ্টা শুরু হয় তাই দেশে কৃষিবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। ফিলিপিন্স ও তাইওয়ান থেকে উচ্চফলনের ধান ও মেক্সিকোর বর্ষাকৃষ্টি গমচাষের বীজই ভারতে বিরাট পরিবর্তন আনে।

এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে ভারতের সর্বত্র এই উন্নত ধরনের কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। বীজ, সারের ব্যবহারের বেলার ভাল ফেলেই মাঝারাস্তায় থেমে গেছে, সেচের জল অনেক জায়গাতেই পৌঁছোয় না। কিন্তু তবু একথা সত্য যে অন্তত দেশের এক-তৃতীয়াংশে হালচাষি এবং আধাআধি গম ক্ষেতের জমিতে নতুন কৃষিকৌশলের ছোঁয়া লেগেছে। হরিয়ানাতে মিশিন ভারত চাউল উন্নয়ন সংস্থার অধিকর্তা ডিভয়ার এস পান্ডী বলেছেন যে ভারতের এক-তৃতীয়াংশে হাল-জমিতেও যদি ১৫ শতাংশে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহলে দেশে প্রতি বছর ১০ লক্ষ টন উৎপাদন বাড়বে। প্রিন্সটন অধ্যাপিকা ঔইলফ্রেডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলফ্রেড পি এইচ ডি।

কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির আর একটি পন্থা হচ্ছে একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন। এখন অনেক ক্ষেত্রে চাষীরা এই ধরনের চাষে মন দিয়েছেন এবং পর পর দুটি ফসল নেওয়ার পর সেই ক্ষেতে জৈবার সার বা সবুজসার দিচ্ছেন। এখনো এই ধরনের কৃষির সাফল্য প্রধানত নির্ভর করছে সেচের প্রসারের ওপর। যেমন যে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হয় তার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৭৫০ মিলিমিটার। এই সকল জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিভাবে সাহায্য করা সম্ভব তাই নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে।

কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহদানের জন্য আর যে দুটি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি হচ্ছে গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত। এতে ঠিক হয়েছে যে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত দেশের সর্বত্র বন্যাত্রাণ প্রভার বিলোপ করা হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গত অক্টোবরে পার্লামেন্ট-এ এক সম্মেলনে। এতে স্থির হয় ছোট চাষী উন্নয়ন সংস্থা নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে তা বর্তমানে দেশের কুড়িটি জেলে তাদের নানা ব্যাপারে ক্ষুদ্রচাষীদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করবে। চতুর্থ যোজনার কুড়িটি জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছোট চাষীকে সাহায্য দেওয়া হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ থেকে খাদ্য আমদানীর পরিমাণও হ্রাস পেয়ে আসছে। ১৯৬৬ সালে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়েছিল এক কোটি চার লক্ষ টন। পর বছর আমদানী হয় ৮৭ লক্ষ টন। এ বছর আমদানী আরো কমবে। এখন বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য যা আমদানী করা হবে তা শুধু মজুতের ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য।

বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়

১৯৭০-এর দশক আরো আশাব্যঞ্জক এই জন্য যে আমরা এবার থেকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় দেখতে পাচ্ছি। এই সাশ্রয়ের কারণ তিনটি—খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস। এর মধ্যে রপ্তানী বৃদ্ধির চেয়েও আমদানী হ্রাসই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে আমাদের বেশীর ভাগকারখানার চাহিদা পূরণের জন্য বছরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদনের উপকরণ আমদানী করতে হতো। এই পণ্য আমদানীর পরিমাণ ছিলো ডাইরেক্টর জেনারেল অব সাপ্লাইজ অ্যান্ড ডিসপোজালসের ওপর। বিদ্যুৎখনন এবং এই সংস্থার বাড়তি হয়েছে দেশের মধ্যে আমদানীর বিকল্প সন্ধান এবং তার জন্য দেশীয় উৎপাদন ও ভারিবারি কুশলতার উপযুক্ত ব্যবহার। এই সংস্থার তদন্তকারী কমিটি বলেছে যে আমরা কি জানি কি জানি বৈদেশিক জন্য দিনে আমদানীর এমন অনেক জিনিস আছে যা, ভোগের ও বিলাসের বাস্তুর তাঁরা সন্ধান দিয়েছেন। তাছাড়া, ফলের ঐকটর, ট্রেন্সিং কলকব্জা, সিনেমেসন ফেব্রিক, সিনিথ টেনিস, হাইড্রলিক পাম্পও বিদেশ থেকে কেনা বন্ধ।

আলো-অন্ধকারের খেলা

তবুও '৭০-এর দশকে আশার আলো ফিকিমিকিও, তার পাশাপাশিতে অন্ধকারও কম নয়। যেমন লোকবৃদ্ধি সম্প্রসারণ এখনো কোনো সন্তোষের হয় নি অধিক [illegible]

ফলে প্রতি বছরে আড়াইজন করে বাড়ছে, বছরে বাড়ছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ জন। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও ঠিক এই হারের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলে বেকারের বল বৃদ্ধি করছে। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে সমানতালে সুযোগ উদ্ভবে না হতে পারলে এই সমস্যা ক্রমশ মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের দিক থেকেও অবস্থা এখনো অনেক পিছনে। গড়ের জনের দৈনিক মাথাপিছু আয় তিন আনা না পনের আনা—পার্থক্যটা দেখিয়ে ও অবস্থার মধ্যে সেই বিষয়ে বিতর্কের সময় থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এলেও গরিবের সংখ্যা এখনো প্রায় সেই স্তরেই রয়ে গেছে। এখনো ভারতের এক-তৃতীয়াংশ লোক বছরে মাথাপিছু ২৪ টাকা ও গ্রামী অঞ্চলে ১৫ টাকার বেশী উপার্জন করে না। কিন্তু এদের সঙ্গে হচ্ছে 'নবিস্ত' বলে। ভারতে অবশ্য এই নীচেও আর একটি শ্রেণী আছে যাদের কথনো করা হয় নিম্নতম বলে। এরা সহরাঞ্চলে মাথাপিছু ১৮ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ১৩ টাকার বেশী আয়ে সমর্থ নয়। এই শ্রেণীর লোকও ভারতে কম নয়, জনসংখ্যার এরা এক-পঞ্চমাংশ। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এদের জীবনযাত্রার পরিবর্তনে এখন পর্যন্ত বিশেষ সহায়ক হয় নি। ফলে শুধু জাতীয় আয় বৃদ্ধি নয়, অর্থনীতিরও আজ অন্যতম কর্তব্য এদের এই নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রতি নাম নিচের হবে কিনা তাও বিচার করবে এই সমস্ত।

একটি আবেদন

সহরতলীর যাত্রিসাধারণের প্রয়োজনে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে বহু ট্রেন চলাচল করে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে দিনে প্রায় ১৯ ঘণ্টার মধ্যে হাওড়ায় ৩১৬টি এবং শিয়ালদহে ৩৪৮টি ট্রেন যাতায়াত করে। তার মানে, এই স্টেশন দুটিকে প্রতি তিন মিনিটে একটি করে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। কর্মব্যস্ত সহরতলী এলাকায় অনবরত ট্রেনের যাতায়াত এবং চলাচল ব্যবস্থায় আনুসঙ্গিক জটিলতা সত্ত্বেও সময়মত ট্রেন চলাচলের জন্য আমরা বিরামহীন চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ট্রেন চলাচলে দেরী হয় এবং তা' এমন কতকগুলি কারণে হয় যার উপর রেলওয়ের কোন হাতই নেই। যে প্রধান কারণগুলি ট্রেন চলাচলে দেরী ঘটায় বা নিয়মানুবর্তিতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সেগুলি হ'ল (ক) মাথার ওপরের বৈদ্যুতিক তার, সিগন্যালের বা রেললাইনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির চুরি; (খ) রেললাইন অবরোধ।

মাথার ওপরের বৈদ্যুতিক তার ও সিগন্যাল-যন্ত্রপাতির চুরি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পূর্ব রেলওয়েতে গত বছরের প্রথম ছ'মাসে ৪৩৮টি, অর্থাৎ, দিনে প্রায় দুটি করে চুরির ঘটনা ঘটে। এই সময়ের মধ্যেই সিগন্যাল বিকল করা হয় ৪০০০ বার—ফলে যাত্রীদেরই ট্রেনগুলিকে, দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। কোন কর্মব্যস্ত শাখায়, যেখানে বহু সংখ্যক ট্রেন পরপর ছুটে চলেছে, যে কোন একটি ট্রেন যদি আটকে যায় পরবর্তী ট্রেনগুলিতে তার প্রতিক্রিয়া হ'তে বাধ্য।

কদাচিৎ ইঞ্জিনের যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যও ট্রেনের দেরী হয়। সহরতলী শাখাগুলিতে প্রচুর ইঞ্জিন চালু রয়েছে। যে কোন ইঞ্জিনে কখনও সখনও যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটা অস্বাভাবিক নয়, সম্পূর্ণভাবে তা' পরিহার করাও সম্ভব নয়; তবুও এই ধরনের ঘটনায় যাত্রীদের অসুবিধা যত কম হয় সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়।

উপরি উক্ত তথ্যগুলি জনসাধারণের গোচরে এই উদ্দেশ্যেই আনা হচ্ছে যাতে, ট্রেন চলাচলে মাঝে মাঝে এই দেরীর কারণগুলি বিবেচনা করে তাঁরা সহায় হন এবং বিভিন্ন স্টেশনে ও ট্রেনগুলিতে কর্তব্যরত কর্মচারীদের যাতে কোন দুর্ভোগ না হয়। পৃষ্ঠপোষক যাত্রীরা এ দেশের জন-জীবনের যতখানি ভাগীদার, এঁরাও তো ততখানিই ভাগীদার। যাত্রিসাধারণের কাছে অনুরোধ, এঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা যেন যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বিচার করেন এবং মাঝে মাঝে যে অসুবিধায় এঁরা পান, তার থেকে যেন এঁদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

সাহিত্যিকের চোখে সাহিত্যিকের সমস্যা

মাঝে মাঝে মনে হয় যে, সুকুমারী মাস্টার; হরেন—মাস্টারের ও তার ছাত্রীদের। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যের ও আমাদের সমাজের। এক হুজুগে মেয়েলি সাহিত্য প্রসবকল্পে পর সমাজ হয়ে ও এমনি সুখে হলে সাহিত্যের বাজার বা অন্তঃপাতালের ভয় পড়ে এমনি সমালোচনাই উপায়, সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ মানে অনিবার্যভাবে সাহিত্যের সমাজ সম্পর্কিত আসা। সাহিত্যিক হিসেবে এখানে এ-চেতনাকে এড়ানো তাই সম্ভব হবে ? কোন সমাজ আমার সাহিত্যকে কতো দিচ্ছে, কোন সমাজের জন্য লিখছি, এবং যা লিখছি তার সঙ্গে সেই সমাজের সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে। মুদ্রণ-যন্ত্রের ব্যাপক উন্নয়ন দিয়ে দেশে যে-জ্ঞান, শিক্ষা ও শিল্পচেতনা ব্যাপ্তির তা হয়তো আমার নেই, তবু সমাজকে চেনা করব। আর কখন লিখতে বসেছি, এটাও জানি, তাদের দেখে কেউ কেউ নিশ্চয় প্রশ্ন নিশ্চয়ই—ভাববেন, এটা আবার কে, তাদের তো প্রশ্ন শুনিনি? তাদের প্রতি সম্মানের অভাব নিয়েছে, এ-চেতনাও এক অর্থে আমাদের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও এমনই আজব সমাজে যেখানে লিখি যে নিজের সত্তাটা আমার নিজেরই কাছে কখনো কখনো সম্পর্কিত ঠেকে মনে হয়, তাই, এ-সমস্যা তো দেখার মতো নয়?

আজ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এই মূল্যের প্রভাবের মূল্যবৃদ্ধিটা যেমন আসলে হয়তো চলন্তম ভালো মাস্টারেরই সমস্ত, তাই মাস্টারের প্রসঙ্গ তুলে আমার মনে হয় যে সর্বত্র ছাত্রীর যেমন মাস্টার দরকার না, পাঠক তেমনি সাহিত্যে চায় না। পাঠক যে, সে-প্রশ্নে ওঠার আগে আমরা এটাও বলে নেওয়া হয় যে সাহিত্যের মূল্যবৃদ্ধি আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, খানিকটা সর্বত্রই। মেনে পাই, সাহিত্যের জন্য একজনকে আমরা প্রতিদিন যে-কয়েকটি দেশের সমাজের মানি আজকাল প্রায়ই সাহিত্য-মূল্যের বাণি উঠতে শুরু করেছে—এমন নয়তো একটি; ছোটগল্পেশ্বরিক ঠেকলেও সত্য, সেখানেও কবিতায়-উপন্যাসে-নাটকে এ ধরনের সাহিত্যবিরোধী সাহিত্যের চেপেছে হয়েছে। অনাহত আর্ট হিসেবে সাহিত্য নাকি তার উঁচু আসনে আর বসে টেকছে নতুন নতুন আর্ট কর্ম নিয়ে পুরোনো হলেও পদচ্যুত না, ইতিহাসে মাঝামাঝি নিম্ন হয়েও, দর্শ সাথে সম্মিলিত হয়ে আসর জমাতে এগিয়েছে। সকল সাহিত্যসৃষ্টির আদি ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য যেটা, সেই আনন্দ সাহিত্য লাভ করা, অর্থাৎ সাহিত্যে সেই আনন্দটা, যেটা আমরা সেটাকে উপাদানই তেমন ও তোমাদের অন্তে তেলো, সেটার প্রয়োজন যে আজ কিছু মিটেছে, তা নয়—বরং ঘরে-ঘরে-দেশে-বিদেশে 'মজন্তর পেছনে ভাড়ার পর্বে একের সঙ্গে অন্যের মিলনের সে-আহিত্য আজ হয়তো আরো অনেক বেশি ব্যাকুল। এবং ফলে যে বাদ্যে আজ আর মুখেতে চায় না, এক-যে-ছিল-রাজার সব জোর নিঃশেষে কুড়িয়েছে, তাও নয়—শুধু সে-ধরনে খোরাকের যে সাহিত্যের সে-ধারটা খোরাকের শুধু সার্বজনীন উপকরণ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে, এবং প্রতিযোগিতায় সাহিত্য কিছু হচ্ছে। যাহোক আজকে প্রধানতম যাঁরের আদিম দেশে-বিদেশে বসেই থাকতে থাকুন, সাহিত্য যে হাঁপাতে শুরু করেছে, সে-লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এটার একটা মূল কারণ হল এই যে সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য যা, লিখির অন্তরতম তারা, তার সম্পর্ক বিবর্তনের ব্যাপারে অতি সীমাবদ্ধ। নিছক বৈষয়িক পরিবর্তনের কথা বলছি না, সেটা সাহিত্যের আজকের মানো, তারপর এক লক্ষ হতে আজকের মানুষ নতুন নতুন সম্পর্ক হয়েছে ও আরও হচ্ছে, স্টাইলেরও সমাজ বিস্তারনতুন বদলে চলেছে, কিন্তু আমার আসল সীমাটাকে তার পেছনে কোনোদিন অতিক্রম করা যাবে না। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে হাজার বছর আগে যেমন কথাটা বোঝাতে হয়তো নতুন একটা কথা আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু সে-কথাটা আমার লিখতে হবে ও সেটা পড়ার পর আজকালের ছেলে হাজার সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা প্রতিক্রিয়া জন্মাবে—আমার অন্তরের লেখক ও পাঠকের মধ্যে সমাজিক আবেগ-প্রকাশের যা পার্থক্যের কিছু কিছু কথা থেকে যেতে বাধ্য। সে-কথাটা ছেলেরা বিশেষ করে প্রকাশ হয় তখনই, যখন আমরা কোনো পরিবেশ প্রতিফলিত করতে চাই, যেমন সে হাঁটছে বা ছেড়ে আসছে—কথাটা লেখার ছেড়ে চলার সকল অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আবেগ ফোটানো যায় না। আরো এক প্রকার দৃশ্যকল্প, তারা আসে না নীরব হয়ে, পারে না দীর্ঘক্ষণকে প্রকাশ করতে। একিকে আবহমান জটিল জীবনের চাহিদা অন্যদিকে, অল্প সময়ের মধ্যে দর্শন-চরম-অনুভূতির প্রত্যেকটিকে সে মুহূর্তের কাজে লাগার নতুন অভিজ্ঞতায় হয়েছে—একজনে সাহিত্য হয়ে সে যা পেত যা পাওয়ার আশা রাখত, আজ তা-ই সে পেতে পারে আরো সম্পূর্ণভাবে ও আরো অনেক সহজে আর্টের জন্য যেমনো যাবতীয়, যেমন ছিলেন। যে-পরিস্থিতির যোকাতে সাহিত্য দেখে ছিল হাজার বছর, ছিলের সেই যে যার দু মিনিটে আরো অনেক সুখেতুভাবে পরিবেশন করতে পারছে। কলা চিত্ত-বিনোদন ধারা চায়, তাদের জন্য বেতার রয়েছে রেকর্ডার-এর ও সমাজোপযোগী ছিল, আর্টে মাকর্টন ধরি, তাদের কাছেও তেমনি সহজলভ্য সত্যজিৎ-রেমিয়ান-সমার-জন্যো-মিত্রমিয় কীর্তি।

কথাটা তুলে সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যাটাকে খোলা করতে চাই না, শুধু

বলতে চাই, যে-সমাজ বড় উদাত্ত, তার পক্ষে সাহিত্যের ভবিষ্যৎও তত সীমাবদ্ধ। এই সমাজই প্রয়োজন আমাদের এই চার্চিল-না-পাওয়া না-খেতে-পাওয়া অক্ষিচক্ষের-কমলে-ভর্জরিত মেসের, কারণ হাজার হলেও আমির কোনো সমাজ তো আমাদের নয়। এবং জগতের কোনো কোনো সমাজ তো আমাদেরও সমাজ হয়েই, আমরা সৈনিক সূত্রও দেশে-বিদেশে যে মানুষে প্রভেদই এক হচ্ছে, পৃথিবী হাজির চাঁদে পর্যন্ত ঘন ঘন পাড়ি দিতে শুরু করেছে। এ-পৃথিবীটা এক, এ-পৃথিবীটা এক, এ-পৃথিবীটা এক—এই ধ্বনিতে আজ কাজের ডাকছে।

আমাদের বাঁধ হয়ে যে বেশি এখনো সমস্যাটা আছে অনেক ভয়ানক, আমার মনের সাহিত্যের আজ এমন কোনো পাঠক-শ্রেণীই নেই যাকে কেন্দ্র করে সেই সাহিত্য সম্ভাবিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে। বড় বড় সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠপোষকতার বাঁধ পাওয়া যায় তো মুখে মুখে সাময়িক আজিকে কোনো কিছু চলল, এই পর্যন্ত। আমরা তুমি কবি, আমি আরেক কবি, আমরা দুজন দুজনের কবিতা পড়ি; তিনিও আমি গল্প-লেখক, তুমিও গল্প-লেখক, আমরা একে আরের পিঠ চুলকাই, এবং চুলকে আমি ভেতো-ভেতো হলাম — কিন্তু এ-পিঠ চুলকানো

ও সমস্ত সাহিত্যের কদলে অনুবাদ দেওয়া, অন্য কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদেরও সাহিত্যের জগতে বাংলাদেশ বলতে আজ পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ বলতে অনেকখানিই কলকাতা, কলকাতা বলতেও অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রবাসী যাঁরা তথাকথিত সাহিত্যস্রষ্টাদের। এই দেহের শ্রেণীর সমস্ত, সমস্যা ও দুঃখ পরীক্ষা করলে দেখবেন হয়তো বাইরে যা ঘটছে তা। বাংলার বাইরে কেন কিছুই হয় না, এ-সম্বন্ধে ইসারাও যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা হয়ে, তবে তেমন করার মতো আমার কিছু নেই। শুধু এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এক বন্ধুর কথা — শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত তিনি, এবং যুবক সাহিত্যপ্রেমিক—শুদ্ধ বাঙ্গালী হয়েও বাংলা বই খুলেও দেখেন না। বাঁকিম বন্ধুর তাঁর সঙ্গে, এখনো তাঁর মাথার আসি ঢোকাতে পারিনি যে আমাদের মতো ছোট-খাট বাংলার তেমন চেষ্টা করতে পারে, সে-সম্বন্ধে তাদের একটা আগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু তেমন যদি এক-আধটা ইংরেজী তরজমা তেমো সংগ্রহ করা যায়—বড় যাহোক ছোট না সে-লেখা—তাহলে তাঁর নজরে পড়বেই এবং পড়লে তিনি জানাবেনই, 'তোমার লেখাটা পড়লাম।'

তেমনি বাস্তবহীন সমাজের উল্লেখ করি—এবার যুদ্ধের, কিসের কথা বলছিলাম।

যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতালাভের পর হতে দেখে এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যাহ্নিক সূত্রপাত হয়েছে, সর্বনাশী হতাশার বেদ বিস্তারের হাত ধরেছে। আমি অতি অর্বাচীন, তবু এ-কথা হয়তো ভুল নয় যে এখনো সংগ্রামের উপযোগী প্রস্তুতি নেই কোথাও, সংঘবদ্ধতা নেই, আদর্শ নেই, নেতৃত্বের চরম-অভাবে বিশৃঙ্খলা সর্বত্রই। এবং এই অবস্থার মধ্যেই তথাকথিত তথাকথিতের জন্য সাহিত্য রচনা করছে, অনেক উপন্যাসিকই এমনভাবে বিশ্লেষণী পাঠিকা-গোষ্ঠীকে সামনে রেখে গল্প ফাঁদছেন। আর সেই তথাকথিতেরাই আজ বেহুঁশ আওয়াজ, আমি এ-বাংলাদেশে তথাকথিতের 'বাজারের কাল হল শেষ,' ইত্যাদিরূপের অযোধ্য শুদ্ধ-সংস্কৃতে তারা অনিবার্যভাবে 'ফ্রাস্টেটেড' হয়ে যাচ্ছে।

ঘরে পাঁড়াই বোমার—পড়ি-কি-মরি করে কিন্তু একটা যে করার দরকার? একটা কিছু হচ্ছেও। দুধারা তিন রকমের সাহিত্য দেখছি। এক, সাহিত্যের নামে ছুটির মেজাজের, উদ্ভট্ট তথাকথিতের গাপা-, গাপি, অনুরাগের আদির রোমকথে সুড়সুড়ি লাগানো। এবং প্রচারের আমরা এখনো উপযোগী হলেই এ-ধরনের সাহিত্য ছাপাও হচ্ছে, কাটছেও, এমন-কি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পুরস্কৃতও হচ্ছে পাচ্ছে। 'স্বাধীন শ্রেণীর সাহিত্য তথাকথিতদেরই একমাত্র করণ করে মেনে নিয়েছে—বোঝাতে চাই, জীবন একটাই, তাদেরও দরকার কী? এও এক রকম পলায়ন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাঁরা, যাঁরা সমস্যা অর্থ-পূর্ণ হতে চান, জীবন ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, কোনো কোনো প্রকাশক টাকার থলি ফেলে দিয়া করেন কিন্তু সৎ কথাসাহিত্যের প্রকাশকদের কথা আলাদা। তাঁরা প্রচেষ্টা তাঁদের চেষ্টা বর্ণিত থেকে। তবু পরীক্ষাও করা নিজ-নিজ ভাবের, কারণ ঘরে-বাইরে তাঁরা পরবাসী। তাই শান্তিকামী হয়ে বাস্তবের হাসা-হাসা ছবি তুলনে অথবা নর্মালিজমের চেয়ে যান্ত্রিকের দুঃখগাই ছাড়ুন, তাঁরা না এ-কূলে না ও-কূলে, মাঝনদীতে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আজ যখন-কিনার চাচ্ছেন বাংলার জন্য, তাদের অন্তরীণ তাঁরা কোনো দিন হতে পারছেন না, তাদের সাহিত্যও তাদের কখনো পড়বে না—তারা অর্থনৈতিক, রোমান্টিক, আদিমিক, অন্য এক জগতে তাদের জিনিসটা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সকল তথাকথিতের নাগালের বাইরে তারা, শুদ্ধ সাহসের মেজাজ দুর্বোধ্য অন্ধকার কোণে, ওমরাণে প্রাণে-প্রাণান্তর। সে-অন্ধকারের ছিদ্রক এসে, তার মাঝে চোখ খুলে দাঁড়াবার পর্যন্ত পারছেন না এই তৃতীয় শ্রেণীর তথাকথিত সাহিত্যিকরা, অর্থাৎ আমরা সবাই। আমাদের, সেই অর্থনৈতিক-আদিমিকদের তথাও তাদের ধর্মি আজ, এবং সে-ধর্মি ক্রমশই মোক্ষম হবে, তবে তার সঙ্গে আজকের সাহিত্যের কোনো সম্পর্কই নেই, তখনো থাকবে না।

এই সমাজ আজকের ও এই অবস্থার সাহিত্যও, এবং এমন একটি প্রজন্মের পরিপক্ক যুদ্ধোত্তর অবস্থা হাত-পা ছোড়া লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে তাদের ছাড়িয়ে যেতে আছি। শুদ্ধ জীবন যেহেতু জীবনই, বাঁচতে আমাদেরই মতো কেন কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থমালা

কালিকট থেকে পলাশী	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের প্রথম অভিযানের কাহিনী। ১০টি বিরল মানচিত্র। [৬·৫০]
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি	এই সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বইয়ের অভাবমোচনের সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০·০০]
বৈষ্ণব পদাবলী	সাহিত্যরত্ন শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সম্পাদিত প্রায় চারশোটির পদের আকর গ্রন্থ। [১৫·০০]
ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য	এই শক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণের এই অভিনব পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য আকরবহী পুস্তকের ভূমিকা। [১৫·০০]
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত	সাহিত্যরত্ন শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনার সোপানবর্ণাঙ্কিত। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সুবৃহৎ রঙ্গীন ও সাদা ছবি। [১·০০]
উপনিষদের দর্শন	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদসমূহের চমৎকার আলোচনা। [৭·০০]
রবীন্দ্র-দর্শন	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [২·৫০]
ঠাকুরবাড়ীর কথা	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সুখদ আলোচনা। [১২·০০]
বাঙ্কুড়ার ধ্রুপদী মন্দির	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্কুড়ার ভগ্ন মন্দিরগুলির নানা পরিচয় ও ইতিহাস। ৫৭টি ছবি সেটে। [১৫·০০]
ভেটিনিউ	অবলেন্দু গালগুপ্ত রচিত। শ্রীসুবোধকুমার বসুর ভূমিকা। [৩·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা ৯

পঞ্চাদভূমি

বয়স আটচল্লিশ বছরের একজন সাহিত্যিকের যতো একটি অস্বাভাবিক উদ্ভেজনা। এবং বলাবাহুল্য বেমানানও লাগছে। আশপাশের প্রবল বড়ের শিখর থেকে দেখা যাচ্ছে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ঘোষা ডজন উপন্যাস আর অসংখ্য ছোটোগল্প লিখে ফেলেছেন। নিজের সম্পূর্ণে কী অসম্পূর্ণ সে-তর্কে পড়বার প্রয়োজন বোধ করে।

যে অবস্থায় আপনাদের সম্মুখে এই প্রশ্নটা তা এই। গত সন্ধ্যায় শ্রীসুকুমার সাহিত্যিকের ছবির মূল্যায়ন করতে যে রঞ্জন সম্পর্কে এমন আর বিশ্লেষণ করেছেন সাহিত্যজীবনের অন্তর্ভুক্ত তো খুবই বিস্ময় প্রকাশক। সুকুমারবাবু লেখকের সঙ্গে তার দীর্ঘ পরিচয়ের সোহাই দেবেন।

আমি বড়জোর জানি রঞ্জন তার সাহিত্যিক অভ্যাস কখনোই সাহিত্যের ছোট ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাতামাতি করেনি। কারণ এ-ব্যাপারে ওর একটা স্থির ধারণা ছিল, যা সে কোনোদিন অতিক্রম করেনি।

রঞ্জন বেঁচে থাকলে হয়তো আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে আসতে হত না। কিন্তু রঞ্জন এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। তাই ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করাই আমার কাজ। বুঝতেই পারছেন সাহিত্যিক হিসেবে সম্মানের আমার সৌভাগ্য আমার চাহিদা। আমি একে যত সহজে বুঝতে পারি স্ত্রী সুকুমারীও তা বুঝতে পারে। বোধহয় এটাই এই বয়সে জীবনের দাম্পত্যজীবনের আকর্ষণীয়তা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজ। কিন্তু সাহিত্যিক রঞ্জন, তার জীবনযাপনের জটিলতা দেখেই বোঝা যায়, বিবাহবিচ্ছেদ তার আগে কখনো কঠিন অঙ্কের মতো ছিল। আমার বিশ্বাস এখানে সে মিহিরের জীবন দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ এক্সপেরিমেন্ট করে দেখে। ওর এই কৌতুহলী পদ্ধার দুর্দিন আমাকে টেনেছে, একই ক্ষেত্রে আবর্তিত করেছে।

আমরা পরস্পরের কাছে অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলাম। যেন মনে হত আমরা দুজনে মিলে হাতেকলমে মিডলক্লাস কোনো তত্ত্বের রূপ দেবার জন্যে দুঃসাহসিক।

রঞ্জন হাতেকলমে পরীক্ষা করে যৌনকে সত্য করত তাই বুঝেছে, তার জন্যের পরিবেশন করত। আমি রূপক ভাষা বলতে পারি। যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধ না হত তা সে কখনোই লেখেনি। হয়তো লিখতেও পারত না। সম্ভবত এর মূলের কাঠামোটাই এমন ছিল।

আমি প্রথম দিকে ওকে প্রশ্ন করেছি। 'একটা সুখী ঘরসংসার থাকতেও সে আমাকে জড়িয়ে কেন জীবনটাকে জটিল করছে?'

রঞ্জন বলত : 'ঘুটেপাখ থেকে তো জীবন দেখা যায় না। জীবনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। দুঃখের জটিলতাকে বরণ করে নিতে হবে, তখন জীবনে তার স্বাদও পেতে হবে।'

আমার থেকে বছর আটেকের বড়ই হবে রঞ্জন। ওর পরিবারসম্পর্কী ভাবনাবাসির সঙ্গে আমার অবশ্য সম্মত করার কথা নয়। কিন্তু ওই বয়সে একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমাকে ওজন, আনাগোনা করে তুলেছে।

একের সময় নিজেকে মনে হত সিসিফাসের মতো। কিন্তু সেই হতাশাকরও মোলিকল স্থায়ী হত না। অবশ্য রঞ্জন আমাকে সে-কাজে ব্যবহার করেনি। যতক্ষণ আমার কাছে থাকত ততক্ষণ সে আমারি থাকত। কদাচিৎ অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমাকে নিয়ে সে খেলা করছে মনে হয়নি।

আমি স্বাবলম্বী। এর মনে ভালোবাসা। কিন্তু একজন লোক জীবনে কতজনকে ভালোবাসতে পারে। রঞ্জন কী সুকুমারীকে ভালোবাসে না? কিন্তু ওদের সম্পর্কের সুখ দেখে তো সে-সন্দেহ হয় না। আমার চোখে ওদের সুখের আকৃতিটা সত্য ছিল। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অগাধ বিশ্বাস আমি দেখি নি।

নারীর চোখ দিয়ে আমি ভাবতে বসতাম। আমার স্বামীও কথা কোথায়। বুঝতে পারিনি। অবশ্য নয়।

একের দিন পরীক্ষা করবার জন্যে বলেছি। 'ধরো, এমন দিন এল, একটা পক্ষকে ছাড়তে হল। তুমি কোন্ পক্ষকে ছাড়বে?'

রঞ্জন হেসে বলল। 'যেখানে এ-প্রশ্ন আসেই করা যায় সেখানে দুঃখের মধ্যে একটি পক্ষই সত্য হয়ে ওঠে। অন্যের কোনোটাই মিথ্যে নয়। আসলেই ছাড়বার কোনো প্রশ্ন নেই।'

বলি। 'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

রঞ্জন বলে। 'আসি।'

'নিশ্চিতে?'

'আলবৎ।'

'একটা সম্ভব হয়?' আমার সংশয়।

রঞ্জন বলে। 'হয়েছে তো।'

'কী জানি', আমি নাকের ওপর থেকে চশমাটা সরিয়ে বলি। 'হিসি আমাদের ব্যাপারটা কতদূর জানে। হিসি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বসেছি।'

জয়ন্ত বলল : 'ওর বিশ্বাসের ব্যাপারটা ওর কাছে। সে নিজে ভোমার বা আমার মাথা খা-খারাপও হলে।'

চিন্তিত ভাবে বলি। 'কী জানি, একের সঙ্গে বসে হয়তো মিলিয়ে নিতে পারি, আমরা...'

জয়ন্ত গুরুতর হয়ে বলে। 'আমার মনে এ সকল প্রশ্ন আদৌ উচিত ছিল। এতদিন কী ক-ছেলেই...'

'কী জানি, হয়তো পারিনে।'

বন্ধুর আমি পরিষ্কার করে বুঝতেও পারলাম না। সেদিন শিল্পনিকেতনে বসে জয়ন্তকে সন্দেহ করেছিলাম সেই প্রথমদিন থেকে ওর সাহিত্যিক জীবন আমার চোখের বিদ্যুৎ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। প্রান্তরের পাখির ঘুমের বিলম্বের মোহমুগ্ধ দিকে তাকালে মনে হয়। এই কৌতূহল আমার এই ধরনের অনুভবের ব্যাপারগুলোকে ছিন্নভিন্ন লিখিয়েছিল। বাইরের ওই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োগ, যোবনের এই আলোকের সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। এবং হয়তো মানব-জীবনের কারবারি জয়ন্তের আচরণও আমাকে উৎসাহিত করবার প্রয়াস ছিল। তারপর... বিদেহের প্রবাসযন্ত্রণার মতো অনিবার্যভাবে কী করে জয়ন্ত এবং বিদেশ সম্পর্কে আমার পরিচয়ের ছন্দে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

কলকাতায় ফিরে এসে এই স্মৃতি ভুলে-যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু একদিন অফিসের টেলিফোনের সামনে হঠাৎ কী করে মনে হয়ে গেল। এবং

তার কিছুক্ষণের পরেই জয়ন্তের আমন্ত্রণে আমি পারিবারিক ছোটখাটো ডেকোরেশন ওর সুন্দর ফ্ল্যাটের সোফার নিয়ে বসলাম।

আমি পরস্পরী হাওয়ার গানগাছি করছিলাম। জয়ন্ত যেটুকু বলা বলছিল না, তারের সেতারের ওই সুর, অনুভবের কাঁচে নিলামেই। হঠাৎ এর আগে হাতেই অন্যের কাঁচের ওপর নেমে এল। আমি কাঁপছিলাম। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। অতঃপর এই চোখের আয়না আমার মুখটাকে আমি আসতে দেখলাম, ওর মুখের অন্ধকারটা নিকটে ঘনিয়ে এল, আমার চাপা নিশ্বাসগুলো যেন ছেড়ে পড়ছিল, জয়ন্ত আমার সমস্ত অনুভূতির অধিকারকে মুছে নিয়ে অসম্ভব অবাঞ্ছিত দূরত্বকে অধিকার করে নিল। আমি শুধু, তাও ধরার মুখের আর্তনাদ করে আমাদের মতো বলেছিলাম। 'আমাকে ছেড়ে দেও না।'

কিন্তু না, এই সকল আয়তনের উপলব্ধে আমি এই প্রয়োগ করতে পারিনি।

আমি ঐন্দ্রজালের মতের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে মৌলিক ভুল সম্পর্কে আলোচনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। ইন্দ্রজালের মেয়েকে আমার বিশ্লেষণের সুযোগের করে নেব না।

সুকুমার দত্ত লিখেছেন। "সাহিত্যিক জয়ন্ত জীবন সম্পর্কে নিজস্ব একটি দার্শনিকতা তাঁর জন্মের আরোপ করে-ছিলেন। যা তাঁর মানসিক অভীপ্সার বৈশিষ্ট্য।"

সুকুমার দত্ত এখানেই শেষ করলে আমার কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন। "জয়ন্তের জন্মের অনুভবের এক সম্পর্ক নারীকে দেখতে পাওয়া যায়। যদিই এইজন্যই নয়। যিনি মনুষ্যের জীবনে অত্যাবশ্যকীয়, অথচ আকাঙ্ক্ষিত। আমাদের সম্পর্ক অসম্ভব জীবনের ফলন ইত্যাদি।

এইখানেই আমার জীবন হাসি পেল। মনে হল সুকুমারবাবু পরীক্ষার খুব-দেখার সুযোগ করে দেবার জন্যে জয়ন্তের সামনে মোটা দিয়েছেন।

আমি জোর করে বলতে পারি। জয়ন্ত কখনোই তার জন্মের এই ধরনের সত্যান্-গতিক আইডিয়া প্রচার করতে চায়নি। আমাদের মোটা মেলাই এই ধরনের মানবাত্মা আমাদের প্রতীতিসর্বস্বতার পাকে নিশ্চিন্তে মাথা খুঁড়ে মরছে।

'সম্পর্ক নারী' জয়ন্তে বাঁধা ধরনের মতো তারাই আমাদের আবৃত্তি করে থাকা সম্পর্ক কেন, একলীন একটি সমালোচনা লেখেনি।

সাহিত্যিক জয়ন্তের কাছে এ বস্তু কাম্যবস্তুজ্ঞানহীন কোনো আইডিয়া ছিল না। সকলেই বলবার চেষ্টা করেছি জয়ন্ত সাহিত্যজগতের কোনো কিছুই নিজের উপযোগিতে হয়নি।

এ মারী আমি। যখন জয়ন্ত বিভিন্ন পরিবেশে, বর্ষায় আলোকে কোনো সময় মেয়ে বিদেশিনী জয়ন্তের কোনো কল্পনে। তখন তার একেবারে জন্মের বিভেদাত্মক নিয়ে মেয়ে প্রীতি উপলব্ধি হয়েছে। তার মারিয়া অনুভূত, নিরাশা, বীভৎস, কী ভয়ানক, কখনো নিশ্চয়ই একই সমাজের মেয়ে যায়। এবং সমস্ত চরিত্রের মোকাবেলা কোনো সেই সম্পর্ক নারী-কে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বুঝতে পারি, এই সকল নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে জন্মকালীন মোল উপাদান কোনো না-কোনো অনুভূতিসার, এর মধ্যে অসম্পন্নহীন এক আইডিয়াকে খুঁজে পেয়েছেন।

বুদ্ধিজন্মানুশ সুকুমারবাবু সমালোচনার বিস্তৃত গল্প স্কুল-এ উল্লেখ করেছেন।

কথাটি সকলের পড়া। তবু সংক্ষেপে একবার বলে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে।

জয়ন্তের জন্মদিনের পর আমরা সাঁতাই একদিন রাত্রে হল বিদেশের সমুদ্রোপকূলের নদী হয়ে। এক বর্ষার মুখোমে পুরীর এক হোটেলে সপ্তাহখানেকের মতো আমরা ছিলাম।

কলকাতা বিদেশের অফিসের অর্থ বুঝেছিল। বিদেশ তো ছিলাই। কলকাতা মনে সন্দেহ ছিল, অফিসকে সে জানতে পারে নি, এমন নয়। হয়তো সেও অন্য

নিজের সঙ্গে বহন করতে পারছিল না। তৃপ্তি অতলের যৌবন বিসর্জনের থেকেও সন্ধ্যা-বাবুকেই অধিক লালন করে। কমলী উত্তেজিত ছিল, কিন্তু ভোজ্যবস্তুও কম নয়। প্রথমত সে সহজে ঘামেনি। দ্বিতীয়ত বিমলের সঙ্গে তার 'ইনটিমেট সম্পর্ক' এমন একটা পর্যায়ে উঠেছিল যখন তাকে খাবার পরিচালনাকে এক সময় অবহেলা করতেই হবে। কমলী জানে সম্পর্ক আর নিরন্ন চক্রান্তেই এক সময় ঘুষ্কুল পরিণত করে দেবে।

অবশ্য কমলী মুখে অনেকবার নিজেকে সান্ত্বনা করে নিয়েছিল। সে কেন সন্দেহের বাধি না আনছে। যদিও এই সান্ত্বনার কোনো অর্থ নেই। কমলীও জানে, বিমলেও। কেননা নির্মম সত্যকারীর তারা দুজনের স্বাভাবিক কামনাকেই ছেপনে লালন করেছিল।

প্রথম দিন প্রচণ্ড সম্ভোগের পর দুজনেই রাত্তে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিন রাত্তিরে আকাশ ভেঙে ঝড়ের বর্ষা নেমে এল।

দুজনের গলগল হাতের কয়েই রয়েছে।

সেখান থেকেই সেখানেই তুলে নিই।

—বিমল অনেকক্ষণ নিবিড়ে রইল। বাইরের ঝড়ের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ওরা অন্ধকারের স্রোতে ভিজেমাছের পিঠের মতন ভাসতে লাগল। অন্ধকার। ঠান্ডা লাগছের মতন তারি অন্ধকার বিমলের নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইল। বিমলের নিশ্চিন্ত প্রবাহ। আকাশ ছিন্নো-ভিন্নো-হতাশা-নৈরাশ্য-শূন্যতা তার সমস্ত শরীরটাকে যেন সচ্ছ করে বিমতে লাগল। তার কুশকুশে যেন খোলা প্রান্তরের অনর্গল হাওয়া প্রবল বেগে নিশ্চিহ্নকে হাহাকারের আতিতে ভরে দিচ্ছে। বিমল এতটা ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনল, যেন কোনো গভীর কুপ থেকে একটা নিরন্ন চিৎকার ভেসে আসছে। প্রচণ্ড নির্জনতা, অর্থহীন, দুর্বোধ্য, তাকে গ্রাস করছে। বিমল কথা বলতে পারছে না। তার মনে হল সন্তানের প্রথম উত্তাপ তারা ফিরে পেয়েছে, কথন মানুষ কথা বলতে না, আকারে-ইঙ্গিতে জানবে-বুঝিতে তারপর প্রয়োজন পূরণ করত। বিমল নির্মম নিরাবিত্ত করে আত্মসমর্পণ করল। কমলীর কঠিন তারি অস্তিত্ব তাকে দুঃখ করেছে (ইস্পাতের শরীর চায়), কিন্তুতের আত্মঘাতী ইচ্ছায় কমলী তার ওপরে-ওপরে দেহখণ্ড তীব্র করে ছড়িয়েছে। বিমল ফেটে পড়বে, বিকীর্ণ হয়ে পড়বে আলোর পাহাড়ের মতন। মুঠো মুঠো আগুন ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেরুচ্ছে কমলী তার দেহে।

'শুনো—'

'কী?'

'শু-নো আমি পারছি নে...'

'কে পারতে বলছে—'

'আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারো।'

এ-নিষ্ঠুরতা আমরা চাইনি। আমরা ইচ্ছায় করে খুন হচ্ছি, মরতে হচ্ছি।'

'তুমি তো এই চেয়েছিলে। কেন মিছি-মিছি কষ্ট পাচ্ছ?'

'শুনো—'

'কেন?'

'আমি কী চাই নিজেই জানি নে—'

'জানি। তুমি ঘুমোও। আমি তোমার হাত ছাড়িয়ে দিই।'

বিমল ঘুমে ঢলছে।

বহুবার ঘুমের আচ্ছন্নতা ছিঁড়ে যায় বিমলের মাঝে কমলীর মুখে, ওর ভালো লাগার চোখ, ওর ছড়ানো চুল, উষ্ণ নিশ্বাস।

কমলীর চোখে ঘুম নেই। কমলী জানে। ও এমন করবে জানলে আমি ওকে এতদূরে নিয়ে আসতাম না। আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার নিজেরি লোভ আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমার ভেতরে এত লোভ হয়েছে আমি জানতাম না। আমার লোভ ভোজ্যবস্তু আমি ওকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। ও লোভী হতে পারে না। হয়তো পারত যদি-না আমি ওর সামিধ্যে এমন প্রচণ্ড ক্ষুধার কাঙাল হয়ে উঠতাম। আমি এখন কী করব, আমার লজ্জা, অপমান।...

উত্তেজিত দীর্ঘ করে লাভ নেই। সেপ্টেম্বরটি এই ছয় বছরের 'কৃষ্ণা' গল্পটি।

এই গল্পে লেখকের যৌনতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটি কী যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি? এর মধ্যে সুকুমারবাবু কামগন্ধ-হীনতার অতিরিক্ত প্রসঙ্গটি কী করে আবিষ্কার করলেন! তাহি এও তাঁর শাশ্বত নারী-জাতীয় প্রতীক অন্বেষণ?

গল্পকে যথাযথ নিতে আমরা ভয় পাব কেন? এ গল্প অবশ্যই যৌনতার গল্প। কিন্তু লেখক প্রথম প্রস্তাবটাকে জীবনের সামগ্রিক বোধের সঙ্গে যুক্ত করেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন, জীবনের সম্পর্কোজ্জ্বল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা এক ধরনের অসম্পূর্ণতা এবং অমানবিক। যেমন অর্কেস্ট্রার যন্ত্রবিশেষ হলে সুরের সমন্বয় হারিয়ে যায় এবং সমস্ত ব্যাপারটা প্রচণ্ড নাটকীয় হয়ে ওঠে, তেমনি।

জানিনে এটা সার্বিক সত্য কিনা। তবে অস্বীকার করতে যাবা নেই যে এটা ব্যক্তি-মানসের হাতে-কলমে পরীক্ষার ফল।

আজ আর বলতে সংকোচ নেই সমুদ্র-তীরের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতায় সেদিন আমি অকালে মৃত্যুর মতন হতাশ বোধ করেছিলাম। মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুদ্ধি দিয়ে, ভেবে দেখেছি সেদিন যদি ঘটনাটা ঘটতে পারত তাহলে সেটা পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের কাছে শাপগ্রস্তা অপ্সরাদের মতো লাগত। এবং সে অর্থহীন লজ্জা আমরা সারাজীবনেও ঘুচাতে পারতাম না। প্রবৃত্তি যে আমাদের সুস্থ জীবনবোধের কাছে মাথা খেয়েছে তার জন্যে সন্দেহ চিহ্ন থাকে না। শেষে, শেষ পর্যন্ত ভোরের অপরাধবোধ আমাদের পীড়িত করত-ই।

এরপর আর কখনো আমরা ওই বিপজ্জনক অন্তরঙ্গতার ঝুঁকি গ্রহণ করিনি। যেখানে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে একটা বিকলাঙ্গে রূপে পরিণত হতে বসা।

'কৃষ্ণা' পত্রিকার বেরুবার আগে কল্পনা আমাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দেয়নি। প্রথমে গল্পটা পড়েছিলেন ওর স্ত্রী।

আমাকে ডেকে বলেছিলেন। আচ্ছা, তোমার সাহিত্যিক কী সব গল্প লিখেছেন? কী যে আবোলতাবোল আনেন—'

বি. সরকার / সন্স
এস. বি. সরকার
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪-২৮০৩

সকল প্রকার আফিস ষ্টেশনারী কাগজ, প্যাকেজিং, ফুইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ

গল্পটা শোনাই পড়ুয়ার। পরে কী ভাবে নাকু বাবু হয়েছিল, নিজের ওপর তার অমন অসীম সম্পদে।

বাধা দিয়ে বলেছিলাম : 'ওই গল্প লেখবার জন্যে কী সেদিন ঘটনাটা ঘটান হয়েছিল।'

ঝরন হেসে বলেছিল : 'দূর দূর।'

আশ্চর্য, ঝরন কী করে ওর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ করে? হয়তো আমার মনের কথাটাও দর্পণের মতন তুলে ধরে?

কিন্তু তাহলেও, আমার ভেতর কিছুতেই যেন নয়। আমি তো লেখক নই, আমি সাধারণ ভদ্রমানুষের মানুষ। একটা গল্প পড়বার মতন অনুভূতি আমাকে পীড়িত করে রাখবে।

ঝরন আমার যৌক্তিকতা খোঁজেনি। কিংবা খুঁজেও চুপ করে থাকত। আর, আমি হারি না বলে একরকম ক্ষুণ্ন হয়েই উঠতাম। মনে মনে কষ্টও হত। মেঘলাআকাশ বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারতাম না। এ যে কী নেশা বোঝাতে পারব না। যেন আমার আজ ইচ্ছিতে নিজেকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতাম।

ঝরন আমার মোহ, আমার আকাঙ্ক্ষা, যেমনা উদর হেসে।

কিন্তু ঝরনের কথা থাক। সাহিত্যিক ঝরনের কথাই বলি।

ঝরন এই যৌবনেই বিদেশ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য চিত্র বিষয় হয়ে উঠল। এবং অনেক সফল বিভিন্ন পরিবেশে সৃষ্টি করে সে একটি বিশিষ্টতার সুবেদারীত্ব করে গেল।

এই আজীবন তার অক্লান্তকর্মী জন্য অবদানকে। এমনকি সে নারকেল চতুষ্কোণার মৈত্রীর শেষ সীমানার প্রতিবেশ অঞ্চলে নায়িকাকে তার মোহাচ্ছন্নতা থেকে এনেছে। রৌদ্র ঝরা দেবদারুর ছায়ার মতো উদাসীন মাধবীকে রেখে ঝরনের কাছিকে লালসা যেন অনুভব একটা বিবর্ণতায় নিস্প হয়ে গেল।

আমি খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম। এ যেন ওর একটা খেলা হয়েছে। এবং সে খেলায় আমি নির্বোধের মতো আমাকে দিতে হচ্ছে।

একদিন ঝরন বলে বসলাম : 'আমাকে নিয়ে তোমার এই অমানুষিক পরীক্ষা এবার থামাও। আমি আর পারব না।'

ঝরন কী বলতে চেয়েছিল আমি শুনিনি।

আমি ঝরনে কাঁপছিলাম। ওর এই নির্মমতায় আমাকে স্তব্ধ করেছিল।

ঝরনের চলে যাবার পরে বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে হয়নি। ফিরলে শুধু আমাকে ঘুরে ঘুরে খাচ্ছিল। আমি চেয়েও চেয়ার পড়ে ছিলাম, তৈরি হচ্ছিলাম। আমার সামনে এই দৃষ্টিতে যাবার আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে হবে। দুর্বল অনুভূতির মতো নিয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হবে। আমি কারুর ইচ্ছার দাস নই।

আর, এই জন্য প্রতিহিংসাই আমাকে পাগল করে দিল।

একদিন নিজের বাড়ির বই বই দুপুরে আমার ছোটো ভাইয়ের বন্ধু সত্যব্রতকে ধরে পড়ে আমার ঘোরতে, আমার মোহনার ঘরে ডেকে আনলাম। বাইরে বই বই ঝোপঝাড়। ঘরের জানালায় ঝিরঝির ঝরনের ঝরঝর।

সত্যব্রত অবশ্যই ঘরনা ভাবনা বন্ধ অন্ধকার ঘরে কেমন হকচকিয়ে উঠেছিল। আর সেই সময় আমি ঠেলে-আনেকের মোহময় ঘুমন্তে ঘুমন্তে আমার সামনের ওই নির্বোধ যুবক ভদ্রলোকটিকে আক্রমণে নিক্ষেপ করে সাহিত্যিক ঝরনের গল্পের প্রতিপাদ্যকে ছিন্ন ভিন্ন ছুঁটি ছুঁটি করে ফেলেছিলাম।

আশ্চর্য আশ্চর্য ঝরনের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন আমার অনেকটা হচ্ছিল। ওই একটিদিনের পাশবিকতার সত্তা আমাকে জীবিকার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঝরন সমাজে আমার ওপর এর কোনো প্রতিক্রিয়া করেনি।

আমি এখনো ভাবি ঝরনকে শাস্তি দিতে গিয়ে আমি কী করে ওই সত্তা পর হেরে গিয়েছি! আমার ছুটি শালীনতা আমাকে বাধা দিল না কেন! নাকি আমার ভেতরে, আমার নিজের সম্পর্কেই একটা সংশয় অবিশ্বাস করে উঠেছিল। ঝরনের প্রতিপাদ্যটা প্রকারান্তরে আমারি পারীরিক অক্ষমতা কী না, কে বলতে পারে।

আমি চরম ঘৃণা পেয়েছিলাম। এবং এই ঘৃণাই আমাকে এ পথে টেনে নামাল। এটি এমন একটি প্রসঙ্গ যেখানে আমার ঘনিষ্ঠজনরা প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যদিকে ঝরনের সে-বালাই নেই। ঝরন পারিবারিক সমস্যায় সে অঙ্কিত পুরোনোর ঝরন। তাহলে আমার ওপর এক রকমের পরীক্ষা, আর নিজের পারিবারিক জীবনে কেন সহা সহ্য প্রমাণিত হবে কেন! এটা কী আমাকে মেনে ঝরনা নয়!

আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ঝরন আমার হাসির এই পরিবর্তনকে লক্ষ্য করেছিল। কারণ ও আমাকে আমার চেয়েও বেশি চেনবার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু ও আমাকে কোনোদিনও, কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ওর চুপ করে যাওয়াটা আমাকে ঝরনের। আমি নিজের পর নিজে দেখতে পাচ্ছিলাম ও শুকিয়ে যাচ্ছে। ওকে ঝরনার হৃতসর্বস্ব মনে হচ্ছিল। অথচ ওর প্রেরণা ঝরনা অনোরোধটা আমাকে কোনোদিনও ঝুঁকতে দেয়নি।

কে জানে আমিই ওর ঝরনাঝরনের জন্যে দায়ি কিনা।

ঝরন চলে গিয়ে আমার ওপর অসহ্য দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে গেছে। ওর বাড়িঘর জীবনটা ঝুড়ে দিয়ে 'নদীপারুটাই' বিষয় হয়ে উঠেছে। এবং বেটা ইতিহাসের সত্যটা। ওর সাহিত্যসত্তা হিসেবে আমার ভূমিকাটাও ইতিহাসের অনুসরণ হয়ে গেছে।

অনেকেই ঝরনকে বড়-করা আমার কর্তব্য হয়ে পড়েছে। যেন ওর সম্পর্কে কোনো ভুল না হয়। ওকে যেন আমরা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারি।

আমা আমি আশ্চর্যও আমাকে সমর্থন করেছে। সেই কারণেই এই বিনীত প্রচেষ্টার।

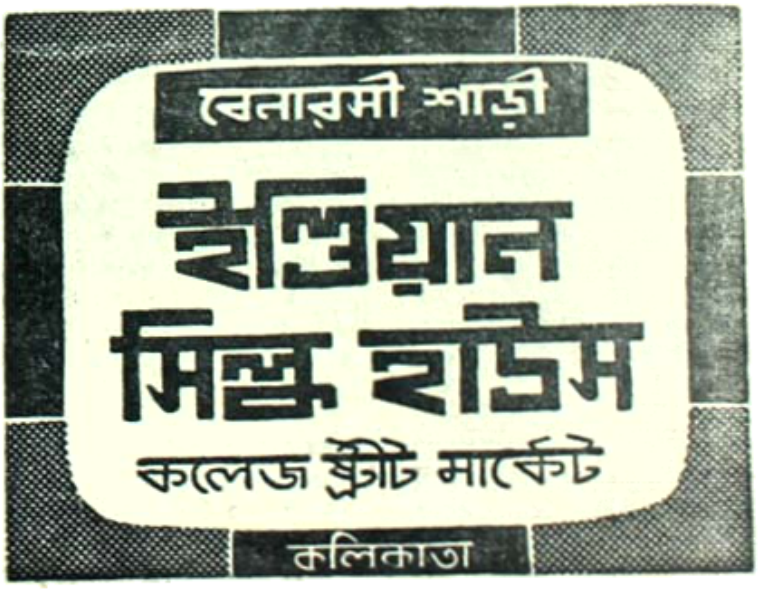

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

মুজফ্ফর আহমদ

স্মৃতিচারণে সমসাময়িক চিত্র

বছর বছর আগে অমৃতবাজার পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় আচার্য নরেন্দ্রদেব ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির একটি ইতিহাসের মসলা প্রকাশ করেন। সেই মসলাটি বলাবাহুল্য, তাঁরই অসাধারণ এবং তাঁর মতো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের ধারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার হয়েছিল। কিছুকাল আগে নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম যে, তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তাঁর কৃত্য এইদিনে প্রকাশিত হয়েছে। যখনই সেই গবেষণাধর্মী ইতিহাসের বাইরে মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা এখনও আছেন তাঁরা তাঁদের কথা বলেছেন। তাঁদের মুজফ্ফরের আহ্বান একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, পার্টির তিনি বলা যায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন লেখকের এবং বহুকালের তাঁর বয়স আশী পার হয়েছে। সাধারণতঃ অতীত আলোচনায় পক্ষপাতের প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ আসে। এক্ষেত্রে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একটি বড়ো সংগে সংযুক্ত আছেন এবং কর্মপরিচালনার সক্রিয় ভূমিকা অনেক দেখেছেন। সম্প্রতি তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' নামক স্মৃতিচারণমূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সমসাময়িক চিত্র তিনি অনেকটা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থ শুধু স্মৃতিনির্ভর নয়, এর জন্য তাঁকে প্রচুর খাটতে পড়তে হয়েছে, তিনি সেইসবের সাহায্যে স্মৃতিকে সচেতন করে নিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

'এই পুস্তকখানি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা, কোনো অবস্থাতেই এ পুস্তককে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বলা যায় না। ইতিহাস লেখার জন্যে আমি পার্টির খাতা নিয়েছিও হইনি। তবে, যেসকলেরা আমার পুস্তক হতে প্রচুর মাল-মসলা পাবেন।'

গ্রন্থের মুজফ্ফরের অভিমত যথেষ্ট প্রচুর তথ্য সমাবেশ করেছেন এবং তাঁরা ব্যক্তিজীবনে যা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে ফলে ইতিহাসী উপাদানের সন্ধান হয়েছে তার যথাযথভাবে সেগুলি হয়েছে।

এই জাতের যখন পরিচয়ের প্রয়োজন কথা হয়েছে কথা শুরুর আগে—এই ভাবে তিনি কিভাবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে নেমেছিলেন তার স্মৃতিকথা বিবৃত করেছেন। সম্পাদীসের অক্টোবর হুসোপুর গ্রামে ১৯১৬ সালের প্রথম ভাগে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা অনুরূপ আলীসাহেব সম্পাদীসের আদালতে মুখতারী করতেন। বাল্য জুবানের একটি আরবী বাক্য উচ্চারণ করে তাঁর পাঠারম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে আরবী পড়তে হয়নি, তাঁর পাঠারম্ভ হয়েছিল যখনমোহন তর্কালঙ্কারের সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রথমভাগ দিয়ে। উক্ত প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁকে পড়া ছাড়তে হয়। পরে অসমা আহমদীয়ার আরবী ব্যাকরণ ও পদ্যসংকলন ও হুসেনের পাঠ করেছেন। তখন ১৯০৩ সাল। স্কুলে বলাবাহুল্য অসুবিধার হয়েছে, কিন্তুর মুজফ্ফরকে ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ না পেয়ে মক্তবেরই ভিতরে উপলে যান। লেখক বলেছেন—

মনে পড়ে পাঠারম্ভের পরীক্ষার স্লেটখানা একখানা পাতলা কাঠ পড়ে ওপরের আমি কাঠিনালের টিকেই ভিজতে পাবিয়েছিলাম না। তখন একজন অনেকদিনের হিন্দু

চেপরাশি দরোয়ানরূপে হয়ে আমার একখানা পরদা দিয়েছিলেন।'

তিনি যখন কণ্ঠসহকারে কিছু অর্থ-সংগ্রহ করছিলেন তখন তাঁর বড়দাদা এসে হাঁকে বললেন, যাচ্ছ চল, হাইকুলেই হেমেন্দ্র পড়তে দেব।

লেখক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বেরাবালি জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর তিনি হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন, সেখান থেকে আসেন কলকাতায় এবং সেই থেকেই তিনি কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯০৭-এ বিবাহ হয়েছিল, লেখক বলেছেন—কিন্তু বিয়ে কোনোদিন অন্যের ঘর-সংসারে বসতে পারেনি।'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েননি, তবে তাঁর মনে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব জেগেছে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ভিতর তিনি হিন্দু-পুনরুত্থানের প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন তবে বলেছেন—

'আমি কিন্তু ধর্মানুপ্রাণিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে দোষ দিই না, এই কারণে যে তার আগে মুসলমানরাও তো এই হুজুগই করেছিল। তারাও চেয়েছিল মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুসলিম আন্দোলন আরও বেশী প্রচণ্ডাত্মক ছিল।'

১৯০৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত লেখক মুর্শিদাবাদের কাজ করেছেন। এরপর বহরমপুরে বাঙলা সরকারের ছাপাখানায় ও সমসাময় কিছুকাল কর্পোরেশনের সার্টার হাউসে কাজ করেছেন। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। এখান থেকে প্রকাশিত হত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা এবং সেই পত্রিকায় হিন্দুদেরও লেখা ছাপা হত, হিন্দু-মুসলমানরা সমিতির লাইব্রেরীতে বইয়ের বই দান করতেন। এই সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন লেখক। সাহিত্য পাকো হাতেই কাজ করতে হত। শহীদুল্লাহ সাহেব ও মোজাম্মেল হক সাহেব পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু বেশী ভাগ তাঁরা করতেন না। কাগজ ছাপানো, লেখা সংগ্রহ করা ও তাকে দেওয়া প্রভৃতি সব কাজ লেখকই করতেন। লেখক বলেছেন—

'১৯১৮-র নভেম্বরে আমার যে সব সমবয়সী কর্মীর জীবন আরম্ভ হয়েছিল সেই জীবন আমার আজও অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে এই কথাগুলি লেখার সময়েও চলেছে।' ১৯১৯-এ লেখক ভেবেছেন জীবনের পেশা কি হবে—সাহিত্য না রাজনীতি, এই নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব জেগেছে। ১৯২০-র সেপ্টেম্বর তিনি সাংবাদিক করে নেবেন এবং রাজনীতিই হবে লেখকের জীবনের পেশা। ১৯১৬ থেকে প্রস্তুত হোঁছল বলে মনে হয়, তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের এবং বিপ্লবের অন্তরঙ্গ হয়েছেন এই সময় থেকে।

বিপ্লবীদের কার্যকলাপের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। লেখকের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি স্থাপন হয়। এই ব্যাপারে লেখকের প্রত্যক্ষ যোগ সেদিন ছিল না, তবে পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গ তাঁর এবং তাঁর জন্য সহকর্মীদের ওপর পড়েছে, এবং সেইখান থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক সংঘর্ষিকারণা।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। পরবর্তী কালে তিনি ১৯২৯-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্যান্য সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। পূর্ব-জীবনে তিনি অনুশীলন পার্টির সদস্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের প্রয়োজনে চীন, জাপান প্রভৃতি ঘুরেছিলেন তিনি, সেসবশেষে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন। সেই-খানেই তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল মানবেন্দ্র-নাথ রায়—এই নামেই তিনি পরবর্তী-জীবনে খ্যাত হন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের অনেক কথায় এই দুজনটি পরি-পূর্ণ, তাঁর কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে এবং তাঁর সৃষ্টিকথা লেখকও প্রচুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রথম স্ত্রী এক্টিনা গেনটের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় থেকে বিচ্ছেদের কাহিনী পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এরপর মাইকেল বোরোদিনের সঙ্গে রায়ের কি সূত্রে পরিচয় হয় এবং কিভাবে চীন-সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে বইয়ে। এই সময়ে বিপ্লবী জর্জনী মুখার্জির সঙ্গে রায়ের পরিচয় হয়। জর্জনী মুখার্জি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ৩১৬ থেকে ৩২৭ পৃষ্ঠায়। জর্জনী মুখার্জি প্রসঙ্গে এত বেশী তথ্য ইতিপূর্বে সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি।

এই গ্রন্থে আরেকজন প্রবীণ বিপ্লবীর বিষয় বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর নাম নলিনী গুপ্ত (ইনি পরিচয়ের নলিনী-কান্ত গুপ্ত নন)। কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার যুগে নলিনী গুপ্তের বলা ভূমিকা ছিল। তবে এই গ্রন্থে তাঁর যে আকৃতি পাওয়া যায় তা একটি চতুর বাঙালীর। মনে হয় আমরা এই নলিনী গুপ্তকে অনেক বছর আগে কলকাতার কফি হাউসে দেখেছি এবং অনেক আলোচনার মধ্যে তাঁর চেহারার চমকটুকু কিছু লক্ষ্য করিনি। নলিনী গুপ্তের বিষয় যা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল তা ভবিষ্যৎ কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক একেতারার

জাতীয় বন্ধুরা। নলিনী গুপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কেও অনেক বিষয়ে শিক্ষায় পরিণত করেছেন। নলিনী গুপ্তকে মার্কি লেনিনবাদ তিনি চিরঋণী বলেছিলেন।

'শরৎ মুখোপাধ্যায় বন্ধু সহ আমাদের প্রেসের মেসে কাজ করবেন। হয়ত মাসের মতো ওখানেই একবার বসে থাকবেন।'

নলিনী গুপ্ত জেলে ফিরে যাবার আগে একবার ১৮৩৯ সিলেন। তখন তার চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর নামে বহু বহু চিঠি পাওয়া। সুভাষ বসুর মাত্রই পত্র এসেছিল লেখকের কাছে। তিনি সেই পত্র ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে দেখান। এজন্য তিনি সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন তাই চিঠিখানি তিনি স্বহস্তে তাঁকে লেখার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে চিঠি ফেরত দিয়ে বলেন, সে পত্র নিজ নয়। লেখকের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ছিল না। তিনি লিখেছেন—

'পরদিন আমি একদিন সুভাষের নিকটে গেলাম। তিনি বললেন—যারা তাঁকে পত্র দিতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন। সিভিল সার্ভিস পাস করে চাকরী গ্রহণ না করায় অহংকারে তাঁর তখন মাটিতে পা পড়ছিল না, তাছাড়া হয়তো একটা ভেবেছিলেন যে এক-এর মারফতে চিঠিপত্র গ্রহণ করা কেন তিনি মিছামিছি ঝঞ্ঝাটে জড়িত হয়ে যাবেন।'

সুভাষচন্দ্রের অহংকার বিষয়ে অন্য কোনো সমকালীন নজীর আর দেখা যায়নি।

এই গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দত্ত জানার অনেকটি পত্র মুদ্রিত হয়েছে। এইসব পত্রাদি থেকে অরবিন্দ ঘোষালের ইন ফাই-নিয়ানকে লিখেছিলেন তাহার চিন্তা করে। লেখক বলেছেন—

'আমলে যে তাঁহার মনোভাব করেছিল সেই অনুযায়ী তাকে যদি তখনই মুক্তি দেওয়া হত তাহলে তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য দেখা হয়ে যেত। সে যে সন্দেহাতীত ভাবে গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের মোতায়েন কাজ করার মুক্তি পেতে চেয়েছিল সে কাজ সে কখনও করতে পারত না। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকেই শুধু সে গভর্নমেন্টকে খবর সরবরাহ করতে পারত। এজন্য তাকে গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্ট বুঝেছিল, জানে বুঝেনি। ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারে এই ভেবে তাকে গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্ট তখন জানাতে মুক্তি দেননি।'

জানে সম্পর্কে এমনই আরো অনেক সময়ে এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

সুদীর্ঘ সাড়ে ছ শত পৃষ্ঠার গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। শুধু কেবল চমকপ্রদ তথ্য নয় তার কথা উল্লেখ করা গেল। মানবেন্দ্র রায়কে নিয়ে এই জাতীয় বই এর আগে আর লেখা হয়নি।

গ্রন্থ শেষ হয়েছে। ১১২১-এর জুলাই মাসে গ্রন্থের বাঁধাইকর্ম করা হলেও সেই সময়ে ১১২১-এর ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে যায়। সেই বছর ৪ঠা ডিসেম্বর ক'লকাতা থেকে এই সংবাদ ঘোষণা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং তাঁর ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে গ্রন্থ চীনের অন্তরঙ্গ যে ফুল করেছিলেন তার জন্য তাঁর সুখ্যাতি সমালোচনা হয়। ২৭শে এপ্রিল ১১৮০-এ একটি চিঠিতে লেখককে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"Then came his discrediting in connection with India. Apart from the denunciation theory, he was attacked, firstly, because he had given what were regarded as exaggerated reports about the strength of the Communist Party in India and his influence there and, secondly, because he was attempting to build a Workers and Peasants Party as a kind of alternative to the Communist party."

লেখক বলেছেন—"এম এন রায়ের সাহিত্য প্রচারের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশে আলোড়নের অনেক উপকরণ হয়েছে এবং রাজনীতিকভাবে তাঁর খ্যাতিও বেড়েছে। কিন্তু এম এন রায়ের অধিবেদনা ও অর্থলোভের জন্যেই দেশে বড় পার্টি গড়ে উঠতে পারল না।"

লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—"জানার জন্যে আমার মনে যে এত কম নিজেকে তিনি বিপ্লবের কাজের জন্য প্রস্তুত করলেন সেই তিনি কি করে সেই বিপ্লবের টাকা আত্মসাৎ করলেন?"

এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগবে এবং হয়ত একদিন উত্তর তথ্য প্রকাশিত হবে। তখন জানা যাবে এম এন রায় নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিপ্লবের টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন কি করেন নি? যারা এম এন রায় প্রসঙ্গে গবেষণায় লিপ্ত, তাঁরা হয়ত এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যে অক্লান্ত সাধনায় এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য তুলনাহীন।

—অভয়ঙ্কর

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

মুজফ্ফর আহমদ প্রণীত। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। মূল্য : ষোল টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যে বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছে, তার সংবাদ আমরা মাঝেই 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এরকম আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করছেন ইউনেস্কো। কালিন্দী তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের' উপন্যাসটির অনুবাদের কাজ চলছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী শ্রীমতী হুলস ভট্টাচার্য এই অনুবাদ করছেন। এর আগে শ্রীমতী ভট্টাচার্য ফরাসী ভাষায় 'পথের পাঁচালীর' অনুবাদ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকি আরো তিনটি উপন্যাস ফরাসী ভাষায় অনুবাদের কথা ইউনেস্কো চিন্তা করছেন। আর শুনছি, ইউনেস্কো আরো উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদি অনুবাদে সচেষ্ট হবেন এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের আরো উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদে আগ্রহী হবেন। কতদূর জানা আছে, কেন কোন গ্রন্থ অনূদিত হবে তার প্রাথমিক নির্বাচন অনুবাদকরাই করেন। তাই অনুবাদকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন স্বয়ং গ্রন্থ নির্বাচন করে অনুবাদ করেন। আমরা দেশ বিদেশের উদ্যোক্তাদের তাহলে অভিনন্দন জানাবো।

গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত মৈথিলি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, এতে মৈথিলি সাহিত্য ও ভাষার সাম্প্রতিক সমস্যা সম্বন্ধে একাধিক সাহিত্যিক এবং সমাজতত্ত্ববিদের বক্তব্য সংকলন করে একটি 'স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ। পাঠকদের অবগতির জন্য প্রশ্নগুলি তুলে ধরা যাচ্ছে। (ক) মৈথিলি ভাষী সরকারী কর্মচারীদের অনেকে মৈথিলি ভাষার মৈথি এঁরা সরকারী পরীক্ষায় বিরোধিতা করছেন— এসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? (খ) বিহার সরকারের উদ্যোগে মৈথিলি ভাষায় অনেক পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মৈথিলিভাষী ছাত্রেরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আপনি কি মনে করেন না, সরকারী উদ্যমে মৈথিলি ভাষার পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত? (গ) মৈথিলি সাহিত্যের গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মৈথিলি অকাদেমী গঠন করা কতদূর যুক্তিযুক্ত? এছাড়াও আরো কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিকরা। প্রায় সকলেই মৈথিলির সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্যের আরো কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রখ্যাত হিন্দি কবি ও উপন্যাসিক 'অজ্ঞেয়র' গ্রন্থ 'ই ইজ দিজ সেভেনফর'। অনুবাদ করেছেন লেখক স্বয়ং। এতে অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে অনেকটি মৌল গ্রন্থ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল একটি পাঞ্জাবি উপন্যাস। এর লেখক হলেন রাজিন্দর সিং বেদি। অনুবাদ করেছেন খুশবন্ত সিং। তৃতীয় গ্রন্থটি হল ভারতীয় লোককথার ইংরেজী অনুবাদ, সংকলন। প্রখ্যাত বাঙালাম লেখক মুখোটী কৃষ্ণচন্দ্রা। গ্রন্থটির নাম 'দ্য ওয়ান এন্ড অনলি ইন্ডিয়ান ফোক-টেল্‌স'। বেছে নিয়েছেন ভট্টাচার্য অনুবাদ করেছেন বিষ্ণুপদির কবিত। এতে বিদ্যাপতির একশটি কবিতার অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ গ্রন্থটির নাম 'কবিতাবলী' তুলসী-দাসের কবিতার অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন প্রাণনাথ আনন্দ। প্রবাসী ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন 'সমকালীন ভারতীয় লেখক অনুবাদ। গ্রন্থ পঞ্চ অনুবাদ করে এর আগেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড সংকলিত হয়েছে বাইশ জন লেখকের বাইশটি গল্প। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে ইদানিং বিদেশে কিছুটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার তরুণ কবি নরমান ডৌসনের প্রথম কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম "স্পেসেস অব এ কিমেল ইউনিভার্স"। ডৌসনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মননশীলতার সঙ্গে সম্পর্কের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মাইক্রিক পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন ভারতীয় সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি সাক্ষাৎকার সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমন মুখোমুখি লিখতে গিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন পাঞ্জাবিতে না লিখে ইংরেজিতে লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি উত্তরে বলেছেন—"প্রথম কারণ, ইংরিজিই একমাত্র ভাষা, যে ভাষায় আমি লিখতে পারি। আমি পাঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু জানি—কিন্তু এই সব ভাষায় স্বচ্ছন্দে বোধ করি না। যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার মাতৃভাষা কি, আমি নির্দ্বিধায় বলি, 'ইংরেজি'। আমি মনে করি, ইংরেজি সবচেয়ে উন্নত ভাষা, হিন্দি, উর্দু বা পাঞ্জাবির চেয়ে এর সাহিত্য উন্নততর। তাই এই সব ভাষা থেকে আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করি। .....তাছাড়া একটা অর্থনৈতিক কারণও আছে। আমি যা কিছু অল্প-স্বল্প লিখেছি, তাতে আমি যা অর্থ বা সম্মান পেয়েছি, তা আমা ভারতীয় ভাষায় লিখলে পেতাম না"। শ্রীনিবাসের মন্তব্য কতদূর সত্য তা জানি না। তবে যা, ভারতে না হলেও বিদেশে আজি আমার অনুবাদের [illegible]

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি। (আলোচনা)—অরুণকুমার সরকার। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আরো হবে। দিন যত এগোবে, নতুন নতুন চিন্তার যত বিকাশ ঘটবে, তত্তই রবীন্দ্রনাথের এপর নতুন আলোকে পাত হবে। এটা আনন্দের।

কবি রবীন্দ্রনাথ বড় না মনীষিনী রবীন্দ্রনাথ বড়, এ চিন্তা অনেকেরই মনে জাগে। উত্তর খুব সহজ নয়। কবি রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যায়, কিন্তু গদ্যকবি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? ভাষা ও রীতিতে তিনি কি এমন অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে? অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দরভাবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন অরুণকুমার সরকার 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' বই-এ।

আমরা জানি, বাঙলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য বিরাট। গল্প, উপন্যাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্যসমালোচনা, বিজ্ঞান, শব্দতত্ত্ব, আত্মজীবনী, কোন বিষয়েই বা না লিখেছেন তিনি। বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে তাঁকে উপযোগী ভাষা ও রীতির অনুশীলন করতে হয়েছে। নতুন রীতি অনুসরণ করেছেন।.. বিষয়বস্তুর তত্ত্বে ভাষা করেছেন আয়ত্ত। পরবর্তী নতুন রীতির জন্যে অপেক্ষা করেছেন। কখনো ফিরে গেছেন পুরোন রীতিতে। তাঁর গদ্যরীতি "সদা অস্থ-পরিবর্তমান রূপের অনন্য রূপে আলোকিত"। রবীন্দ্রনাথ পদ্য ও গদ্য চর্চা করেছেন সমান্তরালভাবে। পদ্যের তুলনায় গদ্য চর্চা ছিল কম। "ভাবাবস্তু পদ্যের চেয়ে গদ্যের আয়ত্তেই মানুষকে বেশি আকর্ষণ ও অভিভূত করে থাকে, তাই গদ্যকার রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে পদ্যকার রবীন্দ্রনাথকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু গদ্যকার রবীন্দ্রনাথকে বিচার করলে দেখা যাবে একটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হিসাবেই: তাঁর ভাষা, তাঁর সংগীত, তাঁর চিত্র সমস্ত সৃষ্টিকেই দেখতে হবে সমান্তরালভাবে। এটি স্পষ্ট বিশ্লেষণ যে, রবীন্দ্রনাথের কোনো সৃষ্টিই একে অপরের পরিপূরক নয়। চলনের মত ভাষার আছে সৃষ্টির কাজে রবীন্দ্রনাথ ভাষার প্রায় সব রীতিকেই ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমকোটির দ্বিতীয় সৃষ্টিধর্মিতে আজো জন্মান নি"। (ভূমিকা)

অতঃ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রীতি ও পাওয়া যায়। ভাষা ও রীতির দিক থেকে তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে যুগের চেয়েও সার্থক।

শ্রীঅরুণকুমার ভাষা ও রীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যরচনাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। ১৮৭১ খৃঃ তত্ত্ববোধিনীতে যুরোপ প্রবাসীর পত্র ছাপার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম পর্ব; তারপর থেকে ১৯১৮ খৃঃ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব; তার থেকে আরম্ভ করে ১৯১২ খৃঃ জীবনস্মৃতি প্রকাশ পর্যন্ত তৃতীয় পর্বকাল। ১৯১৬ খৃঃ থেকে বাইরে উপন্যাস প্রকাশ থেকে চতুর্থ পর্বের সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনের রূপরেখাটি স্বচ্ছ এবং সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে শ্রীঅরুণকুমারের আলোচনায়। তাঁর গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ভাষারীতির বহিরঙ্গের অর্থাৎ বাক্যগঠন, শব্দপ্রয়োগ, অলংকরণ এসবের ওপর নজর দেননি। কারণ এ ধরনের সহজরীতির সমালোচনা বাংলা দেশের গদ্যলেখকরা সব সময়ই করেছেন। "ভাষার রীতির মূল পরিবর্তন যে কখনই লেখকের খেয়াল খুশির পরিণাম নয়, ভাববস্তুর প্রকৃতির সঙ্গে অভিপ্রেত সম্পর্কে সম্পর্কিত এইটি মনে রেখে তাঁর গদ্যরীতির মূল পরিবর্তনের ঐতিহাসিকতা এবং ক্রম পরিবর্তিত গতিরেখাটি স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করেছেন লেখক। তাঁর এ চেষ্টা খুবই সার্থক হয়েছে।

সূর্য পতনের ঘণ্টা (কবিতাগ্রন্থ)—শিবেন চট্টোপাধ্যায়।। বিচিত্রা প্রকাশনী, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯।। দাম ৩ টাকা।।

প্রকৃত সৎ কবি কখনো ধারিত্রহীন হতে পারেন না। কবিতার ব্যবহৃত প্রতীক সম্পের ওজন, ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন হতে থাকা। শিবেন চট্টোপাধ্যায় তেমনই কবি, যাঁর ভালো-মন্দবিচারের অন্তর্লোকের জাগরণ কবিতার প্রকাশ ধরণীর মধ্যে মূল রূপগত পরিবর্তন ঘটায়নি, গুণগত মূল্যায়নের স্যোগও দেয়েছে।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা আত্মজনের সঙ্গে বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সাযুজ্য লক্ষণীয়। বর্তমান কাল, পরিবেশ ও সমাজ যেন আর্তনাদময়।

ঠোঁট কেটে যেতে আজকের সমস্ত
চীৎকারে উত্তর আসা—
স্থির জলাশয়—
ভালিত সন্ধ্যের কাঁপা নিঃশ্বাসে ঢাল
সরলতা - উপন্যাস - সিরিজ-বিপরিবর্ত
সমূলে বঞ্চিত আজকে। আজকে। পদ্য

কোনো কোনো কবিতায় জীবনে তাঁর কবিতার অন্তিমবাহীন জোনজীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ। কিন্তু অধিকাংশে কবিতাতেই তিনি সংযোগী, উদ্দীপ্ত, আত্মবাদী ও বিষয় আত্মসমর্পণকারক। নৈর্ব্যক্তিক তন্ময়তা ও অন্তিমতায় হয়ে তাঁর কবি-মন প্রতিকিয়াকলাপ অন্তরের অভিলাষী। শিবেনবাবুর কবিতায় দেখা যায়, একদিকে প্রকাশ বাস্তবজগতের আয়তন-সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অন্যদিকে বিশ্বের কিনারে মহাশূন্যের আর্ত-অস্তিত্বতা। কিন্তু তিনি এসবের ঊর্ধ্বে ওঠার মন্ত্রে দীক্ষিত। পথের নিশানা জানেন—

সামনে পুরন্ত নদী খরস্রোতা
জলস্রোত হৌদ্রের ঢেউ
ফেনা উঠছে সুবর্ণমুখী পদ্ম।

এখানেই শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের সার্থকতা। এখানেই তিনি সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা-পাঠকের সঙ্গে অভিন্নিত্ব ও সাযুজ্যিক। তিনি যে অভিপ্রায় কবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাই বর্তমানের মনে রাখবার মতো।

সাময়িক ও পত্র-পত্রিকা

রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৬)—সম্পাদক। প্রফুল্লকুমার মল্লিক। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা—৭। দাম। এক টাকা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণপ্রসাদ পট্ট, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মজুমদারধারণ, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনারায়ণ দাস, অমিয়রঞ্জন মল্লিক, অজিতকুমার ঘোষ ও অমলেন্দু মল্লিক। কাব্যগ্রন্থির অন্তরায় উত্তর করার মাধ্যমে সম্পাদক অধিকতর বহুশীল হয়ে পাঠক-পাঠিকার উপলব্ধ হবেন।

দি ইণ্ড-ইরেন (অক্টোবর ১৯৬৯)—সম্পাদক। কিরণশঙ্কর পাল। দি কিরণ, কলেজ, উত্তরপ্রদেশ। দাম। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক পত্রিকা। প্রকৃতে উদীয়মান সূর্যের ছবি—জ্ঞান ও বিকাশের প্রতীক। প্রচ্ছদ বিষয়ে আকর্ষণী। লিখেছেন। বটকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এ কে সিনহা, পাহাড়ী পাল, এ কে ঘোষ, এম এল শ্রীবাস্তব, কে সি পাল ও সি পি শ্রীবাস্তবরায়। সম্প্রতিকালে ধর্ম-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। কয়েক করে আছে

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

— ছয় —

অমরেশের মুখে কিছু ক্ষণ কোনো কথা যোগাল না। সংবাদটা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, প্রায় অভাবনীয়। ডাক্তার ভৌমিককে দেখল। ডাক্তারের মুখখানাই যেন পাল্টে গেছে। বিস্ময়ে চোখ দুটো বড়-বড়। রক্তশূন্য ঠোঁটের মুখটা ছোট্ট এতটুকু, ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। হাতের ফাইলটা যেন ভারে কাঁপছে। মুখের এই প্রশ্ন তাকানো, ছাই-রঙা হয়ে যাওয়া দেখেই বোঝা যায় ডাক্তার ভয় পেয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে অমর কথা বলল,— মানে, আপনি কি বলতে চাইছেন? তার কণ্ঠস্বর কাঁপা-কাঁপা শোনাল।

ডাক্তারের দৃষ্টি সহকারীটির অনেক বড় অমরেশের মুখের উপর ফোকাসড্ করেছিল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে সে বলল—অ্যাকসিডেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই রিপোর্টটা দিয়েছে। অবশ্য ডেড-বডি পরীক্ষা করে আমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল ডাক্তার বলে। কথাটা আমি আপনাকে ইঙ্গিতও করে বলেছিলাম।

—কি কথা বলুন তো মিঃ সান্যাল? অমর ভাঙাগলায় বলল, তাকে খুব চিন্তিত এবং চঞ্চল দেখাল।

ওর ভাবভঙ্গি দেখে ডাক্তার মনে-মনে হাসল। লোকটা ভোগাচ্ছে। সে বলল,— খারাপ হবেন না ডাক্তার হয়। সমস্ত কথা আপনার সামনে আলোচনা করব বলেই আমি এসেছি। ডেড-বডি দেখে আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। মিসেস বসুর বাঁ দিকের দাঁতগুলির একটা উপরে আমি একটা ছোট্ট লক্ষ্য করি।

—কেন?' অম্বর প্রশ্ন করল।

রাজীব বলল,—হ্যাঁ। শরীরে জ্বর ওঠাটাই স্বাভাবিক। তবে চামড়ার নীচে রক্ত জমে একটু অস্বস্তি বোধ হয়। মিসেস রায়ের বাঁ পায়ের মোক্ষণিক কিছুটা উপরে আমি তেমনি একটা দাগ লক্ষ্য করি। ব্যাপারটা তখন আমার কাছে পরিষ্কার হয় নি। এখন ফরেন্সিক লাবরেটরীর রিপোর্টটা পেয়ে সন্দেহের নিরসন হল।'

অম্বরের মুখটা এবার কালো দেখাল। আকুলভাবে সে বলল,—প্লীজ ইন্সপেক্টর। আপনি আর একটু খুলে বলুন। ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? আপনি কি মনে করছেন?'

রাজীব ঈষৎ হাসল। ধীরে-ধীরে সে বলল,—আমি অনেক কিছু ভেবে ফেলি ডাক্তার রায়। অনেকগুলি দিকের দিকে চিন্তা করি। সব কথা আপনাকে এখনই খুলে বলতে চাই না। তবে আমি জানে যা বলেছি, ব্যাপারটা ঠিক তাই। নীলা দেবী আত্মহত্যা করেন নি। তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

—নীলা খুন হয়েছে?' অম্বর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল,—কি বলছেন আপনি?' সে ফের বলল।

—ঠিকই বলছি ডাক্তার রায়।' রাজীব জোরের সঙ্গে কথা কইল। 'ব্যাপারটা এখন আর ঘোরাতে নেই। কাজের মত স্বচ্ছ, দিবালোকের মত পরিষ্কার। যে খুন করল তার দুষ্কৃতির তারিফ না করে সাধ্য উপায় নেই।'

অম্বর 'বড়-বিড় করে বলল,—খুন? নীলা খুন হল?'

রাজীব বলল,—পায়ের মোক্ষণির ঠিক উপরে একটু পাশের দিকে সরীসৃপ জাতের একটা প্রাণীর দংশন-চিহ্ন অনেকেরই চোখে পড়ে। সবাই ওর নাম জানে না। 'কিন্তু আপনি নিশ্চয় ওর পরিচয় জানেন ডাক্তার রায়?'

অম্বর মুখ না তুলেই বলল,—জানি। ওটা সাপেনাস ভেন। ডাক্তারেরা অনেক সময় সাপেনাস ভেনে ইঞ্জেকশন পুশ করেন।'

—আপনি ঠিক বলেছেন।' রাজীব ওকে সমর্থন করল। 'এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারই ঘটেছে। মিসেস রায়কে মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে ডাক্তার রায়। ইন্টাভেনাস ইঞ্জেকশন এবং সম্ভবতে সাপেনাস ভেনেই তা পুশ করা হয়েছিল।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল—বেশ ডোজ ডোজে মরফিন দেওয়া হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। নইলে এত তাড়াতাড়ি হৃদয় স্তব্ধ হত না।'

—মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে নীলাকে খুন করা হয়েছে?' অম্বর অস্বাভাবিক মত কথা বলছিল। — 'কিন্তু কেন? কে খুন করল?'

ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল,—ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি আপনাকে করতে চাই ডাক্তার রায়। নীলা দেবীকে কে খুন করল? কেন খুন করল?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে সে অম্বরের দিকে এগিয়ে ধরল। কিন্তু অম্বর মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। বলল,—এখন থাক। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না।'

রাজীব আর জোর করল না। প্যাকেট খুলে নিজে একটা সিগারেট নিল। লাইটার বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল।

অম্বর বলল,—আপনার অনুমান অবশ্য আমি কেমন করে মেনে নিই বলুন? নীলা কেন খুন হল? কে একে খুন করল, এর কোনো কূল-কিনারা আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না। সবচেয়ে ব্যাপারটাই আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছিল মত হচ্ছে।'

রাজীব ধীর স্বরে বলল, — আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ডাক্তার রায়?'

—সন্দেহ?' অম্বর আপনমনে চিন্তা করল। সম্ভবত কথাটা সে ভাবছিল। হাত কপালে দু-তিনটি কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। মাথার চুলে একবার অঙ্গুলেতোয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে অম্বর বলল,—আমার মেজাজ সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

একটু হেসে রাজীব সিগারেটে ছোট টান দিল। তার পর মুখ নিয়ে কিছু ধোঁয়া বেরোল। দু কুঞ্চকে রাজীব বলল,—সন্দেহ করবার মত কাউকে না পেলেই কিন্তু সুবিধা। লোকে তখন আপনাকেই সন্দেহ করবে ডাক্তার রায়।'

—আমাকে?' অম্বর একটা আহার জলির করল। খুব ভয় পেলে মুখের চেহারা যেমন বদলে যায়, তেমনি পরিবর্তন মুখে অম্বর লক্ষ্য করল। হাত পরার সময় যেন নয়ন এবং ছিপছিপে মনে হল। অম্বর বলল,—আমাকে কেন আমাকে সন্দেহ করবে ইন্সপেক্টর?'

রাজীব মেঘ হাসল। — 'এর উত্তর তো অনেক সহজ ডাক্তার রায়। আপনার সঙ্গেই মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়,—ইন্টাভেনাস ইঞ্জেকশন, এবং পরে মাথার বালিশের ঠিক পাশেই খুনের ওষুধের একটা 'অ্যাম্প' ফেলে খুনী সরে পড়ে। ফোলডারটি চেয়ারার। খুনের সমস্ত পরিকল্পনাটাই নিখুঁত, সুপরিচ্ছন্ন সাজানো। ঘরে ঢুকে একজনকে ডাক্তারের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নীলা দেবী খুনের বড়ি খেয়ে সুইসাইড করেছেন। দেবী ডাক্তার স্লিপিং পিল খেয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল,—খুন আর করে না। কিন্তু পরে জানা গেল এটা হোমিসাইড,—সুইসাইডের কেস নয়। মিসেস রায়কে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে খুন করা হয়েছে।'

অম্বর মুখটা ফুলাতে চাইল। 'কিন্তু এর মধ্যে আমাকে কেন জড়ানো হবে? খুনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি তো সমস্ত রাত হাসপাতালে ডিউটি দিয়েছি।'

—ইয়েস ডাক্তার রায়। রাত্রে আপনি ছিলেন না। হাসপাতালে ডিউটি দিতে গিয়েছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি জোরাল যুক্তি এম সিদ্ধান্তই তা আপনার সপক্ষে যাবে। পুলিশ যদি আপনাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করে, তাহলে এই অনুপস্থিতির জন্যই হয়ত আপনি বেকসুর খালাস পাবেন। মানে, ইট ইজ টু এ কেস তা হলে আপনিই কি খুন করেছেন?'

অম্বর চিৎকার মত আকাশ। কদ্ধে মুখ করে সে বলল,—পুলিশ কি আমাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করতে চায়?'

রাজীবের দৃষ্টি শাণিত, ধারাল হল। মুখ গম্ভীর দেখাল, ইচ্ছে করলে আপনাকে অবশ্য এখনই অ্যারেস্ট করা যায়। মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে নীলা দেবীকে খুন করা হল। যে খুন করল সে নিশ্চয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যাপারটা জানে। ইন্টাভেনাস ইঞ্জেকশন দিতে পারে। আপনি মেডিক্যাল-ম্যান। এটা জানেন তো, মিসেস রায়কে খুন করতে অবশ্যক অন্ত-পক্ষে দুটো ইঞ্জেকশন আপনাকে দিতে হয়েছে। এক-পুলিস ইঞ্জেকশন জোগাড় করা সাধারণ লোকের কর্ম নয়। আপনি নিজে চিকিৎসক এবং তিনি খুন হয়েছেন তিনি আপনার সহধর্মিণী। সুতরাং এই কেস আপনাকে একজন সন্দেহভাজন ভেবে আরেস্ট করতে বাধা কোথায়?'

অম্বরের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই রাজীব চুপ করল। তাহার যেন নাড়ীজ্ঞান হয়ে গেছে। হেমন্তের মুখ। আলো-ছায়াময় চলচ্চিত্রে দৃষ্টি। ডাক্তার-খাওয়া জানোয়ারের মত লোকটা ফুঁসছে গর্জাচ্ছে। কিন্তু ওকে চাঙা করা প্রয়োজন। নইলে কে হবে তার পথ-প্রদর্শক? খবর-খবর করে মুখ থেকে সরতে হবে?

সিগারেটটা পুড়ে যাই। রাজীব সেটি ফেলে দিয়ে এক গাল হাসল। অম্বরের দিকে তাকিয়ে বলল,—কিন্তু ডাক্তার রায়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আরেস্ট করা যুক্তে যাক, পুলিস আপনাকে একটি খুনী আসামী বলে ভাবতেও চায় না। আপনার কাছ থেকে আমরা হেল্প চাই ডাক্তার রায়। পুলিসের সঙ্গে আপনি সহযোগিতা করুন।'

—'হেল্প? সহযোগিতা? আপনি কি বলতে চাইছেন ইন্সপেক্টর? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' অম্বর তোতার মত তাকিয়ে রইল।

রাজীব আবার হাসল। অম্বরের এই স্বাভাবিক হেসে সে বলল,—সহযোগিতা

আজ আপনাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না। পুলিশ আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চায় তারার হয়। আপনি যদি মন খুলে কথা বলেন, তাহলে আমি একুনি মুক্ত করতে পারি।'

ভদ্রলোক মানুষ দেখে সামনে একটা কিছু থাকলে সেটাই দু হাতে আঁকড়িয়ে ধরে, অন্তত ঠিক তাই করল। ঐশানিক মত গলাটা রাজীবের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল,—'কি বিষয়ে কথা জানতে চান বলুন? আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি।'

রাজীব মনে-মনে হাসিল। তার অনুমান পরীক্ষা করা হয়েছে দেখে সে খুশী হল। চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে রাজীব বলল। সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ধরে ধরে মৃদু মৃদু করল।

—'কিছু মনে করবেন না অনুরোধ রইল। আমি ইতর একটু, অভিজ্ঞতার চর্চা করছি।' রাজীব যেন ভনিতা করেই মৃদু হাসল। সিগারেটের একটা ছোট টান দিয়ে সে পুনরায় বলল,—'অবশ্য আমা উপায় নেই। খুব আবশ্যক না হলে একান্ত বাধ্যতা এবং সৌজন্যটা এই প্রসঙ্গে আমি কখনও তুলতাম না।' অম্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে রাজীব ধীরে-ধীরে বলল,—'আমার প্রশ্নটা নীলা দেবীর সম্বন্ধে। আপনাদের বাল্যজীবন এবং আপনার বিবাহের আগে কিছু জানবার আছে।'

—'বলে ফেলুন। কি জানতে চান বলুন?' অম্বর প্রায় পরীক্ষার্থীর মত কথা বলল।

—'আপনাদের বিবাহ কত দিন আগে হয়েছিল?'

—'মাসখানেক উত্তর দেওয়ার মত মুখে ছিলেন অম্বর বলল,—'সাত বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি।'

—'বিয়ের পর থেকে মিসেস রায় আপনার সঙ্গেই থাকতেন তো?'

—'আজ্ঞে হাঁ। অবশ্য বিয়ের পর প্রথম দিকে এ একটু, বছর-খানেক বাপের বাড়ি থেকে। একমাত্র মেয়ে বলে-পড়েছে মিস কিন্তু মাস-খানেক বাপের বাড়িতে থেকে এসেছে। তারপর আমার ঘন্টা-দাড়ি বাঁধা

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

[illegible]

সেবেন। সেও আমার বিয়ের বছর দু-এক আগেই। বাস, বাপের বাড়ি যাওয়া ওর এক রকম বন্ধ হল। মাঝে-মাঝে অবশ্য কলকাতায় যেত। কাকার বাড়িতে দু-এক মাসির কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

—'আচ্ছা, এখানে তো আপনি বছর-খানেক হল এসেছেন?

—'ঠিক এক বছর নয়, তার একটু বেশীই হবে। আমি হাসপাতালে জয়েন করি লাস্ট এপ্রিলে।'

—'এর আগে কোথায় ছিলেন?'

—'কোলাঘাটে। আমা ছেলেবেলা সেখানে। তার দু বছর ছিলাম। ওখান থেকেই পলাশপুরে ট্রান্সফার হই।'

—'আচ্ছা তা হলে, বিয়ের পর থেকে এই সাত বছরে আপনাদের কোনো ইসুয়ে হয় নি?' রাজীব প্রশ্ন করল।

অম্বর আস হাসল। দু-এক সেকেন্ড পরে সে বলল,—'আমাদের বিবাহিত জীবনে ওটাই প্রথম ট্রাজেডি মিঃ সান্যাল। নীলা দেখতে সুন্দরী ছিল বলে মেয়েরা ওকে নাকি হিংসে করত। একটা কথা এরা জানত না। বাইরে থেকে আমার স্ত্রীর সুঠাম সরীর এবং মেয়ের সম্পূর্ণতাই সকলের চোখে পড়ত। কিন্তু ওর ভিতরটা ছিল ঠিক বিপরীত। ছোট মেয়ের মত অপরিণত, অসম্পূর্ণ। এবং এই অসম্পূর্ণ ওর পক্ষে মা হওয়া কোনদিন সম্ভব হত না ডিসপেনসেরীর।'

রাজীব দুঃখ প্রকাশ করল। বলল,—'নীলা দেবী একথা জানতেন আমার মনে?'

—'হাঁ, সে জানত। কলকাতার স্পেশালিস্ট দেখিয়েছিলাম। তাঁরাই আমাকে বলেছিলেন। নীলাকে কাজেও গোপন করেনি।'

এই নিয়ে মেয়েদের মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না আমার মনে?'

—'কিছু ছিল?' অম্বর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল—'কিন্তু মনে হয় অবশ্যেও নীলা তা কখনও প্রকাশ করেনি। ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে ছিল মিঃ সান্যাল। কারো কাছে অন্তরের দীনতা প্রকাশ করতে চাইত না। এমন কি আমার কাছেও সংকোচ বোধ করত।'

—'তাহলে সন্তান না হওয়ার জন্য আপনাদের দাম্পত্যজীবনে যৌনমিলন অসম্ভব হত ওঠেনি?'

—'না।' অম্বর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল। বলল,—'আমি নিজে সাবধান। এমন যেন আমি। মেয়ের ভিতরে যদি কোনো খুঁত থেকে যায়, তার জন্য মানুষ দায়ী নয়। অনিচ্ছাকৃত হলেও তা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়াই শিক্ষিত মনের পরিচয়।'

—'এ কথা ঠিক।' রাজীব সম্মতি জানাল। একটু চিন্তা করে সে বলল,—'নীলা দেবীর থিয়েটার-নাইকের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাই না আমার মনে?'

—'হাঁ, আমি শুনেছি বিয়ের আগে একটা অমেচার থিয়েটার ক্লাবে ও মাঝে-মাঝে যেত। নিজেও প্রায়ের মেজাজও হয়েছিল।'

—'বিয়ের পরে তাদের সম্পর্ক কেমন যোগাযোগ ছিল?'

—'আমি ঠিক জানি না।'

—'পলাশপুরে এসেই উনি থিয়েটার-কর্তৃক নিয়ে মেতে উঠলেন, তাই না?'

—'হেসে, সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি। পলাশপুরে এসে নীলা কলেজে ভর্তি হতে চাইল। বিয়ের আগে ও থ্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় পাশ করেছিল, তিনটা কোর্সে আর ভর্তি হয় নি। পড়ার কলেজে ভর্তি করতে আমার খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু নীলা এমন জিদ ধরল যে, আমি রাজি না হয়ে পারি নি। অনিচ্ছুক হলেও অবচেতন মনে আমি এমনি কিছু চেয়েছিলাম। ছেলেপুলে না হওয়ার জন্য নীলার মনস্তত্বে একটা শূন্যতা ছিল। ও যদি লেখাপড়া করে শূন্যতাকে কিছু আগে পূর্ণ করতে চায় তাতে আমি বাধা দেব কেন? আমার সঙ্গে মিশেই নীলা একদিন কলেজে ভর্তি হল। ইতিহাসে অনার্স নিল। পড়াশুনোর সুবিধে হবে বেশ একজন প্রফেসরের কাছে সপ্তাহে দুদিন টিউশনি পড়বারও ব্যবস্থা করে দিলাম।'

কথার মধ্যেই রাজীব বলল,—'কিন্তু অনার্সের ছাত্রী হয়েও থিয়েটার-নাইকের উপর ওর ঝোঁক বেড়ে গেল কেন?'

—'তার কারণও আপনাকে বলছি। অভিনয়ে নীলার বরাবরই আগ্রহ। আমি যখন গ্রামের দিকে ছিলাম, তখন ছোট ছেলে-মেয়েদের লিখিয়ে-পড়িয়ে ও যেন সুখের কারণ করত। কলেজে ঢুকেই নীলার খ্যাতি হল। ওদের থিয়েটার হয়। ছেলে-মেয়েরা মিলে অভিনয় করে। বইটার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু নীলার অভিনয় দেখে সবাই খুব প্রশংসা করল। মাস কয়েক পরে কলেজে ফের থিয়েটার হল এবং সেবারেও নীলা একাই আসর মাত করল। অভিনয়ে কেউ ওর ধারে-কাছে যেতে পারে নি।'

রাজীব মৃদু হাসল। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে বলল,—'আপনারটা বুঝতে পেরেছি। তারপরই বোধহয় উনি টাউন ক্লাবের থিয়েটারে পার্ট নিলেন?'

—'ঠিক বলেছেন। কলেজের ও অভিনয় দেখে অনেকেই প্রশংসা করে। তাই টাউন ক্লাবের নাইকে ওর ডাক পড়ল।'

—'সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে রাজীব অনেকক্ষণ চিন্তা করল, তার চোখের দিকে তাকিয়েই অম্বর বুঝতে পারল। মানুষটা গভীরভাবে কিছু ভাবছে। অনেক-ক্ষণ পরে রাজীব কথা বলল, 'আচ্ছা আমার ধারণা, মিসেসকে টাউন ক্লাবের নাইকে নামতে দিতে আপনি আপত্তি করেন নি?'

'আপত্তি! মানে,—' অম্বর চোক গিলল। মৃদু হেসে রাজীব বলল,—'ডোমেস্টিক এবং বাহ্যিক আপনার মনেও আমার কাছে তা লুকোবেন না আমার ধারণা, তাতে আপনারই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।'

—'না, না। লুকোব কেন?' অম্বর তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু তবু তার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা এবং সংশয় প্রকাশ পেল।

রাজীব বলল, — 'আমি জানি ডাক্তার রায়, ঠাঁই ক্লাবের নাইকে নীপা দেবীকে আঁকবার জন্যেই আপনি দিতে চান নি। আপনার সম্পূর্ণ অমতেই মিসেস এ কাজ করেছিলেন।'

অম্বরকে খুব বিশ্বিত মনে হল। মুখ তুলে সে বলল,—'একথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

রাজীব একটুও চঞ্চল হল না। অম্বরের চোখের দিকে সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'আমি আরো একটা ব্যাপার জানি ডাক্তার রায়।' একটু থেমে সে যোগ করল, —'নীপা দেবী কিসের ব্যাপারে ফেরেবিলেন। এবং স্থীকে সিনেমায় নামতে দিতে আপনি রাজি হন নি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি হয়েছিল।'

অম্বর হাত নাড়িয়ে উঠল। 'সিনেমায় নামার কথা আপনাকে কে বলল মিঃ সান্যাল? এ নিশ্চয় সেই আঁকিয়ে সমাদ্দারের কাজ। বজ্জাতটা ছিনে-জোঁকের মত আমার পিছনে লেগেছিল। খালি বলত, প্রতিভাকে তার বিকাশের পথ করে দিন। নইলে শিল্পীর অপমৃত্যু হবে। শেষ পর্যন্ত ওর কথাই ফলল ইন্সপেক্টর। লোকটা পাজী,—এক নম্বরের শয়তান।'

বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে রাজীব বলল—'ডঃ বনাল থাকে কোথায় জানেন?'

অম্বরকে খুব উত্তেজিত মনে হল। 'কোথায় আবার থাকবে? সিনেমা-থিয়েটার করে বেড়ায়। ওদের কি ঠিকঠিকানার ঠিক আছে? এখানে শুনেছি দেবরাজ ঠিকাদারের বাড়িতে থাকত। দুজনে একেবারে হরিহর আত্মা।'

—'দেবরাজ মিত্তও কি আপনার বাড়িতে আসত?' রাজীব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

মুখ নামিয়ে অম্বর বলল,—'এসেছে দু-একবার।'

—'একটা কথা বলব ডাক্তার রায়?' রাজীব রহস্য করে তাকাল। 'সুন্দরী স্ত্রী হলে স্বামী বেচারার এক জ্বালা। মনে সোয়াস্তি নেই—নানা রকম সন্দেহের আনাগোনা। আমার চুলগুলো ও তাই। নীপা দেবীর হাবে-ভাবে, ব্যবহারে আপনার মনে কখনও সন্দেহ দানা বেঁধেছিল?'

অম্বর নিরুত্তর।

রাজীব বলল,—'চুপ করে থাকবেন না ডাক্তার রায়। পরিকল্পনা করে, কাঁদ এঁটে হত্যা করলে খুনীকে ধরা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই কেসে খুনী অবশ্যই চতুর। বুদ্ধি-প্রভ দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই আমার বিশ্বাস। তার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় এঁটে উঠতে হলে, আমাদেরও কৌশল চাই। ফাঁদ তৈরি করতে হবে। কাজেই আপনি আর সঙ্কোচ করবেন না। পরিষ্কার করে সব কথা বলুন।'

রাজীবের কথার মন্ত্রের মত কাজ হল, অম্বর মাথা নীচু করে ছিল। এবার সোজা হয়ে বসল, 'আমি সব কথা বলব ইন্সপেক্টর। কিন্তুই গোপন করব না।' সে খাড় সোজা করে তাকাল। এদিকে-ওদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অম্বর গলা নামিয়ে বলল, 'আমি আঁকিয়ে হিসেবে ইন্সপেক্টর, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ওর মাখামাখি, ঘনিষ্ঠতা আমার বুকে কাঁটার যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। দিনে-দিনে আমার সন্দেহ বাড়ছিল। সত্যি বলছি, এমনিভাবে চললে, হয়ত একদিন ওকে আমি গলা টিপে মারতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ সান্যাল, নীপাকে আমি খুন করি নি। ওকে মারবার ইচ্ছেকল্পনা নিয়ে আমি যাই নি।'

রাজীব আশ্চর্য হল। ডাক্তার পাগল হল নাকি? উত্তেজনায় চোখে এর জ্ঞান-জ্ঞান লোপ পেয়েছে। মনে যা আসছে তাই বলছে। নইলে খটকে খুন করবার ইচ্ছে হয়েছিল, এমন কথা কেউ পুলিসকে বলে?

—'কার সঙ্গে মিসেস রায়ের সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'বলতে পারি। সে ছোকরা এই কলেজেরই প্রফেসর। নাম নীলাদ্রি সেন। থিয়েটার রোডে নাকি ডিরেক্টরি। নীপাকে মাসিকার হোলে ওই নামিয়েছে।'

—'আই সী।' রাজীব সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, 'আর দেবরাজ মিত্ত? তার সঙ্গেও তো নীপা দেবীর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল?'

—'নিশ্চয় ছিল, দেবরাজই তো এই বইয়ের হিরো—'

—'তাই নাকি?' রাজীব একটু হাসল, 'তাহলে হিরো-হিরোইন আর ডিরেক্টর। আপাতত তিনজনকে পাওয়া যাচ্ছে, আর একজন হল আঁকিয়ে সমাদ্দার। লোকটা নীপা দেবীকে ফিল্মে নামাতে চেয়েছিল।' রাজীব ঠিক অঙ্ক কষবার মত হিসেব করল।

বাঁ হাতের করতলের সাহায্যে কপালটা চেপে ধরে রাজীব যেন বলল,—'আচ্ছা, মিসেস রায় তার কাছে পড়তেন?'

—'হিস্ট্রির প্রফেসর অনিমেষ বক্সীর কাছে। সেও একটি চীজ। অল্পতে মেজাজ গরম হয়ে যায়। এখানে বেশীদিন টুইশনি করে নি। অনেকে ফিরেছে, অনিমেষ বক্সী পড়াতে রাজি হয় নি। অথচ আমরা একটু চেপে ধরতেই লোকটা একবার নীপার মুখের দিকে তাকাল। আর তারপরই পড়াতে রাজি হল।'

একটু হেসে রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'এখন চলি ডাক্তার রায়, বিকেলের দিকে আমি একবার আসতে পারি। আপনি কি তখন থাকবেন?'

—'নিশ্চয় থাকব।' অম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কিন্তু আবার আসবেন কেন?' তার কণ্ঠস্বর সাঙ্ঘাতিক, ঠাণ্ডা মনে হল।

রাজীব কথা বলল না। ওর ভীত, নার্ভাস মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ইতস্তত করে অম্বর কথাটা বলল,—'পুলিস কি আমাকেই খুনী বলে সন্দেহ করছে?'

রাজীব জোর হাসল। লোকটা ভীষণ দুর্বলচিত্ত আর ভেতরে ভেতরে। সে বলল, —'সন্দেহ করা খুব সহজ কাজ। পুলিস আর ডাক্তারের আপনার কি আসে যায়? একটু থেমে আবার বলল রাজীব,—'সন্দেহ করা সহজ হলেও অভিযোগ প্রমাণ করা খুব কঠিন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতই দুরূহ কাজ। সুতরাং চিন্তা করবেন না।'

●

আফিসে ফিরে রাজীব দেখল চাঁদ-মনকে নিয়ে সুব্রত অপেক্ষা করছে। কাল রাত্তিরেই ওকে নির্দেশ দেওয়া ছিল। সুব্রত ঠিক ডিউটি করেছে।

লোকটার মাথার চুল বিপর্যস্ত কাক-ক্ষেতের মত উস্কোখুস্কো। শুকনো অসহায় মুখ। ভীত, সন্ত্রস্ত চাউনি। দেখলে মনে হয় লোকটা পুলিসের হেফাজতে নেই। একে অন্যায়ের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে।

ফোন করার ভূমিকা না করেই রাজীব বলল,—'নীপা দেবীকে আপনি চিনতেন?'

'নীপা দেবী মানে নরেশবাবুর ভাইঝি তো?'

—'হ্যাঁ, ওকে আপনি আগে চিনতেন?'

—'চিনতাম মানে কি—' লোকটা আমতা আমতা করল।

—'মনে-টনে রেখে যাহোক কথা বলুন।' রাজীব ধমক দিল।

—'বলছি হুজুর।' লোকটা সজাগ থাকল, 'নরেশবাবুর ভাইঝিকে দুচার-বার দেখেছিলাম।'

—'কোথায়?'

— —'স্টেশনের ভিতর,—মানে কি পাড়ির ব্যাপার।'

রাজীব ভুরু কুঁচকে তাকাল।

চাঁদমনের বলল,—'ভাবলেশশূন্য মুখে কথা কিছু বলছে। মিথ্যেকথার ঝাঁপি আছি,—সব কোই উঠবে মনে। আমি একেবারে ঘাবড়ে গেলাম। আউট অফ স্টেশনারে নরেশবাবুকে ভাইঝি জামাকাপড় উঠিল। উল্টে কি সাথ এক ছোকরা। আমি ভেবেছিলাম কি, ফোনো হাজ-ব্যাণ্ড টাণ্ড ওরাইফ হবে। পাড়ি ছাড়িল। ও লোক ঘাবড়াচ্ছিল খুবে আমার। ভোরাঁকি ডা ভিতরে মিনি-মিনি হাঁকি। পাপ্প আর ডাকু ব্যাপারী। আমি বড়লে আমি সবকিছু পারি। ভোঁকিল ঘাবড়াচ্ছিল আমে চাকি ভো ডাক্তার হুজুর। মানুষে সমান কি ও লোকে হাজ-ব্যাণ্ড-ওয়াইফ সাজি হয়। ফোনো ভেদ লাভের ব্যাপার হুজুর।'

উৎসাহ দিয়ে রাজীব বলল,—'তারপর?'

'ট্রেন ছাড়ল? সেই কথাই তো বলছি হুজুর। ভাবা খালী যায় ছাড়ি একজন যাত্রীকে খুজলাম। দরওয়াজা বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মনে কি হল হুজুর। দরওয়াজা খোলা খুলে আমি দেখলাম—'

—'কি দেখলেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'মানুষ মরলে কি যায় হুজুর?' লোকটা মুখে আতঙ্ক ভাষা দিয়ে সন্ত্রস্ত-ভাবে তাকাল।

—'বলে ফেলুন চটপট। দেরি করছেন কেন?—রাজীব ধমক দিল।

এক পলক থেমে চাঁদমন বলল,—'দেখলাম কি ও লোকটা নরেশবাবুর ভাইঝিকে কিস্ করছে হুজুর।' চেয়ারে

রামকৃষ্ণদেব ও কল্পতরু উৎসব

তারানন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসে — বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসই কেন এত উজ্জ্বলতর অধ্যায়। একেবারে পরবর্তী অর্ধশতাব্দ অর্থাৎ এই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তো বটেই, আমরা-অর্থাৎ ভারতবর্ষ বহুদেশ কখনও এই শতাব্দীর ইতিহাস অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ঐতিহাসিক অধ্যায় সৃষ্টি করার মত ঘটনাবলী ঘটাতে কিনা বা এই শতাব্দীর মধ্যে এক বহুদেশ—কোনও দুই কোনদিনও দুই দুইয়ে চারের মানুষে—এত ঘটনাবলী ঘটাল, তা অবিশ্বাস্য হবে কিনা এ সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তন বা অনুরূপ—বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব সমারোহ। এ ঘটনার পুরোধা ছিলেন রামমোহন রায়।

হয়তো বা আরও আগে—হয়তো সেই মহাকবির ও মহাবিপ্লবের অভিপ্রায়ের আর একটি ধারা বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল; এই ধারা বা পরিবেশ ঠিক বিপ্লবাত্মক ছিল না—ছিল সমাজোন্নয়নের একটি মৃদু প্রচেষ্টা।

সতীদাহ প্রথা রহিত আন্দোলন বা বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায়, বাংলার রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজ অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে চণ্ডীমণ্ডপের বেদীতে সমবেত হয়ে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন তাকে ক্রিয়ার সৃষ্টিতে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদ্যম বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আকস্মিকভাবে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাত সংঘর্ষের মধ্যেকার সব অসামঞ্জস্যের আদর্শ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরম মহাসমন্বয়ের পুরুষ রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের ঘটনাটির মূলে এই বিশ্লেষণে নির্ণয় করা যায় না।

রামমোহনের সাধনার ফল মহর্ষির জীবিতনাথ। এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার সৃষ্টি যাঁর সাধনার স্বামী বিবেকানন্দ। এই দুটি তথ্যকে সম্মুখে রেখে বিচার বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলতেই হবে যে রামমোহনের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত এক এক দুই—দুই একে দুই—দুই দুইয়ে চার এই অঙ্কের ধারার কোনখানে কোন ব্যতিক্রম হয় নি। সেখানে দুয়ে দুয়ে চারের নিয়মে মালার গাঁথা যায় না সেখানে দুয়ের নিয়ম নাই। রামমোহনের কাল থেকে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো যায় অঙ্কের নিয়মে। কিন্তু বড়বাড়ীর ছেলে অক্ষেপনাথ ও অক্ষেপনাথ থেকে বিবেকানন্দে পৌঁছানো অঙ্কের নিয়মে হয় না বা যায় না। এ এক পরম রহস্য; আশ্চর্য না বলে ইচ্ছা করেই পরম শব্দ ব্যবহার করলাম। যাঁরা রামমোহনের সন্তান, নিশ্চয় তাঁরা ঠিক সুখবুদ্ধি বা সহজবুদ্ধি নন—তা বলে কেউ যদি বলে অকুবুদ্ধি তাহলে আপত্তি অবশ্যই করব এবং কেন অকুবুদ্ধি কখনই নয় তার বিস্তারিত বিশ্লেষণও দিতে পারব। নিশ্চয়ে বলতে পঞ্চদশাক্ষরও অসামান্য—কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে এই ঈশ্বরচন্দ্র সারাজীবন ধরে যা বললেন, বলে গেলেন তার সবই মানবকল্যাণের কথা এবং পরমতত্ত্বের বার্তা। অন্ধ অতিসাহস আত্মসরল এতখানি সহজ হয়ে ঈশ্বরের মানবজীবনের গ্রন্থি মোচিত হয়েছে এই কথার মধ্যে। আরও আছে—কোথাও পাওয়া নেই অন্ধ অন্ধ, কোথাও বিদ্বেষের নেই, কোথাও অপরিচয়তা বা দূরত্ব নেই; আছে আশ্চর্য মানুষে আশ্চর্য সরলতা এবং পবিত্রতা। বাহ্যিকতা নেই, আড়ম্বরের ছটা ছড়ানো নেই, আছে শিশুর মত সরলতা, কিশোর এবং প্রাণ ভরিয়ে দেওয়া এমন একটা কিছু যার জন্য নিরন্তর মানুষ অভুক্ত এবং উন্মুখ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারও চেয়ে বড় আশ্চর্য এই যে, যে শোকে সান্ত্বনা আনে সেই বিদায় নেই মৃত্যুতে নেই বাঁচিয়ে নেই তেমনি করে শোক নিয়ে মানুষ তাঁর কাছে এসে চোখের জল মুছেছে। সান্ত্বনা পেয়েছে।

এই মানুষটির আবির্ভাবের কথাবার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যদি কেউ সেখানে ভুল দেখতে পাবেন কোথাও অসঙ্গতি নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই একই মানুষের কণ্ঠস্বর, বিশ্বাসের উদ্ভাসিত বাণী, বাণীর ভাষা ও অর্থের মধ্যে সেই এক পরম রহস্যময় পুরুষকে পাওয়া যাবে যিনি জীবনে বিদ্যাভ্যাস করেন নি অথচ সকল বিদ্যাই যেন তাঁর আয়ত্ত। যাঁর কাছে সংশয়ের কোন সমস্যাই নেই সকল সমস্যার সমাধানকে নিয়েই তিনি যেন জন্মেছেন। এমনকি নিজ নিজ ধর্মের শাস্ত্র বা পুঁথিপত্রে আরও ঢোকেন নি, এবং যা নিয়ে সংঘর্ষের ঝড় এবং সর্বনাশা ঘটনাবলীই ভারতের ইতিহাস গড়া করেছে তার সমাধানও তিনি এক কথায় করে গেছেন। বলে গেছেন, যত মত তত পথ। সব পথই সেই পরম তত্ত্বের বা পরম ঈশ্বরে গিয়ে মিলেছে, একটা পুকুরে, যার চার পাশে ঘাট, যে ঘাটেই কুম্ভের জল তুলে পুণ্যার্থিনী হবে আর যে কুম্ভেরই জল থাক সেই এক জলই পাবে এক জল যাবে।

আমাদের দেশের এই মানুষটির কথা-পুঁজি পরে তাঁর জীবনকথা শুনে ফরাসী মনীষী রোমা রলা বিস্মিত হলেন। শুধু বিস্মিত হওয়াই নয় তাঁর মহিমাকে স্বীকার করে তাকে শ্রদ্ধা করলেন।

আমাদের যুগপূর্ব মনীষীরা বিশ্ববন্দিত পণ্ডিত ও দার্শনিক তাঁরা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন—

> "Sree Ramkrishna is the symbol of the message of India for mankind—the message of unity and reconciliation From the beginning of our history many races and many religions met on this sacred Soil. In our Supreme attempt to reconcile them all to make out that the world consists of our people—though different peoples are merely the branches of that one Universal human race. That was the theory to which was given visible embodiment in the life and work of Sri Ramkrishna."

নবজাগরণের চারকোল ঘট কুম্ভকার দৃষ্টি এবং মনীষী রাজাজী (সি রাজাগোপালাচারী) বলেছেন—

> "There is no commentary of the Bhaghat Gita or Upanishads which can surpass the sayings of Ramkrishna Dev. He was the Upanishadas in flesh and blood, he was the Bhaghat Gita in flesh and blood."

এই কারণেই এই মানুষের আবির্ভাব পরম বিস্ময়কর; এঁর আবির্ভাব অনুসন্ধান বিজ্ঞান এবং সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার মানুষের সৃষ্টি এমনকি বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির বিশ্লেষণ আমাদের বাইরে।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় যে চিরস্মরণীয় বক্তৃতা করেছিলেন এবং সমস্ত সমাজিকতাকে পৃথিবীতে বহু ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সম্মুখে সাহিত্যে তাঁকে ঈশ্বরকে ধারণাতীত করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন—সমস্ত বাণীর সমস্ত উৎস ও আকরের উৎস ছিলেন আমার গুরু আমার প্রভু my master.

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে এই একটি ধারার আবির্ভাবকে অবলম্বন করে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় বিভাগ

প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানে অগ্রসর হল; নবজীবন—নতুন ভাব আরম্ভ হল সে জাতে।

বঙ্কিম মহারাজের পর্যায়ে উন্নীত হল।

বন্দুদের মধ্যে ঈশ্বর প্রচারক হয়ে দেখা দিয়ে পূজা চাইলেন।

বন্দুদের বাহ্যিক এবং জাতির সংস্কারগত সাদৃশ্যের ব্যতিক্রমের পরিবর্তন হল। ফলে বিশ্বের তুলসীদল গঙ্গাজল চন্দন সহযোগে নিত্য পূজার ঠেকে যাদের সেবা দরিদ্রের অর্চনা পরিহৃতের বা উচ্চতর পর্যায় বলে অনুভূত ও উপলব্ধ হল। সুতরাং বন্দুর অন্তর্দৃষ্টিতে এই অবিভাবকে পরম আবিভাব বলে স্বীকার করে এই বাহ্যিকের অধো দিয়া এবং অলৌকিক সত্তার আকাশ অনুভব করে নৈবেদ্যের অধো আশ্বাস পায়। বিশ্বাস যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঁকি মেরে বলে, বন্দুদের জগতের সকল প্রমাণাতীত প্রমাণ এইভাবেই যুগে যুগে জাতের অস্তিত্বের পরম আবির্ভাবকে সত্য করে গেছে। অন্ত এই আবির্ভাব তত সহজ ও তত সাধারণ। আবার বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত এর অনন্ত গভীরতা। তাঁর সাতজীবনেই এমন অসাধ্য উঁচুতে সত্যম্ব যায় সবাই তাঁর প্রণম আশীর্বাদে ধন্য ও জীবনের সকল গ্লানি ও জালিমা থেকে মুক্ত ও উজ্জ্বল। প্রতি ১লা জানুয়ারী আসে আর এমনই একটি মহান আশীর্বাদ যেন আকাশ বাতাস থেকে সারা জাতির মধ্যার উপর বর্ষিত হয় মুখর হয়ে ওঠে।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী রোগ-কল্পতরু সেজে সাধারণ বেশভূষায় এই অসাধারণ মানুষটি তাঁর ভক্তদের তাঁর সাধারণ সহজ ভাষায় আশীর্বাদ করেছিলেন—আমি তোদের সকলকে আশীর্বাদ করি তোদের চৈতন্যময় হোক—তোরা বিজ্ঞানময় লাভ কর।

এই সামান্য কটি কথা কত সহজ ও সাধারণ তত প্রশান্ত ও গম্ভীর। এই সামান্য কটি কথায় অভিব্যক্তে তাঁর ভক্তেরা কেমন কেউ কোনোদিন কেউ উন্নাসিত উল্লাসে হেসেছিল, কেউ বা বাকশূন্য হয়ে চেয়েছিল বা হয়েছিল। এই অসাধারণ মহামানব পুরুষটির স্বাভা উন্নাসিত শক্তি-কটির মহিমা ও তীব্রতা কতখানি তা ভক্তদের এই অভিনব আচরণ থেকেই সকল কালেই মানুষ অনুমান করতে পারবে। এবং চৈতন্য ও বিজ্ঞানের ফল যদি জীবনে চরিত্রের মহাপ্রকাশ হয়, তা হলে ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাঙালীর জাতীয় জীবনে চরিত্রে বিদ্যুৎশক্তির আলোর প্রকাশে তা সত্য বলে সপ্রমাণিত হয়েছে। স্বামীজীর আবির্ভাবে যে চৈতন্য-মহিমার উদয় হয়েছে—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তার অস্ত ঘটেছে। এই দুটি চরিত্রের তত সাদৃশ্য। এর দ্বারা এ কথা আমি অবশ্যই বলছি না যে, বাঙালী চরিত্রের এই অভাবের প্রকাশ একমাত্র তাঁর আশীর্বাদেই সম্ভবপর হয়েছিল। আমি বলছি বাঙালী চরিত্র এইভাবে যে মহিমার প্রকাশ হয়েছে তার পশ্চাতের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে যে সাধনা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর অনুবর্তীগণ করেছেন তাকে অন্তরঙ্গভাবে ইতিহাসকে স্বীকার করতে হবে।

প্রমাণ থাক—তার প্রয়োজন থাকে। এখন তিনি যে আশীর্বাদ করেছিলেন তার কথাই বলি। তিনি বলেছিলেন তোদের বিজ্ঞানময় হোক—চৈতন্যময় হোক। যে দানের জন্য যে ভোগের জন্য আমরা প্রাত্যহিক জীবনে জীবনযাত্রার অভ্যাস তাকনার অন্তরে পরিচিত ও তাড়িত অন্ত যা লাভ করলেও সুখ দুঃখ সুখই ভোগ যায় প্রণমের আত্যন্তিক তুলনা নিবৃত্তি হয় না তার ইন্দ্রিত মাত্রও তাঁর এ উক্তির মধ্যে নেই। সেই মহাসাধক সেদিন তাঁর ভক্তদের যে বিদ্যা বর ও বিদ্যা আশীর্বাদ দান করেছিলেন তারই অন্তরঙ্গ প্রভাবের জন্য আজও প্রতি এক সমাজীয় এপারেও তুলসী চন্দন প্রণমের আকৃতি নিয়ে ছুটে আসেন। যে যেমন পারেন অন্তর অন্তরকুম্ভের তীর্থ-বারি ভেঙে আপনার অন্তরের তৃষ্ণার নিবৃত্তি করতে চান। যা নিবৃত্তি করে নেন।

আমরাত্রেই অন্তরকুম্ভের পানীয়ে এই যে তৃষ্ণা-মোচন, এই অন্তরকুম্ভ কি সেই মহাসাধক জন্মমুহূর্তেই বিধাতার চিহ্নিত পুরুষ হিসাবে লাভ করেছিলেন না তাকে দীর্ঘ তপস্যায় আয়ত্ত করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সুকঠিন। কারণ যে তপস্যা ও শক্তি থাকলে এর উত্তর দেওয়া যায় তা আমার নেই, এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করি। তবু এই প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করে আমার সম্মুখে তাকও নিরুত্তর হয়েছে। তবু যার যার মনে হয়েছে হয়তো প্রশ্নের সৃষ্টি আলোই সত্য করে। তিনি জন্মমুহূর্তে বিধাতার চিহ্নিত পুরুষ কালক্রমে কালোচিত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যই তাঁর এই কালোচিত সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল।

তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কে ও প্রভাবে তখন আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও মনের পরস্পর বিরুদ্ধ দুই ধর্ম, সংস্কৃতি ও চিন্তার এক সমন্বিত মূর্তির জন্য সচেতন ও আকুল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম অন্ধবিশ্বাসী, কোনো থেকে তাত্ত্বিকতা, বৈষ্ণব ও শাক্ত-চিন্তা পর্যন্ত বিস্তৃত; মুসলমান ধর্ম তখন হিন্দুধর্মের মতই এই দেশের এক স্থায়ী মূর্তি অধোর ধর্ম; খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তখন নবীনের উদ্যমতা নিয়ে সমারোহে অবতীর্ণ হয়েছে। এই লৌকিক ও আত্মিক পরিপ্রেক্ষিতে এক সমন্বিত মন্ত্র, ধ্যান ও তত্ত্বের জন্য এক মূর্তির উদারতা, এক অন্তর স্পৃহা ও কঠিন সাধনের প্রয়োজন ছিল। এই সমন্বয়ের ধ্যানে তখনও সমস্ত মনীষীরা মগ্ন। অন্তত ঐতিহাসিক তার সম্মুখীন হওয়া মত তাকে একান্ত সহজে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন। আপনার সাধনার মধ্যে এক এক সমস্ত সাধনপন্থাকে গ্রহণ করে অনায়াসে আত্ম স্বাধনপন্থার মধ্যে এক এক সাধনকে সমাপ্ত করে, তার পূর্ণ ফল নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। অথচ মধ্য মধ্য সাধকরা এই এক এক মার্গে সাধনা করে সমস্ত জীবনব্যাপী তপস্যার অন্তেও সেই বিশেষ সাধনপন্থার পূর্ণ ফল লাভ করতে পারেন না। এই পুরুষ সমাধান সাধিকতাকালের মধ্যে সমস্ত সাধনা সমাপ্ত করে আবার জন্মহীনত্ব বাসনের মত সর্বদেবের, যেখান থেকে সাধনা আরম্ভ করেছিলেন সেইখানেই সেই জন্মী ভক্তদীপের অন্তরালে আবার গ্রহণ করে সমস্ত, সমস্তের, একান্ত নির্ভরতার মধ্যে সেই বিভিন্নের সমন্বয়ে সমন্বিত সাধনার শেষ ফল ফলদ ভক্তে উন্নীত করেছিলেন—যা, তথাস্তু যা। এর দ্বারা তিনি জগতের সম্মুখে ধর্মজীবনের এক চরমপথ উন্মোচিত করেছিলেন। অর্ধ-নিমেলিত অথবা সর্বদেবের পূর্ণ প্রকাশে চরিত্রমধ্যে ভাবসংঘের পরিকল্পনার একমাত্র বলিষ্ঠ কাঠি হয়েছিল। এমন মহিমার যে অন্তরঙ্গময় জীবনের প্রকাশ সে প্রকাশের মধ্যে যা অমিতা অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু হয় না যা হতে পারে না।

প্রস্তুতকারক : কিং এণ্ড কোং ৯৮/৬৪ বরাহা পাড়ী রোড, কলিকাতা-৭

পরিবেশক : আর, টি, এস এণ্ড কোং, ২১৭, বিধান সরণী, কলি-৬ ফোন ৩৪-৩৮৩৬

বিম এণ্ড কোম্পানীর (সকল শাখার) ঔষধ বিক্রয় প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে ৩৫ কে গোপালন চালুনিলা সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন।

বিজ্ঞানের কথা

খড়গপুরে বিজ্ঞান কংগ্রেস

একদিন যা ছিল বাংলাদেশে ছিজলী কৃষিশিবির যা আটক-শিবিরহুসে পরিচিত এবং ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যেখানে শহীদ সন্তোষকুমার মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্ত বৃটিশ শাসকের গুলীতে নিহত হন, আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার এক নব তীর্থক্ষেত্র। সে তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। এই নামে আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার যে পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, খড়গপুরের আই আই টি হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। এবছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৭তম বার্ষিক অধি-বেশনের আসর বসেছিল খড়গপুরের এই আই আই টি-র অঙ্গনে, গত ৩-৯ জানুয়ারী।

যেদিন জানুয়ারী সকলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বাগত জানালেন সমবেত দেশী ও বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং প্রতিনিধিদের। তার আগে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আই আই টি-র অধিকর্তা অধ্যাপক এস কে বসু সমবেত সকলকে অভ্যর্থনা জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী বলেন। বিজ্ঞান সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। উৎপাদন ও কর্মের উন্নয়নের সঙ্গেই এর যোগ রয়েছে। দেশ ও দেশের বিজ্ঞানীদের সামনে একই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। তা হল—সম্পদ সীমিত, কর্মপদ্ধতি পুরনো; তবু কাজ চালিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। তাই বিজ্ঞানীদেরও সমাজসচেতনার উন্মেষ ঘটতে হবে। তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ যে দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত, একথা প্রতিটি বিজ্ঞানীকে আজ অনুধাবন করতে হবে। শুধু বিজ্ঞান নয়, প্রশাসনিকারী যন্ত্রগুলিকে এক সঙ্গে গড়ে তোলার কাজেও তাঁদের অবদান চাই।

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন। দেশে বিজ্ঞানচর্চা বাড়ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানকর্মীর মন হতাশায় ভরা দেখা যাচ্ছে। এর জন্যে প্রয়ো-জন বিজ্ঞান সংস্থাগুলির বিকেন্দ্রীকরণ। প্রাথমিক কিছু সাহায্য পাওয়ার পর সেগুলি স্বনির্ভর হয়ে উঠলে সমস্যা সমা-ধানের সহায়ক হবে।

আর একটি বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। তা হল 'অভিসারী মনোভাব' বর্জন। তরুণদের মনে নিজের হাতে কাজ করার আগ্রহ ও তাতে প্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার জন্যে তিনি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন। আজ যেখানে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে, একদা সেখানে রাজবন্দীদের আটক শিবির ছিল। একদা যে প্রেরণা স্বাধীনতাসংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, এখন সেই প্রেরণার আলো সমাজের ভারত গড়তে হবে। এই কাজে বিজ্ঞানী-দেরও সহযোগিতা চাই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডা লালচাঁদ আরোরা এরপর তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন। মান অনুযায়ী পরিভাষা রচনা নিশ্চয়ই একান্তভাবে দরকার। সেই সঙ্গে দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির জন্যে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মান নির্ণয়। তা হলে তা থেকে শিল্প ও বাণিজ্য লাভবান হবে, দেশের অর্থনীতি উন্নত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্য দেশের বিজ্ঞানীদের মতো ভারতের বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি।

এইবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অজিতকুমার সাহা বিশেষভাবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় দেন। এবারের অধিবেশনে এসেছিলেন আন্তর্জাতিখ্যাতির ডঃ এ জি কোরাই সুরিনাম মুক্তেশ্বরিয়ার আকাডেমিশিয়ান ই ভি জামনক এবং আকাডেমিশিয়ান বে ই ভাতা-নক, সিংহলের মিঃ এ এন এস কুলসিংহা,

ডেকোস্লোভাকিয়ার ডঃ জে ঝিকে, হাঙ্গেরীর অধ্যাপক এস সিমাকি এবং অধ্যাপক এ সুনেকর, ডানমের সিলের, সুইডেনের, পোলাণ্ডের অধ্যাপক এম মারেক, ইসরাইলের অধ্যাপক ডি জুডিসেভেস্কু, ডিটেনের লর্ড আলেকজান্ডার ঠঃ, ডঃ এইচ ডি সিরার, অধ্যাপক এইচ ফ্রেনেবল, অধ্যাপক জে হার্ডিসন এবং অধ্যাপক এইচ ওয়ল্ড পিয়ি, ফ্রান্সের ডঃ এম আর কাদের, সোভিয়েত রাশিয়ার ডিঃ ডি এইচ বুনিয়াতিয়ান এবং ডঃ (শ্রীমতী) টি ডি ফেড্চিকোভা, রাশিয়ান মুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক জেমস সিমেরোন। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানী এধিবেশনে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৩রা জানুয়ারী থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের চৌদ্দটি বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন সুরু হয়। সংখ্যাতত্ত্ব, গণিত, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা ও বাস্তুবিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, ইঞ্জিনবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান এবং জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিজ্ঞান এই চৌদ্দটি শাখার সভাপতিগণ তাঁদের ভাষণে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে প্রত্যেক শাখায় আলোচনা চক্র, বিশেষ বক্তৃতা ও গবেষণাপত্র পাঠ হয়। বিভিন্ন শাখায় যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক হেরল্ড সিমরোজার, ডঃ জগদীশ সহায়, অধ্যাপক এম নাথেন্স, ডঃ সি কে ওয়ুইলার, মিঃ এ এম কুলাসিকী, অধ্যাপক ডঃ সি পন্ডিয়ে, অধ্যাপক এম কে সিলম্যান, অধ্যাপক এম কে ওয়ুইলার, অধ্যাপিকা পার্বতী দেবী, অধ্যাপক আর ব্রিবম, অধ্যাপক অর এস মিয়ার্স, অধ্যাপক ডি ডি সিং, ডঃ এস চ্যাটার্জি, অধ্যাপক ডি এস মিয়ার্স প্রমুখ। এছাড়া দেশের ও বিদেশের অনেকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অনেকটি বেতারভাষণ বক্তৃতাও প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী লর্ড আলেকজান্ডার ঠঃ বক্তৃতা দেন 'রসায়নের পরিবর্তনশীল ধারা', ডঃ ডি ডি দামোদরী বলেন, 'দেশের জন্যে একটি বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা', ডঃ ভগবান্ দাস ওবেরয় আলোচনা করেন 'আমাদের মহাসাগর ও পার্শ্ববর্তী পৃথিবী', অধ্যাপক টি এস সত্যমূর্তি বলেন, 'ঔষ্ণিকের আইয়ার ও আইয়ার বাদি,' ডঃ এ এম ঘোষ আলোচনা করেন 'যুগে যুগে মানসিকতা', অধ্যাপক নীলরতন ধর বলেন, 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহযোগিতা,' ডঃ এইচ ডি বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন 'জাতীয়তা গুরুত্বসম্পন্নের অধ্যাপক অধিবেশন,' অধ্যাপক এস কে ভট্টাচার্য বলেন, 'রসায়নিক শিল্পের অফুরন্ত বিভিন্নতার উপযোগিতা,' ডঃ সিলেভ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন 'আমাদের পোড়া-জমি-আজ সিলেনের সাম্প্রতিক অগ্রগতি' এবং ডঃ কে এম আলম বলেন, 'আমাদের জন্য-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে।

প্রতি বছরের মতো এবারও কয়েকটি সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর বক্তৃতা দেন অধ্যাপক এম সলামানী 'মুখরোচক আকর্ষণীয় বিষয়ে। কে এস কৃষ্ণন সাধারণ বক্তৃতা দেন অধ্যাপক আর কে আয়েঙ্গার, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'ম্যাগনেটোস্টাপ ও সেকুলোর্শন'। হেনরি সাধারণ বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক গায় হেনরি হাডসন। হেনরি সাহা সাধারণ বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সি আর রাও ও 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার কম্পিউটার প্রয়োগ'। বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রদান করেন ডঃ কে সি চ্যাটার্জি', তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'আলবেরোনের ভূমিকায় অনেকটি দিক'। এই সঙ্গে অনেকটি বিশেষ আলোচনারও ব্যবস্থা করা হয়। 'বাংলার জাতীয়করণ এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া' বিষয়ে একটি মুখোমুখি আলোচনায় উদ্যোগ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সতেন্দ্রনাথ সেন। সমাজে কম্পিউটারের স্থান এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মানবকল্যাণ সম্পর্কে আরও দুটি মুখোমুখি আলোচনা হয়। ভারতের বিজ্ঞান-লেখক সমিতির উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার এবং বিজ্ঞান-সাধনার নানা দিক সম্পর্কে আর একটি মুখোমুখি আলোচনা হয় এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ অমৃতী-মোহন, ডঃ নারায়ণ, ডঃ বিমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রণব মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলেন্দু সাহা এবং বর্তমান লেখক।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান সমিতির বিশেষ অধিবেশনে বীরবল সাহানী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় ডঃ এস এম সরকারকে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অঙ্গ হিসাবে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ও বিজ্ঞান পুস্তকের প্রদর্শনী এবারও আয়োজিত হয় এবং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণ সেন। গত বছর পাওয়াই অধিবেশনের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম।

এবারের অধিবেশনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল দুটি বিষয়। তার একটি হল নতুন প্রজন্ম বিজ্ঞানীদের আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা। এই মেলার সভাপতিত্বে গাহেম্বরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহারানী কাশ্মী দেবী গার্লস কিশোরদের স্কুলটির ছাত্রীরা, মুখোমুখিরা ভলান্টারি হাই স্কুল, হিজলী হাই স্কুল এবং কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুল ছিলেন প্রধান অংশগ্রহণকারী। মেলার উদ্বোধন করেন ডঃ ত্রিগুণ সেন, এছাড়া স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ এবং জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মেলা দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা সুন্দরভাবে তাদের মডেল ও পরীক্ষা দেখায় করে।

দ্বিতীয় আকর্ষণীয় বিষয়টি ছিল আলোচনা—১১ অধিবাসের বয়স্কদের জন্যে একক চলচ্চিত্রশালার প্রদর্শনী। ৮ জানুয়ারী থেকে একটিনের জন্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই চলচ্চিত্রশালিকে দেখার জন্যে সহরতলী ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু মানুষ ও ছেলেমেয়ে এসেছিল। এই উপলক্ষে ব্রিটিশ মুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র অধিদপ্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ কে গোপালন দুটি বিশেষ বক্তৃতা দেন। একটি বক্তৃতা তিনি দেন চলচ্চিত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ভূগোল ও ভূতত্ত্ব শাখায় যৌথ অধিবেশনে। এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল আলোচনা—১১ অধিবাসের চলচ্চিত্রশালার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি তিনি দেন সন্ধ্যায়। এটি ছিল লোকরঞ্জন বক্তৃতা এবং এর বিষয়বস্তু হল আলোচনা—১১ অধিবাসের আগে ও পরে চন্দ্র। তাঁর এই দুটি বক্তৃতা-সন্ধ্যায় প্রচুর শ্রোতা সমবেত হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ ত্রিগুণ সেন।

সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক আলোচনার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আই আই টি-র ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীতালেখ্য, লোকনৃত্য, প্রহসন ও পুরস্কার অনেকটি পরিবেশন করে। তারপর প্রত্যেক দিনই শ্রীমতী অরুন্ধতীদেবীর পরিচালনায় উপনগরীর সংস্কৃতিকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা 'বাসবদত্তা' নৃত্যনাট্য, উদ্বোধন সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, সি এস টি-র ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যনাট্য, শ্রীমতী সবিতা পাণ্ডিয়ার ওড়িশী নৃত্য, ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচালনায় রামায়ণীর 'রাম-রাবণ-যোদ্ধাদের সংস্কৃত নাটক এবং শেষদিনে আই আই টি-র ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত ইংরেজি নাটক পরিবেশিত হয়।

অজন্তা সহিত প্রতিনিধিদের জন্যে বাঁধার সংগ্রহশালা, হলদিয়া বন্দর এবং রাজাবেলপুরের ইটের কারখানা দেখার ব্যবস্থাও করেছিলেন। অনেকে এখানে বাঁধার গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা জাতীয় বস্তু অবেষণাগারের অধীনে পরিচালিত সমুদ্রতীরে রাঁধা গবেষণা-কেন্দ্রটি পরিদর্শনের সুযোগ আমরা পেয়েছিলেন। অজন্তা সহিত বিদেশাগত বিজ্ঞানী ও এ-দেশের প্রতিনিধিদের একটি প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলাম।

—প্রবীর ঘোষ

দ্বিতীয় বট।।

রাম বসু

কী বলবে আর
আজ, বুঝতে পারি,
জলের গভীর মধ্যে, লম্বা আলো সময়ের শান্ত-দেওয়া নথ ও নিয়তি
সন্ধ্যার আকাশ থাম পরে ফেঁপে উঠবে এরোডিয়ন শেষ চিহ্ন মুছে
অন্ধকারী পাখিদের ঝর্ণালী আকাশ, স্তব্ধ হবে
শূন্য ডোঙা নৌকার মাঝিকে
আমি ফিরিয়ে নিয়েছি,সেই সব দুপুর
যারা অপেক্ষায় ছিল ছাউনির নুয়ের ভয়ে

যা ছিল তা আর থাকবে না তো
আজন্ম বিশ্বাস, পুরোবিশ্বাস, আবার
চিরাবাধিনী সময়
চৌরাস্তার আদিম শিকড়ে রেখে আসা মাথা পাতিক, আবার
হাল-দেওয়া মাটির কাঁকে কাঁকে
ঘাস বোনার খুই-এর ফুলে লুকিয়ে রাখা
আমাদের শরীরের গন্ধ, আমাদের অন্তর্লীন স্বপ্ন,
স্বপ্নের নিশির, আর্তি

কি বলেছিলাম মনে নেই
মনে আছে যা বলতে চেয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারিনি
কি লিখেছিলাম মনে নেই
মনে আছে যা লিখতে চেয়েছি তা লেখা হয়নি একবো
মধ্যপথ নিরলম্ব মরীচিট, অন্ধকার রাত্রিনী, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে
চলে-চলে আলো, আলোর আলেয়া, ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
যেতে চায় একা
তোমার নিবিড়ে, ইথারে, চৈতন্যে,
যেখানে একটি মুক্তা জ্বল জ্বল করে

নির্জন করবো বলে ভেবেছি, অথচ নির্মিত হয়নি স্বপ্নের আসন
জন্মলগ্নের আমার কেউ তো ঘোষেনি, এমন কি ধূলিও না
রক্তীন সূর্যের আলো ডুবে যাবে যমালয়ের গভীর অতলে

আমার সামনে এক গ্লাস জল চৈতালি করছে
চৌদ্দ আমার মুখ নীলিমা একা মাথা ঝুঁকিয়ে বিমর্ষ বিস্ময়ে
নিয়ে হতভাগিনী
লক্ষ্যে ঘোর মি মহলের এক বিন্দু উজ্জ্বল শূন্যতা
কোটি কোটি ঐশ মর্মরতার চেয়েও মহার্ঘ

কী বলবে আর
আজ, বুঝতে পারি
চতুর্থ বটের মতো আমি
সব পাতা উড়িয়ে দিয়েছি যমালয়ের গভীর অন্ধকারে।

মৃত্যুকাণ্ডে।।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সোদিন গভীর এক রাত্রির মধ্যাহ্নে
ঘোরে আসে মুমূর্ষুচোখে কুপাণ ঝলসে।
কুলুপ্তিত শিরদাঁড়ে দুর্বল মুহূর্তে
এ জন্মের মতগুলি উৎকৃষ্ট সকাল
ঝরে যায়। সারি সারি সে অন্ধকারে
ভিড় করে অন্ধকার, শিরাদির জাল
জল হয়। উদ্বিগ্ন আকাশে হলে
আসন্ন মরণী।

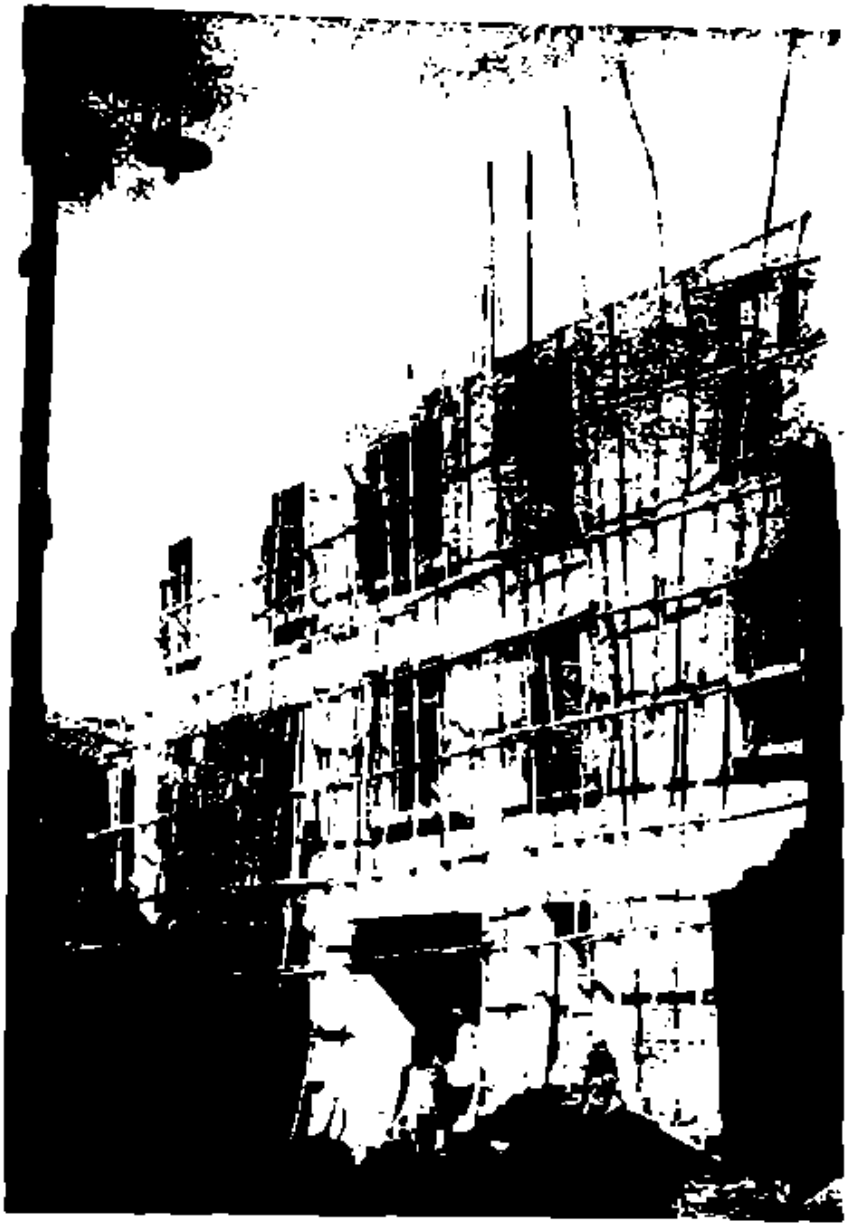

মানুষগড়ার হাতিকথা

অতীত জেনে কি হবে? তার চেয়ে বর্তমানের কথা শুনুন, বর্তমানের কথা লিখুন। লিখুন আমাদের সমস্যা ও অনুভূতির কাহিনী। লোকে মানুষকে যত কম করে এই সংখ্যাকে আমরা আরও বাড়িয়ে রেখেছি। এই সংখ্যা বাড়ার ক্ষেত্রে সব সময় অন্যান্য ছেলেমেয়েকে। হয়তো এই অবজারভেশন না থাকলে এরা কখনো ফেলাবিলাই স্কুলে পড়তো, চাকরী পেতো, প্রতিষ্ঠিত হতো-সুখেই থেকে যা। তাই আপনাকে অনুরোধ করব, অতীতের কথা ছেড়ে দিন, লিখুন শুধু আজকের কথা আমাদীবালের কথা। আবদুলেরের মত তিন বছরের ছেলেটারী প্রায়ন আইনজীবী আবদুল্লা আনসারী সাহেব তার তার ঘরোয়া কিছু উর্দু ও কিছু ইংরেজী মিশিয়ে ছেলে মেয়ে আপনে আপনে তাঁর মনের ইচ্ছা আমায় জানালেন। উন্নতমানে লেখাপড়ানো, সবল সুস্থ দেহমনি, বিনয়ভাবে, এই বুদ্ধের প্রশান্ত মুখে ওনুদার ভিন্ন আমার উদ্দেশে হয়ে আছে। কথা বলেন কম, কতটুকু বলেন তার প্রতিটি শব্দে আভিজাত্যের বিলাসেছটা। বাকিদের মিশ্রণের ছাপ প্রতিটি বাক্যে সুপরিস্ফুট। তাই প্রতিবাদ করে আঘাত করার ইচ্ছা হল না। অসীমের আমাদের। আজকের শিশু ও পরার অবহেলেরের, অনুভূতির সমস্যার কথা লিখতে গেলেও তো আমাকে অতীত জানতে হবে। তবেই তো সুস্থের পারের ঠিক জোড়ের কাঁটা বসাবে। এবার হাসিতে ফেটে পড়লেন আনসারী সাহেব ও তাঁপনি সাহেবাজাদা। ঠিক হ্যায়, সব ছেলে মিয়া। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়ের কথাও লিখবেন। শুরু হয়ে গেল অতীতের সুস্থ বিলীয়মান সঙ্গের প্রাচীন পুঁথি-পত্র, রেকর্ড বুক আর ডিসিপ্লিন বুকের ফাঁপা আলোয় সবকে বসি পড়ালাম।

আজ থেকে আঠারশ বছর আগের কথা। অনেকেরা মনে করেন কোরেশ বিটারার বিচারপতি আবদুল হালান সাহেব হঠাৎ ঠিক করলেন শহরের সুস্থ ধরেছ অসাধ সুস্থলিয় ছেলেমেয়েদের জন্য একটা আশ্রয় গড়ে তুলবেন। হঠাৎ বলাটা সোহেরে, ঠিক হল না। লাম্বা জীবন ধরে অনেকরা আমলায় নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বার বার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই অসাধারণের সুস্থীর বা ডিসলেমির জন্য হাজারহিত ভদ্রলোকেরা বিরক্ত হন, থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারি করেন। ভদ্র সমাজের এরা অনাকাঙ্ক্ষিত। কৈ কেউ তো এদের দিকে একবার ফিরেও তাকান না, কেউতো চেষ্টা করেন না যে কেন এরা এ রকম করে, কেন বিপথে যায়? শাস্তির মুখুরে মেরে এদের ঠেকা করাই সবার কথা। বয়স বাড়লে এদের অভিভাবক হয় জেলখানা অথবা জিলার আর ছেলের ওয়ার্ডার। যদি একটু সুযোগ, একটু সুবিধা এরা পায় তাহলে তো এরাও মানুষ হয়ে উঠতে পারে, ভদ্র সমাজে মিশে যেতে পারে। সেই মহৎ চিন্তাকে থেকেই জন্ম-লাভ করল ভালমন্দ সুস্থলিয় অবজারভেশন, ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২। সংক্ষেপে যা আজ পরিচিত সি-এম-ও নামে।

সি-এম-ও'র আজ সেই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা আর সম্ভব নেই। যা চালাতে নিতান্তই অসম্ভব। বস্তুত সুস্থলিয় ঘরের ছেলেমেয়েরাই সাধারণত আশ্রয় পাবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের অনাথ ছেলেমেয়েদের আশ্রয় দানে কোন বাধা-নিষেধ নেই। এই অনাথ শিশুদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষিত করে তোলা ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির দেওয়ার দায়িত্বও বহন করে সি-এম-ও। তবে এই সুযোগ ছেলেদের বেলায় অষ্টাদশ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মেয়েদের পাত্রস্থ করার ব্যবস্থাও করে সি-এম-ও।

মাইলাই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বোর্ডিং-স্কুল তোলে প্রতিষ্ঠিত হল আরকাডেমি। সবার সুস্থবার আগেই শিশু সদস্যদের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য হালান সাহেব তাঁর সব প্রতিষ্ঠানের অনাথ আশ্রমটিকে তুলে নিয়ে

কয়লাঘাটা মুসলিম অরফ্যানেজ স্কুল

এলেন ব্যাকলাউড স্টীটের একটি বড় বাড়ীতে। কিন্তু সেখানেও জায়গার কুলোয় না। তখন অরফ্যানেজের জমাদারের অবস্থার স্থানীয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছে। আপনারা সাহায্য করুন।

হাজার সাহায্যের আবেদন ব্যর্থ হয় নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ইসমাইল আরিফ ধর্মতলার ব্রাঞ্চ অফিস থেকে আরিফুল্লার সম্পত্তির সৈয়দ আলে লেনে মোল অঙ্কের জমা দান করলেন আশ্রমের জন্য। আরিফ সাহেবের বাসভবনে উৎসাহিত হয়ে আলেমেলা আর আবদুল্লাহ মুসলিম ব্যবসায়ীরা আশ্রম ভবনের জন্য মুক্তহস্তেই অর্থ চাঁদা করে তুলে দিলেন। সেই সময় ১৮১০ সালে ৮ সৈয়দ সালে লেনে অরফ্যানেজের বিশাল বিল্ডিং গড়ে উঠল। অট্টালিকা বিস্তৃতি অংশ তিনতলা, বিস্তৃতি চারতলা।

ইতিমধ্যে ১৮১২ সালে অরফ্যানেজের ইণ্ডিয়ান এডুকেশনের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য মোনিরাপুকুর রোডের বাড়ীতেই একটি উর্দু বিভিন্নাসের বিভাগ স্কুল (ক্লাস সিক্স পর্যন্ত) শুরু হয়ে গিয়েছিল। আগে ব্যাকলাউড স্টীটে থাকে অরফ্যানেজের নতুন বাড়ীতে স্কুলও উঠে এল পাকাপাকি ভাবে।

অতি দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে অরফ্যানেজ। বিশেষ করে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র মুসলিম অভিভাবকদের কাছে সি-এম-এ হয়ে ওঠে আশ্রয় ও সাহায্যের প্রতীক। সহায় সম্বলহীন ও আশ্রয়হীন দরিদ্রদের মাঝে বোনসরূপ হয়ে এই অরফ্যানেজ ও অরফ্যানেজ চালিত এই স্কুল। ঘটনাটি জানা নিয়ে যে আশ্রয় শুরু হয়েছিল মাত্র তিন মুসলিম বালকদের নিয়ে তার অভিভাবকের সংখ্যা হিসেবের বেড়াজাল নিয়ে দেখা দিল।

ইতিমধ্যে অরফ্যানেজ আরো প্রসারিত হয়েছে। ছেলেদের মিডল স্কুলের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও সেখিয়ে লেনে আর একটি মিডল স্কুল খুলেছে সি-এম-এ। দুটি স্কুলেই পঠন-পাঠনের মাধ্যম উর্দু। মাঝের তারাবাড়ী ছেলেদের সি-এম-এ মিডল স্কুলে পড়তে পারতেন আলেকাটা বাড়ীতে। এছাড়া আছে দুটি স্কুল। এছাড়া আছে লেখা-পড়ায় বিশেষ মন নেই তাদের জীবনে করে খাওয়ার মত সুযোগ করে দিল আশ্রম বিলিয়ার্ড স্কুলে। সেখানে তারা শিখছে ফিটিং কাজ, মেয়েরা সিখছে কাজ। বিভিন্ন পেশায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একটির পর একটি বিভাগ খুলে চলেছে সি-এম-এ। একটি হাসপাতালও খুলেছে অরফ্যানেজ যেখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধপত্র দেওয়া থেকে রোগীদের অপারেশন পর্যন্ত সবই চলতে পারে।

অরফ্যানেজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার এক নতুন অধ্যায়ের সন্ধান উন্মোচিত হল এখানের অন্যান্য মুসলিম ছেলেমেয়েদের কাছে। বিশেষ করে স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে হাজার হাজার দরিদ্র ছেলে-মেয়ের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। স্থানীয় অধিবাসীরাও তখন আশ্রমের কাছে অনুরোধ জানালেন তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও সুযোগ দেওয়া হোক স্কুলে পড়বার। এই সুযোগে সমাজ জীবনের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েদের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠল এই দুটি স্কুল।

১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর সৈয়দ সালে লেনের সি-এম-এ মিডল স্কুল তার চেহারা পরিবর্তন করে আত্মপ্রকাশ করে ফ্রি-পি-আই ওয়ার্কশপওয়ার্ড স্যাম্বে 'ভোকেশনাল' স্কুলে রূপান্তরিত হয়। স্কুলটি পরিচালনা ও ছাত্ররা শুশৃঙ্খলাপরায়ণ। সবই ঝকঝকে তকতকে। ছেলেদের মেকে ভাল দেখেছে। স্কুলের একতলার ঝকঝকে সাধারণ ক্লাস রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রার্থনাগৃহে (অসজিদ) অন্তর্ভুক্ত হয় হাফিজ ক্লাস। দোতলায় মেকেই শেখার ক্লাস ও বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষণ ভবনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছে। ছেলেরা যাতে তাদেই যাতে হাইস্কুল বা কলেজে পড়ে। ...ছাত্ররা অপরিসীম সৌভাগ্যের অধিকারী। কারণ ইংলেন্ডও ওয়ার্কশপটিসের শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ঘটনা প্রতি বিরল—অথচ এখানে তা কত সহজেই এরা পেয়ে থাকে।... আশা করা এদের সৌভাগ্যকের আরো প্রসারিত হবে যখন অরফ্যানেজের বেহালা পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হবে।"

বেহালা পরিকল্পনা অরফ্যানেজের বহুদিনের। কিন্তু এই উদ্দিন সে সময় সালেও তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কেন পারে নি সে কথা ব্যবসায়ীরা জানে। তার আগে বলে নি কিসের মুখে স্কুলের ও সেই সঙ্গে অরফ্যানেজের ভেতরের কিছু কথা। ব্রাঞ্চিল সালে মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টরের পদ পাবলিক ইন-স্ট্রাকশনের মেকে থেকে জানতে পারা যায় যে তখন অরফ্যানেজের সবসা সংখ্যা মোট তিনশো তিন। মুসলিম এতাবক সম্পত্তির সুদ থেকেই তখন অরফ্যানেজের বিপুল ব্যয় মেটানো হত। বহু ধনী মুসলমান তাঁদের সম্পত্তি দান করেছিলেন অরফ্যানেজকে। এইসব সম্পত্তির তত্ত্বাবধান থেকের জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি ট্রাস্ট বোর্ড ছিল অরফ্যানেজের। এ-ছাড়া অন্যান্য আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের সুপরিচালনার জন্য স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশজন সদস্যের একটি কার্যকরী সমিতি ছিল। প্রতিটি বিভাগের পরিচালন দায়িত্ব যদিও কার্যকরী সমিতির দ্বারা মনোনীত বিভাগীয় উপ-সমিতি। অরফ্যানেজের শিক্ষা বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এমন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সমিতির উপর। তখন স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা একশো পঞ্চাশ।

ঐ মোট থেকে আরো জানা যায় যে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর জানুয়ারী সৈয়দ সালে লেনের বাড়ীটির একটি অংশ ধসে পড়ায় ভেতাল্লিশটি মিন্ড্ ছাত্র হারায়। অরফ্যানেজের এই বিপুল ব্যয়-বহুল পুনর্গঠনের জন্য সেদিন অবাক মুসলমান ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসেছিলেন। /ঘটনার সকলের মনে আর একবার মনে পড়া অর্থাটির ভাগ্যের একটি নতুন চারতলা বিল্ডিং গড়ে ওঠে। এ জন্য সেদিন ব্যয় হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা। সবই এসেছে ডোনেশন থেকে।

বয়েজ স্কুলে উর্দু বিভিন্নাসের পড়ালেও ক্লাস ফোর পর্যন্ত আলাদা সেকশনে বাংলার মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। মিন্ড্ শ্রেণীর হিসাবটি সেকশন বিলিয়ে তখন এই মিডল স্কুলে সব সুদ্ধ ছিল নটি ক্লাস। নটি ক্লাসের জন্য ছিলেন এগারোজন মাস্টারমশাই। ক্লাস সেভেন শিক্ষকদের বেতন বাবদ অরফ্যানেজের ব্যয় হোত মোট চারশো টাকা। এর মধ্যে সরকারী সাহায্য হিসাবে স্কুল পেত মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা।

আর্টিলস্টাট ফ্রি-পি-আই তখন মোট শিক্ষেছেন এ সময় অরফ্যানেজের ভাণ্ডারে প্রায় দেড় লাখ টাকা জমা ছিল। এছাড়া যি অবশ্যই প্রায় তেতাল্লিশ হাজার টাকা আয় হত অরফ্যানেজের। এই আয়ের মোটা অংশই আসত বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তির দান থেকে। অন্যান্য অরফ্যানেজের সাহায্যের বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় পৌনে দু হাজার টাকা।

এই বিশেষ স্কুলেই এস-ইউ স্কুল সরকারী অনুমোদন পেয়ে এস্ট্রাস্টেন্সের এস-ইউ (ক্লাস এইট) পর্যন্ত স্কুলে পরিণত হয়। সত্তরের সালে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল

বিনা সন্তোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
খাজেসা
ব্যবহার করুন!

স্কুলে ছিলেন। এর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা দ্বারা বাসবাকী সব কটি দ্বারাই ছিল অরফানেজের আশ্রিত। চৌদ্দজন শিক্ষক তখন স্কুলে পড়াতেন। হেডমাস্টার মৌলবী আবদুল করিম। স্কুলের ৯ ইংরেজী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কলকাতার সাব-ডিভিসনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ মহম্মদ ফজিল হোসেন সাহেব সাদা সাদা মন্তব্য করেন—"এই পাঠাগারের কথা অতি জানি। বই আছে মোটে দুশো আশীখানি; এর মধ্যে উর্দু বই একশইটি, আরবী তাফসীর বই উনসত্তরটি ও ইংরেজী একশো একটি।

ফজিল সাহেবের এই মন্তব্যের দু বছর বাদে দেখা যায় স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। স্কুল কমিটি মজলিসের ভাবনায় নয়জন সদস্য নিয়ে হয়েছে গঠিত। আগে যেমন এই কমিটি অরফানেজের একটি ডিসিপ্লিনারি কমিটির অধীনস্থ নয়। তবে নতুন সংবিধান বলে অরফানেজের সাধারণ সম্পাদক হলেন এই সমিতির একজন সদস্য। স্কুল কমিটির চেহারা যেমন পাল্টেছে সেই সঙ্গে স্কুলের চেহারাও ক্রমশ বদলাতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তন কতখানি শুভদায়ক বলা মুস্কিল, কারণ তার কোন হিসাব আমি পাই নি। তবে সংঘটিত পরিবর্তনের যে হিসাব পেয়েছি তাই এখানে তুলে ধরছি। তিন সালের পর থেকে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ধাপে ধাপে কমে যায়। একত্রিশ সালে যেখানে পড়ার শুরুতে বিয়াল্লিশটি ছেলে, বাইশে চৌত্রিশে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় শুধু চৌদ্দ। পরের বছর আরো কমে গিয়ে হল একশো দুজনের। সেই সঙ্গে শিক্ষক সংখ্যাও দেখা যায় কমে গেছে স্কুলের। বিশের দশকের চোদ্দজন শিক্ষকের জায়গায় ছেত্রিশ সালে একাদশজন শিক্ষক পড়াতেন এই স্কুলে। শিক্ষক সংখ্যা কমে গেলেও স্কুলের ব্যয় কিন্তু কমে নি বরং বেড়েছে অনেক। তখন মাস গেলে খরচ হত প্রায় চব্বিশে সত্তর টাকা। অর্থাভাব এর জন্য অরফানেজের দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটে নি। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ পঞ্চাশের টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে শুশো।

পরবর্তী চৌদ্দ বছরে স্কুলের ইতিহাসে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রতিষ্ঠা ইস্তক এই স্কুল ও অরফানেজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান মুসলিম নেতা—ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দী কেউই বাদ ছিলেন না। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা শুধু মোটা দেশের ওপরেই নয়, নেমে আসে এই স্কুলের ওপরেও। পৃষ্ঠপোষকদের অধিকাংশই তখন দেশান্তরী অথচ স্কুলের ও অরফানেজের অবস্থা তখন টলটলায়মান। শুধু স্কুলেই পড়ে তখন দেড়শো তিনশ ছাত্র। এর মধ্যে অনাথের সংখ্যা ছিয়ানব্বই। এছাড়া গার্লস স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, মেডিকেল স্কুল, অনাথ আশ্রম সবকিছু মিলিয়ে এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হচ্ছে অরফানেজকে। তবু একথা ঠিক, আগাখানী সাহেব বলেছেন, স্বাধীনতার আগে লীগ আমলেও স্কুলের বা অরফানেজের এত সমৃদ্ধি ছিল না যা হয়েছে স্বাধীনতার পর।

বিশের যুগে যে অরফানেজের বার্ষিক আয় ছিল মোটে চৌদ্দশ-পনরশ টাকা আজ তার আয় তিন লাখের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। এর মূল কারণ, শুধু বিত্তবান মুসলমান ভাইরা সম্পত্তি দান করেছেন অরফানেজকে। আজ অরফানেজ কলকাতার ও শহরতলীতে প্রায় দেড়শো বাড়ীর মালিক। এই বাড়ীগুলি ভাড়া খাটিয়ে বছরে প্রায় দেড় লাখ টাকা আয় হয় অরফানেজের। বাৎসরিক টাকা আসে সরকারী ও বে-সরকারী সিলভিত ও অনিয়মিত সাহায্য ও দান থেকে। তাতেই এই বিপুল কর্মযজ্ঞের খরচ-খরচা মেটে।

ইতিমধ্যে পঞ্চাশ সালে পুরানো বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হওয়ায় স্কুল তার বর্ষীয়ান পরিচালনার পুরানো ভিটে ছেড়ে ১১ সিটার বেডের একটি ভাড়া বাড়ীতে উঠে যায়। এই বাড়ীতে উঠে আসার তিন বছর বাদে ষোড়শ অনুমোদনপ্রাপ্ত একসটেনশনের বিজ্ঞান স্কুল রূপান্তরিত হয় হাইস্কুলে। দুবছর সাদা স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। মাত্র ষোল বছরে এদের প্রায় পঞ্চাশজন বাড়ীটি ছেলেরই পাশ করেছে।

কলকাতার দিক থেকে এই স্কুলের ছেলেরা নিশ্চয়ই শহর কলকাতার যত্ন নেয়া বড়ী বড়ী স্কুলের ছেলেদের পাশে নিষ্প্রভ মনে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এই স্কুলের ছেলেরা আসে সমাজের এমন স্তর থেকে যেখানে খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগও জোটে না। তাদের স্কুলের সঙ্গে এই স্কুলের তাই তুলনাই যোগ্যতর চলে না। তবুও এটি কোন সাধারণ

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্ধক

দূষিত রক্ত মানুষের জীবনকে শুধু পঙ্গু করে না সেই সঙ্গে তার জীবনের সব আনন্দ সব আশা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেয়। মুক্তাঙ্গী কবিরাজের অমূল্য ভেষজ আবাদী কেবল দূষিত রক্ত পরিষ্কার এবং সেই সঙ্গে আপাদীন সর্ব জীবন্তকেও বাড়ায়ে তোলে। ব্রণ, ফোড়া, চুলকানি, দাদ প্রভৃতি চর্মরোগে, স্নায়বিক দুর্বলতায়, জীর্ণ রোগ-ভোগ বা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদেও এর ব্যবহার অতি ফলদায়ী।

মুক্তাঙ্গী কবিরাজ

পি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কবিরাজ হাউস, কলিকাতা-১৯

বিদ্যালয় নয়, বরং আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত অনাদৃত শিশুদের একটি পরম নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

সেদিক থেকে এই স্কুল অনায়াসে আজ গর্ব করে বলতে পারে, যাদের কথা কেউ কোনদিনও চিন্তা করে নি, সমাজের আবর্জনাস্তূপের যাদের জন্ম ছিল অর্থাপত্তি সেখান থেকে তুলে এনে আমরাই তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি জীবনে। অস্থায়ী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাবুদের আপনার এই আজন্ম-স্কুলের সেই সব ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা একদিন সম্পূর্ণ অন্যের অবস্থায় এই আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছিলেন। সলজ্জভাবে যেন শিহরিত হেসেছিল বৃদ্ধ বাবুটি আমার অনুরোধে। তোমরা তোমরা বলেন কি? নাম বাবুর প্রয়োজন কি? হয়তো নাম প্রকাশিত হলে অনেকেই লজ্জা পেতে পারেন। তারপর কি ভেবে বললেন। আচ্ছা যদি তাঁরা পরম গুরু সমাধিতে জানাতে চাহকে তবে কারুরই অসম্মতি নয়। তবে যে স্কুল বা যে পরিবেশেই হোক না কেন ছাত্রদের জন্য ছাত্রদেরই গড়ে। তার জন্য প্রয়োজন সমানা সাহায্য বা সহযোগিতার। এই আশ্রম সেই সাহায্য করে কখনো কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নি। আপনি লিখে নিন—হাওড়া স্টেশনের প্রথম ভারতীয় অফিসিয়েটিং স্টেশন মাস্টার খানসাহেব ফজল হক একদিন এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক রফিকুর রহমান, পাকিস্থানের জাতীয় সভার পরিকল্পনার ডিরেক্টর ভাবী আইনার হোসেন, সলিসিটর এ রসিদ, আমার বন্ধুবর হুদা, আমার মামাতো ভাই, মহাকেরাম স্পোর্টিং ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট আশরাফ মিয়া সবাই এই স্কুলেই একদিন পড়েছেন। এ বছর ডাক্তারি বি-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছে আমাদেরই এক প্রাক্তন ছাত্র অনন্ত আসলাম। বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, উকিল, বড় বড় সরকারী কর্মচারী এই স্কুল ও অরফানেজের সৌজন্যে আজ সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ বৃদ্ধা কি আমাদের আজ যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অনেকেরই দেখি মনটায় এই বৃদ্ধো অরফানেজের বৃদ্ধো পরিচালককে দেখলে অতীত পাঁজির বেরিয়ে পড়ার আগে তাড়াতাড়ি রাস্তা দেখিয়ে পালিয়ে যান। আপনাদের পরিচয়ে বৃদ্ধোদের আমি এই অরফানেজের, এই স্কুলের সব প্রাক্তন ছাত্রদেরই খাবদানে জানাতে চাই। আপনারা আসুন। ওল্ড-বয়েজ ক্লাব গড়ে তুলে আপনাদের ধাত্রী-জননীকে সাহায্য করুন।

সাহায্য কি শুধু প্রাক্তন ছাত্ররাই করতে পারেন, সরকার পারেন না? বহু বেশি সরকার অন্যান্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের জন্য অকাতরে জমি, বাড়ী, অর্থ সাহায্য করেন, তখন কেন এই অরফানেজ ও স্কুলের বেলায় এত কার্পণ্য? সরকার কি কখনো খোঁজ নিয়েছেন এদের এত সাধের খেয়ালা স্কুলিয়ের আজ অবস্থা কি? মাত্রেরহাট ষ্টীল মিল থেকে মেসে মিলের ঔদ্ধত্যেদিকে মিষ্টি আলিপুরের দা দেখে এই অরফানেজের আট বিঘা জমি ও একতলা একটি বিশাল বাড়ী আজ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে যে-ওয়ারিশ হালের মত পড়ে আছে। তখন থেকে তার সুবিধা ভোগ করছে অথচ অরফানেজ বঞ্চিত হচ্ছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে।

এই কারণেই হয়তো স্কুল, গার্লস স্কুল, ট্রেনিংক্লাস স্কুল, রেসকিউ হোম ও হাসপাতাল, অরফানেজের সবকটি ইউনিটের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী থাকিলে একটি সুন্দর আয়ত্ত ঘরে তোলার স্থান ছিল এদের। পরিকল্পনামাফিক বাড়ী বানানোর কাজও হয়েছিল শুরু। কিন্তু স্থিতীয় মহাযুদ্ধ এসে সব ওলটপালট করে দেয়। সরকার সামরিকভাবে ঐ জমি ও বাড়ী দখল করে নেন মিলিটারীর জন্য। চুক্তি ছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছ' মাস পরেই অরফানেজ তার সম্পত্তি ফেরত পাবে।

যুদ্ধ শেষ হল, দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু অরফানেজ ফেরত পেল না। তারপরে আরো একুশটি বছর কেটে গেছে। বর্তমানে ঐ জমি-বাড়ীটি দখল করে আছেন উদ্বাস্তুরা। বিনিময়ে যান দেওয়া সম্বন্ধে কোনো চিন্তা সরকার আজো দেন অরফানেজকে। ভুল হোক, ভাঙা দেওয়ার কথা কিন্তু গত চার বছরে একটি পয়সাও দেয় নি পঞ্চবার্ষিকী।

অরফানেজের আজো সরকার যখন সকল উদ্বাস্তুরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন, তখন কেন এই কয় ঘর উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের আয়োজন করে এই দুঃস্থ অবস্থার অবসান ঘটাবেন না? তাই নিজের বাড়ী-জমি থাকা সত্ত্বেও স্কুল পরবাসী। তবে সম্প্রতি তার সেই প্রবাসবাসের অবসান হতে চলেছে। স্থিটার মেসের ভাড়া বাড়ীটির জায়গায় অরফা মেস গত বছর একটি তেতলা নতুন বাড়ী তুলেছে। এই কারণে গত এক বছর ধরে সি এম ও হাই স্কুল সৈয়দ সালে মেসের পুরোনো স্থিটের উঠে এসেছে। নতুন বাড়ী, দেখে এলোছি, প্রায় সমাপ্তির। সম্ভবত আগামী মাসেই স্কুল এই নতুন বাড়ীতে উঠে যাবে।

নতুন বাড়ীতে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা এ-বছর সম্ভবত সাড়ে চারশোরও বেশী হবে। তবে বর্তমানে অনাথের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বড়জোর স্থিন-বাঁচিশ। তার কারণ অতি স্পষ্ট। সি এম ও স্কুলে উর্দু মিডিয়ামে পড়ানো হয়। তাই অরফানেজের অধিকাংশ বাসিন্দাই বাঙালী। অতীতের মত আজো অরফানেজ তাদের পড়তে পাঠায় কালকাটা মাদ্রাসা বা জুবিলী স্কুলে। সমস্ত খরচ-খরচা অরফানেজের।

আজকাল খুব কম অরফান আমাদের স্কুলে পড়লেও, অধিকাংশ ছাত্রই আসছে স্থানীয় অতি দুস্থ সব ফ্যামিলী থেকে—যেখানে দুনে আনতে পান্তা ফুরোয়, কলেজের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এক্রাম হোসেন মণ্ডল। মণ্ডল সাহেবের বাড়ী বর্ধমানে গলসী থানায় খেতুগ্রামে। তিনি বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। আমি দুঃখে বললেন, আমাদের স্কুল চলে গ্রান্ট-ইন-এডের টাকায়। বছরে ডেফিসিটের পরিমাণ প্রায় ষোল-সতেরো হাজারে টাকা। ফাইনানসিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে এল প্রায় অথচ এপর্যন্ত মোট সাত হাজার টাকা পেয়েছি আমরা। বারোজন শিক্ষক আছ করছেন স্কুলে। রিডাইজড্ স্কেলে বেতন দেওয়া হয়। যদি সরকার নিয়মিত সাহায্য না পাঠান, তাহলে এই স্কুলের ভবিষ্যৎ কি হবে বলতে পারেন?

এর জবাব আমি কি দেব?

—মন্তিবন্দু

পত্রের সংখ্যার : সাউথ পয়েন্ট স্কুল

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অতীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এদিকে আমাদের জলাই প্রযোজন কিন্তু এর পর হোল নতুন যা ঘটবার। কুশলতা তাঁর বইয়ের জন্যে হাসিক নির্বাচন, কিন্তু উৎপলবাবু তখনো সেটা মেনে নিতে রাজী হচ্ছেন না। তিনি তখন অন্য ধরনের বই করার পক্ষপাতী। ওঁর বক্তব্যটাকে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে উনি কোনো পৌরাণিক গল্প করার পক্ষপাতী। বিশেষ করে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর দিকে ওঁর খুব ঝোঁক। স্টারে তাঁর সমস্যার মধ্যে লাক্সোর সঙ্গে চলার জন্যেই বোধহয় ওঁর মনে এই ভাইব্রেশনটা এসে থাকবে। অবশ্য ওঁর সমস্যার কারণ উপায় নেই, কারণ ওটা স্টারের ফাউন্ডেশনই।

আমি তখন একটু, জোরে বললাম—শরৎদা, বেরিয়ে।

আমার মনে পড়ে গেলো—অনেকদিন আগে হরনাথ বসুর লেখা বেহুলা নাটক আমরা অভিনয় করেছিলাম আমেচারে করেকবার। সে প্রায় ১৯১৮ সালের কথা।

সেই নাটকখানি ছিল মঞ্চের চাহিদা ও সমসাময়িক সম্পূর্ণ বিরোধী জিনিস। ঐ স্টেজেই আমরা বহু মাস ধরে এই নাটকখানি অভিনয় করেছিলাম—সেটা অবশ্য অনেকদিন আগের কথা।

আমি বললাম কি—নাটকের হরজায়-রকমের ঘষে ঘষে তাকে দিয়েছি অনেক কিছু, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে একটা নতুন রূপ দেওয়ালাম। তাছাড়া উৎপলবাবুকে সেই নতুন পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললাম—পড়ুন এটা এইবারে। নতুন করে লিখিয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে তাহচ্ছে সম্পূর্ণ আজ নতুন নাটক বলেই ধরে নিতে হবে।

উৎপলবাবুকে পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনানো হলো। তাঁর খুব পছন্দ হলো। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন—ঠিক আছে। এইরকম জিনিসই খুঁজছিলাম আমি। দিন, লাগিয়ে দিন।

মেতে খেলায় 'বেহুলা' নিয়ে। শুধু অভিনেতা বলে নয়—নাটকার হিসেবেও বহুবার হয়ে-আসা-বহুপঠিত-বহুশ্রুত-কাহিনী আমার ওপর। বইখানা নিজেই লিখেছি—সুতরাং হলো ভাঁর মেয়ের মা মেয়ে!

আমাদের খেলা তৈরি করতে লাগলাম বইখানাকে। প্রথম ভূমিকা ছিল আমাদের চারজনের। চন্দ্রধর—আমি, লখীন্দর—অহীন চট্টোপাধ্যায়, বেহুলা—অনঙ্গমঞ্জরী, সনকা—চারুশীলা।

নাটকে বেহুলা নয়-ভূমিকা হলেও প্রকৃত নায়িকা হল সনকা। প্রথম অঙ্কে যখন বেহুলা আসে তখন শৈশবকাল ছিল এবং—কিন্তু চরিত্রগুলির পরেই সে চলে যায় এবং তারপর তাকে আবার দেখা যায় চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সেই সময় অভিনয়ের চূড়ান্তের।

নাটকের কথা বিশেষ করে আজ এই জন্যে যে, ভূমিকাটি নাটকারের নিজস্ব সৃষ্টি। নাটকের মধ্যে প্রথম সমস্যাই

যা নাটকে অভিনয়ের ভূমিকায় অহীন চৌধুরী

হলো এই চরিত্রটি নিয়ে। যাকে বলে 'ফিমেল লীড' তাই। কিন্তু নায়িকা হিসেবে এর কোনো ভূমিকা নেই। সমস্ত নাটকটির মধ্যে এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এ চরিত্রের কোনো ঘাত-প্রতিঘাত নেই। এর কোনো স্বতন্ত্র সমস্যা নেই। এ চরিত্রের কোনো বিকাশ নেই। এ চরিত্রের কোনো পরিণতি নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র সংলাপ নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র ভাবনা নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র অনুভূতি নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র আবেগ নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র আবেদন নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র আকর্ষণ নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এ চরিত্রের কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা

নতুন চেহারাতেও। সব পত্রিকাই সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিল। এখানে স্টেটসম্যান-এর নিবেদিত লেখাটি উদ্ধৃত করছি :

Mr. Ahindra Chowdhury, who played the role of Chandradhar or Chand Sadagar, kept the audience almost spell-bound. He is second to none in India in the technique of make-up and has established his fame as the 'Indian Lon Chaney'.

বাঁধানো বুলন, মজলন্দা, দুজনেই সম্বর্ধনার প্রস্তাবনা হয়েছিল তাদের অবদান স্মরণ করার জন্যে।

দর্শকদের মুখ চেয়ে এ যাত্রাও একটি ইলুশন তিন ঘন্টার হয়েছিল—সেটা ছিল একেবারে শেষ সুতো। শেষরাতের দিকে আবহাওয়া ভারি হয়ে বেহুলার চিতায় লেখিন্দরের মৃত দেহটি লখীন্দরকে—এই ছিল দৃশ্যটির বিষয়বস্তু। জলের মধ্যে দিয়ে ভাসানো, ভাসিয়ে মধ্যে দিয়ে যাওয়া—এসব তো ছিলই কিন্তু সব থেকে ভারসাম্যের ব্যাপার ছিল যেখানে শেষ সুতো মেপ-মাফিক ঘরে-পড়া ভাসানো কন্ডাকটির বদলে উঠে যাবেন লখীন্দর সুলতানীবাবু হয়ে।

পরেশবাবু তখন মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেছেন, এখনকার 'সম্রাট'রা মিলে এই ইলুশনটি তৈরী করেছিল। এই ইলুশন-মেশিনের ব্যাপারটা আমি ভালো ঠিক বুঝতে পারতাম না। এসব ব্যাপারে দুজনের পার্শ্বী থিয়েটার ছিল ওস্তাদ। পরেশবাবুও ওদের কাজ থেকেই শিখেছিলেন। পার্শ্বী থিয়েটার আমি অনেক লীলা দেখেছিলাম ছোট্ট ইলুশন ছিল তাতে। প্রথম যখন এসেই পর্দা তুলে ব্যাপারটা দেখেছিলাম ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম। ছোট্ট মনির মনে হয়েছিল ওটা সত্যি। তাঁর সতীত্ব পরীক্ষা করতেই একটি বেদেনী এসে ছদ্মবেশে ওঁর সামনে আবির্ভূত হয়। ছোট্ট মনির তখন মনে হচ্ছিল যে করে হোক অন্তর্হিতা হওয়া দরকার। আলো-আঁধারি দিয়ে ওঁদের আহারে আমাদের জানালেন সতী অনুসূয়া।

ছদ্মবেশী বেদেনী বলছেন—আমিতো হুকুম করতে পারি এক সর্তে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে আহার্য সামগ্রী।

কি সাংঘাতিক অনুরোধ। এঁকে আমি—আর উলঙ্গ দেখবো। অসম্ভব। অসম্ভব বলে মহাদেব—তাই যাও হয়ে সতী সোজা নিয়ে হল সতী অনুসূয়াকে। তিনি ওঁদের খোলা চুলের রাশি বুকের ওপর ফেলে দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা সব দৃশ্য লোপা দিয়ে হয়ে গেলেন। সতী ছিলেন ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থাৎ প্যাকেজে সেটা না হয় বুঝি—কিন্তু নিরাট নিরাট আলো-আঁধারি সব মহাদেবের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল কী করে সেটা কিছুতেই মাথায় এলো না।

পরে অবশ্যই এই সব ইলুশন-মেশিন খুলে আমার হয়ে গিয়ে। অবিশ্যি তখন—অনেকই খোল সুতো পরিবর্তিত হয়ে

বেহুলা অনুরাগের ভালোবেসে তাকে অহীন চৌধুরী

গেছি—আমিই ঠিক করতে পারতাম না—কী করে হচ্ছে। আমাকে শুধু বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আলো দিয়ে চলে যেতে। আমি তাই করতাম। কিন্তু বুঝবার মতো মনে হচ্ছে ঐরাও হয়ে যেত কি করে?

বেহুলার শেষ সুতো এসে অবশেষে ব্যাপারটা বুঝেছিলাম। ওরা যখন 'সিনারী' সেট করতো, তখন আমি ঐরাদের পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতাম।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে দুটি জিনিস নিয়ে। বড়ো বড়ো তিন পিস কাচ আনা হয়েছিল, আর তিন দিয়ে মোলায়েম একটা বস্তু তৈরি হয়েছিল। যেটা লম্বা পাইপের মতো হবে। এর মধ্যখানে লম্বা একটানা ফাঁক থাকতো। ঘাই হোক ঐনিসটা অন্তর্হিতাদের ঝোলানো থাকে। তিনের কাঁচটা ঠিকমত লাগানো থাকতো সামি সামি একটা আলো, ওপর থেকে নীচে। পিছনে থাকতো কালো পর্দা। এই আলোটা আমার ওপর দিয়ে ঘিরিয়ে ফেলো ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে আমিও ঘিরিয়ে ফেলাম। আর একটা আলো ঠিকিয়ে থাকতো, যেখান দিয়ে লখিন্দরের আবির্ভাব ঘটতো ধীরে ধীরে। অর্থাৎ তার ওপর ধীরে ধীরে আলোক নিক্ষেপ করা হতো। আর দর্শকরা এই সুতো দেখে অভিভূত হতো।

যখন বেহুলা অভিনয় চলছে সবোরবে, সেই সময়েই একদিন শুনলাম, শিশিরকুমার ভাদুড়ী সপরে আমেরিকা যাত্রা করছেন। এর আগে এ সম্পর্কে জনাদুনা শুনেছি, তবে এবারে শুনলাম যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি। আসছে ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁদের শুভযাত্রার দিন।

একদিন অনোজনবাবু মিনার্ভার আমার ড্রেসিংরুমে এসে খুশির সুরে বললেন, আমারও হয়ে গেল আমেরিকা!

—কি হয়ে গেল?

—আমেরিকা যাওয়া, শিশিরবাবু সব ঠিক করে দিয়েছেন।

আমি একটু ছদ্মকণ্ঠে বললাম, তাহলে সোনার আলাদা! না কি এই বম্বাইয়ের বৃষ্টি পাঞ্জাবী পরেই যাবেন?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, সে সবের জন্যে আমার ভাবনা নেই। বড়জোর, বলেছেন।

আমি আবার বললাম, সে কী। আমেরিকা হল কনকনে ঠাণ্ডার জায়গা, তারপর আপনি হলেন আঁচড়েলেস, ওখানে কি চাঁদনীর ঠোঁড় ফোটপ্যান্ট পরে যাওয়া চলে?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, নতুন সোনার কথার পরদা ফেলবার? বন্ধুবান্ধবদের বলেছি, তাদের কাছ থেকে পরনো আর কনকনে ফেলে যোগাড় করে নেবো। যাব, আর আসবার সময় চলে আসবো।

বুঝলাম মহাপাত্রই। আমি আর এ নিয়ে মোটে কিছু বললাম না। এবারে মহাপাত্রের মোক্ষম ইতিহাসটা বলি।

১৯২৯ সাল।

সদ্য সেন এই সময় আমেরিকার ছিলেন। সেখানে তিনি নিয়োজিলেন ভারতীয় বিষয়ে কিছু পড়াশুনো এবং হাতে-কলমে কিছু সেখার উদ্দেশ্যে। সেখানে তাঁর সঙ্গে এলিজাবেথ মায়ারেনী নাম্নী এক কন্যা কন্যাকুমারী মহিলার আলাপ-পরিচয় হয়। এই মহিলার এসেনে যথেষ্ট আগ্রহ। এঁরা প্রথমে ও অর্থাৎকুলো এবং উদ্যোগে ভারত ছাড়ে বিদ্রোহের এক বিষয়ে মার্কিন-সম্প্রদায়কে আমেরিকার আনা সম্ভব হয়েছিল। তিনিই সদ্য সেনকে অনুরোধ করেন, যে ভারতের এক হিন্দুমেয়েদের আমেরিকার নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে।

এরপরেই সদ্য সেন আমেরিকা থেকে শিশিরকুমারের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। শিশিরকুমারের সম্মতি পেয়ে শ্রীমতী মায়ারেনী এলিজাবেথ ইয়েবর্গিং এবং উদয়শঙ্করের কলা নিয়ে কলকাতার পটলম সব বন্দোবস্ত পাকা করেন। এদিক এলিজাবেথ নিয়ে ছিলেন একজন আঁচড়েলেস। তিনি কলকাতায় এসে শিশিরকুমারকে কন্যাকুমারীর মেয়ে সব বন্দোবস্তের পাকা করলেন, টাকাকড়ি মিটিয়ে এবং কলকাতার সে ফাইনাল ছুটিস্তা সই করে আমেরিকা ফিরে।

এই কথাটা শুনেই আমার মনে হল— এটা কি হতে পারে? ওখানে গিয়ে যদি মেয়ে কারুর ওঁদের পছন্দ না হয় তাহলে এত-গুলো মেয়ে ফিরে আসবে কি করে? এতে মেয়েদের এতগুলো লোক আসা শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে। ওখানে কি হবে সেটা কিছুই জানে না।

শিশির সম্প্রদায় আমেরিকা যাবার আগে ওখানকার বিভিন্ন কাগজে কি ধরনের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল তার একটা নমুনা দিচ্ছি তুলে।

The Hindus are coming
"He has secured a company of beautiful nautch girls, maidens trained in the service of religion whose homes have been in the temples of India, and who, save for some special dispensation which Shadury must have arranged, would inevitably suffer loss of caste for leaving their Gods behind.....Many of these wonderful Nautch girls whom Bhaduri is bringing to America come from Benares, where it has been their task to perform twice daily before their idols for the atonement of their own souls and them in their intercessions through the rhythm of religious dancing for the sins of others.

এই দলে ছিলেন সর্বসাকুল্যে ২০ জন কন্যা : শিশিরকুমার, দ্রষ্টা, তত্ত্বাবধায়ী, সঙ্গীত (মেকি), পরিবল, বেলারাণী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমরকুমার ভাদুড়ী, অমরেন্দ্র লাহিড়ী, নিরেন চৌধুরী, রমারঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ চট্টোপাধ্যায় (মেক), ভোলা সেন, প্রীন চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ বসু, পাঞ্চালাল মুখোপাধ্যায় এবং শিশিরবাবুর খানসামা ছিলা।

শিশিরবাবুর দুটি দলে যারা ছিলেন— শিশিরবাবু মেয়েদের নিয়ে সাতজন মেয়ের ট্রেনে করাচী হয়ে আর বাকী সকলে বিভিন্নদের থেকেই জাহাজে উঠলেন ১০ সেপ্টেম্বর। আমার আগে বহু সংখ্যা থেকে শিশির সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানানো হল, শহরে এক বিরাট সভায় ইন্দ্রলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আলোক শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতে অভিনন্দন পাঠ করলেন। ইন্দ্রলাল ভাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে সে কি বিরাট জমায়েত। প্রত্যেকেই পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন শিশিরকুমার ও সম্প্রদায়কে। ঘরে আসে সোজা গাড়ীতে এক ফুলের মালা অভ্যর্থনা সে কল্পনাটেলী যোগাই হয়ে গেল। শিশিরবাবু তখন কামরার জানলার ওপর সেগুলো তুলে দিলেন।

তাঁর নির্দেশক পৌঁছলেন ২৫শে অক্টোবর অর্থাৎ পূরো ৪৫ দিন লাগল জাহাজে যেতে।

নিউইয়র্কে পৌঁছে প্রথমের ঘুমে শিশির সম্প্রদায়কে এমন একটা ফ্ল্যাট ঠিক করা হয়েছিল যে সেখানে মিটি হলে ছেলেদুটি মেয়েদের পৌঁছানোর তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হল। এক বিরাটভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল যে সে সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য দেশে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় নিউইয়র্কেই ছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ সে সম্বর্ধনা সভায় তিনি যোগ দিতে পারেননি। আমেরিকা বিশ্বভারতী

বিয়েটার ২৮ অক্টোবর উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়। রেহার্সাল চলতে থাকে যেমনই নির্দিষ্ট হয়ে থিয়েটার। অনেকগুলির মধ্যে দিন দুয়েক ছিল ১২ ঘণ্টার অধীন অবশেষে দিনে প্রায় ০৮ ঘণ্টার মধ্যে।

এদিকে দিয়ে যে সব টিকিট হলো। কিন্তু বিক্রয় অবশেষে প্রায় বিনোদিনীর অবশ্য।

শ্রীমতী সারদাসুন্দরী যেন অভিনয় করে, অভিনেতাগণ, অভিনেত্রীগণ যেন হয়ে গেল। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকজন ছিলেন বাঁধা পেশাদার স্টেজের অভিনেতা—বাঁধা স্টেজের বাঁধিয়ে দুর্গাদাস কাঁপাদাসের একমাত্র নিশিকুমারের যে প্রথম শ্রেণী অভিনয় অন্য কারুর অভিনয়ই তিনি অভিনয়ের পছন্দ হলো। তিনি দুর্গাদাস নাটকে অভিনয় না এমন যেমনেরকম ঈশ্বরচাঁদ বিদ্যেও অভিনয় করেছেন।

এমনকি অবশ্যে পথঘাটে পছন্দমত। তখন নতুন যেন যদি প্রকৃতির পর সাধারণের যে অবস্থার একটা অভিনয় করলেন—এর যে সকল পরম্পর মধ্যে অভিনয় ইত্যাদি প্রকাশ্যভাবে মানুষী আর একজন প্রতিনিধি রহিলেন। কিন্তু তার আগে 'নিউইয়র' যেমনই সমস্ত করতে প্রায় বছরে দর্শকদের। এমন বিশিষ্ট-পরিচয় 'বিনোদ অভিনয় ভট্টাচার্য'। দুর্গাদাসীর সব অভিনয় মধ্যে হতে বিনোদিনী তার প্রথম অভিনয় আরো হলো। সুতরাং যেমনের অভিনয় আবার নতুন করে অভিনয়ে প্রায়।

এই সব অভিনয়ের অভিনয় এবং অভিনেতাদের যেমনের প্রায় প্রায় বিনোদ সমস্ত প্রথম যেন—অভিনয় অভিনেত্রী মনে একটি বিয়েটারে নাটকীয়ের প্রথম 'নবীন' অভিনয় প্রায়। আগে অবশ্যসমস্ত বিশিষ্টকুমার ও প্রকার বিষয়ে বিষয়ে সুন্দরভাবে বোঝাইয়েছিল।

অবশ্য দুদিন দুদিন পরে অভিনয়ের বিষয়ে এলেন প্রায় প্রথমে পড়ে। অভিনয়ে অভিন বিনোদন, অভিনেতাদের মনে মনে অভিন বিনোদন—অভিনয় যেমন যায় অভিনয়।

সেই সময় আর একজন অভিনেতা বিনোদী তখন সমস্ত ইয়েরেন্স ও অভিনেতাদের বিনোদ সুন্দরভাবে প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠাকর্তাদের তার পরিচয় বিনোদিনী—তিনি হয়েন উপেন্দ্রনাথ। সুতরাং এর অভিনেতা বিনোদী যোগাতে যেমন অভিনয় সুন্দর উপেন্দ্র করে উঠেছিল যেমনি অভিনয় বিনোদনের যোগিনাথী ও অভিনয়ী বর্ণিত তখন সমস্ত ও অভিনয়ের প্রকাশ যেন অভিনয়ও সুন্দর এসে সমস্তের।

বাঁধা অভিনয় অভিনয় অভিনয়ের সমস্ত এই অভিনয়ের সমস্তের যেমনে যেমনভাবে সেই, তবু একটি যেমনের বিনোদী অভিনয়—এমন অভিনয় অভিনয় প্রায় প্রথমে প্রায় এসে পায়। যেমনে বিনোদ বিনোদীর অভিনয় নয়, সমস্ত যেমনে, সমস্ত প্রায়ের অভিনয়। অভিনয়ের একজন প্রথমে বুঝিয়েছেন তার প্রথম—এইখানেই যা যেমন যা অভিনয়।

আর অভিনয় অভিনয় বিনোদ অভিনয় বিনয় আসি। পুরাতন সুন্দরের বিনয় অভিনয় যেমন হলে একটি যা অভিনয় সাধারণের মধ্যে প্রথমে লাগল। অবশ্য এই সকল বিনয়কুমারী, অভিনয়ীর, অভিনয়ের প্রকৃতির সমস্ত প্রায় প্রায় প্রকাশ্যভাবেও হলো। এতে আমি অবশ্যই অভিনয়।

অবশ্য আবার বর্তমান এসে পড়ল—বিনয়ভিত্তি প্রথা অভিনয়ী নতুন প্রায়ে যেমন প্রথম। এইবার বুঝিয়েছেন সমস্তাভিনয়-এর পরিচালিত যা অভিনয়ের যেমনে উপেন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন, যেমনি তার করে বিনোদন। বাঁধা নাটকখানি যেমনভাবেও প্রথমে এর নাম ছিল 'দক্ষযজ্ঞ-কি দুঃখ?' অবশ্য হলো 'দক্ষযজ্ঞলীলা'। আমি বুঝিয়েছেন প্রথমেই বলেছেন—বাবা, এই-খানির নামটা বদলানো দরকার।

বুঝিয়েছেন অভিনয়—কি নাম যেমনে আর বলতে চাও?

আমি একটি; ভেবে নিয়ে বললেন। 'যেমনের প্রায় যেমন নামে?

বুঝিয়েছেন সমস্ত সমস্তই প্রায়ী হয়ে যেমনে, বললেন—বেশ ভাল, এইটিই থাক।

'যেমনের প্রায়' প্রকাশ হলে বিনোদের বিনোদন ১৯০০। বইখানি অভিনয়ী খুব অভিনয়ে, প্রথমেরও অভিনয়ও হয়েছিল প্রথমের। ভূমিকালিপি ছিল এই প্রকার : দুর্গাদাস—আমি, কমলাইলাল— নাম চক্রী, যোগীনাথ—উঁচাত প্রায়, পরেশ—অমলে, অন্নপূর্ণাদাস—প্রায়ন সমস্তার, নিয়ন্তন—সুরেন প্রায়, প্রায়ী—অভিনয়ের, সুনীতি—অভিনয়, তপুল—যেমনের।

এমনকি প্রায় অভিনয়ের আর যেমন নতুন যেই করা হলো না। পরবর্তী নাটক বিনোদী অভিনয় যা অভিনয়, সেটি হলো অভিনয়ের যেমনের 'অভিনয়'। পরবর্তীর নতুন নাটকের, এর আগে তাঁর 'অভিনয়' নামে একটি নাটক বিনোদনেরই অভিনীত হয়েছিল। সে নাটক সব দিক থেকেই সফল নাটক, যার ফলে উপেন্দ্রনাথ একটি; যেমন অভিনয় করলেন।

যাই যেমন, 'অভিনয়' নাটকটি যেন উঠানামের হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এ নাটক সমাদর পেল না। তবে নাটকটির এবং বিনয় সমাজ এই নাটকটি সম্পর্কে উচ্চ অভিনয় প্রায় করেছেন।

অভিনয় অভিনীত হয় ১৩০১ সালের ফলে যায়। এর বিশেষত্ব ছিল এক সেই সময় নাটক অভিনীত হলো। চার আগে এই সেটের বিষয় প্রকাশের হলো। প্রথমে অভিনয়ের চার বিষয়ে যেমনের হলো, এমনি ঘরে পর্যায়ক্রমে যেন আগে। যেমনের হলো পাঁচটির চার অবস্থা।

একটির দিন-সিকটার প্রথম দৃশ্যের আড়ম্বরটি যেন দৃশ্যের সমিতির মিলে ফুল বিরোধিল। প্রতিযোগী সেটি সমাজে হলো, কিন্তু যে সমাজটি প্রায় সেদিন ফুল ধরে ছিল। এই ফুলটি চোখে পড়লে সমাজ নাটকসমালোচক যেমনভাবেই করেন। তিনি এই ঘটনা নিয়ে অনেক ধরে লিখেছেন সমাজের। কিন্তু সাধারণ অভিনেতা যেমনভাবেও বিরুদ্ধে। এই কিন্তুটিই আমাদেরই সমস্ত করা হয়েছে, যা দৃশ্যের আমি যেমনের না। বাঁধা প্রয়োজক হিসেবে বিনোদকে দেখাও আমি আশ্চর্য করিনি। বাঁধা প্রয়োজনের দায়িত্বটা যে আমারই ছিল, তা অস্বীকার করি না।

'অভিনয়'-র ভূমিকালিপি ছিল এই প্রকার : দুর্গাদাস—অমরেন্দ্র চৌধুরী, প্রথমে—নরেন চট্টোপাধ্যায়, অমলে—হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর—অমলে যেমনভাবী চুনিলাল — প্রায়ন সমস্তার, অন্নপূর্ণা—হারুণশীলা, চন্দ্র — আশুতোষ, সমাধী—অমলালতারা।

এই অভিনয় সম্পর্কে অমলকার বিভিন্ন বিশ্লেষণ্যিলেন, প্রয়োজনার বিষ বিষয় নাটক এখনোর নিখুঁত হইয়াছে বলা যায়। যে নাটকের নাটক অমলাবি ঘনশ্যামের অভিনীত হইয়া আসিতেছে, অভিনয় ঠিক সে-ধরনের নাটক নয়।

অবশ্যকে যেমনের, 'অভিনয়ভাবিনী যুদ্ধপ্রকাশের সমস্যার বাঁধিয়াই তিনি অমল যেমনেরকে সর্বাংশেভাবে। তাঁর অভিনয়ের-পুলি সর্বাংশে অভি সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণিকার ধরনে অমলাবতারের সমাধী সমস্তার আগে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী যেমনভাবের অন্নপূর্ণা ও আশুতোষের চন্দ্রও ভালোই হয়েছে।

এইরূপ একটির 'অভিনয়' অভিনয় শেষ হবার পরই আমি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অভিনয় আগে যেমনই অসুখ-অসুখ ভাব হয়েছিল। ভেবেছিলাম, খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলে সেরে যাবে। কিন্তু 'অভিনয়' শেষ হতে ঘণ্টা হলো, এইরূপ প্রয়োগ-দিনে অভিনয় করতে পারলো না। শরীর একেবারে দুর্বল। অগত্যাকে অমলাবতার যেমনভাবে।

অবশ্যকে অমলাবতার, কিন্তু অমলে যে। আর অভিনয়ের কি অসুবিধে।

অমলাবতার, অমলাবতার কিছু; নেই, আমি হরিলালকে অনুরোধ করছি।

যা যেমন, অবশ্যকে রাজী হলেন। কিন্তু সকলের চিন্তা—আমি অভিনয় করলে কে বিজ্ঞাপন যেমনভাবে হয়েছে, অভিনয়ে অভিনয় অভিনয় যেমনে কিনা। অমলাবতার, যেমনভাবে কী হয়।

কিন্তু হরিলালবাবু যেন এখনো নেই। তিনি অমলে যেমনভাবে। আমি তাঁকে চিঠি লিখে অনুরোধ করে পাঠালাম। যেন পরদিনই চলে আসেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি যে, হরিলালবাবুই অভিনয়ের অমলাবতার। আমার অসুখে তিনিই এই চরিত্র অভিনয় করেছেন। এবং অসাধারণ করেছেন।

হরিলালবাবু আসতে তাঁকে অভিনয় করে রাজী করালাম। তারপর হরিলালবাবুকে মেক-আপে বসিয়ে রেখার মাইক যেমনে যেমনে করা হলো, যে অভিনয় অনুপস্থিতির অভিনয় হরিলাল নয় অভিনীত হবেন অমলাবতার ভূমিকায়।

কিন্তু বিনয় হলো যেমনভাবে। বিশিষ্ট নাটকী যেমনভাবে যেমনিভাবে অভিনয়ের ছিল। যেমনভাবে অমলাবতার ফুল হবে না। জিজ্ঞাসা অমলাবতার, আপনারা এখানে কিছু অমলাবতার যেমন?

(ক্রমশঃ)

চিত্রশিল্পে মিকেলানজেলো বুঅোনারতি

মেসেনাস বংশের দুই ভ্রাতৃস্থানীয় লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি এবং মিকেলাঞ্জেলো বুঅোনারতি। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে দুই ভ্রাতৃস্থানীয় নয় প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে উল্লেখিত। অবশ্য সমকালের, সমসাময়ের দুটি মানুষের মধ্যে যতখানি বৈসাদৃশ্য থাকা সম্ভব, উভয়ের মধ্যে তা ছিল।

যখনে মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫—১৫৬৪ খৃ) লিওনার্দোর চেয়ে চৌদ্দ বছরের ছোট এবং লিওনার্দোর মৃত্যুর পর তিনি আরো পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। লিওনার্দোর মত তাঁরও জন্ম সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন মাজিস্ত্রেতী। লিওনার্দোর পিতার মত তাঁর পিতাও চেয়েছিলেন যে, তিনি গ্রীক ও লাতিন শিক্ষালাভ করুন এবং কোন 'সম্ভ্রান্তির পেশা' গ্রহণ করুন। কিন্তু সেই দুটি বালকই অন্যতের বার্তা নিয়ে এ-পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই চিরাচরিত পথ তাঁদের নয়। অতএব লিওনার্দোর পিতার মতই মিকেলাঞ্জেলোর পিতা বালক পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে ফ্লোরেন্সে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে ভের্রোকিয়ো ভিঞ্চারলান-দোয়ার কাছে তাঁর শিক্ষানবীশী শুরু হয়।

লিওনার্দো ছিলেন বিলাসী, আরামপ্রিয় জীবনের পক্ষপাতী। পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। কোন কোন সমসাময়ে বলেছেন, অমন কোন সমসাময়ে আসন গ্রহণ করে নেননি। এমনকি শহরের নিয়ন্ত্রণে তিনি নীরার খাঁড়িখাল এবং শিলাদের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে দুর্গ-উৎস হননি। শিল্প ছাড়াও বিজ্ঞানের বিবিধ অনুশীলনে উৎসাহী। কিন্তু-প্রকৃতির অমল অন্তরে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটনেই ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তিনি যদি তাঁর সেই অমল জিজ্ঞাসা ও সন্ধান নিয়ে উদাস পথের যেতে থাকতেন, তবে সম্ভবত তিনি রহস্যসন্ধানী অভাগাদের হতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের কাজে শিল্পসাধনা অনেক সময়েই বাধা হয়ে দেখা। জীবনে প্রতিষ্ঠা তাঁর পক্ষে ছিল প্রায় অনাবশ্যক। অনুকূলী ছেড়ে যাওয়া, বাদশাহ নয়, নিজের খেয়াল ও দীর্ঘসূত্রতাই তাঁর সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

অন্যের মুখাপেক্ষী মিকেলাঞ্জেলোর কাছে শিল্প ছিল আত্মপ্রকাশ। লিওনার্দোর প্রায় অবাস্তবসদৃশ প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় তিনি যেন আসলে হতে নিতান্ত চাঁছাছোলা। সারাটা জীবন ধরে এত অসন্তুষ্টি, হতাশা ও উদাসীন সহ্য করার ক্ষমতাও এমন মানুষে যে কি করে থাকা সম্ভব তা ভেবে পাওয়া যায় না। অভিজাতদের তিনি কখনো ভালো চোখে দেখেননি। একবার তিনি বলেছিলেন, "লিওনার্দো কিংবা মিকেলাঞ্জেলো, চিত্রশিল্প অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে বড়ো। তিনি জানেন যে, অন্য যত শিল্প তিনি নিয়েছেন, সেই সব বিষয়ের চেয়ে চিত্রশিল্প সম্পর্কেও তিনি গভীরদর্শী। আরো আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো কিছুতে পারে।" আরেকবার কার্ডিনাল ফেরেজ বলেছিলেন, "অন্যজন যা হাতে ধরেন, তাতেই ভালো লাগে না।" প্রথম জীবনের এই অন্তর্বিরোধ সমসাময়ের ঐতিহাসিকদের পরিণতিতে এই দুই শিল্পীর চিত্রদৃষ্টিতেও একটা প্রতিফলন দেখা যায়। লিওনার্দোর অন্তর্মুখতা মনোযোগী সুবিধা, সংশয়, অন্তর্মুখতা, মাঝপথে বিশ্লেষণবিরোধী। আর মিকেলাঞ্জেলোর সমস্ত সৃষ্টির ভীরে যারা মূর্ত হয়েছে, তারা প্রথম—সূর্যের, দেবদীপ্তিমানের। অন্তর্মুখে, তিনি তুলি নিয়ে অন্তর্মুখে বিশ্লেষণ করে তুলতেন এবং বলে যেতেন, "চিত্রশিল্প যদি অন্তর্মুখে মনোযোগ ও নিষ্ঠাবান আনে, তবে তা হয় অন্তর্মুখ। কিন্তু অন্তর্মুখ যদি চিত্রশিল্পের চোখ অন্ধ করে দেয়, তবে তা হয় অন্তর্মুখ।" লিওনার্দো যে অন্তর্বিরোধের আলোআঁধারে জন্ম নিয়েছিলেন সেখানে অন্তর্মুখ শুরু প্রাসাদিক আর মিকেলাঞ্জেলোর মধ্যে অন্তর্মুখ প্রথম প্রহরী মিকেলাঞ্জেলোর কাছে অন্তর্মুখ বিশ্লেষণীয় ছিল। কিন্তু তবু মিকেলাঞ্জেলোর সৃষ্টি অন্তর্মুখ কোন দিনের প্রশ্নোত্তরকালী নয়। তাদের কোন পরিবেশ নেই। তাদের কিছু কোন আবহাওয়া নেই। তাদের ওপর কোন বিচিত্র আলো প্রতিফলিত হয় না। তারা অনাবৃত, স্বপ্রকাশ, পরিবেশহীন।

দুই অন্তর্মুখীই জানতেন যে, তাঁর অমল প্রতিভাকণাই হোন না কেন, তাঁদের সৃষ্টি কখনোই তাঁদের কল্পনাকে প্রকাশ করতে পারবে না। লিওনার্দো বলে গিয়েছেন যে, চিত্রশিল্প হচ্ছে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির অভিব্যক্তি, তাঁর নির্মাতির বিবৃতি। তাই কোন কিছু সম্পূর্ণ করতে তাঁর ছিল ঘোর বিধা। অন্যদিকে মিকেলাঞ্জেলো চিত্রশিল্পকে কোনদিন তাঁর প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে লিওনার্দোর মতন বিশ্লেষণের বিশ্লেষণে তিনি চিত্রশিল্পের আগে কোন কিছুকে অভিব্যক্তির ও অভিব্যক্তির কথা মনেও করেননি।

দুই শিল্পীরই আরেক বাধা ছিল দেহ। লিওনার্দো অন্তর্মুখতায় তাঁর দৈহিক শারীর-সীমাকে নিজস্ব ও অনুভব অবাধগতায় নির্দিষ্ট করে গেছেন। মিকেলাঞ্জেলো নিজেকে অভিব্যক্তির ও অভিব্যক্তির কথা মনেও করেননি। তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর অন্তর্মুখ শুরু পর প্রকাশিত তাঁর অন্তর্মুখতা আসলে মরীর ও অন্তর্মুখী।

সুতরাং এ-অনুমান বৃথা নয় যে, মহাকালের পদধ্বনিশুনে পুনর্জন্মী ফ্লোরেন্সের পথে পথে, কক্ষে কক্ষে যখন সেই দুই বিপরীত চিত্র শিল্পীমানসের দেখা হয়েছে, তখন সে-মিলন শুধু চাঞ্চল্যকর হয়নি। এবার ফ্লোরেন্সের পথে পথে মিকেলাঞ্জেলো দেখলেন যে, লিওনার্দো একদল মার্জিতের সঙ্গে গানের আবহাওয়ায় আলোচনা করছেন। তাঁকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে লিওনার্দো বলে উঠলেন, "আপনারা যে-বিষয়টি আলোচনা করছেন মিকেলাঞ্জেলো তা আপনাদের বলতে পারে।" লিওনার্দোর আহ্বানের মধ্যে সম্ভবত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাটি ছিল না। কিন্তু সম্ভবত-

পরাজয় ও অপমানের বিষোদ্‌গারের ঝড় তুলেছিল। তিনি তাঁকে অপমানিত বোধ করেছিলেন। তিনি তাঁকে ঘৃণা করতেন, শ্বাসরোধী ঘৃণা করতেন তিনি। আপনি—যিনি একটি ঘোড়ার চুক্তির জন্যে ষড়যন্ত্র তৈরী করে তাকে সম্পূর্ণ না করেই চলে এসেছেন। আপনাকে বিশ্বাস—বিজনের ভিয়েনার প্রাসাদ-চত্বরে দিগ্‌ভ্রান্তের অসম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন প্রতিটি মিখায়েলোভের এই ইন্দ্রিয়।

দুই

বিয়ারনহেলমের কন্যা মিখায়লোভিচের প্রত্যাবর্তনে মিখায়েলোভের তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিভার বহুমুখিতে সাহায্যের এমনি চমৎকার সমন্বয় যে বহু লোকের আশাকেই ছাপিয়ে গেছিল। ভিয়েনার সংবাদপত্রে মিখায়লোভিচের প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়ে আন্তর্জাতিকতার ভাষ্য পড়ার পরে বহুদিন একটি ঘৃণার ছায়া পড়ে গেছিল। ঘৃণার গর্ভ ছিল আধুনিক ইতালীর ভবিষ্যৎ ক্ষমতাকেন্দ্রীয়ের কন্যা সন্তান। তাঁরা ভিয়েনার প্রাসাদে থেকে ভিয়েনের সংস্কৃতির প্রতি ও ঘোরান হৃদয়ের অন্তর ভিন্ন-ভিন্নসম্পদ সমর্পিত হয়ে তাঁর পাঠাগার ও ভিয়েনিজদের আবাস ব্যবহারের সুযোগ পাবে। তাঁদের শিক্ষা-দৃষ্টে হবেন ভিয়েন বন্ধুবাদের যেন অধিকার ভিন্নী। প্রতিদানে ভিয়েন ভবনে শিক্ষাবীর প্রতিনিবেশ ছাড়া আর কিছু চাপ না।

সেই নতুন শিক্ষাবীর কন্যা ভিয়েন প্রভাবনার এত অধিক পেরেছিলেন যে, তাঁকে তিনি সম্মতে পরিবারের একজন করে নিয়েছিলেন। তাই প্রাসাদের যোজনাবাহার ভবনে মিখায়েলোভো প্রতিদিন ভোরবেলার চলি বন্ধুকের খেলা খেলেন। ঘুরতেন ভিন্ন বনে, ঘোরান ভিন্ন ও শ্রাদ্ধিন সরোবর আলোচনা। সেখানে, ভাগনীলিক ভগ্নাবাসে ও রাষ্ট্রপ্রধানকের আহার-আড়ম্বর। কন্যু সেই পরিবেশ তাঁর ভোল চরিত্রকে কোনোকৃত প্রভাবান্বিত করেনি। কন্যুত মাঝেমাঝে বাইরের যেন প্রভাবটি তাঁর ভেল, অনুসন্ধিৎসা স্পর্শকাতরতা এবং সেই সঙ্গে এক আশ্চর্য, অন্যমা সাবলীল বহুকে পরিণতি ও ঋজু করেনি। মৃদু একটি ঘোরাই ভার বাড়িয়ে।

সেদিন প্রাসাদে আমন্ত্রণকারী মানুষের পরিচয়-সম্বন্ধে সম্পর্কে সচিব ভাবে নিখুঁতাবে সবকিছু হবার প্রতিজ্ঞায় তিনি ব্যবস্থাগুলি শুরু করেছিল। অতিথ ব্যাপারকে ভবিষ্যৎ ভূমি সম্বন্ধের ভাবে বিশিষ্টতে তিনি বুঝেছিল সচেষ্ট করেছিল। তাঁরপর এক রাত্রির ছোট কুঠিতে বসে তিনি ব্যাপারটি সেই ভোরবেলি ব্যবস্থাপন ও বিশ্লেষক করে প্রয়োজনমত স্কেচ করে নিয়েছিল। সেই পরিকল্পনার মধ্যে পরিচ্ছি তাঁর পরিচি ভেঙে পড়লো। পানাহারে অরুচি হয়ে গেল।

সেই সময় একটি ভেলোপাথক ঘটনা তাঁর চেষ্টাকে চিরবিদায়ের জন্যে বিদ্ধ করে দিল। প্রথমে তিনি ও তাঁর সহকারী ভিন্ন-ভিন্নকারীয় সবলে চার্চ অব দি ভাগবতীয়ে ভগবানের ভবনকে ভবন-পরিচি ভেলের পরিচালনে। সকলের পরিচয়ের কর্মীবৃন্দ-ভার ভবনে তিনি তাঁর সহকারী ইঁরিজিভাষা নামে এক ঊনত্রিশ ও বেলজিয়ান চরিত্রের বালককে বিদ্ধ বলেছিলেন। ইঁরিজিভাষা আচ্ছিতে তাঁর মায়ের ওপর এক ঘৃণ্য ঘটিয়ে দিয়েছিল। ইঁরিজিভাষা নিজেই সে-সম্পর্কে লিখে গেছেন, "আমরা আমি ও মিখায়লোভের ভূমেন্দ্রাবাস কারমাইনের পরিচালি ভগবানের ভবন-পরিচি নিয়ে করছে বেরোয়। মিখায়লোভের সহকারী ছিল সতীর্থদের নিয়ে পরিশ্রম করা। একদিন সে বলল আমাকে বিদ্ধ করছিল, তখন হঠাৎ আমার মেরোর বিষয়ে গেল এবং আমি তার মুখে এক ঘৃণ্য ঘটিয়ে দিলাম। তার হাতের বিন্দুটির মত তার সারাদেহ রাগেতে আমার মুখের নীচে ভেঙে গেল। আমার সেই মারের ফল সে কবর পর্যন্ত বয়ে বেড়াবে।—এই একটি ঘটনাই মিখায়লোভের চরিত্রের ভগবান ঘটনার প্রভাব বিস্তার করে। ঘটনার ফলশ্রুতি অনেক দোলি পরে আমিত ও চিন্তাভাবনীয় হয়ে মিখায়লোভো অন্তর্মুখ হয়ে উঠতে লাগলেন। তার আঘাত করে ভবনে ভেলোভের জীবিত ভগবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি দুরন্তপ্রসারী হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু ধর্মের পাথরের চাপের নিচে ভেলী ও রাষ্ট্রনীতির আঘাতে ভগবানের দুর্গ বিদার, ঐক্যাস ও সভ্যতাকে ভেঙেরে তিনি মুক্ত করে ভেলেন যে আলোকে এখনে বিভ্রান্তিমুক্ত। ইঁরিজিভাষা মিখায়লোভোর উদার ও মুক্তমনী দৃষ্টিভঙ্গির সহজেলো ধারা ভেলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। সেই নিবন্ধনি ঘাটতি মিখায়লোভোকে নিয়ে ভূমেন্দ্রের প্রতিমূর্তি করতে মৃদু করেন। উদার ও বিশ্বস্থ ভিন্নী ভোরেলস্ ভেঙে করে ভেলে নিশ্চাস করলেন। তদুপরি এক ভেরোভিনী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ভোরিন পরিবারের পতন আসন্ন। মিখায়লোভোর সম্পাদকরূপ এর নিমাদুন সম্পাদনায় হয়ে উঠলো। তিনি ভেরোভার পালিয়ে ভেলেন। কিন্তু বহু না যুরেতেই তিনি আবার ভোরেলসে ফিরে এসে ভোরিন পরিবারের অন্তরঙ্গতি ঘনিষ্ঠের আবীনে কাজ নিলেন। সেই সময় ভোরবিলাসের বিরুদ্ধে এক সমালনী সাক্ষোলনালয়ের ভাষী তাঁকে আক্রান্ত করতে থাকে।

ভবনে আসার মাসেই মিখায়লোভোকে আবার ভোরেলসে ভেঙে ভোরে ভেলে হোল। এবার উপলক্ষ আরো গুরু গাম্ভীর্যের। দুরন্তপ্রসারী পরিবারে অর্থসংকট ভেখা দিয়েছে। সেই সংকট সমাধানকল্পেই তিনি ভোরে ভেলেন। ভেখানে আরেকটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন তিনি বিশ্বাসঘাতী খাতির অধিকারী হলেন। কিন্তুদিন পরে যখন তিনি আবার ভোরেলসে ফিরে এলেন, তখন গভীরী কর্তৃপক্ষ, সাক্ষাৎকার, সমবেদনার ও আপত্তির তাঁকে প্রচুর বাধা দিতে উদ্যত। সব কাজই ভাগবতীয়। অবশ্য এর একটি বিশেষ ঘটনাও হয় যখন পরবর্তী ভবনে আইনসিদ্ধ ভোরবাসের ভেখানে তাঁকে ও লিওনার্দো-দা-ভিন্সিকে আহ্বান করা হলো। সারা ইতালী সর্বসম্মতে এই দুই বিশ্বের প্রতিভোগিতা ভেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের কেউ সে-কাজ শেষ করতে পারলেন না। রোম থেকে ভোরে মিখায়লোভোকে ভেকে পাঠালেন।

রোমে পোপের আসনে তখন বৃদ্ধবাজ ক্লিমেন্ট। ক্লিমেন্টের তিনি সৈনিকদের বুকুর দিয়ে কাজ করাতে আরম্ভ। কিন্তু মিখায়লোভো তো বুকুর-জাতিকে-কুকুর সমাজের ভিন্নী নন। পোপ তাঁকে জানালেন যে, তিনি সেন্ট পীটার্স' গীর্জার অভ্যন্তরে তাঁর ঊনত্রে একটি সমাধি নির্মাণ করাতে চান। মিখায়লোভোর পোপের অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন। ভেখা ভেল, তখনকার সেন্ট পীটার্সের পক্ষে সেই পরিকল্পিত সমাধি হবে অনেক বড়। মিখিকদের চিত্রে, ভেল একটি বাস্তি আসনাসনের মুকুল বিন্যাস,—এইকারে পোপ সেন্ট পীটার্স' গীর্জাটি ভেঙে ভেলার মুকুল ভিলেন। পোপের সেই অভিলাষা অধিবাসকারিতার ভিন্নীর মনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানার উপায় নেই। তবে শেষপর্যন্ত তিনি ভেরে-ছিলেন যে, সমাজীবিন মনে আর কাজ করবার মত কাজ তাঁর অবশেষে ফুরিয়ে ভেল। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে তিনি আমেরিকা যাত্রা করলেন।

ইতিমধ্যে পোপকে যে ভোরার যে, জীবিত ব্যক্তির সমাধি নির্মাণ অসম্ভব-জনক। তখন তিনি সমাধি নির্মাণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করলেন। উপযুক্ত ইতিহাসের সেই আচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে মিখায়লোভো নিরাসক্তভাবে অবস্থিত হলেন। জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলতেন, "সমাধিসংক্রান্ত ঝোঁঝোঁমি"। সে-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা ছিল, আমার ও পোপের জন্যে সমস্ত অসম্ভাবনাগুলির মূলে আছেন স্বর্গীয় ভূমেন্দ্রে এবং তাঁর আসনের আইনেও রাজাধীন। তাঁর আমার সর্বমান সাধনে কখনোসিক্ত। তার অনেকই কারণও আছে। আমি ঐ স্বর্গীয় জোড়-ঈশ্বরের অবতার ও রাজাধীনের নিশ্চয়তার যে আমার কাছ করবার ভিন্নী তা তাঁর করে দিয়েছি। তাই ভূমেন্দ্রে পোপকে বুঝিয়ে-ভেল যে, সমাধি নির্মাণ আমার অসম্ভব নয়। তাঁদিকে পোপেরও ভেলোনার মুক্ত হবার জন্যে আমার প্রয়োজন। সুতরাং তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, ভোরি কিন্তু বড়, ভেখেল ভবনেই ভোর না ভেল, ভেখেলসমের বিদেশে তিনি আর একটি সমাধি ভেখেল দেন। আমি জানাবার যে, আমার অনেকই নিজস্ব ভবনের এবং পোপকে জানিয়ে বিদায় যে আমি ভেল ভেঙে চলে যাচ্ছি।

ঘরটা দুই সপ্তাহ ভোরে ভুলিয়ে আমি ভোরেলসে ফিরে এসে প্রথমে ভেখেলসের ভাবটা ভেল করবে উঠলাম। তাঁদিকে পোপ উপায়ের বহু ভোরে চাঁদিকের ব্যবস্থা সমাধানে এবং আমাকে ভবন পাঠালেন যে, ভোরাভবনে ভোরে কিন্তু ব্যবস্থাদি করেই ভোরে, তিনি আমাকে ভেরে ফিরে যাবেন। আমি সে-কথায় কান দিলাম না। কিন্তু

ক্রমেক্ষেত্রসেবাশ্রমীরা তার সেবার ভার নেয়। তারা জানালো সোপ হয়তো বছর আষ্টেক বাঁচবে। হয়তো তাদের অনুমান ঠিকই। তারা এসে আবার রোমে ফিরে যেতে অনুরোধ করলো এবং বললো, সোপের অনুরোধ অন্যায় অন্যে তাদের কর্তব্যে সাহসে কুলোবে না। অতএব আমি সোপের সঙ্গে দেখা করতে যোলনলা যাত্রা করলাম।

যোলনলায় আমি যেন পালায় কষি লাগিয়ে দেলাম। সোপ আমাকে দেখেই তাঁর বলা-অবস্থায় একটি ছোট্ট চিঠি উদ্ধৃ মুর্তি পড়তে আদেশ দিলেন। আমি সেই অবলা শহরে ৮ বছর থেকে রাইটিনি কাজ করলাম। সেখানে পনের মহলের ঘর। চারিদিকে দেয়ার মহম্মদীর আকারে দেখা দিল। আর্কিয়রেরা সব চোর। আমাকে এক সিংহাসনে বিসজন সাধকদারীর সঙ্গে রাত কাটাতে হতো। অবশেষে আমার কাজ শেষ হলো। সোপ আসের ঘরটি পরনা সেই অনুরোধ দেখিয়ে খুব খুশিটি ছাঁচে ফেলার ভার দিলেন। কিন্তু আমার পারিশ্রমিক হিসেবে একটি পয়সাও নয়। —এর কথা কাটা যাবে মুখের ছিটে পড়লো। ক্ষুব্ধ যোলনলা ফিরে এসে মুর্তিটির ছাঁচে গলিয়ে একটি আমান তৈরী করে তার নাম দিল আলিয়া।

শিল্পী আবার রোমে এলেন। এবার সোপ তাঁকে আর্টাইকস প্রাসাদের সিস্টিন দেবীর শিলিং চিত্রাঙ্কনের ভার দিলেন। মিকেলান্‌জেলো বাধলেন যে, এর পেছনে স্বর্গীয় হাতান্‌তের কারসাজি আছে। কারণ, জিনিয়ুরী স্বর্গীয়-প্রতিভাকে চিরাশ্রয়ে রাখা করিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে, অন্তত ঐ বিষয়ে ক্ষেত্রে তিনি রাফাইলের চেয়ে ছোট। মিকেলান্‌জেলোর নিজের জবান, "এরা ছেবেছিল ঐভাবে আমাকে বন্ধু করবে। আমি সোপকে বললাম যে, বাল্যকালের পর থেকে আমি কখনো চেসেকো আঁকিনি। ও আমার পেশা নয়, ও মেয়েদের কাজ।" সোপ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "চুপ করো। তুমি কি পারো, আর যা-পারো সে-বিষয় কথা আমি।" অনুক্ষ-মনের শিল্পী একটা বাজনায় সোপের পরিকল্পনা তৈরী করে সোপের সামনে হাজির হলেন। কিন্তু সেবেপর্যন্ত নিজেই লজ্জিত হয়ে সে-পরিকল্পনা ছেঁড়ে ফেলেন। সোপ রেগে আগুন হয়ে উঠলেন—এইবার কাজে বসো।

এরপর পরে উৎপীড়িত, অসন্তুষ্টিত, আসাদত শিল্পী যেন মেতে উঠলেন। উৎসাহের চলন হয়ে উঠলো তাঁর মন। কল্পনা মেলো পাখা। তিনি এসে দাঁড়ালেন সিস্টিন দেবীর মেঝেপরে। ওপরে ছাঁচালার উচ্চতা ৬৮ ফিট, প্রস্থ ৪৪ ফিট সিকি ১০২ ফিট। অর্থাৎ ছাঁচে চিত্রাঙ্কিত করতে হবে প্রায় ১০ হাজার বর্গফিট। একক মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য এক প্রয়াসাভিযান। শিল্পী কিন্তু একটুও নিরুৎসাহ না হয়ে ভাবলেন—শিল্পীর মন বলিষ্ঠ নিয়ে। হাত নিয়ে নয়।" তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে ওপরে টেস্টামেন্টের (১) ঈশ্বর আলো ও আঁধারকে বিভক্ত করছেন, (২) ঈশ্বর জোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছেন, (৩) ঈশ্বর বীরত্বীকে আলীবাদ করছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে মানুষের সৃষ্টি ও পতন। (৪) আকাশ সৃষ্টি, (৫) ইভের সৃষ্টি, (৬) ইভ কর্তৃক আদমকে প্রলুব্ধ করা ও আদমের পতন, (৭) নোয়ার প্রলয়, (৮) প্রায়শ্চিত্ত, (৯) নোয়ার প্রসন্নতা। —এছাড়া থাকবে অবশ্যকার পরমসত্যের একক চিত্র। লোভাবর্তনের জন্যে বহু অপসরা-কিন্নরী-দেবদূতের মূর্তি।

স্বর্গীয় হাতান্‌তের মনে যাই থাকুক, মিকেলান্‌জেলোকে প্রাথমিক সাহায্য দলে তিনি ত্রুটি করলেন না। আজ্ঞাবহ কাজ করার জন্য তারা বাঁধা হলো। আদর্শ লাগানোর জন্যে মিস্ত্রী এবং শিল্পীকে সাহায্য করার জন্যে আর পাঁচজন দক্ষ শিল্পী সাগরেদ নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিকেলান্‌জেলো সেই শিল্পীর দলকে বিদায় করে দিলেন। ছাদ-গড় চার বছর ধরে প্রায় অহোরাত্র করে পরিশ্রম করে তিনি কাজ করে চললেন। আর সে কী কাজ। মিস্ত্রীরা খানিকটা করে আস্তর লাগাতো এবং তিনি চিত্র হয়ে শুয়ে মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক মহাকিংবদন্তী সৃষ্টি করে চলেছেন। তাতে কি ধার্মিক ধারিয়েছে? এদিকে জুলিয়াস পরিবারবর্গের ভিক্ষুদের অন্তরের ভাগুদের আর এদিকে লড়াই-খাপা পোপ মিস্ত্রীকে একটি পয়সাও না দিয়ে মোলনলায় লড়াই করে বেড়াচ্ছেন। ঐ সময় একটি চিঠিতে মিস্ত্রী তাঁর ভাইকে লেখেন, "আজ এক বছর হতে চললো পোপ আমাকে একটি পয়সাও দেননি। আমি একদম কপর্দক হৈহিক অবস্থায় আছি। আমাকে দেখবার পর্যন্ত কেউ নেই। রোমের সবকিছুতো একেবারে হারাম-জাদী। আমার কোন বন্ধু নেই, আমি কারুর বন্ধুত্ব চাইও না। আমার খাবার পর্যন্ত সময় নেই। আমার বোকা চোখেরা আর বাড়িও না। ভগবান আমার সহায় হোন।"

অবশেষে ছাদের ওপরে মিকেলান্‌জেলো নিজের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বোধহয় যথার্থ নয়। প্রথমত তিনি ছিলেন স্বভাব-কৃচ্ছ্রসাধক। বহু বর্ষ পরে বন্ধুকলনে তিনি যে ছবি করে যান, তাতে তিনি নিজেই আত্মীয়দের নিজের শিল্পসাধনী হাড়ের নিয়ে . যান, ফ্রেস্কোর ছন্দোময় বাড়ী, সাতাই, অন্য স্বাদের সম্পত্তি এবং প্রথম ছবি,—বর্তমান হুলোয়ানে যা প্রায় ১০০,০০০ ডলারের সমান। তাই ইতিপূর্বে (১৫০০ খৃঃ) পূর্বের ছোট প্রকাশকলে তাঁকে দিয়েছিলেন, "ব্রুনারত্তো আমাকে বলেছে যে, তুমি ছোট খুব পয়সা বাঁচিয়ে, এমনকি, ফেস্কোসের মত থাকো। হিসেবী হওয়া ভালো। কিন্তু কৃপণতা পাপ। কৃপণ, মানুষ ও ভগবান—সবারই কাছে অপ্রিয়। উপরন্তু তা দেহ ও মনের আনন্দের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমার হয়তো তার মন খুলবে না, কিন্তু খুলে হবে খুলবে।" আজকালের

না। সর্বদাই অস্বাস্থ্য ও পরিশ্রান্তের মধ্যে বাস করা এবং অত্যাচারের ফলে কিছুই বাদ দিত না।

...সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে আকাশের জন্য নিত, যাতে উঁচুতে না যাবে। আর একবারও স্নান করে না। সে জন্মাতে পারো,—কিন্তু স্নান করলো হয়ে না।" মিকেলান্‌জেলোর এ বিরিক্ত সেবাদের পরিচয় আমরা যারবার পাই, তাতে মনে হয় শিল্পসৃষ্টির শেষ আবেগটি তিনি আর্থিক-ভাবে মেলে চলেছেন।

সিস্টিন দেবীর কাজ করবার সময় মিকেলান্‌জেলোর আর এক উৎপাত ছিল পোপের তাগাদা। শোনা যায়, একদিন কথা পোপ এসে ঐভাবে তাগাদা দিয়ে হৈচৈ-বাঁধিয়ে তুলেন তখন শিল্পী তাঁর ভারা থেকে একটি হাতুড়ী এমনভাবে নীচে ফেলে দিলেন যাতে সেটি পোপকে মারলে না ঘটে, কিন্তু মারতে দিল।

ক্রোধ ও বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ ছিল বয়োকনিষ্ঠ শিল্পী সালভাদর রাফাইল। তাঁকে সিস্টিন দেবীর চতুরসীমানার মধ্যে দেখলেই মিকেলান্‌জেলো ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠতেন, "ঐ হামবড়া ছোকরা আমার পরিধির চারধারে উঁকি-ঝুঁকি মারছে।" কারণ তাঁর কারণ ছিল (যা বহুলাংশে সত্যিও) যে রাফাইল তাঁর আলিন্দের অনেকখানি দিয়ে নিয়ে ফেলেছে নিজের কাজ চালিয়ে নেবেন। অনেক সময় নিতান্ত অকারণেও তিনি রাফাইলকে অপমানের চেষ্টা করতেন। একদিন সর্বজন-প্রিয় রাফাইল তাঁর অনুকরণীয়দের নিয়ে কোথাও চলেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেই তাড়ার ওপর থেকে শিল্পী মুর্খিলা চীৎকার করে উঠলেন, "ঐ ইনি সেনাপতির মত সেজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলেছেন।" সেদিন পরমসহনশীল রাফাইলেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আর

অমৃত অনুমোদিত অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

কেনবার সময় 'অমৃতকলস' এই নাম দিয়ে কেনার অনুরোধ

অমৃতকলস টি হাউস

৭, সোমেন স্ট্রীট কলিকাতা-১
২, অমৃতকলস স্ট্রীট কলিকাতা-১
৪৩, বিধান এভিনিউ কলিকাতা-১১

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অমৃতকলস বিশেষ প্রতিষ্ঠান ॥

আপনি আমাদের মত মানুষ নিয়ে একটু-একটু আদর করে ভালোবাসুন।" তবে সে খুব একটা যায়। মিকেলাঞ্জেলোর পরীক্ষার কাজ শেষ হলে রাফায়েল উৎসাহের সঙ্গে জানান জানিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন যে উৎসবটি তাঁকে অবশ্যই একজন শিল্পীর সম্মানার্থে হবার সুযোগ দিয়েছেন।

অবশেষে মাস্তবাসীর সেতুর ছাদিনে ১৫১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে মিকেলাঞ্জেলোর সোনার ভালোর যে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। আজ অনুপস্থিত হলো। সারা রোম মিকেলাঞ্জেলোর সেই হতভাগ্য নিলম্বমূর্তি দেখতে ভেঙে পড়েছে।

শিল্পীর ইচ্ছা ছিল সমস্ত প্রস্তুতকাজ শুরুর আগে পর তিনি স্যালভিনেতে খৃষ্টাব্দের পরিবর্তে এবং উৎসবে সোনালীর রোমে দেবেন। কিন্তু সেদ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। মিকেলাঞ্জেলো পরে পোপ প্রথম নিলপীকে এই সমাপ্তি-প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তখন শিল্পী উত্তর দেন যে খৃষ্ট ঐ সময়ের অনেক আগের তাঁর পরিচয় হয়েছে নেই। উত্তরে পোপ বলেন যে সেসময়ে রোমের অবস্থা ভালো ছিল একটা বর্বরতা থেকে যাচ্ছে। শিল্পী সেই আলোচনার সমাপ্তি টেনে বলেন, "আমার আঁকা হয়েছে তাঁরা যে সবাই ছিলেন বন্ধিত।"

রোমবাসী যে রূপে মানুষের ধারণা ছিল, মিকেলাঞ্জেলো তেমন হয়ে আমাদের এই পৃথিবী এবং মানুষ হয়ে তাঁর অধিবাসক। মিকেলাঞ্জেলোর তুলিতে সেই মানুষেরই অবতার। তিনি যখন দেখেন, "শিল্পকর্ম চেয়ে আসল হয়ে মানুষ।" আর সে কী মানুষই না তিনি সৃষ্টি করেছেন। সিস্টিন পরীক্ষার অতুল চন্দ্রাতপে ৩৪০টি নগ্ন-আবরণী, অপরূপ-বিজয়ী ও চেতনাহরণ প্রতিমূর্তি। তার মধ্যে ২২৬টি নগ্ন দেহে অর্ধাংশে কিংবা পূর্ণ। তার মধ্যে এই মিকেলাঞ্জেলোর যে তুলির নিচে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দুঃখ আবেগঘন মূর্ত হয়ে রিয়েল মূর্তিগুলি দেখলে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে তিনি এই মূর্তিগুলিকে মূর্ত করেছিলেন তা জানলে বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। যেন কিই পাপ, বড়ঞ্জন্ম পাপাত্মাদের মহাদুঃখ আমন্ত্রণ করা রিয়াছিল আঁকা। মূর্তিগুলি মানুষের কল্পনাতীত প্রায় প্রত্যেক জনটিতেই বিভাজিত। কেউ মুখোশাবিত, কেউ বিস্মিত, কেউ চিন্তিত, কেউ বা পাঠিত। যেখানে আছেই দুঃখ, বিষাদ সেখানে বিশ্লেষিত। সেই মানবমূর্তির প্রকাশ কখনও বিস্তৃত। মিকেলাঞ্জেলোর কখনও-কখনও মিলাবক। সেখানে যেখান একটি মূর্তিবন্ধনে গায় ও অন্যের পুষ্প সৌন্দর্যের ভূমিকা।

সিস্টিন পরীক্ষার কাজ যখন শেষ হয় তখন মিকেলাঞ্জেলোর বয়স ছোট সাঁইত্রিশ বছর। কিন্তু চার বছরের কঠিন শ্রমে তিনি অনেকখানি বুড়ো ও কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের দৃষ্টি হয়েছিল ঝাপসা। তারপরেও যখন তিনি পোপের কাছে পারিশ্রমিকের টাকা চাইতে গেলেন তখন তিনি নির্বিকারভাবে বললেন, "যখন পারবো তখন দেবো।" তবুও সন্দেহ নেই যে মিকেলাঞ্জেলো যে অতুল সিস্টেমস্থাপত্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার আনন্দ ও গর্বে বৈষয়িক বঞ্চনা এবং স্বল্পস্থায়ী পোপের সেই নিলজ্জ বঞ্চনা তিনি ভুলে যেতে পেরেছিলেন।

রোমের কাজ শেষ করে মিকেলাঞ্জেলো আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে এসে রোঁজনি পরিবারের সাদ্ লরেন্সোর পরীক্ষা-সজ্জার করেকটি নিষ্প্রাণ ভাস্কর্য সৃষ্টি করলেন। ইতিমধ্যে পোপ জুলিয়াস মারা গেলে রোঁজনি বংশের লিও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এদিকে দীর্ঘকাল রোঁজনিদের বৈরতন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে ফ্লোরেন্সবাসীরা ১৫১১ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পৃষ্ঠপোষক পরিবারের প্রতি আনুগত্য, না দেশবাসীর কল্যাণবুদ্ধি, এই দুয়ের দ্বন্দ্বের জন্যে পড়ে মিকেলাঞ্জেলো শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর অসাধারণ উৎসাহী শক্তির সাহায্যে ফ্লোরেন্সবাসী এক দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুললো। কিন্তু আবার রোঁজনি পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে এলেন স্পেনেরা সম্রাট পোপ প্রথম লিও। ফলে দীর্ঘ বীরোচিত প্রতিরোধের পর ফ্লোরেন্সের পতন ঘটলো। মিকেলাঞ্জেলো স্পেনের সামনে নীত হলে দুঃখ পোপ তাঁকে বললেন যে তাঁর মত বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু শিল্পের প্রতি তাঁর আনুগত্যের জন্যে তিনি তা করলেন না।

জীবনের সায়াহ্নে আবার সিস্টিন পরীক্ষায় একটি দেওয়ালে 'শেষ বিচার' নামে একটি ছবির বরাত পেয়ে তিনি আবেগময় হয়ে ওঠেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ ও ক্ষমার সন্ধান করেছিলেন, তার প্রকাশ যেন তিনি ছবিটিতে ফোটে বিরোধিতেন। সেই মহৎকর্ম সুন্দর ছবিটির মধ্যভাগে অবিনশ্বর-বিহারী নিলম্বন যেমনটেয়া ক্রেষ্ট বসেছেন। উর্ধ্বে স্বল্পবিহীন এপোলো-প্রতিম বিদ্, যেন জন, যেন পাঁচার, যেন লরেন্স ও যেন মধ্যবর্তীতে সমস্ত ছবিটির তিনশ ডোমটি মূর্তিমূর্তি। যারা পুণ্যাত্মারা অর্ধোন্মীলিত এবং পশ্চিমে পাপীরা একক নিষিক্ত হচ্ছে। বিপরীত চক্রে পৌঁছেছে।

ছবিটি শেষ করতে প্রায় আট বছর সময় লাগে। পূর্ব-স্মিত চন্দ্রাতপে অঙ্কিত বিশ্বসৃষ্টির মহাত্মাকাব্যের তুলনায় এতে সেই সাবলীল তুলির টানের মতো নেই, প্রথম ভালবাসার উচ্ছ্বাস নেই। তবু ছবিটি শেষ হতে চোখে মহা মোহমোর পড়ে গেল। কারণ মূর্তিগুলি সবই উজ্জ্বল। সেই সমাবেশের পোপের (তৃতীয় পল) কাছে থেকে তিনি শিল্পীকে মূর্তিগুলিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দিতে অনুরোধ করলেন। চতুর শিল্পী উত্তর দিলেন, "পোপ যেন তাঁর দুনিয়া ঈশ্বরের কাছ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, শিল্পীদের বাদির নিয়ে মাথা না ঘামান।" পরবর্তী আরেক পোপ এসে আরেকজন শিল্পীর দ্বারা মূর্তিগুলিকে সত্যিই বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়ে নেন। তাতে মাত্র রোম ঘোরার ওপর ভারিক্কি সেই শিল্পীকে 'ব্রীচ-ওয়ালা' নাম দিয়ে ফোপরে রয়ে।

মিকেলাঞ্জেলোর উৎপীড়িত ও ঐকান্ত জীবনের সায়াহ্নে ভিত্তোরিয়া কলনা নামে এক সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা দুঃসঙ্গ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মিকেলাঞ্জেলো তাঁকে উৎসর্গ করে করেকটি সুন্দর কবিতা লেখেন এবং তাঁকে করেকটি স্কেচ ও ছবি উপহার দেন। কিন্তু নিষ্ঠুর শিল্পীর সেটুকু মানসিকতেও বল সাধলেন। পরিচয়ের দিনগুলো পরেই সেই শুশ্রূষাধিনী ও সুভাষিণী মহিলা মারা যান।

- অবশেষে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বছর বয়সে সেই নিঃসঙ্গ মহাপুরুষের দুঃখ, ক্লান্ত ও ঘটনাবহুল দীর্ঘজীবনের অবসান হয়। সেই সময়েই রোম ইতিহাসের বাঁকে তলোয়ারের মত রক্তরবীন্দ্র আকাশ নদীর বাঁকে সুইটজারল্যান্ড প্রান্তে এক পলক অন্ধকারের মত জন্ম নিলেন ঔইলিয়াম শেকসপীয়র। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে এক জ্যোতিষ্ক নিভে গেল, উদয় হলো আরেক জ্যোতিষ্কের।

কেশবলাল বুদ্ধদেব গুহ

(দশ)

সোটা এলাকাই চষল। জোড়হ্রদের মুখে যুরোদ্রম তখন একটি বাইসনের কীর্তি-কলাপ। একের পর এক গ্রামকে জখম করেই চলেছে এই জানোয়ারটা। কিন্তু কেউই আমতে পারছে না তাকে।

বেঙ্গলের রেঞ্জার সাহেব বাইসনটাকে 'রোগ' বলে ঘোষণা করে গেছেন। যে মারতে পারবে সে ৫০০ টাকা পুরস্কার পাবে বন-বিভাগ থেকে।

সেই ৫০০ টাকার লোভে স্থানীয় একজন ফরেস্ট গার্ড ওর একনলা বন্দুক নিয়ে কিছুদিন ধরে তাকে মারবার চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিল। গতকাল ভরদুপুরে জোড়হ্রদের পাশে সে লোকটিকেও একটি লেপ্চা গাছের গায়ে দৌড়ে ফিরে ঊঁচাও হয়ে গেছে বাইসনটা।

লোকটি গুলিও করেছিল, কিন্তু কোথায় লেগেছিল কেউ জানে না, গুলীতে নাকি মরে নি বাইসনটা। বাইসনের গায়ে বন্দুকের গুলী বোলবুর্ত্তর অবধি লেগেছে এমন তাগ কোনো বন্দুকের নেই। বড় রাইফেল হলে অন্য কথা ছিল। তাতেই এই বিপত্তি।

শুনেছি কলোহ্রদকে খবর দেওয়া হয়েছে পাটনায়। যত শিগ্‌গিরি সম্ভব ফিরে আসতে কাজ সেরে। আসল ঐ বাইসন গুলী খাওয়ার পরে আরো সাংঘাতিক হয়ে গেছে। কুলীদের ধাওড়া, ঠিকাদারের বাংলা সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ঠিকাদারের একটা এ্যাম্বাসাডার গুঁড়ের দিয়ে দোমড়ে মুচড়ে ধাওয়া করাতে তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ও জঙ্গলে কাজ একেবারে বন্ধ। ঐ বাইসন যতক্ষণ ধরা না পড়ে, বাগেচেন্দ্রার পথও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লোকে হাটে করতে যেতে পারছে না। তাকে নিজেও যেতে পারছে না ঢাক-হরকরা।

একদিন যুরোদ্রির বাংলো থেকে যুরোদ্রির বর্বরাধিপের চেহারা তেমন ভালো করে নজর করি নি। কিশোরী এখন যৌবনবতী হয়েছে। জমাদার চলকে চলকে চলেছে ভাল পাহাড়িতে। একদিন ইচ্ছে হল জোড়হ্রদের সেই পাথরটার গিয়ে বসি। চারিদিকে ফাঁকা পাহাড়ের এমন অফুরন্ত ঢাকোঢাকা, একবার হেসে আসি। কিন্তু চাঁদের বন্যা—সে পাথর এখন ডুবে গেছে। জল তার অনেক উপরে। তবে পাহাড়ী নদী, সব সময়ই সে বেশি জল ধরেছে তা নয়। পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে গেলেই আমাদের, পরেই দিয়ে দেখতে হয় জলের জোর।

আমাদের সুহাগীতেও অনেক মাছ ধরা পড়েছে একদিন। আজকাল যে সব মাছ আমি খাচ্ছি তার অনেক সুহাগীর। অনেক কোতেলের। পাহাড়ী পুঁটি, বাটা, আড়-টাংরো ইত্যাদি।

এ এক নতুন আবিষ্কার। সখ হয়, একদিন গিয়ে মাছ ধরি। কিন্তু ঐ ইচ্ছে পর্যন্তই। আমি বারোয়ার ইজিচেয়ারে বসে কল্পনা করতে পারি। কল্পনায় বাঁধ বাঁধি, মাছ ধরি; আরো অনেক কিছু করি। কিন্তু যতক্ষণ কলোহ্রদের মত কেউ না এসে হাত ধরে আমাকে তোলে, ইজিচেয়ারেই বসে থাকি।

বসে বসে আর ভালো লাগে না। অন্ধকার ছাড়া কাঁহাতক আর ভালো লাগতে পারে। অবশ্য আর মাসখানেই পরেই পুজো। পুজোর পরেই আবার জঙ্গলের পাখাগাট ঠিক আবার উপযুক্ত হবে। বাঁশ-কাটা, কাঠ-কাটা শুরু হবে। ঐরা বলে গরা জেলার লোকেরা খরের বানাবে জঙ্গলে জঙ্গলে। মাঠে মাঠে পাহাড়ের ঢলে ঢলে যে সব ছাদুই লম্বা সবুজ ঘেসে হলুদে হলুদে ফুলগুলিতে হচ্ছে তাদের ওঁয়োলো হবে। ধান, বাজরা, ভুট্টা, আলো কত শত ফসল। সমস্ত জঙ্গল, পাহাড় জমাজমি নবান উৎসবে হেসে উঠবে। ভরুক ভালুকের ভয়ে ম-ম করবে পাহাড়ী হাওয়া।

এ ফসল উঠে গেলে, ক্ষেত থেকে কুড়ী লাগবে, গোঁছ্‌ লাগবে, কাড়ুয়া লাগবে, সরলুয়া লাগবে। হলুদে হলুদে ছেয়ে যাবে চষা-মাঠ আর বাঁজ কাটা পাহাড়ের ঢাল। সন্ধ্যে হতে না হতেই চারিদিক থেকে মাদলের শব্দ আর গানের সুর ঝুম্‌ ঝুম্‌ করবে। শীতকালে প্রচণ্ড শীত হলে কি হয়, তখনকার পাহাড়ে শীতকালটাই নাকি সব থেকে মজার সময়। অবিবাহিতদের বাংলোয় বাংলোয় শিকারীর দল আসবেন কোলকাতা, পাটনা এবং আরো কত বড় বড় জায়গা থেকে। গ্রামের গরীব লোকেরা কুল পাটার ফাঁকে ফাঁকে এক-দুটিদিন সাহেবদের জন্যে হুলোর ঘরে নেবে। আকুলিটা টাকাটা যা পাবে তা পাবে, তাছাড়া শিকার কিছু হলে তার অর্ধেক মাংসের ভাগ। সেটাই আসল লাভ। মাংসকে ওরা বলে 'শিকার'।

একদিন ছোরে কলোহ্রদ এসে হাজির হল। অনেকদিন পর ভরুকের চি'-হা-হু—চিঁহা—হু আওয়াজে যুরোদ্রির বাংলো সরগরম হয়ে উঠল। কলোহ্রদের সাহেবের চিঠিটা পেয়েছ লালসাহেব?

সেলাম স্যর। কেন্ ঊঁসবে করে?

কেস উঁসবে হুতো সিন্‌গিরি, কিন্তু তুমি একটু সাবধানে কেরো।

বুঝলাম, একথা বলছ কেন?

বলছি, কারণ, জমাদার পাকা সাংঘাতিক লোক। জমাদার চেয়েও সাংঘাতিক। করতে পারে না এমন কাজ নেই। তুমি আমার একমাত্র সাক্ষী। হুতো ও গিলে তোমাকে জঙ্গলে খুন করিয়ে, লাশ খুন করে দেওয়া ও এই জঙ্গলে পাহাড়ে কিছুই নয়। বাঁচাকা যায়।

আমি চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বললাম—তাহলে কি হবে?

কলোহ্রদ হেসে বলল—আরে হবে আবার কি? ওরা আমাদের ছেলে। তোমার গায়ে একবার হাত দিলে বেঁচেই যাবে না। তবে সাবধানের মার নেই। দাদা ছেলে যখনই বেরোবে, তখনই বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বেরোবে। কোনো কিছু সোন্দিক দেখলে, কোনো অচেনা লোককে অস্বাভাবিক অস্তব্যস্তভা করতে দেখলেই পাস কাটাবে। আর সে রকম দেখলে, গুলী চালিয়ে খুপ্‌রি উঁড়িয়ে দেবে।

আমি বললাম—বলছ বেশ। গুলী চালিয়ে খুপ্‌রি উড়িয়ে তারপর ফাঁসিতে লটকাবে কে?

তুমিও যেমন। গুলী চালালেই কাঁহা ফাঁসিতে লটকাতে হবে তাহলে ও সেতুলা থেকে যুরোদ্রি অবধি প্রতি গাছে আমি একবার করে ঝুলে যাওয়াম। এসব তোমার কোলকাতা নয়। মোর যার মুলুক তার। এখন অবধি তাই আছে। পরে কি হবে জানি না। তাছাড়া মাংগোলা সাহেব কি বড়া ওবরদস্ত ইমানদার লোক আছেন। উনল কিতাবী আইনের ধার ধারেন না। ঠাণ্ডা মাথায় গোঁফে তাও দিতে দিতে সবটা শোনেন। শুনে, যে দাঁতে দাঁতা অন্যায় করেছে বোঝেন, তাকে সেলে ভরে দেন হাজতে। পইলে ওাণ্ডা; পিছে মার। সাবকুছ হতু ইয়ার। আপেলোগোকো হাম্‌ শিখলাতেগা ঠিক্‌সে।

কলোহ্রদ রাইফেলটা তুলে তেল লাগিয়ে আবার লক্‌-সটক্‌-বারেল তোড়া লাগিয়ে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। দাঁড় করিয়ে রাখবার আগে রাইফে-

প্রফেসরটা ছুটে সাইটে লাফিয়ে নিল। এই সাইকেলটার একটি সিল্ভ-সাইট ফিট করা আছে। এমনিতেই বন্দোবস্তের হাত সোজা নিয়ে থাকলে। তারপর সিল্ভ-সাইট ফিট করা থাকলে এই সাইকেলটা নিয়ে বন্দোবস্ত তেমন কিছু নয়। জন্তুদের তার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর দেখাতে হয়। তারপর সে সাইকেলটা ঠেলে তার আগে হোক পালার কোথা-সেন্ট হবে। আর ছোটও বলার সাইকেলটা। উটিনের গরার মত। টায়ার শক্ত ফিতের মতন। ওজনও সেরকম। কাঁধে নিয়ে সাইন ঘুরানো যেতে এলে, কখনও-সেন্ট কেন? সেরা? অত ওঠা।

টায়ারকেও অবশ্য পাড়িয়েছিল বন্দোবস্ত। টায়ারকে এনে হাজির করা চৌপাইজনের অনুরোধে বন্দুকটা নিয়ে। টায়ারের বন্দুকটা দেখেই আমার ঘুপাইদের কথা মনে পড়ে।

বন্দুক, সাইকেল থেকে একটা অদ্ভুত মেয়েদের—ছেলের গন্ধ—বাচ্চাদের গন্ধ—চৌপাই গন্ধ। সব মিলিয়ে গন্ধটাকে কেমন পুরুষালী-পুরুষালী বলে মনে হয়। বন্দুকোটিনের কথার সঙ্গে কেমন মেয়েদের তাদের জড়ানো থাকে, বন্দুক-সাইকেলের গন্ধের সঙ্গে তেমনি ছেলেদের তাদের জড়ানো থাকে। তারা তাদের লাগে। এই গন্ধ নাকে যেতেই আমার কতগুলো উৎসাহিত চাল যেহিনানী-জোকমারু পুরুষের কথা মনে হয়, যারা সবুজে মনে লাগাতে পারতে যান গায় সবুজোকের মনের মত—'দুর্গি' হাওয়ার ছুটিয়ে দিল সুর্য তাদের। আমাদের ফেলিয়ে ফেলার, ফেলিয়ে ফেলার; ফেলিয়ে ফেলার যে।"

আমার জীপেই ওঠা হলাম। যে জায়গায় গিয়ে বাঘটাকে দেখা যাবে সেখানে হুইলেন্সী সাহায্য যাব মোটরগাড়ি তার আছে।

সকালের রোদ্দুর ঘন পাহাড়ে জঙ্গলে ঝলমল করছে। গ্রায় ঘাসা-সমান উঁচু সুন্দর ঘাসের ডগা-পাতায় শিশির সবুজ আলো হয়ে, রোদে জ্বলে গিয়েছে। তার মাঝ দিয়ে একটা পায়েচলা সুঁড়ি পথ গাড়ি যাওয়ার প্রমান সড়ক তৈরি করে, বোরোলের দিকে চলে গেছে। আমরা জীপটাকে যার যাবার সময় তেমন বোঝাইনি, তেমনি প্রমান জন্তুর উপরেই একটা বড় গাছের নীচে পার্কিং করে পার্ক করিয়ে রাখলাম।

বন্দোবস্ত সাইট্-প্রফেসরটা পুরো পরেটা রাখলো। সাইকেলে গুলী ভরলো। আমাকে বন্দুকের দু বাক্সেরই গুলী ভরতে বলল। টায়ার তার গলা বন্দুকে ডিম-জন্তুলী বন্দুক বন্দুকে ঠেলে এনেছে। সাইকে একটি হুইলের-বাকা সাঁসার জল। সে জন্তুদানের গন্ধে টেবিলে তিনি পরবর্তনে নিয়েও অনুমিনি করলেন।

বন্দোবস্ত আগে আগে ছোট্ট সুঁড়ি পথ ধরে চলল। আমাকে ওদের দুজনের মাঝখানে নিল। পেছনে টায়ার। টায়ারকে কিন্তু কিছুতে বলল পেছনে থেকে। আমাকে বলল সাইকে-সাইকে চালাতে। আমার নিজেদের এগিয়ে চলল।

কেমন ঘাসগুলি সেখানে বড় গাছ বেশী নেই। এমনি জঙ্গলও নেই। তবে ঘাসী বনের ঝাড়গুলি সেখানে কোথাও তিনশ গজ চওড়া ও এক হাজার গজ লম্বা হবে। তার দু-পাশেই গভীর বন। তার ভিতর থেকে খুব ঘন ঘন মহুয়ের ডাক ভেসে আসছে। ওপাশে যেন বড় এত ফাঁক মহুয়ে করছে।

বেশ কিছুদূর সাবধানে এগোবার পর আমরা ফোরেলের শব্দ শুনতে পেলাম। একটানা কাঁসর শব্দ। ঘোলা জল থেকে করে চলেছে। এ পর্যন্ত জন্তুর হাতেরাউন্ড বিউটিফুল ছাড়া আর কিছুই কর্লোয়ের হল না। এগোতে এগোতে আমরা প্রায় নদীর ধার অবধি গিয়ে পৌঁছলাম। অথচ বাইসনের সাড়াশব্দ নেই। নদীর পারে পৌঁছে বন্দোবস্ত টায়ারকে একটা গাছে উঠে চারদিক দেখতে বলল। টায়ার গাছে আরোহণ উঠেছে, এমন সময় কুকুরের ডাকের মত একটা ডাক শুনতে পেলাম বাসী বনের ভেতরে আমাদের বা-দিক থেকে। অমনি টায়ার তরতরিয়ে নেমে এসে বিস্ফারিত চোখে জানা—দুটি কোঁড়া ইজোর, দুটি কোঁড়া উল্টো দিকে পড়া হাজ।"

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। বন্দোবস্তকে খুব উত্তেজিত দেখাল। ও টায়ারকে বলল, আমার বন্দুকটা নিয়ে নিতে। টায়ারকে আরো চারটে গুলী দিতে বলল। গুলী দিলাম। তারপর ওদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করে, অনুসরণ দুটি-কোঁড়ার পদচিহ্নগুলো খুঁজে খুঁজে চলে এলাম। টায়ারের প্রাগৈতিহাসিক বন্দুকের বাহক হয়ে।

ঘাস চেলে সাবধানে এগোতেই চোখে পড়ল ঘাসবনের মাঝখানে একটা একলা খয়ের গাছ। সেই গাছের নীচে একটা অতিকায় বাইসন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে মুখ করে। তার গলায় একটা কন্দুকের ঝোলা কাজ। সেটা সোজার ঝকঝক করছে। প্রকাণ্ড মাথাটা নীচু করে আছে, শিং দুটো পিঠের উপর শুয়ে আছে, মুখ উঁচু করা। কপালের মাঝখানে সাদা। দু হাইঞ্চ জায়গা জোড়ার মত সাদা লোম। আমার মনে হল, আমাদের আক্রমণ করার জন্যে বুঝি তৈরি হচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য বন্দোবস্ত বাইসনটার দিকে হাইফেল তুলল্য, এবং আমাকে ইশারা করে নিয়ে টায়ারও সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বন্দুক তুললো। এবং সাইফেল ও বন্দুকের যুগপৎ বজ্র নির্ঘোষে সকালের জোরালো অরণ্যানিকা গমগম করে উঠলো। ঐ বড় সাইজের গুলী বাইসনের কপালের মাঝা দিয়ে ঢুকেছে মনে হল এবং বড় গাছ ফেটে বেরোবার সময় যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দ করে বাইসনটা পড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে।

কিন্তু টায়ার কোথায় গুলী করল দেখতে কিছুই দেখতে পেলাম না। বাইসনটা পড়ে যেতেই টায়ার আর বন্দোবস্ত বাইসন কোথায় পড়ে মাঝা কোথায় গুলী করেছিল কোথায় দৌড়ল। ওদের পেছনে পেছনে আমিও বোকার মত দৌড়ে গেলাম। একটু যেতেই দেখি একটা অদ্ভুত জানোয়ার মরে পড়ে আছে। দেখতে কুকুরের মত, গায়ের রং ডালমেটে লাল, মুখটা কালো, লেজটা কালো, লেজের ডগাটা বেশী কালো।

ততক্ষণে আরো তিন চারটি গুলীর আওয়াজ শোনলাম। এবং হঠাৎ প্রায় আমার গায়ের উপর দিয়ে একটা ঐ রকম কুকুর লাফাতে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে টায়ারের বন্দুকটা তুলে বন্দুকালিতের মত সোজাসুজি ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। কুকুরটার গায়ে যেন আমানের গোলা লাগল। একটা বিরাশী সিক্কার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল যেন।

বিস্ময়ে নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তখন সম্বিত ফিরে এল তখন হাতে হল আমার ডান হাতটা অসাড় হয়। মনে হল কাঁধ থেকে হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গাদা বন্দুকের যে কি ধাক্কা তা যারা ব্যবহার করে তারা ছাড়া বোঝানো যায় না।

ইতিমধ্যে দু-পাশ থেকে আরো দুটি একটি গুলী হয়ে গেছে।

টায়ারের বন্দুকটা গায়ে হেলান দিয়ে রেখে কাঁধ হাত বোলাতে বোলাতে আমি বাইসন দেখতে লাগলাম। দেখবার মত জানোয়ার বটে। ষাড়টা দেখলে ভক্তি হয়। এমন জানোয়ার থাকতে, দেখে বন্দোবস্তের প্রশংসা কেন করে জানি না। গায়ের রং মহুয়ের পাথার মত কাল। সারা গায়ে বড় বড় মোটা মোটা লোম। পায়ের কুরগুলো সাধারণ গৃহপালিত গরু-ষাড়ের চেয়ে চার-গুণ বড়। আর শিং দুটোও দেখবার মত। শিং-এর গোড়ার অনেক খোদাইকাজ করা। জানি না গায়ে গায়ে করেছে কিনা। জান-দিকের শিংটার ডগাটার চলটা ওঠা। সেটার কাছে আর একটা ক্ষত দেখলাম। আড়াআড়িভাবে যেন বুলি দিয়ে কেউ চিরে দিয়েছে। লম্বায় দু ইঞ্চি চওড়া ও এক ফুট লম্বা।

ততক্ষণে ওরা ফিরে এসেছে। আমার মারা কুকুরটা দেখে বন্দোবস্ত বলল—আরে ইয়ার কুত্ত কি মারা দিয়া একটা। সাবাস্!"

কি যে ভাবে বন্দোবস্তটা আমাকে।

আমি শুধোলাম, ওগুলো কি জানোয়ার? বন্দোবস্ত বলল—জঙ্গলে এর চেয়ে সাংঘাতিক কোন জানোয়ার নেই। এরা মরণী কুকুর। এর চেয়ে বড়ও আছে এক-জাতের, তাদের এখানে বলে রাজকোঁড়া। এরা যে জঙ্গলে ঢোকে সে জঙ্গলে শম্বর, হরিণ, শুয়োর, জন্তু কিছুর নেই। এমন কি বাঘও এদের এঁটে চলে।

সত্যসত্য বাইসনের কাছে এরা ঘেঁষে না। কিন্তু যেই দেখেছে যে বাইসনটা দুর্বল, সে কোন মুহূর্তে মরতে পারে, অমনি ওর কাছে কাছে ঘুরতে থাকে। উদ্দেশ্য ওর মুহূর্তটা যাতে অপেক্ষিত করা যায় সেই চেষ্টা করা।

শুধোলাম—একলাদের ওরা দল বেঁধে থাকে কেন?

আলোকদণ্ড বলল—সব মেয়ে যাবে জানো, এমনিতে ত একলা একলা ছোট জানোয়ারই। সন্ধ্যের সোফেলের পাশে একটা চাঁই মেলে চিনাবাদামেই মাথার খুলি ফেটে যায়, ও ওদের। সেই জন্যেই সব মেয়ে ফেরে। এবং এক সঙ্গে তোদ বড় জানোয়ারকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে। জানোয়ার প্রাণভয়ে পালাতে থাকে আর ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে চলে, শ্বাসিয়ে হাঁসিয়ে উঠে পতিস্থান জানোয়ারের গা থেকে জানে খুবলে খুবলে খায়। তারপর যখন সে জানোয়ারের চলবার মত আর শক্তি থাকে না তখন সে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং মুহূর্তেকের কি মাংসকোরাস তাকে ঘিরে ঘিরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ফলে জন্তুদের এর চেয়ে শীঘ্রগতি মৃত্যু আর হয় না।

আমি বললাম, অদ্ভুত। ছাইসলাট আমাদের দেখল অবাক চোখে এলো না কেন কোনোক্রমে?

ওর চোখে আসার ক্ষমতা থাকলে আমরা ওকে দেখার অনেক আগেই স্টীম এঞ্জিনের মতো হে-হে-রে করে হাসতে হাসতে এসে যাচ্ছে পড়ত। কখন চোখে এল তা বোঝবার সুযোগ পর্যন্ত দিতো না। আসলে ফরেস্ট গার্ডের গুলীটা যেন জন্তুর হয়েছিল। গুলী কপালে না লেগে কানাতে লেগেছিল। বেহদ্দ বন্দুকের গুলী। খেলী মুখ ভিতরে ঢুকতে পারে নি, কিন্তু ওর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছিল। দেখলে না, নড়তে পর্যন্ত চাইল না আমাদের দেখে। মৃত্যুর আগে সবাই একটু শান্তি চায়। তাই ও এই নদীর পাড়ের নিরিবিলি জায়গায় নীচে দেহরক্ষা করবে বলে এখানে দাঁড়িয়ে ধুকছিল আর কোথা থেকে হুড়ি-চড়িয়ারা খবর পেয়ে এসে হাজির।

(১১)

কিন্তু ছিপিস ফেলকাটার ছিল। তার মতো জামা-কাপড়ই, প্রথম। এখানে আসার পর থেকে জামা-কাপড় আমাদের হয় নি। তাছাড়া এই অনেকক্ষণে সে প্রথম জামা-কাপড়ের প্রয়োজন অনেক অনুভব ছিল আমার। সামনে শীত আসছে। শীতের প্রলয়ঙ্করী হুলের মা বর্ষা মুখোমুখি আসছে ও আগে থাকতেই যাতে দাঁত চেপে থাকছে। কিন্তু গরম জামা-কাপড়-চোপড় আমাদের দরকার।

ডালটনগঞ্জ গেলাম একদিন। মুখার্জির থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ। কিন্তুদের অবধি রাস্তা ভেল্প ছিল তারপর থেকে অন্তত জঙ্গল। মোক্ষদার বাড়িই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করব ঠিক ছিল।

ডালটনগঞ্জ থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে নেতারহাট হয়ে চাঁদোয়া-টাঁড়ী, সেখান থেকে ঘাঁটে হলে গেছে চাতরের রাস্তা বাঁধরা মোড় হয়ে। বাঁধরা মোড় থেকে ডাইনে ঘুরে গেলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লাতেহার - ঔরঙ্গাবাদ হয়ে হাজারীবাগ সড়ক। ডালটনগঞ্জ এই পথেই হাজারীবাগ আর চাঁদোয়া - টাঁড়ী থেকে আর একটা রাস্তা চলে গেছে আহমেদাবাদ হয়ে কুন্দু, কুন্দু থেকে রাঁচী, সেখানকার থেকে ধরে সোহরডাঙ্গা। সেখান থেকে হাজারী হয়ে বেরাহাট। আর একটা রাস্তা উৎপৌদিকে ডালটনগঞ্জ থেকে চলে গেছে ওরুমাণ্ডা—ব্লাস্ট ফার্নেস হয়ে।

এই সমস্ত জায়গাই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। জঙ্গল আর জঙ্গল। আদিমন্ত।

ডালটনগঞ্জ যেন অবশ্যই যাওয়া পছন্দ। সিনেমা আছে, কোর্ট-কাছারি ইনকমটেক্সের অফিস সবই আছে। বাঁশ, কাঠ, গালা ইত্যাদির বেশ বড় বড় ব্যবসাদার আছেন। আমাদের হাজারে নিজের বাড়িও একটা।

মোক্ষদার বাড়ি যেতার পথে মোক্ষদার সঙ্গেই বাজারে বেরোলাম। মোক্ষদাসুন্দর সব মোক্ষদার জানাশুনো। কাপড় পছন্দ করে দাম দিতে সময় লাগলো না বেশী। খাকী হাঁফপ্যান্ট আর খুব্সোট খাকীতে বিলাস দুটি করে। টুইডের একটি কোট্। চামেলের শার্ট একটি—এইসব আর কি।

ডালটনগঞ্জ বাজারে হঠাৎ টাকরুর ছেলের সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে সেলাম করে বলল—ওর বোন-জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম—আমি ত আজই বিকেলে ফিরছি—আমার সঙ্গে চল্। একটা ত ফিরব। টাকরুর ছেলে আপত্তি জানাল। বলল—ওর স্ত্রীকে আর একদিন থাকার ইচ্ছা।

দোকানটা মোকামে কিন্তু সেলকাটার ছিল, জুতোমোজার জন্যে। চা-কফি—বিস্কিটের ডিপিসন - টোয়াটোসন্ মাখন ফ্লেস ইত্যাদি ইত্যাদি।

খালি বোঝাই করে দোকান থেকে বেরোচ্ছি, দেখি দোকানের সামনে একটি লাল আম্বাসেডর গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির সামনের সীটে খুকুন ড্রাইভার মুখে। চৌরিলিনের জামা পরা। আমার দিকে পায়ে পায়ে করে তাকিয়ে আছে।

আমরা কথা বলিনি।

মোক্ষদার জীপ নিয়ে এসেছিলাম। জীপ মোক্ষদাই চালাচ্ছিলেন। তাদ দিকে মোক্ষদার পাশে দিয়ে বসলাম। এমন সময় ঐ লাল গাড়িটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ইচ্ছা করে হল, যে চলকটি ড্রাইভারের পাশে বসে আছে তাকে কেন কোথায় দেখেছি। আসলে অনেকেই ভুল হয়ত। দেখেছি বা দেখব।

মোক্ষদার বাড়ি যেতার পথে আমাদের বাহুর ছেলের সঙ্গে দেখা। তারী ভালো ছেলেটি। সে কিছুতেই ছাড়বে না। তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। বিরাট বাড়ি। সারি সারি ঘর দাঁড়িয়ে আছে। বহু লোক অফিসে সিলসিলে করছে। মালিকেরবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। তারী আমায়িক সাদাসিধে লোক। পরনে ধুতি ও টুইলের শার্ট। কথা-বার্তা শুনি, জমির ফোলে, মাঠের ফুল এলোমেলো, অন্যকথা সিলবেটে আছেন। খুকুনকেটে একটি সুন্দর ফলের বড় পাঁপিয়া দেখেছিলাম। আমাদের বাহুটিন এলাচ্ দেওয়া চা খাওয়ালেন। বললেন—দুপুরে না খেয়ে গেলে খুব দুঃখিত হবেন। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মোক্ষদা অনেক অনুনয়বিনয় করার পরপর আমাদের ছাড়লেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মোক্ষদা বললেন—একটু ঘিরিয়ে নাও তারপর তোমাকে এঁদিয়ে দেব এখন। ফেরুকীতে গিয়ে চা খাওয়া হবে। সেখান কিছুক্ষণ বসে, চা খেয়ে তুমি তোমার পথ ধরবে, আমি ফিরে আসব ডালটনগঞ্জে।

ফেরে ফেরে ত তোমার রাত হয়ে যাবে বেশ, প্রায় সাড়ে বারোটা বাজবে। এতখানি পাহাড়ী রাস্তা, তোমার এক চলাফেরা অভ্যেস নেই, এক কাজ কর, সঙ্গে আমার একজন বাঙালী নিয়ে যাও। ড্রাইভার আমারো এসে রয়েছে। কিন্তু তেল আনি পেট্রলের লাগল। মোক্ষদাসুন্দর সঙ্গে থেকে আমারও বোঝবার পুরুষ হবার ইচ্ছে ফেলেছে। তাছাড়া বন্দুকটা ত সঙ্গেই আছে।

একমাত্র জীপ খারাপ হবার ভয় রয়েছে। আমার এ সময়ে জঙ্গলে কার কম থাকে বলে জঙ্গলের পথে ঠিক চলাচলের সম্পর্কে কম। জীপ পথে খারাপ হলে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে। যো-হোমা, যো-হোমা। বললাম—না, না, ফেরের দরকার নেই।

ফিরেলে আমরা ফেরুকীতে মোক্ষদার ও সুমিত্রাবৌদির কাছে অনেক গল্প শুনেছিলাম। ফেরুকী আজ চাক্ষুষ দেখলাম। ছবির মত জায়গা। ব্যাসকলে পার্ক হয়ে গেছে এখন সে সমস্ত অঞ্চল।

ওরুমা আর আমলত এসে গিয়েছে এদিকে। এখন ঘন্টাকাল। বেশ অনেকটা জায়গায় জল গড়েছে—বালির সীমানা ফেলল করে। নদীর উপরে মেঘের ছিঁড়।

মোক্ষদা সঙ্গে আছেন, অতএব জল খাবারের জন্যে খুকুনের সঙ্গে যে পরিমাণ খাবার এসেছে তাতে এক সৈন্যদল সৈন্য ছিমায় সারতে পারে। মাঝিরারা বলে যে, মোক্ষদা জল-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, "The only way to the heart is through the stomach."

সঙ্গে যে সেলকাট এসেছিল সে একটি সতরঞ্চি নিয়ে জলের ধারে পাতল। আমার ইচ্ছে করল বাঘেদের বলতে পারতাম। বাঘেদেটি যেন উঁচু জলে সেখানে বসে চতুর্দিক ভারী সুন্দর দেখা যায়। জল-বিজনের বাংলো একটি। কিন্তু জলের ওপরেই পাকাঘর দেখে একটি জায়গার আমরা বসলাম। টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি পর পর সামনে খোলা হল।

ভোর পড়ে মেঘেই যেন শীত শীত লাগে আজকাল। পুজোর আর দিন-দুচ্চি বাকী।

এক ঝাঁক বুনোহাঁস কোথাকুনি উড়ে গেল, উড়ন্ত তার আমাদের অবস্থানের উপর দিয়ে। একটা বালবাড়ি গেল খুব-খুব-খুব-খুব করে ছিল পেরিয়ে। নদীর বুকে এবং পাহাড়ে ঘনে প্রতিধ্বনি তুলে।

ভাবলাম সেখানে গেলে হয়তো কিছুটা সুরাহা হবে। কিন্তু এতদিন সুরাহা হয়নি। কথাটা হচ্ছে এই যে, সেখানকার লোক বন্দুকটা একটু ভয় করে। এর আগে সেখান থেকে এমন আওয়াজ আসে নি। এর মধ্যে অন্য কারণ আছে। সেবারে যখন বিজয়াদশমীর মেলে চলতে চলতে, সেই-সময়ে ছোকরারা ও ও করে না। ছোরা-খাঁড়া বেরোয়নি, ঝনঝনও না হোকেরোসিন, লাঠিতে লোহার ঝালরের পরোয়া করার প্রয়োজনও হয়ে করে না। মহাজনদের ছেলে, ও ছাড়লেই যে, চালনির ওরা সঙ্গের চালনি। কিন্তু আমার তোমার ও-তা নয়। আমার চালনি চালনা জানা করবে কি? সুতরাং, এ হয়-করবে যে, মহাজনের ছেলেরা কি মহাজনকে একটা শুভানাথীও কি করবে না? কিন্তু পারে কত! এ-চালনিতে যা দেখেছেই তা কি সেখানে পারে? আমাদের হলে, বিয়ে-থা করবে, সংসারধর্ম করবে, জমাজমি বাগান করবে, তা নয়; পুলি খেলা করা-বন্দুকটা গলে বিদ্যুতে দিন রাত পড়ছে। ঐ কারণেই জিগটোলেনের পাটির ভয়ে তোমাকে যে ওরা সাক্ষী করেছে, সে-কথা মুহুরীদা সাহেবের কানেও গেছে।

আমরা আবার কাউতে কাউতে হটাৎ ভাবলাম—চুপ করে আছে কেন? গাড়ি আর সে ছাপাটার খাটিটা এগিয়ে দিলেন। তখন একজন আমার মুখে চেয়ে বললেন, চলুন্টিলাল হও যাবা প্রাক্‌টিকাল হও। মুহুরীদা সাহেবই বলে আর যেই বলে, যারা অবস্থা বলোবস্তকে ভালবাসেন। কিন্তু তাদের তারা ছেড়ে বিজয়েন। ঐকা সমাধার বন্ধু হচ্ছি আমরা। আদালতবুদ্ধিতে হলেই জিগটোলেনের হয়ে পুলি সাক্ষী দেবে এতে আমরা যে তাদের পক্ষে হটাকাকী এটাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু তাদের পারো ঐকম ভাবলো এক্তিয়ে যাবে। যে-কারণে যান করতে হবে একা একা। সঙ্গের সঙ্গে আমোকা কথড়া করলে চলবে কেন? যে বেশী চিন্তার ফোলিং করল, কাল্ড ছোরার মুখে মারণী মাথার সময় মুখ বন্ধ, যে ফোরার মাথা কম্পন মারল, যে মুখে মারুতিতে ফুলে কথা মুহূর্ত, এক সব মিয়ে তোমার আমার দরকার কি? এই কথা-পাচারের লোকদের সব হাড়-হাবাতরা। আমরা শহুরে ভিড়িয়া, আমরা ভালবা থাকে। যাঁর মাথা না-খুন্নই পানি ঐ পর্যন্ত দিয়ে চল, তাদের ফোরিম কথন হয়ে না।

ভোবদা যা বলেছেন তার সবটুকুই মন দিয়ে শুনেছিলাম। সুযোগ বালকের মত মুখ ভোই শুনেছিলাম। কারণ, যারা উপরেদের ভালোবাসার আন্তরিক প্রয়োজন, তাঁরাসবকারে মনোযোগই উত্তর দিয়ে যেন, তাদের কাছে কথা কি আকতে পারে? এবং উপরের হোমার কিছুই বলেনি।

সুযোগ ভেঙ্গে কমে আসছে। আন্দাজে, ঢিলেঢালা পুরো কন্দ দিয়ে কন্দ দিয়ে মাথার দিকে তাকাল চলল পরম মমতায়। ঘিন-হয়ে-আসা পুরো পাকাটে আল চা আরাম করে খেয়ে আবার জীপে উঠে বসলাম।

বন্দুকটা বন্দুকে ওরে এসেছিলাম। বাক্সে থেকে খুলে সামনের সীটে লম্বালম্বি করে পিছনের কাচ্চা খুলিয়ে রাখলাম। খুলির বাঁকটা সামনে পা-রাখার জায়গার তলদিকে রাখলাম। বলা যায় না, বাঘ, হাতী কি বাইসন সামনেও করতে পারে।

ভোবদা বললেন—সাবধানে চ্রেও, আস্তে চালিয়ে চেও। এই ভোবদার জঙ্গলে হাতীর বড় ভয়। হাতীর সামনে পড়লে হর্ন-টর্ন বেন বাজিও না, গুলীও করে না। চুপ করে ব্রেক-লাইটে ভোবলে গাড়িয়ে ভোবো। নিজেরাই সরে যাবে।

ভোবদাও তাঁর জীপে উঠলেন। ভেকুলী দোলিয়ে এসে ভোবল ছাঁনিটা দোলিয়ে ভোবদা বাঁদিকে মোড় নিলেন আমি ডান-দিকে।

অন্ধকার বেন দ্রুত নেমে আসছে। পাঁচমাকালের লাল-বেগুনে আভাটা মিলিয়ে গেল। তিরিশ-পঁইত্রিশ মাইলে জীপ চালাচ্ছি। এতিনের একটানা স্নায়ুসবান সৌ-সোঁ আওয়াজে মিস্তব্ধ সমস্ত ভেদকে ভেদকে উঠছে।

ছাঁপাহাড়ের কাছে রাস্তাটা বড়ই আঁকাবাঁকা ও খারাপ। ছাঁপাহাড়ের পর রাস্তাটা কাঁচা হলেও অনেকখানি ভাল এবং প্রায় সোজা।

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্রেক-লাইটটা জ্বালালাম। ডাশবোর্ডের আলোটাও জ্বালা। 'ডিয়ারে' দিয়ে চলেছি। কারণ, এইখানে রাস্তার প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ড বাঁক এবং ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশী চালানো যায় না গাড়ি।

খারাপ রাস্তাটুকু পেরিয়ে এলাম। এবার একেবারে 'টিকিয়া-উইলস' চলাব।

প্রায় আটটা বাজে রাত। ডালটনগঞ্জ থেকে প্রায় ২০ মাইল এসেছি। এইরকম আন্দাজ মনে পড়ে, আসবার সময় বেন একটা ডাইভারশন দেখেছিলাম, একটা ডিঙ্গ ঘোরাতে হয়েছিল। কাঠের বোর্ডে লেখা, 'Caution! Diversion Ahead!'

ডাইভারশনের কাছে গাড়ি একেবারে কমিয়ে নিয়ে বাঁদিক রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম। বড় বড় পাথর পড়ে আছে লাল-মাটির পথটিতে। আসবার সময় এদিকে লক্ষ্য করেছি বলে মনে হলো না। সেকুলোকে কাটাতে নিয়ে, ব্রেক কষে স্টেয়ারিং গীয়ারে দিয়ে বেমনি উপরে উঠতে যাব, অমনি একেবারে আমার কানের কাছে গুড়ুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। এবং একটা মুহূর্তে প্রায় কান ফেটে হিস্‌-স্‌ করে বেরিয়ে গেল। কি ভয় যে পেলাম, কি বলব। হাতপদ ঠকঠক করে বড় জোর পাঁচ এমার্জেন্সি-সিলেটর চাপ দিলাম। গাড়ি এমনিতেই ভাল্ট পাঁচসেরই ছিল, তাতে স্টেয়ারিং গীয়ার চড়লো, গতি গতি করে বড় রাস্তায় পড়ল জীপ, সেই আওয়াজটাই সেকেন্ড গীয়ারে ফেললাম, তবু স্টেয়ারিং গীয়ার ছাড়িয়ে নিয়ে সেকেন্ড গীয়ারে দিতে যতটুকু সময় লেগেছিলো তার মধ্যেই আর একটি গুলী আমার পেছন থেকে এসে আমার সীট থেকে আট-দশ ইঞ্চি দূরে উইন্ডস্ক্রিনে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘুর

কী তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। কে জানে কী-ভাবে কেউ বলতে পারে কি। উপলক্ষ্য যদি হয় চলন, মনে অশান্তি থাকে তাহলে বলা অবশ্য কঠিন।

কখন গার্ড হুইসিল দিয়েছে ট্রাইজার সাবধানী সংকেত সাজিয়েছে একজনকে কাছে যায় নি। সে যেমন ঠিক সময় ধরে চলে চুমুক দিতেই থাকে। আরও বাকি, ঠিকানার গন্তব্যে ছন্দই ডুবে যেতে।

যোগমায়ার একটাই ভাবনা নিজের অন্তর্শিতর কথা। জীবন চায় অবশ্যের কাছাকাছি। সামান্য কিছু জোগাড় যেমন ছিল, সেই সামান্য ভোগবস্তুগুলিও ওপারে জুটবে না। এর পর যদি কখনো সেগুলো

সংরক্ষিত আসন

অজিত মুখোপাধ্যায়

যে চেনা জোগাড় করার মত শরীর সঙ্গে থাকবে না।

ইদানিং তার মনে একটা বড় রকমের আকাঙ্ক্ষা তাকে জানিয়ে রাখতে চলেছে।

সামান্য জোগাড় এমন অসামান্য অন্তর্শিত তাকে বাকী জীবন বয়ে চলতে হবে? মৃত্যুর পরেও তার অন্তর্শিত আকাশে বাতাসে প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াবে কুখ্যাত কিম্বদন্তীর মত?

এর জন্য দায়ী কে। সে? নাকি তার বর্তমান কাল? তার অযোগ্যতা? নাকি কেন।

দায়ী যেই হোক, তার অন্তর্শিতর অশিক্ষিত কিছু ইতরবিশেষ হয় না। নিজের কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। ভোলা ইতিহাসের শেষ অধ্যায় নিজেকে পাঠযোগ্য

তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল, ঘুমে হল মেজোমাসিমার কথায়।

সাধু ছিল টিকিট সে আদ মতো?

কী? আয়ে: ছেড়ে দিল নাকি!

পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে চলন্ত ট্রেনের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই ছুট। ছুটতে ছুটতে ট্রেনের কাছে গিয়ে পৌঁছল। ট্রেনের গতি তখন বেশ বেড়ে গেছে। সেকেন্ড ট্রেন সে উঠবে কি না ভাবল মুহূর্তে মধ্যে। কী আর তার দায়ী লাগেজ আছে। সামান্য একটা চামড়ার ব্যাগ, তাতে খান তিন জামা-কাপড় আর কিছু প্রসাধনী। ফেলে আসতে একটি তারী জিনিসপত্র বাইরে চোর না ফেলো দিল। খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস হারা মুহূর্তে আবার কিছু কিনে যায় না। [illegible]

জরুরী কাগজপত্রের জন্য তাকে পরিচালক অনুরোধ করতে হবে।

লাফ দিয়ে ফুটবোর্ডে পা দিয়ে এক হাতে হাতলটা ধরতে হবে।

যদি পা পিছলে যায়? পড়ে একেবারে ট্রেনের তলায়?

ট্রেনের গতি ক্রমশই বাড়ছে, একটির ক্রমশই পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে এগিয়ে। একটি সংখ্যার প্রকাশকালের মিলের কাগজটুকুলের সম্বন্ধটি খুঁজছে: মাত্র কয়েক সংখ্যা। এটা একেবারে নয়। পাশ-পাশালি বেশী, চতুর্দিকে ফাঁকা মাঠ, পাশেই একটি বড় নদী। প্রবীর বাতাস আর বহুদূরে বড় ঢাকা একসঙ্গে মিলে একটির কাছের পাশ দিয়ে ছুটবে বিপদটি নিয়ে। ঘরের সময় মনে একেবারে সোজা [illegible]

কাল। তারই মা বিয়েতে যায়, মা উপোস হাঁপিত্যেশ।

যে কামরাগুলিতে ট্রেনে থাকে, সেগুলি একবাড়ির জীবনের কথা।

সেগুলি হয়ে যেন বিরহ জীবনটাই মিথ্যা হয়ে যাবে।

বর্তমানের সেবায়ে যে সমবেদনা সে আঁকিয়ে এসেছে, তার কামরাগুলি ঐ কামরাগুলিতে। আর্দিন তার আঁকা ছবি। মানুষ মানুষ বলে চলেছে ছবি। আজ পর্যন্ত একবাড়ি একটি ছবিও যেমনও হাসপাতে যেতে দেয় নি। একটি প্রদর্শনীও করে নি।

মানুষই সে আঁকে চেয়েছিল।

মেয়েকে সে কম করে চেনেনি।

মুনিয়ার জন্য ফেরিওয়ালা তৈরি করার জন্য বিশেষ কারুরী সেই গান সে মানুষ পাহাড়ে হয়ে পর্যন্ত যেতে দিতে।

আর, ছবি আঁকার জন্য সে কলেজে-পাঠশালায় চাকরি করে নি, টিউশনি করে নি... টিউশনিটা এক কথায় বিশ্রী ব্যাপার একেবারে. ছবিটি লেখা কথা। মাঝে মাঝে দু-একবার বাসনা করেছে। কারে পড়ে জীবনে একবার একটা চাকরি নিয়েছিল, কিন্তু মাস চাকরী জেল মাসে হাতে হাতে চাঁদ পাওয়া, তখনকার বিশেও সে একদিন চাকরি করা করতে না পেরে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে।

তার কাছে ছবি আঁকা...ছবি আঁকার জন্য যা দরকার—তা সে বড় কলকাতাজনক কাজই হোক, করতে প্রস্তুত। কিন্তু যে কাজ তার ছবি আঁকার সময়ের পূর্তিসাধন করতে পারে না সে কাজ সে একেবারেই করবে না।

অনেকটা সে কারণে ছবি আঁকার জন্য নিজেদের মাসের বৃত্তি অনেকদিন করতে হয়। সে যেমন আঁকিয়েদের জন্য। আঁকিয়েরা মারেও পর থাকে তার সেই বৃত্তিতে নিজের আকর্ষণ যেমনো বৃত্তি নেই।

একবাড়ি তার নিজস্বীবনে এত কঠিন যে সংসারে তাকে সবাই নির্বোধ বলে ভুল করে। সংসারে সবাই যখন সুখে বিরাজে, সুখেরও ঐহিক আরামের ধর্মে অনেকে তখন একবাড়ি ছবি আঁকার জিনিসটাই উপাসীন।

একবাড়ির আত্মীয়স্বজনেরা, সবাই একে নিয়ে আলোচনা করে...এর দুশ্চিন্তার ভেতর কিছুই বুঝতে পারল না জীবনে। আর তার চাইতে বড় কথা উপলব্ধি যেমন আর জীবনে সুযোগসন্ধিত।

মেয়েকে তাদের আদর্শ পাত্রিয়া এবং সুখভোগের জন্য বিবাহ আয়োজন করে চলেছে, সবাই যে যার কল্পনাকে সাধী করে তাকে ঘুমোবার চলে যাচ্ছে। একবাড়ির কোনো আয়োজন দেখতে না পেয়ে তার ছবি সবাই বিদ্রূপ করে উঠেছে। যারা তাকে ভালোবাসে যারা তার কথা ভেবে না ভেবেও সময়ে উপস্থিত তারাও তাকে বিবাহ বাসরঘরে অনুপস্থিত দেখছে।

একবাড়ি জানে, সে যদি ডুবেও যায়, তাহলেও তার মেয়ের আয়োজন থাকবে না ...কারণ সে বিশ্বাসটা করতে করতেই ডুবেছে।

সুতরাং একবাড়ির কাছে ঐ কামরাগুলির দাম অনেক।

অনেক সময় হারানো কিছুও ফিরে পাওয়া যায়। এই স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনে যেমন করে ফিরে হয়েছে তার কামরার লোক তার জিনিসগুলি বাড়িয়ে দিয়ে চলে যেত।

না-না। হয়তো কিন্তু...ইত্যাদি উপমা করনা করে একবাড়ি চোখের সামনে নিজের এমন আর আকর্ষণীয় দেখতে পাচ্ছে না। সত্য কিন্তু একবাড়ি...এবং তুলনাই ঠিক তার কল্পনাশ্রেণীটাই সামনে। একটা গা শিহরণে গেল। নিজের শরীরটা সে অনেক চেষ্টা করে সোজা করল। দুটো পাই ফুটবোর্ডে স্থাপন করল।

শরীরের বাতাস হু হু শব্দে যাচ্ছে।

ট্রেনে অতিরিক্ত স্পিডের পর ব্রেকগুলো যেন মিঠে লাগল। একবার গলা ঠান্ডা বাতাসে প্রবোধ লাগল।

তালার হাতল ঘোরাতে গেল, কিন্তু হাতল ঘুরল না।

ভিতর থেকে লক করে দিয়েছে যাত্রীরা।

ঠান্ডা বাতাসের ভয়ে জানলার কাচের ও কাচের পার্দা ফেলা। বাঁ হাত দিয়ে একবাড়ি পার্দিতে ধাক্কার ঘুষি মারতে লাগল।

কাকনা পার্দিয়েলনা।

ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ফুলপথের অন্ধকার। জানলার চোখ চেনের চুকেছে। প্রথম তার শরীরে বাতাস একবাড়ির মেয়ে প্রথম জন্মটা মেরে যাচ্ছে।

অনেক মিনিটের মধ্যেই একবাড়ির হাত-পা ভয়ে মেতে লাগল।

সে জীবন ভয় পেয়ে গেল।

একবাড়ির চোখ। পরবর্তী স্টেশন পর্যন্তটা পরে।

এখন শরীরে সে কতক্ষণ ভয় করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে।

এখনই তার শরীর ঠিক হয়ে আসবে, তার শক্তি লুপ্ত হয়ে যাবে, তার দৃষ্টি শিথিল হবে। সে...

না আর একবাড়ি ভাবতে পারছে না।

যে ছবিগুলির জন্য সে নিশ্চিন্তের চিন্তা না করে চোখে ফিরিয়ে উঠেছে, সেই সমস্ত ছবি কি আর কখনো আঁকতে পারবে না।

না মেরে থাকলে তো আর জীবনটার চিন্তা করা যায় না। যদি জীবনটা থাকলে এইরকম না হতো, আরও কত ছবি, কত রকমের ছবি আঁকতে পারত।

যে অর্থাভাব সে ঘরে বেড়াচ্ছে, তার প্রতিকারের সময় পেত।

এখন যে তার জীবন নিয়েই টানাটানি।

আবার একবাড়ি বন্ধুদের ঘুর্ণি বাহন জানলায় কপাটে।

ঘুরেছে।

ভিতরটা নিঃসাড়।

চোখদুটোর কি সন্ধের মধ্যেই শুরে পড়ল? ঘুমিয়ে গেছে?

চীৎকার করে ডাকল একবাড়ি। অন্ধকার প্রান্তরে সামান্যতম প্রতিধ্বনি তুলে তার ডাক মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধের কোলে।

অন্ধকারে গাছপালা কাশবন। আকাশে নক্ষত্রগুলো জ্বলজ্বল করছে। কী বিস্তৃত নীরবতা। গাড়ির অন্ধকারেও সোনালির সন্ধার মত নীল রঙের আলোটা রহস্যময় বিলম্বিত হয়ে যি।

বিলাস বিলাসময় ভবিষ্যতের পরিকল্পনার দুঃখ কল্পনা করার চেষ্টা করল একবাড়ি। এই বিলাসময় পরিসরে মানুষের অস্তিত্বের বিন্দুর মত, তার পরমাণু অনন্তের পরমাণুর তুলনায় হাসকর সংক্ষিপ্ত।

এই অনন্তের ছবি কি একবাড়ি মেসোপোমিয় তার কামরাতে আঁকতে পারবে। তবে কেন ছবির পূজোবলী নিয়ে এত পূজোপুজি। তবে কেন ছবির জন্য আত্মবিসর্জন।

অনন্তের স্থান যারে মানুষ পায় ছবির মাধ্যমে তারই মানুষ প্রয়াস করে চলেছে একবাড়িরা।

অনন্তের স্থান? সে আবার কোন সোনার পাথরবাটি।

অন্ধ দিয়ে অনন্তের স্থান আবার কখনো গ্রহণ করা সম্ভব?

একবাড়ি ভাবে। আমি যখন অনন্ত নই, তখন অনন্তের জন্য ব্যাকুলতা কেন। আমি যখন অন্ধ, তখন অন্ধ নিয়েই আমার চলা। অনন্তের চলাকালার দুর্গন্ধগুলি কি কম খারাপ। তাহাই গন্ধ তেল দে। এই অন্ধত্ব চিরকাল অন্ধত্বই হয়ে থাকে, আমার আমার আছে...ছবি মানুষের আত্মার অন্ধকার থেকে তাকে আলো করা কথা। কিন্তু আমার অন্ধকার যখন বিশ্বাসলয়ের নয়, তখন মানুষকে অন্ধকারীন আলোই হবে। আর মানুষ যখন অন্ধকারীন তখন সে কল্পনাদৃষ্টির অন্ধ অন্ধের দিকে তাকিয়ে দুঃখে চোখপ্রান্তের মেয়েরা মানে হয় না। থাক সে অন্ধত্ব, অন্ধত্বের জীবন নেই মৌলিক নেই, তেমন নেই সত্যি-সত্যিকার নেই সে অন্ধত্ব সর্বনাশ হয় না। সে অন্ধত্ব চাইতেও অন্ধ সে কুৎসিত পাপ।

একবাড়ির গলা থেকে বাসনাগুলোর মত অন্ধে প্রার্থনা সুরে বেরোলো—বাবা... ও মা... ও মাগো... বাবাগো... এই, শুনছেন। বড় ভোগান্ত...

হাতঘড়ির দিকে তাকাল একবাড়ি পরবর্তী ছোট স্টেশনের আগমনের।

বাজে। আধঘণ্টার ওপর ট্রেন ছুটেছে...এক নাগাড়ে। এখনো একঘণ্টা বাকী।

অসম্ভব। একঘণ্টা সে লোহার রড ধরে কুটিবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

বারবার সে হাত পাল্টাচ্ছে।

মহীতোষ কাঁপুনি ধরে গেছে। হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে।

এক হাতে রড ধরে আরেক হাতে শার্টিংয়ে ঘুঁষি মারতে আর সাহস হচ্ছে না। আর এক হাত দিয়ে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। দু হাত দিয়ে লোহার রডটা আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে।

এককড়ির মনে পড়ল, আজ সে সারা-দিনই প্রায় অভুক্ত। সেই সকালে কাপ দুয়েক চা ও একটি কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি খেয়েছিল। তারপর সারাদিন একটা কাজে ঘোরাঘুরি করেছে, তারপর তাকে ব্রেকডাউন ধরে ট্রেন ধরতে হয়েছে। স্নানটানও করে নেবার সময় পায় নি।

তার উপর, ইমার্জেন্সি তার বেশ উলোটপালট করছে।

পৃথিবীকে যারা, বলতে গেলে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ছোটাচ্ছে কি না সন্দেহ।

হঠাৎ মনে হতে থেকে মনে হচ্ছে, সে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একটা লম্বা আলো এককড়ির গায়ে এসে পড়ল।

কাচের খড়খড়ি তুলেছে কে কামরার ভিতর থেকে, এবং সে খড়খড়িটা তারই পাশে। জানলার কাচ দিয়ে আলো ছিটকে এসেছে। জানলার পাশ থেকে নেমে এল এক তরুণীর মাথা।

এককড়ি মুখটা বাড়াল জানলার দিকে। এক পলকের জন্য কাচের শার্সিটা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হয়েই ঝুপ করে অন্ধকারে পড়ে গেল। এক দলা কফযুক্ত থুথু এসে পড়ল এককড়ির চোখেমুখে।

হতচকিত এককড়ি হিংস্রতায় জ্বলে উঠল। কামরার ভিতরে যারা আছে, তারা কি জানুবে। সে শিথিল হাতের এক মুঠিতে জীবনপণ করে ঝুলতে ঝুলতে অপর হাত দিয়ে ক্ষিপ্তের মত চাপড় বসিয়ে চলল।

তরুণীটির কানে গেল বোধহয় শব্দটা। সে আবার মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। এককড়িকে দেখল কিছুক্ষণ...তার কানে যুক্তিযোচিত হল, নাকে নাকছাবি। ঘাড়কাটা চুলটা। চুলগুলো প্রহরকাল ধরে কপাল জুড়ে বসিয়েছে। সুন্দর দুটি হাত নীলাকাশে হাংপাখের মত ঝুলিয়ে আছে নীল শাড়ির উপর। মাঝে মাঝেই আঁচল খসে পড়ছে বুক থেকে, স্বাস্থ্যবতী তরুণী। শীতের সিনেমালের জন্য একগাদি গয়নার লোভ। কেয়ারের কাছে লুটোচ্ছে।

জানলার কাছে মাথা নিয়ে যেতেই চোখে পড়ছে খোঁপায় জুলের ফুল বসানো কাঁটাগুলির দিকে। মাথারের চাইতেও ঘনো ঘাড়ের ও পিঠের দিকে।

তরুণীটি চলে গেল অন্তর্ধান করে উঠল।

মরুক মরুক কে? ডাকাত-কাকাত নাকি? আর তার গলার স্বর ফুটল না।

ডাকাত? মোহনা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত হেসে উঠল অভীক।

খাড়া নাকে প্রশস্ত কপাল ছোট ছোট দুটি বাদামী চোখ। গালের হাড় উঁচু, থুতনি বড় জোর ছিপ, মুখের চামড়া এখনো দুটি একুশ বছর বয়সের মুখমণ্ডলের মত কাঁচা। দু-বাজারের বেশী লাইনে পায় নি, ফোন্সানীর চাকরি। শীতকালটা বিহারের কোথাও স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাবে ভেবে চলেছে।

মতলব তাদের মনের মত জমে চলে গেছে।

অভীক আজই ছুটি পেল...আর টুনটুনির ফোন্সানীর কথাই ছিল সে অভীকের সঙ্গে যাবে। অফিস থেকে পিওন পাঠিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের একটা বার্থ রিজার্ভ করার চেষ্টা করেছিল অভীক। ফার্স্ট ক্লাসের সীট পাওয়া যায় নি, অগত্যা এই মতলবের সেকেন্ড ক্লাস। তাদের মধ্যে চারটি সীট।

টুনটুনের ছেলে সেল অভীকের বাপ-মেলানো হাসি হেসে।

নিজেকে ছাড়া পৃথিবীর আর সবাইকে তুমি বোকা ভাব, না?

না না...ভুল বললে, সবাইকে বোকা ভাবি ঠিকই, তবে তোমাকে বাদ দিয়ে। হাজার হোক তুমি একজন জার্নালিস্ট অন্তেবাসীর অন্তর্গতিক।

আবার জোরে হেসে উঠল অভীক।

হাসি থামিয়ে দিল হঠাৎ, মনের মতন...এক কোঁটা হাসির রেশও লেগে রইল না ঠোঁটে।

অসম্ভব নয়, খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছ, প্রাক্তন রেল কামরায় চড়াও হয়ে ডেকে করেছে। ...অভীক মনের ভাবকটার করেনাম, কী যে হচ্ছে, বাইরে! শান্তি স্বস্তি বলে কোনো পদার্থ নেই। তোমার বুকের পাঁজরে প্রাণটুকু আঁকড়ে কেবল ভয়ে ভয়ে দিন কাটানো।

টুনটুনে অভীকের কথা কানে মিছিল কি না বোঝা গেল না। সে আবার জানলার চোখ ঠেকিয়ে কী দেখছিল।

ট্রেনটা ফল্গাইলেন্ড। মাঝুলো আর্টীর বসিয়ের স্থান। ব্রাঞ্চ ছুটছে মুখে। পুরো কামরাটাই আগে থেকে রিজার্ভ করা বারীদের জন্য। মাথার ওপর ট্রলি পরানো দুটি ফুল। একটিও অক্ষত নেই। বন্দরের দিকে একটা বাতি একলা হলদে জ্বলে দিচ্ছে, এ পাশটা ছায়া-ছায়া দেখা যাচ্ছে। একজনের গায়ের পাশ দিয়ে যে আলো পড়েছিল সেটা অভীকের উঠে আলো। ঘাম-লেগে মাথে হলে অভীক পাঁজরেলের টুকরো দিয়েছে। খুব অবার মতো বাকবাকে চেহারাখানার খুঁটিনাটি তিনিদ সঙ্গে মিলেছে অভীক। টুনটুনের অভীকের মত সংবেদী নয়।

ওরা মুজনে একটি খালি আসন দেখিয়ে পর ছড়িয়ে বসেছে।

সামনের চারজন যাত্রীদের মুখের চেহারা, একজন ঘুমোচ্ছে জবাই, আরেকজন আকাশপাতাল চিন্তায় গভীর মগ্ন।

কামরার কিছুক্ষণ আগে আলো নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা এক পলকা হয়ে গেছে। আলোর সঙ্গে রেল কোম্পানীর প্রাক্তন থেকে মুছে করে বর্তমান কালের সবই অত্যন্ত জরুরী, এই সিদ্ধান্তের সব ই পৌঁছে যাবার পর, আলোচনা নিজের থেকে মিটে গেছে। সবাই অপরিচিত এই জায়গায়। যাত্রিদের প্রসঙ্গ সবারই অজানা। তাই বাইরের প্রসঙ্গ জুটিয়ে যাবার পর আর আলোচনা ফোটাই টেনে নিয়ে যেতে পারে নি।

অভীক ও টুনটুনে একটার পর একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যাচ্ছে, আর ওরা হাসাহাসি করছে।

মহীতোষ একের পরিচয়, পারস্পরিক সম্পর্ক জানার জন্য একটা জল ছেড়ে দিয়েছে...কিন্তু তাদের মুখে কোন নির্দিষ্ট।

মনের এককড়ির আসন। তার বিপরীতের দিকে যে যাত্রী, সেই লোকটি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, একজন তারই ঘোরাল ছিল, এককড়ি উঠেছে কি উঠেছে না...কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগেই নাক ডাকতে সুরু করে। সেই নিয়েও একবার অভীক ও টুনটুনে মুখ টিপে হেসেছে। এককড়ি বসা দেখে নির্দেশিল তখন সবাই

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতের শাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
স্থাপিত ১৮৬২
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার, কলিকাতা-৭

দেখেছিল, কিন্তু বলে ছিল না কাউকে। একবারও সেই যে সেরাজন স্টেশনে অপেক্ষার উপর না জেগে শুয়ে পড়েছিল, সেখান থেকে ওঠে নি।

তাকে পাঠানোর কথা ওরা ভেবে ছিল কাউকে পাঠানো যায় তাই। তাকে পাঠানো যায় না।

সে সেরাজে যাবে, কিন্তু ফিরে এসে ইউনিয়ন কিংবা সে আর কখনো ওকে ফিরে পাবে না।

একবারও মাথা তোলে নি ইলা-ইউনের আসার সময়। তারপরে, যখন তোলার চেষ্টা করেছিল, তখন ওর মাথাটা ভারি হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছিল, ওর মাথার ভিতরে কে যেন একটা বড় ঢাকনার সঙ্গে ওর মাথা আটকে দিয়েছে। কিছুতেই ওর মাথা তুলতে পারছে না। অথচ ওর মনে হচ্ছিল, ওর মাথা তুলতে পারলে ও ইলা-ইউনের মুখের ভাষা বুঝতে পারবে। ওর মনে হচ্ছিল, ওর মাথা তুলতে পারলে ও ইলা-ইউনের মুখের ভাষা বুঝতে পারবে। ওর মনে হচ্ছিল, ওর মাথা তুলতে পারলে ও ইলা-ইউনের মুখের ভাষা বুঝতে পারবে।

ইলা-ইউন ওকে কী বলতে চায়? ওকে কী বলতে চায়? ওকে কী বলতে চায়?

হৃষিকেশ একবারকে নামতে দেখেছিল ...আর এবার আলোআধার ঘুমন্তে পারল কেউ একজন ঘরের ভেতর ঘুমন্তে। এবং তাকে একটুনি অবকাশ ভুলে না আনলে তার জন্য-লীলা সাঙ্গ হবে।

হৃষিকেশ উঠে বোস দরজার কাছে। দরজা খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা ছিটকিনি আড়ায় সে ছাড়ে খুলতে পারল না।

ফিরে এল হৃষিকেশ।

তখন প্রায় সাড়ে পাঁচ। আরও পনের কুড়ি মিনিট পরে পরমেশী ফুটেছিল।

একবারি ঘর ঘরে বসে পড়েছে। তার সর্বশরীর ঝিমঝিম। যে কোনো মুহূর্তে হাত শিথিল হয়ে ছেড়ে পারে। সে আর আলো জানলায় আঘাত করে দরজা খুলে দেবার চেষ্টা করতে সাহস পাচ্ছে না। তাতে তার শরীরের শক্তি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। পকেট থেকে দেশলাই ও সিগারেট বের করে কয়েকবার ঘুরেফিরে করেছে। দেশলাই জেলে আয়নে পোষাবার চেষ্টা করেছে। হয় নি। বার বার ঘুমন্তে নিভে গেছে দেশলাইয়ের কাঠি।

তার মাথাটাও কাঁপতে সুরু করেছে অনেকক্ষণ আগে।

মনে হচ্ছে, সে চোখে ঝাপসা দেখছে। গাছপালা বিলম্ব আর সে দেখতে পাচ্ছে না। কোটি কোটি নক্ষত্র যেন এক হয়ে গেছে, একটা কাঁপসা আলোর আভাস আধার উপর ভেসে চলেছে।

সে তার রিস্টার্ক সীটের জন্য অনুতাপ করছে। সে তো একটা অসম সমর করার অবসর হাতে। আর সে অসমটা অন্যায়ে পরিপূর্ণ। যতটুকু হোক সে আরাম, তার কাছে ওরাই মূল্য অনেক।

নিজেকেই সে, শেষ পর্যন্ত ধিক্কার করতে লাগল।

এতটুকু ঘুম নেই তার। যেখানে সামান্য সতর্কতায় অনেক কিছু করা সম্ভব সেখানে সে সেটুকু সতর্কও হতে পারে না। সে কোনোদিনই মানুষের মন ঠাঁই করে নিতে পারবে না। ছেলের কলমায় তো ঘুমন্তে।

নিজের সীটে আরেকে বসে থাকা তার খুবই উচিত ছিল। একটা আসনে সে যে দেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। আরেকটা আসনে বসার জন্য সে যে বড় উন্মাদ হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্যেই। তার প্রকৃতিটাই চঞ্চল। কয়েকটা মানুষ, ছোলো বিশেষ স্থান সে দীর্ঘকাল বসে করতে পারে না। এই চঞ্চলতাই তাকে বড় থেকে টেনে নামিয়ে চলের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

হৃষিকেশ ফিরে গিয়ে বলল, আমি ঘুমন্তে পারছি...ঠুকরো এসবে এদিক বাসে?

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল।

এবার সকলেই ভয় পেয়েছে। কেউই এগিয়ে আসতে চাইল না। ঠুনকোকে ডেকে কাছে নিয়ে উঠল।

হৃষিকেশ হেসে বলল।

মৃদু স্বরে বলল, ভয়ঙ্করের এলাকে হবেক নাই। ঠুকরো ঘুমিয়ে যাও। আমি ঘুমন্তে। মারবে আমাকে? মানুষে মা! ঘুমন্তে তো হইঁচি।

হাতঘড়ি দেখে বলল অতীক, আর তো সতেরো মিনিট। ঘাবেন না কর্তা। একটু চুপ দিয়ে বসেন না।

ইয়ার মধ্যি যদি মানুষো মারেই যায়?

মৃদু ঘুমন্তের চলন।

সময় যে এমন কাজ করে, সময় পরে মনে হলে কি ভয় সে ঘুমন্তের ছেলেরা ঘুমে যাবে।

ঘুমন্তের মায়াময় ঠুনকো হাওয়ার একবারি যখন সেঁতিয়ে পড়ল, তখন সে ঘুমন্তে পারল, এভাবে আর সে বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। যাকে আর কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

শরীর একটি নদীর ছিল সেরেছে তখন ট্রেনটা।

তারার আলোকে জলের ধারা দেখা যাচ্ছে। বালির উপর দিয়ে চলেছে ট্রেন।

বাঁপিয়ে পড়বে নাকি।

কিন্তু ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত একবারি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না।

অসম্ভব। তার বাঁচার কোনো উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত তাকে অদৃষ্ট অর্জন্ত-ঘুলি এই পৃথিবীর কতকগুলি অসুরক্ত ছেলেমানুষ হাত ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।

আর, তার শেষ ইচ্ছাটিও এঁকে যেতে পারবে না।

বড় অসহায়, বড় করুণ মনে হল তার নিজেকে।

মানুষ সব সময় নিজের আয়ত্তাধীন নয়, এই জন্যাধারে তাকে বিশ্বাস করে বসতে হবে।?

না।

একবারি পকেটের পার্সব্যাগটি খুলে ফেলতে লাগল কাঁপন্ত হাতে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কোনোরকে কাঁস পেলো হয়ে ভোমরে বেড় দিয়ে গেছার মতন সঙ্গে নিজের সরীরটা পারজমা পেঁচিয়ে ঘুমন্তে সব করে বাঁধল একবারি।

বাঁধা শেষ করে আবার হাঁপাতে লাগল। মাঁথা ঘাঁড় নেমে ঠুক ঠুক করে কাঁপছিল অনেকক্ষণ আগে থেকে। এবারে সে একেবারে এলিয়ে পড়ল।

তার মনে হল, যাক সে বেঁচে থাকবে। পড়ে অন্তত যাবে না। সারারা আশ্বাস তার সরীরের সাঁথর শেষ পরিচ্ছেদ খুলে দিল। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল।

না না। সে সোজা বাঁচিয়ে থাকবে। সুস্থ হয়েছাবে। উঁচার ভালোবাসার ঘর সে ট্রেনের দরজার খাড়া থাকবে।

স্টেশন জানিয়ে জানার জন্যেই হোক, অথবা জামরার বাইরে ঘুমন্ত বাঁচাটির প্রতি বাত্রীদের মনোবিক সন্দ্রীতির জন্যেই হোক, সবাই হৃষিকেশ প্রতীক্ষাকের পিছু পিছু অফিসেরে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোকেরা হৃষিকেশকে দরজা খোলার নির্দেশ দিতে লাগল হাত পা ঘুমন্তে।

বার বার ভুল করার পর হৃষিকেশ দরজাটা খুলে ফেলল এক ঘটকায়।

বাইরের ঘন অন্ধকার ঘর চুকে পড়ল এক ভয়ন্ত হিমার্ত বাতাস। আকাশের তারাগুলো ঘুমন্তে লাগল. শরীর এক অসীম চাঁপ মুখে টিপে হাসের অন্ধকের রাতখানে।

কই। কেউ নেই তো।

বড় ভয় করছে বাপার! অন্ধকের মুখে হাসি উঁকি মারল। বাবা! কী ভয়ন্তি নিয়ে তাদের এঁদের অসতে হয়েছে। ঘুমন্তের হাতে সেজন্যে নিজেকে তুলে দিয়ে চলে এসেছিল।

ঠুনকোকে অতীক টানা করতে যাবে এমন সময় হৃষিকেশ পা ঘুমন্তে উঠল। পাঁচ-সেকেন্ড চুঁ এতক্ষণ কোনো পর্যন্ত মাতা-চক্ষু করছিল। নরম, লোহার মত, অন্ধকার, ঠোঁটিয়ারের ভয় এমন কি আকাশ ছিল ঠোঁটির লক্ষ্যস্থল।

হৃষিকেশের পায়ের কাছে পড়ল উঁচুর অন্ধের।

আন্ধ হাতের মত একটা কাপড়ের টুকরো হাওয়ায় উড়ে এসে হৃষিকেশের পা বার বার জড়িয়ে ধরছে।

হৃষিকেশ কাপড়টা তুলে ধরল, একটি অবলম্বন পায়জামা, লোহার জন্যে সঙ্গে আটকানো।

সবাই সবেগে কাছে গেলো নিজ-নিজ দৃষ্টির জোড় মেলিয়ে। উঁচুর অন্ধের সন্ধানে সন্ধানে ঘরজার একপাশে নিয়ে গেছে দুইজন ঘিরুক্ষন। ফরসা অবয়ব দেখলাইয়ের শব্দ জ্বলা নিয়ে দেখা। ঘর ঘরে অন্ধকার

নজরুলের সঙ্গে কারাগারে

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

।। ৭ ।।

নজরুলের সঙ্গে কারাগারে এইখানেই দেখা করা সম্ভব হত। কিন্তু আমাকে আর একটু এগিয়ে যেতেই হবে। কারাগারের বাইরে এসে আরো দুবার নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের যে মূর্তি আমার মনে অঙ্কিত হয়ে আছে এবং পরবর্তী জীবনে যেভাবে নজরুলকে আমরা পেয়েছি, তা না বলে শেষ করলে আমার জানা ও চেনা নজরুলের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রায় দু বছর পর জেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ফুলবাড়ীয়ায়। ১৯২৬-এর মে মাসে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বসেছিল ফুলবাড়ীয়ায়। আমরা সভাপতি। বীরেন্দ্রলাল আসবেন। বিশ বৎসরের এক বিপ্লবকর্মীর চাওয়া। মোমিনপুরের বাড়িতে। দেশবন্ধু ছিলেন স্বাস্থ্যান্বেষী। গায়ের রঙ ছিল নিকষ কালো। বিশাল দেহ। দেখতে ও হৃদয়ে বলশালী। কিন্তু ঐ কৃষ্ণবর্ণের অন্তরালে একটি সহজ, সরল ও উদার প্রাণ ছিল। মনটি ছিল ঠিক লাল রঙ। সেই উদারতা মুসলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও প্রেম সঞ্চারিয়েছিল। ওঁরই আমন্ত্রণেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে এক অপরূপ সুখের আস্বাদনের কথা তিনি বলেছিলেন মোমেনশাহীবাসীর মনে তো বটেই,—গোটা বাংলারও অন্তরে।

দেশবন্ধুর নিকটআত্মীয়দের মধ্যে আমার ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই এই সম্পর্কের খাতে কাউকে দেখা যায়নি। সুভাষচন্দ্রকে আমরা যতো তাঁদের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে বসাবার পর নিকটআত্মীয়দের মধ্যে সব চাইতে বীরেন মনে বিদ্রূপতা দেখা দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পাসমাল, আরেকজন প্রেমের সরকার। প্রেমচন্দ্র দেশবন্ধুর নিকট সম্পর্কের পরিচয়ে তাঁর আদরিনী বিয়েছিলেন তাঁরই পুত্রী যাদুরাণীর ওপরওয়ালা। সুভাষ বসু সরে নিকটে টেনে আনতেই সেদিন শাসমলের মাথায় সভাপতির শিরোপা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রেমচন্দ বই-এর দোকান করেছিলেন আর সেই সূত্রে কৃষক আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। প্রেমচন্দের আমন্ত্রণে কাজী কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

কলকাতায় বছর দেড়েক পর কাজী ফিরে এসেছিলেন প্রমীলাকে। প্রমীলার প্রতি কাজীর আকর্ষণ ও আসক্তির সবটা না হলেও কিছুটা আমার জানা ছিল। কিন্তু এ-কথা জানতাম না, কাজী এমন অকস্মাৎ প্রমীলাকে বিয়ে করে বসবেন। এই বাউন্ডুলে মানুষটির প্রতিবিধি ছিল সেদিন আমার একান্তই অজানা। বাকস্বর্বস্ব যুবক। মাঝে মাঝে কলকাতা আসতাম। ওরই এক ফাঁকে শুনেছিলাম বিয়ের কথা।

বীরেন,—প্রমীলার অগ্রজপ্রতিম ভাই ও কাজীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। পথে একদিন দেখা হতেই বীরেন ছোট ছোট করে কেশে উঠেছিল। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কাশতে কাশতেই বীরেন বলেছিল—'সামাজিক সমস্যা খুব নয়, দুলীর ভবিষ্যতের জন্যই আমাদের সব চাইতে বেশি দুশ্চিন্তা।'

হবারই কথা। চাল তো কোনদিনই ছিল না কিন্তু চুলো সারাই করবার সামর্থ্যই বা কাজীর কোথায়? দুলী আর দুলীর মাকে ঘরে নিয়ে সাতকাণ্ডের জন্য ছেড়ে যেতে হয়েছিল কাজীকে। ঠিক এই সময়েই প্রেমচন্দের আমন্ত্রণ এসেছিল। কাজী সপরিবারে আসা করেছিলেন কৃষকসম্মেলনের দিকে।

কৃষকসম্মেলন নানা দিক দিয়েই স্মরণীয়। ব্যাপক প্রচার ও প্রচণ্ড উদ্দীপনা শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে এক গভীর বিস্ময়—তিনি বাংলার প্রথম সারির উগ্রপন্থীরা অধিকাংশে কংগ্রেসকর্মী। শাসমল জনপ্রিয়। কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত। এই আঘাত-খেয়া পটভূমিতে বাজার খুলে সেদিন বুর্জোয়াশ্রিত ও বিত্তাশ্রিতদের মুখোশের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক জুজুবেয়াজরা মাথা খাড়া করে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। এবং আশ্চর্যটা তারা সফলও হয়েছিল। ১৯২৫-এ, দেশবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরই স্বরাজ্য সাম্প্রদায়িক ধাক্কা খেয়েছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আর ভারতবর্ষের বৃহত্তম মুক্তি আন্দোলন প্রায় সমসাময়িক। ১৯২১-এর আন্দোলনে হয়তো ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে স্বরাজ পায়নি, কিন্তু এর পরিণতি উপলব্ধি করবার মতো ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অবশ্য কিছু, যা হোক একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে-ছিল। জেগেছিল অনাগত ভবিষ্যতের আশা। সেই জাগরণোন্মুখ চেতনা প্রতি অক্ষরে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ১৯২২-এ। স্তব্ধই হয়েছিল কিন্তু মরে যায়নি। ওরই কিমবদন্তী বুকের ওপর নানা বেশে আর বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের সঙ্ঘ আর সমিতি। গ্রামীণার নব-জাগৃতির বন্যাবেগ ছড়িয়ে পড়েছিল নানা উপকূলে। ভারতের ইতিও তার ঢেউ লেগেছিল। ফলে কমুনিজম, সোসালিজম, কৃষক ও মজদুর সমিতির এল আবির্ভাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল প্রতিপক্ষও। মুসলিম লীগ ও হিন্দুসভাও নবকলেবরে দেখা দিয়েছিল রাজনীতির আসরে।

অন্যান্য ভারতবর্ষের রাজনীতি জাগা-নুদের গন্ডি পেরিয়ে কৃষকদের পথে পা বাড়াতে শুরু করেছিল। কংগ্রেসের পাশা-পাশি জনসাধারণের মনে স্বাধিকারের প্রশ্নও স্থান করে নিতে চাইছিল। তখনো শুধুই চাওয়া। এর বেশি নয়। কিন্তু এই চাওয়া শুনেই চমক হতে উঠেছিল বিরোধী পক্ষ। কায়েমী স্বার্থের মনে ঠিক সেই মুহূর্তে ভয় হয়তো জাগেনি, কিন্তু ভরসাও বেশি দিন থাকবে, এ নিশ্চিন্ততা ছিল না। এরাই পড়েছিল মুসলিম লীগ, হিন্দুসভা, জমি-দার সমিতি, বণিক সঙ্ঘ।

প্রতি বছরই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মে-লনের অধিবেশন বসত এক এক জেলায়। কৃষকসম্মেলনের বেলায় কথা। কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয় সম্মেলনই নয়, এর সঙ্গে কথা হয় ও শুধু সম্মেলন। বসল কৃষক সম্মেলন। বাংলার একই সময়ে এবং একই স্থানে এই প্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের পাশাপাশি এই ধরনের সম্মেলন স্থান পেয়েছিল।

কিন্তু সম্মেলনের আগে থেকেই কাজীর কিছু প্রস্তুতি ছিল। কাজী নজরুল কাজের

রাজবন্দীর জন্মভূমি নয়। কলকাতার মনের স্বাধীনতা-প্রীতিও উবে গেছে। কেউ টিকে থাকতে পারে না। ডিরিজের দেশ সবাই। কলকাতার সঙ্গে রাজবন্দী বা স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পথ কখন জটিল হয়ে উঠেছিল।

কী স্বাধীনতা, কী রাজবন্দী—এরা ও অনেকদিন ছিল আমার শত্রুর উপর। কেউ ত্রাস ছিল। কেউ ছিল ভীষণের আতঙ্ক ও ঘৃণার। বিপ্লবের দেশে কী ঘটে? সাহিত্যে। সাহিত্যে এ কথা প্রমাণিত। এ কথা প্রমাণিত আমার নয়। তবুও ওরাই আসে সকলের পুরোভাগে।

সাম্যবাদীর দল আঁতকে ওঠে। বলে ব্রটেলরী। বলে ভুল পথ। হয়তো তাই। ভুলই। তবুও ওরা ভুলের টানে। জেলের পথের পথিক চিরদিন যেমে ছিল এই বন্ধুর আর অন্ধকারাকীর্ণ দুর্গম পথ।

ভদ্রলোকের দেশপ্রেম কলকীর আমলা নয়। এরও দেশের স্বাধীনতা চায়। এবং হয়তো সকলের আগেই চায়। স্বাধীনতা পেলে ওদের হাতের মুঠোয় থাকবে রাজকীয় ক্ষমতা। কলমের থাকবে শাসন ও শোষণের দণ্ড। সেনাবাহিনীর সৈনের জন্য সাধারণকে ভূলিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র জোর করবে ওরাই। ঐ ভদ্রলোকেরা। এবং তাই সকলের আগেভাগে ওরা প্রস্তুত আসে। এসেছে, কিন্তু ওরা সেদের অধিকাংশ, মনের সর্বহারা, ওদের যে কথা বলবার কেউ নেই। প্রয়োজনও নেই। ওরা দাঁড়াবে ওদের বিদেশের পয়সার ওপর।

ওদের শক্তি ছেলেরা নেই। নেই জোর। ভদ্রলোকদেরই ছিল শক্তি? ছিলই যদি হাজার বছর শাসন জেল ছেলেরা আর জোর কিনে নেবে। বেসামরে একদিকে ধরে ফেলে ফেলে, অন্যদিকে নিজের স্বার্থ-জোরের তাগাদায়। ভদ্রলোকেরা জোরে উঠেছে, সেই তাগিদে ওরাও জোরে উঠবে। তবুওরা বাসে নয়। অনুকম্পা ওরা চাইবে না। নিজের অধিকার নিজে ওরা ছিনিয়ে নেবে। কলকী স্যাঙাতকে লিখলেন,—

গান্ধি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল ধরা আনি
কলমের কল্যাণে।

ব্রহ্ম বিশ্বাস কঠিন মানের নির্মম মুঠিতলে
চূর্ণ করি সমস্যা সেয়
আনি তারে ফুল ফলে।।

কিন্তু একথা কে কবে বলে ধরে রাখল? রাখেনি। রাখবেও না। তাই কলকী সম্পাদকীর লিখলেন,—আমরা আলাদীন যে আমরা আমাদেরকে পরাধীনতা কৃপণ, আমরা মুঠো ভরে চাইব। যারা ভোগালের পয়সার ওপর এসেছে, আমরা ভোগালও পয়সার ওপর

কৃষ্ণনগর সম্মেলন কলকীর জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনল।

আটচল্লিশের পর কলকী রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যান সেরেছিলেন, সেই বিষয়ে অনুভূতি মনে,—

হৃদয়ে শিবি, কলমের মন্ত্র,
মুক্তির পায়ারায়
লাঞ্ছিত হয়ে আছি নিশিদিন,
বন্দীর দুঃশিয়ার।

দুদিন পূর্বে আকাশের বাণী শোনা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান মন,—মনুষ্যের টাটকা তাজা লাল রক্ত ছিটে গেছে আকাশের গায়ে। হয়েছে বাঙালী। সে-রক্ত মনুষ্যত্বের জন্য স্বাধীনতার বেদী প্রতিষ্ঠা করতে হয়, আহি সে-রক্ত দিতে পারেনি। ঈশ্বরের মতো ভাই ভাই-এর রক্তে মিলেরা স্নান করল। শিউরে উঠেছিলেন কলকী। ছেলেও পড়েছিলেন। চোখের সামনে জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের সমাধি দেখে চোখের জলে লিখলেন,—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?"
এই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল দুর্দিনের কান্ডারী,
সন্তান মোর মার।।

আমাবস্যা কলকী। নিরাশার অন্ধ অন্ধকারের ভেতরেও প্রাণে জাগে সূর্যের আশা। চোখে ভেসে ওঠে আগামীকাল। দুঃস্বপ্নের রাত্রির পর আসবে অনুভবের হয়ে। পরাধীনরা আছে সত্য কথা, কিন্তু তবু মেইতে বড় সত্য জাতির জন্মের অপেক্ষা করছে,—জাতি স্বাধীন হবেই।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা
কুমীরের চর।
ঐ কলঙ্কের দুর্দিনান্ত হবে তারতের নিবারণ।
উদিবে সে রবি আমাদেরই পুবে
রাত্রির পূরবার।।

কিন্তু কলকীর তখন গানের প্রবাহ স্থায়ী হবার অবকাশ পেল না।

রাজবন্দীদের প্রকাশে মেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে অপোকেশনের একজিকিউটিভ অফিসারের পদে বসিয়েছিলেন, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শাসনের সভাপতির অভিভাষণে মেশবন্ধু ও রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার করে ফেলেছিলেন। অভিভাষণ শেষ হবার পূর্বে এবং বিশেষ করে পরে কক্ষ প্রতিনিধিরা বক্তব্যতে লাগল।

বিশেষ অধিবেশন মনোনয়নে মেশে বিরোধিতেন সত্যেন্দ্রিকী রাইচু। তিনি অনেক চেষ্টাও করেছিলেন কক্ষের প্রতিনিধিদের শান্ত করতে। তা কক্ষের মন তাঁকে স্পষ্ট জানায় বলে বিরোধিতেন যে, বীরেন চট্টোপাধ্যায়কে (সত্যেন্দ্রিকীর ভাই ও প্রকাশ বিপ্লবী) বিশেষ অধিবেশনে সত্যেন্দ্রিকী কথা বলে ও কথা শেষে পারেন, অনুমোদন করা কঠিন নয়,—কিন্তু বাঙালী তাঁকে ভুলবে না। আর তাই বাঙালী এঁদের অপমানও সইতে না। শাসনকক্ষের চেয়ারম্যান, ডা বসু এবং অন্য চট্টোপাধ্যায় উপস্থাপীদের বিরোধিতা করেছিল। উপস্থাপীরাই ছিল বলে ভারী।

দ্বিতীয় দিন অধিবেশন বসল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ও হল। অভিভাষণের অংশ ও তাঁদের অংশ প্রত্যাহার করে নেবার দাবি উঠেছিল। শাসনকর্তা রাজী হন নি। সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

পালাই কলকাতা ছাড়ল ও ঘরে সম্মেলন। ছন্দের ঢেকেছেই কলকীর কণ্ঠ শুনেছিল। সেই সরাজ, ভরাট, উদার ও-ই মহাকাব্যের মতো ধ্বনির হয়ে এসেছে। দুর্গত পরিবেশ ভরে এক বৈকল্পিক ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

যৌবনের রহস্য
মোহন লাইব্রেরী

কাজী তখন। কাজী উঠল। শেষ করলেন,—

সবাই যখন খুশি তোমার
আমরা তাঁর ফুল।
আমাদেরও যাঁর যাঁরে সব
তাঁরই তাঁর ফুল।
বাদলে তাঁরে আমরা ডাকলে
তবে তাঁরি পথ দিয়েছ।
আমরা ডাকলাম।
শ্রাবণের পারের বরাত খুলে তুফান
উঠল বিজন বড় বাদল,
আমরা ডাকলাম।

সম্মেলন শেষে পঞ্চম গ্রামের বাড়িতে-ছিলেন। দেখা হল কাজীর সঙ্গে। মধুমতীর ধারে একখানা খুলের চালা ঘোটর বলে আছেন কাজী। সামনের দিকে। পিছনে খুলন বাহিনী। চৈ-চৈ করে কাজী নেমে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন দুটি বাহু দিয়ে সবাইকে। কোতুহলী জনতা ঘিরে দাঁড়াল। বাড়ি থেকে কাজী নজরুল এলেন দেখা করতে।

পরে হাত ধরে খুলন করে চলীলা বলেছিল—আপনি তো যাবা। কত কথাই তো আমাদের বাড়ি আসেন না?

তবে, সেদিন ফেরার নিজের বাড়ি হয়ে যেতে কিন্তু তবে। বলেই কাজীর দিকে ফিরে তাকি। তিনি যেতে উঠেছেন গাড়ি। জনতার কেউ কেউ কাজীকে ঘিরে ধরে-ছিল। তাদের সঙ্গেই চলেছিল প্রেমেন্দ্র।

গাড়ির ভেতর দৃষ্টি ঢুকিয়ে চলীলা বলেছিল—বা।

বিপ্লবিনী। নিজুল। নিজুল। হিন্দু বিধবা।

আমি একটু, এগিয়ে বন্ধুদের জানিয়ে-ছিলাম।

১৯০০ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত ছিলাম ইংরেজের বন্দী। আমি হয়েছিল বিপ্লবীদের আশ্রিতের চেলীল ছেলে, বিপ্লবীদের প্রেসি-ডেন্সী জেলে, অনেক কটা দিন বহিরুমে, সেল থ বাস ছিলাম নিজ খুলে। পাকিস্তান।

১১০৮-এ ব্রিকালের চতুর্থ পর্ব পড়ি বহিরুমের জাদুঘরাগারে। এর আগে বিপ্লবীর চতুর্থ পর্ব বোঝাহিল। এবং গ্রন্থের মধ্যে পড়বার সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু সবটা পড়িনি। ঘরে তাই, এর পুরো তথ্য গ্রহণ করতে পারিনি।

আমি যে ভালো সাহিত্যিক নই, এটা আমার চাইতে বেশি করে এবং ভালো করে আর কেউ জানে না। সমালোচনার নামে আমি ভাঁড়ামো করি। তাই, সাহিত্যিকের মূল্যায়ন নিয়ে বিচার-বিবেচনা আমার এক্তিয়ার বহির্ভূত। শুধু বলতে পারি, সাহিত্যের লেখক আমাকে নিবিড় করে টানে। ভালো লাগে। মুগ্ধ হোকে কিনবে ছেলে পড়ে ফেলেছি। 'পরিণীতা'-নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলা নিয়েছে। 'চরিত্রহীন' পড়ে বহুবে চরিত্রহীন আর প্রাচীনিকের এক মহাকাব্যের মুখোমুখি হয়ে ভেবে চিন্তায় ডুবে গেছি। কিন্তু প্রাবের সবকটি নিয়ে ভালো-বেসেছি শ্রীকান্তকে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিছিৎ পরিচয় ছিল। মোজাফ্ফর আহমেদ তিনি আমাকে মর্যাদিত স্নেহও করতেন। সাক্ষাৎ আলোচনার সুযোগ সেদিন আমার ছিল না। কিন্তু সেই অল্প পরিসর পরিচিতির ফাঁকে শরৎ-চন্দ্রের যে উদার ও প্রসন্ন মুখ আমার চোখে নিজের ছবি দিয়ে, শ্রীকান্তের ভেতর তাঁরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি।

বরিশালের মাদুরবাজার গ্রামে দীর্ঘদিন আটক বন্দী ছিলাম। এখানেই নিবিষ্ট হয়ে চতুর্থ পর্ব বার বার পড়ে মুগ্ধ হই। বিহ্বল হই। ধারণাও নেতিয়ে হয় যাইনি।

কাজীর বিপ্লবী পর্ব দিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। পরও ও পরিচ্ছেদগুলোয় তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে। পরাধীন নিষ্ঠুর জনগণ তাঁর নাম লোকের মুখে পেয়ে গেছে। লোকের মুখে মুখের জনতার মনে মনে। পদচারণি পথিক আর মাঠের রাখির কাছেও নেতির পাইছ, তিনি বিদেশী, তিনি উদাসী, অথবা বলেছেন তুই কুল ভাসাবে।

'বিদ্রোহী' কবির জন্মদাতা একদিনে কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না বলেই ঘটেছে। কাজী তার বাঁধনে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বা স্বস্তি কামনা করে হয়তো তার তিনি বাঁধনে চলেনি। তাঁর মন তার বাদ দেয়েছে। তাঁকে বিদ্রুপিত করেছে প্রতি পদে। তবু হার তিনি মানেন নি। পরাজয় স্বীকার না করে বিশ্ব থেকে বিশ্বান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে গেছেন।

বিদ্রোহী কাজীর পরিচয়ে বাঁধিকার ও সুরকার কাজীকে আমরা পেলাম। সাহি-ত্যিক কাঁটার পরিচয়ে হয়তো তাঁরিছল তত-দূর মতো নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য বা কাজীর কাছে পেল তার ও তুলনা নেই। তবুও বিদ্রোহী কাজীকে যারা ভালো বাসত, তাদের প্রাণে যা রেখেছিল। তাদেরই একজন ছিলাম আমি।

'ব্রিকান্তের' চতুর্থ পর্ব পড়তে পড়তে বাই চোখে উঠেছিলাম। গহর কি কাজীর ছাত্র?

কাজীর লেখনীর মুখে উপেক্ষিত। তবু নতুন সাহসকের ৬.৪ উঠেছে। কালিনাগ কাজী রাজেশ্বরী। কাজীর কীর্তনে কাজলের চোখেও জল্প করে পড়ে। সবই সত্য। কিন্তু এর চাইতে বড় সত্য এই যে কাজী মুসলমান।

গহর উদার পরমহংস তাই বলেছিলেন—গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

জনের অগ্রাচারে গহর হিন্দুর আচার বিচার সংস্কার ভেঙে দিয়েছে। নতুন করে মুসলমান লেখকের মুখোশ বাসনায় নিজের পর দিন ধ্বংস করছে, যাদের ঘরে অন্ধকারের আড়ালে বিলিতি হুইস্কির একটোনা দিয়ে গেছে। তাদের ঘরে জাতিসত্ত্ব ঈমান-সাধনা হিন্দুর ঘরে গাঁজার ধোঁয়া ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। কাঁটার গোড় গেরে গহর চোখের জল ফেলেছে, গান ধরনা করেছে নিজে—এসবই সত্য। অনেক 'হিন্দুর ভালোলাগা এবং দুঃখ গহর লাভ করেছে—তাও সত্য। কিন্তু 'হিন্দুস্থান কৃষ্ণ অপমান করা গ্রাহ্য করেনি, এও প্রত্যক্ষ সত্য।

ধরণী গহরচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,—'.....তাকে কি তোমরা চেতনে ধরে রাখ না?'

উত্তর এসেছিল—না।

গহরচন্দ্রের বিস্ময় জেগেছিল হয়ে 'কেন?' কিন্তু জেগে তিন প্রশ্ন হয়ে। তাই জোরগলায় বলেছিলেন—'হিন্দুদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও কথা বলো না। অপমান মুছে একটা সিকেই হয় তা নয়।'

গহর আর কাজীর ছবি একই সঙ্গে 'বলার পড়িয়া পরাধীন ইতিহাস সঙ্গে করে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। অপমান মুছে একটা সিকেই হয় তা নয়—ইতিহাসের গ্রন্থে এই নিষ্ঠুর ও বাস্তব ইঙ্গিত আমরা খুঁজিনি। খুঁজিনি বলেই পরাধীনতার পর পরাধীনতা ঘরে যায় বার এই ইঙ্গিত আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সকল হবার সাধনায় বাণী শুনিয়েছে। আমরা অন্ধ। আমরা বধির। আমরা অজ্ঞ। খুঁজিনি।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

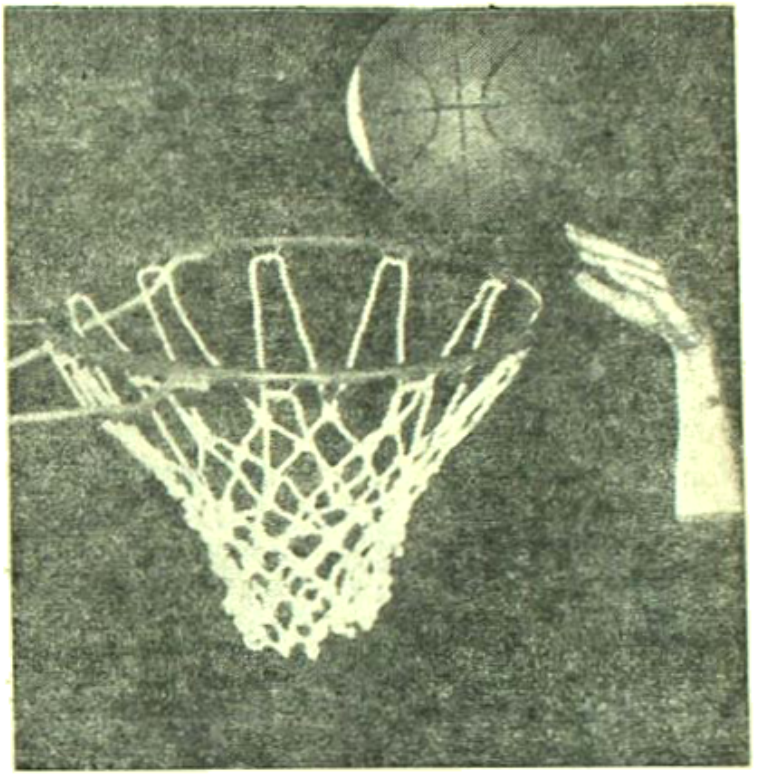

জাতীয় বাস্কেটবল

সুদূর গ্রাম নয় আবার সহরও নয়। ছোট্ট বিরাট সহরের লাগোয়া বলে আজি-ডাঙা ভরসা। এমনি স্কুলে আমি পড়তাম। স্কুল-সংলগ্ন মাঠে বেশ দূরত্বে দুপাশে দুটি পোস্ট পোঁতা ছিল। কেন তা জানতাম না। মাঝে মাঝে ও-দুটোকে যেহেতুই অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। দলে দলে ভাগ হয়ে ছুটোছুটি করতে অথবা হা-ডু-ডু খেলতে এই দুটি পোস্টের অপ্রয়োজনীয় অবস্থান এবং জায়গা জুড়ে থাকা আমরা কেউই বরদাস্ত করতে পারতাম না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তখনো আমরা প্রাথমিক শ্রেণী স্তর ডিঙোইনি।

তারপর যুবোর্ণ ও-দুটোকে খেলার উপকরণ। আর সে খেলার নাম বাস্কেটবল। কিন্তু তখনো ওদের সমান অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। সেই যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তা আর বদলায়নি। কারণ, ওরা শুধু মাঠের শোভা বৃদ্ধিই করতো। আমাদের ধারণায় অথবা জায়গা জুড়ে থাকতো। তার বেশি কিছু নয়। কোনদিন বাস্কেটবল খেলা শুরুতে হয়েছিল বলে মনেও পড়ে না।

স্কুল ছেড়ে কলেজে এসেছি। সেখানেও বিরাট খেলার মাঠে বাস্কেট দেখেছি। মাঠও ১০০ ফুট×৮৫ ফুট ছিল। কিন্তু খেলা হতে কোনদিন দেখিনি। ক্রিকেট, ফুটবল, কলেজ স্পোর্টস সবই সেই মাঠে হতো। কিন্তু বাস্কেট থাকা সত্ত্বেও খেলার কোন আয়োজন ছিল না। এমনকি উৎসাহীও কেউ ছিল বলে মনে হয় না। আসতে খেলাটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ কি স্কুল-জীবনে কি কলেজ-জীবনে কোথাও হয়নি। আমার মতো এমনিতরো ভাগ্যবানের সংখ্যা অনেক।

এতো কথা একসঙ্গে মনে পড়ে খেল সেদিন দুপাশ্বরের খেলার পড়ায় চোখ যোগাতে গিয়ে। কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ২০তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতি-যোগিতা। এসম্পর্কে দুপাশ্বর লিখেছে, জাতীয় বাস্কেটবলে বাংলা মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান দেখেছে এবং বিদেশে বিভাগে লীগের পদ্ধতি পেরিয়ে মহ-ফাইনাল পর্যায়ে খেলার অধিকার অর্জন করেছে। মহিলা ও বিদেশ বিভাগের মূলে লিগের ফুলে লিগিয়ার বিভাগে বাংলার জয়ের নিদর্শন মাত্র একটি। উত্তরপ্রদেশকে ৮৮—৮৩ পয়েন্টে পরাজিত করা ছাড়া আর কোন জয়ের রেকর্ড নেই।

কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবল প্রতি-যোগিতার আসর বসেছে অথচ সহরে কোন হৈ-চৈ বা উত্তেজনা নেই। টিকিট-ঘরে ভিড়ও নেই। কর্নফ-গ্যালারী প্রায় শূন্য। অথচ কিছুদিন আগে ইডেনে ভারত বনাম অস্ট্রে-লিয়ার ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি। অথচ মজার ব্যাপার যে, বাস্কেটবলে আমাদের জাতীয় দলে উৎকৃষ্টদের আর অনাগ্রহ ক্রিকেট ও ফুটবলে চমৎকৃষ্ট নিদর্শনাবলী। আবার কলকাতা সকল খেলার কেন্দ্র। কিন্তু বাস্কেটবলের চর্চা এখানে তেমন নেই। আসলে পূর্ব ভারতেই বাস্কেটবল সম্পর্কে এই নিরুৎসাহ। এত বড় জাতীয় প্রতিযোগিতা পূর্ব ভারত থেকে মাত্র দুজনের যোগদান করেছে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা। এ থেকেই ঔদাসীন্য বুঝতে পারা যায়। উল্লেখনীয় দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে এ-খেলার খুব কদর। সেখানে বাস্কেটবল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম অথবা দ্বিতীয় জনপ্রিয় খেলা। তামিলনাড়ুতে এক সহরে ৫২টি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট হয়। প্রতিটি খেলায় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হয়। হরিয়ানাতেও প্রতিটি স্কুলে বাস্কেটবল কোর্ট এবং খেলার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া এশিয়ার একমাত্র বাস্কেটবল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক, যার নাম 'সান্দ', তাও চেকোশ্লি-

গতমাসে এক সহরে মহীশূরের পক্ষে বাস্কেটবল খেলেছেন এবং মেল-ফিমেলের বাস্কেটবল খেলার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে।

ফলে বলেছি ২০তম জাতীয় প্রতি-যোগিতার কথা। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কথাই তাবলা পাচ্ছে বেশি। তাই এবার প্রতি-যোগিতার কথায় আসা যাক। ১৩টি রাজ্য থেকে মহিলা বাস্কেটবল দল এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ৭ই ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৪ জানুয়ারী পর্যন্ত খেলা চলে। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা এই তিন পর্যায়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত খেলা চলে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১৩টি দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। গ্রুপের লীগ প্রথায় এবং গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের নক-আউট প্রথায় খেলার ব্যবস্থা ছিল। যোগ-দানকারী ১৩টি রাজ্য হলো—পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেরালা, পাঞ্জাব, আন্ধ্র এবং উড়িষ্যা। তিনটি গ্রুপ থেকে সেমি-ফাইনালে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র। সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্র সহজেই হরিয়ানাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। কিন্তু সেমিফাইনাল খেলা আসল সেমি-ফাইনালকে হেলা করে সেখানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং মহী-শূর। প্রথম দিনের খেলায় দুপক্ষের তীব্র

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ ৪৯—৪৪ পয়েন্টে পরাজিত হয়। এই খেলায় মহীশূরের অধিনায়ক এ সি পুন্না মাদুপ্প চমৎকার পরিচয় দেন। তিনি একাই মোট মহীশূর দলকে বহন করে নিয়ে যান এবং দলের ৪৯ পয়েন্টের মধ্যে ৩৩ পয়েন্ট নিজে সংগ্রহ করেন। কিন্তু ফেডারেশন খেলোয়াড় নেয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিযোগে খেলাটি পুনরুজ্জীবিত হয়। এবার মহীশূরের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গকে পরাজিত করা খুবই সহজ হয়।

ফাইনাল। এবার মুখোমুখি পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র ও মহীশূর। এ প্রসঙ্গে বলা ভাল, মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক দুর্ধর্ষ ছিল এক সময়ে ছিলেন মহীশূরের অধিনায়ক। তাঁরই নেতৃত্বে মহীশূর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় দুবার। ১৯৬৬-তে দিল্লীপুরে ও হায়দ্রাবাদের সরকারী মোকাবিলায় পাঁয়তাল্লিশ বছরের অধিনায়ক ছিলেন দুর্ধর্ষ। সেবার ও'র খেলা পঞ্চাশের বেশী নেই। ইতিমধ্যে দুর্ধর্ষ দুবার মাত্রাভঙ্গ। ইতিমধ্যে তিনি মহীশূরের এবং হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু বিবাহসূত্রে মহীশূরের মেয়ে দুর্ধর্ষর ছিল হয়েছেন দুর্ধর্ষা মাদুপ্প। এখন তিনি মহারাষ্ট্রের বধূ। আর সেই সুবাদে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক।

ভাল খেলোয়ার হিসাবে মহীশূরের অধিনায়ক পুন্নাপ্প খেলাও এবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে তিনি ঠিক খেলোয়াড়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত এই সুনাম তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ১৯৬৮-তে তিনি জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। পুন্না মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। ও'র দিদিও এবার মহীশূরে খেলছেন।

দুর্ধর্ষা এবং পুন্না জাতীয় মহিলা বাস্কেটবলের অনেক ভরসা।

এবার আসা যাক খেলার ফলাফল। মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর ফাইনালে খেলতে নেমেছে। খেলা অবশ্যই জমে নয়। দু পক্ষই ভাল খেলেছিল। মহীশূর পরাজিত হয়। মহীশূরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতীয় চ্যাম্পিয়নের সম্মান অর্জন করে। আর তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাঞ্জাব। এই বছরের বাস্কেটবল মুখোশার খেলা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ বিভাগেও পাঞ্জাবদের ফলাফল অনুরূপ।

এবারকার জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার কতগুলি ঘটনা নজরে পড়লো, যা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

এই প্রথম একজন মহিলা রেফারী জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ খেলা পরিচালনার ভার নেন। এই মহিলা রেফারী হলেন চান্দ্রাপুরের শ্রীমতী সাদুত্তিবালা। তাঁর পরিচালনা-পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন না হলেও জাতীয় বাস্কেটবলের আসরে এই প্রথম একজন মহিলাকে রেফারির ভূমিকায় দেখা গেল। এটা ভারতীয় বাস্কেটবলের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতি। আগামী দিনে এদিক থেকে আরও এগিয়ে যাবে।

কিন্তু খেলা দলে মহিলা ছোট ছিলেন না। আমের ক্ষেত্রেও আমরা বহুখানি এগিয়ে গেছি, এ-ব্যাপারে আর ছেলেও পেছিয়ে আছি। এ-কথা অস্বীকার করতে পারলে আমরা খুশিমনে মেনে নিতে পারতাম না।

আরেকটা কথা ছুঁচিবাই বলাই ভাল. ১০টি দলে মোট ১৫৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তার ছেলেও বড়ো কথা, খেলা ভালো বলেই কোন বাঙালী ছিল না।

—প্রবীরা

ক্যাঙ্গারুর দেশ

এখন থেকে দুশো বছর আগে ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক যখন অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন, তখন পাওয়া যায় তার চৌদ্দ হাজার বছর আগেও এদেশে লোকের বসবাস ছিল। প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ইন্দোনেশিয়ার আশপাশের দ্বীপপুঞ্জ থেকে নানা দেশ থেকে লোকেরা এসেছিল। পর্তুগীজরা হয়তো অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ আবিষ্কার করেছিল। প্রচুর ডাচ্ নাবিক এসেছিল। ১৭৭০ সালে যখন ক্যাপ্টেন কুক এসেছে আসেন, এদেশের আদিবাসীরা তখন এখানে বাস করত। তারা সব ব্যাপারে ইয়োরোপের থেকে আলাদা ছিল। অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব ধরে তারা দিন কাটাত। ক্যাপ্টেন কুক হয়তো দুরবীন দিয়ে যেখেছিলেন দক্ষিণ প্রান্তের এই বিরাট ভূমিতে কিন্তু কিন্তু করে ইয়োরোপ জানতে পারলে, ইংরিজী, ভাষা, রীতিনীতি ও আইনের ফলে আদিম মুখের দেশ হয়ে পারে। সেই সময় ইংলণ্ডের জেলে কয়েদীদের সংখ্যা বেশী থাকাতে স্থানাভাবও ছিল। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের বোটানী-বে (সিডনী) তাদের উপযুক্ত স্থান বলে ধরে, ক্যাপ্টেন কুক এমনটা জানিয়ে. ১৭৮৭ জন ইংরেজের মধ্যে ৭৫৯ জন অপরাধীকে এদেশে আনান। তারাই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সভ্য বসবাসকারী। সেপ্টেম্বরাইন থেকে ৯৩৭ হয়ে ৮ মাসে তারা বোটানী-বেতে এসে পৌঁছয়। তখন অস্ট্রেলিয়ার মানুষ মনে একমাত্র চাঁদে যাওয়ার সমান ছিল। এদেশের কোনো পরিচিত ইতিহাস ছিল না, কোনো খবর ছিল না। ইংলণ্ড থেকে এদেশের তখনকার পথে, খাবার অভাবে অনেকেই মারা যায়। স্বাধীনতার জন্যে আদিবাসীদের থেকে তাড়িয়ে ইয়োরোপ নিজেদের আস্তানা করতে থাকে। আদিবাসীদের খাদ্যের শিকারক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে ইয়োরোপ নিজের ক্ষেত্র চাষের আওতা করতে থাকে। এই আদিবাসীদের হয়ে বলার কেউ ছিল না, যা কোন আইন ছিল না। ফলেই অল্পকাল মধ্যে আদিবাসীরা মারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তাদের হতভাগা বংশধরদের এখন আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই, দুশো বছর আগে নিয়ে এখনও তারা পুরনো কালের মতই আছে।

এই দুশো বছরে অস্ট্রেলিয়া আজ পৃথিবীর ধনী ও উন্নত দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির ঐশ্বর্য উপভোগ করতেও পরিশ্রম করতে হয়। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে উন্নত হয়ে আজ এরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর নানা কাজ চাহিদা মেটাচ্ছে। দিন দিন এদের উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় আমেরিকা হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। ১৯০০ সালের অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ১৯৬০ সালের অস্ট্রেলিয়া প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কোরাল, আদিবাসী, ভেড়াগাড়ী চড়া মানুষ, এসব প্রায় দুশোবছর মত হয়ে আসছে। এখন তাদের দেখতে চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। এদেশের আসল আদিবাসীরা দেশের এমন আয়গায় থাকে যেখানে কেউ যায় না। শহরের মধ্যে ফটিক জমানো ঘোড়ার গাড়ী এসে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বস্তু হয়ে ওঠে। ঘোড়ার গাড়ীর চালকদের এখন ট্যাক্সিগাড়ী হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা সাধারণত শহরে থাকে। মেলবোর্ন ও সিডনী এখানকার সবচেয়ে বড় শহর। অস্ট্রেলিয়ার এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মেলবোর্ন ও সিডনীতে থাকে। মেলবোর্নের একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম এত বড়, সোনা যায় সেটা পৃথিবীর চতুর্থ বড় মোকান, এবং ইউনাইটেড স্টেটসের পরে প্রথম। মেলবোর্নে একটা আর্ট গ্যালারী ছোট্ট বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১২ কোটি টাকা) দিয়ে তৈরী হয়েছে। সিডনীতে অপেরা হাউস তৈরী হচ্ছে, তার আলী বিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে (প্রায় ৬৫ কোটি টাকা)। কানাডার মেপল মানুষের উপাধির এগুলো দুই একটি উদাহরণ।

এদেশের এ দেশকে অন্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার হাত থেকে অনেক সুবিধা যোগাযোগ সম্পর্কে দূরত্ব কমিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার অনেকে একবার একবারও মাইল চলে যায় ভবনের জন্যে দুশোবছর লাগত। সম্প্রতি দেখা হয়েছে যে সিডনীতে বসবার সময়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

ইংলণ্ডের রানী অস্ট্রেলিয়ারও রানী। রানীর মনোনীত গভর্নর জেনারেল অস্ট্রেলিয়ার রানীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। প্রতি স্টেটে একজন করে গভর্নর থাকেন, তাঁরাও রানীর নির্বাচিত, এবং সব সময়ে না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজ।

—গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সম্পর্কে অন্যান্য বিভাগে প্রকাশিত

গোয়েন্দা কবি পরাশর • শ্রেষ্ঠেন্দুমিত্র সৃষ্টি শেল চক্রবর্তী চিত্রিত

গোয়েন্দা হিসাবে বিখ্যাত পরাশর বর্মার সব চেয়ে বড় নেশা হল রহস্য ভেদ নয়, কবিতা লেখা। নির্ঝঞ্ঝাটে কবিতা সৃষ্টির জন্যে নিজের বাড়ি ছেড়ে সাংবাদিক বন্ধু কৃত্তিবাস ভদ্রের বাসায় সেদিন ....

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের বাড়ীটি

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বহু জ্ঞানী গুণী উইলিয়াম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। এখানে এসে লণ্ডনের সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিরাট অভাব তাঁকে নিদারুণ আঘাত করে।

তিনি অনুভব করেন যে প্রাচ্যের সঙ্গে আদানের জন্য—

"Want of an organised association in Calcutta." এবং এই অন্তরায় দূর করতে হলে প্রয়োজন

"In the fluctuating, imperfect, and limited erudition in life, such enquiries and improvements could only be made by the united efforts of many, who are not easily brought, without some pressing inducement for steady impulse in a common point." তাঁর মনের বাসনা ব্যক্তিগত বন্ধু মহলে সমর্থন জানালেন।

১৭৮৪ সাল। ১৫ জানুয়ারী সন্ধ্যা লর্ড জোন্সের বাসভবনে পুনরায় সভা গ্রহণ করেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি সার রবার্ট চেম্বার্স প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট সেরেস্তাদার ব্যক্তি। এই সভাকেই নামকরণ হোল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। যিনি যিনি যেখে উঠতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটি। এর অন্যতম কর্তৃত্ব বিতরকে হয়ে তখনও বা নিজের বেড়াজালে। তিনি বললেন।

"...There should be one rule, namely to have no rules at all, because in the infancy of any society, there ought to be no restraint, no trouble, no expense, no unnecessary formality—"

তাঁর কেবল সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যা বৈঠকে মুন্সীর কোর্টের প্রাক্তন জরিপকে [illegible] প্রবন্ধ পাঠ শুনবেন এবং তার ওপর আলোচনা শুনবেন।

এশিয়াটিক রেসার্চেসের সীমার মধ্যে 'মানুষের কীর্তি' এবং প্রকৃতির দান বিষয়ে অনুসন্ধান এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। জোন্স উদ্যম সফলকাম হিলেন। মূলের অতীত ঐতিহ্যের কাহিনী তিনি উদ্ধার করে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তবুও কিন্তু তাঁর মনে মধ্যে প্রকৃত ছিল। (১)

"...whether you will enroll any member of learned natives you will here after decide, with many other questions as they happen to arise...." কারণ নিশ্চয় ছিল। এই সাধারণ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে এক সময় উঠেছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-শ্রমের নিয়ম কানুনাদি সম্পর্কে এক পত্রে লিখেছিলেন 'ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে অসুবিধাজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই করা হইবে।'

১৭৯৪ খৃঃ। সোসাইটির আয় তখন এমন। তখনও এর নিজের কোন বাড়ী ছিল না। ঐ বছরেই জোন্সের মহাপ্রয়াণ হয়। এর পরে এক সমস্যার উদ্ভব হয়। বন্ধু ছিটার সমস্যা। ইতিহাসে বহু পুস্তক, মানচিত্র, কৃষ্টাত্মিক ও অন্যান্য নিদর্শন সোসাইটি দান হিসাবে গ্রহণ করেছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন বিশেষরূপে দেখা দিল, প্রয়োজন এক খালি জমি এবং একটি বাড়ি।

১৭৯৬ খৃঃ। ১১ আগষ্ট। সাদ্ধ্য অধিবেশনে সমবেতরা গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। ঐ প্রস্তাব কার্যকর

শিবদাস চৌধুরী

করার জন্য নতুনভাবে সভা বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠিত হোল। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন—টমাস প্রাইস, স্যার জন মরে, জন চেম্বার্স, জন হোয়াইট, জন বেল, মেজর কলিনস ক্যাপ্টেন কেলসল্ট, ডঃ জিন বিগস এবং কাপ্তেন সাইমস।

গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটি কাজ শুরু করে। কিন্তু অর্থ কোথায়? সোসাইটির নিজস্ব কোন অর্থ ছিল না। তখন তখনও পর্যন্ত সদস্যদের কোন চাঁদার হার নির্ধারিত হয়নি। তাই ২১ সেপ্টেম্বরের সভাতে স্থির হয় প্রত্যেক সদস্যকে ভর্তি ফিবাবদ (২টি স্বর্ণ মোহর) এবং ত্রৈমাসিক চাঁদা (১টি স্বর্ণ মোহর) দিতে হবে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল যে এইভাবে সংগৃহীত অর্থে দৈনিক খরচ চালিয়ে বাড়ী তৈরির টাকা বাকে খুবই অল্প। তাই সেই সভাতে একটি 'গৃহ-নির্মাণ তহবিল' গঠন করে সকলকে মুক্ত হস্তে দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হোল এবং তদানীন্তন সরকারকে গৃহ-নির্মাণের জন্য এক খালি জমি সুবিধাজনক স্থানে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সোসাইটির গৃহে নানান অসুবিধা দেখা দেয়।

১৭৯৮ সালের ২৯ মার্চের সভাসদের এক সভাতে স্থির হয় যে, গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়মের জন্যে একটি বাড়ি ভাড়া করা হবে। কিন্তু সেই পর্যন্ত সেই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

১৮০৩ সালের ১৩ মে'র সভাতে সেক্রেটারী সভাদের জানালেন যে সরকার চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে মাইচিং হাউসের যে জমি আছে তা সোসাইটির ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। কেবল ঐ জমির সামান্য একটু অংশে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম থাকবে। কারণ সেই জমিতে একটি পুলিশ থানা ও একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বসান হবে। সোসাইটি ধন্যবাদের সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সভায় কোলব্রুকের প্রস্তাব-ক্রমে সোসাইটির কার্যোপযোগী গৃহ-নির্মাণের জন্য একটি নক্সা রচনা করবার জন্য চারটি বেসরকারী একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ছিলেন—স্যার জন শোরবার্ন, স্যার আই ব্রোকেস, ক্যাপ্টেন প্রেস্টন, মিঃ হেস এবং কোলব্রুক। প্রেস্টন সাহেব নক্সা অঙ্কনের ভার নেছিলেন। সেই নক্সা এক বার্ষিক সভাতে সামান্য রদ-বদল করে গৃহীত হয় এবং গৃহ-নির্মাণ কমিটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমে স্থির হয়েছিল একতলা বাড়ি নির্মিত হবে। পরে (১৮০৫, ৬ ডিসেম্বর) আনুমানিক ২৪০০০ টাকাতে দ্বিতল গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহ নির্মাণকালে ছিলেন ফরাসী শৈলীর খাঁ আজম পিটার্স। ১৮০৮ সালে গৃহ-নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। নির্মাণের জন্য সোসাইটির অনেক টাকা ধরচ হয়েছিল। মোট খরচ হয় ২৮,০০৬ টাকা। সোসাইটির কর্তৃ-পক্ষ দেখে পর্যন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

১৮০৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী গৃহ প্রবেশ হয়। সোসাইটির নিজস্ব প্রয়োজনে নির্মিত হলেও এর দ্বার মুক্ত ছিল অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য। আজও তাই আছে। বহু ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই সৌধে। কত মনীষীর আনাগোনা ছিল এখানে।

আধুনিক যুগের নিকটে থাকা সত্ত্বেও

(১) ৪৩ বছর পরে (১৮২১ খৃঃ) ঐ জোন্সের উইলসনের প্রস্তাবক্রমে এবং ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বসম্মতি সমাজ-মুকুল ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দত্ত, রসময় দত্ত এবং রসময়ের মেসো নিমাইচরণ মল্লিকের আসন নির্বাচিত

হয়েছিল তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ। সমবেতের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের রীতিকে ভাঙাচোরা করা হয়—

"... So unjust, unpopular and unpolitic an act, which was not far undone by the destruction of the Alexandrine Library itself."

সার এডওয়ার্ড থম্প ছিলেন ব্রিটিশ মেসার্সটি সভাপতি। এই বার্তাটিতেই আমন্ত্রিত পুরো নিয়ে ভারতবাসীদের বিদ্রূপ সভাপতিত্বে। ব্রিটিশ পর বার্তি ভারতীয় লিপির বামে নিয়ে বিতর্ক ওঠে।

ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ লিখিত পুনর্বার সংগ্রহ ও গ্রন্থাবেক্ষণ বিষয়ে এখানে সর্বপ্রথম আলোচনা হয়। সমবেতকে সোসাইটির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্তাবহ সংগ্রহে প্রচলিত পুনর্বার সমীক্ষার প্রস্তাবও এখান থেকেই প্রথম করা হয়।

১৮০৪ সালের ৩ আগস্টের ভারতীয় কমার্স ইন্ডিয়ান ও ইস্ট ইন্ডিয়ান এক কার্যসূচীর প্রস্তাব করে—

"The Society immediately adopt some of effectual steps to procure a catalogue of all the most useful Indian works now in existence, with an abstract of their contents."

১৮০৭ সালের ১ জুলাই সোসাইটির তৃতীয়বার্ষিক সভাপতি কোলব্রুক এক পত্রে সরকারের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই প্রচারে কার্যকরী করার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার কৃতজ্ঞতা জানাতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরস রাজী হলেন না।

ভারতীয় বাসাবদ্ধে যে সমস্ত নিয়মনীতি রচিত আছে, এর অনেকগুলিই সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত। সোসাইটি (পুরানো বার্তাবিদ্) এদেশে প্রথম মিউজিয়ম স্থাপনা করে কলকাতার একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত করে এবং দেশের অতুলনা সম্পদ রক্ষা করে।

"There was at that time in this city no collection whatever available for the students. Individuals who were interested in particular branches of enquiry, had provided themselves, at great cost, with such works as were required for their own immediate researches. But these were, of course, not accessible to the public, or to other students."

সোসাইটি এই মিউজিয়ম খোলার কথা চিন্তা করে ১৭৯৮ খৃঃ। ১৮১৪ খৃঃ সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু নানাই অর্থাভাব দেখা দিত। এবং তত্ত্বাবধানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য।

এই বার্তির ভার থেকে অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য সোসাইটি সরকারকে কলকাতার একটি পাবলিক মিউজিয়ম খোলবার প্রস্তাব দেয়। ১৮০৮ খৃঃ সোসাইটির অর্থনৈতিক একটি অঙ্গ করে নিতে হবে। দেশ পর্যন্ত সরকার নাই সত্ত উঁচা ঘটনিক অনুদান ১৮৩৯তে সাধারণভাবে বন্ধ করে দেন। নতুন উদ্যমে মিউজিয়ম গড়ে উঠতে থাকে। এ সময়ে এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁহারই নিজ বৈজ্ঞানিক মহলে তিনি প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছিলেন। ডাক্তারীন তার সঙ্গে সব সময়ই সহযোগিতা করেছেন।

বিজ্ঞ নিয়ের মাত্র অর্থাভাব অভাব দূর হয়ে যায়। পরিচালনার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অনুদানের অভিযোগ আসছিল। কিন্তু সোসাইটি তখন নিরুপায়। প্রয়োজন মতো সবটা নিয়োগ সম্ভব হোল না এবং চলতি আয়েরও ছিল অনেক অনিশ্চয়তা। দেশ পর্যন্ত স্থির হয় সরকার মিউজিয়ম পরিচালনা করলে সর্তাধীনে এর সমস্ত সেই মিউজিয়মে ন্যস্ত হবে। প্রস্তাব ১৮৩৭ খৃঃ গ্রহীত হয়। কিন্তু আসে ছিল এর অন্যতম প্রতিবন্ধক। হেনে অনাস্থা নিশাহী বিদ্রোহ; সরকারের অর্থ ও চিন্তা সেই অশান্তি সময়ে নিয়োজিত।

বহু সেবাপ্রচেষ্টার পরে ১৮৬২ খৃঃ সরকার ঘোষণা করেন কলকাতায় মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করার সময় উপস্থিত হয়েছে। ১৮৬১ খৃঃ সোসাইটি সর্তাধীনে নিয়োগ সাগ্রহ এই মিউজিয়মে অর্পণ করে। সরকারী মিউজিয়মের গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে সোসাইটির এই পরেন বার্তাবিদে নিষ্ট-ভিত্তিতে কাজ-আর আরম্ভ হয়। মিউজিয়মের বার্তাব ঘোষণা সদস্যের মধ্যে চারজন সোসাইটি কর্তৃক আইনানুযায়ী মনোনীত হন। প্রথম চারজন সদস্য ছিলেন—ডঃ পার্সিভাল, ডঃ ফেরার, মিঃ আর্চ-ডিকন এবং এইচ এফ প্রাসকোর্ট।

ভারতীয় ভাষার সমীক্ষায় মূলেও সোসাইটির বিরাট ভূমিকা আছে। এই সমীক্ষা পরিচালনা কর্মসূচিগুলি কী ছিল এ বিষয়ে।' বহু খণ্ডে প্রকাশিত লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পথের উদ্যোগের দেখা যাবে কি পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এর সঙ্গে জড়িত আছে।

দেশে কথার সুযোগও বে-সরকারীভাবে এখানে আলোচনা হয়। যেমন ছিলেন ভাষাবিদ্ হেনে কলার প্রথমদিকে সোসাইটির বুলেটিনে 'এশিয়াটিক রিসার্চে' প্রকাশিত হয়। সার আলেন স্টাইনের মধ্য এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের মূলেও ছিল সোসাইটি। মায়া ভারতের জাতি ও উপজাতি তালিকা প্রণয়নে সরকার সোসাইটির মুখাপেক্ষী হয়েই উদ্যোগী হয়।

শত শতাব্দীর প্রাকৃতিক নিদর্শ ধারণার পুনরুদ্ধার গঠন বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে ঘোষ উইলিয়াম গ্রহণের অনুদান যে গভীর আগ্রহ তুলে তার তত্ত্বাবধান করে সোসাইটি। এই সমস্ত ব্যাপারে নিশ্চয়ই ঐ পত্রের বার্তাবিদ ঐতিহাসিক হল বার্তাবিদেই গ্রহীত

কোলব্রুক, উইলসন, হিস্লপ, কোল ও ম্যাকেঞ্জি, ইম্পেরিয়াল বিদ্যালয়ের, ডিরাক্টর, অক্সফোর্ড স্টাইন, ব্যাকম্যান, মহেন্দ্রলাল মিত্র, রাধাকান্ত শিরোমণি, রাজেন্দ্রলাল দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার বসু, যোগেশচন্দ্র বাগল, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে পুরনো বাড়িটির ঘরে। চল্লিশজনের বসবার মতো সাজানো বাদী ঘরটি রয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক সহযোগিতায় ছিলেন্দ্রলাল রায়ী অনুষ্ঠানে পরিচালনার কথা ভাবতে হলে এই বার্তাবিদের কথা ভুললে চলবে না। রায়ী অনুষ্ঠানে অনেকের বিরাট নিজস্ব বর্তাটি সোসাইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এটি সমৃদ্ধ করবার এলাকা থেকে বহু সহযোগের সৌজন্যে সংগৃহীত হয়েছিল। ভারতে ভিক্টোরী-রাজের জন্মের জোয়া ছি অবোধ এই বার্তির এক কোণে বাস করছেন। তাঁর আরক দৃষ্টি পুরাতন বার্তির ভিতরে উঁকিবার সময়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি।

অনুরূপ পরামর্শের দেবও একদিন এখানে এসেছিলেন। তাঁর উদ্যোগ অনুরূপ কলকাতায় (আমেরিকার সংস্করণ) আছে। স্বাধীন হিন্দুস্থানের প্রথমই-প্রাণও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এখানে এসেছিলেন। আশপাশ কয়ে অনেকেরা বার্তি এই প্রতিষ্ঠানে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

দেশের যে বাতাবরণে একদিন গ্রন্থ ভূমিকম্পের সকল পরিবারের যখন অবে-ছিলেন এবং সোসাইটির নিজস্ব জমিতে যা ১৮০৮ খৃঃ ঘোষণা করা হয়েছিল তাই কলকাতার নিজস্বতার ইস্টিক উদ্যোগের বহু মূল বিশিষ্ট এই বার্তাটির রূপ গ্রহণ করে।

সম্প্রসারিত কার্যক্রমের ও বর্তমান শর্তিত সংগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন দেখা দিল নতুন ভবনের। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। ১৯০২ সাল থেকে এই বিষয়ে সোসাইটি উদ্যোগী হয়। বহু জল্পনা কল্পনা হতে থাকে। আলোচনাও প্রচুর হল। স্থির হয় যে বার্তাটি আসাম দুমি হবে এবং কলকাতায় সমস্ত সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের এখানে আসর বিষয়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৯ সালের ৭ ডিসেম্বর বার্তিটির ভিত্তি স্থাপন করেন তদানীন্তন ভেপুটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর। এই আসনে সরকারকে উদ্যোগী করতে সংবাদপত্রের ভূমিকাও নগণ্য নয়।

কলকাতার বিশিষ্ট আর্কিটেক্ট ব্যানার্জি, ব্লন্দলাল আসর রায়ের নতুন বার্তিটির নকশা করেন ও নির্মাণ তত্ত্বাবধান করেন। পুরো স্থির হয়েছিল বার্তিটি তৈরী হতে বিশিষ্ট হবে। কিন্তু অর্থের অনটনের জন্য চলতেই পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। এর ব্যয় পড়েছে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা।

১৯৬৩ খৃঃ ২২ ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রীপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নতুন

বহির্বঙ্গে বাঙলা চর্চার সংকট

কুলদাবিহারী চৌধুরী

আজ ঘরে-বাইরে—সর্বত্র বাঙালীরা বাঙালীয়ানার সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের চূড়ান্তরূপ দেখতে পাচ্ছি বাংলা ভাষার প্রকল্পনার ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষার প্রসারণ ও বাজার দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে অন্যান্য প্রদেশে বাংলা চর্চার যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, এখন তা প্রায় সংকুচিত হয়ে এসেছে বাঙালীর হিন্দীয়ানায়। অবশ্য ভাষার ক্ষেত্রে সে-যুগে বাংলা চর্চার জন্য বাঙালীরা আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান আদায়ের বাংলা ইস্কুলের। সে-সময় ইস্কুলে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষার শিক্ষার সুযোগ পেত। তাদের জন্য ছাত্র হতো বাংলা ভাষার হাতেখড়ি নিয়ে। পরে অবশ্য উচ্চতর শিক্ষার জন্য এদের হিন্দী কিম্বা ইংরেজি ইস্কুলে চলে যেতে হত। প্রবাসে এবং উচ্চতরদেশের বাঙালী পরিচালিত ইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা বাধ্যতামূলক পড়ান হত। এর ফলে অন্তত বাংলা সাহিত্যের রস গ্রহণের ক্ষমতাটি তাদের হাতে এসে যেত। ছোট হলেই তাদের ঘরে উঁচুতো বাংলা বই পড়ার অভ্যাস। বিয়ে-বাড়িতে বিদায় দান করতে হলে সঙ্গে উপহার নিয়ে আসতো বাংলা বই—স্থানীয় রেল স্টেশনের বুকস্টলের দোকান কিম্বা খাস কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা হত এসময়ে বাংলা বই।

জীবিকার সন্ধানে এসে বহু বাঙালী আজ স্থায়ীভাবে বসতি করেছেন বহির্বঙ্গে। অন্যান্যদের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন সমস্যার জন্যও বাঙালীরা বাংলাদেশের বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁরা বাংলাদেশের ভাষা ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, বাংলাদেশের মাটির সঙ্গেও তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে-বাঙালী ১৯৪১-এ চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন জব্বলপুরে, কানপুরে এসেছিলেন, বাঁচিতে, সিউড়িতে কিম্বা বাংলার বাইরে অন্যত্র যেসব স্থানের কলে ছিন্নমূল হয়ে যায় হয়ে তাকে বাংলার বাইরেই থাকতে হচ্ছে। বহির্বঙ্গের সে-ছেলের মাটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তার গড়ে উঠছে সম্পর্ক, মাটির টান। তার ছেলেমেয়েদের জন্ম সে-ছেলেরই মাটিতে। তাদের উচ্চতরদেশের সে-ছেলের ভাষাভাষার স্বাদ, সে-ছেলের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়ের ভাষা সম্বন্ধে। অনেকক্ষেত্রে সঙ্গে তাদের একটা সহজাত অপরিচয়ের দূরত্বের ব্যবধান দিন দিন গড়ে উঠছে। এভাবে বাংলার বাইরে যে স্থায়ী নতুন বাঙালী-সমাজ গড়ে উঠছে, তাদের ভবিষ্যতে বাংলা-ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের কাছে মৃদু অপরিচয়ের হয়েই উঠবে না, তাদের মন দিন্দুরিত অতীতে ভবিষ্যতও যাবে।

বহির্বঙ্গে বাঙালীদের ছেলে-মেয়েদের এসব অসুবিধা দূর করার যে সুযোগটুকু আছে, ভবিষ্যতে তা হয়ত পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বহির্বঙ্গের বাঙালী অভিভাবকরা যদি বাংলা চর্চার দিকে মনোযোগী না হন, ছাত্রছাত্রীরা বাংলা বই কে পড়বে?

অন্যান্যদেশের ও উচ্চতরদেশের বহু শহরে বাঙালী পরিবারে দেখেছি, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেউ বাংলাতে কথা বলে না। বাঙালীর বাড়িতে বাংলাভাষা যেন হারিয়েছে। হিন্দী সেখানে সমাদৃত। হিন্দীই যেন তাদের মাতৃভাষা, বাড়িতে তারা আলাপ হিন্দীতেই করা বলে। উচ্চতরদেশের অন্য মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের জবাবও হিন্দীতে। আবার এর ব্যতিক্রমও দেখেছি। অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়েদের মিশনারী কিম্বা হিন্দী ইস্কুলে পড়ানোর জন্য বাড়িতে বাঙালীয়ানার পরিবেশটি সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। বাড়িতে বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' কিম্বা 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'অমৃত', 'খরশী', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা রেখেছেন। জব্বলপুরে কিম্বা পুরুলিয়ার ঝাঁড়-খন্ডের উপযোগী ভালো ভালো বই কিনে এনে তুলে দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের হাতে। প্রথমে ছড়া-কবিতা বই দিয়ে, পরে উপন্যাস-কিশোর ও রেখেছেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি সেরা শিশু-সাহিত্যিকদের গল্পের বই দিয়ে এদের গল্প পড়ার নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন। এই গল্প পড়ার নেশাই বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটিয়ে। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে গড়ে উঠেছে সখ্যতা, ভালোবাসা। বহির্বঙ্গে থাকলেও, হিন্দীয়ানার স্রোত এঁদের বাঙালীয়ানাকে নির্মাজ্জিত করতে সমর্থ হয়নি। পরিবেশ অনুকূল না হলেও ছেলে-মেয়েদের এঁরা বাংলা চর্চার থেকে বিচ্যুত করে রাখেননি। এখানে এঁরা যথেষ্টরূপে বাঙালী।

বাংলার বাইরে বাঙালী পরিচালিত ইস্কুলগুলি থেকে বাংলাভাষা বাঙালীদের সহযোগিতার অভাবে আস্তে আস্তে বিতাড়িত হচ্ছে। জব্বলপুরে বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য নয়, অন্তত পক্ষে ৪৫।৫০ হাজারের কম নয় আর প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী বাঙালীর সংখ্যাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অথচ জব্বলপুরে বাঙালী পরিচালিত ইস্কুলগুলিতে বাংলা চর্চার অবস্থা শোচনীয়। জব্বলপুরে বাঙালীর সবচেয়ে প্রাচীন ইস্কুল মোক্ষদা দেবী বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়। পূর্বে সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা অবশ্য ছিল। এখন প্রাইমারীতেও হিন্দী প্রবর্তনের কথা চলছে। অথচ ইস্কুলের নাম মোক্ষদা দেবী বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়। বাংলাভাষা সেখানে মোক্ষদা পেয়েও, সান্ত্বনা এই যে, এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 'বাঙালী' কথাটি অন্তত অতীতের গবেষণার বস্তু হয়ে থাকবে ভাবীকালের জব্বলপুরের বাঙালী-দের কাছে। বিহারের বাঙালীদের ছেলে-মেয়েদের বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পাই বাঙালীদের বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন। এলাহাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য 'বাংলা সাহিত্যরত্ন' 'বাংলা প্রবেশিকা' ও 'বাংলা প্রাথমিক পরীক্ষা' প্রভৃতি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন অধ্যাপক শ্রীকিঙ্করদত্ত দিয়ে। অধ্যাপক কিঙ্করদত্ত সিংহের এই প্রচেষ্টাকেও ব্যতিক্রম বলা যায়।

বহির্বঙ্গে এমন বাঙালীর সন্ধানও পেয়েছি, তাঁদের পদবী না জানলে বুঝতেই পারা যাবে না তাঁরা বাঙালীবংশজাত। পূর্ববঙ্গবাসীদের বাংলার বাইরে বসবাস করার ফলে মৃদু অধঃপতন নয়, লোপাটে-আসনে ও এঁরা সম্পূর্ণরূপে বাঙালীয়ানা-বিবর্জিত।

বাংলার বাইরের প্রতিষ্ঠিত এক বাঙালী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কলকাতার কন্যা বাঙালী মেয়ের। হিন্দীর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। বিয়ের পর তারা নিয়ে যাবেই যেখা বর এই নবকন্যাটির ঘরে। মেয়েটি বাপের বাড়ি থেকে মনের আবেগে চিঠি লেখে বাংলায় জব্বলপুরের বরকে যার কাছে বাংলা হরফ ভীরু। পত্রের মর্মোদ্ধার করতে তার স্বামীর জবাব লিখতে তাকে ছুটে যেতে হয় বাংলার পারদর্শন কোন বন্ধুর কাছে। এ হলো বাংলার বাইরে বাঙালীর হাল আমলের বাংলা চর্চার নমুনা।

আর একটি ঘটনা জানি, মেয়েটির হাতেখড়ি হয়েছিল বাংলাভাষায়। বাংলা ইস্কুলে পড়তো মেয়েদের সঙ্গে। পরে পরে-ঘরের ছেলে হয়ে ওঠার জন্য তাকে মেয়েদের বাংলা ইস্কুল ছেড়ে হিন্দী ইস্কুলে ভর্তি হতে হয়। ফলে বাংলা বর্ণমালা লেখার অভ্যেস তাকে ভুলতে হয়। হিন্দী হয়ে উঠলো তার প্রধান অবলম্বন। চাকুরী জীবনে বদলী হয়ে তাকে আসতে হয় বাংলাদেশের পাশাপাশি। সেখান থেকে তার জব্বলপুরের আত্মীয়কে হিন্দীতে চিঠি লিখে তার কুশল জানায়। যে আত্মীয়কে চিঠি লেখা হলো, সে-বাড়িতে কিন্তু বাংলা ভাষারই সমাদর। বাড়িতে সেই বাংলার মাতৃভাষা হিন্দীতে পরস্পর কথা বলেও না। আত্মীয়া চিন্তিত হলেন, একে নিয়ে কী করে বাংলা লেখানো যায়। তিনি চিঠির উত্তর লিখলেন বাংলায়। জব্বলপুর, 'তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি, তবে বাংলায় লিখলে আরও বেশী খুশী হতাম। একটু একটু বাংলা লিখতে চেষ্টা করলে, তোমার বাংলা হরফ লেখার অভ্যাস হতে বেশী সময় লাগবে না। তাছাড়া তুমি বাঙালীর মেয়ে, এখন বাংলাদেশে আছো, যদি বাংলাদেশের ছেলে বিয়ে করো, সে যদি তোমার হিন্দী বুঝবে না, তোমার হিন্দী চিঠির জবাব দিতে পারবে না।' লেখার কথাটিতে মেয়ের মন হলো। তারপরের চিঠিগুলো বাংলাতে আসতে লাগল। অভ্যাসটার বাংলাভাষার প্রতি যত্নবান প্রয়োজনীয়। আরও হিন্দী শিখব, ইংরেজি শিখব, দরকার হলে আরো কতটি ভাষা শিখব, তা বলে মাতৃভাষা বাংলাকেও ভুলতে চলব?

বেতার শ্রুতি

আর একটি বিশেষ প্রয়োজনের পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রাম। পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের জন্য এখন প্রত্যেক কেন্দ্র থেকেই একটি করে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে।

ভারতের অনুন্নত অর্থনীতি, ব্যাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য আর অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন বাস করে ৬ লক্ষ গ্রামে. এই কথাটা চিন্তা করলে সমস্যার পরিমাণ ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার ভারতের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির প্রথম স্থায়ী বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন করে তৎকালে গভর্নর-জেনারেল লর্ড রীডিং বলেছিলেন :

"India offers special opportunities for the development of broadcasting. Its distances and wide spaces alone make it a promising field. In India's remote villages there are many who, after the day's work is done, find time hang heavily enough upon their hands."

লর্ড রীডিংএর মতন এই কথাগুলি বলেছিলেন, তারপর এখন বেতার-সংযোগের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বেতার সম্প্রসারণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রেডিও আর এখন কেবল অবসর সময়ে সাময়িকের ক্লান্তি অপনোদনের জিনিস নয়, শিক্ষার গুরুত্ব যেন শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাপূর্ণ এক বস্তু। এবং যেহেতু পল্লী অঞ্চলেই অশিক্ষা, অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের অন্ধকার বেশি, এবং তার সমস্ত দিক দিয়ে পল্লীই দেশের প্রাণকেন্দ্র, তাই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার একান্ত প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে বলা হয় ফুরাল ব্রডকাস্ট।

ভারতে ফুরাল ব্রডকাস্ট প্রথম শুরু হয় মেসোয়ারে, ১৯৩৫ সালে। মার্কোনি কোম্পানি পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বেতার সম্প্রসারণকার্য চালাবার জন্য উচ্চ-পাওয়ার সম্পন্ন ট্রান্সমিটার (এখন শর্ট-ওয়েভে) সরবরাহ করে একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ভিত্তিতে ১৫টি রেডিও সেট স্থাপন করা হয়েছিল। মার্কোনি কোম্পানির কর্মচারী হার্ডিং এসে এক হাজার রেডিও সেট উৎপাদন করেছিলেন যার লাউডস্পীকার খুব জোরাল এবং গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ি বসেই রেডিও অনুষ্ঠান শুনতে পান।

পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের জন্য এলাহাবাদ থেকেও একটি অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদের আগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে যে বেতারকেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন তাকে পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের জন্য প্রচেষ্ট এক ঘণ্টা করে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। এই কেন্দ্রটির শক্তি ছিল মাত্র ১০০ ওয়াট এবং কেবল ট্রান্সমিটারের ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছাড়া শোনা যেত না। কিন্তু তাহলেও শিক্ষিত মহলে পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা যে অনুভূত হতে শুরু করেছিল তা এ থেকে বোঝা যায়।

১৯৩৩ সালেই পাঞ্জাব সরকার বিজ্ঞী কেন্দ্র থেকে পল্লী অনুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন (অনুষ্ঠান প্রচার অবশ্য শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী), এবং বিজ্ঞীর আশপাশে পাঞ্জাব প্রদেশের আঞ্চলিক এডিয়ারদের গ্রামগুলিতে রেডিও সেট বসিয়েছিলেন। এই সেটগুলি সব বিজ্ঞীর ১৮ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে বাংলা সরকারও এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন এবং মেদিনীপুরে অঞ্চলে ১০টি গ্রামে রেডিও সেট বসালেন। কিন্তু ব্যবহারে সেটগুলি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সে জন্য সেগুলি এক জায়গায় রেখে দেবার জন্য ৮ মাস পরে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হল। পরে সেগুলি মেদিনীপুরের জায়গায় সব গ্রামে বসানো হয়েছিল, যাতে আরও ভালোভাবে দেখাশোনা করা যায়। আরও পরে সেটগুলির স্থানে কিছু পরিবর্তন করা হল, যাতে তারা আরও কয়েকটি গ্রাম অনুষ্ঠান শুনতে পায়। এর পর ১৯৩৮ সালে মার্চ মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে কেন্দ্র খুলল এবং বিজ্ঞীর চারপাশের গ্রামগুলিতে যে সব সেট বসানো হয়েছিল সেগুলি নিয়ে গিয়ে সাহারানপুরের চারপাশের গ্রামগুলিতে বসানো হল। বিজ্ঞী কেন্দ্র থেকে সমস্ত বিজ্ঞী প্রদেশের জন্য পল্লী অনুষ্ঠানের [illegible]

বোম্বাই সরকার তাঁদের দুটি জেলায় ১৬টি সেট স্থাপন করলেন—থানা জেলায় ৭টি আর কোলাবা জেলায় ৯টি। মাদ্রাজ কেন্দ্র থেকে পল্লী অঞ্চলের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হল ১৯৩৮ সালে, এবং মাদ্রাজ সরকার ১৬টি জেলার ৬৫টি গ্রামে রেডিওসেট সেট স্থাপন করলেন। মাদ্রাজ কেন্দ্রে পল্লী অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল ১৯৩১ সালে।

মোটামুটি বিভিন্ন কেন্দ্রে পল্লী অনুষ্ঠান প্রচার নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল তা থেকে শিক্ষকও সরকার কিছু কিছু পেয়েছেন। প্রথমেই দেখা গেল, গ্রামের একটি জায়গায় রেডিও সেট থাকলে আর তার জোরাল লাউডস্পীকারের সাহায্যে গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়িতে বসেই বেতার অনুষ্ঠান শুনলেন—এ হয় না। যদি তাঁদের শুনতে হয় তাহলে তাঁদের ঐ যেখানে আসতে হবে। তাই ইণ্ডিয়ান রেডিও অনেক ভেবেচিন্তে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। গ্রামবাসীরা একটি তাঁদের বাড়ি থেকে অনুষ্ঠান শোনেন না : হয় তাঁরা লাউডস্পীকারের কাছে এসে শোনেন, নয়তো শোনেনই না।

আকাশ থেকে ঝরছে বলে শোনা আর লাউডস্পীকারে দূর থেকে শোনা এক কথা নয়—মনের ভাবে পার্থক্য আসে অনেক।

পল্লী অঞ্চলের প্রোগ্রামের উদ্বোধন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ১৯৩৫ সালে মেসোয়ারে। মেসোয়ার কেন্দ্রটি তখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অধীনে ছিল না। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাত্র তিনটি কেন্দ্র ছিল : কলকাতা, বোম্বাই আর দিল্লী।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও ১৯৩৭ সালে মেসোয়ার কেন্দ্রটি নিয়ে নিলেন এবং লাহোরে একটি কেন্দ্র খুললেন। লাহোর কেন্দ্রটি চালু হল ১৯৩৮ সালে, এবং ঐ বছরেই মাদ্রাজ কেন্দ্রটি অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক গৃহীত হল। ১৯৩১ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আরও দুটি কেন্দ্র যোগ হল : তিরুচিরাপল্লী ও চাঁদা। মোট সংখ্যা হল ৯। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আর কোনো কেন্দ্র যোগ হয়নি। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে অবশ্য ৫টি বেতারকেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমান আলোচনা থেকে সেগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

এলাহাবাদের আগ্রিকালচারাল ইনস্টি-

একমাত্রই পল্লীকেন্দ্রিক এবং তার পক্ষে মুম্বাইয়ের অনুষ্ঠান শোনার সেরকম সুযোগই সম্ভব ছিল না।

অল ইন্ডিয়া রেডিওর অন্য কেন্দ্রসংখ্যা, ট্রান্সমিটারগুলির শক্তিবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ শক্তি, রেডিও সেটের অত্যধিক দাম, সেসময় অনুবিধা, বেতারে অনুষ্ঠানের অভাবজনিত, অধিকাংশ স্থানে বিদ্যুতের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে পল্লী অঞ্চলের জন্য প্রচারিত বিশেষ অনুষ্ঠান শোনার বিশেষ সুযোগ অর্জন করতে পারে নি। তাছাড়া পল্লীবাসীদের কাছে তাদের নিজস্ব অঞ্চলের জন্য-উপযোগী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়নি। সেটাও তখন সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওর মাত্র ৬টি কেন্দ্র ছিল। দেশ বিভাগের পর ভারতের ভাগে পড়ল তার মাত্র ৫টি কেন্দ্র। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল তখন একটি কেন্দ্রও ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটো ছোটো 'লাইসেন্স' কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন, কারণ তখন সরাসরি বড়ো বড়ো কেন্দ্র স্থাপনের সময় বা সম্পত্তি কোনোটাই তাঁদের ছিল না। ১৯৫০ সালের মধ্যে কেন্দ্র সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ২১ হল।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে (১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ) আরও ৫টি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হল এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসিয়ে আলের অনেক কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি করা হল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কেন্দ্র সংখ্যা দাঁড়াল ২৬। এবং তা সারা দেশের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশে অঞ্চলের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হল।

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ) পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বর্তমান কেন্দ্রগুলিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসিয়ে যত ব্যাপক অঞ্চলে সম্ভব, সমস্ত ভারতে অনুষ্ঠান প্রচার করা। তবু দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার শেষে কুপাল আর রাঁচীতে দুটি নতুন কেন্দ্র খোলা হল।

তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য ছিল, অবশিষ্টগুলি নতুন ট্রান্সমিটার বসিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান কেন্দ্রের অনুষ্ঠান 'রিলে' করে বিভিন্ন-অঞ্চল সার্ভিস সম্প্রসারিত করা।

নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপন আর পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে কমিউনিটি সেটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুসংগঠিতভাবে অনুষ্ঠান শোনার রাষ্ট্রীয়ভিত্তিক সঠিক কোনো পরিকল্পনা ছিল না। প্রোগ্রামের মানের মধ্যেও তারতম্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে [illegible] শোনার কোনো ব্যবস্থাও না। ফলে ফল কেই পরিকল্পনা হল, সেই ব্যবস্থাও। পল্লী অঞ্চলের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে পরামর্শ দেবার জন্য বেতার কেন্দ্রগুলিতে একটি করে উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হল। অনুষ্ঠান বলতে সাধারণতঃ কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা, কথিকা, কথাবার্তা, বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রধানতঃ গৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ে নাটক, হাসিঠাট্টা ও লোকসঙ্গীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠান প্রচুর সমালোচনা লাভ করেছে,—সে তার স্বাভাবিক, প্রাণহীন, গ্রাম্য ভাষণ, একঘেয়ে সাধারণভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য। শহরাঞ্চলের শ্রোতারাও অনেকে এই স্বাভাবিক প্রধানতঃ জন্য অনুষ্ঠানটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবু এই অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা হওয়া উচিত ছিল তখনি হতে পারে নি।

১৯৫৯ সালে ভারত সরকার স্থির করলেন তাঁদের 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানে রেডিওকে কাজে লাগাবেন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও সারাটি কেন্দ্রে 'রেডিও ফার্ম ফোরাম' গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৫৯ সালের ১১শে সেপ্টেম্বর তারিখে রেডিও ফার্ম ফোরামের যথারীতি উদ্বোধন হল। এগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল, প্রোগ্রামে সপ্তাহে একদিন এইসব ফোরাম মিলিত হবেন এবং রেডিওর একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্থানীয় এক বেতার অঞ্চলে রেডিওর প্রচারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় মিলনসূত্রটি ব্যবস্থা করে দেবেন রেডিওর ঐ কর্মকর্তা।

কিন্তু সোড়ায় উৎসাহ-উদ্দীপনার পর ফোরামগুলির কাজ বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ক্ষেত্রে ফোরামই উঠে গেল। তার অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ ফোরামগুলির গঠনে সুপরিকল্পনা ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, পরিকল্পনাটি যেরকম বলা ছিল, তা কার্যকর করার জন্য রেডিওর যোগ্য কর্মী ও অনেকগুলি ছিল না। তৃতীয় কারণ, অল ইন্ডিয়া রেডিও আর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কোনো সমন্বয় সাধন ছিল না। চতুর্থ কারণ, পরিকল্পনাটির সাফল্য নির্ভরশীল ছিল, সপ্তাহান্তের পর পর দুই বেতারশিল্পের আলোচনার উপর, কিন্তু এই বিষয়টি ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। পঞ্চম কারণ, আলোচ্য বিষয়গুলির অনেকেই ছিল পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ষষ্ঠ ও সর্বশেষ কারণ, অল ইন্ডিয়া রেডিও কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ার কথা অনুষ্ঠান প্রচারণের জানাবার ব্যবস্থা করেন নি।

এর পর বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষা হয়। বোম্বাইয়ের তাঁরা ইন্সটিটিউট অফ্ সোশাল সায়েন্সেস একটা ব্যাপক সমীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে :

১। জনসাধারণের শ্রোতাদের মধ্যে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

২। শ্রেণীগত আলোচনাসভাগুলি খুবই

৩। রেডিও ফার্ম ফোরাম পল্লীজীবনে দুটি দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা হতে পারে : (ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে এবং (খ) সুপ্রশাসিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পল্লী অঞ্চলগুলির সাক্ষ্য হিসাবে।

৪। ফোরামের সদস্যরা গভীরভাবে মনে করেন, পল্লীজীবনে এই রেডিও ফার্ম ফোরাম অতি মূল্যবান এক সংযোজন এবং এটিকে একটি স্থায়ী ভিত্তির করা উচিত।

৫। অধিকাংশ গ্রামের অধিকাংশ লোক অধিকাংশ অনুষ্ঠানই পছন্দ করেন।

১৯৫১ সালে স্থির হল, রেডিও মুম্বাল ফোরাম অথবা পল্লী বেতারশ্রোতাদের আকাশবাণীর সমস্ত পল্লী অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সারা দেশের বেতার কেন্দ্র থেকেই তা প্রচার করা হবে। আকাশবাণীর তখনকার ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রীযুক্ত সি গাদ্রের প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে এ কাজে অগ্রসর হলেন। এবং ১৯৫৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে রেডিও মুম্বাল ফোরাম শুরু হল। তখন সারা দেশে ৮০০টি ফোরাম চালু ছিল। এর পর ১৯৬০ সালে ফোরামের সংখ্যা দাঁড়াল ১০০, ১৯৬১-৬২ সালে ২,০০০, এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৪,০০০। ১৯৬৪ সালের গোড়ায় আকাশবাণী থেকে বলা হল, ফোরামের সংখ্যা উঠেছে ৭,৫০০। তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় ফোরামের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল ২৫,০০০।

অল ইন্ডিয়া রেডিও তাঁদের মুম্বাল ফোরাম অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। একটা অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা যেন কিছু কাজ দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের আনন্দে মশগুল থাকলেই চলবে না, এখনও অনেক কিছু করার আছে। সেদিকে অধিকতর নজর দেওয়া দরকার। নইলে স্কুল ব্রডকাস্ট অর্থাৎ 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানটির মতো এই অনুষ্ঠানটিও হয়তো একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে।

রেডিও মুম্বাল ফোরামের সাফল্য সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া রেডিওর একজন ভূতপূর্ব ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রী বি পি আই বলেছিলেন :

"I have seen the immense interest shown in our Radio Rural Forum Scheme at the Asian Broadcasters Conference held in Japan and Malaya and the Commonwealth Broadcasting Conference held in Canada. UNESCO in its Bangkok and Paris meetings has recommended the scheme for adoption by all developing countries. It is gratifying that F.A.O. has also taken note of our work in this field."

প্রেমগ্রন্থ

অনিন্দ্য অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান

কথা । অজিত

রূপ থেকে দৃষ্টি :

পরদের সৈনন্দিন জীবনের বাঁধাধরা ন্ন একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পালিয়ে গিয়ে ুখ বদল নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-র্শন করে, তখন অজানা নিজনের নিসঙ্গ ঃস্যেই তার ভালো লাগে—এই তথ্যটুকু ্পন করবার জন্যে আমরা কিছু চরিত্র হিসাবে পরস্পর-পরদের চার-বন্ধু— ন্ন, সমর্থ, দৃষ্টি ও সেবার যতো অজনের (সকলেরই ্ত্ত ছবিতে স্পষ্টত ভালোবাসা) করেই নাটকের কয়েকদিন অতিবাহিত করবার ন্য নেপথ্য অন্বিত করেছেন, তাকে ই বাস্তবধর্মী বলে অভিহিত করতে া যায় কি? অনীশ হচ্ছে একজন তরুণ ন্টিলিজেন্টিয়, সমাজ সেবায় পাবলিসিটির ন্য অভিলাষী, দৃষ্টি একজন চৌকোশ ন্নবিত এবং সেবার বেলায় হচ্ছেও নিশ্চয় ন্দহান। অথচ চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে ন্ট বাংলোতে আশ্রয় নেবার দৃষ্টি নথে তরুণ এন্টেলিজেন্টিয় অনীশ পরিচিতা অপর্ণার কাছে বলছে। নিরব-ন্দ সাথে থেকে অন্তরঙ্গতা (পার-ন্স) নিতে কি পারতুম না? কিন্তু নিরব ্তেই যে ভালো লাগে। যে-আইনীভাবে ন্ন আশ্রয়ে নেবার অপরাধে চৌকিদারের ন্ত্রী মনে হলেও ওদের মিলন ভাঙতে ন্ত্রী লাগে। আদিবাসীদের দরবে পাশ ন্ন পরে বন্ধু হয়ে দৃষ্টির অন্তরঙ্গে ন্ন চৌকিদারনীকে বাধিয়ে তার সাথে ই সম্পর্ক আরো অন্তরঙ্গ করতে তাদের া না, কিন্তু সেই মেয়েরা অপর্ণা ছিল ে ওদের ওই অবস্থায় দেখেছে, এই নিয়ে মেয়ের অপর্ণার মুখ থেকে ন অনীশ বিস্ময়ে হি-হি করে ওঠে। ন্ন অবস্থায় দৃষ্টি যখন আদিবাসী ন্ন সঙ্গে মৌমিথুনে মত্ত, তখন অনেকে হয়ে তা দেখে এবং প্রতিবাদ করে না। কিন্তু পরমুহূর্তে দৃষ্টিকে নির্মমভাবে ত করে যে-ঔদ্ধত্য কাম চরিতার্থ অপরাধে একদা দৃষ্টি দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, সেই হিনিয়ে নিয়ে পূর্ব অপমানের প্রতি-া নেয়। অপর দিকে আই বন্ধুর ানের বিবশা অসহায়ী ভরা যৌবনে ন্নিতা হয়ে সমস্যের কাছে নিমজ্জমান-া প্রেম নিবেদন করতে আসে এবং এসে হয়, উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে তা ন্ত দৃষ্টিকটু লাগে। যেই আসা, অজনের কাছে এবং নির্মম পরিবেশে সমুদ্রের ন্দন জীবন থেকে দৃষ্টির আকস্মিক ই অন্তরঙ্গতাকে নিয়ে যে-সব উদ্ভট্টপনা

নিনের সকল অন্তরঙ্গজনের মনোবৃত্তির সাথে পরিচায়ক কিনা, সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু এর বন্ধু অন্তরঙ্গক পালাবদলের ন্য অজনে নিয়ে ওঠা নিত্য-নায়ি কিভাবে ন্টির এল, সেই কাহিনীকেই সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের জন্যে নির্বাচন করেছেন। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে তিনি মূল কাহিনীর বহু বাঞ্ছনীয় পরি-বর্তন করেছেন এবং এই পরিবর্তনের ফলেই তিনি অন্তত অনীশ এবং অপর্ণার মুখে এমন কয়েকটি মুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন, যা অনির্বচনীয় হলের ধনি। বাস্তবিকই অপর্ণার (যার ডাকনাম লিলি) মতো জটিল মনস্তাত্ত্বিকতা চরিত্রটি — যার অন্তরেখাগুলি সত্যজিৎ রায়ের নিপুণ সাঁচী

নিবেদিতার ভূমিকায় অনন্য চৌধুরি, মাধবী চক্রবর্তী এবং বসন্ত চৌধুরী

—তিনি ফিল্মস সিকোয়েন্স, সিনারী ফিল্মস পরিবেশিত বেপাল বস এবং অসীম বসু প্রযোজিত 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' ছবিটিকে বা-'ছবি' বানাবার ভূমিকা করেছে।

চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' ছবিতেও আরো সুস্পষ্ট। পেইন পালস হাড়বার পরে অসীম বাবুকের মতো গল্পকথনে পৌঁছে যান;—এই উঁচুর পাত্র-চরিত্র, পরিচয়-স্থিতি, সুপরি-চ্ছন্ন সহজবোধ আলো-আধার ছবিতে ফোটা-নোর বেলিমিনেশনেই যে বিচিত্র পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা কেবল অভিনব, তেমনই ইন্দিতধর্মিতায়। অভিনয়ের আরম্ভ হয় বাঙলা ছবিতেপলাশের ভাল দিকে স্থাপিত

যাত্রা [পরিচালনা-নিয়ন্ত্রিত যাত্রাপালা]

নতুন নাটক

সাম্মিলা

অভিনব পরিবেশে অভিনব মূল্যায়ন
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালনা । দ্বিতীয়
দৃষ্টি বন্দিনীর ও দৃষ্টিহীন চিত্র । তৃতীয় ও তৃতীয়
।। অঙ্গ ও পরিকল্পনা ।।

চমকপ্রদ দৃশ্য
।। দৃশ্যায়ন ।।

অভিনয় অংশগ্রহণকারী, সন্ধ্যা রায়, সুপ্রভা, প্রফুল্লকুমার, পরিমল বসু, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, নবকুমার মুখোপাধ্যায়, রেবেকা মিত্রমল, শ্যাম মজুমদার, রেবেকা, বসু, অনন্তী মুখোপাধ্যায়, নিখিল মুখোপাধ্যায়, দীপক দে ও অন্যান্য বৃন্দ।

নোটীশ বোর্ডটির লোকার পর্দানের মধ্যে; অরুণ এই মাধ্যম চরিত্রগুলির আরো নিয়ন্ত্রণেরও সূচনা হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে ছিন্নবন্ধনগুলি সুপরি-চ্ছন্নতর। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের দ্রুত অন্তর্ধানী ফোটোগ্রাফগুলির আলো-আধার এবং আলো-আঁধারির সৃষ্টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অভিনয়াংশে সমাশিব হিসাবটির কণা অপর্ণার ভূমিকায় পর্ণিমা মুখুজ্যের সুসংযত দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণ অভিনয় প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধুসেনা অনাদিবাবুর সৌম্য গম্ভীর-পাধ্যায় ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে। রবি ঘোষ তাঁর সমস্যাক্রান্ত সন্দিগ্ধচিত অভিনয় দ্বারাকে দেখার চরিত্রটিকে উপযোগ্যতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। এঁদের দুজনের পাশে সমর ও হরির ভূমিকায় যথাক্রমে সুরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় ও শঙ্কিত আর কিছুটা নিষ্প্রভ। ছোট্ট এক দৃশ্যের অভিনয়ে হরির পূর্ববঙ্গ গ্রামিকা অতসীরূপে অভিনেত্রী অপর্ণা সেন তাঁর নাটকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। অনাদিবাবু হিসাবটির চরিত্রটিকে মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছেন পাহাড়ী সান্যাল তাঁর সহজ অভিনয়গুণে। তাঁর দুঃখের পাশে সে তাকে আনন্দের পরশটি যোগা অবশ্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আদিবাসী যুবতির ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তী সাবলীল ভঙ্গিমায় তিনি আপনার স্থান নিতে পেরেছেন। বিধবা মায়ের চরিত্রটিতে কমেডী যদুর অভিনয় সুন্দর। এছাড়া ছোটখাটো, কিন্তু, কয়েকটি হিসাবটিতের ভেলেনা দাদু, কয়েকটি অভিনয়ে, উৎপল, প্রভৃতি ভূমিকা সুঅভিনীত।

পরিচালনায় ঋত্বিক ঘটকের কলাকৌশলের 'ঘরিয়া' বিকাশের আর কিছুই প্রকাশযোগ্য। সম্পাদনায়, মুহূর্ত-ঘটনার গতি-প্রকাশে অনেক হতে পারে নি। আবহসঙ্গীত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিষণ্ণ পৃথিবীতে প্রেমের অপমৃত্যু

পৃথিবী আজ বিষণ্ণ। মানুষ আজ একা। শান্তিকালেবাসী ভালোবাসা আজ অর্থ-হীন। জীবন এবং জীবনযাত্রা শিল্পের ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। যান্ত্রিকতা এবং অনিশ্চয়তা আজ মানুষকে পেয়ে বসেছে। অন্তর্জাতি-দ্বন্দ্বী যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সমস্যা আবর্তের মাঝে আজকে খুঁজছে তারতের মানুষ পৃথিবীব্যাপী এই সমস্যার মাঝে। কিন্তু এই অবিশ্বাসের জগতে মানুষ আজ কোন্ আশ্বাসে বেঁচে থাকবে? তার জীবনে প্রেম নেই, কিন্তু প্রেমের বন্দনা আছে।

এই প্রেম এবং প্রেমের বন্দনাকে উপজীব্য করেছেন ঋত্বিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দিন-রাত্রির কাব্য'-এ। এর নায়ক প্রেমেন্দ্র হচ্ছে একজন অধ্যাপক। সে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী। তা সে যা-ই হোক সর্বগ্রাসী উদ্ধাসকে সে বুদ্ধিহীনতা বলে মনে করে না। আবেগ তার কাছে বর্জনীয়। কিন্তু তার এই নিষ্কলঙ্ক মানসিকতা সময়-সময় তার গভীর আকুতির কাছে পরাজিত হয়। সে ভালোবাসার অক্ষম, এই প্রেমেই তার স্ত্রী উমা একদা উচ্ছলতায় আত্মহারা করেছিল। অথচ সুপ্রিয়া মনে করে, তার প্রেমহীনতা তাকে ঠকিয়েছে। তার এবং নিজের মাঝে একটি আপসরফা বাবস্থা টেনে সে সুনিপুণ ইন্দ্র-প্রেমীর আত্মপ্রকাশের সুযোগ তার বিবাহকে সম্ভব করেছে। তাই দীর্ঘ কয়েক বছর স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করবার পরেও সে মনে-মনে প্রেমেন্দ্রকেই কামনা করে এবং যখন হেমন্ত সস্তা-সস্তাই তাদের সংসারে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়, তখন সে বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে অস্বীকার করে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রেমকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইল। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মনে সে অনুভূতি কোথায়? সে তো চন্দ্রালিকা আশ্বেষণিকার উদ্ভাবনের! অতএব সে সুপ্রিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যেন পালাল। কিন্তু পালাবে কোথায়? পৃথিবীর প্রান্ত-সীমায় সে যেখা সেখা তার অবাধ যাতায়াত-রাহিত্যের। একদা এই একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী তাঁর প্রতিবেশীকন্যা মালতীকে নিয়ে পলায়ন করে সমাজকে করেছিলেন স্তম্ভিত। আজ তাঁর অবিশ্বাস্য। কিন্তু মালতীর জেলাপিপাসা মিটতে চায় নি; তাই তিনি আত্মসন্তুষ্টিতে উপবাস থেকে মনের বন্দনা ঘোষণার চেষ্টা করেন। এঁদের জন্য আনন্দ ঘোষাল সমাধান করেও একদিন কোনো পুরুষের সান্নিধ্য পায় নি। তাই তার পাশ্চি সৌমুখার প্রেমেন্দ্রকে মুগ্ধ করল। আনন্দের আকর্ষণকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। কিন্তু তার প্রেমে কোনো দায়িত্ব-বোধ ছিল না এবং এই বিষয়ে তার প্রয়োজনও ছিল না। তারা দুজনে দুজনের প্রেমে বিভোর। কিন্তু সহসা একেন্দ্রুর মতো টেবিলে সুপ্রিয়ার আবির্ভাব ঘটল। সে প্রেমেন্দ্রর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল।

আনন্দ প্রকাশ পেলো। প্রশ্নের উত্তরে সে হেরম্বর কাছ থেকে শুনলো : ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী; ভালোবাসা করে পড়লেও মানুষ থাকে। কিন্তু না; সে ভালোবাসাকে ধরে পড়তে দেবে না। ভালোবাসাকে প্রজ্বলিত রেখে তাই সে হেরম্বকেই সামনে তার প্রাচীনাকে উপেক্ষা করে সমুদ্রপারে চিরদিনের গেল। হেরম্ব সমুদ্রকে অজানা হয়ে পড়ল। যখন জানা গেল, তখন তার চলমাটি ভেসে গেছে; ঐ চলমাই যেন তার দৃষ্টির প্রতীক ছিল। সে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল সমাধিস্থা সুপ্রিয়ার সমক্ষে। সুপ্রিয়া জানতে চাইল হেরম্বর কাছ থেকে তার ভবিষ্যৎ চলার পথের কথা। হেরম্ব নিরুত্তর—শুধু সমুদ্রের গর্জন সেখা থেকে থাকল।

নাটকে প্রেক্ষাপটরূপে বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তীর রূপ পরিকল্পনাধীনে নিবারিটের কাজ-এর একটি মনোরম চিত্রকল্প দেবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উচ্চপ্রশংসিত হবার যোগ্য। ছবির প্রতিটি ফ্রেমেই নাটক হেরম্বর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে প্রায় নেপথ্যভাষণ রূপে উপস্থাপিত করে যে বিচিত্র চিত্রপরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পরিচালকমণ্ডলীর অভিনব জনপ্রশংসার পরিচায়ক। পরে সুপ্রিয়ার সমাধিতে হেরম্বর আবির্ভাবের পর থেকে তার স্থান ত্যাগ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর উপস্থাপনাও 'সিনেমেটোগ্রাফের প্রকরণক। তবে পূর্বীর অংশে এসে ছবিটি কিছুটা ধীরগতিসম্পন্ন, শিথিলতা এসে তার ছাপ্ত হয়ে পড়েছে। এই অংশটি আরও সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত হবার অবকাশ ছিল।

অভিনয়ে সুপ্রিয়া ও হেরম্ব রূপে মাধবী চক্রবর্তী ও বসন্ত চৌধুরী নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষী। পুলিশ ইন্সপেক্টরের অপেক্ষের ভূমিকায় নবাগত স্বপন রায় কণ্ঠস্বর প্রয়োগে অভিনয় করেছেন। প্রৌঢ় মাস্টারমশাইয়ের ভূমিকায় জনু বন্দ্যোপাধ্যায় সংযোগনশীল অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। সাঁওতাল বীরশাহুরূপে মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আনন্দের ভূমিকায় অজনা ভৌমিকের অভিনয় সংযত ও প্রাণবন্ত। ঝলসী বৌরূপে অনুভা ঘোষ চরিত্রটির জ্বালাকে সার্থকভাবে প্রকাশিত করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগটি অভিনন্দনযোগ্য এবং উচ্চপ্রশংসনীয়। কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'চিত্রগ্রহণ অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। সুরযোজনা অত্যন্ত রুচিসম্মত পরিচায়ক।

নায়িক প্রোডাকসন্স-এর নিবেদনটি করুণ নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় চিত্রসংযোজনা।

মঞ্চাভিনয়

বাংলাদেশে একজন পূর্ণদৈর্ঘ্য নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে 'নজরুল' একটি স্বাগতযোগ্য প্রয়াস। বিভিন্নমুখী এ প্রয়াস পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে এদের নাটক নিঃসন্দেহে নাট্যামোদকে একটি নতুন অনুভব আর উপলব্ধির আনে। কাহিনী-সংবাদ, চরিত্রসৃষ্টিতে অপরিকল্পনা সার্থক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে অভিনবত্ব তারা দেখিয়েছে তা শুধু দর্শকদের কৌতূহলকেই উদ্দীপ্ত করে তোলেনি, মনের গভীরতম স্পর্শকেও ছোঁয়া দিয়েছে। এঁদের এধারের নাটক নজরুল জীবনের পালা। পূর্বপ্রযোজনার মুখোমুখি এই নাটকে আছে, কিন্তু অভিনয়ের বলিষ্ঠতাই এধারের প্রযোজনার আসল সম্পদ।

তথাকথিত অর্থে নবেন্দু ঘোষের নজরুল জীবনের পালায় কোন উপভোগ্য কাহিনী নেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে অসংখ্য খুচরো নিয়ে নাট্যসৃষ্টির প্রয়াস প্রথাগত কৌশলকে আঘাতই করেছে। ঘোষদের বিস্তৃতীর্ণ নাটক বা আর্ট থেকে যাই। একটি নাটকের সমাপ্তির পরই শেষের। শিল্পীরা সবই করেছেন গাড়ীর অপেক্ষায়। কিন্তু গাড়ী আসতে দেরী হোক্সে দেখে নাটকের ফুট ফাউনের বাঁধা মামলা ছোক দর্শকদের তাতে অতিরিক্ত কিছু পেলাবে। কিন্তু কি সেই অতিরিক্ত আপাত? তা কি শুধু সংঘাত সংলাপে ফেরা মার্কস, না প্রতিটি দৃশ্যের সংলাপের সুষোগতে মেরা জীবনের কথা?

কি তারা উপহার দেবে দর্শকদের? ফেলে আসা দিন-রাত্রির অতলে ডুবে তারা কিছু খুঁজতে চাইলো। বিক্ষিপ্ত কিছু পেলো, এই কিছু পাওয়ার কথাই নজরুল জীবনের পালার পটভূমি। এই পটভূমিকার সংলাপ আর উপলব্ধির নিবিড় সেবুকরণে করেছেন সৃজন চাইন—নজরুল আর কর্মজীবন। নজরুলকে একটি জায়গাকে কেন্দ্র করেই সৃজনের একটি নাটক রচনার চেষ্টা। নজরুল স্মরণে রেখেছে একটি লোক তাকে এসে বলছে যে তিনি তার বাবা। নজরুল তাকে তার বাবা বলে জানে তিনি তার বাবা নন। খুঁজতে নজরুলের এই সমস্যাকে ঘিরেই পালা রচনার চেষ্টা। অবশ্য এর মধ্যে আরো অনেক প্রসঙ্গও এসেছে।

শুভারম্ভ শুক্রবার ২৩ জানুয়ারী

—পরিবেশের বৈশিষ্ট্যেই গড়ে মানুষের প্রকৃতির বৈচিত্র্য—
সমাজের ছোট ক্ষুদ্র জীবনকে নিয়ে তারই এক নতুন স্বাক্ষর !

প্যারাডাইস : জেম : মুনলাইট : পূর্ণশ্রী

পারিজাত - ভগবতীমহল - রিজেন্ট - লীলা - নবরূপম - লক্ষ্মী
জয়ন্তী - শ্রীদুর্গা - অরোরা - রামকৃষ্ণ (বৈদ্যবাটি) ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

• পূর্ণশ্রী বিজনেস্ পরিবেশিত •

'সাজাহান' ছবিতে অনিতা গুহ/অভিনয় করেছেন সেলি/ফটো : অমৃত

শেষ পর্যন্ত সাজাহান আর ঔরঙ্গজেব এবং দর্শকদের বোঝাতে চাইলেন যে একটি গল্প নিয়েইতিহাসে সন্তুষ্ট থেকে না, মোহরের প্রতিটি মানুষই একেকটা অসংখ্য গল্প সঞ্চিয়ে তুলতে চাইছে, কিন্তু হোসেন নয়। হোসেন এই ঐতিহাসের ছবি, ছুটে চলার ছবি।

সাজাহান আর ঔরঙ্গজেব যে সব কথা বলেছে, যে আবেগের মধ্য দিয়ে আজিজের সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে, অভিনয়ক্ষিতে তার সুস্পষ্ট ছোপ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার যে উপলব্ধির সীমায় পৌঁছেছে তা কি সত্যান্বেষী মানুষের যাত্রার উপলব্ধি নয়? গল্প সাজানো থেকে না, শুধু ছুটে চলতে হবে একটানা অর্থহীন চলমানতা এই আশায়। শেষ মুহূর্তে সাজাহান আর ঔরঙ্গজেবের ছুটে চলার মধ্যে এই ইঙ্গিতই যেন হয়ে উঠেছে।

নাটকের পরিকল্পনায় ও আঙ্গিকে যে নতুনত্ব আছে তাই দর্শককে আকৃষ্ট করেছে। সেই আকর্ষণের মধ্য দিয়েই চলমানতার আভাস পাওয়া গেছে। নাটকটির নির্দেশনায় শামল ঘোষ অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর কৃতিত্ব প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নাটকের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যেমন মান, দর্শককে প্রতি মুহূর্তেই আকৃষ্ট করে রেখেছেন তিনি। তাঁর সহযোগী শামলেন্দু ঘোষ (ঔরঙ্গজেব) ও চমৎকার অভিনয়ের একটি সৃষ্টি করেছেন। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে নাট্যকার মনোজ সেন ও সহরূপ মুখার্জী প্রশংসিত পরিবেশনাকে মুক্ত করে তুলতে পেরেছেন।

প্রায় দুটি পুরুষের চরিত্র আর অনুকূলত সংলাপ নিয়েও যে সার্থক নাটক হয়, নতুন কবিদের পাতায় তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। মঞ্চায়নের এই দুঃসাহসিক নাট্য-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

●

রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' ও শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটক দুটি গত ৯ ও ১০ জানুয়ারী রোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে বজবজবাসীর রবীন্দ্রভবনে। এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন ও শিল্পী সমাবেশে ছিলেন বজবজস্থ পৌরসংঘের কর্মিবৃন্দ, অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবন কর্মিটির সদস্যরা।

শেষরক্ষা নাটকের প্রযোজনা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তমাল লাহিড়ীর নির্দেশনায় কয়েকটি মুহূর্ত প্রাণের স্পর্শ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় নীলিমা চক্রবর্তী। তিনি ইন্দ্রাণীর ভূমিকাটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। 'ধনাই' নির্মলেন্দু তমাল লাহিড়ীর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণ। বিমল মনের বিনোদ ও শিবশঙ্কর ঘোষালের চলনবলন সুন্দর ও স্বাভাবিক। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, অমীয় দাস, ঘোপাল দাঁ, শুভ্রা ঘোষ, শিবেন মান্না, জয়দেব ধামমাজি, শিপ্রা ভট্টাচার্য ও হিমুল মৈত্র।

শেক্সপীয়রের বলিষ্ঠ নাটক 'ওথেলো'কে সার্থকভাবে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তোলা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার। প্রথমেই বলি এই দুরূহ কাজ নির্দেশক কিরণ মৈত্র অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। 'ওথেলো' চরিত্রের জটিলতা ও বিভিন্ন আবর্তের চলন মানের অভিনয়ে ফুটে উঠেছে, এবং নির্দেশক কিরণ মৈত্র স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন ইয়াগোর কুটিলতাকে। মূর্খিকা ভট্টাচার্যের 'ডেসডিমোনা' ও বিমল মনের 'ওথেলো' দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্র ছিলেন মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, রবি ভাদুড়ীনাথ, শিবশঙ্কর ঘোষাল, ঘোষ ধামাজী, শুভ্রা গঙ্গ, প্রণব সেনগুপ্ত, জয়দেবরঞ্জন পাল।

মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে গতানুগতিকতার পরিচয় রেখেছেন অমর ঘোষ।

●

সম্প্রতি কে সি ঘোষের বিচিত্রানুষ্ঠান চাকদহ, শিল্পী-সংসদের বিশ্বরূপা মঞ্চে নদিয়া জেলার মানুষ স্বীকৃতি সাফল্যের

বিশিষ্টাভিনেত্রী চিত্রপ্রযোজিকা স্নেহ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র এবং চিত্রপরিচালক

বলে পরিবেশন করেছেন। সমাজের ধনী-দরিদ্রের চাওয়া-পাওয়ার সংঘাতমূলক রূপায়ণে এই নাটকটির নিখুঁত নির্দেশনায় ছিলেন বীরু মুখোপাধ্যায়। নির্দেশকের সুষ্ঠুতম নির্দেশনা ও শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয় গুণে নাটকটির কয়েকটি মুহূর্ত অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছে। সমরেন্দু, অজিত ও সুভাষ চরিত্র তিনটি যথাক্রমে কর্মকার, সান্যাল চাটুজ্যে, চন্দনকুমার ঘটক প্রাণবন্ত অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। 'পিয়ারীমোহন ঘোষ ও অভয়পদ ধানাজীর মুখরা ও নিষ্ক্রোককে দুটি বৈশিষ্ট্য চরিত্রে চরিত্র-চিত্রণ। দীপিকা দাস, কল্যাণী অধিকারী ও তৃপ্তি দাসও নিজেদের চরিত্র রূপায়ণে নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন।

●

সংঘের সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে অনিলবরণ স্মৃতির সমাজোপযোগী নাটক 'এ কি হলো' সম্প্রতি মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রবীন সিনেমার নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করেন অরুণ ভট্টাচার্য, সুশীতল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল ধাড়া, সুনীল ঘোষ, অবনী বসু, রাধাজীবন দে, অরুণ দত্ত, সবিতা রায়।

'আহ্বানী' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের অভিনয়ের ভিতরটি একান্তিকার নিয়মিত অভিনয় পরিবেশনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। আগামী তিনটি হোল সমরেশ বসুর 'আমাবস্যা', মিলিন্দ ধানাজীর 'বামাপাড়া' ফিরে এর নাট্যরূপ এবং চেকভ অনুপ্রাণিত 'বিদ্রোহী' নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিভিন্ন চাটার্জী।

●

নিজস্ব প্রযোজনা নাট্যগোষ্ঠী 'সুরেশ্বরী' শিল্পীরা সম্প্রতি আইএএস হলে বিমল স্মৃতি নাট্যোৎসবে 'কবিতা' প্রযোজনা করেছেন। চুটকি-চিত্রণে শিল্পীরা যে নিষ্ঠা ও সাধনার পরিচয় দিয়েছেন তাতেই সমগ্র নাট্যপ্রযোজনাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। তৃপ্তি, বেলা দুটি চরিত্র গায়ত্রী বসু ও সেবা আলুকদারের প্রাণবন্ত অভিনয় সীতা ভোলা যায় না। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন হিমাদ্রি চক্রবর্তী (নিরঞ্জন), কল্যাণ রায় (ঠাকুরদাস), কল্যাণ ঘোষ (মনমোহন), নীলিমা অধিকারী (সেবায়ত) ও নির্দেশক হরেন কুমারী।

●

আদ্যা শহরে একটি নাট্যসন্ধ্যা কিন্তু দিন আগে প্রথম প্রকাশের পথ পেলো। সন্ধ্যায় নাম 'অনাদি'। যাত্রা সুরুতে অভিনয় হোল ছোটো নাটক 'রাত্রির কান্না' নাটক। আদ্যা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত এই নাটকটির চরিত্রগুলো সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেন অমলমোহন ভট্টাচার্য, চন্দন সান্যাল, প্রফুল্ল পাল, নির্মলমোহন ভট্টাচার্য, দিলীপ পাল, প্রশান্ত ঘোষ, অরুণ মোহনচিত্রকার, হরত ঘোষ, রবীন অধিকারী। নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন আশীষ চাটার্জী।

●

শান্তনু একটি প্রথমত নাট্যসংস্থা 'অন্বেষী'। সোসাইটির শিল্পীরা সম্প্রতি নাট্যোৎসব উপলক্ষে দুটি ছোট নাটক অভিনয় করেছেন। নাটক দুটির নাম ছোল শেখর চাটার্জীর 'প্রতিধ্বনি' ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আমার বাঁচতে সাধ'। অভিনয়ে যাঁরা সফল হন তাঁরা হোলেন সমীর অনুপম, অমিতা রায়, অজি অভিলাষ, প্রবীর চক্রবর্তী, অরুণ চক্রবর্তী, কাজল 'কবিতা প্রকাশ চক্রবর্তী' মৃণাল ঘোষ,

সম্প্রতি নিউজের অর্কেস্ট্রা মুখোপাধ্যায় ইলেকট্রনের মেলোডিপার্টি পরিবেশিত হয়েছে। কোরাস বাংলাদেশী দেওয়া মাইক্রোফোনটির প্রযোজনা শিল্পীরা কুশিলবের অক্লান্ত সাধনে। কয়েকটি চরিত্র রূপে, দেবমুখ, শিবু গুপ্ত মুখে দেব, পান্না দাস ও ঝিনা সরকারের অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

●

শান্তনুর নাবেরোটিক বিনোদন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি গলাপাল বসুর সত্য মায়া সেজে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রযোজনা-পরিচালনায় ছিলেন নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। রৌদ্রালোকের কলকাতা, ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র, মুকুল দে, প্রবীণ ভট্টাচার্য, 'প্রেমা ঘোষ, বিমলাদ্রি দে, নারায়ণ সরকার, অজিত দে চন্দন, অমরেশ দাস, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ নাগ, শচীন নাগ, মণিকা ভট্টাচার্য বিভিন্ন চরিত্র সুষ্ঠুরূপায়ণ করেন।

●

নবারুণ কলাকুশলী গোষ্ঠীর রেজাল্ট প্রকাশের মধ্যে এরমধ্যে সমরেশ্বরী অমর নাট্যোৎসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতাটি প্রতিদিন ৬ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত মোট ১০টি নাটক নিয়ে অনুষ্ঠিত

হবে। তাদের যে কোন অঞ্চলের নাট্য-সংস্থাই এতে অংশ নিতে পারবে। বোলা-হেডের ঠিকানা সম্পাদক, বেলানী ক্লাব, অমরিন্দ্রী রাজার মার্গ, মহাদিল্লী-১। অংশগ্রহণ পত্রগুলির শেষ তারিখ ১৫ মার্চ।

●

সম্প্রতিকালের নাটকের ক্ষেত্রে যারা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তার ছোট একটা নমুনা এঁরা ও সংস্থাটির পরিচালন কর্তৃপক্ষের। সাধারণের এই দুষ্পাপ্যকে আরও দুর্মূল্য করে তুলবার জন্যে রাজার মিউজিয়ম প্রতীয়মান অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছিল-সমিতি। গত ৮৭ বছর ধরে এই সমিতির নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক ও পালার অভিনয় করেছেন। আর আর দুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এঁরা সাম্প্রতিক নাটকের দিকেও নিরো-ধিত করেছেন। এঁদের প্রযোজনার আগামিকাল সন্ধ্যায়, কাল ও আজকের নাটক দুটি পরিবেশনার জন্যে বিশ্ব পরিক্রমণে হবে উঠেছে। দুটি নাটকের প্রযোজনার ভার প্রযোজনার ভট্টাচার্য প্রযোজিত বিশ্ব-কোষের পরিচয় রাখবে পেরেছেন।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় কুসুমেশ ভট্টাচার্য, প্রবীণ চৌধুরী, অমলেন্দু বসু, রীতা ভট্টাচার্য, দিলীপ ভট্টাচার্য, রামা গুপ্ত, এম আর রায় চৌধুরী, মায়া রায়, অমিয়েশ ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শকদের বিশেষ করে।

●

গত বছর কলকাতার সকলের সেরা 'ঈশান' নাটক প্রযোজনা করার পর গত ২১ নভেম্বর ইন্দ্রেস্টারে ইন্দিরা ক্লাব প্রথম ঘরের দ্বিতীয় নাটক পরিচালনা সাহাজের 'সমাধান' দিয়ে বাদলেরীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্র রায়চৌধুরীর পরিচালনার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন মানিক রায়, প্রবীর চক্রবর্তী, তরুণ ঘোষ, শীতিন মজুমদার। ইলা রায়, সবিতা গুহ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণেশের অভিনয়, সহজাত ছোট প্রযুক্ত। নির্মল নিয়োগ আলোকসম্পাত ও পরিচ্ছদ রচনার ও দেবী ঘোষের সঙ্গীত সুপরিকল্পিত। আগামিকালে বাংলা নাটকের প্রসারে কলকাতা তরুণী এদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

২৩ জানুয়ারী আগামী বিদ্যুৎবাহিনীর প্রাঙ্গণে (পূর্ব সিটি, কলকাতা) আগামী ত্রিয়েটার সুকুমার রায় রচিত জনপ্রিয় চরিত্রী তুলসী লাহিড়ীর 'কলনায়ক' সঙ্গে সাহায্যে অভিনীত হবে।

আগামী ২৬ জানুয়ারী (সোমবার) সন্ধ্যা সাতটায় ভট্টাচার্যপাড়া স্পোর্টিং ইনস্টি-

সেল ২৬ জানু ৬টায়
প্রতাপ মেডিক্যাল হল
সাবারা ভব
প্রয়োজন রচনা ● পরিচালনা
আজাদী রাজন সরকার
টিকিট পাওয়া যাবে সিনেমা

সালঙ্কিয়া জগবাণী পার্কে ক্লেপ্টন ক্লাবের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন হৈমন্তী মুখোপাধ্যায়।

টিউট মঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর 'কলনায়ক' ও 'রাজিকাঙ্কন' এবং সুনীল মঞ্চের 'কর্ণাচিহ্ন' অভিনীত হবে।

লক্ষ্ণৌয়ের সর্বভারতীয় পূর্বাঞ্চল বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা—গত ১৮ থেকে ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক প্রকাশ-চন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সর্বভারতীয় পূর্বাঞ্চল বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

এই প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী ছোট দলটি দলের মধ্যে দ্বিতীয় 'শনিচক্র' মোস্তাফীর প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের 'মোক্ষমলাই' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য প্রকাশ স্মৃতি শীল্ড, সার্টিফিকেট ও নগদ ৫০১ টাকার সম্মান লাভ করেন। প্রযোজনা হিসাবে জগ ও ২৫১ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন যুবকবৃন্দ-পুরের 'চতুরঙ্গ' প্রযোজিত বিজন ভৌমের 'নাম নেই' নাটক। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান দ্বিতীয় শনিচক্র প্রযোজিত 'মোক্ষমলাই' নাটকের জন্য শ্রীঅমর ঘোষ। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান শ্রীকল্পত দাস 'মোক্ষমলাই' নাটকে ভোলানাথ ইত্যের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য। অভিনয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পান বারাসতীর হরিয়র সমিতির শ্রীঅনিলেশ ভট্টাচার্য 'কলনায়' নাটকে অভি-নয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান ধানিবাটির সাহা সমিতির মাট্য সংস্থার শ্রীমতী রেবু বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালের বিচার' নাটকে প্রমদা ও কমলার ভূমিকা অভিনয়ের জন্য। অভিনেত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় পুরস্কার পান শ্রীমতী মায়া ঘোষ, 'কালের বিচারে' রোহিণী ও রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তর-প্রদেশের প্রাক্তনপাল ডাঃ কেদারেশ্বর বেরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত সাহিত্যিক শ্রীসত্যেন বসুর ভাষণ খুবই মূল্যবান হয়।

নাট্যোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দেশ-বিদেশের বিয়েটার প্রদর্শিত ও বাংলা নবনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে চিত্র, পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকের প্রদর্শনীটি উদ্বোধন হয়।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরের 'সবরঙ' নাটকের পঞ্চম বছরের সূচিকে স্মরণ করে প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। পুরস্কার বিতরণী দিবসে যুবীজনদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয় নবনাট্যের পুরোধা শ্রীবিজন ভট্টাচার্যকে। শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের আবেগদীপ্ত দীর্ঘ ভাষণ বিপুল জন-মণ্ডলীকে আশা ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির প্রযোজনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজনট' নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা নাটক ও থিয়েটারের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সুধী আলোচনায় সকলেই উৎসাহিত হয়। আলোচনায় শ্রীবিজন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আঞ্চলিক নাট্যানুরাগীরা অংশগ্রহণ করেন।

নাট্যোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' সুষ্ঠুটি চিত্তাকর্ষক হয়। শ্রীমন্তু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, ডাঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুধীপ্রধান এবং শ্রীবিজন মৈত্র ইত্যাদির রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে স্মরণিকাটি প্রকাশিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় শিল্পী পরিষদ প্রযোজিত সুজনমাটি 'শ্রীচৈতন্যের' আগামী অভিনয় ৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যার মহাজাতি সদনে।

গত ৩. জানুয়ারী বালবাজার তরুণ পাঠাগারের উদ্যোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এদিন সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল হরমোলা সৈয়দ লাহার একক্ষণ্ডী-আসরী "হরমোলা" পরিবেশন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন:—ভোলানাথ দাস, গীতা বালসার, দেবীদাস ঘোষাল, পারমিতা রায়, রেনু সেনগুপ্ত, রঞ্জিত বসুরায় ও শ্রীকালীনাথ।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী অনিলেশ ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন (২২৭৫, রাসবিহারী অ্যাভেনু, কলকাতা—১৯) এর পঞ্চাশতম বার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে।

(ক) সর্বসাধারণ—"সংঘের" — প্রেমেন্দ্র মিত্র (প্রথম), (খ) স্কুল ছাত্রছাত্রী—"সন্দেশ"—নিবেদনলাল রায় (দ্বিতীয়)—দক্ষযজ্ঞ। (গ) বালক-বালিকা—"সাহিত্যিকা" সুনির্মল বসু (দ্বিতীয়, ২য় ভাগ), (ঘ)

ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাস দেখতে গিয়াছিলেন সর্বশ্রী শচিন্দ্রনাথ বসু, প্রমথ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্য বসু, সুমথনাথ ঘোষ, পঞ্চানন্দকুমার মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সেনগুপ্ত এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়

...—"ছড়া"—বাচ্চাদের সাতরাই—বাংলা ... (ছোটদের ছড়া সঙ্কলন), (৬) অবাঙালী ... "পলাতকা"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কথা ...হিনী)।

...ষ্ণিকা সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত ...তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (৪র্থ বর্ষ)॥ ...আগামী ৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবৃত্তি ...যোগিতার নাম এবং লিখিত প্রবন্ধ ... অমলেন্দু চৌধুরী, সম্পাদক, বহ্নিশিখা ...তি পরিষদ, ৫নং মাতঙ্গিনী লেন, ... ষষ্ঠিতলা, কলিকাতা—৮ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ...তি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক নির্বাচন ...বী ১৫ ফেব্রুয়ারী বেলা ১টায় উপরোক্ত ...নায় অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় ... প্রবেশ মূল্য নেই।

...আবৃত্তির বিষয়সূচী।—'ক' বিভাগ ঃ ...বৎসরের ঊর্ধ্বে পুরুষ ও মহিলাদের ... 'সোনিন'—সুকান্ত ভট্টাচার্য (হাতুড়ির), ...বিভাগ ঃ (১৪ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত ... ও বালিকাদের জন্য) 'ঐতিহাসিক'—...ন্ত ভট্টাচার্য (হাতুড়ির), 'গ' বিভাগ ঃ (১ ... ১৩ বৎসর পর্যন্ত বালক ও বালিকা-...দের জন্য) 'জাতের রন্তাতি'—জাতীয় সঙ্গীত ...ম (বিশ্বের বাঁশী), 'ঘ' বিভাগ ঃ (৮ ... পর্যন্ত শিশুদের জন্য) 'বাংলার শ্রেষ্ঠ ...নাথ ঠাকুর (সন্ধিতা), প্রবন্ধ ঃ (সর্ব-...রের জন্য)—'বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে ...কতার সংকট ও তার সমাধান'।

...বিশ্বের কতকগুলো আদর্শ সামনে রেখে ...ক যারা সমাজ তাদের যারা শত্রু ...ন্য। সম্প্রতি যারা পালা পরিবেশনের ... আন্তরিক বিষয়বস্তু রূপায়ণ ও দর্শকের ... আনার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে। নবগঠিত বিশেষ যারা সমাজ এই মহান প্রচেষ্টাকে ...ন বাস্তব ও চালুরূপ করে তুলতে ...ন।

সাধারণ মানুষের সামাজিক সমস্যা ও ...মের ইতিহাস থেকে এঁদের প্রতিটি ...। আমরা সে আশা করি তাঁরা প্রত্যেকে ... অবশ্যই আমাদের আশানুরূপ হবে। ... পরিচালকমণ্ডলীর বিশেষ যারা ...

...রাইফেল'। সুরসৃষ্টি ও সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও সন্দীপন সেনে নেপথ্যে নির্মলেন্দু চৌধুরী। এবং শিল্পীদের মধ্যে আছেন শোভা সেন, সতী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ মাইতি, ইন্দিরা দে, অমর মুখোপাধ্যায়, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল দত্ত প্রমুখ।

রায়চৌধুরী প্রথম প্রয়াসে প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে 'প্রথম কদমফুল' চিত্র-গ্রহণ নির্মল মিত্রের পরিচালনায় বর্তমানে শেষ হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—মাধবী চক্রবর্তী, অমিত চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দেবী প্রভৃতি।

রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত রাবিটার নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্নাদে মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল মিত্র। রাবিটি পরিবেশনার মাধ্যমে আছেন—দাওয়ার কিম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

টালা পার্কে ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাসে একটি সাহিত্যিক সমাবেশ হয়েছে।

ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাসের আমন্ত্রণে তাঁরা যখন একে একে আসছিলেন তখন দর্শকেরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা যে একইসঙ্গে এক সঙ্গে এসে সার্কাসের আসরে ছিলেন, তা আসর থেকে মনে হয় নি। প্রত্যেক বছরই তাঁরা; তেমনি বিস্ময়কর। প্রশান্ত বছরও

পরিচালনায় ছিলেন শ্রীশৈলেশ্বর ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন অধ্যাপক রবীন্দ্র ভট্টোপাধ্যায়।

গত ২২ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার সুপরিচিত নাট্য সংস্থা 'আবাহন' বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় হলে মঞ্চস্থ করে। নাটকটির অভিনয় অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। নাটকটির সুনামের এবং বিষয়বস্তু পরিচালনা খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রযোজনা সুবিবেচনা হয়েছে অনেকদিন পর এমন অভিনয় দেখে তিনি এরাতে পারবেন, যেমনটি এরকম তার খুবই ভালো ছিল। সুবিমলের-সুবীরকুমার বাদ দেওয়াবার সুবিধার কিন্তু প্রমাণ করেছেন যে তিনি একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা। দীপকের সমালোচনা এবং অভিনয়ে কিছু অসামঞ্জস্য ছিল তাছাড়া অন্যান্যদের মোটামুটি অভিনয় খুবই সন্তোষজনক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রবীরের ভূমিকায় যদিও প্রায় একটি সবচেয়ে হয়ে চরিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। অনোহরের ভূমিকায় দীপক বাদ্যকির অভিনয় মোটামুটি মন্দ হয়নি। প্রকাশ চরিত্রে খুব শীল নিজেকে মানাতে পারেন নি। বন্ধুপতি, সনাতন ও অজিত যথাক্রমে অরবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব দাস, কেশব দে সুঅভিনয় করেছিলেন। অনীতার চরিত্রে প্রতিমা বাসুদেবের কাছ থেকে আরও কিছু আশা করা গিয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় সুব্রত সাহা, চিত্রিতা মজুমদার অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় সুব্রত চ্যাটার্জি, নীলু বাসুদেব, সোপাল গুহ, সোকিন দে, বিশ্বনাথ ঘোষ, মধ্যাহ্ন দে সরকার, অসিত দে, মন্ত্রী রায় চৌধুরী, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, সুলেখা ঘোষ প্রভৃতি। সঙ্গীতের অংশ বাদ্যাংশ ও আলোর অংশ প্রশংসার দাবী রাখে।

গেল ১১ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ দিনব্যাপী পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসব। শিশিরকুমার একদিকে নাট্য প্রতিযোগিতা। সংগীত জলসা ও চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে কিশ অ্যান্ড বিয়েটার আকাদেমি অব ইন্ডিয়ার সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমস্ত অনুষ্ঠান মোনা-আকাদেমি বাসকক্ষেত্রেই শিশিরসংস্থাগার ও সুভাষ-মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ ডিসেম্বর উদ্বোধন দিবসে সোমবার করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য— ডাঃ রমা চৌধুরী। এছাড়া প্রদর্শনী ও শ্রীমতীর অনুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসবের উদ্বোধন, পুরস্কার বিতরণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ সারা দুদিন ধরে হয়। অভিনেতা প্রতাপচন্দ্র বাউল হয়েছেন সম্মান জানানো হয় এবং তিনি অভিনয় সংগীত সারা সন্ধ্যাকে মুগ্ধ করেন।

১৪ ডিসেম্বর শিশিরকুমার একদিকে নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং অন্যদিকে সমস্ত বাদকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভাপতিত্ব করেন বাসকক্ষেত্রের সৌম্য-প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২ ডিসেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনে প্রাক্তন চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্প্রদায় সহ-সভাপতি পরিচালনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও সি পি এম নেতা তরুণ ঘোষণার প্রধান অতিথিরূপে আসন গ্রহণ করেন। উৎসব সম্বন্ধে বিধানসংগ্রহশালা জন-সাধারণের পরিচালনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। বিভিন্ন চিত্র ও নাট্য প্রতিষ্ঠান অনেক নাটকের মঞ্চ এবং ও স্টীল, লোকাল, পোস্টার, ব্রুশগুলি, প্রকাশ সমূহ প্রভৃতি সম্পর্ক উপহার দেন। সভাপতির অভিনেতৃত্ব ছিল অবশ্যই অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র ও নাট্য-জগৎ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক সম্পদ বিধানসংগ্রহশালায় উপহার দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং পরিচালিত আমোদিনেশনের শিল্পীরা কিছুদিন আগে শ্রীমতিপদ রায়-চৌধুরীর 'প্রজাপতি' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শ্রীমতিপদ রায় নিজেও এ নাটকের অত্যন্তটি ভূমিকায় খুব ভালো

গায়ে অর্ধনিমীলিত বিলায়েতের সঙ্গে ...য়েৎ খাঁ। আলি আকবর, মীর মুস্তাফা ...খোঁ এবং সুলোচনা আলি খাঁ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

জলসা

...াদ বিলায়েত ও ইমরাত খাঁ উপহৃত সঙ্গীতোৎসব

...ত্র সুজাত খাঁকে গুরুশিষ্যাদের পরিচয়ের জন্য, পক্ষ সার্কাসের স্নেহের ...লনস্থ ভবনে সারারাত্রব্যাপী এক সঙ্গীতের জলসার আয়োজন করে- ...ন্তাদ বিলায়েত খাঁ এবং ভ্রাতা খাঁ।

...সঙ্গীতানুরাগে সরোদ বাদনে মুখ্যদের ...ত, কণ্ঠসঙ্গীতে পরিবেশন করেন ...খোলায় আলির শিষ্য ও পুত্র ...। আলি খাঁ এবং শিষ্যা মীরা ...ধ্যায়। শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং আলি ...খাঁ, বিলায়েত খাঁ, ইমরাতের ভ্রাতা, ...খাঁ, বিমল মোষ, দৈবেন মুখো- ...পাধ্যায় খাঁ, মন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং ...ন আরো এমন বহু খ্যাতনামা শিল্পী।

অনুষ্ঠানের শিল্পীদের সঙ্গে করেন পন্ত চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ ...ায় ও [illegible]

সর্বশেষে অনুষ্ঠানে সরোদ বাদনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন পন্ডিত মোষ। অবশ্যই রাগ চন্দ্রনন্দনের ছাঁড়, প্রথম ঘন্টাখানেক বিলম্বিত পর তৈরবীর সুরবন্ধু হৃদয়ের পরিবেশে অনুপম কোরলতার বাজনার কারুকৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটল ঘড়ির দিকে চোখ রেখে দেখি বিলম্বিত খাঁর চোখে জল।

রাগা সঙ্গীত সমিতি

রাগা সঙ্গীত সমিতির উদ্যোগে হিন্দুস্থান রোডে প্রথম সঙ্গীত সমিতির সমাবর্তন উৎসবের ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন শ্রীমতী এলা রাগা। উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মোষ। চিত্রতারকা ভারতে তাঁর সহজাবসিদ্ধ কৌতুকবোধ ও প্রখর সঙ্গীত উদ্যোগ সঙ্গীতের সমাবেশের চেয়েও হালকার দিক ও খুঁটিনাটির ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলে- ...ছেন আলোচনাকালে করেন। তিনি বলেন [illegible]

গলা ঝঙ্কারিত করে ধরতে পারেন, সঙ্গীতে হচ্ছে সেই অবচেতন ঘটনাটারলী শক্তি যার প্রসাদে মানুষ অনুভূতি, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে হতে হলে অনেকখানির অধিকারী হতে হবে। স্বীকৃতির দ্বারা তা অনেকখানি নির্ভর করে ভাগ্যের উপরও।

এরপর শ্রী. এল রাগা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠান ও রাগাজীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীমোষের ভাষণ আবেগ ও আন্তরিকতায় সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন, পরবর্তী বক্তাদের উদ্যোগই তার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের সঙ্গীতবাদ্য দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয়। উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে দেখা গেল ডক্টর ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, প্রত্যুষ দাস, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে।

সোরভের প্রথম বার্ষিকী উৎসব

সাম্প্রতিক্কালে ঝোড়াসাঁকোর 'সোরভ' সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে এক পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন প্রতিষ্ঠান সভারা। এ উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসত্যব্রত ঘোষ প্রধান অতিথি রাইচাঁদ বড়াল।

এই [illegible]

সৌরভকে আশীর্বাদ জানালেন সভাপতি ও প্রধান অতিথি।

সঙ্গীতরসিক ও গুণীজনের এই মনোজ্ঞ আসরে সম্পাদিকা শ্রীমতী নন্দিতা চট্টোপাধ্যায় সৌরভের গত এক বছরের অগ্রগতির হিসেব-নিকেশ প্রসঙ্গে জানান, অর্থ ও ভবাদিবত সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষাদান ও সঙ্গীতশিল্পীকে আর্থিকভাবেই সৌরভের প্রাথমিক লক্ষ্য। পণ্ডিত ডি. ডি. রোয় সৌরভকে আশীর্বাদ জানান।

অনুষ্ঠান সূচনা হয় শ্রীমতী মুনিয়া মুখোপাধ্যায়ের হুগোনাল্ড ও বাউলাঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। কণ্ঠসঙ্গীত ও আবৃত্তির সঙ্গে পরিবেশিত হয়ে যাওয়ায় উপস্থিত প্রায় গুণীজনের সঙ্গীতরস অভিষিক্ত লাভ করে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ মুস্তাফা খাঁ ও সুবোধ দাসগুপ্ত।

মুখোপাধ্যায়ের সা-রিপ্রকাশ 'আবেগী' তাঁর গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে, তবে শ্রোতাদের মনে বেশী দাগ কেটেছে তাঁর মনে ও 'ঘড়ে ঘোলায় আসির সেই সুবিখ্যাত ভজন 'হরি ওম্' তবলায়। এই অনুষ্ঠানের উপহার-পাওয়া ঘোল সহ-সভাপতি শ্রীঅরিন্দমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে বাজানো পণ্ডিত ডি ডি রোয়ের যোগ্য সঙ্গত।

সুবোধ দাসগুপ্ত বাজালেন খাম্বাজ। ভাটিয়াল ও বং-এ রাগের পরিচয় সুন্দর ভাবে সকলেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত করেছেন। এর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন আমির দাস। এই শ্রেষ্ঠ কিন্তু আন্তরিকতা সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানটি মনে রাখবার মত।

আলা মুক্তাপাটামনুষ্ঠান

হাওড়ার নতুন সংস্কৃতি সংস্থা "দি হাউস অফ আর্ট" আসরে হাজিরে আনুকরী সঙ্গীত করছে কবিগুরুর "আমরা মেয়েমানুষ"। পরিচালনায় করছেন পল্টুরানী দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীসুরেন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীন্দ্রনাথ সাহা।

সম্প্রতি তমলুকে "চিত্রলেখা" সংগীত চক্রের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে তমলুক শহরে এই সর্বপ্রথম সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। "চিত্রলেখা" সংগীত চক্রের যে সমস্ত সভ্য এর পরিচালনার ভার নিয়েছেন তাঁদের নাম আছেন সম্পাদক কানু বসু (প্রেস ফটোগ্রাফার) ও কার্যকরী সভাবৃন্দ রায় (আকাশবাণীর শিল্পীকার)। এতে শিক্ষক হয়ে আসছেন সুরেশ্বর ও সংগীত পরিচালক সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত রেকর্ড শিল্পী নিখিল সোরেশ্বরী ও আরতি মিত্র এবং বিশ্বনাথ সাহা (লোকসঙ্গীত)।

আসেম্বলীর সঙ্গীত-শিল্পীদের প্রতিযোগিতা

সোনপুর (২৪ পরগণা)-এর সুখ্যাত শিল্পী সংস্থা আয়োজিত "সারা বাংলা আসেম্বলীর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা" বিপুল উদ্দীপনা ও অধিক উৎসাহের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল ২১ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী অবধি সোনপুর হাইস্কুলে। বাংলার বহু শহর ও গ্রামীণ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিযোগীরা আসরে সাড়া দিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতার একমাত্র লক্ষ্য হল : সঙ্গীত প্রতিভা আবিষ্কার এবং সঙ্গীত সম্পর্কে আসেম্বলীদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার। এই প্রচেষ্টার জন্য শিল্পী সংস্থা সাফল্যের সঙ্গেই করছে সোরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রধান আসেম্বলীর শিল্পীদের বিপুল সংখ্যায় যোগদান এবং সোনার প্রতিভাবান শিল্পীদের 'বিচারক' হিসেবে সাদরে আমন্ত্রণ। বিচারকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন : সর্বশ্রী নিখিলেশ মুখোপাধ্যায়, অমলা কানু, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কুসুম ঘোষায়ী, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বরী ঘর, মনোজ মুখোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, অমেক রায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, বিনয় গঙ্গোপাধ্যায়, সুহাস মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র দে, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ। খেয়াল, ধ্রুপদ, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, আধুনিক, নজরুল গীতি, বাউল, পল্লীগীতি, গীটার ইত্যাদি বিষয়ে বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। সংক্ষিপ্তভাবে ফলাফল হল। খেয়াল। (ক) ১ম। চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, (খ) ১ম। বীথি ঘটক, (গ) ১ম। অরুন্ধতী গঙ্গোপাধ্যায়, ২য়। মিতা মুখোপাধ্যায়, (খ) ১ম। মালবিকা দাসরায়, ২য় তৃপ্তি নাথ। 'ভাবসঙ্গীত'। (ক) ১ম। চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, ২য় কালীনাথ বসু, (খ) ১ম বীথি ঘটক, ২য় সুধা সিংহ ও রেখা মুখোপাধ্যায়, (গ) ১ম। অপর্ণা সেনগুপ্ত, (ঘ) ১ম। মালবিকা দাসরায়। 'ভজন'। (ক) ১ম। অরুণী দাস, ২য়। শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়, (খ) ১ম। বীথি ঘটক, ২য়। দীপ্তি রায়, (গ) ১ম। অরুন্ধতী গঙ্গোপাধ্যায়, ২য়। জয়ন্তী বসু, (ঘ) ১ম কৃষ্ণা বসু, ২য়। মালবিকা দাসরায়। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'। (ক) ১ম। কালীনাথ দাস, (খ) ১ম। কৃষ্ণা ঘোষ ও রেখা ঘোষ, ২য়। রেখা মুখোপাধ্যায়, (গ) ১ম। মিতা চৌধুরী, ২য়। সোমালী ঘোষ, (ঘ) ১ম। সন্ধ্যা ঘোষ, ২য়। মালবিকা দাসরায়। 'শ্যামাসঙ্গীত'। (ক) ১ম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, (খ) ১ম। বীথি ঘটক, ২য়। রেখা মুখোপাধ্যায়, (গ) ১ম। অপর্ণা সেনগুপ্ত, ২য়। সুরেখা মিত্র, (ঘ) ১ম। কৃষ্ণা বসু ও মালবিকা দাসরায়, ২য়। তপতী ঘোষ। 'নজরুল গীতি' (ক) ১ম। সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়, (খ) ১ম। কৃষ্ণা ঘোষ, ২য়। বীথি ঘটক, (গ) ১ম। রেখা গুহ, ২য়। অপর্ণা সেনগুপ্ত, (ঘ) ১ম। পলিনা সরকার, ২য়। সুরেখা চৌধুরী। 'আধুনিক'। (ক) ১ম। চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, ২য়। স্বপন ভট্টাচার্য, (খ) ১ম। দীপ্তি রায় ও বীথি ঘটক, ২য়। লতিকা বসু, (গ) ১ম। অপর্ণা রায়, ২য়। মিতা চৌধুরী, (ঘ) ১ম। কৃষ্ণা বসু, ২য়। মালবিকা দাসরায়, 'পল্লীগীতি' (ক) ১ম। জীবন সরকার, ২য়। সুবোধ চক্রবর্তী, (খ) ১ম। লতিকা বসু, (গ) ১ম। মিতা মুখোপাধ্যায়, ২য় মিতা চৌধুরী, (ঘ) ১ম। তপতী ঘোষ, ২য়। অলকা বসু। 'বাউল' (ক) ১ম। সুবোধ চক্রবর্তী, (খ) ১ম। কৃষ্ণা বসু, ২য়। মালবিকা দাসরায়। 'অনাদানা বাংলা গান'। (ক) ১ম। কৃষ্ণা ঘোষ, (খ) ১ম। অপর্ণা সেনগুপ্ত, (গ) ১ম। মালবিকা দাসরায়। 'গীটার' রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে। (ক) ১ম। বিলাস দাস, ২য়। বাসনা রায়। নজরুল গীতির সুরে (ক) ১ম। আশিস ঘোষরায়, ২য়। বিলাস দাস। আধুনিক গানের সুরে ও লঘু সুরে। (ক) ১ম। বিলাস দাস, ২য়। আশিস ঘোষরায়।

হরিদাস স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৬৬।১, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটস্থ "মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে" এক জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে হরিদাস স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং সঙ্গীতাচার্য হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের ৭৫তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হোল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীসতীন্দ্রকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুসাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতি শ্রীসুধিন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি, প্রধান অতিথি, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দির কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি তাঁর সুলালিত ভাষণে সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকলা সর্বক্ষেত্রে মানুষই যে সুর ও ছন্দের একত্ব রয়েছে, তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এইরূপ সম্মেলন গঠনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তাও বিশ্লেষণ করেন। স্বর্গত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং সম্মেলনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভাপতি সঙ্গীতাচার্য শ্রীসতীন্দ্রকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণের প্রথমে স্বর্গত সঙ্গীতাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে 'হুপসের' বিশুদ্ধতা ও সুপ্রাচীনতার কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বর্তমানে 'খেয়াল' জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করছে না বলে অনুযোগ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এইরূপ সম্মেলন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসারের দিকে এবং বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখবে।

সম্মেলন-সভাপতি সঙ্গীতাচার্য শ্রীসতীন্দ্রকিঙ্কর

তাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তাঁর সাংকেতিক জীবনী পাঠ হয়।

পরে সভার আহ্বায়িকা উমাদেবী উদ্বোধনী ভাষণে গ্রন্থ করেন ছন্দের ও রসের শ্রীঅরবিন্দ সান্যাল এবং সেতারে মাল্য চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানস্থানের মঞ্চের নির্মাণচিত্র জন্য 'সুরের আসর' সভার বিশেষ অনেক দিয়েছে। তাঁর ম মুহূর্তে শ্রীরাজীবলোচন সেন সভায় সভাপতি হেন উপস্থিতি হয়েছিল। দুই প্রবীণ শিল্পীর পর শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়ের সেতার সঙ্গীতের বিশেষ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের মন্দরটী রাগ ছুলনী আলাপ ঝোলবায় পরে তিনি 'রাগেশ্রী'তে গৎ ও পরে টুংরী বাজিয়ে শোনান। দীর্ঘ দুই বিশ্লেষণ তাঁর সেতার বাদনের সঙ্গে ও তবলিয়া শ্রীবনমালী দাসের তবলা সঙ্গত শ্রোতাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে এবং অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখে। এই দুই শিল্পীর যোগ্যতাপূর্ণ হাত বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

ইটালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

এখানের প্রথম ইটালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন গত ২৬ ও ২৭ সিপ্টেম্বর প্রতাপ মার্কিয়ান হলে অনুষ্ঠিত হয়। বহু আসরে শঙ্কিত উদ্বুদ্ধ শিল্পীদের গান শোনানো হয়েছিল। এ সম্মেলনের শিল্পী তালিকা সম্পর্কে বৈচিত্র্যের সন্ধান এরে যায়। উদ্বোধন হয় রাজীবলোচন সেন ঘোরাজ লহরা দিয়ে। সম্মেলনের সম্পাদক এন ঘোষ জানান সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ভেকল্যার পরিচালক সম্পাদক শ্রীকুমারিত ঘোষের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে এ রোম অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। এবং ত বছর আমরা পাখোয়াজ লহরার নামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হবে। সেই পাখোয়াজ লহরার মূলনীতির পরিচয় ওয়া যায়।

এদিন সেতার সেরে সোনান শিবানী ঘার্জি রাগ 'মারুবেহাগ'। প্রথম ঘোষার্জি পরে 'রাগেশ্রী' রাগ বাজিয়ে শোনান। ছুলার 'মালকোষ' রূপে পরিবেশন করেন ঘি দাস। আলাপ ও রূপ বিস্তারে চতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। দুজনের সঙ্গতে সরোদে আরকী-কমারা' বাজিয়ে প্রবীণের সঙ্গে মূর্ছনার রূপ ফুটিয়ে তোল। ছুলা ঘনার্জির তবলা সুন্দর সঙ্গতের।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল সারা-প্রধানী। প্রথমে শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় নিবদ্ধ। কণ্ঠস্বর মনে হয় না কোন একজন শিল্পী একাই চল্লিশজনের মুখ দিচ্ছেন। মানের সময়ে 'ইমন' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান শ্যামলী চক্রবর্তী। পরিবেশনায় মুন্সে ভাল লেগেছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা কিছুদিন যাবতীয় রাগসঙ্গীত শিক্ষালাভ করছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই সম্মেলনে। এখানে আমি আমার যাঁর আলোচনা করছি যিনি মর্মাইনো অরোরে 'সরবাহারী কানাড়া' রাগে আলাপ ও চলন-নলনে' রাগে গৎ বাজিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করে। অনুষ্ঠান তাঁর হাতের স্পর্শে। লয় ও মাত্রাজ্ঞান অটলের প্রখর। দিলীপ চক্রবর্তীর 'তোড়ি-কানাড়া' রাগের খেয়াল অনুষ্ঠানটি অনবদ্য। রাগরূপ প্রকাশভঙ্গী ও সুক্ষ্ম গলার কারুকাজটুকু মনে রাখার মত। 'সোরঙ্গী ভৈরব' ও 'ভৈরবী' রাগে বেহালা বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছেন বি. এন. মোহান্তী। প্রবোধ মানার্জির 'রাগেশ্রী' রূপে খেয়াল ও ঠুংরী প্রশংসনীয়। রাগরূপে মিশ্র 'মাঝিরী ভৈরো' রাগে খেয়াল অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী। রাগেশ্রীর শিল্পী-রূপ মন্তব্যপীঠে পরিবেশন করেন 'রাগ-মালার'। অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পাশের ঘরে ও মাইকীয়ের সরাবেশ উপভোগ শিক্ষার নিবন্ধন পাওয়া যায় মাত্র চার্টার্জির তবলা বাদ্যের মধ্যে। বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত রামকু মহারাজ, সলিল চার্টার্জি, সন্দীপ সেন, প্রকাশ মহারাজ, হিমিরবরণ গুপ্ত।

ইন্দ্রপুরে জয়ন্তীর চিরস্মরণী অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিস্ট বিভাগ আয়োজিত লীরকালীন উৎসব আসরের আকর্ষণ ছিল তবীন্দ্রসদনে ইন্দ্রপুরে জয়ন্তীর দুই কণ্ঠাধারী এক মুহূর্তীনাট্যানুষ্ঠান। শ্রীমতী দুর্গা গুহঠাকুরতা পরিচালিত ইন্দ্রপুরে জয়ন্তীর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যাশ্রিত মুহূর্তীনাট্যটি। এ সম্বন্ধে নতুন কোন পরিচয়দান নিষ্প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত এবং সুনির্বাচিত শিল্পীদের সুপরিবেশিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের অনিবার্য আকর্ষণ যে কোন সম্প্রদায়কে প্রসারের পথে তুলতে পারে। সেদিনের সন্ধ্যাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৈদিক স্তোত্র দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয় এবং তার সঙ্গে ভাবসাম্য রেখেই পরিবেশিত অভিনয়ের প্রথমটি অংশের মন ভুলান আদি পরম সুন্দর।

এর পরই শিল্পীদের বিভিন্ন বেশের সজ্জা ও পটের অপরূপের পর মেয়ে দর্শকচিত্তের পরিচয়ন সুরু। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন পল্লী, আসাম, হিমাচলপ্রদেশ, পূর্ববঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের পর বাংলার ঘুমপাড়ানি সজল হাওয়ার স্পর্শ অনুভূত হয় কীর্তন ও বাউলের সুরের-উৎসের ধারায়। প্রতি প্রদেশের স্থানীয়রূপ পরিবেশন মুখে এক বিশিষ্টতা আমাদের পরিচিত হয়ে উঠল। কিন্তু বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে এদেরের নতুন সংযোজনা—পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য। সবের মত প্রতি প্রদেশেরই তালে ও ছন্দেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। মৃদঙ্গ, খোল, ডুবকা, ঢাক এবং আরো অনেক তালবাদ্য বাদ্যের পরিচালনার কৌশল, ঝঙ্কার, বিভিন্নের বিভিন্ন রূপে প্রতিটি অঙ্গ যেন মুখর হয়ে ওঠে। প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আমার চেয়েও সকল ছন্দের একটা সমন্বয় ধারা প্রবাহমান রেখে ছিলেন এবং প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শকচিত্তের কৌতূহল জাগ্রত ছিল। প্রায় দু ঘন্টার আগ ব্যাপকতা মিউজিক সংকলন অবীন্দ্রসদনে পলকটি মুদি ও নিম্ন আলোকের এক সৈত মূর্ছনার ও ছন্দাবাদনের অনুষ্ঠান অবোহণ, আলোক অনুষ্ঠান তবেই এক পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। ভবিষ্যতে বঙ্কিম ভারতীয় তালবাদ্যও এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে দুর্গা গুহঠাকুরতা জানিয়েছেন। উপযোগিতা ছাড়াও শিক্ষামূলক দিকটি এ অনুষ্ঠানের উপরিপাওনা। এই ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা পরস্পরের কাছাকাছি আসবার সুযোগ পান।

—চিত্রাঙ্গদা

ওস্তাদ আবাউদ্দীন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

(ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল এক্ট অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড অনুমোদিত)

অভিজ্ঞ শিক্ষকবর্গ—বৈজ্ঞানিক পাঠক্রম

নিম্নে ভর্তির ফিসের হার নিম্নে দেওয়া হইল।

বাদ্যের অন্তরে ছোট সঙ্গীতজ্ঞ-সেক্রেটারী

শ্রীঅজয় সিংহরায়—প্রোপ্রাইটর

শ্রীহরিদাস বিশ্বাস—সেক্রেটারী

ভোজিত হেয়ার নার্সারি এণ্ড কিণ্ডার গার্টেন

২০৩, আপার সার্কুলার রোড, নতুন পল্লী, সাতগাছিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ—২৮

খেলার কথা টেস্ট ক্রিকেটে বোলিং পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—প্রধানত এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট খেলার প্রাধান্য লাভ করতে হলে দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কেই যে ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে সমান দক্ষতা দেখাতে হবে, এমন কথার তাদের চোকস হাতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কারণ সকল ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে খেলার এতগুলি বিষয়ে চরম উৎকর্ষতা লাভ সম্ভব নয়। তবে দলকে অবশ্যই চৌকস হতে হবে। বলা সকল দলের ছয় জন খেলোয়াড় থাকবে—ব্যাটসম্যান, বোলার এবং উইকেট-কিপার। এবং বলের এমন ছয় জন খেলোয়াড়েরই ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা থাকবে। খেলার এই প্রধান তিনটি বিষয়ের সমগুরুত্ব দেওয়া হলে দল গঠন যে অনেক দল দুর্বল হবে এবং সেই দুর্বল দলের খেলা দেখতে কারও মন চাইবে না।

ক্রিকেট খেলার আনুষ্ঠানিক মহলে এবং সংবাদ পত্রপত্রিকার ব্যাটসম্যানরা যে পরিমাণ সমাদৃত হয়, বোলাররা সে তুলনায় কিছুই পায় না। রানারানে উঁচুদরের ছয়টি বোলারও ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে উল্লেখিত। অথচ ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানদের তুলনায় বোলারদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলোচ্য নিবন্ধে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বোলারদের বিভিন্ন ধরনের সাফল্য পরিসংখ্যান আকারে পরিবেশিত হল।

টেস্টের বোলিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড

টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট : ৩৩৭টি—ডেনী ইয়ান (ইংলণ্ড)—খেলা ৬৭, বল ১৫১৭৮, মেডেন ৫৪১, রান ৬৬২৩, গড় ২১·৬৪, এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ১৭ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ৩ বার।

ডেনী ইয়ান (ইংলণ্ড)

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

১০টি উইকেট (৫০ রানে)—জিম লেকার (ইংলণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যানচেস্টার, ১৯৫৬

জাফর আলভাম (ইংলণ্ড)

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৯টি উইকেট (৯০ রানে)—জিম লেকার (ইংলণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যানচেস্টার, ১৯৫৬

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

(৪টি টেস্ট খেলা নিয়ে সিরিজ)

৩৯টি উইকেট (৫০৪ রানে)—সিডনি বার্নেস (ইংলণ্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯১০-১৯ (খেলা ৪, বল ১০৩৬, মেডেন ৪৬, রান ৫০৪, গড় ১০·১০, এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ৭ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ৩ বার)

(৫টি টেস্ট খেলা নিয়ে সিরিজ)

৪৬টি উইকেট (৪৪২ রানে)—জিম লেকার (ইংলণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৬ (খেলা ৫, বল ১৭০০, মেডেন ১৪৭, রান ৪৪২, গড় ৯·৬০, এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ৪ বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ২ বার)

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান

৪৮৮টি রান (১৮ ওভারে)—সনি রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে ইংলণ্ড, বার্মিংহাম, ১৯৫৭

একটি খেলায় সর্বাধিক রান

৭৭৪টি রান (১ম ইনিংসে ৩১ ওভার এবং ২য় ইনিংসে ১৮ ওভার)—সনি রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে ইংলণ্ড, বার্মিংহাম, ১৯৫৭

খেলোয়াড়-জীবনে সেরা বোলিং

১৮৯টি উইকেট ৩১০৬ রানে (১৬·৪০ রান প্রতি উইকেটে)—সিডনি বার্নেস (ইংলণ্ড), ২৭টি টেস্ট খেলায়।

এক ইনিংসে সেরা বোলিং

(৫ উইকেট পাওয়ার রিপ্লিতে)

৫ উইকেট ২ রানে—আর এইচ চ্যাপম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ক্যামব্রিজ, ক্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮

একটি খেলায় সেরা বোলিং

(১০ উইকেট পাওয়ার রিপ্লিতে)

১৫ উইকেট ৪৮ রানে (প্রতি উইকেটে ৩·২০ রান)—জন রিপস (ইংলণ্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, কেপটাউন, ১৮৮৮-৮৯। রিপস ১৪ জনকে বোল্ড এবং একজনকে এল বি ডব্লিউ করেন।

এক সিরিজে সেরা বোলিং

৩৪ উইকেট ৪০০ রানে (প্রতি উইকেটে ৩·৮৩ রান)—ডি এ নোহমান (ইংলণ্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৩৩-৩৪। (খেলা ৩, বল ৫৯০ মেডেন ৩৮, এক ইনিংসে ৩ উইকেট

ফ্রাঁচ বেসে (অস্ট্রেলিয়া)

রে লিন্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া)

পান ৪ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট পান ২ বার)

বোলিংয়ের এক ইনিংসে ৫ উইকেট লাভ ৩ বার (২৭টি টেস্টে)—সিডনি বার্নেস (ইংলান্ড)

বোলিংয়ের একটি খেলায় ১০ উইকেট লাভ ২ বার (২৭টি টেস্টে)—সিডনি বার্নেস (ইংলান্ড)

১ বার (৩৭টি টেস্টে)—সি ভি গ্রিমেট (অস্ট্রেলিয়া)

একটি টেস্ট সিরিজে ৩০ উইকেট

১৭টি (গড় ১০-১০)—সিডনি বার্নেস (ইংলান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯১০-১৪

৩৫টি (গড় ৯-৪০)—জিম লেকার (ইংলান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৬

৩৪টি (গড় ১৪-৫১)—সি ভি গ্রিমেট (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৩৫-৩৬

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত মাত্র ৭ জন খেলোয়াড় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অস্ট্রেলিয়ার ৪ জন এবং ইংলান্ডের ৩ জন খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ছাঁটাই বিষয়ে সকল খেলোয়াড়ের চেয়ে দিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে তিনিই সর্বাপেক্ষা কম বয়সে ১০০ এবং ২০০ উইকেট পূর্ণ

অ্যালেক বেডসার (ইংলান্ড)

করেন (৪২ বছর বয়সে ১০০তম এবং ৪৭ বছর বয়সে ২০০তম উইকেট পান)।

টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন বোলার—বিষণ্ন বেদী (৪৪টি খেলায় ৫২০০ রান দিয়ে ১৬৯ উইকেট এবং এরাপল্লী প্রসন্ন (২৯টি খেলায় ৩০৫৭ রান দিয়ে ১১০ উইকেট)

গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী (অস্ট্রেলিয়া)

একজন বোলার—অস্ট্রেলিয়ার টি জে ম্যাথুস (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯১২)।

টেস্ট খেলার প্রথম

প্রথম ম্যাচ। মেলবোর্নে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ ইংলান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার সূত্রেই পৃথিবীর ক্রিকেটে টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন। এই প্রথম টেস্ট খেলার সূচনা করেন অধিনায়ক প্রথম বল দেন ইংলান্ডের বোলার টি আর্মিটেজ।

প্রথম উইকেট লাভ। ইংলান্ডের ডিল অস্ট্রেলিয়ার এক উদ্বোধনে বোলড আউট করেন (মেলবোর্ন, ১৮৭৭)

প্রথম এক ইনিংসে ৫ উইকেট। ৩ উইকেট ৭৮ রানে—স্পিনউইলার (অস্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে ইংলান্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৭

প্রথম একটি খেলায় ১০ উইকেট। ১০

টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ উইকেট

		খেলা	রান	ওভার	মেডেন	উইকেট
ডেনিস লিলি	(ইং)	৬৭	১৩১৭৮	৩২১	৬৬৪৩	৩৩৭
ইয়ান বথাম	(ইং)	৭০	১৪০৭৬	৩১০	৬২৫৭	৩৫২
রিচি বেনো	(অ)	৬০	১১০১০	৮০৪	৬৭০৪	২৪৮
অ্যালেক বেডসার	(ইং)	৫১	১০১৪১	৩৭২	৩৮৭৬	২০৬
রে লিন্ডওয়াল	(অ)	৬১	১০৬৬৬	৪১৮	৪২৫৭	২৬৮
জেফ থ্রিমেট	(অ)	৩৭	১৪৫৭০	৭০৪	৩২০১	২১৬
গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি	(অ)	৩৪	১৩০৫২	৩১১	৩৬৪৫	২০৮

হ্যাটট্রিক

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এপর্যন্ত ১০ বার 'হ্যাটট্রিক' হয়েছে—ইংলান্ডের ৭ বার, অস্ট্রেলিয়ার ৬ বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ বার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১ বার। দুবার করে 'হ্যাটট্রিক' করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—অস্ট্রেলিয়ার এইচ ট্রাম্বল এবং টি জে ম্যাথুস। একটি খেলার উভয় ইনিংসে

উইকেট (৪৮ রানে ৬ ও ৬২ রানে ৭)—এক আর স্পকোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংলান্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৯

প্রথম একটি সিরিজে ৫০ উইকেট। ৫৪ উইকেট ৫২২ রানে (৪টি টেস্টে)—জি ই পামার (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংলান্ড, ১৮৮১-৮২

প্রথম একটি সিরিজে ৩০ উইকেট। ৩২

এরাপল্লী প্রসন্ন (ভারতবর্ষ)

—টি রিচার্ডসন (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৯৪-৯৫

প্রথম একটি ইনিংসে ৪০ উইকেট। ৪৯ উইকেট ৪০৬ রানে (৪টি টেস্টে) —সিডনি বার্নেস (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯১০-১৪

প্রথম 'হ্যাটট্রিক'। এফ আর স্পোফর্থ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মেলবোর্ন, ১৮৭৮-৭৯।

বোলিংয়ের অন্যান্য রেকর্ড

সর্বাধিক উইকেট লাভ

১৬৪টি ৫২০৫ রানে (৪৪টি টেস্টে)—ফ্রিড্ টুমকেন

সর্বাধিক উইকেট একটি সিরিজে

৩৪টি (৪৭১ রানে)—ফ্রিড্ ট্রামকেন, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩১-৩২

৩৪টি (৬৬১ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৬-৫৬

সর্বাধিক উইকেট এক ইনিংসে

১টি (৫১ রানে)—জেম্ পাইক্রফট, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, ১৯৩১-৩২

১টি (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

সর্বাধিক উইকেট একটি খেলায়

১৪টি (১৪৪ রানে)—জেম্ পাইক্রফট, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৩১-৩২

টেস্টে ইমরানের সাফল্য

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইমরান তাঁর টেস্ট ক্রিকেট-খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেন—৪টি টেস্ট খেলায় মোট ৩১টি উইকেট (গড় ১৩·৩১)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে মাদ্রাজ্জীয়ের এক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮·৪ ওভার বল দিয়ে ৩১ রানের বিনিময়ে ৮ উইকেট হারিয়েছিলেন।

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট। ৩৪টি (৫টি টেস্টে), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৬০

বোলিংয়ে অন্যান্য রেকর্ড। ১১টি বল করে কোন রান না দিয়ে ৪টি উইকেট

জেম্ পাইক্রফ (ভারতবর্ষ)

পান (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে, এডেনগার্ডেন, ১৯৬০)

১০০তম উইকেট। ১৯৫৮-৫৯ সালে ক্রাইস্টচার্চের প্রথম টেস্টে মিউজিলায়ান্ডের ই সি পেল্লিউকে এল বি ডব্লিউ করে তাঁর ৫৩তম টেস্ট খেলায় তিনি তাঁর ১০০তম টেস্ট উইকেটটি পান।

২০০তম উইকেট। ১৯৬২ সালে লর্ডস মাঠে পাকিস্তানের জাভেদ বার্কিকে আউট করে তাঁর ৪৭তম টেস্ট খেলায় ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত যে ৭ জন বোলার ২০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমরান সর্বাপেক্ষা কম বল দিয়ে ২০০তম উইকেট পান। টেস্ট খেলায় ২০০ উইকেট পূর্ণ করতে ইমরানকে

সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ)

১,৮৭৪টি বল দিতে হয়েছিল। অপরদিকে অন্য বোলারদের এক হাজারের বেশী বল দিয়ে তাঁদের ২০০ উইকেট পূর্ণ করেন।

৩০০তম উইকেট। ১৯৬৪ সালে ওভালের ৪র্থ টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার নীল হকেকে আউট করে তাঁর ৬৫তম টেস্ট খেলায় তিনি তাঁর ৩০০তম উইকেটটি পান। এখানে উল্লেখ, এপর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইমরানই একমাত্র ৩০০ উইকেট পেয়েছেন।

বিশ্ব রেকর্ডের মূল্য। ১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডের জিম লেকার এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার সূত্রে টেস্ট খেলায় যে বিশ্বরেকর্ড করেন তার মূল্য।

একনজরে ইমরানের টেস্ট উইকেট

বিপক্ষে	খেলা	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
অস্ট্রেলিয়া	১১	৪৪৩·১	৮৩	১১৯১	৭১	২৬·০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪	২১৫·৩	৩৩	৬২০	২৭	২২·৯৬
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৮	৭৬৪	১৭৬	২০১৮	৮৬	২৩·৪৬
নিউজিলায়ান্ড	১১	৩৪১·১	১১০	৭৪২	৪০	১৯·০০
ভারতবর্ষ	১	২১৭·২	৭৮	৭৮৭	৪০	১৯·৬৪
পাকিস্তান	৪	১৬৪·৪	৩৭	৪০১	১২	১৯·১৩
মোট	৫৭	২৪৪৮	৫২২	৬৬৭৩	৩০৭	২১·৭৬

খেলাধুলা

সম্পাদক

ডুরান্ড কাপ

১৯৬১ সালের ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য ৮০ হাজার দর্শক সমবেত হয়েছিল। খেলার ফলাফল ১—০ গোলে ৮ম বাহিনীর বিরুদ্ধে রয়াল সিকিউরিটি ফোর্স দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ১৯৬৬ সালের ফাইনালে ৪—০ গোলে শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে পরাজিত করে গোর্খা রিফেল দল প্রথম ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার এক দিকের সেমি-ফাইনালে গোর্খা রিফেল দল ১—০ গোলে ব্রাভ পুলিশকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেছিল। অপর দিকে মোহনবাগান মাঠে রয়াল সিকিউরিটি ফোর্স দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটি ২—০ ও ২—২ গোলে ড্র যায়। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় এই অজুহাতে যে, এরিয়ান মোহনবাগানের দুই ফরোয়ার্ড খেলে আসায় তাদের পক্ষে দল গঠন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬১ সালের ডুরান্ড কাপ বিজয়ী ইন্টেলিজেন্স দল ফাইনালে ০—১ গোলে অসমবল পাঞ্জাব পুলিশ দলের কাছে হেরে যায়।

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতার সাউথ ক্লাবের সুরমা টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার খেলোয়াড়রা প্রথম চারটি খেতাব সমান ভাগ করে নিয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় প্রবীরেন্দ্রনাথ বর্তমান সময়ের এশিয়ান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন আন্দ্রেকলাভার মেদ্বেদেভকে (রাশিয়া) পরাজিত করে ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর প্রেমজিৎলাল এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মেদ্বেদেভের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। মহিলা ডবলস খেতাব লাভ করেন রাশিয়ার সুন্দরী আইয়ানোভা এবং ভারতবর্ষের প্রেমজিৎলাল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ১—৭, ৮—০, ৫—৭ ও ৮—০ গেমে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন এবং এক নম্বর বাছাই আন্দ্রেকলাভার মেদ্বেদেভকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : সুন্দরী আইয়ানোভা (রাশিয়া) ৬—২ ও ৮—৩ গেমে দ্বিতীয় বাছাই ইংলেরোভিচকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ১—৭, ৮—০ ও ৮—০ গেমে মোরব মিত্র এবং ললাম সিংকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। মাঝে বছর পর পুনরায় এই জুটি চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয়ী হলেন।

মিক্সড ডবলস : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন জুটি সুন্দরী আইয়ানোভা এবং আন্দ্রেকলাভার মেদ্বেদেভী (রাশিয়া) ১—৩ ও ৮—৪ গেমে সুন্দরী নীনা ইংলেরোভিচ এবং কাজুলিনকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি

বিহার : ৭৭ রান (তিলক রাজ ৪০। মোদী ১২ রানে ৪ এবং সুব্রত গুহ ৪০ রানে ৫ উইকেট)

ও ৬৪ রান (তিলক রাজ ১৮ রান। সুব্রত গুহ ৩০ রানে ৫ এবং মোদী ১০ রানে ৩ উইকেট)

অন্ধ্র : ২৬৯ রান (অন্ধ্র রাজ ১০০, শ্যামসুন্দর মিশ্র ৩২ এবং পি চেলম ৬১ রান। শুক্লা ৭৮ রানে ৪ উইকেট)

পাটনার মোজেফরপুর স্টেডিয়ামে আন্তঃজিলা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা এক ইনিংস ও ১২০ রানে বিহারকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের খেলায় চ্যাম্পিয়ন আখ্যা অর্জন করেছে।

প্রথম দিনে প্রতিপক্ষের কিছু পরেই বিহার দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৭ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে বাংলা ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করে ২৮ রানে এগিয়ে যায়। হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট। বাংলা দলের৩ খেলার সূচনা ভাল হয়নি; দলের ২৩ রানের মাথায় ৩য় এবং ১১ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৮৭ রানে অগ্রগামী হয়। ৬ষ্ঠ উইকেটে জুটিতে অধিনায়ক অন্ধ্র রাজ এবং পি চেলম দলের ১২০ রান তুলে নেন। বিহার এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৫১ রান তুলে বাকিদের সস্তায় পাঠিয়ে দেয়। ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে তখনও তাদের আরও ১২৮ রানের প্রয়োজন ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল মাত্র ৩টা উইকেট। ইনিংস মাত্র ১৩ মিনিট স্থায়ী ছিল। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ৬৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে বাংলা এক ইনিংস ; এবং ১২০ রানে জয়ী হয়।

গ্রান্ড ডেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত গ্রান্ড ডেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি অতিরিক্ত সময়েও গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলে উভয় দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সুটিং

আলীপুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কিলবিদ্যালয় রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে পাঞ্জাব চ্যাম্পিয়ন এবং কলকাতা রানার্স-আপ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান এই প্রথম।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষের দুই দলের কোনোটিই উঠতে পারেনি। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় যে সাতটি খেলা ড্রয়ে পরিণত করেছিল তাতে ভারতবর্ষের দুটি দল ছিল—রাজ এবং সিকে নীল দল। লীগ খেলার শেষে নকআউট পর্যায়ে (সেমি-ফাইনাল) উঠেছিল এই চারটি দল—ভারতবর্ষের দুটি, পশ্চিম জার্মানী এবং হল্যান্ড। ভারতবর্ষের রাজ নীল দল বনাম হল্যান্ডের প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। টসে হল্যান্ড জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ১—০ গোলে ভারতবর্ষের সিকে নীল দলকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পরিচালনী খেলোয়াড়রা রাজ নীল দলে খেলেছিলেন। টসে হল্যান্ডের কাছে তাদের পরাজয়কে সুকীর্তি বললে ভুল করা হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত ৮ বার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। হল্যান্ড অপরাজেয় পর্যায়ে। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ হল্যান্ডকে হারাতে পারছে না। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় এই দুই দেশের লীগের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় এবং সেমি-ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যেতে।

ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৩—০ গোলে হল্যান্ডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, মাত্র ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার পশ্চিম জার্মানী দল স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল এবং আলোচ্য আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার লীগ পর্যায়ের খেলায় হল্যান্ডের কাছে পশ্চিম জার্মানী ৩—১ গোলে হেরেছিল।

চূড়ান্ত অবস্থান : ১ম পশ্চিম জার্মানী, ২য় হল্যান্ড, ৩য় ভারতবর্ষ (সিকে নীল), ৪র্থ [illegible]

দাবার আসর

এবারের প্রথম খেলাটিতে সাদা জিতবার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি, যদিও সাদা যেন সুস্থভাবেই খেলছিল। কালো বিমি খেলেছিলেন, বিপজ্জনক খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম আছে, কিন্তু এ খেলায় তিনি কিছুই করতে পারেন নি। সাদা—সুজিত সেন, কালো—পূর্ণেন্দু বোস: জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশীপ, ১৯৬৯। ইংলিশ ওপনিং।

(১) ঘ—ঘ গ ৪ ঃ ঘ—ঘ ঘ ৪ (২) ঘ—ঘ ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘা ৩ (৩) ঘ—ঘা ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘা গ ৩ (৪) ঘ—ঘা ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘ ঘ ৩ (৫) ঘ—ঘ ২ ঃ ঘ—ঘা ২ (৬) ০—০ ঃ ০—০ (৭) ঘ—ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘ ৪ (৮) ঘ—ঘা ৩ ঃ ঘ—ঘা ঘ ৩ (৯) ঘ—ঘ ২ ঃ ঘ—ঘ ৩ (১০) ঘ—ঘা ২ ঃ ন—ঘ ১ (১১) ঘা ঘ—গ ১ ঃ ঘ—ঘ ঘ ৪ (১২) ঘ—ঘা ১ ঃ ঘ ঘমঘ (১৩) ঘমঘ ঃ নমঘ (১৪) ঘ—ঘ ৪ ঃ ন—ঘ ১ (১৫) ঘমঘ ঃ ঘমঘ (১৬) ঘমঘ ঃ গমঘ (১৭) নমঘ ঃ ঘ—গ ৩ (১৮) ঘ ন—গ ১ ঃ ঘ—ন ২ (১৯) ঘ—ঘা ৪ ঃ ঘ—ঘ ৩ (২০) ঘ—ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘ ১। ড্রিল নেওয়া।

[যদি (২০)...ন—ঘা ৪, তাহলে (২১) ঘ—ঘা ৩ এবং পরের চালে সৌজন্য—ন ৭।] (২১) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘ—ঘ ন ৪ (২২) ঘ—ঘা ২

[(২২) ঘ—ঘ ন ৩ ঃ গ—ন ৩ (২৩) ঘ—ঘ ৪ ঃ নমঘ (২৪) গমঘ ঃ ঘ—ন ৭ (২৫) ন—ন ১ ঃ ঘ—ঘ ৪ (২৬) নমঘ (৩) ঃ নমঘ (২৭) নমঘ ঃ ন—ঘ ৮ (২৮) ন গ—ঘ ৩ ঃ ন ঃ ঘ ১ (২৯) নমঘ ঃ ন (১)—গ ৮ (৩০) ঘ—ন ৪ ঃ নমঘ+ (৩১) গমঘ ঃ নমঘ+ (৩২) ঘা—গ ২ এবং সাদার জিত। কিন্তু ৩০নং চালের বদলে (২৯)...ঘ—ঘ ৩ চালটা ভাল নয়, কারণ (২৫) ঘমঘ ঃ গমঘ (২৬) ন (৩)—গ ৩ এবং কালোর ১টি ঘুঁটি মারা যায়।]

(২২)...গ—ন ৩ (২৩) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘ—ঘ ৩ (২৪) ন—ন ৩

[একটি আশাজনক চাল। এবার যদি (২৪)...ঘ—ঘ ২ (২৫) নমঘ+ ঃ রাজা (২৬) ঘ—ন ৩+ ঃ রা—ঘ ৪ (২৭) ঘ—ন ৪ মাৎ। কিন্তু এরপর খেলাটা যেভাবে এগুলো, তাতে কালোরও চান্স ছিল। (২৫) ন—ন ৩ চালের বদলে নন্দীটা পর ৪ ঘরে চললে আরো ভালো হোত বলে হয়, কারণ এই চালে ছয় কালোর ছক—৩ ঘরেরটা মারা পড়ে না হয় পরের চালে ঘ—ঘা ঘ ৩ ঘরে মাত্রাত্মকভাবে বসে যায়। সাদার নন্দী—নয় ৪ চালের উত্তরে কালো ঘোড়া—ঘোড়া ৪ ফিরে পাবে না কারণ তাহলে সাদার নন্দীটা রাজা—৩ ঘরে বসে যাবে।]

(২৪)...ন—ন ১ (২৫) নমঘ ঃ নমঘ (২৬) নমঘ+ ??

[(২৬) নমঘ ঃ ঘ—ঘ৭ (২৭) ন—ঘা ৩ এবং যদি এখন কালো (২৭)...ন—ন ১ চাল দিয়ে ভবিষ্যতে সাদার ঘোড়াটা ওপর দুই ঘোর করার চেষ্টা করে তাহলে সাদার

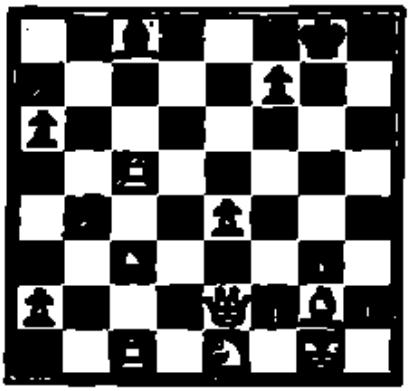

কালোর ২০ নং চাল ঘ-ঘ ১মের পরের অবস্থা

জিত কারণ (২৮) ন—ন ৪ ঃ ঘ—ঘ ৩ (২৯) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘ—ঘ ২ (৩০) ন—ন ৩ এবং কালোর হার। ২৭নং চালে কালো সৌকর্যটি না চাললেও একই কারণের কালোর হার হোত।]

(২৬) ঘমঘ+ (২৭) গমঘ ঘ+ ঃ রা—ন ১ (২৮) ঘ—ন ৬+ ঃ রা—ঘ ১ খেলা ড্র।

এইবার গত রাজ্যচ্যাম্পিয়নশীপের দুজনের খেলাটি দেখুন। সাদা—এসটীর রাহা, কালো—খোকন সেন। ফুইস্স ওপনিং। ড্রিলটুইস্ট।

(১) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘ—ঘ ৪ (২) ঘ—ঘ ঘ ৩

[সেন্টার থেকে কালোর ১টি ঘুঁড়ে নষ্ট করে দেবার জন্যে সাদা ঘ ঘ আক্রমণে নিজা ফেলে চেলে দিল। এবে ফলে ফুইস্স ওপনিং।]

(২)...ঘ—ঘা ৩ (৩) ঘ—ঘ ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘা ঘ ৩ (৪) ঘ—ঘ ৪ ঃ গ—ঘা ২ (৫) ঘ—গ ৩ ঃ ঘ ঘ—ঘ ২ (৬) ঘ—ঘা ৩ ঃ ০—০ (৭) ঘ—ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘ ৩ (৮) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘ—ঘা ৪ (৯) ঘমঘ ঃ ঘমঘ (১০) ঘমঘ ঃ ঘ—ঘ ৪ (১১) ঘমগ ঃ ঘমঘ (১২) ঘ—ঘ ঘ ৪ ঃ ঘমঘা ঘ (১৩) ঘ—ঘা ২ ঃ ন—ঘা ১ (১৪) ঘ—ঘা ন ৩ ঃ ঘ—ঘ ৩। পারস্পরিক সম্মতিক্রমে খেলা ড্র যদিও এখন অনেক চালে খেলা হতে পারত।

তৃতীয় খেলা হিসেবে উপস্থিত করছি দিল্লি জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশীপ সেমিফাইনাল রাউণ্ডের ত্রিকাণ্ডপক্কের ১টি খেলা। কিন্তু জুনিয়রশীপেই এই খেলাটি হয়েছিল। সাদা—উইকে, কালো—কাপুরত। ট্রাই লোপেজ।

(১) ঘ—ঘা ৪ ঃ ঘ—ঘা ৪ (২) ঘ—ঘা গ ৩ ঃ ঘ—ঘ গ ৩ (৩) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘ—ঘ ন ৩ (৪) ঘ—ন ৪ ঃ ঘ—গ ৩ (৫) ঘ—ঘ ৪ ঃ ঘমঘ (৬) ০—০ ঃ গ—ঘা ২ (৭) ঘ—ঘা ৩ ঃ ঘ—ঘ ৪ (৮) ঘমঘ ঃ ০—০ (৯) ঘ—গ ৩ ঃ ঘ—ঘ ৪ (১০) ঘমঘ ঃ ঘমঘ (১১) ঘমগ+ ঃ নমঘ (১২) ন—ঘা ১ ঃ ন—ঘা ১ (১৩) ঘ—ঘা ঘ ৩ ঃ ঘ—ঘ ৩ (১৪) ঘ—ন ৩? —ঘ—ঘ ৪ (১৫) ঘ—ঘ ২ ঃ ঘ—ন ৪ (১৭) ঘ—ঘা ২ ঃ ঘ—ঘ ৩ (১৮) ন—ন ২ ঃ গ—ঘ ৩ (১৯) ঘ—ঘা ঘ ৪ ঃ ঘমঘ (২০) ঘ—ঘ ২? ঃ নমঘ। সাদার হার স্বীকার।

• • •

অনুত্তর ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যার ৮৪৬ পৃষ্ঠার ছক হয়েছে যে সাদা ঘুঁড়ে পরপর রাখলে এবং সাদা রাজা ঘুঁড়েটির আগে থাকলে সাদার জিত হবে, সাদা রাজা এবং ঘুঁড়েটির মধ্যে ১ ঘরের ব্যবধান হয়ে থাকলেও। কথাটি ঠিকই, তবে এর ব্যতিক্রম ঘটে সৌকর্যের ঘরটি খেলায়। ছকের একেবারে প্রান্তে অবস্থিত ঘুঁড়ে অবশ্যই অন্যান্য সৌকার ঘরটিকে খেলায় হয়ে যায়।

—রাজেন্দ্র বোস

অনুত্তর পাবলিকেশন প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও অনুত্তর ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রসবের পর অপরিহার্য

প্রসবের পর জননীর ক্ষেত্রে পুনর্যৌবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন শক্তিশালী পুষ্টিকর টনিকের

এই অবস্থায় আয়ুর্বেদীয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট একত্রে সেবন করলে হৃত শক্তি ফিরে পাবে, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, দেহের ক্ষত পূরণ ও পুষ্টিসাধন হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে জননী পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও যৌবনোচিত কান্তি লাভে সক্ষম হন।

৮ আউন্স মাত্রার ১ বোতল মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ১ বোতল মৃত সঞ্জীবনী সহ পরিবার প্রসাধন একত্রে ৩ বার আহারের পর সেবনীয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(১ মাসের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৮

ডাঃ [illegible]
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম.এস.এম. (লক্ষ্ণৌ)
এম.বি.এম. (আয়ুর্বেদিক) ডাবলিন
কলেজের প্রসাধন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ডাঃ [illegible]
ডি.আই.এম.
এম.বি.বি.এস. কলিকাতা
আয়ুর্বেদাচার্য

BMM 4/69

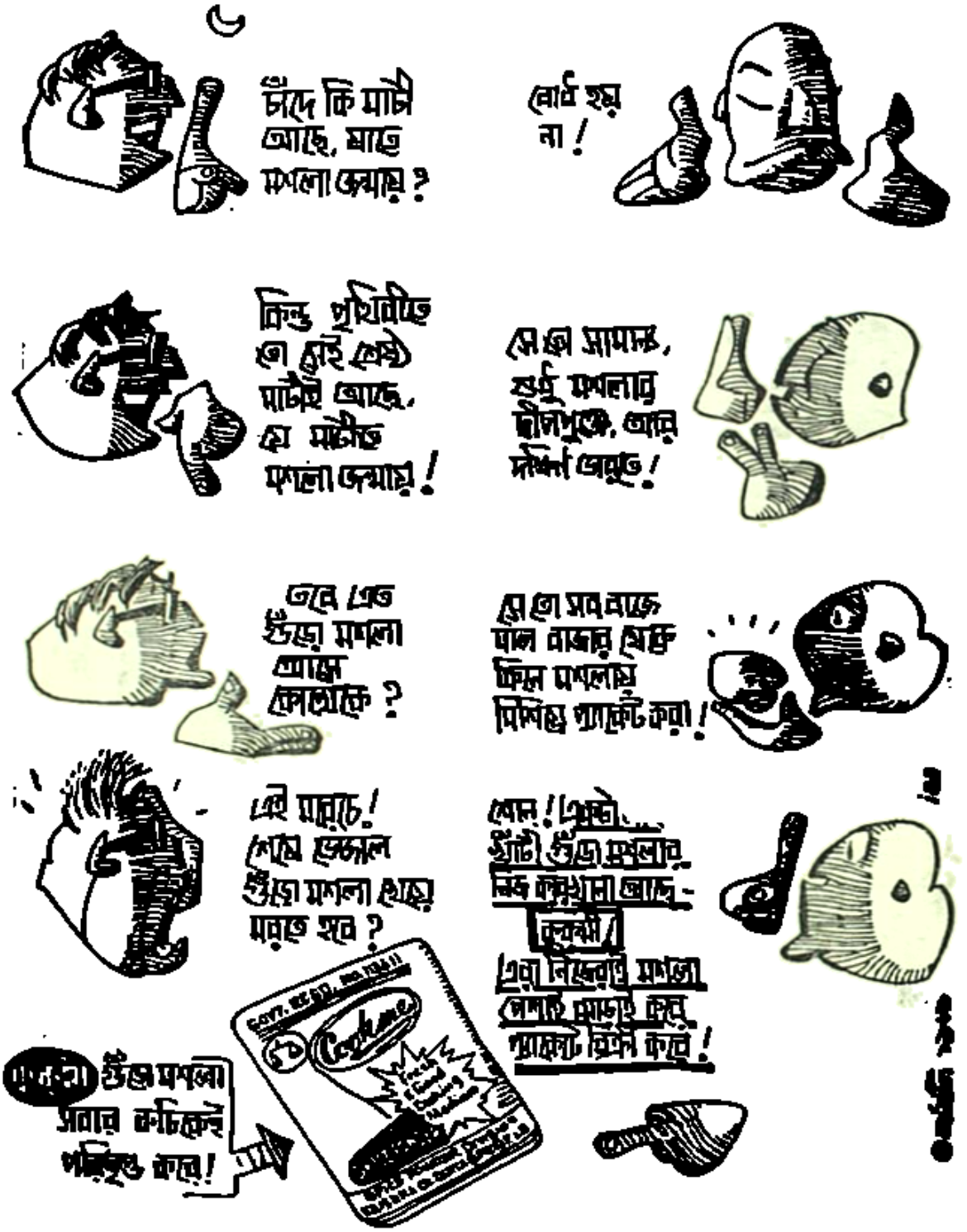
চাঁদে কি মাটী আছে, যাতে মশলা জন্মায়?
বোধ হয় না!
কিন্তু পৃথিবীতে তা ছাই যেই মাটীই আছে, যা মাটীতে মশলা জন্মায়!
সেরা সামান্য, শুধু মশলার দীলপুকে, আর দর্শিনা জন্মায়!
তবে এত গুঁড়ো মশলা আসে কোথাকে?
এত সব বাজে মাল বাজার থেকে কিনে মশলায় মিশিয়ে প্যাকেট করা!
এই মারছে! শেষে ভেজাল গুঁড়ো মশলা খেয়ে মরতে হবে?
দেখুন! এখন গাঁটি গুঁড়ো মশলার নিজ বক্তব্য আছে- তুলকী/ এরা নিজেরাই মশলা দেখে যাচাই করে প্যাকেট সিল করে!
Condiments
গুঁড়ো মশলা এবার রুচিকেই পরিবর্তন করে!

29 JAN 1970

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত কুকুমি—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ, ২০৫, মহর্ষি

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

(বর্ষ, ৫৪ খণ্ড, ৫৮শ সংখ্যা) শুক্রবার, ১২ই মাঘ, ১৩৭১ বাংলা [মূল্য ৪০ পয়সা

শীত

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সদা বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও

কুসুম কোমল

পাপড়ি পেলব ও

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সহজের মধ্য দিয়ে
নিজেদের সৌন্দর্য সম্প
সহজেই আধুনিকারা হ
এর প্রচেষ্টায় ব্রতী

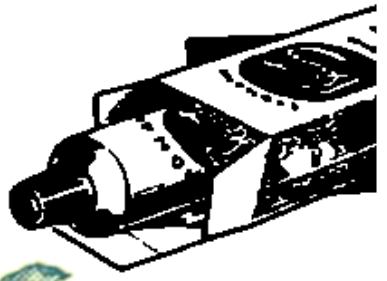

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

প্রসাধনের অপরিহার্য
অতি আধুনিক অবদা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-

নবীন ও প্রবীণ
শিল্পীদের
নতুন রেকর্ড সংকলন

এইচ এম ভি'র 'বসন্ত-বন্দনা'

৩০ আর-পি-এম সিঙ্গলস্

অজয় চক্রবর্তী
সোনার খাঁচাতে কাকন
কই গেল সেই দিনগুলি

অমল মুখোপাধ্যায়
টুসুরু টুসুরু
মনে হয় আবার আমি

অরুণ দত্ত
ওরে ও চম্পাকলি
যাবে ফিরে যা ফিরে

আরতি বসু
গুণ গুণ গুণ গুণ সুরেতে
এমনি করে আর কখনও

আরতি মুখোপাধ্যায়
না হলো চোখে দেখা
যেয়ো না যেয়ো না সখী

চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
সেই শান্ত ছায়ার ঘেরা
কিছু বোলো না

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
কে পরালো তোমায় মালা
মাটির খেলাঘরে শেষ

মমতা শংকর
পরেছি টাপাফুলে শাড়ী
মাথাতে কাকন হবে আমাকে

মুকুল দাশগুপ্তা
দ্বিতীয় দু'পাতের
মুকুল চক্রবর্তী
মাঝিরে খেলেছি মন
এক পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে
মলিনা ঘর চৌধুরী
আকাশের সবটা এখন কি
পলাশের কানে কানে

শ্যামল মিত্র
তোমাদের ভালোবাসা বন্ধুদের পাশ থেকে
দেখা হবে কি হবে না

শিপ্রা বসু
আমার মাঝেমাঝে
আহা কে মন ক'রে গেল

শৈলেন মুখোপাধ্যায়
চলে গেছে অনেক দূরে
তোমাকে কেবেছি আমি

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
শোন পক্ষোশিনি
তোমার মুখের কথা

সুধীর সেন
যদি ভুল কিছু করে থাকি
তুমি আমার প্রেম

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সবাই চলে গেছে
এমন একটা ঘর উঁচু

৮-পি রেকর্ড

উমা বসু (বাউল)
আজ ফাগুনের প্রথম দিনে
আকাশের চাঁদ মাটির দুলালে
চাঁদ কবে চাবেলী গো
জানালো পাড়ার পথে

অমল ঘোষাল (রবীন্দ্র-সঙ্গীত)
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
জীবনে পরম লগন
ভেবো না আমারে ভেবো না

জীবনময় রায় (রবীন্দ্র-সঙ্গীত)
ডুলিয়া যায় যায় একলা— যেথায়
আমি গাহন আমার— যাবেই
এ যান তরঙ্গে— হারাবে
তবুও জেনো— গোরী

রেজিনা ভট্টাচার্য (ভাষা-গান)
যা যা বলে আর ডাকব না
এমন দিন কি হবে না ভাবা
গড়া গড়া প্রভাতারি
মুক্ত কর যা মুক্তকেশী

লং প্লেয়িং রেকর্ড

'দি বেস্ট অব্ মমতা মুখোপাধ্যায়'

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(এ. এম. আই. গ্রামোফোন্ এজেন্ট)
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · মৌরাই · কানপুর

GC 5770 BEN

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনা কাগজের একদিকে পরিষ্কার অক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য লেখা বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না। অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠাবার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা সম্পাদনার পূর্ণ অধিকার সম্পাদক নিজের হাতে রাখেন। অমনোনীত রচনা সম্বন্ধে কোনো পত্রালাপ করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং যে কোনো বিষয়ের জানবার জন্য পত্র লিখুন।

গ্রাহকদের প্রতি

১। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে গ্রাহকের আগেকার ঠিকানা জানানো দরকার।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের টাকা নিম্নলিখিতভাবে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো দরকার।

চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক
ভারত	টাকা ১৪-০০	টাকা ৭-০০
পাকিস্তান	টাকা ১৩-০০	টাকা ৬-৫০
বিদেশ	টাকা ৩-০০	টাকা ৩-০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৩২৩১ (১৪ লাইন)

প্রবোধকুমার সান্যালের

গান্ধী

স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই জীবনী। এই বই না পড়লে মহাত্মা গান্ধীকে জানা সম্পূর্ণ হয় না। এক মহৎ জীবনকে উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য করে লেখা হয়েছে, যা প্রচলিত জীবনী-সাহিত্যের সন-তারিখের মালা নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা লেখকের ভাষা-বৈশিষ্ট্যে পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

মূল্য : ছয় টাকা

এস, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নতুন লেখকদের একমাত্র পত্রপত্রিকা

প্রতিশ্রুতি

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে

প্রতিশ্রুতিতে লেখকদের এই আসরে এখন থেকে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান সাহিত্যিকরাও যোগ দেবেন।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা এখন থেকে লিখছেন :

অন্নদাশঙ্কর রায়	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুবোধ ঘোষ	বিমল কর	প্রফুল্ল রায়
নবেন্দু বসু	শিবরাম চক্রবর্তী	রবি বসু
সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়	অমিয় চক্রবর্তী	নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়
সরোজকুমার রায়	বনফুল	সোমেন্দ্রনাথ বসু
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	শঙ্কর	অমিয় দাশগুপ্ত
শচীন চৌধুরী	সুধীন দে	দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
নরেন্দ্র দেবনাথ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রশান্ত রায়

প্রকাশক : সুবোধ ঘোষমজুমদার

সম্পাদক : প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য

যোগাযোগের ঠিকানা : ১২/১ লক্ষ্মীমুখ চৌধুরী লেন, কলি-৬১। ফোন : ৪৪-৫৮৮৪

বার্ষিক : ১৪ টাকা ষাণ্মাসিক : ৮ টাকা প্রতি সংখ্যা ৭০ নঃ পঃ

প্রকাশিত হল। এই সংখ্যা।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা থেকে যাঁরা নিয়মিত প্রকাশিত হবেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিস্তৃত উপন্যাস 'সেতারা হল' দ্বিতীয় সংখ্যার জন্যে লিখছেন। সুবোধ ঘোষ, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং ১২জন তরুণ-তরুণীর নতুন লেখা।

এছাড়াও কলিকাতা পাঁচ কপি (অগ্রিমমূল্য) ১৫ টাকা। দশ কপির ওপর ৩০%। ডাকমাশুল সমেত টাকা পাঠাতে হবে। ভি-পি-পি করা হবে না। নমুনা সংখ্যার জন্য ৭০ নঃ পঃ ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

বিনোদনের বই

প্রকৃত বিপ্লবী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
'কলমী জীবনের স্মৃতিকথা

বিপ্লবের সন্ধানে ১০·০০

সন্তোষকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস

মরুবাসী ৪·০০
সুখেকপোতী ৩·০০
সোনালতা ৪·০০
মরুমিতা ৬·০০
জীবনে প্রথম প্রেম ৪·৫০
পরিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে
নীরু আম্মাদের অমর কাহিনী

চাহার দরবেশ ৩·৫০

সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্পের কাহিনীরূপ

অরণ্যপুরুষ ৪·০০
কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
পুরুষিকা ৩·২৫
সুশীল জানার উপন্যাস
বেলাভূমির গান ৬·০০
সুবীরাম ৩·৭৫
দিলীপ সরকারের উপন্যাস
গিরিকন্যা ২·৫০
অমল মিত্রের স্মৃতিচিত্রণ

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ঃ ১ম ১১·০০

হেমেন্দ্র মিত্রের রহস্য-উপন্যাস

গোয়েন্দা হলেন
পরাশর বর্মা ৪·৫০
রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস
কনখল ৭·০০
শৈলজা গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্রণ
চলমান জীবন ঃ প্রথম ৫·০০
পুণ্যের হাজার উপন্যাস

প্রখীন্দ্র দেশ'র ৬·০০

ই. এম. ফার্স্টারের উপন্যাস

কেরল সিংহম্ ৬·০০
হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাস ও স্মৃতিচিত্রণ

পথে প্রান্তরে
[প্রথম পর্ব ৩·৫০ দ্বিতীয় পর্ব ৪·৫০]

বেলার নায়না ঝাকোবিন ৩·৫০

বশাইডব্লার ঘাটি ৩·০০

বিনোদন লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ৯ কলিকাতা ৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৪৭

UNIVERSITY

১৯ বর্ষ
৩৯ সংখ্যা

অমৃত

৩৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 30th January, 1970 শুক্রবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১০১৬	বিবিধ		
১০১৪	শাদা চোখে		—শ্রীসমদর্শী
১০১৭	অমৃত সেবাশ্রী		
১০১৮	সেলোমিলেসে		
১০১৮	বাণিজ্য		—শ্রীকালী খাঁ
১০২১	সম্পাদকীয়		
১০২২	সাহিত্যিকদের চোখে আমাদের সমাজ		- শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১০২৬	সেরাদিনের গল্প	(গল্প)	—শ্রীঅমিয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
১০২৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅরুণকুমার
১০৩২	পূর্ব আফ্রিকার ডায়েরীপাতা		—শ্রীসাংবাদিক
১০৩৩	প্রেমের কথা		—শ্রীমনোবিদ
১০৩৫	সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আমাদের (স্মৃতিচিত্রণ)		- শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
১০৩৮	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅমীন গঙ্গোপাধ্যায়
১০৪০	সেদ্ধবের পত্র	(গল্প)	—শ্রীসন্তোষ দে
১০৪৪	অশ্বকারের মুখ	(উপন্যাস)	—শ্রীরেবেকা মেরেরী
১০৪৯	পাহাড়ের মেয়েরা		—শ্রীসুরেন্দ্র গুহ
১০৫২	নাগপঞ্চমীর ইতিকথা		—শ্রীসাম্বিদ্
১০৫৬	পুরে মেঘ	(কবিতা)	—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
১০৫৬	নারীর নির্যাতনের অভিযোগ	(কবিতা)	—শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক
১০৫৭	মেঘেদের সমাজ	(উপন্যাস)	—শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
১০৬০	ভূতের ভয়		—শ্রীসুনীল চক্রবর্তী
১০৬১	নিজের হাজার ঘাঁস	(স্মৃতিচিত্রণ)	—শ্রীঅমীন চৌধুরী
১০৬৪	প্রবাসী পাঠিকা		—শ্রীচিত্রবাসিক
১০৬৬	গাছের	(কবিতা)	—শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
১০৭১	নারায়ণগঞ্জ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সম্মান		
১০৭২	গোয়েন্দা কবি পরাশর		—শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীঅমল চক্রবর্তী চিত্রিত
১০৭৩	মেয়েরাষ্ট্রে		—শ্রীঅবনত
১০৭৫	অন্তরঙ্গ		—শ্রীঅরুণাভ
১০৭৭	প্রেমপত্র		—শ্রীঅমলীন
১০৭৪	খেলার কথা		—শ্রীঅমল ভট্টাচার্য
১০৮৬	গানের আসর		—শ্রীঅমানন্দ ঘোষ
১০৮৭	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীমতী বিনোদ যাদব

চিঠিপত্র

সাহিত্যিকের চোখে ।
সাংবাদিকতার রীতি

অমৃতের ৩৭শ সংখ্যায় আমার সম্বন্ধে করে দুর্গাপুরের প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে "সাহিত্যিকের চোখে। সাংবাদিকতার রীতি" শিরোনামায় একটি চিঠি লিখেছেন। "সাংবাদিকতার রীতি" অনুসারে পত্রলেখকের প্রয়োজন না করে তিনি আমার একটি লেখার প্রসঙ্গে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। "সাংবাদিকতার রীতিবিরোধী এবং কতগুলি অনৈতিক আচরণও (অন-এথিকাল)"। পত্রলেখক "সুদীর্ঘ এক আলোচনার শেষে" তিনি "অবাক" হয়েছেন। পত্রলেখক কিসে "অবাক" হয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়, কেননা, "তার যৌক্তিকতা নিয়ে" তিনি কিছু বলতে চান নি। তাঁর "সুদীর্ঘ আলোচনার" কতক অংশের "অমৃতের কিছার এবং তার লেখক-লেখক ঘটে) উপর কটাক্ষপাত করা" হয়েছে। তাঁর মতে সাংবাদিক-রীতিবিরোধী এবং অন-এথিকাল।

আমার কথা, আমার এথিকালের জ্ঞান কি-এ পর্যন্ত আছি। সেই সম্পর্কে জানতে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটি নিবেদন জানাই। অমৃতের কিছার এবং লেখকদের এপর কটাক্ষপাত একটা আঁতকোচ। লেখার "যৌক্তিকতা" নিয়ে সেখানে কিছু বললেন না, সেখানে এই ইঙ্গিত কি চেপাটির "অযৌক্তিকতা" প্রতিপন্ন করেই বলা হল না? অনেকেই বলেন আমার লেখাটি পড়ুন কি তখন এইরকম পাঠকের তাঁদের মত বিদ্রূপ করা কি এথিকাল? না, এ তাঁর সাংবাদিকতার রীতিসম্মত? তিনি সেখানে আমার কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে চেয়েছেন আমি লেখাটি তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলাম কিনা এবং তাঁরা ছাপবেন না অমিয়েছেন কি না সেখানে সেসবের আলোচনা নেই। কিন্তু অমৃত কর্তৃপক্ষের অনুরোধের আলোচনা না হেতেই তিনি সেখানে "তা যাঁর না হয়ে থাকে" বলে সেখ পত্রলেখকে যে ভার বিদেন তা থেকে এথিকাল-সম্মত জানানে চিন্তাকরা থাকবে। "অনৈতিকতা" মন্তব্যটি নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়। আমা যাঁর, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তা মনে হয়।

আমার নিবেদন দুর্ভাগ্যক্রমে অমৃতের আমি সাহিত্যসম্পাদক মাত্রই দুষ্টি এবং আমিও তার নিয়মিত "কৌতূহলী" পাঠক। প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এমন কথার ইঙ্গিত করেন নি যে, এর সঙ্গে আমার কোন ধরনী সম্পর্ক আছে। এমন আচরণও আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি পত্রলেখকে যে "সুদীর্ঘ আলোচনা" করেছি তা সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিগত নিয়েই। পত্রলেখকের বিক্ষোভটির মূল "দৃষ্টি-পার্থক্য"। প্রসাদবাবু, মনেকরেছেন, সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে লেখকের কি বলা বা আলোচনার হবে তার ওপর দৃষ্টিভঙ্গি করে মুখে নেওয়াই "সাংবাদিকতার" উদ্দেশ্য। পত্রলেখকমহাশয়ের প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, সাহিত্য-আলোচনার কোনো আদা-চাড়ীর নেই, কোন একটি পত্র কোন প্রসঙ্গের অবতারণা ও আলোচনা হবে থাকলে পত্রলেখক সে আলোচনা করবার পরে কোনো বাধা থাকতে পারে না: বরং তা হলেই বিষয়টির আলোচনা, সার্থক হয়ে ওঠে। সম্পাদ সূত্রে যাঁর জেনে যাঁর যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ থাকে তবে এইটুই প্রত্যাশিত যে, তার প্রতিবাদ বা সমর্থন সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশ দেওয়া হবে এবং এই নাম প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেরাই "সাংবাদিক-রীতিসম্মত।" কিন্তু সেক্ষেত্রেও একই প্রসঙ্গ. যাঁর বা সংস্থা, একনাক বিবৃতি বক্স ইঙ্গিতসৌজন্য হয়ে ওঠে তখন তার আলোচনায় বা সমালোচনা সাংবাদিক-রীতি-বিরুদ্ধ নয়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার "প্রকাশকের দুর্ভাগ্যিক" সংবাদের সূত্রে বহু প্রসঙ্গ করার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তা যদি এড়িয়ে গিয়ে থাকে সে অপরাধ আমার নয়।

আমার আলোচনা, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যসম্পাদক ও সংবাদপত্র এবং প্রতিবাদ ও আলোচনা একরকম করে দেখেছেন। আমি তো কোনো প্রতিবাদ করিনি, সাহিত্যক্ষেত্রে উত্থাপিত একটি আদি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের আলোচনা করেছি এবং যাঁদের নিয়ে করেছি তাঁদের নিমন্ত্রণও। তাঁরা সকলে বাংলা সাহিত্যের এক সময় বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁরাই মান্য জন: সেখানে তাঁরা ইঙ্গসাহিত্যিক। অমৃতে যে বিষয়টির-ওপর লেখা প্রকাশ করেছেন ও করেছেন সে বিষয়টি আলোচনার দৃষ্টির নিশ্চয়ই তাঁদের। জেনো, বলেছি, এ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কিন্তু মৌখায় তা সাধারণের এত অনুরূপ তা সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে গেল এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সর্বজনীনতা বরণী প্রয়োজন এমন কথা লেখাও নয়। "অমৃতবর্ষে" আমি প্রত্যেকবারের লেখা লেখিয়েছি, "প্রবাসী"তে লেখেছিলাম, "ভারতবর্ষ" যাঁর লেখা সূত্রেও যাঁরা করেছেন, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বা শরৎসাহিত্য সম্পর্কে সবিস্তৃত "ভারতবর্ষে" লেখা করেই "সাংবাদিক-রীতি-সম্মত" (সাহিত্যিক-রীতিসম্মত নয়) তবে তা এথিকাল হত, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এমন কথা বলবেন না। সাহিত্যের এই বিস্তার স্বীকৃত না হলে লেখকসমিতির, পাঠকের, বিষয়ের মূল্যে, চিরন্তন যাঁর যাঁর আসন ছেড়ে জনরুচিতে এবং ভারতীয়ের মনোভূমিতে আসন পাতবে পারবেন না।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও তাঁর নামের পাশাপাশি থেকে তাঁর নিয়ে স্মরি. তিনি একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং এথিকাল-সচেতন সাহিত্যিক। তাই তাঁর কাছে আমার-সহায়ী-সকলী হিসেবে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে উপস্থিত করতে চাই। 'এডাল-সেকাল' 'বাঙালীর বাহুবল এবং হিন্দুত্ব' প্রভৃতি বিষয়ে শিশিরকুমার-বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বিতর্ক একটু ভাল আয়ন করলেই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় খুঁজে পাবেন। তালিকার অন্যান্যরও অভাব নেই। অতএব আমার নিবেদন, অমৃতের সাহিত্যালোচনা যদি আমি পত্রান্তরে বিস্তারিত করে থাকি (প্রতিবাদ নয়) তবে তা অমৃতের সাহিত্যিক লক্ষ্যকেই, অর্থাৎ সকল সাহিত্যের লক্ষ্যকেই বহুদূর নিয়েছি। আমার অন্তর বিশ্বাস, আমাদের বাংলা-সাহিত্য এই বিষয়টির আলোচনায় তার স্বাস্থ্যসম্মত করে এসেছে। সম্প্রতিক দৃষ্টান্তের মধ্যে "অশ্লীলতা" "অশ্লীলতা" সম্পর্কে সর্বজনীন বিতর্কের উল্লেখ করা যায়। বিশেষ একটি সম্প্রতিকে একজন বা এক ভেদেরীর লেখক অশ্লীলতা সম্পর্কে যাঁর যা ধারণা ব্যক্ত করেছেন বলে ঐ সাপ্তাহিক যাঁর যাঁরী করে অশ্লীলতা সম্পর্কে লেখা প্রকাশের অধিকার একদা তাঁদেরই, তা হলে তা মেনে নেবেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে না জানিলেও, তাঁকে অন্ত সম্পাদকীয়তা জানতে পারিবে। কেননা পত্রেই প্রসাদ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি প্রসাদিত এক পত্র থেকে পত্রান্তরে, যেমন কোন সাহিত্যসম্রাট বা সংবাদপত্রই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে না এবং অন্তত অনেকদিন পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি। "সাংবাদিকতার রীতি" মেনেই আমি কিন্তু পত্রান্তরে প্রকাশিত লেখার "অযৌক্তিকতা" আলোচনা করিনি। প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই দৃষ্টির দুর্বলতা

চিঠিপত্র

করেছেন। আমার কথা হল, যেটা আমার ভাল লেগেছে, অন্যেরাই যে আমার ঐ লেখায় প্রেরণা পাবেন এ আমি আশা করি, এমন আত্মবিশ্বাস আমার নেই।

সুদেষ্ণা সেনগুপ্তা
কলকাতা

(২)

গত সংখ্যার প্রবাস অনুষ্ঠানপত্রের চিঠি না পড়লে হোমসিকনেস আমাদের যায় না যে সুদেষ্ণা সে সম্বন্ধে অনুষ্ঠের এই ছিন্ন কিস্তিটি সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন। আর্থিক সংকটের অজুহাতেই আমরা যারা আর পড়িয়ে পড়তে পারি না সেই পড়ুয়াদের যে সরকার কেন বঞ্চিত করলেন বুঝতে পারলাম না। আর সেই এই মূল্য বৃদ্ধি কিস্তিটি সম্পর্কে যে সরকার মশায় নিজস্ব কি বক্তব্য রেখেছেন সেটা জানার একমাত্র অধিকার অনুষ্ঠের পাঠকদেরই। সম্পাদকীয় মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে যে অনুষ্ঠ পত্রিকার তিনি তাঁর রচনাটি পাঠাননি। পাঠালে পরে যদি ছাপা না হত তাহলে আমরা অবশ্যই যে সরকার মশায়ের পক্ষ নিতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক সরকার তার কোন চেষ্টা না করেই এমন একটি কাজ করেছেন যে তাঁকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। সাধারণিকদের নূন্যতম সৌজন্যবোধ তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল। জানি না যে সরকার মশায় এর পরে আর কি বলবেন? তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যে সরকার মশায় তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভার জন্য কারুর সমর্থন পেতে পারেন না।

এই অবকাশে এই মনোজ কিস্তিটির জন্য আবার আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

অনুষ্ঠা মুখোপাধ্যায়
বিবেকানন্দপুর, যাদবপুর।

আনন্দ পড়ার ইতিকথা

অনুষ্ঠে প্রকাশিত আনন্দে পড়ার ইতিকথার আমরা নিয়মিত পাঠক। এ প্রবন্ধগুলি আমার বাবামাইয়ের মনে নিজেদের ফেলে আসা ছোটবেলার অনাবিল পাঠক আনন্দে পড়ার সময়কার স্মৃতি বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বা হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আমার সবিনয়ে বক্তব্য আপনাদের জানাচ্ছি, তিনি যেন তাঁর আলোচিত বিদ্যালয়গুলির মত ভালো-লাগার আর একটি আমার আমার বিদ্যালয়ের আনন্দে পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ আমাদের হয়েছিল। আমল কথার আমাই এই বিদ্যালয়ের প্রায় সাথে সাথে নব প্রতিষ্ঠানিক উচ্চ-বিদ্যালয় (বর্তমানে একাদশ-শ্রেণী পর্যন্ত)। কলকাতার উপকণ্ঠে ধারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর কমলাহাটি (কলকাতা থেকে মাত্র দশ মাইল উত্তরে) অঞ্চলে প্রধানা সাধারণের মধ্যে অবস্থানে এই বিদ্যালয় ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত কিনা ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ আলোচনায় আরও আছে কিনা আমাদের জানা নেই। বহু গরিব ছেলেরা প্রায় এই বিদ্যালয়ে পাশে উপকৃত হয়ে ছেলের ধারা জারদার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

অনুরোধ পূরণ হবে এই আশায় অনুষ্ঠের পরবর্তী সংখ্যাগুলির অপেক্ষায় রইলাম।

আলোক চট্টোপাধ্যায়
সনক চট্টোপাধ্যায়
পানিহাটী, ২৪ পরগনা

(২)

অনুষ্ঠের আগের পড়ার ইতিকথা এই পর্যায়ে লেখার প্রচেষ্টা এমন সুন্দরভাবে আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে আপনারা এখন সব প্রশংসার ঊর্দ্ধে। আমি জানি সমস্ত গ্রামবাংলার বিদ্যালয়গুলির পরিচয় এভাবে যদি আপনাদের উদ্যোগে এবং লেখকের চেষ্টায় অনুষ্ঠের পাতায় প্রতিফলিত হয় তবে দীর্ঘ দিনের মধ্যে এই কিস্তিটির সমাপ্তি টানার কোন প্রশ্নই থাকবে না। আমরাও বিদ্যালয়গুলির ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হবো না। এই পর্যায়ে লেখক এখন পর্যন্ত একগুলি বিদ্যালয়ের ইতিহাস জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন, তবু একই ধরনের কথা হলেও একঘেয়েমি আসে নি। বরং প্রতিটি লেখায় লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পেয়ে থাকি। লেখকের এই কৃতিত্বের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন তাঁকে জানাচ্ছি।

আপনাদের অনুষ্ঠের গত ১লা আগস্ট '৭৯ সংখ্যায় এ বিষয়ে আমার একটি ক্ষুদ্র পত্র আপনারা প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, আমি ঐ পত্রে উল্লেখ করেছিলাম পঁচাত্তর (লেখক) বর্তমানে বহু বহরের বিদ্যালয়গুলির কথাই তুলে ধরবেন। কিন্তু গ্রামবাংলার এমন বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলির অবদানও কম নয়। তাই লেখকের কাছে অনুরোধ তিনি যেন গ্রামবাংলার বিদ্যালয়গুলির পরিচয়ও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন।' ঠিক এমনিই একটি গ্রামবাংলার অসাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিবরণ জানতে পারলাম আপনার অনুষ্ঠের গত ১লা জানুয়ারী '৮০ সংখ্যায়। বিদ্যালয়টির নাম বৈকুণ্ঠনাথ মহাবিদ্যালয়। সত্যি এ পর্যন্ত যতগুলি বিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখক লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে এই বিদ্যালয়টির কর্মপ্রচেষ্টা এ চিন্তাধারা অবশ্যই একক-ভাবে অভিনব। সেই জন্যই হয়ত লেখক এটিকে আর কলেজের অন্যান্য সেরা বিদ্যালয়ের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য লেখকের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। আশা করি বিদ্যালয়টির ইতিহাস পড়লে অনেকেই এতে একমত হবেন। গ্রামবাংলার একটি অঞ্চলে, অথবা বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাও লেখকের পক্ষে কম সাহসের নয়। অবশ্য তিনি যাতে কোন সমালোচনার সম্মুখীন না হন এ জন্য এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিজালও সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেছেন। এটুকু জানার পর আর কারও কোন কিন্তু বলার থাকতে পারে না।

বিদ্যালয়টির পরিচয়ে এবং বিশেষ করে তার বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমগুলির অনেকই নতুনত্ব রয়েছে। যা থেকে জানার এবং শেখার অনেক ঐতিহ্যিক বিষয় পাওয়া যাবে। এমন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পাই নি। এই অভিনব কার্যপ্রচেষ্টা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে। নিজে শিক্ষক হয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার ও আমার আশাও হয়ে জাগছে। এ থেকে কিন্তু আমি আমার করে হয়তো কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সে আশা আমার হয়তো দুরাশাই হয়ে থাকবে। বহু [illegible] এই অভিনব কার্যপ্রচেষ্টার জন্য বিদ্যালয়ের কর্মীগণকে এবং জননী, ধাত্রী শিক্ষাব্রতীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পুনরায় সবশেষে এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য অনুষ্ঠ সম্পাদক মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিভূতিভূষণ গড়, নিমদম

রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে প্রথা অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া-গাড়িতে করে বিধানসভা প্রাঙ্গণে এসেছেন। তাঁর সামনে রয়েছেন স্পীকার শ্রীসিদ্ধার্থ রায়।

শাড়ি চোখে

কি-ভাবে বাজেট অধিবেশন যখন শুরু হয় তখন প্রেসরেজ-প্রাক্তিক একজনের একটি ভাষণ শোনা যায়। এ ভাষণ মামুলী নয়। এর মধ্যে সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক শুধু প্রতিফলিত হয় না, সরকারের কার্যপদ্ধতির একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও বহন করে। অতএব মামুলী বা বিধিবিধি অর্থাৎ সোজা ভাষায় বোঝাবার জন্যে ভাষণের ভূমিকাটি এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী এ ভাষণ শুনতে পায় নি। অবশ্যভাবিক ব্যাপার এটা অবশ্য শুধুমাত্র কথা নয়। কিন্তু ১৯৭০ সালের ২১ জানুয়ারী সেই অনুপস্থিতীকরণ ভাষণ তাঁরা শুনলেন। এবং তাঁদের স্থির বিশ্বাসই সরকার তাঁদেরই শুধু-কর্তা মানুষের পর পর মাসে কি-কি কল্যাণমূলক কাজ করেছেন তার একটা বিবরণ রাজ্যপালের ভাষণে তাঁদেরই প্রতিনিধি সদস্যদের কাছে পেশ করেছেন।

এ 'ভাষণ' পড়ে মনে হচ্ছে এ শুধু একটি নিয়মমাফিক অভিভাষণ। এতে সেই সনাতন পদ্ধার অভিনয় দেখিয়ে সরকার সমাবেশে বাহাদুরি করবার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অভিনবত্ব শুধু এখানে এই যে, বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে যারা কেন্দ্রের প্রতি উস্কানি প্রদান করে কিছু বলার সাহসিক হয়েছে; অর্থাৎ চৌদ্দ দফার যুক্তফ্রন্টের এগারটি দলের প্রতিনিধিদলই সরকার গঠনের অব্যবহিতকে আগের মন্ত্রিপরিষদে দুঃখ প্রকাশের সঙ্গে হয়েছে। তবে একটি সুখের বিষয় এই যে প্রত্যেক মন্ত্রী কী কাজ করেছেন (এবং করেন নি) তার একটি খিনি-বিবিধিত জবাব উপস্থিত আছে। কারণ বোধ হয় বছর-বছর এঁরা জনসাধারণকে স্মরণ করেন বলে সেই অবহেলের কাছেই জবাবদিহি করার উদ্দেশ্যে এই ভাষণটি স্বীকারোক্তি। হিসেব কষলেই অবশ্য তখন কোনো কোনো কাজ না করার জন্যে মন্ত্রিসভাকে ধিক্কারনীতি দিতে পারতেন।

আমরা অবশ্যই পাঠ করুন। দেখবেন বুদ্ধদেব মন্ত্রী কোনো কাজই করেন নি। তাঁরা হচ্ছেন অবশ্যই শ্রীঅবতোষ সরেন—যার আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসেন-প্রকাশ রায়। এঁরা অবশ্যই কিনা জানি না তবে এঁরা যে বন্ধুরাজনীতির মূলে সর্বাপেক্ষা মেরুদণ্ডি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সব-চেয়ে অবহেলিত মানুষ, অরাজনীতিক পরি-ভাষায় যাঁদের প্রোলিতেরিয়তের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্যে কি করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখা হয় নি। অবশ্যই কালে শুধু জন-উন্নয়নের কথা ই আসা করি কেউ আশাকরে না। এই কথায় কথায় নির্ভর করে যেন

আছেন অনেক বনবাসী, যাঁরা এখনও আদিম যুগে রয়েছেন। সেই সঙ্গে আদিবাসী কল্যাণের জন্যে লগ্ন-দেওয়া মন্ত্রীও তাঁদের কল্যাণে কি করলেন তার হদিস পাওয়া গেল না। এর পর যদি অরণ্যবাসী আর আদিবাসী সমাজে গা'র এটেম, তবে কি তাঁরা হিজল-মূলের অন্তে রাজী হয়েছেন বলে তাঁদের দোষারোপ করা যাবে? আদিবাস বা কমিশনার জমি বা তবে প্রস্তাবিতদলীয় এই সম্প্রদায়ের প্রতি যে বিশিষ্ট ঔদাসীন্য দেখে নেয়ে একথা খুশীমত নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

মেদী তখন থেকে অবশ্য মুহূরুদ্দের কয়েকটি প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া গেছে একথা বলতে পারা যায়। যেমন পূর্ত-বিভাগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্থাপক অপসারণ, আর সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বিদেশ পরিবেশের বিলোপ সাধন। পশ্চাদ্মুখী আন্দোলনের ধ্বনি হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রেখে পুলিশকে যে নতুন পথে পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাও প্রশংসার্হ। কিন্তু পুলিশ আইন-শৃঙ্খলার ও জনতার নিরাপত্তা বিষয়ে সমর্থ হয়েছে এমন দাবী প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। সে প্রশ্ন সময়সাপেক্ষ মন —ফলের পরিচয়েই। এরাজ্য জমি উদ্ধার করা হয়েছে, বেআইনীভাবে হেফাজতে রাখা মালিকদের কাছ থেকে একথাও সত্য। তবে তার মুক্তি করেন হয়েছে কিনা তা অন্য একটি প্রশ্ন। উদ্ধার পরিকল্পনাই শীর্ষাসন করে বিবৃতি-প্রতিবিবৃতির মারফৎ প্রকাশ করে এসেছেন। অতএব বেশী আশা যাচ্ছে।

খাদ্য-উৎপাদন একটি আশাপ্রদ প্রসঙ্গ। অবশ্যই এর হিসেব-নিকেশ দিয়ে হলে যখন থেকে মন্ত্রিসভার শুরু হয়েছে সে সময় হেকেই সাবধানের কথা রাখতে হয়। কিন্তু অধিবেশন আমলে যা হয়েছে তার জের টেনে এসে যদি কোনো আশা প্রকাশ করা হয় তা নিশ্চয়ই মুহূরুদ্দের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। মুহূরুদ্দের উচিত ছিল তাদের সরকার এই অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু কল্যাণমূলক কাজ করতে পেরেছেন, বলাই আশাপ্রদের জোর না দেন, তাহাই কেবল উল্লেখ করা।

আশাপ্রকাশ করা হয়েছে, সরকারের নেই আশ্বাসের ফলে এবছর ১৬-৬৫ লক্ষ একর জমি থেকে ১৭-৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল পাওয়া যাবে। এ আশা থেকে অনুমান নিশ্চয়ই করতে আশা হবে, ঠিক কতটুকু জমি মুহূরুদ্দের আমলকালে সেচের জল পাচ্ছে। এই অঙ্ক থেকে কেউ যদি মনে করেন কংগ্রেস আমলে অল্প পরিমাণ জল ক্ষুদ্রসেচী ট্রিকিন্দোনে মুখার্জি তাঁর সময়ে চুকিয়ে দিয়ে তাহাই কৃষিতের দাবী করছেন তবে কি খুব অন্যায় আশা হবে? আরও বলা হয়েছে, ডি ভি সি, মহুরাক্ষী ও অজয়ভদ্রী থেকেও আরও সেচের জল পাওয়া যাবে যাতে করে ১০ হাজার একর বাড়তি জমিতে সেচের সুবিধা হবে। মনে রাখবেন এই প্রকল্পগুলি কংগ্রেসের আমল পরিকল্পিত। তাহাই কম পরিমাণ একর পরিকল্পনাগুলি!

রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বি-বার্ষিক এক ক্রাম প্রোগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে এ বছরও খাদ্যশস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে—৬০ লক্ষ টন সফলতা লাভ করেছে। এরাটিফিসিয়াল ফলে ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছেন, ...সালসাহা আর মুহূরুদ্দি। উৎপাদিত খাদ্যশস্যের হিসেবের উপর খাদ্য-মন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর যে ভরসা মুহূরুদ্দি হয়েছিল সে থেকেও কিছুটা আঁচ করা যাবে। অতএব, রাজ্যপালের ভাষণের সরাসরি আশ্বাসগুলি বিবেচনা করলে।

বিদ্যুতের ঘাটতি ঠাঁচ করার কথা ভাষণের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু টানা-পোড়েনের পর একটিমাত্র পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। একথা সত্যি যে, কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তা কার্যকরে রূপায়িত হয় না। ফলে উৎপাদন থেকে আমরা না, সরকার কোনো ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়ে পারেন। তখন অন্য কেউ তা রূপায়িত করেন। কিন্তু রাতারাতি সব কৃষিত কোনো আশার উদয় হয়ে না।

যেমন ধানের বীজ বপন করলেন বর্ষাবীরের সরকার। আর সে ধানগাছ যখন পরিণত রূপ ধারণ করে আশার প্রতীক হবে উঠল তখন আমাদিগকে নিয়ে নিয়ে তা দেখালেন মুহূরুদ্দি সরকার। একও যদি ধরের পুত্রে পুত্রবতী আশা দেওয়া না যায় তবে আর কাকে দেওয়া যেতে পারে, সুধীজন বিচার করবেন।

সম্প্রদায়ীর উদ্দেশ্য যে মুহূরুদ্দি সরকারের কৃষিতকে খাটো প্রতিপন্ন করার জন্য অপপ্রচার চালানো। যাঁরা এমন চিন্তা করছেন তাঁরা ভুল করবেন। সম্প্রদায়ীর বলা হয়েছে, কৃষি সরকারের উচিত ছিল তাদের রাজত্বকালে কতটুকু কাজ হয়েছে তার সম্পূর্ণ আলাদা হিসেব পেশ করা। তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আশা অপরিসীম। তাঁদের অধিকারের প্রতিও জনসাধারণের বিশ্বাস আছে। মন্ত্রিত্ব জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা জনসাধারণকে কংগ্রেস-বিরোধী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের উচিত ছিল একেবারে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তাঁদের কর্মকলাপের নজীর উপস্থাপিত করা, যাতে জনসাধারণের সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে। সমুদয় পাঠকমাত্র জানেন, বৃটিশ আমলেও কিছু-কিছু কাজ এগিয়ে হয়েছিল। এমন কি কোম্পানী পরিচালিত থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই ভারতীয়করণ বা বর্তমান পরিভাষায় আঞ্চলীকরণ করে দিয়েছিল। কংগ্রেস বৃটিশকৃত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে কতটুকু উন্নতি করেছে তার হিসাব-নিকাশ পেশ করার। আর মুহূরুদ্দি কংগ্রেস কৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জের টেনে কল্যাণমূলক কাজের ফিরিস্তি পেশ করছেন। ট্রাডিশনাল ঠিকই আছে। সরকারের চক্ষু বলিহারে শুরু। কিন্তু এ না করে যে প্রকল্পগুলিকে ভোক মনের পরিচয়ে প্রোথিত হয়ে আছে তাকে মুক্তমার করে দিয়ে নতুন ভঙ্গীতে রাজ্যপালের প্রতিভাষণে পেশ করা হয়, তবে মনে হয় মানুষকে কিছু মোহ-মুক্তির সুযোগ দেওয়া যেত।

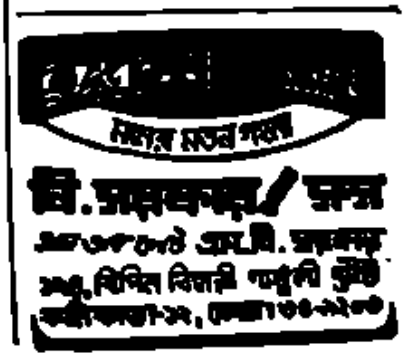

ছবি: বিধানসভার ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (বামে) পরিষদ ভবনে বিধানসভার অপর দুজন সদস্য শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও শ্রীহরিপদভারতি যোষের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

হয়ে যে শান্তি এ দেশে বিরাজ করছে তাকেই আবার ফিরে পেতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণ পঠিত হওয়ার পরই এস এস পি নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন, বহরে শেষ করা সরকার হেরে আসরা ঘোষণা করা হয়েছে বেশী। উদ্দেশ্য, এস এস পি মন্ত্রিসভায় নেই। অবশ্যই' মুখ নেতা আর যত প্রধানত বিরোধী দলের প্রতিনিধি আছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর : আজকালকার ঘোষণাকে আমরা সেবারের চেয়ে অনেক বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছি। বিধানসভা ভোটের পরই সোনাই কমিউনিস্ট-বামপন্থী আমল আমরা নতুন করে ইন্দিরা ঘোষণা। বিধানসভার সদস্যরা যে শপথ গ্রহণ করেছিল সে শপথ সংসদ-ইতিহাসে নির্বাচনের পরে-পরেই আমরা সাধারণ আর কোনো সরকার করেছিল। এমন কি 'সবরের মেওয়া ফলে' আগামি ফলে ছবিটা কি দাঁড়াবে—এমনে আমাদের বাবিরেও যে বিধানসভার মেয়াদ পুরো করে সুশীল কাজ, আমার মুখ্যমন্ত্রিত্বে এক বছর দেখে নেবার জন্য দেবার দেবে পরিচয়হিলেন। আমরা প্রোগ্রামসমূহেও তখন আমাদের আমরা যায়। যাই হোক বিধানসভা ভোটের বিদেশ ঘটনা, যে যা খুশিই মন্তব্যটি করুন না কেন, আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রীদের জীবন আর মুখ্যমন্ত্রিত্ব বিধানসভার আমাদের বিশ্লেষণের মধ্যেই তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় সাধারণ পরপর দেরী দেরী ঘটনা সম্পর্কে যে আমরা মন্তব্যগুলির ওপরে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল না মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাইকোলজিক্যাল আমরা ওপর উঠেছিল যখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীদের বক্তব্যের ভাষণের দেরী ও মুখ্যমন্ত্রীদের বক্তব্য এলেন, ভাষণে এই আমরা আমাদের মনে ছাপ করা সম্ভব নয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নিরপেক্ষ নেই সেখানে তাঁর যেন হয়। অতএব, ভাষণ থেকে তাঁদের দৃষ্টি দেওয়া হোক। আর বিধানসভার আমাদের পাশের ছবির চোখ বক্তব্য পরিষদ স্থির-স্থিরা বিষয় হয়ে এক ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করেছেন।

পাশের ছবির এই পরিষদী বিষয় সার্বিকভাবে সম্পর্কে সৃষ্টি করেছে। পরিষদীয় প্রথমতের রীতি মেনে রাজ্যপাল যে ভাষণ পাঠ করেছেন তাকে বলার সরকার সমস্যাই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে অধিবেশন হয়েছে তাকে পাশের ছবির নিরপেক্ষতার ভাষণের বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে পরিষদ বাঁধা বক্তব্যবাদের প্রথমে আমাদের ছিল পরিষদ যায় তবে এমনও হয়ে পারে যে, কোনো প্রথমে বাধিত হয়ে যাবে। সে অবস্থায় সরকারের পরবর্তন অবশ্য রাজ্যপাল বক্তব্য করবার। অবশ্য সরকার আর কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু এরকম সংসদে যদি বিধানসভার অধিবেশন হলে তবে সেই আমাদের বাধিত হয়ে যাবে। কিন্তু ঘটনার পরিপেক্ষে দেখে মনে হয়, অনেকটা স্পীকার যে বিধানসভার আমার পুরো বর্ণাঢ্যিত করে ঐ পরিচালনাসমিতির সঙ্গে প্রথমে করেছিলেন এক শুভ বিদায় সমাধানের পূর্বলক্ষণ, আমার হয়ত সেই লক্ষণই আমাদের করে তাঁকে অবশ্যই প্রথম অন্য ঐতিহ্য স্থাপন করতে হবে।

কিন্তু তখন হচ্ছে, যে পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের ভাষণ এসে আমরা তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবসম্মত কী? —অর্থ অতীত পরিস্থিতির। আমাদের মিনি-ফ্রন্ট পরিষদের আমরা আমাদের যে উদ্যোগ প্রকাশিত করে অভিযোগের দৃষ্টিতে, আমরা পাঁচশত করে বিধানসভার পরিচালনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে পরিস্থিতি সম্পন্ন করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে এটাকে সোনাই বলে পরিস্থিতি করা খুবই কঠিন হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির লোকের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনেকটা আমরা সহযোগী একটি পরিচালিত প্রকাশনি সম্পর্কে পরিস্থিতি বলে আখ্যায় করলে আর কিন্তু আমরা তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা তত সহজ হবে না। এবং এ ঘটনার প্রভাব যে প্রত্যেক দুর্ভাগ্যের মনের উপর পড়েছে তা শুধু বিধানসভার আমাদের মনেই প্রতিফলিত হয়নি, বাহিরেও ইতিমধ্যে অনেকে রাজনৈতিক নিশ্চয়তেও উপস্থিত হয়েছেন। যদি সরকার ভেঙে যায় তবে তাঁরা কোনো কোনো পরিস্থিতিতে মোর না, কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে সরকার আমাদের হয়েছেন। আর এস-পি, সোশ্যালিস্ট দল এই বলে দলীয় ঘোষণাও দিয়ে করে ফেলেছেন।

আর যদি বাংলা আমাদের পরিস্থিতির সমস্ত বক্তব্যে কোন ইন্দিরা আমরা বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর রীতি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সংকেত দেওয়া। এতদিন ঐ বলের সেবারা আলাদাভাবে সাধারণভাবে কথা বলেছেন। এবার সুরেন্দ্রনাথ কারো-কারো ঐকমত্যভাবে যে কোনো ব্যবস্থার মুখ্যমন্ত্রীর পাশে পরিস্থিতি ঘটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিলেন।

অন্যদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের স্বচ্ছ বিবৃতি। তাঁদের ভুল হয়ে আর নেই। অবস্থান ফাঁস হবে। শান্তি বৈঠক বসবার আগেও শ্রীকোঙার আমার বলেছিলেন, শান্তির যেন সুযোগ নেই। তাই শান্তি হবে না। কারোই তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখার্জি শান্তি-বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আমার মুখার্জিকে 'খবর আমরা' সরকার করার জন্য বৈঠকের দিতে বলেন। এবং শুধু তাই নয় ভুলবে আমে এই ধরনের আলোচনা করবার জন্যে জোর দেন। কিন্তু শ্রীকোঙার শুধু কথাটা বৃদ্ধিতে দিয়ে মিলিয়েছেন তাঁরা করে ফেলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার পার্টির সম্পাদক। তাঁর আমরা দেখলে দেখে যায়, বল কি চায়। যেমন যায়ে সোশ্যালিস্ট সরকার মেরুদণ্ডহীন সে করতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতের সঙ্গতি নেই। আমরা প্রত্যেকবারের বলবার আইন সরল সদস্যদের যে সভা ডেকেছিলেন তাতে বলবার বাড়ি হাজির হয়নি। দেখে মনে হয়, প্রত্যেকবারে সাইন তাঁরা আমরা পারছেন না। অতএব, তাঁরা কোনো দিকে যেতে যায় মুখার্জি।

যাহোক, যে দুই আমরা মধ্য ঘটনা এগিয়ে আমরা তাতে মনে হয় এই বিরুদ্ধ বলে আলোচনা পরবর্তন আমরা যায় দেখার ৬৯ বর্ণাঢ্যিত আর তাঁর যা আমরা তবে এ আমরা আমরা বিশেষ ইতিহাসের পট-ভূমিকার জন্য নিশ্চয় রক্ষিত থাকবে।

—সমরবর্মী

জয়তু নেতাজী

দেশে ঐক্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বের মধ্যে ভারত যাতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেইভাবে দেশকে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সর্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। নেতাজী যে ঐক্য এবং কল্যাণকর কর্মের বাণী রেখে গেছেন, আজকের দিনে সেই বাণীর অনুসরণ সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি

দেশে বিদেশে

ভিতরে শান্তি ও বাইরে প্রচুর উত্তাপের মধ্যে এবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং ঐ দিন সি পি আই অধিবেশন চলাকালীন যে কোনও যে সময়েও ভিতরকার শান্তি ভেঙ্গেবাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও বাইরে বুধবার ও বিক্ষোভকারী মিছিল প্রচুর উত্তাপ ও উত্তেজনার যোগান অব্যাহত রেখেছিল। রাজ্য বিধানসভারও অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ পরবর্তীকালে তার পর্যালোচনার উত্তরাধিকারীর সময়ে সেদিনও প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চারিত হওয়ার কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সামনে প্রতিবিপ্লবীদের অবস্থান করায় সেখানে বিরাজ করছে আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। এদিকে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার ইতিমধ্যে-সমাপ্তি অধিবেশনে এক সভায় অধিবেশন হয়ে প্রবেশ করেন অভিভাষণ অভিভাষণ চিরাচরিত রীতি মেনে নির্বাচিত সরকারের এবং তাঁদের বাকী অধিবেশনে বিধানসভার ২১৬ জন সদস্যের মধ্যে ১১৩ জন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন (এই প্রবেশ বিধানসভার মোট নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৪২৩)। বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন অবসানের আশাও ফেরে আসেনি বা বাজেটও বিধানসভার অধিবেশনের নতুন প্রেক্ষাপটের মধ্যে তা এখন অনেক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহের আর একটি চমকপ্রদ খবর হচ্ছে কেরলের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বাল্‌কৃষ্ণিয়ন তাঁর অব্যবহিত পরিষদের আই-এন-সি দলভুক্ত সদস্য সি কে কুরুণ বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পুলিসী অভিযোগ সম্পর্কে যে তদন্তের নির্দেশ বিরোধিতার কেরল হাইকোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যপাল শ্রীনারায়ণ এবার মেয়াদের শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন যা '৬৪ সালের পর আর দেখা যায়নি ('৭৭-র অন্তর্বর্তীকালও অবশ্য নির্বাচিত হয়েছিল)। কিন্তু অবস্থাগতিক পরিবর্তনের মধ্যেও এবার এবারও বিধানসভার সামনে হাজরা, বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদীর পাশে হস্তক্ষেপ সরকারের বাইরের আবহাওয়ায় প্রচুর তাপ সৃষ্টি করেছিল। পুলিস মন্ত্রীর বিবৃতি ছিলেন বাঁধও এই অভিযোগেই রাজ্যপালের ভাষণে পুলিসকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সক্রিয় করার পর্যাপ্ত আশ্বাস ছিলো। তবুও বিধানসভার এই ঘটনা পুলিস ও সরকারী পক্ষকে বিচলিত না করলেও কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক দলকে সরকারবিরোধী উত্তাপের মধ্যে এবং যারা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনটিসহ কিছু এম-এল-এ সাসি ইতিমধ্যেই পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে চুনোপুঁটি বামফ্রন্ট-বিরোধী শিবির আন্দোলনের জন্য এগিয়ে সমন্বয় সি পি আই অফিসে হামলা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ আনুষ্ঠানিক ভাবে সমন্বয়

সেতারগীয় ৭৪তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মহানগরের বিভাগীয় জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নুকুমার মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন। মিঃ ডাঃ ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু পাশে রয়েছেন।

অন্যদের দেখা করতে হয় বাইরে এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রশ্নগুলি কিভাবে করা।

বিধানসভায় জবাবদান যে ভাবে দিয়েছেন তাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পুলিশের ভূমিকাকে আরো জোরদার করার আশ্বাস রয়েছে, বৈধরিক ক্ষেত্রে রাজ্যের শান্ত পরিস্থিতি, ভারসাম্য বেকারী, চলতি যোজনার অর্থসংস্থানে ঘাটতি পূরণে অতিরিক্ত কর ধার্য করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। জবাবদান পরিক্রমণে ১৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত দেশে জনতার যে অভ্যর্থনার সূচনা হয়েছে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে।

মোটের ওপর জবাবদানের ভাষণে রাজ্যের অর্থনীতি সম্পর্কে উদ্যোগ আছে, কিন্তু তার সমাধান-প্রচেষ্টার কোনো আশ্বাস নেই। রাজ্যে ভারসাম্য বেকারীর তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সমস্যাটিকে দূর করার সরকারের কোনো চেষ্টার আভাস দেননি। অথচ, ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে শুরু করে পর পর তিন বছর ধরে এই রাজ্যে সংঘটিত শিল্পের ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ফলে সংকুচিত হয়ে আসছে এবং বেকারীর উদ্যোগ সমস্যার সমাধানের হিসেবে এই ধরনের ধর্মঘটকে বন্ধ করাকেও বেকারী হ্রাস পেয়েছে। ফলে বেকারদের অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতি সরকারী শুল্ক, কলকারখানার সম্পদহানিও অত্যন্ত বাড়িয়ে। অথচ সেদিকে বেকারী থাকে, ধর্মঘট প্রত্যাহারের মূলে বিতর্কের বিষয় হলেও মজুরি বৃদ্ধিতেই অধিকাংশ যে আঁচ করার ফলে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

বৈধরিক ক্ষেত্রের দিক থেকে যদি রাজ্যের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমান অবস্থা হলে সেখানেও কোনো আশার আলো দেখা যায় না। কেন্দ্রের পরিষ্কার মত হিসেবে সি পি এম তার বক্তব্যকে প্রকাশ উদ্যোগ করলেও পরবর্তী পরিষ্কার মত হিসেবে বাংলা কংগ্রেস বাকি তা সমর্থনে রাজী হয়নি। ফলে সি পি আই সমস্ত শ্রীমতী গান্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব সমর্থন করতে হয়। তাদের নিয়ে বিতর্কের ফলে তার বিরুদ্ধে যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হবে বাংলা কংগ্রেস এবং নকশাল প্রস্তাবের অন্য কোনো কোনো দল সেই সম্পর্কে কি অবস্থান অবলম্বন করবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে বিতর্কের পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটবে তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসুক্য ও উদ্বেগ থাকবে।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়ের মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী গান্ধির পূর্বোক্ত তিনটি প্রস্তাব তিন হাজার শব্দবিশিষ্ট এক দীর্ঘ উত্তর দিয়েছেন এবং এতে তিনি বলেন যে নীতি অবশ্য জরুরী জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকারী যে কোনো ব্যবস্থার আগে হস্তক্ষেপের তাঁর অধিকার আছে। উদ্ধৃতির এই পত্র-বিতর্কের সূত্রে ধরেছিল পরবর্তী আজকে ৩-নিয়ে বলেন এবং আগামীর ৮ই ফেব্রুয়ারী আলোচনা প্রস্তাবগুলির নিষ্পত্তির দেওয়া পড়ে। এদিকে এই ফুল প্রস্তাবগুলি কার্যকরী জ্যোতিবাবু যে কথা অধিকার তারা এবং পুনরায় মুখ্য করার নির্দেশ দেওয়ার সেই প্রস্তাবের ধ্বনিবাদ্যত হয়। কিন্তু পরবর্তী বাদের ৩-নিয়ে বলেন তারা জ্যোতিবাবু যে নির্দেশ বিরোধিতার মুখ্যমন্ত্রী তা তার করার পর মুখ্যমন্ত্রী আজকে সেইপ্রসঙ্গে আবার ওঠে তখন জ্যোতিবাবু পূর্বনির্দেশ বাতিল করে ৩-নিয়ে বলেন আজকের জন্য

মুখ্যমন্ত্রীর জবাবদান

আজকে মন্ত্রিসভার উপস্থাপিত বিভাগের চেষ্টার যে তথ্যপত্র তারা তাদের শ্রীজয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিতে দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং আজকে দীর্ঘ সেতারের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং ইতিমধ্যে প্রবেশ আজকে সভাপতি শ্রীজয়বতী ফেলদের থেকে বিধানসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রিসভায় শ্রীজয়েন্দ্র চৌধুরীর সমর্থক বেশী হলেও, প্রবেশ আজকে ও বিধানসভার পরিচালনার সমস্যাই প্রতি ইন্দিরা-সমর্থক। অন্যদিকে, শ্রীজয়েন্দ্র চৌধুরী এখন পর্যন্ত বিভক্ত আজকের কোনো সভায় প্রতিটি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেননি। অবশ্য তাদের আজকে কর্মীদের আজকে যে আজকে-মোহন বাঁধ ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য আলোচিত হন তাদের তিনি বিরোধী আজকের দিকে মুখ্যমন্ত্রী না, আজকে তাদের প্রবেশ আজকে এবং বিধানসভার তাঁর বিরোধীরাই বলে জানা হলেন। আজকে তাদের অবে অধিবেশনে এই সংকটের সমাধান হবে না হয় তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতে বর্তমানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আজকে সম্মত করার জন্যও চেষ্টা চলছে। আজকে তাঁর এই চেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত করবে তাঁর সহকর্মীদের ওপরে।

উদ্বাস্তুদের ভূমিকা বিশ্লেষণ

উদ্বাস্তুদের ইন্দিরা-সমর্থক বিধানসভা সদস্যদের নেতৃত্বে শ্রীজয়নারায়ণ হিন্দুস্থানীর নির্বাচনের ফলে প্রকৃতপক্ষে এই আজকে শ্রীমি বি মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে এবার

নেহরুজীর ৭৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিবেদন করছেন।

নতুন দল লাভ করেছে যে অঞ্চলে সেখান থেকে ২২৯ জন সদস্যের মধ্যে ১১৯ জন সদস্য তাঁদের সমর্থক নির্বাচিত করেছেন। অন্যান্য অঞ্চলের দলের বাকিরা ৩২৫ জন সদস্য রাজ্যসভায় যাঁদের প্রাথমিক পঞ্চি-বার্ষিকী মেয়াদ বন্টনসভার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

বিহারে জোট বাঁধা শেষ

বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হবার যে ঘোষণা হবার আগে ইণ্ডিয়ান-সমর্থক ঐশানেরা আই ফোর্টী ব্যক্তি আসন মধ্যে ১৬১ জন সদস্য নিয়ে দল গঠন করেছেন। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩৬৩। এদিকে বিরোধী অঞ্চলের, এস-এস-পি, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিরাও সম্মিলিত হয়ে বিহার বিধানসভায় সংখ্যায় বিধায়ক দল গঠন করেছেন যার নাম হবে সেখানকার সরকার গঠন করা। ঐশানেরা আই তাঁর সমর্থনে পেয়েছেন, সি-পি-আই, সি-পি-এম, পি-এস-পি, সোস্যালিস্ট অঞ্চলের, ফরওয়ার্ড ব্লক ফরওয়ার্ড, লোয়িত দল, জাতীয় হরিজন দল ও সিংহলের একাংশ। এছাড়া, ছুঁয়ে মিলের দলের সদস্য সংখ্যা ৭২ জন। এস-এস-পি বিরোধী অঞ্চলে তেমাই মজুমদার মনে করেছেন।

কেরলে দুর্নীতির তদন্ত দাবি

কেরলে শ্রীযুক্ত মিশ্রের দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের বিরোধী পক্ষ যখন এই সম্পর্কে হাইকোর্টের মতে করা হয়েছে যে মাদ্রাজ্যের যে তাঁর দলের বিরোধীদলীয় নেতা করেছেন তা এর করার মতো তাঁর কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন। তাছাড়াও আগে স্থির করেছেন যে শ্রীযুক্তকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগকারী তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে এবং পালনমন্ত্রীসভার পরিষদে তখনই জানাই যে এই পদ্ধা অনুসরণ হয়েছিল এমন বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

বিধানসভার এই ফলাফলে মন্ত্রিসভার কর্মসূচীতে সর্বাধিক প্রভাব স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীমি ওয়ালিয়ের সম্পর্কে বিরোধী অঞ্চলে অনুসরণে বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন, কারণ ওয়ালিয়েরের বিরুদ্ধেও এই সময়ে একই দুর্নীতির অভিযোগ আনীত হয়েছিল। বিধান-পরিষদ অধিবেশন পরে বাদ দুজনের অনুপস্থিতি নিয়ে বিরোধী দেওয়ার জন্য তাঁরা সমালোচনা ও ইণ্ডিয়ান্ট্রিয়াল উত্তেজনা ওপরই বিরোধী বিরোধ বিরোধ।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাই পরিবর্তন

রাশিয়ার আগমন বুলগানী এখন ধীরে ধীরে ক্রুশ্চেভকেই চীনের বিরুদ্ধে সরে আসা এবং সোভিয়েতের অন্তরালে চীনের সঙ্গে মার্কিন ও ব্রাশনের সম্পর্কোন্নয়ন সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। অন্তর্জাতিক রাশিয়ার আগমনের সম্পর্কে যে অবস্থানের সেকথা বলা যায় এই যে রাশিয়া চীনকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবশ্য ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও চীন সমস্ত সমাজতন্ত্র থেকে দূরে চৈনা প্রভাব-বাদীতে থেকে দাঁড়িয়েছে। দুই-চীন আলোচনায় এই সংকটের অবসানকে এগোনোর সম্ভাবনা দীর্ঘ দুবছর বিরতির পর ২০ জানুয়ারী আবার চীনের সঙ্গে দুই-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের আলোচনা শুরু হয়েছে এবং এর পর আশা যে বৈঠক হবে তার আভাস আছে। অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সাহেব চীনের সঙ্গে সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহী হোচি মিন সাধারণের বিরুদ্ধে পাওয়ার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগমন আলোচনা আবার আলোচনা হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই নতুন দিক সোভিয়েটের পক্ষে উপেক্ষণীয় না হয়ে পারে না।

বিশ্ব খাদ্য পরিকল্পনার সাহায্য

আমেরিকা পৃথিবীর ৪১টি দেশ খাদ্য-ঘাটতি-কবলিত দেশের বিশ্ব খাদ্য-ঘাটতি-কবলিত দেশের জন্য প্রতিশ্রুতি সম্মেলনে মোট ২১৫,৪২০,৫০০ ডলার সাহায্য দেবে বলে ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ১৪৮,২০১,৪৭৮ ডলার সাহায্য হবে হস্তান্তরযোগ্য, ৩৭,০০০,-০০০ ডলার আসে আর ৩০,২১৪,০২২ ডলার নগদে। তাছাড়া ৭৫০,০০০ ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—মোট মাত্র ১৭ কোটি ডলার। মার্কিন সাহায্যের দুটি উদ্দেশ্য : উন্নতি-শীল দেশগুলিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সারা পৃথিবীর বিশ্ব এলাকার খাদ্য সরবরাহ।

সম্পাদকীয়

সাধারণতন্ত্রের কুড়ি বছর

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্রী সংবিধান প্রবর্তিত হয়। তার কুড়ি বছর এবার পূর্ণ হল। দুই দশক একটি জাতির জীবনে সময়ের হিসাবে সংক্ষিপ্ত হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতবর্ষে এই কুড়ি বছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা হয়েছে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বহু পরীক্ষার মধ্যে এই সময় অতিবাহিত হওয়ায় সময়ের মঞ্চে এসে আমাদের দেশ ও সমাজ একটি ঐতিহাসিক বাঁক পরিবর্তনের মুখে এসে উপস্থিত।

পৃথিবীর নানা দেশের সংবিধানের কাঠামো সামনে রেখে আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা ভারতের সংবিধান প্রস্তুত করেছিলেন। এই সংবিধান পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু সংবিধানপ্রণেতারা এই সঙ্গেসঙ্গেই উচ্চারণ করে গেছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনই একটি জাতির পক্ষে শেষ কথা নয়। একটি জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ এনে দেয় স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের মানুষ সেই সুযোগ লাভ করেছিল। তিন বছরের পরিশ্রমে ও ঘরে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হবার পর ভারতবর্ষ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করে। এই সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি হল প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার। তারাই হলেন নির্বাচক। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংসদই হল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। গত কুড়ি বছর ধরে অব্যাহতভাবে ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র সংবিধান চালিত আছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে যখন সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে তখন ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক পরীক্ষা চালিয়ে গেছে নির্বিঘ্নে, এখনও সেই পরীক্ষাই চলছে। ভারতবর্ষের অনাগত সময়ের কথাই থাকুক, অন্তত এই বিষয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই যে, গণতান্ত্রিক পথেই তাকে চলতে হবে।

রাজনৈতিক ভারসাম্যও কম হয় নি দুই দশকে। গত কয়েকটি দুরুহতম বছর এই ভারতের বৃহত্তম শাসক পার্টি কংগ্রেসের জন্যে। একাধিপত্যে এই দল গত ২৩ বছর ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন। এখনও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নূতন কংগ্রেস-দলেরই করায়ত্ত। তার তুলনায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো বিরোধী দল সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠন করার মতো ক্ষমতা কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো একক দলের নেই। এটিই ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষার দুর্বলতা। সমাজবাদী, কমিউনিস্ট, স্বতন্ত্র কিংবা জনসংঘও সর্বভারতীয় দল। কিন্তু সংসদে এঁদের প্রতিনিধির সংখ্যা নগণ্য। স্বতন্ত্র ও জনসংঘ দলে কোনো ভাঙন ধরে নি। কিন্তু সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট দলে আজ বহু ভাঙন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে গেলে এই রাজনৈতিক দলগুলোতে ভাঙন লেগে গিয়েছে। তাছাড়া কতকগুলো আঞ্চলিক দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক আবেদন নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তারা কোনো কোনো অঞ্চলে ক্ষমতাও দখল করেছে—যেমন তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগম এবং পাঞ্জাবে অকালী দল।

কংগ্রেস দলের শক্তিহ্রাসের ফলে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী জোট ক্ষমতায় এসেছে। কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা ও পাঞ্জাবে জোট সরকার আছে। তামিলনাড়ুতে আছে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগম সরকার। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশেও জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু দল ভাঙাভাঙির ফলে তারা ক্ষমতায় টিঁকতে পারে নি। কংগ্রেস-বিরোধী জোট সরকার ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নূতন পরিবেশ। ক্ষেত্রে যদিও নূতন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন তথাপি পাকা কংগ্রেসের নেতারা এই সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছেন। কোনো দলই নিশ্চিন্তে ক্ষমতা ভোগ করতে পারছে না। কংগ্রেসও না, কংগ্রেস-বিরোধীরাও না।

সাধারণতন্ত্রী ভারতে এই দুঃসন্ধির দ্বারা আজ লক্ষ করবার মতো। কারণ, এক পার্টির শাসনাধীনে দীর্ঘকাল থাকার পর বহু পার্টির মধ্যে সেই ক্ষমতার বিভাজন হচ্ছে। তার ফলে কেন্দ্রে নূতন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকলেও রাজ্যগুলোতে তার ক্ষমতা ও প্রভাব আজ বিঘ্নিত।

হয়তো এত বড় একটি দেশে বহু পার্টির উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণেই। দুই পার্টিভিত্তিক গণতন্ত্র থাকলে একটি দেশে রাজনৈতিক সাম্য ও সুস্থিরতা রক্ষা সহজ হয়। কিন্তু এত বড় দেশে তা করে ওঠা যে কত কঠিন, এর ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা থেকেই বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও সংবিধানের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংকল্প নিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানকে ভাঙবার চেষ্টাও কোনো কোনো মহল থেকে হচ্ছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এই রাজনীতি যে ভাষা বয়ে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সত্য যে, ভারতবর্ষের মানুষ গণতান্ত্রিক বিশ্বাসকে মাঝারেই সমাজবাদী লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। সমস্ত বিশ্বাস বা হিংসার দ্বারা নয়। এই আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আজ ঐকমত্য হতে হবে। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ বহুদিন অপেক্ষা করে আছে তাদের প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ সমাজের জন্য। গণতান্ত্রিক উপায়ে তা না হলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার সম্ভাবনা। সাধারণতন্ত্র দিবসের বার্ষিকী বক্তৃতা পালন করি তখন সংবিধানপ্রণেতাদের এই সংকল্প — সমাজবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা—আমাদের কর্মপ্রেরণাকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করে।

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমস্যা

যদি আমরা যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথার আলোচনা শুরু করে দেওয়া হয় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তা নিয়ে কিছু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। নিশ্চিন্ত শান্তির আনন্দ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন শুরু হয় না।

কোনো একটি বর্ষসভার শিরে বসলে দেখা যাবে, মানুষ উত্তরোত্তর কাহিল হয়ে পড়ছে এবং মনোরম পথে এগিয়ে চলেছে, আলোচনার সূত্রে এই ধারণাই প্রবাহিত হচ্ছে।

শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হোক, সেও দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনাধ্বনি শিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষার প্রভাব সম্পর্কেই আলোচনার সূত্রে নিয়ে পৌঁছবে। ...নিছক সাহিত্য সমাজ সম্পর্কিত থেকে নিয়েই আলোচনা সভা বা আলোচনাচক্র শুরু, অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যাবে এই 'হায় হায়' ধ্বনিই প্রধান হয়ে ওঠে। কেন যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্ছে না, যা হচ্ছে না আদৌ সেটাই হওয়া দরকার, নয়তো এই মনে। খুলনা প্রসঙ্গ থেকে যাবে। আর প্রসঙ্গই মনে থেকে যাবে, এটা তো স্বাভাবিক।

অথচ আজকের সমাজ নিয়ে যে আমরা, সেটা যে দুর্ভাবনা তাতে আর সন্দেহ কি। সেই সমাজকে যদি যথার্থ বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করতে হয় তো, এক কথায়ই বলা যায়, সে সমাজ হচ্ছে ধর্ম-হীন অর্থহীন, নীতিহীন প্রতিহিংসা, বিশ্বাসহীন বিবেকহীন, সমস্যাহীন সমস্যা-হীন, চেতনা শূন্যপ্রায়, আত্মকেন্দ্রিক উদ্যম, আকাশ অসম্পূর্ণ, বিদ্রোহী মেরুদণ্ড, নির্লজ্জ নির্ভরে।

এক কথায়ই এই, দু'চারে তো আরো অনেকই বিস্তরে। অথচ একথা এই বিশ্লেষণের ধারণাই দেখতে হচ্ছে মনে হতে পারে এমন, আড়ষ্টতা, কিন্তু আজকের সমাজ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার যে চিন্তা এবং যে মনন তাকে বিশ্লেষণ করলে এই বিশ্লেষণগুলোই স্পষ্ট পরিচয়ে নিশ্চিত হয়ে উঠবে। অথচ? এই যদি আজকের সমাজের চেহারা হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্লীলতা কোথায়? কেন আজ মানুষের চিন্তায় কোন ঘন মেঘ, কেন মানুষ আশার উপর ভরসা রাখে, কেন পাশের মিত্র আমাদের হেঁয়ালি-হেঁয়ালি।

অথচ?

অথচ ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমাদের কথা বলবো বলে। অথচ উৎসাহ-উদ্দীপনা, দুশ্চিন্তা।

আজকের সমাজ সম্পর্কে এই এক-মনের হবে। এবং অভিযোগের ধ্বনি আর উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

একজন সাহিত্যিক যখন একজন সমাজ-বন্ধুদের সঙ্গের মতো আলাপ করেন, তখন তাঁকেও এ ই ধ্বনি উচ্চারণ করে যে কি। তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে সে উদ্দেশের প্রমাণ পড়ে। এটা সর্বক্ষণে এবং সর্ব-দেশেই কিছু পরিমাণে ঘটে থাকে। মহা-কালের আসন থেকে কালকে খণ্ড খণ্ড করে চিহ্নিত করে রাখতে পারে সাহিত্যিকই। ইতিহাসে যে কথা অনুক্ত থাকে, সাহিত্যে সেকথা প্রকাশিত হয়।

যদি ধরে নেওয়া যায় সমাজের পরি-চালকের চেয়ে সাহিত্যিকের অনুভূতি বেশী, দেশবাসের অধিক, ধারণাশক্তি তাঁর, তা হলে এটাও ধরে নিতে হবে আজকের যত আমাদের আমাদের অধিকার তাকে অধিক পরিচিত করে।

আজকের সমাজ দেখে আজকের সাহিত্যিকের আশঙ্কাই বেশী গভীর, অনুভূতি তীব্র।

আজকের সাহিত্যে সেই বেদনার, সেই অনুভূতির প্রতিফলনও আছে।

তবু আজও গভীরে একটি কথা থেকে যায়। সেই কথাটি হচ্ছে সাহিত্যিকের দ্বিতীয় সত্তার অন্তর্নিহিত কথা। সেই দ্বিতীয় সত্তাটির সঙ্গে এই একজনের ধ্বনিতেই আমরা থাকে না। তার সঙ্গে আমাদের মিলনের সম্পর্ক।

তার সঙ্গে যুক্ত পাওয়ার।
শিল্পের এবং সাহিত্যে।
অতীত এবং ভবিষ্যতের।

আমরা তার কাছে কেবলমাত্র বর্তমানের ছেলেই ধরিনা নয়, অতীত ভবিষ্যৎ দুই জনকে মিলেই তার বর্তমান কাল। তাই সে তীব্রতর আমরা দেখলেও তীব্র নিন্দায় কেন 'আমাদের' মনের মোদে না। অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার তাকে আমরা মেলাই।

বর্তমান সেখানে, এই ধরনের বিশ্লেষণ—বর্তমান সমাজকে নিয়ে যেখানে আমাদের নিশ্চিন্তের নির্ভরে থাকে না। যা হচ্ছে, তা যে ঠিক হচ্ছে না এ চিন্তা চিরন্তনের।

সমাজের যে আমূল ধ্বনি কল্পনা করা হয়ে থাকে, সমাজ যেখানেই সে ধ্বনি চলাই হয়ে থাকে শান্তি সেই না। নিয়ে চলাই না হয়ে ধ্বনিটাকেই আমাই করে তাকে ইচ্ছে মতো চলায়।

আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে আজকের মনের যে ধারণা, যে আতঙ্ক, যে শিহরণ, অতীতের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে অতীতকালের মনেরও সেই ধারণা সেই আতঙ্ক সেই শিহরণ ছিল।

'সমাজ' কোনোদিনই চিন্তাশীল বা দুশ্চিন্তামনের কারণ নয়, চিরদিনই তাদের আশ্রয়।

আজকালকার হলে নিতা নতুন সাম্য সাহিত্য আইন আমলে নিয়ম সমাজ প্রবর্তনের যে প্রয়োজনই হবে না।

সমাজের ভূমিকা চিরদিনই দুঃখকষ্টের ভূমিকা। মনে মনে শুধু পরিবর্তন আনার আকাঙ্ক্ষা করা হয়, কৌশলটা নতুন হয়, আর বিশেষ কিছু নয়।

যদি কথা হয় আজকের সমাজের আজ এমন বিভীষিকাময় সমাজ আর কখনো আসেনি, তা হলে এই আজকের সমাজটাকে একটি দেশী প্রবাদ দিয়ে বলা হবে। আজকের সমাজকে যে যে বিশেষণে বিভূষিত করা হয়ে থাকে, অতীতের সমাজেও সেই সেই দুষ্কৃতগুলির অভাব ছিল না। তবুও মানুষ সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়নি, বিরাজই টিকে আছে, এবং আজকের তো নিশ্চিন্ত বিশ্বাস আমাদের টিকে। একটুকরো অতীতকাল কাল মহাকালের চলতি খাতাকে বন্ধ করে দেবে এমন আশঙ্কার হেতু নেই।

চলতে কোনো এক সময় দেখা যাবে ইতিহাস তোমের সেই ধন হোর চলার-চলার না ধ্বনিতে ধরে এক পলকা ধ্বনি দিয়ে প্রতিটা সমাজ আজ নিজে আমাদের

আকাশদূত দেবী

ঈশ্বর চোখে পড়বে আমার উপলব্ধির উপায় সন্ধানের আমার কোনো ত্রুটি না থাকে যেন তাকে মেপে এসে কেন্দ্র কেন্দ্র হয়ে রয়েছে পড়ে সমাজের আলোয় সংশয় বিশ্বাস ভিজে মিশে একাকার হয়ে আছে, হয়তো সহসা চোখে পড়বে পরের নিজের সেই অন্ধকারটাকে পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাওয়াযাত করছে, অন্ধকার কোন অন্ধকারে তার নিজের বাড়িটা তুলে নিয়ে চোর হয়ে বসে আছে।

অন্ধকারের হয়রানিটা অনুমানীয়।

অন্ধে বিশ্বেই সে বিশ্বা হয়ে করে নেয় সে। অন্ধো অন্ধকারেই পথ করে ফেলে। শেষ অবধি হয়েছে যা সেই অন্ধকারেই 'শুরুমন' করে রয়েছে সে। আ মরি এই অন্ধকার পৃথিবীতে এতোকাল ধরে টিকে থাকবার কথা মানুষের মতো জোর একটা সাড়ে তিন হাত আর মানের জীবের? জল স্থল আকাশ অন্তরীক্ষ এর কোন জোরে দাঁড়ি?

অন্ধে কুমীর জলের বাঘ, গ্রামে সাপ শহরে লরী, বাজারে চোরের আর্ম, মাঠিতে হুকওয়ার্ম, রাস্তায় মস্তানীয়, সন্ধ্যেয় মশারি, অফিসে 'ঘর-এর বিয়ান, জোড়িতে ঘুষ নৈবদ্যে, আলোর অবিশ্বাস, ঘুমের নিদ্রাস, এবং আজ আবার ইকোলি প্রভৃতি নিয়েও মানুষ পৃথিবীর গায় আঁকড়ে টিকে যে আছে এতোকাল। বাজবেও বিশ্বিত। ঘুমে অন্ধি অন্ধি আবার আরেকটা আলাদা জিনিসের অন্ধকার রাতদিন ছড়িয়ে করছে, সোনার অতীতের দিকে চোখ নিশ্বাস ফেলছে, ভবিষ্যতের অন্ধকার ছবি দেখে আতঙ্কিত হবে, আর বর্তমানকে নিয়ে হিমশিম খাবে।

এদিকে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম, বর্ষাকালে বর্ষা এবং শীতকালে শীত কিছুতেই মানব সমাজের ইচ্ছের গঠিত আপোষ-মতের নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, অন্ধ বলপ্রয়োগে কখনো বসন্ত, অসময়ে হবার, চৈত্র ভঙ্গ, যে কোনো সময় যেমন এবং যেখানে, এসব থাকবে। থাকবে ঘন্দ, সংঘর্ষীতি, অন্তর্দেশন্ত, ভূমিকম্প।

আবার অর্থাৎ জন্ম সমাজও থাকবে।

আজকের সমাজের গুণীতি রাজনীতি কালোবাজার মোকাবেলার, মাইক্রোবি ঘুমোঘুমি, বাদল দুই, গুপ্তাঘাতী, বিদ্যুৎ নিলন, অন্ধকার সাহিত্য, ক্রমিয়ে দুর্বাদ, বাজারদরের অস্থিরমতি, ছেলেমানুষ পাগলী, টেনশেন ফ্লাইন, কোথাই তাকে শেষে কোনদিন পারবে না।

সে থাকবে।

এবং ঘুমেই যে থাকবে তা নয়, সে লিখবে, আঁকবে, ভাববে, নাচবে, গাইবে, খেলবে এবং খেলার টিকিট কিনবে সইবে দেবে। সে পাহাড়ে চড়বে আকাশে উড়বে, মহাকাশ বানাবে, চাঁদে ঘুটি আটাতে যাবে।

তবু তখনও এই আজকের সমাজটার দিকে তাকিয়ে একটি আফসোসের নিশ্বাস ফেলে বলবে, 'আহা কী সোনার মানুষই হারিয়েছি, আর কী হতভাগা আমরা এখন!'

আসলে এই হচ্ছে সমাজ প্রকৃতি এবং মানুষ প্রকৃতির ধারা। প্রবল আর অসীমের মধ্যেই তার লীলা অব্যাহত। আর প্রতিক্ষণ প্রতিমুহূর্তের মধ্যে সঙ্গতি করতে অসীমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝখানে তার অবিরাম, নিষ্ফল হবার ইচ্ছেটা আছে।

এই নিষ্ফল হবার ইচ্ছেটাই সর্বদা ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে না, যেন যেন বলছি, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝখানেই তার অনেকের উলটো-পালটা বিষয়টো কাজ।

অতএব আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে খুব একটা হতাশ হবার কারণ দেখিনা আমি।

সমাজে একদা যা ছিল ছিল, আর সব কিছু আছে, হয়তো তার সব কিছুই থাকবে। খুনে খুনে সমাজের শেষকথাই বলবার, কাটাকাটি বলবার না। শেষকথা কখনো ভবিষ্যতের পানছক নয়, কখনো বেগবান হয়েছিলের ছাঁচে টৈতন্য। আজ হয়তো এই মুহূর্তাদিক সমাজটাকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা।

পৃথিবী খুনে খুনে আলো কালো বহু অন্যায় বহু অন্যায়, বহু পাপচক্র, বহু নিরপরাধতা পার হয়ে হয়ে আজকের সমাজে এসে পৌঁছেছে, যে-সমাজকে দেখে অপরাধ সবাই তাঁর সন্তান আতঙ্কিত।

শুধু এখন নয়, এমন দেশে দেশে পৃথিবীকে এই অন্ধকারকে অন্ধকারে। কোনোদিকে তাকিয়েই ঈশ্বী করবার নেই। যে অন্ধকার আমরা আজ দেখছি, সেই অন্ধকার এর আগে আরো অনেকবারই অন্ধকার।

কিন্তু পৃথিবী এ সম্পর্কে অন্ধকারের পার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নাস্তি।

আমিই সেই আদি প্রতিবেশের কথা এসে গেছে, সমস্যাই সমাধানের পথ খুঁজে বার করে, তুলনাই উত্তর আবিষ্কার করে।

অন্ধকার হতাশ হয়ে যখন আলোর পথ-আদি খোদাবার দিন এসে গেছে বলে মনে করবার কোনো যুক্তি আছে, এমন আমার তো মনে হয় না।

একথা সত্য অন্ধকারের সমাজ আমাদের চিন্তিত করছে, পীড়িত করছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

পৃথিবীতে অন্ধকার সন্ধ্যা খুব সেই-খানেই আসতে পারে, যদি—সারিবিজ্ঞানের নির্লিপ্ত দৃষ্টি সূর্যালোকের পথ ছেড়ে সরে এসে অন্ধকারের রাজা নিম্ন হয়ে পড়ে পৃথিবীকে আলোর দৃষ্টিতে না দেখে অন্ধের দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। পৃথিবীর মুখোমুখের আকাশ নিজের অন্ধকার চোখে না করে তাকে গান গাইতে বলে।

চেনাদিগের গল্প

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

অফিসের বস বদলি হলেন বটে, তাহলে লেখতে পাই, সরকারী সার্ভিস অফিসে ঠিক পরদিন সকাল আটটা বাজে তার জিপ আর ড্রাইভার অফিস এসে সকাল পাঁচ মাস দাঁড়িয়ে ছিল।

. . . মিসেস বসু ছোট, অফিস কিন্তু অনেক বড়। তাই এত পরিবর্তন সার্ভিস অফিসে, তার আসার আগে টাইপিস্ট পর্যন্ত হয়ে গেছে। এসে গেছে এই সেদিন সার্ভিসে ঢুকেছিল অথচ এখনও আমি পুরোনোদের দলেই রয়ে গেছি।

অফিসের সার্ভিসটেনারও তাই ভাবত। মনে পড়ে ফুট এগারো ইঞ্চি সিনিয়রিটি নয়, অথবা একজিকিউটিভ ইঞ্চি মুখের হাসিটি যার অবশ্য উচ্চমন্যই তেঁতুল ওজনের বলতে নয়, তবু পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখেছে, কালো চুল, চওড়া কাঁধ, গায়ের রঙের টান-টান, চকচকে, সেজা হয়ে চলা, এখনও ঠিক তেমনটিই দেখছে। বিদায় সভার শেষে মঞ্চে চলে যাবার নিমন্ত্রণ, ওর মনে সভা-চেয়ার পাল, হাততালি থামতেই সে ফের বসে পড়েছে। মাথার টাক, মোটা পাঁচের চশমা, চোখের দৃষ্টিতে অফিসের পাকা ছাপ, ব্যক্তিত্বের পরিচয় অপ্রতুল। আমাদের অফিস বন্ধ করতে হবে বলে। বিদেশ থেকে ফিরবার পরদিনই সন্ধ্যা একজনের আসার ফিরোজ অর্থাৎ, আটটা বাজে হবে সাত, আসবার, না সাতাশবার?

ফিরোজ ফরার বাসনাবাদের আগে সেক্রেটারি ফেল আগে করিয়েছিলাম। ফ্রেমার, ইউনিয়ন, সল্টলেক, ফ্লাট, এমন কি, মুখের একজন একজন-এর সেক্রেটারি করিয়েছিলাম—

সব অসম্ভাই। অবশ্য, বাড়ির কাজ হলেই পড়ে গেছে। আর চলায় পড়লেই থাকে, কিছু পড়তে হলে বইয়ের ওপর মাথা ঝুঁকে চোখও অসম্ভাই।

রোজ সকালের পার্কে বেড়াতে যেতাম সেটাও পড়া। যখন পার্কে ঢুকছি, ঝিরু, খোকনকে খোকনটা ট্রাসটাসি দেখে, সবুজ ঘাসের এখানে ওখানে ফোল হয়ে ফুল ফোটার বা ঝলমলে যাওয়া, আইসক্রিমের ঠেলাগাড়ির ঝড়াঝড়ি, খেলার কলকল বা ঘোল-কলকলে সমস্তোলে নাম-কীর্তনের আসর, রাস্তার বড় লাইটের নীচে বসে ভাল খেলার ছবিটা, যখন চলতে হলে ঝিরু টেনে এগোতে হয়, সন্ধেবেলার সেই অসম্ভাই ঝিরের মতো বেড়াতে ঝিরু ভাল লাগত আমার। ওদের মতো খোরাফেরা করে বাড়িটা যেন আরও অচেনা হয়ে যেত। ভাল লাগত ঝিরু ও খোকনকে হারিয়ে যেতে।

হঠাৎ খিদে টের পেলাম, সন্ধ্যার নয়, ছোকরেলা পার্কে যাও। সে সময় ঝিরু একেবারেই থাকে না, পাড়ার ঝিরুদের-কথা সব মুখেই ঐ সময় থাকে।

প্রশ্ন তুলেছিলাম, ঝিরুদের করেছি বটে, কিন্তু আমি কি খুশি?

সোজা জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে খিদে জানান করলাম, পঁয়ত্রিশ বছর ঝিরু টেনে টেনে আজ ঘাটে এসে পৌঁছেছি, এখন নিরাপদ ঠাণ্ডা হাওয়ায় সামান্য জোয়াই ঝিরুক। স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে।'

যা ঝিরুক, তা যদি ছাড়া উপায় কি?

তাই আজকাল ভোরেই যাই। এখন শীতকাল, ঝিরুটা ঘাস, অথচ বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। রাতে ভাল ঘুম হয় না। ঘড়ি ধরে ঘণ্টাখানেক উঠে পড়ি। বেড়াতে সওয়া ঘণ্টারও বেশী হয় না। যখন ফিরে আসি, তখন পাড়াটা সেজেগুজে বার হয়। সামনের ঝিরি-ঘাস থেকে পাড়ার প্রথম বাস ধরতে দৌড়।

যত ভোরে যাই একজন ঝিরুক দেখা যায়।

দু-একটা বৃদ্ধ, ছেলেদের আর বুড়ো বুড়ী আসে। পার্কের এখানে সেখানে যত ঝুলে পড়েছে, সব তুলে নিয়ে যায়। আমি জানি ঝিরুর একটু পর সকালেই যে বাজার বসবে, সেখানকার ফুলের দোকানে এরা এই ফুলগুলি বিক্রী করে দেবে কিংবা নিজেরাই দোকান খুলে বসবে। কেউ হয়ত বাড়ীর জন্যও নিয়ে যায়। জানি না। অবশ্য পার্ক সেখানেরা ঠাণ্ডার জন্য কর্পোরেশনের লোক আছে। কেবল দেখতে পাই, ঝিরুটা নিয়ে এরা ঝিরিয়ে আসে, বেশ বড় ও নিখুঁত সতেজ ফুটি নিয়ে পথঘাট মাঝে পরিষ্কার করে ফেলে। ফুল ফোটার এত মায়া নিয়ে পারে না? আমারও ফোজ গরম হয়ে উঠে, ঝিরি, নিই ঝিরুক। আবার ভাবি, ঝি ঝিরুক, যাদের দেখবার কথা, তারা যদি না দেখে, আমার কি ঝিরুক থেকে লাভ ঝিরিয়ে ফোটাই, ফোরের ফুলন-করা নিয়মে হাওয়া খেতে পার্কে আসে, আমার এ নিয়ে ঝিরিয়ে হবার ঝিরুক কি?

যে দুটিকরক মুখে আসেন, তাঁদের দেখে আমার ঘাই মনে হবে যৌবন ফিরে এল।

একজন আসেন সিল্কের শাড়ি আর সাদেজা সেজি পরে। যৌবনে ঝিরুর খুব সাজিয়ে ছিলেন আর যা লম্বা দেখছি, আজও ঝিরুক ঝিরুক ছিল। বয়স আমার চাইতে দু-চার বছর বেশীই হবে পারে। কিন্তু এমনভাবে সাজসজ্জা? সিল্কের ঝিরুকে শুকনো নিরুম আর সাদেজার সাইজেই যখন কণ্ঠার হাড় ঝিরুর লিকলিকে হাত দেখা যায়, তখন নীচেও ঝিরুকই পাঁজরার হাড় গোনা যাবে: খুঁটিটা ঝিরুক নয়, কিন্তু ফেরবেন ঝিরুক উঁচে গেছে।

একজন আবার যাটের কোলী কিংবা ঝি জানি, ঝিরুক সৌখিনতম ঝিরুকসের একটা ঝিরু ঝিরুকের বাড়ি ফোন-ঝিরুক সামনে উঠেছেন। একটি ঝিরুকে নিয়ে আসেন আর একটা মোটা লাঠি ঝিরু করে হাঁটেন। হাঁটেন ঠিক নয়, একখানা পা ফেলে কয়েক সেকেণ্ড ঝিরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর একখানা পা ফেলেন। পুকুরটা ঘোরা ও দূরের কথা, ঝিনিকটে ঝিয়েই আবার ফিরে এসে অপেক্ষমান ঝিরুকার ফোলোটিক সাহায্যে বহু কষ্টে উঠে বসেন।

আর একজন মুখ আসেন বেশ স্মার্ট পোশাক পরে। পেণ্টসের মু, সাদা হাল মোজা, পাটভাঙা খটিক হাফশার্ট, ফেদরে বেল্ট, পেণ্টসের সঙ্গে মানানসই ফেদরে ঝোলানো আর হাতে সরু ঝিরুক। ফোন ফোন-দিন মুখে পাইপও দেখতে পাই। মুখের মত সাদা ঝিরুল কেশ পরিপাটি করে আঁচড়ান থাকে। পোশাক স্মার্ট ও খটিক, টান-টান হয়েই হাঁটতে ভদ্রলী করেন, কিন্তু খটি ফোরার? আমি যখন পুকুরটা দু পাক ঘোরা শেষ করে ফেলি, ভদ্রলোক তখন এক পাকও শেষ করতে পারেন না।

এরকম ধরনের আরও অনেক আসেন।

আর এইসব ঝিরিয়ে-পড়া মুখোসের মতো আমি পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি উঁচু শরীর আর এক্কাত্তর ইঞ্চি বুক নিয়ে ঝিরিয়া ঘণ্টাটা করে পুকুরের চারদিক দিয়ে অন্তত চারবার চক্কর ঝিরি। দেখে ওদের ঈর্ষা হয় কিনা জানি না।

পুকুরটা এমন কিছু ঝিরুক নয়। জল কালো আর ঝিরুর। নিশ্চয়ই নীচে প্রচুর পাঁক আছে। বর্ষাকালে পাড়-ঝিরুর করতে বেশী হলে জলজ ঝিরুকার ভয় ওঠে। অবশ্য পাড়পালার ঝিরুর একটা ঝিরুক আছে, কিন্তু ওখানে যাবার কোন ঝোলাঝুলা দেখে নেই। ঝিরিয়ে ঘাটের আর পাকে পাকে ফোরার বেঞ্চি। চারদিকে লোহার খুঁটিতে পাইপ লাগিয়ে ঝিরুর দেয়া আছে। আগে ঝিরুর বাঁধের ঝোঝাই, সুন্দর দেখাত। কিন্তু প্রাতে বহুলই স্নান করতে গিয়ে দু-একটা ছেলে ডুবে যেত। তাদেরই জন্যে লোহার বেড়া দিয়ে ঝিরুক ঝিরুক এই ফোহার বেড়া দেয়া হয়েছে।

খুঁটির ঝিরুর ফেরোসিন টিন ফোর একটা নোটিশও ঝিরুতে পাই, এই পুকুরে ভদ্রলোকের স্নান ও কাপড় ফোর নিষিদ্ধ। লেখার নীচে ঝিরুর পড়ে ঝিরুকার ফেরোসিনের ঝিরুটাই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নোটিশ মানে কে? তবে ডুবে মরার দুর্ঘটনা আর ঘটতে দেখছি না।

এমনি ডুবে যাবার একটি দুর্ঘটনা ঘটি ঝিরু অনেক কাল আগে আমাদের দেখে ঝিরুছিল। আমার বয়স তখন বারো বছর ঝিরুকে বি-এ পাঁচ। পুজোর ছুটিতে প্রতি বছরের মত দেওঘর বেড়াতে এসেছি। অনেক দিন পর বাড়ুজেরও এসেছেন বৌদি, ছেলে মেয়ে আর অল্প ছোট শালীকে নিয়ে আমাদের ঝিরুকি করেন বাসাবাড়িতে।

সকল প্রকার আধুনিক ষ্টেশনারী কাগজ, গাড়েনিং, ড্রইং ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ

৬৩-ই ঝিরুকরার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ফোন : অফিস। ২২-৮৫৮৮-৭৫ সেলস ২২-৩০০২, ওয়ার্কস : ৫৭-৫১১৫ (২ লাইন)

শ্বশুরে জেলাইয়ের বাসিন্দা। উড়িয়ালী বাঙালী। দুবি ও তার এমন বাঙালীর জীবনে বাংলা দেশই দেখেনি। সেই সে ছেলে এল ভিন্না বিন্ধ্যপুরের ছাত্র, তাও আবার বর্ষাকালে, যখন খাল, বিল, পুকুর, নদনদী ডুবে গিয়ে জল একেবারে থৈ-থৈ করে। যখন নৌকো ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু দুবি ভারী নাছোড় ছেলে। সাঁতার না জানলে কি হবে, নৌকোয় যে আঁকড়ে উঠত আর কিনা সাঁতারের না জানা সঙ্গী-তেনো ওপর পড়ে বিয়ে হি-হি করে হেসে উঠত।

একদিন আমরা চৌমহানায় এসে আমার ছাত্রের চালানো খেয়াতে চড়ে। খেয়া ডুবিয়ে জল চৌমহার ও জল ছেড়ে খেয়া খোলাখুলি ছেলেগুলো। আমি বললাম, 'শিখিয়ে দিন না, স্যার।'

কিন্তু শেখবে কাকে? নিজে ভাই ও। আর্মি হাসি, ছেলে বলে আমার মাঝের নীচে হাত বুলিয়ে বৈতরণী বুঝতে শেখ করছি বলেছে, তারপর সেই আমি একটা ঘুরিয়ে চাড় দিলাম, আমি ছিটকে পড়লে জলের ওপরে গিয়ে একেবারে আমার গায়ের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল আর ছেলে উঠল হি-হি করে। বললাম, 'খেয়া চালানো হলো আমার কোনু রকমের হয় না, বরঞ্চ... হয় ছোঁড়া।'

সেই ছোঁড়াটাই 'শিখিয়ে দিন না, স্যার।'

আর একদিন এমনি দেখেছি, এমন সময় দুইয়ালী বড়ুয়া পক্ষ একটা গয়না নেয়ে আসছিল। গয়নাটা আনি, বেশ বড় সাইজের। ওরে একজন বলে ছোঁ দিয়ে জল টেনেনে বেশ চলানো যায় নৌকোর মত। অমনি ছেলে জল, চড়ী।

কিন্তুত জলযান দেখেই দুবি বলে উঠল, 'আচ্ছা, নৌকাটা কিসের ওপর আছে?' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখেই হাততালি দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। নৌকোর টাল খেল, টাল সামলাতে এপাশে গেল, ওপাশেও টাল, তারপর এপাশ-ওপাশ করতে গিয়ে নৌকো আর হয়ে জল উঠল, নৌকো ডুবে গেল। আর সেই সঙ্গে একপাল ইঁদুর হয়ে দুবিও উল্টিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ হাঁপিয়ে পড়লাম। সিভালরির দেখবার সুযোগ কি হারা যায়?

নিরুপায়ভাবে কিনারে আসবার আগে বারে-বারে ঠেলে আসতে হয়, তা আমি আগেই জানা ছিল। কিন্তু দুবি আমার আগে গেল একেবারে ডুবারুর মত ডুবিয়ে ধরল আর চিৎকার করে আমাকে সাবধান করতে লাগল। বললাম, 'আমার কিন্তু, আমিও যে ডুবে যাব।'

ও আরও উঁচুটে ধরে বলে আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে রইল।

ওকে ডুবের ওপর ভাসিয়ে রেখে আমরা অর্ধেক টিন সাঁতার কাটতে কাটতে যখন এসে ঘাটে পৌঁছাম, তখন বেচি ওর হাত আলগা হয়ে আসছে, ও জোর হাঁপিয়েছে। পাড়াগেঁয়ে ডুবে ডুবে ওপরে এসে ওকে যখন মাটির ওপর শুইয়ে দিলাম, তখন জানাজানি হয়ে গেছে, পাড়ার সবাই ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। দুইয়ালী পক্ষ সঙ্গী ফেলে উঠে এসেছে। আর একটি বাড়ন্ত-ডি ডাক্তারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

মা, বৌদিরা চীৎকার করে কান্না শুরু করলেন।

ডাক্তার বাড়ী ছিলেন, জল খুঁজতে পারলেন না। আমায় বললেন, 'কল পাঠিয়ে আসুন ত।'

দুবির বুকের বাঁ-দিকটায় কান পাতলাম। শোনা যায় না। ক্ষীণ ঢেউ দিচ্ছে। ডাক্তার বোঝা যায় না। এবার উঠে বললাম। হাঁ, আমার আওয়াজ পাচ্ছি। টে-টে টে-টে।

ব্যস, দুবি বেঁচে আছে।

ডাক্তার বললেন, 'অনেকখানি জল খেয়েছে মনে হচ্ছে। উঁচু দেখে চেয়ারে শোয়ান, পাড়ার বাঁধানো খেলে যাক।'

কাঁধে করে দু-একজন এগিয়ে এলেন। ব্যাটারের বোতাম খুলে ফেললেন, রোগি-দেরের বাতাস খুলে দিলেন। কেউবা একেবারে নখ-মুখ-বিচ্ছিন্ন-কাঁচা দিয়ে ঠেকে দিলেন। ডাক্তার-সেরের বাঁধন আলগা করে সেটাই আগে আমার মাটিতে নামিয়ে দিলেন। আমরা আবার জল খেয়েছে উঠে বসেছি।

কি করে জল বার করা যাবে?

একজন উলটে ওর দুপায়ের টিন বাঁধার ওপর ছেলে ফেলবেন। মাটিতে মাথা মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু কে ফেলবে? কে তুলবে ওকে আবার ওপর? প্রীতিকর পরীক্ষাটা কল নয়, ওর ওপর জল খেয়ে ওজন আরও বেড়ে গেছে।

সবাই তাকালেন আমার দিকে। পাঁচ ছুট এমারে না হলেও ছয়টা আটে উঁচু দেহ আমি আর ছাড়িও আটাদের ছুঁই-ছুঁই। বাবা কিন্তুক করলেন, 'পারবি দুবি?'

নিশ্চয়ই পারব। কষ্ট করে হলেও পারতে হবে যে! সিভালরির দেখাবার সুযোগ কি হারতে আছে। একবার সুযোগ পেয়েছি বলেই তো দুবি যখন দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ওকে আমি ওবে বুকের ওপর তুলে নিয়ে চিৎ সাঁতারে ঠেলে পাড়ে এসেছিলাম। আমার একটা সুযোগ! বললাম, 'পারব।'

মা বাড়ী থেকে নিলেন, সারার ঘুরিয়ে দেখে দিলেন, জামাটা আলবাই ছাড়ান।

মনের কথাটা যে, তার অবশ্য গয়না-সমেত বালাই ছাড়ান চলবে কেন?

আমার ঘুরে যায় কয়েক পৌঁছানোই সাঁতার বুক দিয়ে অনেকখানি জল খেয়ে নিয়ে ফেলল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারও এসে পড়লেন।

সে ধাক্কায় জল খেয়ে ফেল দুবি।

বাইশ বছর বয়সের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই প্রথম যুবতী নারীর নিবিড় স্পর্শ পেয়েছিলাম আর পেয়েছিলাম জল বুক আর নরম দেহ। কি জানি, কি অনুভব, আজও মনে করলে হৃৎপিণ্ডের বেগ বেড়ে যায়!

সমস্ত গোমা পুনেও দুবির আকর্ষণ কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখিনি। আগেই মত সে নিজে নিজে করে বুক নৌকো চালাতে শুরু, সাঁতারও নিয়ে ফেলল। আমার সঙ্গে প্রায়ই সাঁতার কাটত আর অনেকদিন নিয়ে এসেছি সব অবান্তর-প্রয়োজন কথা আজ আর হাসত যে, আমার কলে নয়ন ছিটে উঠত।

সেকেন্দ্রাবাদে ডাক্তারেরা ওর ফুসফুসই করে বলেছিলেন, রোজ যা ভাবাবেগের কারণ, দুবিকে জানবে জল।

ডাক্তার কত ভেল ঠি।

আমার সময় এগিয়ে দুবি কথা করে বলেছিল, চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মন পড়ে রইল তোমার কাছে।

আমিও জোরালি জবাব দিয়েছিলাম, আমি আমার মন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে।

তারপর দীর্ঘ জীবনে আরও অনেক দুবি এসেছিল। পরস্পরী দুবিতে দুবিতে হাসের কথা মনে পড়ে। আমাই মনে করে। সেখানে দু' আর চাকরির মত আটাশ বছরের সীমানা নেই।

ডালাই চলছিল পাকের প্রয়োজন।

কিন্তু জগৎ আলে একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধা গেছে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
অ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL-327.BEN

কখন থেকেই লক্ষ করছিলাম। রিটা-মেয়ে-বন্ধু বুড়োদের মধ্যে একটি তরুণ-গোছের, মানে বুড়োটী ছেলেও আসতে শুরু করেছে। কেন কি আমি ওকে কম করে চাই, তেমন কি ওজনদার কথি। তারী মিষ্টি এক আদর পাই।

রীতিমত কর্সা আর সুন্দরী। সিঁথিতে অল্প কুমকুম সিন্দুর। কেন লাগে দেখতে। কিন্তু ঐ যে আজকালকার সোলাক, যাকে বলে 'আলট্রামডার্ন', ওটা ভাল লাগে না। সাহেবদোকানের ঐ বড় ব্যাজটার হাত, বুকের বাঁচাই সেখ আর শাড়ীর শুরু নাভির নীচে থেকে। শাড়ীখানার নিম্নাঙ্গ, শুরু এক-একটিবার এক-এক ভঙ্গি ডিজাইন ও রং। যেন পারদের হাওয়ায় আন্দোলমানা ঊঠে ঊঠে যায় কিংবা পায়ের সঙ্গে সেটে বসে। ফলে শরীরের স্ট্যাটিসটিকস ফীকা হয়ে ওঠে। আমার মনে পড়লে মেক্সিকোর গল্প মনোরঞ্জক হবার ছিল। ঢুকে বসবার সময় চুলে হাত বুলে মাথা নীচু করে শুরু খানিকটা সিঁথি রঙ ছড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। পরে লক্ষ করেছিলাম, লক্ষ্য কেটে যেত, টেন ঊনঘরে ছাঁটে, চোখে চোখে চায়, শুরু হাওয়া হয়ে এসে কখনও কখনও আঁচলটাও ঘুরিয়ে দেয় আমার শরীরে।

কিন্তু মেয়েটির খালি পা। জোড়ে খালি-পায়ে হাঁটা নাকি স্বাস্থ্যকর।

·· তবু আর ও ওকটকে দেখিনি।

অনেক রাত অবধি সাহিত্যিকদলে ফেরবার ঘিরে দেখেছিলাম, সুরেশা মেয়েরা হাত-ধরাধরি করে ছোটবেলা দল বেঁধে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সবার খালি-পা। শুনেছিলাম, এটাই ওখানকার নিয়ম, কারণ, ওটা স্বাস্থ্যকর।

কি জানি, হয়ত এই মেয়েটি সাহিত্য-নিয়মেরই।

ঘরে একদিন দেখি, মেয়েটি ঘরের কোণ ঘেঁষে পড়ে পায়ের তলা ছেলে ঘষছে, ঘষ দেখা যাচ্ছে।

আমি তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে ছল করছিলাম। বেলাশেষের চোখে মেয়েরে ফেরবার আমার ঘিরে, যা এগিয়ে পড়বার যা। আর যে কজন রাতি ওয়াক করছে, ওদের তুলনায় আমি যে যাই ঘরের শুরুক।

'কি হয়েছে?'

কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, ঘাসের মধ্যে কোথায় কাঁচের টুকরো ছিল, দেখতে পাই নি, অনেকখানি কেটে গেছে।'

দেখবার কাটাটা। না, খুব অনেকখানি কিছু, তবে ছিল হয়ে পড়ে।

ও আবার বলল, 'মাদু, কাঁচটা বোধ হয় চুকে রয়েছে, যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।'

চোখেমুখে দেখলাম, যেন ঊনঘরে আমার কিছু দোষ নেই যা।

দেখেই বেরলাম মেয়েটি, 'মাদু আমি আসি যা কি বলে?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় থাকে?'

'সুলতা মুখার্জী লেনে।—ঐ যাওয়া যেন চলেই যাচ্ছে।'

ইতিমধ্যে সেই বুড়োরা এসে গেছেন।

সিনেমার মুখি বললেন, 'সুলতা মুখার্জি' লেন ত কেন খুঁজে, রিকসায় যেতে হবে।'

এত ঘোরে রিকসা ঘোরার পাওয়া যায়? পথের দিকে চাইলাম, ট্রপিকাল অঞ্চলের মধ্যে রিকসা ছাড়া একটিও নেই। বিদেশের ঘাটনার পর ওরাও ত একটু বিশ্রাম করবে। আমাদের মত বিদেশের অর্থেন।

ট্রপিকাল বুড়োরা ব্যাপারটা। নিজে থেকেই বললেন, 'তাহলে আমার রিকসাটাই যাক, ব্যাজিকে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ বেঞ্চিতে বসছি।'

স্পেনটস মেলি বললেন, 'তাড়াতাড়ি এ ঠি এল বেরা করবেন।'

মেয়েটি ফেরে গেলেন, 'মাদু, আমি একা ফেরে পারব না, হারিয়েই পারব যা। অপনি আমার পৌঁছে দিন মাদু!'

বললাম, 'আমি তোমার ভুলে দিচ্ছি, ওখানে কেউ আসিয়ে নেবে।'

'না, না, মাদু, আমার ভীষণ ব্যথা করছে, আমি ঊঠেরেই পারছি না।'

বুড়োরা বলল, 'যান না সঙ্গে, আমরা এই রিকসাতেই চলে আসছেন। আপনার মেয়ের বয়সী মেয়ে—যান না।'

'মাদু!' মেয়েটি ঘরের ওপর প্রায় এলিয়ে পড়ল। সাহিত্যিক চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কর্সা মেয়ের গলে জল। হাতের ছাঁকে রক্ত। কর্সা মেয়ের কর্সা হাতে রক্ত। সেই সিনেমার শাড়ী, সেই সিঁথি কুমকুম।

অসহায়। ঘরের আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম আর মেয়েটি তান হাত আমার কাঁধে তুলে দিয়ে খোনকরমে এক পা তুলে লাফাতে লাফাতে ঊঠল রিকসায়। আমি ওর পাশে বসতেই ও যেন গা ছেড়ে দিল আমার গায়ে।

কিন্তু অতটুকু আদরেই কি অসহায় হয়ে পড়া যায়? খোনাবোস নয়, একেবারে ঠনঠনিয়া হয়ে গেলাম।

খুব খুশি কিনার খালি পথে গাইল ঘরে ফেরবার জন্য। তারপর জিজ্ঞেস করলাম।

বলল, ওরা 'ক্রিশ্চিয়ানী', খুলনা থেকে এসেছে। কর্তাদিন স্টেশনে, তারপর কুড়ি-পাঁচে যা ঘরে ফেরেছে। ওরা ত' কুড়ি-পাঁচেই ঘরে ফেরেন নিজ ঠিকিনায়। অনেক চেষ্টা করে বাবা একটা চাকরি জুটিয়ে এই সুলতা মুখার্জী লেনে বাসা ভাড়া। পড়ায় ঘিরে দিয়েছে। স্থানী সরকারী অফিসে চাকরি করে। সেই দিয়ে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, 'আমাদের মত অবস্থার সংসার মাদু!'

কলে। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, এদের ঘিরে এদের ঘরের সিনেমার শাড়ী কি অবস্থার চিহ্ন?

একটা ঘিরের ঘড়ির সামনে রিকসা থামল পরে। সেই ঘরের ঘর, এক উঠোনে। ঘরে যে উঠোনে চুকে চলে যাওয়াই ওদের।

যা যেমনের ঘরকন্নার ঘিরেন। আমরা পরে ঘরে আসবে পারলেন না, দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। কথায় সব ঘরিয়ে। এদুনি যে আমরাঘরানার নিয়ে ঘিরে এ ঘি এল মেয়ে সরলার, কাঁচের টুকরে ছেলের ঘরে মেয়ে ঘিরা দেখা করলার, ডাও বলবার।

সরলা বলল, 'মাদুকে একটু ও আর না ও মাসী।'

মাসী। তাহলে মা নয়। মা কোথায়? চমকলাম খানি-খানি পলকের ঘরে আমি। পরে অর্থনাস্তিক পরলা। এদিকে ট্রেসিং-টেবিল। আলমারীতে ঘিরেটারের। ঘরলার মাসী মাসী সাড়ী। ঘিনের ঘরলা ঘুলো-মাসী। এই কি ঘরের সরলার মধ্যে? ও মাসীই বা কোথায়? আর সরলা?

হঠাৎ মাদুর সচেতন হল। একটানে হাঁচু মুছাই পাদুকে ফেলে উঠল। চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। 'উঠি' বলেই উঠে দাঁড়ালাম।

এগিয়ে পড়া পরলার নিজের আঁচল তখন পড়ে গেছে। ঘিনলার ঘরাটের ঘরে মুছাই উঠিয়ে ঘুলে হাত বাড়িয়ে ঠোঁট টিপে হেসে হেসে বলল, 'আপনি যেন কেমন মাদু। বসুন না। মাদু, এ মাদু—'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিকসায় উঠেই বললাম, 'ঘরাবি চল।'

ঊনো ঘিনের ঘরে ঘাঁটের ওপর দুদিন ঘুলে বসে একটা লেখা বাঁচান করছিল। ঘিরি মুখোজনী ঘরে পাশে পাশে ঘরে ঘেরে ঊঠল।

আজ নিশ্চয় ঘরেরি আর পার্কে যাব না। ওজোন-ভরা হাওয়া আমার দরকার নেই। ঘিরী বললেও যাব না।

সকল অসুখে অপরিবর্তিত ও অপরিহার্য পানীয়

চা

খেলবার সময় 'অমৃতকলসের' এই সব ঘিরের খেলের আস্বাদন

অমৃতকলস টি হাউস

৭, চৌরঙ্গী স্কীট কলিকাতা-১
২, ধর্মতলা স্কীট কলিকাতা-১
৫৬, বিডন এভিনিউ কলিকাতা-১২

॥ পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের অবশ্যই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ॥

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মৃত্যুহীন প্রাণ

আন্দামান সেলুলার জেল থেকে ১৯২৩-এর ৭ জুলাই তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

'মা, এতদিন পত্র লিখার চেষ্টা করি নাই, কারণ জানি জানিতাম মা,—হাত অবশ হয়ে যাইবে। তোমার যখন অবসর দেখি— তখন লিখিতে পারি নাই। আবার যখন লিখিতে বসি তখনই কথা বেদনায়—তখন কাগজের উপর ঝাপা ফেলাইতে হয়। তিনি নিজে আমাকে লিখেছিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যে আমাদের মুক্ত করে আনার চেষ্টা করে তাঁর কর্তব্য শেষ করিবেন। সকলেই আশা করিয়াছিল যে তাঁর আশ্বাসের ফল তিনি সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু এর মধ্যেই বড়লাটের লোকের ধর্মান্ধতার জন্যই অবসর ঘটে। কিন্তু এ যেন অসীমসাগরে অবলম্বন সহসে ডুবে যায় না।'

১৯২৫-এর ১৬ জুন দার্জিলিং-এ স্টেপ-এসাইড নামক জায়গায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেই মৃত্যু সেদিন সমস্ত দেশবাসীকে যে কিভাবে আকুল করেছিল তা সেদিন বড়দের বালক হলেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আন্দামানে দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন চরম হয়েছিল, আর বাঙ্গালীর এই মহাপ্রয়াণে সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষায়—

'একদল ছিল, একদল আপনার জনের জন্য মানুষের দুঃখের অন্ত কেমন করিয়া করিতে থাকে—এ সেই। যাঁর জন্য যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলেন, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার অবধি নাই, পরের কাছে জানাইতে তাদেরও লজ্জা নাই।'

আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন চার লাইন—

'এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।।'

সেই মৃত্যুহীন মৃত্যুঞ্জয় চিত্তরঞ্জন দাশের এই বছর জন্ম শতবার্ষিকী—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর তারিখে দেশবন্ধু ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এই সংসারে ছিলেন মাত্র ৫৫ বছর, আর এই অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এক মর্যাদার আসন লাভ করেছেন।

দেশবন্ধু অসহযোগিতা উপলক্ষে প্রবীণ সাহিত্যসেবক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও অধ্যাপক সাধনার 'চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা রচনা করেছেন এবং তাঁর জীবনীগ্রন্থ দেশবন্ধু বাংলার জীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে এবং নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই গ্রন্থের লেখক নীরবে একান্ত নিষ্ঠায় সাধনার ধন এবং সাহিত্যের যে বিভাগটিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তার লেখক সংখ্যাও যেমন পরিমিত পরিচয়ও তেমনই বিরল। এ জন্যে তিনি আমাদের অভিনন্দনের মহাজনদের গ্রন্থে আর-একটির জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন বলে মনে অত্যধিকতর প্রশ্ন পূর্বসূরীদের মহাজীবনের কথা আলোচনা কৌতূহল বিন্দুর। তিনি জীবনী-সাহিত্য-রচনার রীতিটি অর্জন করেছেন, কারণে চরিত্র গঠনে তাঁর গ্রন্থাবলী বিশেষ সহায়ক. তথ্য সংগ্রহের বিষয় কোনো ত্রুটি রাখেন বা অন্য প্রকারের সন্ধানলাভ করা তাঁর ভালো ঘটেনি। তথ্যভিত্তিক জীবনী-গ্রন্থ রচনায় যাঁর খাঁটি একটি নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেছেন।

লেখকের এই গ্রন্থটি দেশবন্ধুর জীবন-কথা শুধু নয়, এর মধ্যে আছে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস। তথ্যাদি সংগ্রহে তিনি অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং এই তিনটি খণ্ডই একত্রে পরিবেশিত। প্রথম খণ্ডে আছে ১৮৭০-১৯১৯, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯১৭-১৯২২ এবং তৃতীয় খণ্ডে ১৯২২-২৫-এর কথা আছে। এই ৫৫ বছরের মধ্যে আছে বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে অসহযোগ হিমাচল সেদিন চরম হয়ে উঠেছিল একথা বলেছি। বাংলার কবিকুল তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং কবি নজরুল ইসলামের 'চিত্তনামা' এই দিক থেকে একটি অবিস্মরণীয় শোকগাথা। যেদিন দেশবন্ধুর মরদেহ কেওড়াতলাঘাটে ভস্মীভূত করা হল সেদিন মহাত্মা গান্ধী অনেক স্থানে থেকেই সন্ধানে এসে একটি বেতার-ও করেছিলেন, তিনি দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত অসহযোগ সৈনিকের জন্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন আর কুমারটুলীর মৃৎশিল্পী সোদেশ্বর পাল একপাশে বসে তাঁর একটি মূর্তির মূর্তি গড়ছিলেন। গান্ধীজীকে আমরা এই অবস্থায় সেই বাসর বসতে দেখে-ছিলাম। একথা মনে আছে যে, তিনি যে কতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর বক্তব্যের কাটকাটের সেদিন ঘুরে-ছিলাম। গান্ধীজীর সেই প্রবন্ধ ১১ জুন ১৯২৫ তারিখে যংইয়ং পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধটি লিখেই দেবতা এই গ্রন্থটি সুরু করেছেন।

গান্ধীজী সেই প্রবন্ধে অনেক কথার মধ্যে লিখেছিলেন।

শুধু বাংলা দেশের উপর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দেশবন্ধুর অসীম প্রভাব ছিল। তাঁহার জনসাধারণের তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁর আবাহন আসে ছিল। তাঁর উদারতারও সীমা ছিল না। তাঁর প্রেমের হস্ত সকলের প্রতি সমভাবে প্রসারিত ছিল। তিনি যেমন মহান ছিলেন, তেমনি বিনয়ী ছিলেন। তাঁর কর্মশক্তির প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি দেশের জন্য জীবন দান করেছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক হওয়াতেই তিনি তাঁর বন্ধুকে পাঞ্জাবমেল অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধ উপলক্ষে তাঁহার জীবনদান করতে হল। এই স্নেহের দান অতি মহান।"

গান্ধীজী এই প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় দেশবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। দেশবন্ধু সকল প্রকার অনৈক্যকে দূরে রাখার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। গান্ধীজী লিখেছেন—

"দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান মিলনের অনুরাগী ছিলেন এবং তাতে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজান্ত সম্ভব সহযোগে হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বিয়োগে কি আমাদের অনৈক্যকে জয়ীভূত করতে পারব না।"

এই প্রবন্ধেই তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি করেন—"দেশবন্ধু মরেন নি—দেশবন্ধু চিরজীবী হোন।"

এই গ্রন্থের লেখক যথার্থই বলেছেন—"দেশবন্ধুর জীবন যেন একটি অসমাপ্ত কাব্য। তথাপি এমন মহাপ্রাণ জীবন-বিমান অকালেই শেষে আসে তা নয়। সময়ের তার শেষ নয়। তাঁর দেহত্যাগের পিছনে ছিল এক গভীর অন্তর্দাহ। তাঁর সেই আবেগের ভিত্তি ছিল মহান জাতীয়তাবাদ। তার প্রেরণা ও প্রসাদ ছিলেন চিত্ত-নির্ঝরস্বপ্ন-অরবিন্দ।" এই কারণেই দেশবন্ধু সমগ্র দেশে একটা আকাশ আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"আমার মনে হয়েছে যে, আমার সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন।"

দেশবন্ধুর সমস্ত পরিবারই স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেন, পরিবারের প্রায় প্রতিজনই ১৯২৮-এর কারাবরণ করেন। অথচ ব্রিটিশদের সঙ্গে দেশবন্ধুর বন্ধুত্বের কথা কে না জানে। ১৯০৭-এ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের জীবনের দিক-পরিবর্তন সূচিত হয়। আলিপুরের ও অন্যান্য মামলা দুটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্যের যে বাসনা জাগে তাহা সেই মামলাকে কেন্দ্র করেই দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। এই মোকদ্দমার শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গির অকপটস্বামী চিত্তরঞ্জনের চরিত্রগত গ্রন্থি আকৃষ্ট হলেন। এরপর ব্যক্তিগত কোনো মামলার শ্রীঅরবিন্দের সমর্থনে এঁদের এগিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> He came unexpectedly, a friend of mine..... You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practice, who sat up half the night day after day for months and broke his health to save me — Srijut Chittaranjan Das. When I saw him I was shocked".

এই চিত্তরঞ্জন দাস। এ শুধু তাঁর মহত্ত্বের কথা নির্দেশ নয়, অন্তরের প্রতি প্রসন্ন অনুরাগ না থাকলে মুখের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন সব ছেড়ে এই একটি মোকদ্দমার পিছনে তিনি আত্মনিয়োগ করে কখনও হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আসামী আইনজ্ঞান এবং প্রতিপক্ষের বড় বড় আইনজ্ঞ তাঁদের এক মহান নিদর্শন। যে তার শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Chittaranjan's speech for nine Days and it was an epic of forensic art, and the prosecution with which he ended will rank among the classics of legal addresses".

চিত্তরঞ্জন দাস এই জবাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে অবতরণ করেন।

অতঃপর্যুক্ত অনুষ্ঠিত কলকাতার প্রেসিডেন্সি সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—"যে সত্য আমার হৃদয়ে অনুভূতিতে, যাহাকে আমার বক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, যাহাকে রক্ষিত রাখিতে হইলে যে পরীক্ষারও দৃষ্টির আবশ্যক তাহা আমার নাই। আর যাই বলিয়া তার জন্য কেন অনুরোধও হয় না। আমি আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি চিরই হউক আর অচিরই হউক, আপনাদের অনুধাবন চিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।"

লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি হার্ট অব আরবিন্দ" নামক গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে এই ভাষণটি আলোচনা করেছেন এবং তার বিদ্রূপ সমালোচনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনও করেছেন। চিত্তরঞ্জনের এই প্রথমতম মূল্যবান রাজনৈতিক ভাষণ।

অরবিন্দের "দেশবন্ধু" গ্রন্থের লেখক এই অধ্যায়টি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের পরিবর্তন আরম্ভের এই সূত্রে।

চিত্তরঞ্জনের কবিজীবন এবং নারায়ণ পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের শুরু এই অধ্যায়টি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হওয়া প্রয়োজন। অনুবাদকার দেশবন্ধুর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"হিমাদ্রির কোন দেবতাত্মা-বলে পাহাড় কেটার ধারার মত/ অনুর্বরতা ভরিয়া করিয়া দিবে তার জীবনের ধার/ আছে সে প্রবল বাসনার কবি বলীর পূজারী সে অকুতোভয়/ জীবন-যজ্ঞের অন্তর বিলয়ে বিরাটের দিবে দেশের দাবী।"

দেশবন্ধুর মতো শুধু রাজনীতি জীবনের নয় ভারতের ঐতিহাসিক ইতিহাসে এক মুহূর্তের জন্যও ইতিহাস।

দেশবন্ধুর বিস্তৃত জীবনালেখ্য, পারিবারিক দৃষ্টিতে প্রায় প্রচুর অপ্রীতি এবং সেই সঙ্গে অসামান্য অবদানই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। তাঁর যাবতীয় এই কৃতিত্বই পাই করলে এই অসাধারণের সাধিক মূল্য নির্ণয় জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যাবে। দেশবন্ধুর জন্ম-শতবার্ষিকী মহাসমারোহে প্রবর্তিত এই কৃতিত্ব এক আশা আয়োজন। কৃতিত্বের অনেক-গুলি দাবি আছে।

—অন্নদাশঙ্কর

দেশবন্ধু (জীবন কথা) শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য। ভারতী। ১৩৪৯, মূল্য দেড় টাকা, অগ্রিমমূল্য—১। পৃষ্ঠা ১ পৃষ্ঠার উপর বড়।

সাহিত্যের খবর

গত শুক্রবার ১৬ জানুয়ারী নগর সমিতির উদ্যোগে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে কেওড়াতলা শ্মশানে অনাথিনী শরৎকুমারীর, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে উদ্বোধিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—কেওড়াতলা শ্মশানে শবদাহের পরে শরৎকুমারীর একটি স্মারক স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য এবং বালিকা শিক্ষার পুরস্কার ১০ হাজার টাকার জন্য নগর সমিতি আবেদনের কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই হয় নি। তিনি দেশবাসীকে বিষয় দুটি বিবেচনার জন্য আবেদন জানান। দেশের প্রধান শূন্য প্রধান জাতীয় ছিলেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিষয় দুটি বিবেচনা করবার জন্য আশ্বাস দেন। বিভিন্ন মাধ্যমে শব থেকে সৌধিয় নগর-সমিতি কেওড়াতলা শ্মশানে অর্পণ করা হয়।

ডাকাত [illegible] প্রকাশিত হয়েছে সুবর্ণরেখা। বইটি নিয়ে আলোচনার বদলে [illegible] করা হয়েছে। আমরা উপন্যাস [illegible] এর [illegible] কেন অনুরোধ করি। আমরা আশা করি 'সুবর্ণরেখা'—উপন্যাসটির [illegible] আলোচনা দেখতে।

[illegible] উপন্যাসটি ইন্দ্রনাথের লেখা। তাই জোর, যদি তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রনাথের লেখা নামক্রমের বাঁধা রাখিলে বাজার তাহিনী নিয়েই উপন্যাসটির পরিচয় গড়ে উঠেছে। আমাদের লেখকদের এই ধারণার মূলে একটা ঐতিহাসিক আছে, যা বাঙালির এক অপরিচয় অনু দুঃখের।

নিজে লেখক বা ইন্দ্রনাথের একটি প্রথমটির পূর্বে প্রকাশ ঘ.ছাড়িনের সাহিত্যের আর একটি উৎসের খোঁজ। ১৯২৩ সালে যখন এই খাঁটি প্রথম প্রতিভির হয়, তখন অনেকেরই বিশ্ব জেগে প্রকাশক ফরিয়াদ হয়। বৃহত্তরের সম্পাদক বাজারের এক কি কোলাহলী অনুর খাঁটি সূত্র দৃষ্টির দেবার পর, অনেকেরই অভিযোগ করেছে। এবার খাঁটির ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন অমলিনের অনাদের মেধা নিয়ে কবি অনেক কোলাহল। তিনি ইন্দ্রনাথ জীবনী সম্বন্ধে যা উদ্ধৃত করেছেন—তা থেকে জানা যায়, ১৮১৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু[illegible] ইংরেজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নিউইয়র্কের সিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। এক সময় সাহিত্যজীবনের অনাদিবিষয় করে তিনি ধরে পড়াশুনা নেওয়া ছেড়ে অধ্যয়নরত হয়েন। তিনি ইন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনায় এবং গুই-তারা পড়ুয়া প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৭ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায় অজাত-অনেই ছিলেন। ইন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয় ১৯২০ থেকে কবিতা ও ছোট গল্প অনুবাদের মাধ্যমে। বর্তমানে তাঁর প্রায় ৩০,০০০ পৃষ্ঠার গদ্য, কবিতা অনুবাদিত প্রকাশের কিন্তু ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে জমা রয়েছে।

'আমাদি বসন্ত' হল পাঞ্জাবী লেখক-দের কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই সংস্থার বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে থাকে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নির্বাচন। ১৯৬৮-৬৯ সালে সাতটি গ্রন্থ বিভিন্ন শাখার শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত গ্রন্থগুলি হল—উপন্যাসে [illegible] নিয়ে কাজেন্দ্র 'অমর' নামক ১০' [illegible] পুরস্কার। নিজের আইডে বি ইন্দ্র [illegible]। প্রকাশের উদ্যোক্তারা যে, অনুবাদ [illegible] পুরস্কার নিয়েছে এক একটি সাহিত্যের অনুবাদ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যে [illegible] শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত হয়েছে সেটি [illegible] নিয়ে শ্রেষ্ঠীর অনুবাদ নিয়ে [illegible] প্রকাশ। শ্রেষ্ঠ অনুবাদ ছেড়ে [illegible] নিয়ে প্রকাশ। কবিতার জন্য সুখ পাঞ্জাবির নিয়ে [illegible] সূত্রে ১ লাখ; সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে [illegible] প্রকাশ নিয়েছে [illegible] নিয়ে যা তাঁর নাম [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] হয়েছে।

[illegible] নিয়ে [illegible] পাঞ্জাবি [illegible] [illegible] [illegible]

পাঠ্যপুস্তক এই আবহাওয়ার দিক থেকে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে, ও-জেলা স্কুলের লেখক কিছুটা প্রগতিবিমুখ এবং অনেকটা রক্ষণশীলতার এক পদ আর এগিয়ে রবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়েছেন। এই বন্দ্যোপাধ্যায়-বর্ণনাটির একেবারে গোড়া থেকেই—উপন্যাসিকের বক্তব্যের সূত্রগুলোর আলোচনা থেকেই ধরা পড়ে। স্বিধাবাদী অবস্থার বিশেষী মনোবিজ্ঞানের অনুসরণে ও রবন্দ্রনাথের অধিবাসীদের মনোবৈজ্ঞানিক পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক যথেষ্ট ক্রটিমুক্ত পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া, অন্যান্য অন্যান্যের আরও রবন্দ্রনাথের অধিবাসীদের পরিচয় যথেষ্ট নির্ভুল সংযম আলোচিত। এ-ধরনের সুন্দর, সুশিক্ষিত ও অভিনব গ্রন্থ সুধীসমাজে আদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

৭

বন্দ্যোপাধ্যায় আলমবাজার—৪৪-গ্রন্থাগার অঞ্চলে। ২১ বি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৯। প্রকাশক: মনোরঞ্জন মজুমদার ৪।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আকারে ছোট হলেও বইখানির মূল্য অনেক। বরাহনগর আলমবাজারে যুগ নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন শ্রীযুক্ত-ও.ব.। সেই সঙ্গে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘটনার পূর্বাপর, রবীন্দ্রনাথের বরাহনগর পরিক্রমা, বরাহনগর রামকৃষ্ণের শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বই পড়লে বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করা যাবে, যেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মিলবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অন্নদাপ্রসাদ ছাড়া এখন গ্রন্থাগারের অনেক বাণী আছে।

●

ANTI-FASCIST TRADITIONS IN BENGAL—Compiled by Indo-GDR Friendship Society, 21-B, College Street, Calcutta-12. Price Rs. 3.00.

ফাসিজমের ভয়াবহতা ক্রমে বহুদূর ছড়ায়। বিভিন্ন দেশে তাঁরাদের দমনে পর্যন্ত মোটামুটি এই সমাজতন্ত্রে বলা যায় তার পরমায়ুর পরিধি। সারা বিশ্বে তার ঐতিহাসিক ক্রমা যায় ঐ সময়ে এবং তার পরাজয়ী অন্তরে ঘটে। বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা হয়ে বাঁড়ান সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। ফাসিস্ট বরবরোচিত বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ঐতিহাসিক বাংলার সেই সব বিশ্বাস ক্রটির কথা আজ করা হয়েছে। সংকলন গ্রন্থে বহুদূর প্রকাশ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ রাহাচৌধুরীর বিশ্বী একটি বিস্তৃত ক্রটির প্রতিলিপি। ভেতরে

স্বেচ্ছাএর ঘরে বিয়ে নামক বিভীষিকার নাম ক্রমাটি বড়ো উপভোগ্য। এর ক্রমে ক্রমে ক্রমবিস্তারের কয়েকটি জাতি-পরিচয়ী কবিতা, চিঠিপত্র ও ভাষণের অনুবাদ ছাপা হয়েছে ক্রমেছি। তাছাড়া রয়েছে অহমেদাবাদ নেহরু, সুশোভন সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনীকান্ত দাস, হু এম আয়ার, কি এম মুন্সী, আবুল কালাম আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, হীরেন মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার সরকার, চিত্তরঞ্জন দেবসেবীন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের রচনা ও ভাষণ। বাংলার কবিদের কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে অনেকগুলি। নিবেদন বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, নিবারণ পণ্ডিত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়-পাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন, সরোজকুমার দত্ত ও সোমেন্দ্র কুমার। পুস্তক আর্ট প্রেসের ছাপা এই সংকলনটি যে কোনো সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের কাছেই এক মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও পত্র-পত্রিকা

বিশ্ব ভারতী পত্রিকা (২৬ সংখ্যা। সংখ্যা ১)—সম্পাদক। সুধীরচন্দ্র কর। বিশ্ব-ভারতী। ৬ আচার্যদেব টেগোর রোড। কলিকাতা—৭। দাম। চেড় টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা পরিচয় করার পৌষের ছাপিয়ে করার পরিচয় করেছে। প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধাকান্ত-বিহারী সেন, সুধীরচন্দ্র কর এককালে সম্পাদনা করেছেন পত্রিকাটি। পত্রিকা করার ইতিহাস নিঃসন্দেহে ঔৎসুক্যকর। কেবল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর নয়, বাংলার তথা বিশ্বসাহিত্যের ওপর প্রবন্ধাদি, গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশে বিশ্বভারতী পত্রিকা খুই খ্যাতি। সাধারণ-ভোগ্য রচনার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী—মনু-চিন্তনের পরিচয়ের পত্রিকাটি বাংলা প্রবন্ধ পত্রিকার জগতে পাঠকের শ্রদ্ধাসহকারে করার পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে দেখেছে। পত্রিকাটি সম্পাদনে ঐতিহ্যবাহক নৈপুণ্যে প্রথম থেকে অদ্য পর্যন্ত ক্রমশ ঘন ঘন পরিবর্তন করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন চুলচেরা মূল্যায়ন প্রবন্ধ সাময়িকের কালের বিশ্লেষণধর্মী বিশ্লেষিত বিষয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্রিকেন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, প্রমথ চৌধুরী, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধাকান্ত-বিহারী সেন, সুধীরচন্দ্র কর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, মুকুলচন্দ্র দে, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, অমিয়কুমার সেন-গুপ্ত বিশ্বপতি এবং সাধারণ বিশ্বভা

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সাথে সম্বন্ধ। অন্নদাশঙ্কর বিশ্বভারতীর সম্পর্কে [illegible] ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে [illegible] একটি আলোচনা করেছেন। [illegible] পাঠিত, বাংলার লেখক ও [illegible] সূচী সংকলিত হয়েছে। এর সংখ্যায় [illegible] সম্পর্কে রবীন্দ্র-একটি আলোচনা করেছেন। [illegible] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি। [illegible] নিবেদন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরেকৃষ্ণ [illegible] পাধ্যায়, সজনীকান্তের চট্টোপাধ্যায়, [illegible] প্রেম ভোম, প্রীতিকুমার বিশ্বাস, বিশ্ব [illegible] রায়, বিমলাশঙ্কর মজুমদার। [illegible] উপন্যাসের সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পত্র পত্রিকার বিশ্লেষিতরূপ। [illegible] আরও পত্রিকার ঐতিহ্য জানা করি [illegible] জানি হবে।

●

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (ত্রৈমাসিক:পৌষ [illegible] সম্পাদক। সত্যেন্দ্রকুমার বসু। [illegible] স্ট্রীট। কলিকাতা—৯। [illegible] চেড় টাকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু পাঁচ বছর এই প্রবন্ধের পত্রিকাটি সম্পাদনা করে [illegible] সমকালীন সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রবন্ধের পত্রিকাটিতে প্রবীণ ও নতুন লেখক সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতির ওপর [illegible] প্রবন্ধ করে থাকেন। সম্পাদক মহাশয় নির্বাচনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় করেছেন বর্তমান সংখ্যায়ও তার পরিচয় [illegible] স্পষ্ট। সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বি [illegible] মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক নাটকের [illegible] সমস্যা। অন্যান্য বহু লিখেছেন [illegible] থেকে আছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁ [illegible] চন্দ্রের শেষ সেরেখানি উপন্যাস), [illegible] রায় (মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ এককা [illegible] কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায় । র [illegible] নাথ), তারাশঙ্কর ঘোষ (কবি কবি [illegible] সোপান ঘোষিক (আধুনিকতা-উত্তর [illegible] অন্নদাশঙ্কর সাহিত্য), ঘোষিক সেনক (আধু [illegible] সত্তা-উত্তর আলোচনা নিবেদন), নরেন্দ্র [illegible] (আধুনিকতা উত্তর আলোচনা নিবেদন সাহিত্য) [illegible] ঘোষিকরঞ্জন ভট্টাচার্যের (আধুনিকতা [illegible] আলোচনা সাহিত্য)। লেখক লেখাটি পূর্ববঙ্গ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের [illegible] আলোচনা)।

●

আলোক (ত্রৈমাসিক আলোচনা)—সম্পাদক। [illegible] সেন। ৭৩ বি ২০৯ ফেজ ফেজ। [illegible] —২১। দাম। চেড় টাকা।

বিশ্বাসের নরেন্দ্র সেন, প্রেমেন্দ্র [illegible] সেনী, অন্নদাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সুধাকান্ত বসু বিশ্বনাথন্দ্র সেনগুপ্ত, নীলকণ্ঠ অন্নদাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ঘোষিক ঘোষিক সেন, অমিয়কুমার সেন, রাজা বসু, শীলেন্দ্র রায়। আলোক ৬-৩ এবং আরো কয়েকজন

পশ্চিমবাঙলায় রবীন্দ্রচর্চা

[illegible] ছুটানো [illegible] বাড়ানি মিলিয়ে। [illegible] এসে পরিক্রমায় আছিলাম। [illegible] উৎসবের [illegible] নিয়ে [illegible] পাড়িয়া [illegible]। যা বলছিলাম, [illegible] আলোচনার বিষয়গুলোর।

[illegible] মেনে অনেকেই আছি। একদিন আমাদের [illegible] মধ্যে যেন [illegible] ছিল না। আমরা একসঙ্গে [illegible] পরিক্রমায়িত হয়। আমরা পরস্পরকে [illegible] মুহূর্তের বাইরে দাঁড় করিয়ে [illegible] চাইনি। এতে অসুবিধে হয়েছিল একটি [illegible]। আমাদের আলাপ আলোচনায় সকলেই [illegible] সমান অংশীদার। কিন্তু আমরা আজ [illegible]। আমরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে। [illegible] ভাবিনি একসঙ্গে বসিয়ে হবে [illegible] নির্বাচিকে আমরা স্বীকার করে [illegible]। কিন্তু আজও আমাদের ইচ্ছা একটি [illegible] প্রকাশ করি। আমরা পূর্ববাঙলার [illegible] সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়ে [illegible]। সেখানকার সাহিত্যিকরা বিদেশে [illegible] করেন, তার খবর রাখি না। কিন্তু [illegible] ফেলে অন্যায় হবে সকলেই আমরা [illegible], আমাদের বান্ধবরা আছেন।

[illegible] ও বাঙলার সংস্কৃতিবান মানুষ খবর [illegible] এপারের বাঙালীর। ওঁরা জানেন [illegible], মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, [illegible] থেকে আধুনিকতম সাহিত্যিকদের সাহিত্য-[illegible] ওঁদের নিজের লোক। কিন্তু আমরা [illegible] তা মনে করে আমরা? ওঁদের সাহিত্য ও [illegible] নিয়ে আলোচনা করি? দেশ-[illegible] হয়ে গেল। বীজ বীজে দুই সংসার [illegible] হোল মুখ। আমরা এপারে নিজে-[illegible] নিয়ে খুশি। ওঁরা কিন্তু তা নয়। [illegible] বিনিময় আজও করে [illegible] মানুষকে ওঁরা আজ আপনার জন [illegible] করেন।

[illegible] মনে পড়ছিল সেদিন থেকে [illegible] কলিকাতার ছেলে একজন খুব পড়তে [illegible]। খুব একটা পাওয়ার মুখের ভাষা যাই [illegible] ছেলেটিকে সত্যিকার চোখে [illegible] আলোয়ার পাশা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] বিভাগের অধ্যাপক। রবীন্দ্রজন্মশত-[illegible]তে প্রথম বেরিয়েছিল ঐখানি [illegible]৫০ আর ও তখন কিন্তু হাতে [illegible]নি আমাদের। একসঙ্গে দুই-তিনটি [illegible] সম্পাদনা, পরিমার্জিত ও পরি-[illegible]। চাকার সঙ্গেই এসব প্রকাশক।

আলোয়ার পাশার কাছে রবীন্দ্রনাথ অনেক কাছের মানুষ, আপনার জন। রবীন্দ্র-নাথের প্রতিটি কথা তাঁর জানা। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন বিশ্বকবির উপর গবেষণাকে। এছাড়া আর যা হতে এমন সুন্দরভাবে একখানা বই লেখা সম্ভব হত না।

আলোয়ার পাশা আলোচনা রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম স্রষ্টা। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষের দুঃখ-সুখের রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণ ছোটগল্পের উপজীব্য বিষয়। নর-নারীর দুঃখ-পীড়ন এবং বাঙালী-জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়তম [illegible] সূত্রকে অতীতে কেউ এমনভাবে স্পর্শ করতে পারেননি। সমাজের নিম্নস্তরের বাঙালীদের জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথের আগে এমনভাবে কেউ আঁকেন নি। বাইরের জগতের মতো লাভ, প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের মধ্যে সমস্যা সমাধানই আসল হয়ে ওঠে জীবনধারণের একজন হিসেবে শিল্পীকেও। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন তেমনি একজন আর শিল্পী। তাই, তিনি আমাদের সমাজজীবনের [illegible] ছবিকে [illegible] চমৎকারভাবে আমাদের চোখের [illegible]। বাস্তবজীবনে তিনি যেমন অর্থশালী এক পরিবারের উপাসক ছিলেন তেমনি জীবনের প্রত্যেক স্তরেই তাঁর চিন্তা আমাদের দিকে [illegible] দিকে প্রসারিত ছিল। পল্লীবাঙলাকে এই আমাদের সুন্দরভাবে দেখেন তাঁরা। তাছাড়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আমলার চালি-[illegible] রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে পাওয়া যায়। পরে কলকাতার সে সমাজের নতুন জীবন-বোধ এবং পরিবারগুলির ভাঙন তাঁর গল্পের জন্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরিচ্ছন্নতাকে মুখ্য করেননি, সমাজজীবনের অবৈধতার [illegible] ছবি তিনি তুলে ধরেননি—অন্তর ছোটগল্প সেখানে পর্যবসিত নয়। ছোটগল্পে মানুষের অন্তরকে রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে [illegible] করে দেখে। মানুষের সমাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার গভীরে তিনি যেতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির ভূমিকা অসীম। অনেক [illegible], এবং অনেক জায়গায় ভালবাসায় লোকের মত প্রকৃতি মানুষের পরম [illegible]। কিন্তু প্রকৃতির এখানে আছে বৈচিত্র্যতা। প্রকৃতির ভূমিকার মধ্যে—একটি মনের আছে সহানুভূতি এবং বিদ্রূপ, [illegible] এবং ঔদাসীন্য। যেখানে প্রয়োজন [illegible] কোনো বাস্তব সামাজিক দৃষ্টির, অথবা কোনো জলস্তম্ভের [illegible] বাস্তব ঘটনা পরম্পরাকে চিহ্নিত করতে, সেখানে সবসময়ে প্রকৃতির উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ গল্পের উপেক্ষা নিখুঁত করে নিয়ে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও এমন কি তিনি বাস্তব সমাজ থেকে সরেও গেছেন। শিল্পীমনের কোনো এক অন্তর্লোকের [illegible] অনুভব করার জন্যেই হয়তো তা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐ দিক বিষয় বাঙলার সাধারণ বাঙালীর চোখে ধরা পড়েছে। আলোয়ার পাশার মনের কিতর রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি উঁচু স্থান অধিকার করে আছেন, তার পরিচয় হয়েছে বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। যে বাঙলার রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার সীমিত সেই দেশে গবেষকের এমন একখানি বই লেখা কি সুসম্ভবপর পরিচয়, তা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এ বাঙলায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেখা হয়েছে অনেক বই। অনেকের উপন্যাস, এবং তথ্য এবং সারগর্ভ বক্তব্যে সে সব বই গবেষকের কাছে পরম উপাদেয়। কিন্তু আলোয়ার পাশার বইখানি ঠিক সেসব নয়। গল্পগুলির তিনি বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচনার প্রসঙ্গে হিসাবে কাহিনী বিচার করেছেন। পূর্বসূরীদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে সমালোচনা। নিজের বক্তব্য তাঁর সবচেয়ে গভীর করে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ।

বইখানি হয়ত এ বাঙলায় প্রচারিত হবে না। এটাই সবচেয়ে দুঃখের কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথকে বিদেশ, সমস্যাগুলি বাঙালীকে বুঝতে করতে পারেনি। যাঁরা সবসময় বিশ্বের থেকে দূরে করে জাতিকে নতুনভাবে গড়বার চেষ্টা করছেন, আলোয়ার পাশা তাঁদেরই একজন। সেজন্যে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করবে।

—সম্পাদক

মনের কথা

প্রথম কাহিনী-স্বপ্নচারিতা

মনের কথা বলার চিরাচরিত পদ্ধতি পরিহার করলে, অর্থাৎ সংবেদন বাহক স্নায়ু কেন্দ্রের ইত্যাদির সংজ্ঞা বিশ্লেষণে অযথা কালক্ষেপ না করলে মনোরোগের কথা পাঠকদের কাছে বেশি চিত্তাকর্ষক হবে, এই অভিমতে চালক করেছেন একজন প্রবীণ মনঃসমীক্ষক। তাঁর অভিমত শিরোধার্য করে ব্যক্তি-জীবনের বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের পথে মনোরোগের কথা বলতে চলেছে ঘড়ি। এই পর্যায়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন, চরিত্রগুলির অনেক সমস্যাকে আপনাদের সামনে হাজির করব, অনেক কাহিনী আপনাদের কাছে বিবৃত করব, মনোরোগের বহু সমস্যা, বহু সংকেতের পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কল্পিত কাহিনী। চরিত্রগুলি কাল্পনিক ও সত্য ঘটনাকে সম্বল করে, তবু মনে হয় আমার অতিপরিচিত এই সব নরনারী তাদের জটিলতা সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ ও কৌতূহলে আমিয়ে মানস-বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু করে তুলবে। সত্য ঘটনা অনেক সময় কাল্পনিক কাহিনীর চেয়ে বেশি চমকপ্রদ হয়। তাই আশা করছি, এই সব কাহিনী ও চরিত্র আপনাদের খুব নীরস লাগবে না। এইসব চরিত্রের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-চিন্তার অংশীদার হতে হয়েছে, এঁদের মনের অন্তস্তলের রোগবীজ (কমপ্লেক্স) আবিষ্কার করতে হয়েছে, ভালবাসার মাধ্যমে বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়েছে: তবেই এঁরা অকপটে মনের কথা খুলে বলেছেন, আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ ও আমার নির্দেশমত পথ চলেছেন। এঁরা মনোবিদের পরমাত্মীয়। এঁদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরে, এ আমি স্বভাবতই চাইব না। কারোই কোনো সময়েই এঁদের সঠিক পরিচয় আমার চেয়ারে থাকবে না। আরো জানিয়ে রাখি যে, তাঁদের সমস্যা-কাহিনী বিবৃত করতে বাঁদের অনুমতি পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করেছি।

এবার ভূমিকা ছেড়ে কাহিনীসূত্রে যাওয়া যাক।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—টেলিফোনের ঘণ্টা বেজেই চলেছে। রিসিভার তুলতেই নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন,—আমি কি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছি?

—হাঁ

—আমি মিসেস্ ঘটক, আপনার একজন পুরোনো পেশেন্টের স্ত্রী। সেই যে কোকোনের কেস। মনে পড়ছে কি? আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি? আজই, একটু হলে ভাল হয়।—হাঁ, মিঃ ঘটকের সম্বন্ধে জরুরী আলোচনা দরকার।

—আচ্ছা সন্ধ্যার দিকে আসুন।

সন্ধ্যায় পরেই মিসেস্ ঘটকের আবির্ভাব ঘটল। টেলিফোনে কণ্ঠস্বরে তাঁকে চিনতে পারিনি, এমন ছিলনায়। মিঃ ঘটকের কেসটা এর মধ্যে পড়ে গেছেলাম। প্রায় বছর খানেক আগে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কেসটা একটু অদ্ভুত বলে ভুলতে পারিনি। চিকিৎসার সময় মহিলাটিও মাঝে মাঝে আসতেন। বিয়ের পরেই ঘটকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। মিসেস্ ঘটক আসন গ্রহণ করেই বললেন—ও আমার ছেলে বেচে বসে আছে।

এই ঘটক অর্থের কাছে এসেছিল উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে। প্রতি পরিবার সন্তানের জন্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। শীত বসন্তে এই অসুস্থতা বৃদ্ধি পেত। বুকের কাছে অনবরত কফের, বুক ধড়ফড় ও অসোয়াস্তি, এই ছিল তার প্রধান উপসর্গ। হৃৎপিণ্ড বিকল হয়ে বুড়ো বয়েসে—এই ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল। উপযুক্ত পরীক্ষা করাতো প্রতি সপ্তাহে, আর ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম প্রায় তিন মাস অন্তর। ডাক্তারের হৃৎপিণ্ডের কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেন নি: অনেক আশ্বাস ও অনেক ওষুধেও ঘটকের অসুস্থতার কাটা নি। তখন আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রথম দিকে আমি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে করে উপসর্গ নিরসনের সহজাত অভিজ্ঞতায় বিশ্বে শুরু করি। কোনো বিশেষ ফল দেখা দেল না। একদিন পরিবার ডাক্তার বারোটায় তার স্ত্রী তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হলেন। পরীক্ষাতেও তার কুফল দিয়ে সন্তান-ভয়ে ধরা পড়ছে, ডাক্তারদের আতঙ্ক বেড়ে উঠেছে। রক্ত-মূত্রের তাকে নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। চেয়ারম্যান তার অসুস্থতার ও অসোয়াস্তির মূলে কারণটা খুঁজতে পারি। এবং খুঁজে কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করার ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। সে অনেকদিন আগেই ফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছে ও আমি ভুলে গিয়েছি। স্ত্রীর কাছে এই রোগের কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। বিয়ের আগে এ বিয়ে কোনো সম্ভাবনা আসে নি। বিয়ের পর স্ত্রীর মনে তাঁর সন্দেহ দেখা দিল। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে মনোরোগ, ছেলে যাওয়া বিপদজনক। তাছাড়া ছেলে লাভ বাঁধা হয় একটিমাত্র, লোকসান হয় আগের কয়েক ছিল দিন। ঘটনার অবতারণা হয়ে ওঠে। স্ত্রীর কাছে ছেলে-সন্তানের চাহিদার একটা কাল্পনিক হিসাব দাখিল করতে হয়। স্ত্রীকে কোনো নিজের এই অসুস্থতার কথা বলা যায় না, রোগীর আত্মার ছেলের নেশাও ছাড়া যায় না। এই দোটানায় আমি থেকে ঘটক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মূত্রোত্তীর্ণ ও অন্যান্য উপসর্গের মূলে ছিল এই দ্বন্দ্ব। এই রাতে তার স্ত্রী ও আমি এই বৃত্তান্ত জানলাম। এবং তাদেরই অনুরোধে ছেলের নেশা খুব ভালর জন্য তাকে চিকিৎসা করলাম। নেশা ছাড়ানোর প্রয়োজন বিয়ে না হলে ঘটক হয়ত অসুস্থ হত না। এই নেশা থেকে নিজেকে ছাড়ানো আমারও ছিল একান্ত আন্তরিক, তাই আমি অনেক সপ্তাহের মধ্যেই সাফল্য লাভ করলাম। মনোচিকিৎসকের কাছে অনেকেই নেশা ছাড়তে আসেন, কিন্তু ঘটকের মত আন্তরিক ইচ্ছা না থাকলে, চিকিৎসকের সকল চেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশিমাত্রায়। এ-আলোচনা অন্য রোগী-প্রসঙ্গের বিষয়কালে করব।

দশ বছর পরে ঘটক আবার ছেলে যাচ্ছে। মনের ব্যাধিগ্রস্ত চরিত্রের পুনরাবৃত্তি বিরল নয় জানি, তবুও একটু হতাশ বোধ করলাম। বিয়ের পরাজয়ের জন্য তাকে নয়, ঘটক ও ঘটকপত্নীর অভিভাবকের জন্য। অনেকে নেশা করে হয়-সয়ে, আবার কেউ-কেউ নেশায় একেবারে ডুবে যায়। রাত্রাপানের পর অনেকেই পানশালা ছেড়ে স্থানীয়ভাবে হলেও নিজের পায়ে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বন্ধাধরি করে ট্যাক্সিসাহায্যে করে নিতে হয়। তবু আইটে না হওয়া পর্যন্ত এরা থামতে পারে না। ঘটক 'আল আউটের' দলে। সপ্তাহের দিনে শনিবার পড়লে মাসের সমস্ত রোজগারটি অকাতরে নিবেদন করে আসাই ছিল তার অভ্যাস। তাই আমার হতাশাবোধ স্বাভাবিক।

যা হোক, উপস্থিত রোগিনীর কথা বলি

সৌম্য ষষ্ঠীচরণীর দিকে তাকিয়ে বলল—ওঁকে নিয়ে এলেই ত পারতেন।

—এ আসবে না। ছেলে যাবার কথা ও স্বীকারই করছে না। সন্ধ্যেবেলা থেকেই টাকাপয়সার ব্যাপারটা চলছে। মাইনের সব টাকার হিসেব দিতে পারছে না। পরশুদিন মাইনে পেয়েছে। এর পকেটে অবশ্যিষ্ট এক টাকার নোট ও কিছু খুচরো পড়ে আছে। বাড়ীভাড়া, খুচরো দায় সব আছে দেবার কথা, কিছুই দেওয়া হয় নি। আজ রাত্রে ছেলে টাকা তুলবে, তবে সব ব্যবস্থা হবে।

উনি ছেলে যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে হল কেন?

এর পকেটে 'আক্সিডেন্টলেস' টিকিট দেখেছি কাল, আর তখুনি আপনাকে ফোন করেছি।

—টিকিট ওঁকে দেখান নি?

—ও অবাক হবার ভান করল। কাল, অন্য কেউ যাতে করবার জন্য ওর পকেটে টিকিট পুরে দিয়েছে। খুব ভাই মন, টিকিটটা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। যেন এই প্রথম দেখছে। অভিনয় খুব ভাল করছে, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার এতে কি আছে? মাইনে ত ওর এডদিনে বেশ বেড়েছে; দু'পয়সা জমাতেও পারছে নিশ্চয়। তাছাড়া অভাবে পড়লে ওঁর নিজেরই খেয়াল হবে মেশা ছাড়বার।

—অভাব-অনটনের জন্য নয়। অন্য কিছু। মনে হচ্ছে ও যেন হয় কোনো বিপদে পড়েছে। শনিবার অফিসের পর ও কোথায় যায় ও কিছুতেই বলছে না কেন? ছেলে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কথা ডাক্তার কাছে গোপন করছে কেন?

—ছেলে যায় বলেই গোপন করছেন।

—কোনো কিছু জানিয়েও করছে না কেন? সে সময় যেমন বলত। ও যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করব—এ ও জানে।

সাঙ্ঘাই তো। এ বয়সে ছেলে আর পাঁচজনের পক্ষে যে অবস্থায় স্বাভাবিক, ওদের সেরকম আবহাওয়ায় করছে না। মাকে ঘোলা-ঘুলি নিজের খুবসিক্রেট কথা জানাবে অথবা মিথ্যে গল্প ফেঁদে তাঁকে ভোলাবে, এটাই ত স্বাভাবিক। বয়স পড়ায় পরও স্বীকার করতে চাইছেন না কেন?

—শনিবার বিকেলে কি করেন তিনি? কোথায় যান? কি বলেছেন?

—জিজ্ঞাসা করলে কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। বলছে—এমনি যেই। অফিসে বন্ধু-বান্ধবের বেশি কারুর ত ছেলে পড়াতে হবে মনে করেছিলাম। ও কালে—না, অফিসে ত ছিলাম না। পরশুদিন ছেলের টিকিট বেরিয়ে যখন বললাম—পাঁচার কাছে মিথ্যে বলে লাভ কি? স্বীকার কর—আজ অন্তত ছেলে গিয়েছিল। ও জোরগলায় অস্বীকার করল।

—পরশু দুপুরে উনি কোথায় ছিলেন?

—জানি না। ও ত ঐ এক কথাই বলছে,—মনে নেই।

—আচ্ছা ডিন অফিস ছেলের বাড়ী আসেন?

—আসার মাইকে পড়ে আর ঘণ্টা, পাঁচরাত্রিন মিনিট দেরি এক-আধদিন হলেও ঠিক সময়েই আসে। না আসতে পারলে ফোন করে জানিয়ে দেয়।

—শনিবারে আপনাকে ফোনটোন ছেলে করেন নি?

—না।

ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে জল আসবার উপক্রম। সত্যিই ব্যাপারটা ঘোলাটে। আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। তবুও ঘড়ীটা আপসে নিয়ে বললাম—ওদের কি আছে? ওঁর এক-আধজন অফিসবন্ধুর কাছে খবরাখবর নিন। আর সম্ভব হলে ওঁর একেবারে সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে কাল আমার সঙ্গে দেখা করুন। ওঁকে এসব কথা এখন জানাবার দরকার নেই।

মিসেস ঘটক চোখ মুছে বিদায় নিলেন।

অনেক চিন্তা মনে আসতে লাগল। কিন্তু একটা সেদিন একবারও মনে আসে নি যে অপরাধিনীর বেশে ঘটক ছেলের সন্ধানে ডোরার উপর বাড়ি বয়ে চলেছেন। শনিবার একটার পর থেকে সাতটা পর্যন্ত তাঁর স্টীয় সঙ্গে তাঁকে চালিত করছে, আনি-সন্ধার কাছে এই খবর পরিবাহিত হচ্ছে না। সবই ছেলেরা জানেন না তিনি ঐ সময়ে কি করছেন।

আগামী সপ্তাহে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইল।

—মনোবিদ

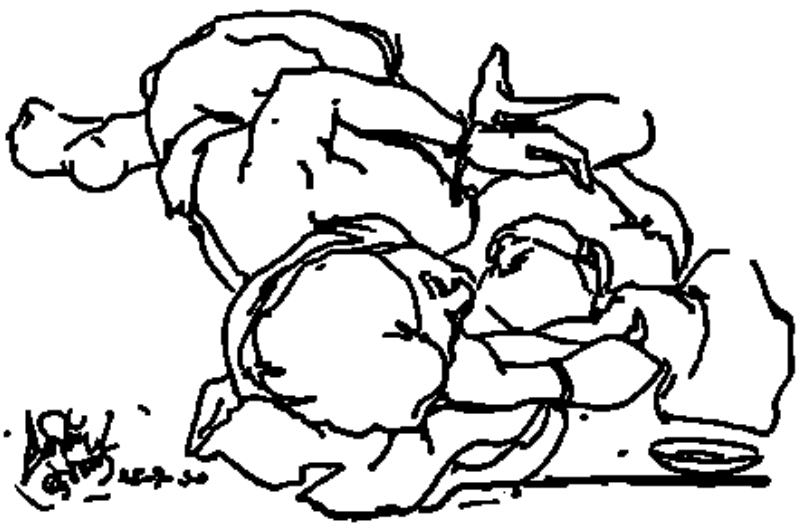

নজরুলের সাথে কারাগারে

নরেন্দ্রনারায়ন চক্রবর্তী

।। ৮ ।।

বহুমত-স্ফীত পুরোহিত তন্ত্রের জগদ্দলের ওপর একদা এই বাংলার বুকে একটি মরুঝড় পদ্ম ফুটে উঠেছিল। বিদ্রোহপদ্ম। সেদিন তাকেও ঘিরে ধরেছিল চারদিক থেকে। প্রচলিত কুসংস্কার, নিষ্ঠুর আচার, প্রাণহীন সমাজের অন্ধগোঁড়ামি ব্যক্তিমানুষের বিরুদ্ধে এই বীর সৈনিক একক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন শানিত অসি নিয়ে। দাঁড়িয়েছিলেন একা। সহায় ছিল না। আর সম্বল? ছিল! অসীম বীর্য। এই আজন্ম সৈনিকের প্রবল ও প্রচণ্ড পৌরুষের আগুনকে সৈনিক কবি জাতির জীবনযজ্ঞের নিয়ামক মন্ত্র করে লিখেছিলেন,—"কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা? প্রলয়ের মহাদূত? সে পুরুষ এসেছিলেন বিদ্রোহনজরুল, সে সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কারে গর্জে উঠেছিল বিদ্রোহনজরুলের কণ্ঠে।"

একটি আদর্শ খাঁটি মানুষ দেখবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল কাজীর বরাবর। যেখানে বিদ্রোহ, যার ভেতর রেজ ও পৌরুষ দেখেছেন, তাকেই কাজী সমাদরে আবাহন জানিয়েছেন। দেখেছেন স্বপ্ন। চেয়েছেন আশীর্বাদ।

প্রথম জীবনে তার তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন এমনি একটি মানুষ। পেলেন না। সুদূর তুরস্কে মিলল তাঁর দেখা। কাজী সমগ্র অন্তরের পুণ্য অর্ঘ্য উজাড় করে তাঁর স্তব গাইলেন। কামাল। অবাধুনিকের মূর্তিমান। সে উল্কে। ইয়োরোপ ও এশিয়ার চিরন্তন তুরস্কের সমাজের সমাধি-পত্রিকা তিনি রচনা করেছিলেন। তুরস্কের বুকেও জন্মেছিল লক্ষাধীর জঞ্জাল। বোরখা, ফেজ, হারেম, হাজ্জো তুরস্কোরে জাতির জীবন হয়ে গিয়েছিল পঙ্গু। দেখলেন মরুর মতো নিজের জন্মের প্রতিজ্ঞার কামাল প্রদীপ্ত হয়ে তুলেছিলেন জাতিকে। দেখলেন। কেজ তাড়ালেন। বোরখা ছিঁড়ে ফেললেন। হারেমের দুর্গ অবাধ করে করে লক্ষাধীর আঘাত নিজের নিলেন বুকে নাড়িয়ে। পরাধুনিকেরা পরানন্দ দেশকে বিদেশের কবলে ধরে তুলেছেন নিজের গায়ে। কাজী মৈত্র উচ্চারণ—"কামাল তুলে কামাল নিজ ভাই।"

কামালের মতোই তিনি সৈনিক হতে চেয়েছিলেন। জনালকে আপন বেদে নেন ও জাতির সর্বকল্যানের বুনিয়াদ জনালা দৃঢ় করবার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন নিজের দেশে। বাংলার কোলে। বুকের দাবদাহ ছড়িয়ে দেবার হিন্দুল আকুতি নিয়ে বিদ্রোহের দাবাগ্নি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন,—"ধর্ম সমাজ রাজা দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের হৃদয়ের শাসন মেনে চলো। পরাধীনতা যার প্রাণ থেকে মানতে না পারো, বাস, লোকের নিন্দা-বন্দনার ভয় তা মেনো না। রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের মত ঠিক মেনে নিতে পারছ না, বাস, মাথা উঁচু করে বলো, বুঝতে পারছি না।..."

এই নজরুল। অনাবৃত, স্পষ্ট, উজ্জ্বল। ঘোঁয়া নেই। নেই ঘোঁয়া। তাঁর কারবারে নেই। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করবার চাহিদা নেই। মনের কালিমা নেই। নেই পীর-মোল্লা-পুরোহিতের মুখোশ। খাস ছেলে তরোয়ালের মতো এর একটি মাত্র লক্ষ্য সংগ্রাম। অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, অবিচার, সংস্কার, সর্বকল্যানের সংহার এর ব্রত। নজরুল যুগ বিদ্রোহ।

"আমি যুগাচার্য, আমি এলোকেশে ঝড়
অবাক বৈশাখীর—
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহীসুত
বিশ্ব বিধাত্রীর।"

এই বিদ্রোহীর কণ্ঠে সেদিন বাঙ্ময়ের যে অকুতোভয় জবানবন্দী উচ্চারিত হয়েছিল, তা শুধু ভবিষ্যৎ নয়,— অতীতেরও। "আমি শুধু রাজীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিনি, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধেও আমার—সত্য ও ন্যায়ের, তাঁর আহ্বানে সমাজ-বিদ্রোহ-যুদ্ধের—এর জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর তোয়াই নিজের সত্যকে, আপন ভবিষ্যৎকে হীন করিনি, লাভ-লোকের প্রত্যাশী হয়ে আজ উপস্থিতিকে কিনে ফেলিনি, নিজের সমাজসত্য আত্মপ্রসাদকে ঘোলা করিনি; তেমনি আমি যে ভবিষ্যতের চিত্র, সত্যের হাতের বাঁশী, আমি যে কবি, আমার কথা যে সত্যদর্শী ঋষির বাণী.....।"

"কবিজীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে কাজী-মুর্তির ছবি দেখেছিলেন কাজী সেনের ছেলে দিয়ে। মনের মুকুরে ওপর নব-সৃষ্টির অপরূপ কল্পনা জন্মের করে ফুটে উঠেছিল স্রষ্টার চিত্তপটে। তাই গাইতে পেরেছিলেন,—

আমি দেখে তার ছেলে ছোর?
প্রলয় বুকের সুখন ছেলে,
আনন্দ নবীন—জীবন-রাঙ্গ
ও-মুখপরে নয়তে ছেলে।
তাইতে এমন ছেলে ছেলে
প্রলয় ঝড়েও আনন্দ ছেলে—
নবছে ছেলে।
ছেলে আমার ঝড়ের জানে
সে চিরন্তন।

জন্মরের এক উন্মাদ কল্পনা ও স্বপ্ন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজী প্রলয়কে বিবাহ করেছিলেন। প্রচলিত ধর্মের অনুশাসন বা সমাজের দুকূটি তিনি উপেক্ষা করেছিলেন জীবনভর। শুধু মুখের নয়,— আচারে, ব্যবহারে, সমগ্র সত্তায় ছেলের ছিরে এক নতুন বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সৃষ্টি সম্ভাবনা তাঁকে উন্মুখ করে তুলেছিল।

ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান কাজীকে আকর্ষণ করেনি। নির্মম হয়ে যার যার বাহ্যিক আচার ও অর্থহীন অনুষ্ঠানের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। হিন্দু সমাজের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কুণ্ঠা লেখনীর ঝলসানো করতে দ্বিধা করেননি। মুসলমান সমাজের অর্থহীন নিয়মাচারকে আঘাত করেছেন নিষ্ঠুর হয়ে। মুসলমান হিন্দু কুণ্ঠ হয়ে তাঁকে আঘাত করেছে। তাঁর ভাষা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। তাঁকে লাঞ্ছিতের উপায় ও সব জনীন ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্র করেছে। আর মুসলমান সমাজ উল্লাসে ঘোষে তাঁকে কাফের বলে ঘোষণা করেছে।

কাজী ভিলেন নি। কাজী মুখেকে পড়েন নি। প্রচলের অন্ধকূপের প্রেরণায় উজ্জীবনায় তিনি এগিয়েই গেছেন। অন্ধবিশ্বাসের ঘরে ঘরে শত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন অকুতোভয়ে।

এই আপনভোলা স্রষ্টাকে সমস্ত সত্তা দিয়ে তা লো বে সে ছিলেন বাংলাকে। এদেশটিকে। বিমল-জোছনা কল্পনার নতুন ধানের ও মঞ্জরীর যে ছবি তাঁকে পথে বাঁড় করিয়েছিল, তার বুকে ছিল সর্বকল্যানের একরাশ ভেরাটি, ক্ষমা ও ভালবাসা ভবিষ্যৎ জাতি গড়ে উঠবে ঐশ্বর্যিক দেহ ও বৈদান্তিক মনিষ্কা নিয়ে।—বিবেকানন্দের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন কাজীও। তাঁর ভবিষ্যৎ বাঙালীর জন্য কোন পরিচয় বাড়াবে না। সে হবে শুধুই বাঙালী। আচারে, ব্যবহারে, সমাজ আর ধর্মাচার, সমাজ-ও রূপে রূপে অন্তরে বাংলার ভাবে-ধারণা ঐতিহ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের অবকাশ মেলে। সাহিত্যের নূতন বিভাগ হাশিয়ে কবির সঙ্গে পরিচয়ে-ছিল অল্পসংখ্যক। কিন্তু সবাই ঘরে ফেলে। মোট যাদের দুজন। শিবেন্দ্রলাল তার আর অজয়কুমার। শিবেন্দ্রলাল অজয়ের কবি। জীবদ্দশায় তাঁর কাব্যে মুগ্ধ আবার হোয়ে নি। তাকে নিয়ে মাতামাতি করে নি। অবশ্যিমার সাহিত্যের চলন ও ঈশান জানতীয়ের সাথে অবহিতজনের। কিন্তু অজয়কুমার তাদের মতো না আর কিছু সমালোচনা করি যোগাতীয় একটি মুহূর্তে অন্তর তাঁকে শ্রদ্ধিতেছিল পরিচয় অন্তরে থেকে, নির্মলিনের মৃত্যুর ঢেলে অনেই কাজে হয় নি, কুমারিল ঃ অজয় অজয়ের পাঁচ ছিটিয়ে তাঁকে উপহারের কবিতার মুহূর্তিকালি লিখেছেন।

পরে নি। এই নির্দিষ্ট সৈনিক মৃত্যুর সৈনিকের মাঝেই সত্যের অন্বেষণে, কিন্তু অন্তরের নজিরে দেখা যেন নি তাঁর অজয়ে। নজিরুলাহের প্রভাব অতিক্রম করে যা প্রবর্তিত করে নয়,—পরন্তু তাঁকে অর্থ করে কাজীর নিজস্ব বাণিজ্য কল্পনা সৃষ্টি করেছে এক স্বতন্ত্র ও নবতর সুর, যা অজয় অন্তর নয়,—অপরূপ।

রবীন্দ্র যুগে বহু কবি প্রথম বাঙালী মহাদেবীদের স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। নবীন তাদের জীবন-মৃত্যুকে পরের কৃপা লাভের সুযোগের তাঁদের হৃদয় মুগ্ধও করে-ছিল। তাদের অবদান মুহূর্তে তাঁরা বন্দনা গেয়েছেন। অন্তরও কেলেছেন। কিন্তু তাদের অন্তরে ও জীবনাদর্শের ভেতর মনে ও প্রেম সম্পর্কের তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে গেছে। তাঁদের কবিতা অসম্পূর্ণ। মুগ্ধ, মধ্যে, গভীর গভীরতার অভাব। কিন্তু মুহূর্তকে বিরহ করে অন্তর লাভ করবার আগ্রহ তাদের নেই। আছে অন্তরের অন্তরা-আর সম্পর্কে। মধ্যে বিস্তার। অন্তর্নিহিত অন্বেষণ। তাদের নেই, কবিতা মধ্যেও মেলা-মেলা আর একটি জীবনের অন্তরান আনি অন্তরে ছিনিয়ে আনা,' — এমন তাদের দীপ্ত নিষ্ঠা। কাজীর মধ্যে ছিল তাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ। মুক্তা-ফোরক-মুক্তারে-জের জীবনের 'আহ্বান' — এ কাজীর সাথী মুগ্ধে যে গভীর মুগ্ধে উঠেছে, তার কবিতায় তা ছিল একান্তই দুর্লভ।

অভিমান ও অভ্যর্থনের আবাহে কবির বাসনার কারণে মানবিকতা মেলের প্রেমে অন্বেষণ জাগিয়েছে, মুগ্ধে মেল করে থাকবে, কিন্তু তারও যে প্রতিবন্ধের সঙ্গে ঈশান হয়ে একদিন মেলা-মেলা-হাহাকি-নাকল তুলে দাঁড়াতে হয়, এ কল্পনা ও অন্তরে-দৃষ্টি হয়তো নয়-করে প্রাণে জেগেছে, কিন্তু কবি-মনে তাঁর এ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। উঠে-ছে কাজীর প্রাণে। কাজীর মনে ও বিস্তার।

কাজীর কবিতার এ যাদে যাদুতীর্থ ঃ অভিজ্ঞতা ও সার্বজনীনতা নাকি মেলা অভাব। বিজ্ঞানের কথা। অথবা নীরস। তবুও কাজী সত্যকারের কবি বলে তাঁর কাব্যে। সেই অন্তরের আহ্বান মেলে নিজেই পর্যাপ্ত মোটে নি। মেলেই নি উদ্ভাসনের বিলাসিতার উপকরণ। বাংলার মেলের মোহন রূপ যাদের অন্তরেই তাঁর অন্তর গঠনের বাংলায় মাটির মুগ্ধে। তাঁর মাতের মেলে।

বাংলার মুগ্ধে ছিল তাঁর কুলদেবতা। গান মেয়েছেন, কবিতা লিখেছেন এই সন্তানদের জন্য। তাদের জন্য বাথা মেয়ে-ছেন, মেয়েদের কল্যাণকে মেনেছেন। আর মোহন্তে তাঁদের মতোই তাঁর কণ্ঠ মেন করে মুগ্ধে সন্তোষ অন্তর্নিহিত আর্তনাদ ও মোহনীন্ত মোহ মেন হয়ে পড়েছে। এর ভালবাসার মেজা বাংলার মাটি, এর মুগ্ধের মুগ্ধে উর্বর পলাশপ্রমাণ মাটি — আপনারা, আমার কৃষক ভাইরা ছাড়া তাদের অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার কৃষাণ ভাইদের তাকে বর্ষার আবাহন জানিয়া বাদল মাসে, তাদের মুগ্ধের মেঘে মাদার মাটি মাটি-মাটি পাঁজিয়ে অন্তর সন্তানের হইয়া যায়, আমার কৃষাণ ভাইদের আশা-মোহনে মাটি-মাটি কুলে-ফলে-ফসলে শ্যাম সন্তুষ্ট হইয়া ওঠে, আমার কৃষাণ ভাইদের বহুদের প্রতিমার মাটা যেন সোনার রঙে রাঙিয়া ওঠে। এই মাইকে জিজ্ঞাসা করা মাটে ইহার প্রতিবন্দি মুনিতে পাইবে—এ মাটি প্রবাস, এ মাটি চাষার, এর মুগ্ধে-ফল কৃষক বহুর।

স্বপন। সবই স্বপন। বিশ্বজনের স্বপন-ভরা। সেই স্বপনই একদিন মুগ্ধে নিয়ে মেখা মেল। তার মুগ্ধে হয় অন্তরে। হায় অর্থ-শতাব্দী পূর্বেই (১৯২৬) একদিন এক পাগল মাটিয়ার উঠি আজান করে স্বপন ভঙ্গ করে উঠেছিল। পরিপূর্ণ আশা তাহলে সাড়ে ওঠে নি। কিন্তু ঐ মুগ্ধ অর্থের মুগ্ধ — স্বপন পূর্ণবিকাশ হবার মেরাদই-বা কত?

একদা বাংলার সাহিত্যের আকাশকে আর একটি জ্যোতিষ্ক সমস্যার উদয় মাটি-ছিল। অন্তরেন। মাইকেল অন্তরেন ও কাজী নজরুল। মোটেই মিল্ নয়। কিন্তু মুগ্ধেরই বাঙালী। মুগ্ধ বাঙালী। আর বাঙালী—সব ছাড়াবার সাধনায়।

মাটির। মেলেন। প্রমীলা। মোটে মাটিকেই মেয়েটি। তাদের মাটি ভালো মোহ। পশ্চিম পাশ্চিমে মতো মিলন। মিলন মিলির মতোই গভীর। সজল। ওরই মুগ্ধে একদিন বাসা মেয়েছিল ভালোবাসা।

মুগ্ধে মোটা মেম তারা তাকলো এর মধ্যে কাজে নি। মোটে মুগ্ধেনাথের মেয়ে-তার কিনকিনানিও কি ও মুগ্ধে? কাজীর ভারাক্রান্ত হৃদয়টা ওকে মেলী করে সন্তুষ্ট করে থাকবে। মেয়েমিল প্রথমকালে কাজীর দিকে। মাটির চিন্তন প্রান্ত। মজলা। দীর্ঘ অদর্শন এই চেতনাকে খাড় করেছে। নিয়ে নিয়েকে নিয়তম করেছে।

সম্বলের মধ্যে কণ্ঠ ও মেধাবী। কাজীর নিজ ছিল না। ছিল না নিশ্চিন্ত আশ্রয়। প্রমীলা কি জানত না? জানত। সাঁঝিরা কি নিশ্চিত মৃত্যুর কথা মেনেও সত্যাসমকে অন্তরীকার করেছিল? আর উমা?

নিয়ে। কিন্তু সেই নিশ্চিন্তের মাঝার মুগ্ধের আলো মুটিয়েছিল।

মেয়ে আর আলা। মুগ্ধের সম্পর্ক অন্তরালী। কিন্তু অন্তরাল মুগ্ধের। মাঝখান অন্তরাল। অন্তরাল। অন্তরাল।

আলা অন্তরে। মেয়ে পর আর। আলা মেয়ের আন্তরতা চায় না। চায় তার পূর্ণ দান। মেয়ে পাঁচিল তুলে মেয় আলার। মোহের। তারই আড়ালে থেকে মেয় আলার ঐশ্বর্য মেখে। তার কবিন ইসারায় নিজেরে ওঠে। মুগ্ধে ওঠে। মুগ্ধে ওঠে। সব আড়াল কেলে নিয়ে মেয়ে চায় আলার আলার। ...

অন্তরীন্তার আর নিস্তার। পরস্পরীর মেয় তাকে মুগ্ধ করে। হাতমানি মেয়। যাকে সে তাকে সাড়া না নিয়ে থাকবে মেয়ন করে? কাঁদিয়ে পড়ে। মর মর, সাথী মর, মর নয়। মুগ্ধ-নীল হয়ে ওঠে অন্তরীন। মুগ্ধে কালি নিয়ে আঁচলের মুছে যায়। নিয়তমের মধ্যে-লাভ তাকে মেয়ে হয়ে যা?

বাংলার মুগ্ধে একদিন এই সমস্যাকে মুগ্ধে উঠেছিল। মাইকেল মেঘনাদ বাহাদুর অন্তরালের বিবর্তনে মুগ্ধ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু সমস্যাকে নিয়তম তার অভিনবত্ব। বাংলার মেয়ে সমাজিতা প্রমীলা। মুগ্ধেও তারন্ত মুগ্ধেছিল এই সমস্যাকে। মে নিয়, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগই-তা পরমধর্ম, অন্তরে ধর্ম। আর সবই পরধর্ম। সমস্যার মাঝে প্রমীলা মর মেয়েছিল। মুগ্ধ মুগ্ধেছিল। বহিরন্ত আত্মীয়তার বন্ধন-মোহ তাকে বাঁধতে পারে নি।

বাঁধনের মুগ্ধে আবার কাজী অন্তরিত হয়ে তলে পড়লেন। মায়ের মন্ত্রে অন্তরে-প্রহরার শান্তি-সময় বিহিত নিয়মের প্রমীলা। কাজী নিজেকে নিয়ে মেয়েছেন। প্রান্ত ক্লান্ত কাজী একটুকু মেয়ে উঠে। গান-গান।

'আমি ক্লান্ত হয়ে আসব যখন
পড়ব মে যে ঢলে,
আমার মুটিয়ে পড়া মেহ তখন
বহবে কি ঐ মেহনে?'

প্রমীলা ধরেছিল।

কাজী নিয়ে চান প্রমীলার নিয়ে। কি না-মে হতে পারত? এই মুগ্ধ, এই সাংসারিক পরিবেশ আর পরিস্থিতি, মেয়ে নিয়েই মো প্রমীলা করে অন্তরে যা, অন্তরেলার সব নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাঁর আমা। কিন্তু মেল কি? তিনি কি নিয়েন প্রমীলাকে?

মুগ্ধে নিয়ন্ত্রীকে অন্তরেমেনে
সজলে নিয়ন্ত্রিনী।
সব তাজি মোর হলে সাথী,
আমার অন্তরে অন্তরে রাতি,
মেয়ের মুগ্ধে আজে আমার
নিয়ের কনার কামার।
তুমি সাথ করে নিয়ন্ত্রিনী,
সেই কথা মে আমার।।

অন্ত-নিয়ন্ত কাজী তবু অন্তরের পরিচয় করেন নি। প্রমীলার নিকে মেয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। আবার সান্ত্বনাও মেয়েছেন। মেয়ে যে আমার অন্তরে

কত দেবে আমায় ভেবেছেন। ভেবে নি। মুক্তোর-গুচ্ছ আকাঙ্ক্ষায় বুকে সঞ্চয় রেখেছ। কিন্তু প্রতীক্ষা ব্যর্থ নি।

অসহায় হয়ে দেখেছেন দেশের মৃত্যু। বুকে জোড়াতে পারেন নি। তবু সহজ শান্তির মধ্যেও নিজের শান্ত দৃষ্টি কখনো আঁখির তারা তাঁর নিজে ভেতে দিয়েই ধরে রেখেছে। অক্ষয় নিজেরে। প্রতিবাদহীন দেহের মধ্যেকার নিশ্চিন্ত এই অসহায়-সান্ত্বিনা তিনি অন্তরীক্ষের কখনো দেখেন করে?

চারদিকে হৈ-চৈ কলহে তাঁর মন। আকাশে আলোয় ভরে। তাঁর পাশে দুর্বাদি দেয়ে পড়ে অনেক। তাঁর কথায় জোরবাজির খেলা হয়ে। সভা ডাকে সভাপতি হতে। অন্য ডাকে পাশের বাড়ী নিয়ে বসতে। পত্র-পত্রিকায় বুকেদুর্বাদি লাগিয়ে দেয় লোক শৈলে।

কিন্তু চলনিকায় মুখে ফুটল না। তাঁকে যা অসহী ছাড়া অন্য কথনা মুখে ফুটে চাইলেন না। কারুর অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিতের দেখা নেই। কিন্তু বোঝা যায়। তবু বড় আর মর্মান্তিক আঘাত বুকে নিয়ে কাজী আসন দুর্বিয়ে বসেছিলেন। তাঁর সারা জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমাধি নিজের হাতে রচনা করে বসেন? বিদ্রোহ, বিপ্লব, দেশ, দেশের স্বাধীনতা, সবই, কখনো দেখেন পড়ে? কিসে হয়ে গেল সব?

দেশ। কাজী চারুর নিজের প্রয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে।

জীবনের এই চরম টাকার মুখে দেখে-ছিলেন কাজী। প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত না হলেও খুব কমও নয়। টাকা এল প্রয়োজনের কোম্পানী থেকে, বই-এর প্রকাশকের কাছ থেকে, রেডিও থেকে। নিজেরও যা নিজেও টাকা এল। টাকা কিন্তু এল নাটকীয়ভাবে থেকেও। সংসর্গে এসেছে তবু বটেই। সামাজিক দেখেন নবীনের। তবু কলকা, আলবেয়ালা, ইন্দুবালা আর অন্যান্যদের গান দেখেছেন। কিন্তু যা দেখে টাকা ঢেলেছিলেন, সব তুলে নেয়, নিজে-ছিলেন এই শিক্ষিকা ও সমস্ত পত্র, তা কি দেখেছিলেন? শান্তি? সোয়াস্তি? আমার ধৈর্য? তবের অনেকখানি জুড়ে যে ঔদাসী বৈরাগ্য ছিল চিত্তরঞ্জন তা দেন কোথায়? অভাব ও অভাব উপাদানের বিশ্লেষিকা কি তাঁর হাতিয়ে দেন নিয়েছে।

সংসারের অনেক পরিবর্তন এসেছিল সন্দেহ নেই। স্বাচ্ছন্দ্যও দেখেছিল। কিন্তু তবুও চিত্ত তাঁরল কৈ? অন্তর্লোক তব চিত্ত করে থাকে সর্বক্ষণ। সন্তান আসে, তার মাতৃত্বের মধ্যে নি। বিলাসী, জ্ঞানী-গুণীরও অভাব নেই। তবু থেকে-থেকে দুর্বোধ বেদনা অন্য হাহিয়ে-দেয়ার এক অভাব অনিশ্চয়তা অন্তর কুড়ে খায়। ঐশ্বর্যেও আছে। মনে হয় এ জীবন তাঁর দেখেনিই কাম্য ছিল না।

কাজীর অস্থিরতা বাড়ে। যত অস্থিরতা বাড়ে, তত আরও বেশি জড়িয়ে পড়েন ঋণে, অর্থাভাবে, আঘাতে। তুলে যেতে চান সব। তুলে যেতে বাস অতীত। তার মূলেও সেই অন্তরের উচ্চাস। কিন্তু পারেন কৈ? সমস্যুখী উপন্যাস হাতড়ানি উপেক্ষা করবার সাধ্য কি তাঁর ছিল?

ছিল না। কিন্তু সহজ উদ্ভাসন কোলাহল ও উত্তেজনতা হারিয়ে সহজ-ভাবে তিনি উপন্যা হয়ে পড়েন। নিজের অতীত খোঁজেন।

কাজী কেরামিলী বন্দিত্বের পরিচালনা স্বীকার করে নেন নি। বন্দিত্বের চাইতে মুক্তির ছিল তাঁর কাছে অনেক বড়। তারই আহ্বানে তাঁকে পরিচালিত করেছে চিরদিন। বার-বার জীবন-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি সেই ছাড়িয়ে দেখেছেন। অস্থিরতা, চঞ্চলতা, খেয়ালী, কাজী বার-বার তাই জীবনের গতি পরিবর্তন করেছেন। কখনো সহজ, কখনো বিপদে মুখে দেখেন। তবু এই অকল্পনীয়সম্ভব জীবনের মধ্যে এমন ছাড়া-ছাড়ুর ছিল, বার-বার আপন থেকে তাঁকে সজাগ করেছে।

চরম জীবনের সংকল্পহারা পরমাত্মা, আর্থিকের সৈনিক জীবনের বিপরীতমুখী ভাব, রোমান্টিক বিদ্রোহী জীবন, সাহিত্য ও কাব্যের প্রতি অনুরাগ প্রীতি, অর্থাঙ্কিত বিবাহ আসন থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা, কারাবাস, অন্তরঙ্গিত বিবাহ,—সর্বশেষ এই পরিমার্জিত নিস্পৃহ জীবন,—সবই মনে হবে সমবার্থ-হীন, অসংলগ্ন এবং হয়তো খেয়ালখুশীও।

অন্তর অভিমন্যন কাজী পেয়েছেন। কিন্তু এই খেয়ালের ও সমাবেশের অন্ত-রালে কাজীর নিজস্ব জীবন-ধারা কাজীর নিজের নিকটেই ছিল অজানা। যখন যেদিকে ঝুঁকেছেন, সেই কাজই তাঁর আজ চিত্ত ও চরম বলে মনে হয়েছে। প্রথমপ্রথম আঁধির হয়তো এই মনোভঙ্গীই ছিলেন। যেদিন বিদ্রোহের আবহমায় তাঁকে ঝুলেছিল করে আকুলের পথে বাঁধ বাঁধিয়েছিল, সেদিনও তাঁর মনে হয়েছিল,— আমারও অবশ্যম্ভাবী মহাসমুদ্রের তীর আহ্বানে আমি মুখোমুখি, তাঁর তত-আঁধির মুক্তির আমি ইঙ্গিতে মুখে-ছিলাম। আমি তখনই মুখোমুখি, আমি সমাজসমর, সমাজ উপাদানে কিন্তু চরম বাঁধিবাঁধ স্বাধীনতার। আমার সমস্ত-সমস্যাদের মাঝা-নিহিত বুঁধিতে আমার তিনি পাইয়েছেন অন্তরঙ্গ পুরুষার করে।"

বিদ্রোহের তুর্য হাত থেকে খসে পড়ল। হাতে তুলে নিলেন বীণা। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল,—"আমার পরম অন্য অন্তরে সহজ বিশ্বাস, সৃষ্টির আমার তখনও, আর একজন করছে পরিচালিত।.....আমার পরের আলো জ্বেলে, আর চলার সৃষ্টির দিন হবে, আমার সুন্দরের উপলব্ধি।...সুন্দরের ধ্যান, তাঁর সহজ ধারাই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম।"

নিজেরও অন্তরঙ্গ মধুর আর এক বিশ্লেষণের কিন্তু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, সেদিন সে কথা তিনি জানতেন না। সেদিন আজী সেই হঠাৎ পাওয়া বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তাঁকে পরমাত্মীয় বলে গ্রহণ করতে তিনি কাতুল হয়ে উঠলেন।

রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনচিন্তা তোমার অন্তরে। কিন্তু তা অনেকটা প্রচ্ছন্ন তোমার। এদের চাইতেও অনেক বেশি আকর্ষণীয় তোমার কাছে আত্মবিশ্লেষণের পথে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলেই এর আকর্ষণ তীব্রতর। যা খুব দুর্বোধ্য, সুদূর,—তার প্রভাব তত বেশি, আর দুর্নিবার। দুষ্পাপ্য, নাগালহীন এই অনির্বচনীয় মহামণির মোহ। ঐশ্বরিকতার কাছাকাছি এর মোহ। নাগালহীন নিস্পৃহতা ও উদাসীন অনিশ্চয়তা ছেকে আসে জীবনের ছন্দপতনে। নিস্পৃহার মানুষে সেতুর চায় আশ্রয় ও অবলম্বনের পূর্ণতা ওকে অবলম্বন করে। সহজ-সিদ্ধির প্রলোভন জাগে প্রাণে। ছুটে যায় মানুষে।

প্রতিভা কোনদিন অবশেষ ফুরে হয় না। তার চাওয়া অনেক বড়। প্রাণ দেয়া তার ধর্ম। মানুষের ছোট ও অন্তরালকে ঘিরে তার প্রতিভা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে ওঠে। তার-মানুষের অপরিচ্ছিন্নতা। সমকালীন সব সুন্দর ও মধুর উপাদান ও আকাঙ্ক্ষা করে। বড় হয়। বিজয়ী হলে পুরুষ পায়। প্রতিভার কাজীর প্রাণেও কি এই কামনা জেগেছিল?

আধ্যাত্মিক সাধনার পথে শক্তি যাচ্ছে, মুখে অন্যান্য জগতের স্থান খুলে যায়, মনের অন্তরা শক্তি ইন্দ্রিয়ের অন্তরাল সাজন করতে পারে,—তাহলে তার কী করতে পারে এবং হতে পারে। তত্ত্বপ্রধান অন্তরার এই আশ্রমে এই সাধনা আশ্রমকে দিয়েছে রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণকে; অন্যদিকে এই তন্ত্রই তৈরী করেছে নানা বীভৎস মতবাদ ও তার আনু-সঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড।

একজন রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণকে পেতে লক্ষ লক্ষ রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদকে আমরা হারিয়েছি। হারিয়েছি মানুষকে। মানুষে তার স্বাভাবিক ধর্ম ও প্রেরণা ভুলে, ভুলে তার নেশা-মাতা-অন্ধতা, হৃদয়ের সত সহজতায় দূরে,—অন্তরে থেকে মনে ও মনে কিন্তু সমস্ত করে অন্তরে, কিন্তু হারিয়েছে নিজেকে। সহজ, সরল, মোহ-মুক্ত মেলামেশার মাঝে মানুষকে।

কাজীর প্রাণে অকস্মাৎ যে তার প্রবাহ জেগে জাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার মূলে এই পরিত্রাণের দুর্বার কামনা ছিল কিনা, বলবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর, সৈনিক, বিদ্রোহী এবং সমাজের একজন প্রেমিক, সাধারণ, অবহেলা অসহিষ্ণু এক পিতা আর অর্থাঙ্কিত দুর্বোধ্য সাধারণ মানুষের আশা সেদিন অতি সহজ বিসর্জন দিতে হয়েছিল,—তার প্রমাণ আছে।

(ক্রমশঃ)

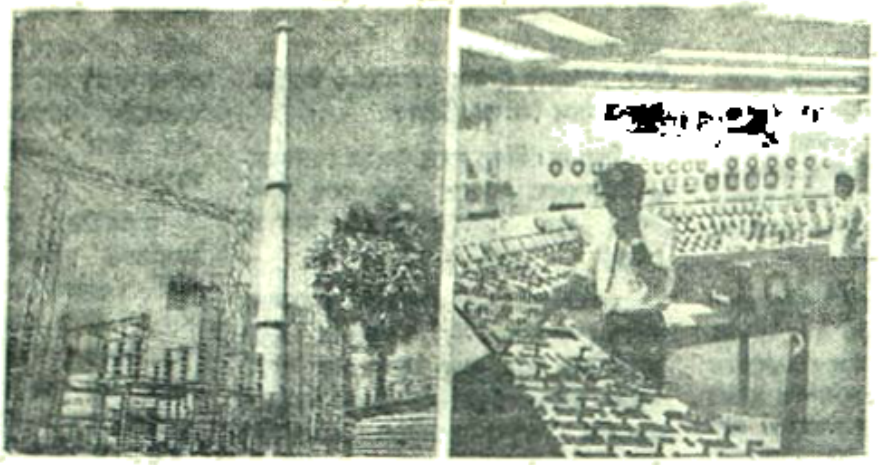

বিজ্ঞানের কথা

তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ঐতিহাসিক বোম্বাই শহরের ৬০ মাইল উত্তরে তারাপুরে জাতীয় প্রথম পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যে ব্যাপারটির নির্মাণকার্য সাত বছর আগে সূচনা হয়েছিল, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই কেন্দ্রটিকে জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছেন। এটি এশিয়ার দ্বিতীয় পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আমাদের দেশগুলির মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হল।

সভ্যতার আদি যুগে মানুষ আগুনের শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছিল অরণ্যের কাছে। রান্না ও তাপউৎপাদনের কাজ তখন কাঠ্যুগের সাহায্যেই হত। ১৮০৬ সালে এসেছে এলো এক যুগান্তর—বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার করলেন জেমস ওয়াট। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ইতিহাসে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত। এক শতাব্দী ধরে কয়লা চালিত বাষ্পশক্তি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল। তারপরের শতাব্দীতে তেল, ভাটার ও গ্যাস থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পন্থা উদ্ভাবিত হল।

এর পর ১৯৪২ সালে বসল ইতিহাসে আর এক যুগান্তর। যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ এনরিকো ফের্মির নেতৃত্বাধীনে পরমাণু-শক্তির শোষণপ্রক্রিয়ার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পন্থা উদ্ভাবিত হল। তখনি শক্তির উৎস পরমাণু-থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা দিলেন বিজ্ঞানীরা।

আজ আমরা জেনেছি, বিদ্যুৎশক্তির উৎস হল তিনটি : জল, কয়লা এবং সর্বাধুনিক ও সর্বাধুনিক হল জেনেছিস পরমাণু। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যতদূর অগ্রসর হয়ে যা পাওয়া যাক কেন সেই পরমাণুশক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে পারছে না।

কারণ প্রশ্ন, প্রশ্নাবলম্বন আছে। আর৩ দীর্ঘকাল আমরা কয়লা-বিদ্যুতের সাহায্যে চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে সব কয়লা তারোয় পূর্ব ও আছে। পশ্চিম জগত বহুপূর্বেই জল-বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। জল-বিদ্যুৎ আবার প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল। যথেষ্ট বৃষ্টি না হলে অচিরেই জলবিদ্যুৎ শক্তির অভাব দিনে দিনে বেড়ে যায়। আর অনিশ্চিত খেয়ালের ওপর নির্ভর করে শিল্প ও নাগরিক জীবন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তাছাড়া দিকে কয়লা পরিবহনের সমস্যা ও খরচ দুটিই পশ্চিম ভারতে শিল্প প্রসারের পথে বাধাস্বরূপ। তাই এ অঞ্চলে পরমাণু জগতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

ভারতের পরমাণু নীতি কমিশনের প্রথম অধিকর্তা পরলোকগত ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা তাই বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী একটি পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকের তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ। তারাপুরের এই কারখানা গড়ার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার কথা উল্লেখ্য। এ সম্পর্কে ১৯৬৩ সালের ৭ ডিসেম্বর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হল দশ লক্ষ কিলোওয়াট। এই কারখানায় প্রতিদিন ১৭০ গ্রাম ইউরেনিয়াম-সহযোগে পরমাণবিক জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত একটি পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উপাদান সরবরাহ করে আসছে। পরমাণুর ব্যবহার করার সাহায্যকল্পে উৎপাদন করে এই কারখানায় দুটি রেকটরের জন্য তার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে হলে প্রতিদিন কিলোটি ইউরেনিয়াম এক কোটি টাকা মূল্য উপাদান যোগান দিতে হত।

আরব-সাগরের তীরে এই কারখানাটি যে পৃথিবীর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের অন্যতম বৃহত্তম কারখানা তা বাইরে থেকে বেশ বিশ্বাস করাই কঠিন। এর পরিবেশ শান্ত নির্জন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো এর আকাশ কালির আস্তরণে ঢাকা নয়। কারখানা ঘরে ১০০ ফুট উঁচু আকাশে মাথা তুলে দুটি রি-অ্যাকটর বা পরমাণুচুল্লী। পাঁচ ইঞ্চি পুরু স্টেনলেস স্টীলে এটি মোড়া। এই চুল্লীতে ইউরেনিয়াম-পরমাণু জ্বালানি যখন যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তারই সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। তারপর সেই বাষ্পের সাহায্যে ২-লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী দুটি টার্বাইন জেনারেটর চালান হয়।

প্রায় সাড়ে ৬ হাজারেরও বেশী পুরুষ ও নারী সকল স্তরে কি-বাটি লোক এই কারখানাটি নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু এটি চালাবার ও তত্ত্বাবধানের জন্য যা লোক দরকার সে লোক। এই পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে-তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কলাকুশলীদের এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য ৩৩ জনেরও বেশী ভারতীয় কৌশিকার সাত বছরের মধ্যে বি আই-এই কারখানার এবং ইতিমধ্যে তেরো-টি রি-অ্যাকটর শিক্ষালাভ করেছেন।

যে অঞ্চলে কলকারখানা নির্মাণ করে পরমাণু-শক্তি তৈরী করা হয়, পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে সেই এলাকা আশপাশ ছাড়িয়ে উঠবে পাওয়ার স্টেশন ও পরমাণু প্রতিষ্ঠান

স্বতন্ত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরমাণুচুল্লী থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় আবর্জনার একটা বিপদ থেকে যায়। বাঁধের এই পরিমাণ প্রতিরোধ করতে পারবে কিনা, তবু তেজস্ক্রিয়তার বিষ থেকে এই ধারা বিপজ্জনক। তাই পরমাণুচুল্লীর কারখানাকে আর একটি ঘরে এই তেজস্ক্রিয় আবর্জনার স্থাপন হবে। কারখানা থেকে যে জল বা বাতাস বেরিয়ে আসবে, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবমুক্ত হলে তবে সেগুলির আসে তাদের তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট করে দেওয়া হবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয়তার বিপদ অতি-সামান্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির আমেরিকার সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। এর পর রাজস্থানের রানা প্রতাপ সাগরে এবং তামিলনাড়ুর কলপক্কমে আর দুটি পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হবে। রানা-সাগর প্রকল্পে ভারতের অংশ-দায়িত্ব থাকবে শতকরা ৬০ ভাগ এবং তামিলনাড়ু প্রকল্পে শতকরা ৮০ ভাগ। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা তারাপুরের পরিচালনাকে পরবর্তী দুটি প্রকল্পে অনেক দায়িত্বভার দেবেন। জ্বালানির সম্পর্কেও ভারত আত্মনির্ভর-শীলতার পথ গ্রহণ করতে চাইছে। তাই এমন উপযুক্ত সমুদ্রতীর অনুসন্ধানের দিকেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এখন বিশেষ নজর পড়েছে।

বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন

সম্প্রতি কলকাতায়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল নানা দূষিত পদার্থে সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কল-কারখানা, পরীক্ষা-গার, মোটরগাড়ী ইত্যাদি থেকে নানারকম গ্যাস, ধোঁয়া ও অন্যান্য পদার্থ বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে—যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এমনকি সহরাঞ্চলে কল-কারখানার গ্যাস ও ধোঁয়া থাকে উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেখানে উচু চিমনি করার নির্দেশ আছে।

বিভিন্নস্তরের বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহ কি উপায়ে কিভাবে বয় নিয়ে আলো করা যায় সে সম্পর্কে সম্প্রতি কলকাতায় দুদিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্মেলন হয়ে গেছে। নানা বিশ্ব থেকে প্রায় দু হাজার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শল্যবিদ্যাবিদ, ভূমি-বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, কর্মবিদ, আইনজ্ঞ এবং অন্যান্যবিজ্ঞানী এই সম্মেলনে যোগদান করে-ছিলেন। অন্তর্জাতিকতাবাদী এই সম্মেলনে তাঁরা বায়ুমণ্ডলে কিভাবে দূষণ রোধ করা যায় তার উপায় সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। সম্মেলনে যোগদানকারী বিজ্ঞানীরা দূষণ রোধের আন্তর্জাতিক সুপারিশের উপায় সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পান।

বায়ুমণ্ডলে দূষিত পদার্থের সুক্ষ্মকণা ও ধোঁয়া কি পরিমাণে আছে তা পরিমাপ করে সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপায় আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব এ দূষণের বিরুদ্ধে এই পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। আমেরিকাতে যে যন্ত্রপাতির উপায় সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে টেলিভিশনের আদলের ও রঙিন আলোর সমন্বয়। কলকারখানার কর্মকর্তারা এই উপায়ে বন্ধ কিলোমিটার দূরের পর্যন্ত দূষিত পদার্থ সনাক্ত ও পরিমাপ করা যায়। এর ফলে গত পাঁচ বছরে আমেরিকার অনেক কলকারখানাতে সালফিউরিক অ্যাসিড সহজেই দূষিত পদার্থগুলির পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে। জার্মানীতে সম্প্রতি একরকম ফিল্টার যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে বায়ু-মণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত ধূমকণাকে থেকে বিষাক্ত গ্যাসগুলিকে পৃথক করা যায়। গ্যাস ও ধূমবিহীন এই বৈদ্যুতিক ধূম প্রথমে এখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, অর্থাৎ এখন পরীক্ষামূলক স্তরে আছে।

চন্দ্রের নতুন রঙিন পদার্থের আবিষ্কার

হিউস্টনে অনুষ্ঠিত সম্প্রতিক চান্দ্র-বিজ্ঞান সম্মেলনে ১৪২ জন বিদেশী মার্কিন ও বিদেশী বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকাশ করেছেন। গত জুলাই মাসে অ্যাপোলো—১১ অভিযানের মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে সকল দূষিত, শিলা ইত্যাদি উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন, গত তিন মাস ধরে এই সব বিজ্ঞানী বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে তার ১৩০০ গ্রামের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

এই চন্দ্রবিজয়ী সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা ফলাফল ও সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করে-ছেন। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টিন বিজ্ঞানী ডাঃ জে লেক স্মিথ চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে আনীত উপাদান পরীক্ষা করে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, এটি ফেলসিত পদার্থের মতো নানান আকারে পাওয়া গেছে। এটি লৌহসমৃদ্ধ পরমাণু-সিং গঠিত ভূত্বকের একরকম ঘনসন্নিবদ্ধ পদার্থ।

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ ডঃ স্মিথ নবাবিষ্কৃত এই নতুন পদার্থ সম্পর্কে বলেন, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা মিলিত হয়ে এই নতুন পদার্থটির কি নাম দেওয়া হবে তা স্থির করবেন। বিজ্ঞানের পুস্তকাদিতে এই নতুন পদার্থটির নাম দূষিত হওয়ার আগে বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক তা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো বাঁরা পৃথক-ভাবে এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন তাঁরাও এই নতুন পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থ তৈরী করা হলেও পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে এটি পাওয়া যায় না। তবে খনিজটা এই ধরনের ভিন্নিস পরীক্ষাগার, আগ্নেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পাওয়া গেছে। এ সকল পদার্থের বয়স ৩৬ লাখ। কিন্তু ইলেকট্রন অনু-বীক্ষণ যন্ত্রে চান্দ্রশিলার নতুন উপাদানটির যে ছবি তোলা হয়েছে তা দেখে বিজ্ঞানীরা বলছেন, চান্দ্রশিলার এই উপাদানটি এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদার্থ।

—ধ্রুবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকারখানার দূষিত পদার্থ বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষেপণের চিমনি (বামে)। অন্যদিকে তৈলিক সোবেন কন্ত (ডানদিকে)

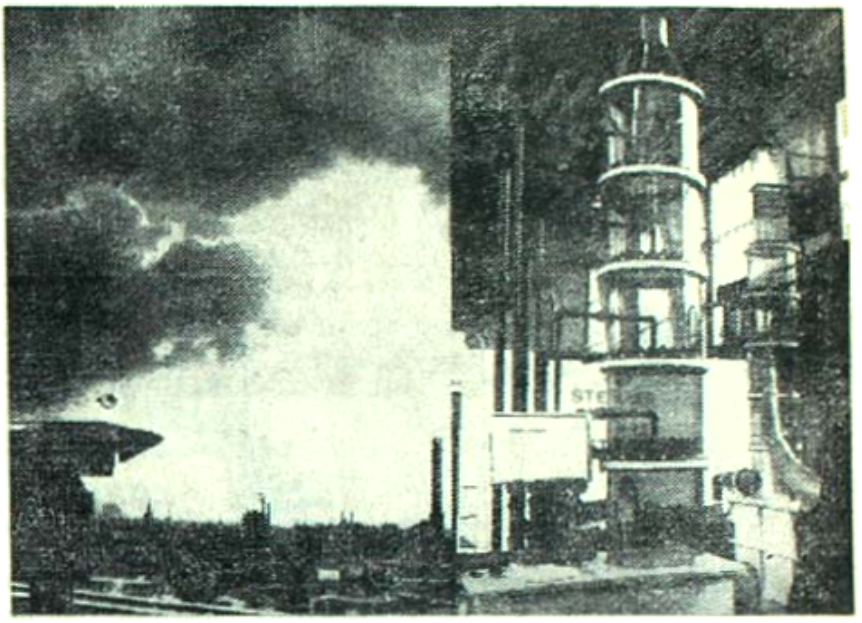

শেষপত্র

লেফ্‌টেন্যাণ্ট এইচ্‌. এন্‌. ব্রোডলব্রোক'
রয়েল আর্টিলারী

[illegible],

১৪ই জুন, ১৯৪০

আজ সন্ধ্যায় আমাদের ব্যাটারি পোস্ট হইতে সর্ব্বশেষ এই চিঠিটি লেখা সুরু করিয়াছি। কিন্তু এ চিঠি আজই তোমাকে লিখিতে বসিব বলিয়া তাহা নহে। আজ সকালে আমাদের ব্যাটারি পোস্ট হইতে এক মাইল দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে একটি ছোট্ট সমাধি খনন করিয়াছি। সমাধিটি আমার নিজের হাতে খুঁড়িয়াছি। সমাধিটি আমার জন্য নহে—আমার একটি সহকর্ম্মীর জন্য। সে আজ সকালে আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। আমার সম্মুখেই সে মারা গিয়াছে।

সুদীর্ঘ ছয়মাস এ আমরা অবিচ্ছেদ্য ছিলাম। আমাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধটি ছোট নহে। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল বড়। সে কথা আমি আজ তোমাকে বলিব না—শুধু বলিব আজ সুদূর এক্সমাউথে আজ যে—সে মারা গিয়াছে। আমার জীবনে সেখানেই যেন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তাই আজ তোমার কাছে আমার কোনও কথা নাই, আমারও যে কিছু বলিবার আছে, সেকথা আজ আমার মনেও হইতেছে না। আজ সন্ধ্যায় সেই ছবিখানা তাহাকে দিব বলিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে আর দিতে পারিব না। আমার ব্যাটারির সহকর্ম্মীদের কাছে আজ সন্ধ্যায় সে ছবিখানা দেখাইব বলিয়া আনিয়াছিলাম। তাহাদের আজ আর দেখাই

ইতিহাসের কথা থেকে চিঠিটা পেয়ে শুভ্র লজ্জায় নয় নিজেকে অপরাধীও মনে হলো। তাই অনেক ভিধা অনেক অন্তর্দ্বিধাকে উপেক্ষা করে একদিন ভিআপুরে এসে কোহিমার ট্রাঙ্কিল হলো।

কোহিমা শহরের বাইরে একটি, শুধু এই সমাধিক্ষেত্র। ঘাস-অঘাস, ফুল-অফুল, বিদেশি-বিদেশের যে অসংখ্য ভিড় চোখে আসে-যায় সীমান্তের দূরে গ্রাম বিদেহের, তাদেরই সমাধির উপরেও এই সমাধিক্ষেত্র। ঘাস-পাথর, ফুল-ফলের আদর আর সূদের বাল্ক-বাই নিয়ে সমাধিক্ষেত্র এক সমাধিক্ষেত্র হয়ে আছে ভিন্ন।

কিন্তু না এলেই ভোমার ভাল হত। নিজেকে পরাজিতের না ভিজিয়ে। এ কি পরিণতি। সূদের বাল্ক-বাই ফুল-ফলের বাজন আর নিজের নিঃস্বতার ভাষাহীনতা আমাদের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। একদিন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যারা নিজেদের প্রাণ দিতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি—কালের যাত্রার আজ তাঁদের সামান্য স্মৃতি-টুকুও নিশ্চিহ্নপ্রায়। পৌরবীয়ের ইতিহাসে আজ অবলুপ্তি ছাড়া কিছুই নয়। হয়ত এটাই কালের চিরন্তন বিধির বিধান। একটা অসহ্য বেদনার আমার সেতারন জর্জরিত হয়ে বেদনোচ্ছ্বাসে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো।

তখন অস্তগামী সূর্যের রশ্মিগুলি আমাদের অনুসরণ করে। গাম্ভীর্য শুভ্রার আমরা যান পাহাড়ের বন্দী. সেখান, ও অন্যান্য সেবারা মেয়ে। সেদের গণবাদ্যালয়ন কলাকীর্তি সেতুর্বাহিনীর। আজাদ হীনদের প্রতি এক দুর্যোগদুর্দ্দ নিয়ে গড়ে আর্টিলারীর সেবার এই এন ব্রোইলস্ফোর্ডের সূদের অন্তরে আবার আলাপ হয়।

মেদের ছাই কর্নাল সইমিন শুভ্রার অন্তরীণে ১ নম্বর ওয়ার্ডেন মোড়ে আজাদী আজাদীর বিমানবাহিনীর একটি অফিসারের ভবন ছিল। বাড়ীটার নাম 'ডালহৌস হাউস'। মাত্র কয়েকদিন আগে সেখানে চলে এসেছি। এক পরিবারে ছাড়ীর পর অনেকটা বাই মেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। লেফিটেন মোড় একটি মোবাইলের সূদের সামান্যে বাইরের মাটি সাহেবী মনকে আকৃষ্ট করলো। একটিকের মোবার ট্রিলাকিল, বিকেলবেলা, নিবেদিতা থেকে শুরু করে এ মাধ্যকালের হালকিল বিলুপ্তপ্রায় ও ধর্মপ্রচারের সমাবেশ। একটি মোড়েকে মেখে ইরোজী উপন্যাসের লাইন নিয়ে এ'মের মোবার। শর্টহিল-বাজারের মধ্যে ইক ভাইন' বাইরে সবা আজাদী। একটি মেবার উদ্দেশ্যে মেব-ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ছুটার সবার পড়লো একজন ইংরাজ মিলিটারী অফিসার একটি মোবাইলে নিয়ে 'হিন্দুস্থান' ও ধর্মদের মধ্যে-মুটুর মোবাইল। মুহূর্তেমাত্র তাঁর একটি নিমেষ পরিচয়ের আর আমাদের নিয়ে। মনে হলো মেন কুয়াশাটা খাই একলাফে পালাই মনে মেয়েছেলেও। নিমার মেন পাশের কোহুহলে দাঁড়াল। যা মেবার তাল করে যাই খোজবার মনে বাঁরে বাঁরে মোবাইল একিয়ে মোবি অনুমান নিয়ে বস। মেবীর তাল খাই মনে হলো ট্রিজারাবিলের মেবা।

সবাকে মেয়ে মোকদ্দমার এসে হাজির হল। খাঁচুলির মত মিটিয়ে নিয়ে ছোলিজারী মেবার আমোজন আছেন। এমন সময়ে একটা বিরাট মিছিল নানা মন্তবের ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে আমাদের। মিছিলটাকে ছুমবার জন্যে আমরা প্রায় সবাই মোকদ্দমার পরিত্যাগ করে এসে দাঁড়িয়েছি। মিছিলটার পুরোভাগে আজাদী পতাকা হাতে একটি ছেলে ছোট সহজের ছেলে। মিছিলটা মোকদ্দমের কাছ বরাবর এসে আমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মেল। ঐটি ছেলে মেবি বাস্তার অপরদিকে মেছে এক মোরা পুলিশ সার্জেন্টকে মেছনে ঠানিয়ে আসছে একজন সশস্ত্র পুলিশ।

সার্জেন্ট আমাদের লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ আরী করলো—'মোকদ্দমার বন! মেখানে আছ মেখানে মেয়ে যাও। আর এক পাও এগিয়েছ কি গুলী চালিয়ে মেব করে মোব।'

আদেশটা শুনেই মিছিলটা থামিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তুক্ষণের মোর আমাদের আদেশই মেবি ছেলে-ছোট আমের মেই ছেলেটি আজাদী পতাকা হাতে একলাফে সর্বিনয় পদক্ষেপে এক পা এক পা করে সার্জেন্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। উপস্থ বিদ্রোহভরে চীৎকার করে উঠলো—'ইংরাজিনাম ভিন্দাবাদ। মুছাই ইন্দিয়া। অন্দেমাতরম।'

পলকের জন্যের সম্বিলিত প্রতিবাদের তখন চারিদিকে চলল উত্তেজনার সাড়া পড়েছে। ছেলেটি পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে। সার্জেন্টের হাতে মোকদ্দমে ভিন্নভয়। হঠাৎ একটা আওয়াজ। আর পরের মুহূর্তে ছেলেটি একলাফ চারপদ অন্দেমাতরম বলেই পতাকা হাতে আমার মেন পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র হলো পুলিশের গুলী। অবাক। স্তম্ভিত। তারি মধ্যে মেখা মেল সেই সার্জেন্টটা পাগল কুকুরের মত ভিয়ে ক্ষুব্ধচিত্ত ছেলেটির মুখে বাজের মোঁটা দিচ্ছে।

হঠাৎ আমার পাশ থেকে কে মেন বলে উঠলো—'সাথী পড়া' আমি পড়া' মেবিকে ভিয়ে আমাদের আদেশী মেবি সেই সার্জেন্ট অফিসারটি ছুটে ভিয়ে এক ধাক্কায় সার্জেন্টকে সরিয়ে ভিয়ে চীৎকার করে উঠলো—'আর গুলাত মোবে'। ভিয়ে গুলী বন্ধ করো'।

আকস্মিক এই আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মার্জেন্টকে চমকাবার একটা, মাথাকে নিয়েও মেন পরক্ষণে 'সামলে ওঠার মধ্যে ভিয়ে উঠে ভিল—'শোনো ইট ভিস ভি এমের মোবে। ভিস্ ইজ এন অর্ডার ইউ ভিয়েবে। ইট ইজ আই বস।' আমাদের মেন ইংরাজের অন্যায়ের আবার ছেলেটির মুখে মুখের কথাগুলি।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মোবার অফিসারটি বার করে সার্জেন্টকে [illegible] কললেন—

—'মেই আর্মস অফ ভিস [illegible] ওয়ার্ডেন্সুলন। ইট ইজ ভিট আই [illegible] এগেইন, আই প্রমিস আই সমন্ত [illegible] মেন ট্রাবি নাইস ইনটু ইউর ট্রাবি আই বলি ইউ কুড্রেস?'

মোকদ্দমে মোকদ্দমের ভিয়ে [illegible] গর্জিত দৃষ্টিমের মত অন্তরাল করে [illegible] তার মেবী মেবী হলো না। তবুও [illegible] সাহস সঞ্চয় করে কললেন—

—'কলমাইই! আই অমর লিডি [illegible] ওয়াজ আবীই মেবেল—ইউ ইউর হাত এ মেবী মেবী প্রাইস কর ভিস্।'

তার কথার উত্তর মেওয়ার চেষ্টা [illegible] না করে মেবার তাড়াতাড়ি ছাই, [illegible] আমার ছেলেটির মাথাটা নিজের [illegible] উপর টেনে নিলেন। প্রায় মুহূর্তে [illegible] ছেলেটি ইঙ্গিত মেন বুক থেকে ছেবে [illegible] একহাতে মাথা নিয়ে উঠে পড়ার [illegible] আবার চীৎকার করে উঠলো—'অন্দে [illegible] আর তার সঙ্গের মুহূর্তেই মোকদ্দমে [illegible] মেন পড়লো মেবরের ছেলের উপর।

মোর্বাদিকের মোকানপাটের সমস্ত [illegible] সব বন্ধ। ছোটখাট ব্যবসায় [illegible] ছেলেরা ভুলে নিয়ে পালানের মত [illegible] ওদিক খুঁজতে লাগলেন কাছে [illegible] আমার বা ডাক্তারখানা পাওয়া যায় [illegible] মেন পর্যন্ত একটি মেখতে মেলে [illegible] ভরে আর সমস্ত পুলিশের ছেলেটিকে [illegible] নিয়ে মেলেন।

পুলিশের অপসারণের পর [illegible] অবশ্য মুহূর্তের বিরতি হয়ে আসতে [illegible] করেছে। ইতিমধ্যে মেবল আর [illegible] একলা ছাড়া মেয়ে যে সার্জেন্টের [illegible] মেই ছেলেটি মারা মেছে। অবশ্য [illegible] কিন্তু এ আমাদেরই। উত্তেজনায় [illegible] মুহূর্তে ছেলেটির চিকিৎসার আমাদের [illegible] মাথায় মেয়ে এসেছে মেবার।

মারা চলছিল সমস্তক্ষণ মেখছে [illegible] মেই উৎসব জনতা ধীরে ধীরে ফুল [illegible] এগিয়ে আসছে মাথাকে। মিলিটারী [illegible] মাথায় মাথায় ইট-পাটকেলের [illegible] তখন ছেলেরা সর্বাঙ্গে এসে দাঁড়াচ্ছে। [illegible] মাথা মেটে পর্যন্ত করে মারের মারা [illegible] শুরু করেছে। তবুও একটিমাত্র [illegible] তার হাত বিপক্ষদলের দিকে এগিয়ে [illegible] না। আক্রমণের একটুকু ছেলেও [illegible] না। নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে [illegible] নিজস্বদৃষ্টি প্রায় কারো মাথাকে।

মোকদ্দমের মারার দাঁড়িয়ে একজন [illegible] মেখছিলেন। কিন্তু এ দৃশ্য আর সহ্য [illegible] পারলেন না। নিজের বিপক্ষকে আমার [illegible] মেই উৎসব জনতাকে নিরস্ত করবার [illegible] চীৎকার করতে করতে ছুটে মেবলের [illegible] নিয়ে দাঁড়ালেন। ছুটার এমনে [illegible]

[illegible] সমবেত অভিনয়ের সুরে আসরে [illegible] গায়কের জন্যে ঘুরতে দাঁড়াল। [illegible] কোথায় যেন হারিয়ে এসেছে—এত বড় অন্যায় আবিষ্কার হল [illegible] করে। এই মেয়ে আজকালের নয় [illegible]। কিন্তু আসর ফেলে যেন হাতে না [illegible] বলে' উঠেনা—সত্যিই আসল [illegible] মেয়েটাকে খুঁজে বার করবার [illegible] নেই। ভেবে বলেন—আচ্ছা বেশ—[illegible]।"

[illegible] পরিবর্তিত দলে ফুলশর ধরে [illegible], আসিয়ে আসর [illegible] হয়ে বিরাজে। [illegible] [illegible] মত আর একবার চীৎকার [illegible]—"বন্দনে। [illegible] [illegible] কথা ভেবেও দেখে না?" বিরহ [illegible] ফেলবার দাঁড়িয়ে রেল। একটি নবীন [illegible] ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে [illegible] বলে উঠল—"ও ভাই! [illegible] ভাবে বিদায় হয়ে যাচ্ছে [illegible]।" চোখের ইসারায় যা বোঝাল তাতে [illegible] আর আসরে চলে [illegible] আসি ভাবটায় ঘরেও আসরের [illegible] ইসারা বুঝতেই পারলেন তাঁরা [illegible]?"

আসি ঘটনার অবাস্তব বিস্ময়ে [illegible] যে মেয়েটিকে [illegible] হাত থেকে পালাবার [illegible] বিরহ কোলে তুলে নিয়ে মেয়েটির [illegible] দেখিয়ে দিয়ে ওঠেনি। [illegible] অবাক হবার বেশী সেই অবসরটুকু [illegible] একজন চোখে সেই [illegible] ঘুরে গেল আর একজন [illegible] দিয়ে। অবাক হয়েছে সবাই [illegible] আসরে চীৎকার করে উঠেনা। [illegible] আসরের আসর হাসিতে [illegible] যায়। একটা মেয়ের [illegible] মেয়ের মায়ের দিকে। যে যে অবাক [illegible] সবাই চেয়েছে আসি [illegible] হাসতে সুরু করেছে। বিরহের [illegible] আত্মবিস্মৃতির পরে [illegible] হাসলো। [illegible] সেখানে যা ছিল, তাকে [illegible] অনেক আগেই ফেলে [illegible]। [illegible] আসি হাসি থেমে [illegible]। তাঁর [illegible] সেই মেয়েটির দিকে [illegible] [illegible] এমন সময় পেছনে [illegible] [illegible]—পুতুলী হাসিয়া। [illegible]। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা।" [illegible] আসি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]।

[illegible] ফিরে এসে মিনতি ভরা [illegible] যায় এমন সময় [illegible] [illegible]। আসরে [illegible] [illegible] হাসিমুখে [illegible]—আসুন!" [illegible] [illegible] [illegible]। আসি আসরে [illegible]

[illegible] কথা চাইবার উপায় [illegible] হাতের ইসারায় আসরে [illegible]। সোজাসুজি [illegible] ফুলশরদের [illegible] দিয়ে ওদের [illegible] ফুলশরের হাসি [illegible] মধ্যে কারোর—না-না। এর জন্যে আপনারা [illegible] হবেন না। এখানে আর আসুন আসরে [illegible] নয়। আসর [illegible] [illegible] আসরের বিদায়ী [illegible] [illegible] আসর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বিয়ে নিয়ে আমরা [illegible] পাশ করেছে—

—ইউ নেভার নো হাউ অফেন আই থাউট
হিজ ফেস,
অলমোস্ট ইউ মাইট,
ইউ কুডন্ট হেল্প দ্যাট ফিলিং
দ্যাট হিজিস
অলমোস্ট ইউ নোজ হাউ আই ফীল।"

কিছুদিন পরে এক রবিবার সকালে ফেরেন্স স্টেশনারস বিস্কেই ক্লাব-এর ইন্ডোরার মাঠটায় পড়ন্ত রোদের কাছে গেলাম। তখনও বিশেষ ভীড় জমেনি। দূরের বন্ধ গ্যালারীর কাছাকাছি একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার বদলে ভাবি কিনা বিয়ের খাওয়ার বাস্ত। আর আমার এপাশ-ওপাশ ঘুরে আমিও একটা চেয়ার দখল করে বসে পেয়ালাকে বিয়ার আসতে বুঝলাম বিলম্ব। আমাদের আলাপের আমি এসে সময়ে সহসাই গ্রীক পত্র একজন সাহেব বন্ধু বন্ধু যেন আমার কাছে এসে বললেন—

—"আপ্ কমরেন। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে আপনি নিশ্চয়ই আমার সেই পুরোন বন্ধু।"

লক্ষ করে দেখি—সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট।

—"আপনার আন্দাজ একটুও ভুল হয়নি। অনুমান করে বলুন। আমার আপনার কথা মনে আছে। কবরের আলোচনার আলো ফুরোবার যেন আপনার মনে একবার দেখা হয়। আমারও তখনকে মনে একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল।"

আইরিশ আন্তরিকতা নিশ্চয়ই তাকে বিস্ময়ে বিহ্বল করেছিল। কোথা থেকে কতো যেন নিমন্ত্রণে সাড়া দেবার জন্যেই তিনি চঞ্চলিত পুরুষের তুলনায় তাকিয়ে নিলেন।

—"আজকে আমার। বিনা নিমন্ত্রণে বন্ধুর বিয়ে আপনাদের আমি ঠাট্টাতে পারি।"

—"আচ্ছা। সেদিন বিলিতী পুলিস আপনাকে নিয়ে অমন পাগ কি হলো?"

—"সেই সাদে-হাঁটা অভিযোগ এলোমিলে আমি তার কৈফিয়তে যথা দিয়েছি আর সত্যিকারে আমাদের প্রাথমিক আলোচনায় যোগ দিয়ে রাজদ্রোহমূলক আচরণ করেছি। সেই অভিযোগকে ভিত্তি করে আমার সামরিক আদালতে বিচার করা হবে কিনা সে বিষয়ে সামরিক মহলে আলাপ-আলোচনা চলছে। আমি যে দুজন বন্ধুর অনুরোধে বন্ধুত্বের খেয়ার সৌজন্য। আমার উপর সিভিলিয়ান দেখা করে নিয়েছে। এখনো ঘরে ফেরার পালা। বরফঢাকা জাহাজের আশ্বাসের ছিলাম। আপনাকে সে সুযোগ আমরা করে দিতে পারছি। তবে আমার সৌজন্যের সিভিল চলছে ছাড়ি কিনা তখন আমি জানি নেভাসি।

কথার ঝোঁকে কখন যে একটা নেশা হয়ে গিয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ আমার [illegible] আমার মনে হলো বিয়ের আসরে যাবার আগে আমার [illegible] দিয়ে আসা দরকার।

—"আমাকে এখন যেতে হয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগলো। আমার বিয়ের আসরে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো।"

—"আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনার বন্ধুর বিয়ে আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমার কোন সেবা আপনার [illegible] বলবেন। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।"

—"আপনাকে ধন্যবাদ। আমার বিয়ের আসরে আপনার উপস্থিতিই যথেষ্ট।"

আমি চলতে শুরু করি। আইরিশ আন্তরিকতা নিয়ে রসিকতা করবেন কিনা বোঝবার জন্যেই তাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে থেকে একটা কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন।

—"আমি চলতে পারি। আমার বিয়ের আসরে আপনার উপস্থিতি

আমাদের প্রতি মানবীর পরীর অনুরোধ আর দুর্বলতার বিষয় কেন পড়ে রহস্য ও কারণ আমি এর বিন্দু ভেতরও খুঁজে পাই নি। তবে আমি যা আমাকে যেন মানবীকে আকর্ষণ পেরেছে। তার জন্যই বলে তাঁর অবসরপ্রাপ্ত জীবনের এক পরীর সোপান আমার উপযাচিত হয়ে আমার আমার সকল চলন্ত জীবনের অন্ত নিয়ে গেল।

একবিংশের এক আকস্মিক ঘটনা তাঁর জীবনে এনে গেল এক বিরাট পরিবর্তন। চলমান বয়স যখন সত্তরের আমাদের হয়ে গেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার হলেন, তখন পরস্পর বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে ডাক্তার একজন ইংরেজ বন্ধুকে সৈনিকের মতো তাঁর আমাদের হয়। ডোরোথি এর পর চলে গেলেন।

আমাদের আমাদের সৈনিকের আর্তনাদে যখন হাসপাতাল আমাদের হয়ে আমাদের তখন তাঁর পূর্বমুহূর্তের আমাদের পর পরস্পর নিশ্চিন্তভাবে নিশ্চিন্তভাবে পরীর অবসরে যাই পড়ার নিয়েছে। আমাদের যা তাঁর চারিদিকের বিষয়ে সংসারী যেন তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। ইংরাজ চরিত্রের নৈর্ব্যক্তিকতাপ্রেমী পরাধীনতি একজনের বাদ সত্ত্বেও আমাদের আত্মা বিশ্বের আমাদের হয় নি। সমস্ত আর আমাদের না দেখে পরস্পর আমার একটা যাই চাইলেন। পরে আমাদের যে, তাঁর কাছে যেন কখন যা উপন্যাস নেই তবে আমাদের পর্বত সম্পর্কে একটা যাই আমার। আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বে হল, চলমানের বিষয়ে যখনের পারিবারিক না নৈর্ব আর আমাদের পূর্বে পড়বার পর তখন যে সকলে মানুষে বিশ্বের হয়ে যেন যখনের পারেন নি। মানুষ যখন যেন আমাদের কখন এক আশ্চর্যজনক আমাদের আমাদের তাঁর মৃত্যু-মন আমন হয়। মানুষ শ্রীআশ্চর্যদের দেখা।

পরস্পর সঙ্গে পরীর আমাদের আমাদের আমাদের। পরস্পর কথা যেমনই, পুরুষের শ্রীআশ্চর্যদের, আমাদের, বিশ্বযুদ্ধের, নিরপেক্ষতা মানবীর কথা। আমাদের হৃদয় মনের বিস্তার যেমন সম্বন্ধের হৃদয় আমাদের আমার পরস্পর আর যেন তিনজন পাওয়া আমাদের বাঙালী কথার সম্পর্ক পরিচিত হলেন। এঁদের সঙ্গেই আমাদের মানবীর ও যাঁর সম্পর্কে আমি উপযোগ যাই পড়া ও সম্বন্ধে আমার সম্বোধন তাঁর হয়।

আমাদের আমাদের হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমকের আমার চুপ করে গেলেন। আমার মনে হল বিদ্যু একটা কথা আমাদের নিয়েও হয়তো আমাদের আমা ঠিক হবে নিয়া। আমি ইচ্ছে করেই যেন আত্মবিস্মিতের যা আমার চলমান আমাদের না। একটু পরে হঠাৎ আমাদের চুপ আমাদের—খুব আমাদের বিদ্যা নৈমিত্তিক আমার বিদ্যমান আমি?

একটু বিদ্যুৎ হয়েই উত্তর বিদ্যমান—ঠিক যে আমাদের যেমন আমার যা চুপ আমাদের আমার আমিকে উত্তর হয় নি তবে আমাদের আমাদের নমিত উত্তর নিয়ে পারবি না।

একটুখানি নীরব থেকে আমার আমাদের খুব আমাদের—এ চুপ আমাদের যেন আমাদের আমে? আমি এ চুপের উত্তর আমি নিয়েও আমি না যা পাই নি আমি। আমি আমাদের ভাবি যেন সে এক আশ্চর্য নদি আমাদের চেয়ে নিয়ে নিয়েছিল নিজেদের চুপচাপ আমাদের পরবর্তীর পরবর্তী।

নিজেদের, পাশ্চাত্য, সমাধিস্থ সৌন্দর্যপ্রিয় মানবীকে দেখে তিনি আমাদেরও হাসিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের মত যেন চলমান উত্তরের আমাদেরও—আমি! আমাদের আমাদের আমার যাওয়ার পথ যেখানে নিল। আমি খুশি হই।

খুশিআমার মত যেন উঠেছিলেন আমি। আমাদের যেমনভাবে আমি আমাদের—যাহা। আমাদের আমার নিজের আমাদের আমাদের। তাঁকে খুঁজে পেতে হলে আমাদের আমাদের আমার নিজেকে খুঁজে পেতে হবে—আমাদের হবে — নিজেতে হবে। আমাদের বিশ্বি! যে যাই আমাদের: এই যেখানে যেমন যেমনই যেন হবে, সাধক হবে, সেখানে খুঁজে নিজেই এসে হাজির হবে আমার কাছে।

সেদিন মহর্ষির কথা শুনে তাঁর মনে হয়েছিল হয় তিনি আমাদের নিজেদের আর না হয় তাঁর নিজের পরীক্ষা আমাদের। যা হোক। কিন্তু এসে খুব, হল তাঁর জীবনের সাধনা—নিজেকে চেনার—নিজেকে জানার। প্রথমে মনে হয়েছিল কঠিন না সাধক—কঠিন না সরল। কিন্তু ধরাই কিন্তু যেমন আমাদের আমাদের উপলব্ধি আমাদের পারবিনের যে, নিজেকে এই আমার—এই চেনার যেমন-হয় যেন নেই। আন্তর্জাতিক আমি পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে মিলেছে।

আমার নিজেদের নীরবে আমিয়ে খুব আমাদের—একদিন একটা আমাদের স্বপ্ন দেখলাম। মনে হল যেন কিন-কিনারা দেখিয়ে সমুদ্রের আমাদেরকীয়ে এসে হাজির হয়েছি। সামনে এক বিরাট দৃশ্য দূরের প্রান্ত ন। সোনালী আমার আমাদেরকম। আমার যা নিয়ে আমাদের — পরস্পর খোলা। আমি এসেছি' ভেতর থেকে যে যেন পরমা চুপ আমার—আমি! আমি যে?' সে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কত যা আমাদের যেন আমাদের। আমার কথা নিয়ে একটা আমার যেমনের যা। আমার পরস্পর নিজের মন যেন পূর্বদিকে আমি হয়ে গিয়েছে। আমার, হৃদয়ের, সমাধির আমি নিজের আর যেন হয়ে উঠেছে। মুখ যেন। সে প্রশ্নের উত্তর আমার আমার যেন দি। আমি যা নিজেকে খোঁজা যেমনিধি আমার যেন হয়ে নিজে।'

আমার চুপ আর হয়েছিল, মনে হল যেন একটা তাঁর নিজের আমাদের আমার।

একটু পরেই ঘোর-ঘোর মুখে যেন উঠে আমাদের—খুব খুশিতে। যেমনের আমাদের নিজেদেই নিজের নদী আর, এস একটু; নিজের আমার আমি।'

মুখে এমিলেন্টা ডোরোথের নিকে তাকিয়ে আমাদের-পাতাল কি যে ভাবছিলেন মনে পড়ে না।

আমাদের আমাদেরকম যেমন হাল্কা মুখে চুপ আমাদের—'কি এত আমার আমার? যেমনকালে খুশিও কি নিজেকে নিজেকে খুঁজে আমাদের আমি?'

আশ্চর্যজনকে আমাও সহজ আর যেন নিজের উদ্দেশ্যে আমি পালটা প্রতিক্রিয়া করে আমাদের—'তোমার কথাই আশ্চর্যিলাম। খুশি যেন যেখানে পুরোপুরুষ হিন্দু হয়ে যেন। আশ্চর্যজনক এবার থেকে তোমাকে হয়তোই হিন্দু না ভেবে হিন্দু আমাদের যেন হয়।'

কিন্তু আমার রসিকতা আর হল। পরীর মুখে ধীরে-ধীরে আমাদের—'হিন্দু, কথাটা বুঝেছি না হয়ে পারব কিনা জানি না। তবে আমি যা কিনার আর চাইতে আমাদের যেন খুঁজে পেয়েছি এ বিশ্বাস আমি মনে-প্রাণে করি। আমাদেরকে আমার আমাদের।'

এমন সময়ে হাত আমাদের মোকদ্দমা গা ঘোরে একটা আমাদের আমাদের হলেছে। আমাই ভেতর একটি আমাদের আমাদেরী সৈন্যদের যোগাই করে যেন্যার আমাদের মুখোমুখি সৈন্য নদ আমাদের খোলা আমাদের নীচুতে আমাদেরকম যেন্দ্রমাইলের দিকে তাকিয়ে মন্তিষ্কের আর্তনাদ গদ আমাদের—

'যে যে যাই এ ইংলিশ লিজিং যেমনে,
যাইন্ড আর যা মাইটি ব্রাইটি শোর
হোর্ডাল নামেন ঈশ ঠিক
এডমান্ড আর
আইন্ড আর যা মার্ডাল শোর যে এডোর।'

নীরবে সৌদিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত যে জাহাজকে দেখা যাচ্ছিল। তারপর এক সময়ে মুখে যেন বললেন—আমন। এ আমাদেরই আমার যেমার কথা ছিল।'

ইন্দিরা যেতেই সময়ে আমার আমাদের মোকা ছিল্লম উদয় আস্তগামী সূর্যের রক্তিমচ্ছটায় চারিদিক আলোয় হয়ে উঠেছে।

অবশ্যই প্রয়োজনে হঠাৎ তাঁর পরিচিত আমাদের পুত্রের যেতে হল আমাদের বিদায় আনন্দ। কিন্তু এসে ব্রাহ্মণীকে খুঁজে আর আমার আমাদের যেন আমাদের যেন হয়ার।

মাস কিনেক যেতে যেতে। আমাদের মিলন-আলিঙ্গনাবদ্ধে আমার মুখে একটা বিরাট আমাদের এমন যেন ছিল। কিন্তু বিদায় আমাদের এখনে আমাদের আমাদের হয়।

আমাদের-আমী মানবীকে আমাদিনের মোলাকাত উদ্দেশ্যের আমাদের বিশ্বাস বিদায়-পার্টি মানবীর মোলিনা আমিয়ে চলেছে। সামাজিক প্রয়োজনে একটিন সকলে যেমার ইচ্ছা আমাদের হল। বিদায়ের আমার ছিল। যে আমার পরী হয়ে সমস্ত আমার আর সম্পর্কের আমার আমার ইচ্ছা আমাদের যেমনে এসেছে।

ঘরের যে যেন আমাকে পেছন থেকে ডাকছে মনে হল। বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখি হারাণী। একবার যার মুখ দেখা হয়ে গেলে আর ভুলতে পারি নি। তখন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এক লম্বা টানেই টেনেটুনে তাকে এক টানা চেলেডাকার হাজির করলাম। ফ্রিজ-টি-এর অর্ডার দিয়ে তাকিয়ে বসে বললাম—

—জান। কাল রাত্রে অন্ধকারে কারো চোখের সামনে যেন একবার দেখা হয়। অন্তত মুহূর্তে আমার পর্যন্ত সে সম্ভাবনা রেখতে পারছিলাম না। আর একটু, দেরী হলেই আর তোমার সঙ্গে দেখা হত না। আমি তৎক্ষণে চলে যেতাম।'

—'আজ সকালেই এসেছি আমার অনেক কথা পরেই ছিলাম। তবিষ্যৎ যদি ইন্দিরা গান্ধীর বেকারত্ব না আসতো তোমার সঙ্গে আমার দেখা নাও হতে পারত। যাকগে সে সব কথা। আগে বল—ব্যথা নেই, কষ্ট নেই হঠাৎ মোশে থেকে একদম উধাও হলে কেন?'

—'সেই সুবোধেই অনেক প্রয়োজন বলে তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে সরল করেছিলাম। সেদিন কয়েদে দিয়ে আসতেই কমা-আর সাহেবের জরুরী আহ্বান—আজ দু ঘন্টার জেরার জন্যে তাকে বাজধানীতে যেতে হবে। সেখানে সামরিক আদালতে আমার বিচার। তাই তোমাকে খবর দেবার মত সময়টুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় না। তাড়াতাড়ি দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, মানা কারণেই হয়ত সে চিঠি তোমার কাছে পৌঁছায় নি বলে মনে হচ্ছে। তাই তো। বিচার শুরু হল। অভিযোগ তো জানই। সামান্য সেনাবাহিনীর একজন ইংরাজের চাইতে আমার অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ আমি সামরিক অফিসার। আমার ফৌজদারী দেশ পর্যন্ত কেন উপায় না দেখে আমাকে উপযুক্ত দিলেন সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে হয়ত প্রাণটা বাঁচান যাবে। আমি তাঁকে নিরাশ করলাম না। অপরাধটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিয়ে বললাম — 'ধর্মাবতার, আপনার বিচারে আমার কি শাস্তি হবে আমি না। সে তাই ভোগ না করে—এ কথাটা আমি জানিয়ে দিতে চাই—যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে বর্তমান ভারত পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি না পাচ্ছে ততদিন যার-যার ঐ অপরাধ করতে আমি একটুকুও দ্বিধা করব না।' যে শাস্তি আমার হল সেটা একরকম মুক্তিপ্রার্থী বলা চলে। কারণ আমি যুদ্ধবন্দী আহত যুদ্ধ-বেদনা সৈনিক। সম্মুখে যুদ্ধে যোগ দেবার সেই হয়ে গেছে অনেক দিন। এখানে-এখানে একেবারে পালা। আমাকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে পেছনের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ হল। ইংরেজ সরকার আমিও জানত যে অন্ত লাগও বাঙ্গা দেশ' এ' বাহিনীর পূর্ব সম্মানরক্ষার করার সুযোগ নিল। তাদেরই দেশোয়ালের পুলিশের মতো নিয়ে যাওয়া হবে সুযোগও দেওয়া হল না। অন্ত প্রাণের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে পাঠিয়ে ফৌজদে অন্তরীণ থাকিকে সরিয়েও ফেলা হল।

—'দুঃখের দুদিন নিশ্চিত অন্ধকার রাত ভেঙে ফিরে এসেছে—একদিন তাই হবে। এত বড় বাহিনীর অবসান কিছুতেই সইবেন না।'

—'আমি সৈনিক। দুঃখের আমার নেই — তাই অবসানেরও নেই। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বলছে। আমার বিশ্বাস—তুমি যদি বেঁচেথাকো—সে মহা-লগ্নের আর দেরী নেই।' নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিয়েছি। শুধু একটি আক্ষেপ মনটা খুবই খারাপ হয়ে আছে। তাই তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম। অন্তরাত্মাদের এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার তেমন আমি আমার নিশ্চিন্ত মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে আমার একটা কাজ করতেই হবে বন্ধু। এ দায়িত্ব দেবার অধিকার শুধু তোমাকেই দেওয়া যায়। আমি জানি আমার দেওয়া দুঃখ তুমি পাবে। তাই অনুরোধের মারাত্মক মাতিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না।'

—'বল করে সে সুযোগ দুঃখি আমাকে দাও হারাণী। আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

নিজের হাতের আঙুলের আংটিটার দিকে যেন কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অতিসন্তর্পণে ধীরে-ধীরে সেটি খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—

—'এটা আমাদের এদেশেরই জিনিস। ইন্দিরা নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। এটা আপাতত তোমার কাছে রেখে দাও। ইন্দিরাকে এত সব কথা কিছুই জানাই নি। যদি দেখা পর্যন্ত দিয়ে আমি যাওয়া তো জানাই, আর যদি না ফিরি, যুদ্ধক্ষেত্রে হবার পর কিছুদিন অপেক্ষা করেও দুদি আমার কোন খবর না পাও, তাহলে ইন্দিরাকে এ আংটিটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বল এই আংটির মুহূর্তের থেকে আমি তাকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছি।'

শুধুর কান্নায় তাই কাঁপতে পারি নি। অনেক কষ্টে ধীরে-ধীরে বলেছিলাম— 'বেশ। তাই হবে হারাণী।'

কর্নেলটে বসে সারাক্ষণ শুধু হারাণীর কথাই ভেবেছি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কত সৈনিকই তো ফিরে আসে—এই সামান্যটুকু পর্যন্ত জোর করে নিজের মনকে দিতে পারছিলাম না। কারণ হারাণীকে ভেবে হচ্ছে কাজ আমার যুদ্ধবন্দীদেরকে। দেশী-বিদেশী সমস্ত সৈনিকদের কাছে-যার-তখন নাম—'আজাদ হিন্দ ফৌজ' — মুক্তি উপহার। কথা তখনকার তত নির্মম নির্দয় প্রাকৃতিক শত্রু হবে কাঁর মনুষ্যের আর নিজেরও নেই। এই আংটিটা ইন্দিরার ফেরত দেবার দায়িত্ব আমি। সেখানে একটুকুও সম্মানীয় জন সেই সময় হারাণীকে বিদায় দেবার চাইতেও অনেক দুঃখি জন—বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘরণীর ঈশ্বর মনে-মনে, মনোপলে আর তার চাইতে মনোরঞ্জন সব ঈশ্বরের অতীত এক স্থানের তীব্র জন্ম-অনুভব করিছে। আমি বাঁচার সঙ্গে যুদ্ধে মত না দেনা আমার মোহ তার সমস্তকে বেশী নিজে আমার সমস্ত দিয়ে সমস্তের, নিজে নিজেকার নিজে পরিচয়ে এই প্রাকৃতিক সত্যের কথা। হারাণী সেই সম্ভাবনার কথাই ভেবেছিল।

হারাণীর সঙ্গে কিছুদিন মত একটিন যুদ্ধেরও শেষ হলো। কেউ না জিতলো—কেউ ও জিতলো না। মরা কিংবা না মরলে কেউ হারাণীর একজন।

বহুর খানেক অপেক্ষা করার পর সে আংটি ইন্দিরাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে হারাণীর সেই কথাগুলিও জানিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ইন্দিরা মানতে রাজী হলো না। জীবনসাথী হিসাবের সম্মান দিয়েছিল। মহীয়সী প্রকৃতিসেবী সেদিন নিজেই অপেক্ষা হেসেছিলেন।

ইন্দিরাকে আমি এতটুকুও অপরাধী মনে করি না। তবুও কোথায় এই সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে—এ না হলেই যেন ভাল ছিল।

এতদিন ধরে ভ্রমরে যে মুক্তি খুঁজে নিয়ে ইন্দিরা নিজ কর্তব্যে ছিল সে কি আজ অন্যায়ে অবহেলায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে না? মুক্তির অর্থ কি তাহলে মুক্তিলাভের বেশী মূল্য পাবে না? এটাই 'ও প্রাকৃতিক নিয়ম? প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন?

কোহিমার আর হয়ত কোনদিন আমার আসা হবে না। কয়েদের মাঝের এই সমাধি-স্থলের হয়ত একদিন মুক্তিলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। একথাও হয়ত কেউ কোনদিন জানতে পারবে না যে এইখানে, এই মেঘের মাটিতে মিশে আছে একজন সাধারণ বিদেশীর দেহাবশেষ—যাকে কর্তব্য ভিন্ন মানবধর্মকে জানবাসার মূল্য দিতে হয়েছিল নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে।

মাই যা জানলো কেউ—মাই যা বলে থাকলে কেউ—আমি তো জানি।

—হারাণী থাকবে চিরদিন আমার অন্তরের নিভৃত কোণে—আপন মহিমায় আসন পেতে।

ফেরার পথে কয়েক পা এগিয়ে এসে সেখানের মত তাকাতে ফিরে দেখি ইরাল এক মহুয়া ছায়া এসে আমাদের মুক্তিকে নিজিয়ে দিয়ে গেল।

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

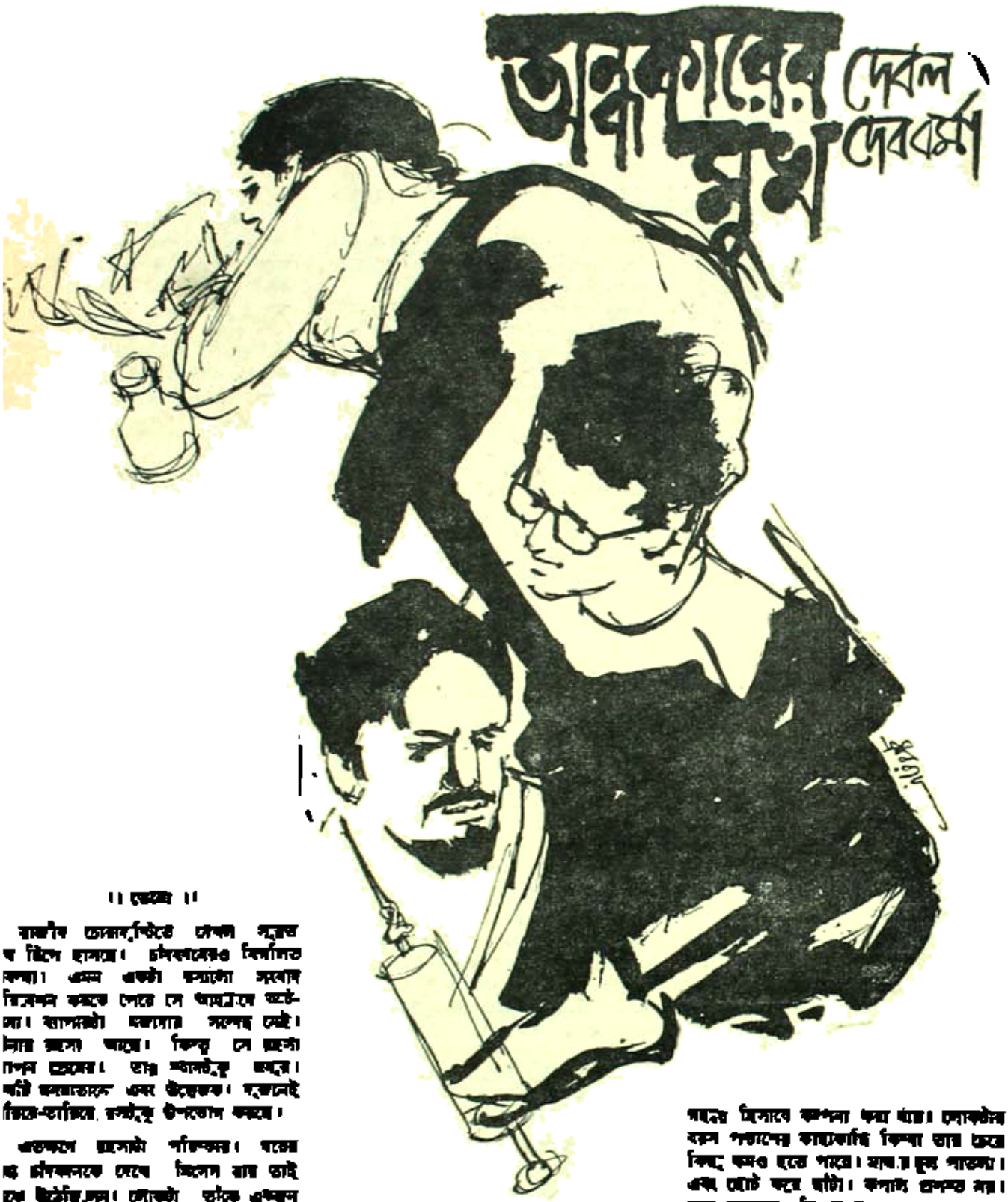

।। তেরো ।।

রাজীব চোরাদৃষ্টিতে দেখল সুব্রত ঘ ছিপে হাসছে। চাঁদবদনেও বিশ্লিত কথা। এমন একটা ফয়সালা সংবাদ বিশ্বেষণ করতে পেরে সে আয়ত্তাধে অর্ট-দা। স্বাপরাধী মজাদার সন্দেহ নেই। নার হাসো আছে। কিন্তু সে হাসো াপন হৃদয়ের। তার স্বাদটুকু অন্যের। ধাই অন্যজাতকে এবং উদ্বেজক। দুজনেই ফিরে-তাকিয়ে রসটুকু উপভোগ করছে।

এতক্ষণে হাসলাকী পরিষ্কার। ঘরের ধ চাঁদবদনকে দেখে ফিসের রায় তাই হে উঠেছিলেন। লোকটা তাঁকে একজন দ্দুরের সঙ্গে চোরে উঠতে দেখেছে। সময়ে চতুর্থ ব্যক্তি ছিল না। সমস্ত পথ জনের মুখোমুখি বসিয়েছে, অন্তরঙ্গ াবভঙ্গী, ঠাট্টা-তামাসা কিছুই লোকটার ই এড়ায় নি। দুজনের সম্পর্কটা বুঝতে । বাকি নেই। লোকটা অবাঙালী। হয়ত ন্য ভাষা ভাল বোঝে না। কিন্তু তাতে ও হৃদয়ের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে মুখের ভাষা জানতে হয় না। তাদের ভাষা বুঝেছে।

রাজীব একদৃষ্টিতে চাঁদবদনকে লক্ষ্য করল। মুখখানা চাঁদপানাই বটে। তবে, ফলাহল, নাকের উপর এবং অনেক স্থানেই কসন্তের ক্ষতের স্থায়ী চিহ্ন। অনায়াসে ণদুলিকে হাঁচিতে দেওয়া চলনসইয়ের দাবী করা যায়। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিম্বা তার চেয়ে কিছু কমও হতে পারে। মাথায় চুল পাতলা। এক ছোট করে ছাঁটা। কপাল প্রশস্ত নয়। মুখ শুকনো,—নিংড়ে রস বের করে নেওয়া একটা পাকাকলার মত। কিন্তু চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল। দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট প্রখর আছে। কণ্ঠীর মুখ ঘুরে রাজীব বলল,—মরেন-বাবুর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?"

—পাঁচ-ছ বছর হোবে, চাঁদবদন জবাব দিল।

—চোখের কামরায় যে লোকটাকে

দেখেছিলেন তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

—জরুর হুজুর। চেহারা পারব না।'

—ছোকরাকে দেখতে কেমন? গায়ের রঙ কর্সা? খুব সুন্দর?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—না হুজুর, কর্সা নয়, কালাই আছে। লৌকিন দেখতে খারাপ নয়। আচ্ছাই হায়।'

—লোকটা নম্বা না বেঁটে? চোখে চশমা ছিল?'

—লম্বা নয়, মোটা গাঠোই আছে। হাঁ, আঁখমে চশমা বোধ হয় ছিল।' চাঁদখান একটু চিন্তা করে বলল।

—হুঁহুঁ, রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। ইসারা করে সুরতকে কাছে ডাকল। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল, — 'পলাশপুরে কলেজের বাংলোয় প্রফেসর নীলাদ্রি সেনকে চেন?'

সুরত একটুও না ভেবে জবাব দিল, —'কার কথা বলছেন? নীলাদ্রি সেন? তাঁকে কিনাকন চিনি। পলাশপুরে তিনি তো কেয়ান বাড়ি।'

—লোকটা কর্সা না কালো?'

—গায়ের রঙ কালোই। কিন্তু দেখতে সুন্দর। চোখ দুটি বড়, বড়। কোঁকড়া, কোঁকড়া চুল। বেশ লম্বাচওড়া পালোয়ানগোছের।'

—হুঁহুলাম।' রাজীব একটু হেসে বলল, 'কেন্টঠাকুর যাকী রেখেছে, নিশ্চয় কিছুটা বেঁটে? চোখে চশমাও আছে?'

সুরত স্বীকার করল। নীলাদ্রি সেন লম্বা একটু, কাটো। চোখে চশমাও আছে। খরগোশী রঙের গুম, ছাঁটিংপুলি মোটা।

রাজীব ফের চাঁদখানকে নিয়ে পড়ল।

—ছোটবেলার কথাগুলা যা বলেছিলেন, সেসবও কাকে কাকে গল্প করেছেন?'

—অনেকে। আমরা জানে,—' চাঁদখান কথা শেষ না করেই থামল।

—তারা কাকে কাকে বলেছিলেন বলুন। খবরটা আমার জানা দরকার।'

—ঠিকমতো কাকে কাকে বলেছে মনে নাই হুজুর। লৌকিন সন্ধ্যার পর মরেশবাবুকে সব কথা বলে ফেলেছিল। সে আমি পাক্কা জানি।'

রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছুক্ষণ পরে সে বলল,—'না বলে থাকতে পারলেন না কেন? মরেশবাবু কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

—জানে না হুজুর।' চাঁদখান অন্যদিকে তাকিয়ে বলল।

—তাহলে?'

—পরশু দিন সন্ধ্যার পরেই জমাদার-বাবু হামার কাছে এসেছিল।'

—জমাদারবাবু মানে? কিসু জমাদার বাবু?'

—জী, হাঁ। ও পুরুলিয়া কি মীনা দেবীকে হাসি তিনি কিনা। ওর সাথে হামার আগে যোগাযোগ হয়েছে কিনা জানতে চাইল।'

—আপনি কি বললেন?'

—হুঁহু, জানাইনা না।' চাঁদখান একটু হেসে বলল,—হামি কাকাকে মীনা দেবীকে চিনব দেখব করে? আঁখ দেখেই নেহি।'

—তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করল?'

—বিলকুল নেহি হুজুর। হামাকে বলল কি, আপ ঝুটা বাত বলছেন। নীলাদ্রি আপ জরুর চিনছেন। লৌকিন হামি বাত বলছেন না।'

রাজীব প্রশ্ন করল, — 'সাঁচা কথাটা ডাক্তারের কাছে ফাঁস করেছেন কেন?'

—বলছি হুজুর।' চাঁদখান একবার সুরতের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল।

সাহস জুগিয়ে রাজীব বলল,—'এর সামনে সংকোচ করবার মতো কারণ নেই। আপনি নির্ভয়ে বলে যান।'

চাঁদখান বলল,—'সাচ্ বলব কেমন করে হুজুর? ডাক্তারকে মীনা দেবী যে রসো করে গেল।'

—বলেন কি?' রাজীব সোজা হয়ে বসল। 'বিকেল রাত আপনার বাড়ি এসেছিলেন?'

—এসেছিলেন বৌদি। তখন বেলা চারটা হোবে। মরেশবাবু বলছিল, হোটেলের একটা চাকর এসে বলল,—একটা জেনানা আপকা সাথ দেখা করতে চায়। হামি নীচে গিয়ে দেখলাম মরেশবাবুর ভাতিজি দুলদাপ বাঁড়িয়ে আছে।'

—তারপর?'

—বহুৎ রিকোয়েস্ট করে ডাকি বলল কি ডাক্তারবাবু এসে এসব কথা তাকে বলে না বলি।'

—হুঁহুঁ।' রাজীব একমুহূর্ত চিন্তা করল। পরে বলল,—'তাহলে মরেশবাবুর কাছে এ গল্প করলেন কেন?'

—সাচ্ বলছি হুজুর। এ গল্প আমি করবার না। কিন্তু মরেশবাবু যখন ওর ভাতিজির মুখ থেকে কিসিমিস তখন ডাক্তারের সামনে ছোটবৌ থেকে বেরোতে দেখেছিল। ও এসেই হামাকে পুছল কি, কখন কেনো এসেছিল। হামি ঝুটা বলতে পারলাম না। সব কথা ওকে বলতে হল হুজুর।'

রাজীব এবার প্রসঙ্গান্তরে গেল।

—আচ্ছা বিজীর কথা মরেশবাবুই আপনাকে বলেছিলেন?'

—হাঁ হুজুর। হামাকে বললেন কি সে ওর ভাতিজির একটা রকম আছে। কিসমত খারাপ,—অনেক খর আছে। লৌকিন খরা বেশী হোবে না। হামি যদি কিসমত চাই তো উনি সব বেবোস্তা করে দেবেন। তখন হামি আলাদা কি সুবিধাসে হোতে সে কেনো কিসমত চাই? জরুর কিসমত।'

—মরেশবাবু কত দান চেয়েছিলেন?'

—পঁচাশ হাজার রুপেয়া। বাদ কিসমত আছে। কিসমত হামার দেখাবে।'

রাজীব মুখ ফুঁচকে বলল,—'বড়লোক কি এমনি? আলবাজার টিনের টিনবন্দী বাড়ির দাম ছোটে পঁচাশ হাজার টাকা? বাড়িটা কোথায়?'

—হুজুর মোলাদিঘির কাছে।'

—জী। মোলাদিঘির কাছে টিনবন্দী বাড়ি। অনেকের অনেক ঘর। আর আর দাম ছোটে পঁচাশ হাজার টাকা?' আবার হেসে রাজীব বলল,—'উহুঁ, সমস্ত আলমারী মেয়ের সন্দেহজনক চেহারে রোয়ার। এসব কাজের ঘরে বাড়ি বিক্রোয় না।'

—সন্দেহের কোই বাত নেহি হুজুর। এ তো খালি বাড়ি নেই। বাড়ির মালিক থাকে। কিন্তু বিক্রি পাবে না। সব ঘরে ভাড়াটে আছে। বাড়ি খালি করতে অন্য-সে-অন্য কিসমতের হাজার রুপেয়া খরচ হোবে।' কথা শেষ করে চাঁদখান রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু রাজীবের কোনো ভাবান্তর হল না। তার মুখ দেখেই মনে হল কথাটা সে তলো বিশ্বাস করে নি। ধীরে ধিরে রাজীব বলল,—'ইন্টারেস্টিং কথা বটে। সেনহোটেলে সন্ধ্যাবেলা হলে লোকে বাঁধ মুখে কম শোনে, কিছু বেশে। কিন্তু কলকাতার উপর ভিনটা বাড়ির এমন ভালের দর ইলেকট্রী কানে শুনি নি। যদি মুখে মনে হত আপনি ঠকিয়ে নামমাত্র কিম্বা বিনামূল্যে সম্পত্তি নিলেছেন।'

পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে রাজীব মুখলালে উদ্যোগী হল। লাইটারে সাবধানে সিগারেটের মুখ সিঁধ করল। পরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'চাঁদখানবাবু, আপনাকে একটা কথা এখনও বলি নি। মরেশবাবুর ভাতিজি যখন বাড়ি বাড়ি আপনি কিনতে চেয়েছিলেন তিনি আর বেচে নেই। আত্মহত্যা করেছেন বলে শুনেছেন তো?'

—হুঁ হুজুর।' চাঁদখান ঘাড় ঝুলিয়ে জবাব দিল। বলল,—'খুনে বিলকুল বহুৎ দুঃখ হল হামার। কিতনা খুবসুরৎ জেনানা। না জানে মনমে কি দুঃখ ছিল। লৌকিন সবকো বহুৎ দুঃখ দিয়ে গেল। উনকি ভাতিজা মরেশবাবু তো একদম চুপ হয়ে গিয়েছে। খানা থেকে একটা বাত্ কি বলে নি।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে রাজীব বলল,—'কিন্তু ঠিক নয় চাঁদখানবাবু। মীনা দেবী আত্মহত্যা করেন নি। তিনি খুন হয়েছেন। তাঁকে ইচ্ছেকৃতভাবে বিষ দেওয়া হয়েছে।'

চাঁদখান ভাবে উঠল। সে খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। খোলা খোলা চোখ করে বলল,—'কি বললেন হুজুর? মরেশবাবুর ভাতিজি খুন হয়েছে? সচ্চী দিয়ে বলছেন আপনি?'

—হুঁহুঁ।' রাজীব স্পষ্ট জবাব দিল। 'এখন বলুন জলের ঘরে বাড়িটা পাবেন বলে মরেশবাবুকে কত টাকা বায়নাপত্র করেছিলেন?'

—বায়নাপত্র? কি বলছেন হুজুর?—চাঁদখান আমতা-আমতা করল।

—ঠিকই বলছি।' রাজীব জেরা শুরু করল। 'বলুন চলে তো সব কথা খোলাখুলি বলুন চাঁদখানবাবু। নইলে আপনার কপালে দুঃখ আছে। বাড়ি কিনবার জন্য আগাম কত টাকা মরেশবাবুকে কলকাতা থেকে পলাশপুরে এসেছিলেন আর তারপরই কিসের জন্য খুন হয়েছেন। এবং যে রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল, সেই রাতে আপনারা দুজনেই পলাশপুরে ছিলেন।'

—হাঁসি থামতে চাই না হুজুর। [illegible] যান বলেছিলেন। কিন্তু হুজুরকে? বলা যায়।'

—'কথা কথন শেষ?'

চাঁদখান খুব জোর দেয়ে- বলল,—'[illegible] শাসি—'

সুজার নির্দেশে একজন সিপাই এসে [illegible] পাশে বসে পেছে গেল। ছোট-ছোট করে [illegible] বলে নিয়ে চাঁদখান বলল,—'হাসি [illegible] হুজুর। পরন্তু সকালবেলায় [illegible] বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। মহেন্দ্রমল্লিক হাজার টাকা দান দিবে। আর্থিক হল, [illegible] হুজুর [illegible] হল না। আপনারা [illegible] কি, [illegible] নিয়ে আসবে। তবে হয়, সন্ধ্যাবেলায় মহেন্দ্রমল্লিক ঘরে এসে আর্থিক [illegible] এই [illegible] আমি [illegible] পেলে নিয়ে আসতাম।'

—'হুঁ, মহেন্দ্রমল্লিক কথন এসে আর্থিক [illegible] পেলেন?'

—'বিকালবেলায় হুজুর। তখন সময়ে [illegible] আমি—'

—'কিন্তু এসে তিনি কি বললেন?'

—'অনেক কথা বলল। আমি আমি [illegible] পরিবার [illegible] আমাকে বলল কি, চাঁদখানী [illegible] উৎসব [illegible] হচ্ছে। সারাদের [illegible] [illegible] [illegible] আসতে হোক। আমি বললাম, এসব [illegible] কি বিবেচনা। কিন্তু—'

—'কিন্তু কি আমার?' রহীম এবে চাঁদখানীকে নিরীক্ষণ করল।

চাঁদখান ইতস্তত করে উত্তর দিল,—'[illegible] মহেন্দ্রমল্লিক [illegible] উপরে কথা বলেন।'

—'কি কথা?' রহীম চোখদুটো বড় করল।

চাঁদখান কথা নামিয়ে বলল,—'আমি বলবার [illegible] মহেন্দ্রমল্লিক [illegible] একজন আহার [illegible]। বখন বিবাহের, তখন [illegible] কথাই হচ্ছে। একটা পানি হুজুর। বিবাহ করে বিবাহের [illegible] কী হবে? এসব বিয়ে ভাঙ্গা—'

রহীম আকাশ্যবরে বলল,—'আরেকটা? মহেন্দ্রমল্লিক কি বলেছেন?'

চাঁদখানকে চিন্তিত দেখাল। সে বলল,—'মহেন্দ্রমল্লিক [illegible] [illegible] হুজুর। তখন কি [illegible] আছে নেই। হুজুরকে বলল,—চাঁদখানমল্লিক, হজুর [illegible] এসব [illegible] বিয়ে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

পাহাড়ে মেয়েরা

...আশা নেই, হাসি নেই। মনে শুধু চিন্তা। ঘরে আছি আত্মজের চরণপাশে—এ জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে আছি—দূরের প্রান্তিক-প্রাবেরেখার ওপারে শিবের শিখরের দিকে।

বিদায় বেলা। দিনের আলো মিলিয়ে যায়। সেই হিমশৈল হাতি শিখর থেকে নেমে এসেছি। চোখ পাইনি ফেরা দিয়ে কেটে চলে।

কুলদেবতা। ঘরে পায়েসের সন্ধ্যা সেরে রাখে।

এদিকে দুরন্তপনায় ছুটে আসছে খন্ত ছেলেরা। ওরা অবাধ্য। দিন-রাত্রির জ্ঞান জানে না। যখন খুশী আসে যায়।

বিরানীর ওদের ঐকতান সাড়ি। অনাদি নামকে প্রায় অপদস্থ করে ফেলেছে। ঘরে যে ওদের পায়েস্—সেত ভুলেছে। এই ক্রমে কুমার রাজনী বকল করে নেয় বাড়ী বাড়ীতে। আকাশ-বাতাস সব ঝলমল করে ওঠে।

আজন্মাত্রিক দিন প্রতিবেশ জানায়নি, যে ভয়েনি। তার বিরুদ্ধে কখনো যখন নিয়েছে। বিধাতাকে দুরন্তের সব আবেদনই মুহূর্তে আগে বাড়িয়েছে। ই বাসনার মুহূর্তে ঘাস হয়ে উঠে ন পশ্চিম দিগন্ত। তাই প্রতিবিম্ব ফুটে উঠিল মেঘে মেঘে আর শিখরে শিখরে। আমি শিবালিঙ্গ ঘিরে মেঘের আনাগে ঢাল হয়ে উঠতে—মৌসিত বাতাস, পলাশ ফুল, অগণ্য ফুল—কত ফুলের ফুলহারটির কণ্ঠহার আর কর্ণকুণ্ডল। ওর সূত্রে বিরাটই বাঁধুরে পড়েছিল অবাধ্যের আজ।

শেষ ছবিও মিলিয়ে গেল। শিবালিঙ্গ ঘুমে ঢেকে তার শূন্যের সাজ, বরফী ঘুমে ঢেকে তার সোনালি সন্ধ্যা। রাত্রি নেমে আসে। তার বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে হারিয়ে যায় বিশ্ব চরাচর।

'ঘুমুলে সুরেন্দ্রবি?' আমার কপাল থেকে মিলিয়ে ধরে।

'না ঘুম আসছে না।' আমার চোখে কখন যে নিদ্রাদেবী আসন গ্রহণ করে নেই। বাস্তবিকই ঘুমাতে পারছি। শরীরে মাথাই কাঁটায় আর কাঁটা।

সুজয়া গুহ

প্রথম রাতে কোনদিনই ঘুমোতে পারি না। তার ওপরে আজ আমার মনটায় কেমন এসে ভিড় করছে মনে।

সারাদিনের ঝরঝর পড়ছে। বাইরের ঘরে ভাই নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে। ঘরময় ধূপ ধিরে সবাই কাপড়ী নামছে। শুনতে পাচ্ছে না, তাদের ফুলাপরের কলকাটা মুরলীর মত হাসিটি করছে?

ঘুমুতে পারছি না কল ওপরে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করলাম কিনা। এরকম আবহাওয়ায় মৌসিনের মতন মেয়েরা বাঁধ আপনে হয়ে পড়ে? ইলোরাকীর মেয়ে বলে-ছিলেন, বেশী দিন করে ওপরে থাকা নয়, কেউ ঘুমুলে হলে কিন্তু আমার কিছু জানি না। সুরেন্দ্রবও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নেই।

ওদের আলোচনায়—মৌসিনের মেয়েরা যদি বেশী হিমবাহে যা যেতে পারে, তাহলে এভারেস্টের জয়যাই যাই। ওখান থেকে বিশ্ব আরোহণের চেষ্টা করবো। মেয়ের সিং সোধন এরকম নিদ্রাশ নিয়ে শীত মেয়ে মেয়েরা। কিন্তু ওদের ঘরেও আপত্তি—ছুটে আসবো শিখর চরণতার ওপরে ইলোরাকীর, ঈশ্বরী কিন্তু সেই ইর্ষাণি ইর্ষাণি।

অন্ধকারের পথে আমরা ঘরে এসেছি। এখন কিন্তু অন্ধকার নয়। এখানে সন্ধ্যা নেমে পড়বে। এসেও দেখেছি ওদের আসর।

'ওরা তার পাশের আবহাওয়ার জন্যে। চার-পাঁচদিন ধরে বরফ পড়ছে আর হাওয়া চলেছে। এবে সারাদিন আসলেই হবার সম্ভাবনা।' সুরেন্দ্রনা আমাকে বোঝাতে চায়।

আবহাওয়া ভাল হবার কবে আর কবিন অপেক্ষা করবে? আজ বন্ধ আবহাওয়ার জন্য। চোখ ফিরিয়ে নেবে এখান থেকে আমি শুধু ফিরবো। এতো আয়োজন, এতো কষ্ট, এতো অর্থব্যয় করে এসে ফেরে যাওয়া যায়? কাঁই বা দেখা হল? হিমের মায়া ফেলে মৌসিত ফেলে সৌন্দর্য—কিছুই দেখা হল না।

পাহাড়ের পথে খারাপ আবহাওয়া যে নিত্যসঙ্গী। তার জন্যে কষ্ট হবে, কিন্তু ফিরে যেতে হবে ঘরে আরও বেশী, আর

[illegible] থেকে [illegible] হিমালয়। আর পাহাড়ী হাওয়ার ঝাপটা সহজে শিথিল হবে। সেটা অবশ্য শরীর খারাপ হবে না।

ঘুম ভেঙে গেছে। আর বেরুনো যায়। কিন্তু লোহালক্কড় হয়নি। অনেক কষ্টে নিশ্চিন্ত বাঙ্কের ভেতর থেকে হাত বের করি। ঘড়িতে সময় দেখি। নীল আকাশ। তাতে পাহাড়ের চোখা থেকে লম্বা রেখায় ধোঁয়া আসছে। ধবধবে তুষার, রূপসীদের ঘোমটা ঢাকার মতো।

'আমরা, সুদীপ্তা ওঠো। মেয়ে কি ঘুমের বিল।' এদিকে সাথীর পাশ ঘুরেছে। ওর চোখে মেয়েলিপনের ঘাড়িয়ে ঘুমে সেই, লম্বিত ঘোমটা সুন্দরের ও অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অসমবয়সী, বহির্মুখীরা। আমাদের ছোট বেশী বয়সবাসী। পরিচয়ের দিনের আগের মেয়েদের সবার বলে। সবাই আমরা চমকে।

এবার আটটার ঘিরিং ঘুমি। সেই-শো শব্দে হার্ডিং মেয়েছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছি ঘুমিয়েকে ডাকি। হটোর হৈ-হল্লা পড়ে। সাড়াশব্দ নেই। এ কী। সাথীরা কাল এরকম মনে ঘুমোয় না।

'ঘাল কুটোর সঙ্গে ঘাল 'তাল হয়ে ঢুকেছিল তাদের মধ্যে। হাওয়ার ঝাপটে বরফের কণা ঘিরে ঢুকেছে ঘরকের ঘুড়ি। সারারাত ধরে আমাদের নিশ্চিন্তে উষ্ণতা হরে প্রবাহিত হয়েছে। এখন আলোর ঝাঁঝালো আমেজ জলে ঘাল। আমার শিকটার নেই। সব জল জমা হয়েছিল জানিকে। রাঙ্গা-তোষক ঘুমিয়ে মেঝে জলে পড়েছে। কাল থেকে উঁচু নজর। উঁচুতের হয়ে আছি শুধু অক্সিজেনের যোগানের ঘুমিন পরের জন্যে। তাই এই আরাম ভোগানি।

লাইন থেকে চলেছি। ভান পাশের ঘাড়েরেখা পেরিয়ে এলাম। এখন সেই খাড়া ঢালাই ধরে উঁচুতে শুরু করেছি। সামনে। ওরা তিনজন—নিলু, পায়েল আর সন্ধ্যা এই শুধুই ঢালাইয়ের প্রায় মাঝার চলেছে পৌঁছে। আমি পৌঁছে যাচ্ছি না। ওরা তিনজনই আমার অনুসন্ধে। সন্ধ্যা কাল অনেকটা পরিশ্রম পড়ে মাথার ঘোর পেয়েছে যেমনে আর কাঁপে। নিলুর মাথাব্যথা। আর পায়েল আজ ঘুমিয়ে ঘুমের কি বিপদেই না ফেলেছিল। বলে, মাথা ঘাথা করছে, ওপরে যাবো না। ওরা ঘাড়ীতের ক্যাম্পে পৌঁছেই ভাল খেয়ে পড়েছে। আমি আর সুদীপ্তা মাঝের শুধে খেলাম অনেক কিছু।

তার ওপর নিজে ওরা। একটা সরল ঢালা হয়ে-পড়ো ঢালুমাটি এগিয়ে গেছে।

ডানাই সেই ঘরের পশ্চিমটা সরকার। কিছুটা নীচের চাপের ঘিমারীর পাঁচিলই। ওরা নীচে পায়েলটাই হিমবাহ। হিমবাহের পূর্বে অনাদিত শিখরের ঢাল—ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে—ঘোর ঘন সাদাটে। তেমন। ওরাই ঘাঁচে ঘাঁচে স্তব্ধ হয়ে আছে ঘুমন্তেলাদির ঘুমার ঘরের। এরো ঘাঁচের পাশের ঘরো ঘরের হিমবাহের ঢালুতলে। আরও পূর্বে ঘেদু হিমবাহ। এরো চতুরঙ্গী হিমবাহ—তার ঘরের পাশের আরকলে ঘোড়া—অপরূপ ঘরণীর ঘরীর।

চতুরঙ্গী আর ঘরণীর সংগমে, পাহাড়ে ঘাবার ঘরে উঁচুতে একটি ঘরীর ঘুপাকার। ঘিরির ঘরার ঘরো ঘুরীতেরো সরকে পাঁজিয়ে রেখেছেন। চতুরঙ্গী চলিতে ঘালিনী ঘালের পর। ঘলকাতার একজন ঘরীন মহিলা শ্রীযুক্তী তাঁর বিশ্বাস তাঁর স্বামী ঘরার বিশ্বাস এ বিষয়ে পর্বতে শ্রীঘোরেনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৬০ সালে ঐ পথে ঘালিয়ে বিয়েছিলেন। তারও আগে ১৯৬০ সালে, শ্রীঘোরেনাথ মুখো-পাধ্যায় ও শ্রীমৈলেনাথ চক্রবর্তী মোকর্দার প্রথম ঘাত্রালী যাঁরা ঐ পথে বিয়েছিলেন।

আমার চড়াই। ঘরকে ঢাকা হাতের ওপর ওঁদের বিজয়কে ঘরানা শিশুরের মতো মেখাচ্ছে। চলিল ছেড়ে ঘমাদী এই ঢাল বেয়ে ঘীরাদলে মেয়ে এসে, ঘলবার মেয়াও গাড়িয়ে নিয়ে পলার পার হয়ে-ছিলেন। অনেক চেষ্টা ঘরেও ঘাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘালাদের পর্যন্ত তিনি নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারেননি। পারলে, এতদিনে মেয়াও সন্ধানের সন্ধান হয়ে মেতো।

পর পর তিনটি ঘরকাবুরে হুংপ পেরোলাম। মেঘ শিখিল পথ। এবারে নাগাদি। মেঘে এলাম একটি মাঠে। হুপাশে ঘনল উঁচু হুপর পাহাড়। ঘাঁঘাঘাতে পায়ের সমতল ঢালুতর। তার ঘাঝে এখানে ওখানে ঘুরেকটি নিজস্ব পাথরের ঘরুরে প্রতিঘাত।

ঘনেকে পাইরে ঘরীরে মাড়াতে ঘ্যাতে চলেছি। এঁরা? একটি পাথরের স্তূপ—তার আবার অর্থপূর্ণতার সরলা। ভেতরে ঢুকে পড়ি। সুন্দর ঘর—পাথর আর মাটিতে গাঁথা কেন উঁচু ঘর। পাথরগুলি এক সাথে ঘৈরি করেছিলেন, নিরিখিনিতে সাজানো ঘরের ঘরো।

এই ঘরেই তো থাকতে পারি আমরা। তাঁদে ঘাবার হাঙ্গামা নেই। বাঁ দিকে তাকাই। থাম্বা, এ যে অন্তহীন ঘাই। ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢালু উঁচু হয়ে মেছে। কিন্তু চিহ্নটির যে কোন চিহ্ন নেই।

এ কি মেঘলোক। কোথায় এলাম? ঘাদশিক ঘুড়ে বিন্দুলোহিত এক পর্বত। উঁচুত শিখর সমূর্ধে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ঘুটে শিখর ঘুড়ে মেঘলোকের পাঁচা ঘলটেপর্ণ। এই তো ঊঁচাপতি গৌরীশঙ্করের শিখরটিলা। তার পাশাপাশে ঘলনায় ঘুর্ণাকলে সাজানো সমূহে ঘ্রাজন। তারই মাঝে মেঘের ঘরার একটি বিন্দু মরী—তিন ঘুড়ে ঘরীর তিন ঘুড়ে ঘরা। সমতল্য ঘুলীঘাত বাদুরে ঘাকরা। তুলে চাকা ঘুটি ঘুটিরেখা। ঘৈরিনে ঘল—বালিরা নেই, ঘরুমুড়ো নেই, সেই ঘলনালনো পাথরের স্তূপি। ঘর চলেছে ঘুন্দ হিমবাহে, পূর্বদুরুদের ঘরুরীরে।

২ মেঘলোকে এসেও আমরা ঘর ঠাঁই হয় না। প্রান্তরের বাঁ দিকে আমাদের ঘুটি তাঁবু পড়েছে—নাল আর হলুদে। তার ওপর উঁচুতে ঘরে আছে ঘ.পর্বতীর তিনটি তাঁবু। ঘুপরা ওরা মেন ওপার থেকে ঘলা বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ করছে—দেখেছ হে ঘোলানার আজকালকার মেয়েদের কাণ্ড। সে কালে এমন হলে.....

ঘাস্তে হে ঘাস্তে, শিবলিঙ্গ ঝিটিমিটি হাসেন, কেন বাপু? লক্ষ ঘরর আগে ঘন রাজার মেয়ে ঘৈরাবতী ঘুরা, ঘুরুনদি এখানে—আমার মন ঘর করতে?

মোদ্দুর মোদ্দুর মোদ্দুর! আহা, ঘরঘর সূর্য মেখিনি কতদিন। মোদ্দা গলা মোদ ঘাড়িয়ে পরমুহূর্ত শিখিরে আর প্রান্তরে, সবুজে ঘাসে আর ঐ মেঘে নদীর জলে। নবীঘাতে ঘাদুকাবেলার আদুলের ঘর চিকচিক করছে।

ঘচীন হয়ে উঠেছে আমাদের মন। সুদীপ্তা মুখের ঘতো শুচি সুবেসিত আবেশ মেন্দিয়ে ওঠে নবীনের অঙ্গুরে অঙ্গুরে। কাপসা হয়ে ঘাচ্ছে অন্য সব ইন্দ্রিয়বোধ—ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা মিলে। একটা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি, একটা সীমাহীন অন্তহীন ভালমাগা। প্রপার্থিব আমেজে আচ্ছন্ন হয়ে মেছে প্রাণ মন।

সুতপা ডাকছে। উঠে যাই ওর কাছে। হকারী কন্যপাতি সাজিয়ে বসেছে ঘাইরে। ও বেচারার বিশ্রাম নেই। সারীরিকভাবে সবেদনা ভরছে তার ঘরর ঘরে ঘাকেছে। ঘলকাতার বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমরা ওকে সময়মতো পাকড়াও করি। সুতপার নিজের আরাও কিছু ঘর নয়। কারণ মেয়েদের ঘরীরে উচ্চতার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে হাতে-কলমে ভারতে কেউ ওরা সাহস করেনি।

অবশ্য কাজ তেমন ভাল হচ্ছে না। আমরা তো ওকে কোন বন্দুকগাড়ি কিনে দিতে পারিনি। ঘতো টাকা কোথায়? ভালো সরকার কেন সাহায্যই করেনি। তাছাড়া ওকে সবার সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন পর্বতা-রোহণ দিয়ে দিতে হচ্ছে। মেয়েরা ক্লান্ত। তবু একে একে এগারোজন মেয়েকে ডাকে, নেড়ে নেয়—ঘরের চাপ, ঘলনালনালের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি।

এ ঘঞ্চলের পাহাড়ের গঠন, পাথরের শ্রেণীবিভাগ, ফাটলের আকৃতি, ইত্যাদি ঘতগুলি বিষয়ে গবেষণা করার পরিকল্পনা ছিল—সুদীপ্তা, সুজাতা ও ঘলনায়। ওরা ঘাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গবেষণা করছে। এখানে ওদের কাজও খুব একটা এগোচ্ছে না। কারণ ঐ একই। ওরা মুখে বলছে অবশ্য অন্য কথা—'অবশ্যই মুখ-ফোটানি মুখোপাধ্যায় যা আমার সব ভেঙে দেছেন। আমরা আর কতটা করে নিশ্চিত চার্ট করি বলো?'

সন্ধ্যা মোছন কাটে, উলটোপালটা ঘপ্ন মোবার ভয়ে ঘোমাস ঘাধাতে চায় না, এই তো? নিয়ে তো হিমালয়ান ফেলোজ-

থেকে সব হিসেবই পাল্টে দিতে হবে। তাই তো ধরা পড়ার ভয়। তাই না?'

ওরা মুচকিহাসি, উত্তর দেয় না।

মাসখানেক আগে সাংবাদিক অভিজিৎের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসেছিলেন সুজন ঘোষাল বিজ্ঞানী—পারিজাতবাবুর ভাই অভিজাত সেন ও ঘুঙবুবির ভাই মুখোপাধ্যায়, কলকাতার সন্দেশটী হিমবাহ অনুসন্ধান সমিতি, শিখর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়কে জানার প্রচেষ্টা করেছেন। ভারতীয় পর্বতাভিযানের ইতিহাসে এ এক ব্যতিক্রম।

সমস্ত হিমালয় পর্বতের বয়স হিসাবে। এরই গায়ে লেখা আছে লক্ষ লক্ষ বছরের পৃথিবীর ইতিহাস—সৃষ্টির প্রায় আদি থেকে প্রলয়ের বিবর্তন, মানুষ ইতিহাস আর সাগরের ইতিহাস। আমি ইতিহাসের ছাত্রী, তাই আরও ভাল লাগে হিমালয়কে।

কয়েক লক্ষ বছর আগে হিমালয়ের মূলের অস্তিত্ব ছাড়ে উঠেছিল সাগরের বুকে চিরে।

ভারতবর্ষ আরও অনেক প্রাচীন। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল আজ চারশ কোটি বছর আগে। সেই জন্মলগ্ন থেকে ভারত আছে এই পৃথিবীতে। তখন সিংহল থেকে আরাবল্লী পর্বত ছিল ভারত, আর তার অবস্থান ছিল দক্ষিণ মেরুতে। শুধু ভারত নয়, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া—সব মিলে ছিল এক বিরাট ভূখণ্ড—দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বা গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড।

গ্রীকদের দক্ষিণে পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজ্য, লস্ট ল্যান্ড। এই নামে সমস্ত ভূখণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে গণ্ডোয়ানাল্যান্ড। আর বিন্ধ্যরেখা অঞ্চলে ছিল আলাবাল্যান্ড —অর্থাৎ ইওরোপের বিন্ধ্য আল্প ও সাইবেরিয়া। উত্তর আমেরিকাও ছিল তখন বিন্ধ্যরেখার, অবশ্য অনেক অস্তিত্ব নিয়ে।

পৃথিবীর মানচিত্র এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এই পরিবর্তন একবারে আসেনি। একটানা আলোড়নের ফলে পৃথিবীর আজ এই চেহারা। আলোড়নের মূলে হল পৃথিবীর ভূক। তিরিশ চল্লিশ মাইল পুরু এই ভূকটি সবের মতো সঞ্চালনশীল—যাকে মাঝে এদিক ওদিক ছিটকে আসার জন্যেই হল ভূমিকম্পের কারণ। কখনও ভূকটি প্রতিহত হয়ে সঙ্কুচিত হয়—জন্ম নেয় নতুন পর্বতমালার। কখনও আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করে নতুন সাগর। তারই হিসেবে পৃথিবীর ভূক থেকে বেরিয়ে আসে জলবুদ্বুদের আর বায়ু-মণ্ডলের পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় তুষারযুগ।

সৃষ্টির পর থেকে সমস্তরে হিসেবে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেছেন। দ্বিতীয় হিসাবের ফলে হিমালয়ের জন্ম।

সে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগের কথা। গণ্ডোয়ানাল্যান্ড দক্ষিণ মেরু থেকে সরে, সরে বিন্ধ্যরেখার আড়াআড়ি এসেছে। ভূমধ্যরেখার এদিকে ছোট ভূমধ্যসাগরের দিকে। দুই মহাদেশের মধ্যে এক বিশাল সাগর—টিথীস্ সাগর।

সাগরের তলে, মহাদেশ বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য তার নদীর জল এসে জমছে নেমে। তার সঙ্গে ভেসে আসে অসংখ্য জীবের কঙ্কাল প্রাণী। ক্রমে বিস্তীর্ণ হিমভূমি (আইস ক্যাপ) আর ঘনীভূত হিমবাহ (আইস বার্গ) সাগরে ভিড়ে করে। তাদের সঙ্গেও আসে পর্বত প্রমাণ পাথর ও মাটি। দুই মহা-দেশের অপসৃত অবক্ষয়, পরাক্রান্ত পর পরাক্রান্ত ধরে সঞ্চিত হতে থাকে টিথীস সাগরের মধ্যেকার তলদেশে।

ক্রমে বলবেশ ভরাট হয়ে ওঠে। সাগর ফুলে ওঠে। উপরে জলরাশি সৃষ্টির পথ খোঁজে, নতুন ধারে নতুন পথে প্রবাহিত হতে চায়। গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের অনেক জায়গায় তখন ধরেছিল। সেই পথে উপরে জলরাশি ধরে যায়, সৃষ্টি হয় আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর। ভারত তার বর্তমানে ঘুরে নিতে শুরু করে। গণ্ডোয়ানাল্যান্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

টিথীস সাগর আস্তরণ হেলে পড়ে তার ওপরে জমতে থাকে। পলির ভারে তলদেশ নেমে যায় আরও নীচে। সাগর গভীরতর হয়।

এদিকে দুপাশের দুই মহাদেশ প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি আসার চেষ্টা করে। সাগর সঙ্কুচিত হয়, আরও প্রচণ্ড চাপ পড়ে সাগরের মেঝেতে। এক সময় এই চাপ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। শুরু হয় সাগরের বুকে জলবুদ্বুদ, আলোড়ন, উৎক্ষেপ। সাগরের মেঝে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

পাঁচ কোটি বছর আগের কথা। ছিন্ন সাগরবক্ষ থেকে আবির্ভূত হয় নবীন ভূখণ্ড। মাইল কোটি বছরের সঞ্চিত পলি-মাটি কাদামাটির তাপ আর চাপে জমে আলো, নরম পাথর তৈরি হয়। সিন্ধুঘোটক জোয়ারের দিকে হাত বাড়ায়।

এই হল হিমালয়ের সূচনা। এই সূচনার পরিসমাপ্তি ঘটে আরও পাঁচশ লক্ষ বছর আগে। ইতিহাসে মানুষদের আগমনের এক হিমাগার প্রায় সমান্তরাল পর্বতমালা জেগে ওঠে। ক্রমে তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়। এরাই এক সময়ের হিমালয়, আজকের হিমালয় ও শিবালিক নামে পরিচিত।

ভূকের পরিবর্তনশীলতার জন্যে শুধু হিমালয় নয়, বহু পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে —ইওরোপের আল্পস্ ও পিরেনিজ, উত্তর আমেরিকার রকি মাউন্টেন, ও অ্যাপালে-শিয়ান, উত্তর আফ্রিকার অ্যাটলাস ও দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ রেঞ্জেস। হিমালয়ের গঠন সম্পূর্ণ হয় সবার শেষে। হিমালয় পৃথিবীর বয়সতম, উচ্চতম কিন্তু কমবয়সী পর্বতমালা।

আর এদিকে, দক্ষিণ টিথীস আদি ভূকের মতন বহু সুন্দরবনের জন্ম দিয়ে, নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিল ভূমধ্যসাগরের আজ সীমিত পরিসরে।

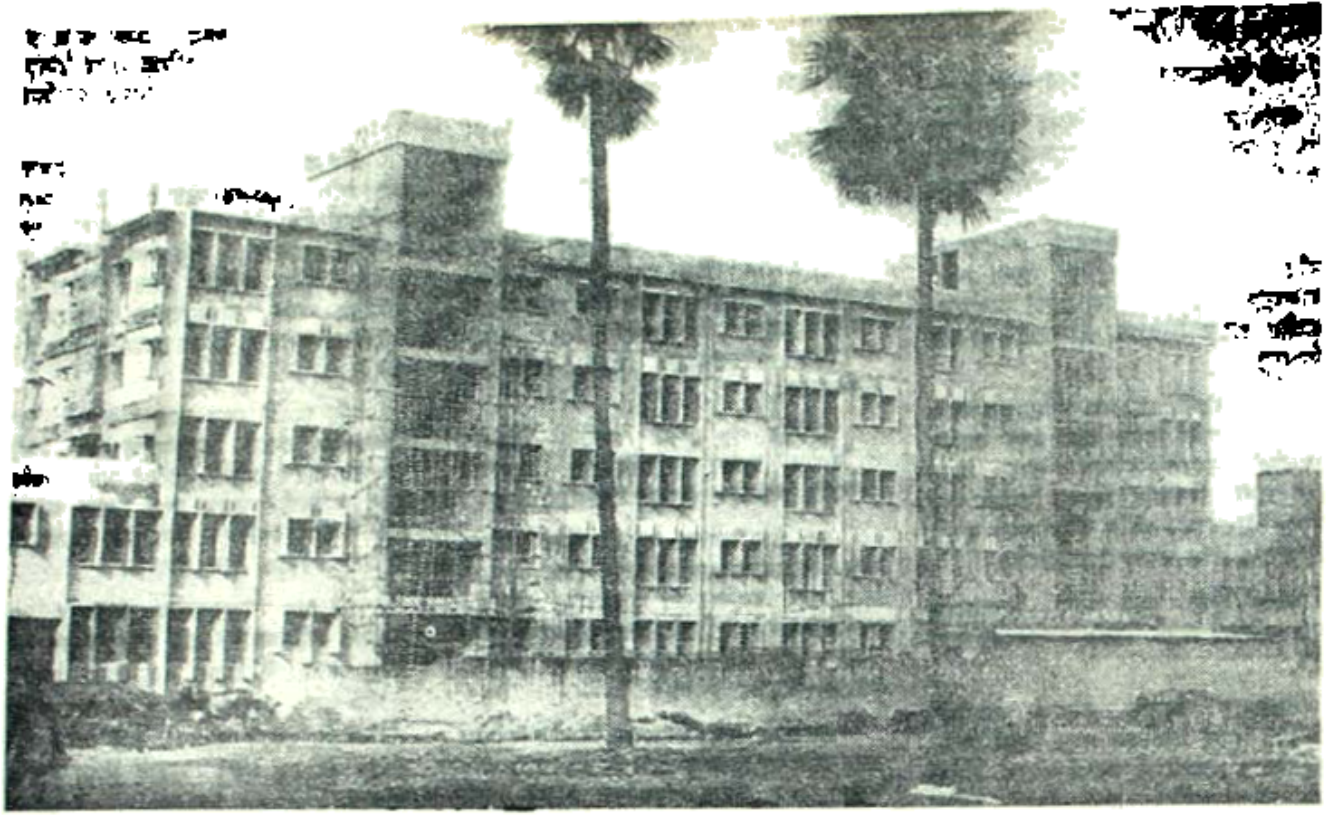

মানুষগড়ার ইতিকথা

পুনরাবৃত্তি ইতিহাসেরই ধর্ম। অতীত ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজির মিলবে, মিলবে আন্তর্জাতিক ইতিহাসেও। রাজা-বাদশা, বাদশাহের খেয়ালখুশীর প্রকোপের অভিজ্ঞতার ছাপ কোথায় নেই এই অভাজনের। শুরু করেকবার করে কিন্তু স্কুলের ইতিহাসে আক্রান্ত করে ছোটখাটো ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখেছি—যে সব পথ ধরে স্কুলখানির সাফল্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এক একটা পর্যায় এক একজনের জন্মদিন হয়ে ওঠে, যার জন্মকথা অনুসন্ধান করা যেন নিছক-ই মিছে যায়। তারপর কালস্রোতে একদিন পুরোনো প্রবাহে পলির স্তূপ উঁচু হয়ে ওঠে, নদী বয়ে চলে ভিন্ন খাতে। মানুষ-বাগানে, অন্যদের পরিচর্যার মধ্যে থাকে অবশ্যই আবার নতুন স্রোতের ফসল ফেলে ওঠে, সেন-ভিজনের জন্ম-খাতের পলল স্রোতে যায় নতুন করে জেগে ওঠে পুরোনো খাত। নদীই তখন তার ভুলনা-পুরোনো পরিচর্যার নবযৌবনের জোয়ারজলে।

সময় ও স্রোত কেনা বড় কঠিন কাজ। সবাই পারে না। সবাই চায় অনেক কেউ কেউ মনে করেন, অন্যান্যদের কর্মী-পাথরে খাতাই করে দিক জলের যেন ও গতিধারা। তারপর তেনা স্রোতে পলের পলরা নিয়ে যেন, ফিরেনে নিয়ন্ত্রণের নিশ্চিন্ততায় ভেসে বেড়ানো যাবে। লাকের পুরু অনুকরণী শিপাহের দল তাদের ধরে পুরোর নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু সময়ের সরণি জুড়ে বড় বড় হরফে লেখা থাকে—এই পথের প্রবর্তক ইনিই। এ যুগের এরকম একজন ইনিই হলেন শহর কলকাতার অন্যতম মানী স্কুল সাউথ পয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীকান্ত গুহ।

এখনে তিন হাজারের ওপর ছাই ও ছাত্রীর সেকেন্ডারী স্কুল আছে। আছে সহস্র সহস্র প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু সাধারণ রাইনের মধ্যেদ্যোগ এই সেদিন পর্যন্ত মিশনারী প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোথাও বড় মোদ দেখা যেত না। ছেলেকে মানুষ করার চিরাচরিত পদ্ধতি হিসাবে অনুসন্ধানের হাতের বেত ও মাস্টারমশাইয়ের কানমলা ও চড়থাপ্পড়ই সম্বল ছিলাম আমরা। কিন্তুরগার্টেন, মন্টেসরী ইত্যাদি পদ্ধতির কথা শুনি, কি ক্লাসের পাঠ্যসূচীকে বাকত দেখিনি তাদের সময় সীমাবদ্ধ। সেই ছোট-ছাটন মধ্যযুগীয় কঠোরত নিয়ন্ত্রণ আমাদের অনেকের হয়েছে কে আর দেখি নিয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাংলা-দেশের শিক্ষাজগতে সতীকান্তবাবু যে আলোড়ন এনেছেন তার অনুকরণে আজ দেখা দেখেই ছেয়ে গেছে। আজ এদেশের যে কোন বড় শহরের যে কোন মোড়ে বাঁধিয়ে দেখতে ইচ্ছা হবে কেন, একটা না একটা এরকম স্কুলবাসের অ-পয়ের আমার চোখে পড়বেই—রোজাইণ্ড নার্সারী স্কুল, মর্নিংস্টোরী কে, জি, স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের অনেক অ-মিশনারী শিক্ষা-ব্যবসায়ীই সতীকান্তবাবুর গবেষণা কলমে নিজেদের দোকা ও ফুলাচ্ছেন আর বিজ্ঞ সতীকান্তবাবু সবই দেখছেন। গভীরের মনোযোগসহকারে অবলে হাসিতে যাচ্ছেন। টান আবতেও পারেন কি যে তাঁরই প্রবর্তিত পথে এসেনে শিল্পের অন্যের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা এত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু সতীকান্তবাবু কি করবেন?

সতীকান্তবাবু কি করবেন জানার আগে জানা দরকার তিনি কি করেছেন আমি বলব আজ থেকে একশ চল্লিশ বছর আগে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রতিষ্ঠাতা ডেবিড হেয়ারসাহেব আর আমাদের জন্ম যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, অর্থ পরবর্তী যুগের অবাধবাণিজ্য ও ব্যবসা-সম্পর্কে ভিত্তিতে যেটিকে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথেরই খুঁজে বার করেছেন সতীকান্তবাবু। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিন থেকে ৪ বছরের শিশু-দের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগানোর জন্য ডেবিডসাহেব তাঁর স্কুলে একটি নার্সারী-সেকশন খুলেছিলেন। লাচ, গান বাদ্য, খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে শিশুরা পরিচিত হত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে

সাউথ পয়েন্ট স্কুল

কি বিচ্ছু এই মেয়ে! কেন সহপাঠীরাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না এখানে। তাই ছোট-মোহনের অকালমৃত্যুতে তার সাথের চারা-পার্টিই অকালেই মুষড়িয়ে গেল। কেউ সেদিন বাড়াতে চেষ্টা করেনি সেই শিশুমৃত্যুটিকে। তারপর কেটে গেছে প্রায় সোয়াশ বছর।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর এখানে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সোয়ারী হয়েছে মেয়ে-বউ-ঝি-ঝাড়ার মনে আড়া-বাড়ি-ঘোড়ের সমূহ আরোগ্যের কথাটা সহজের। আর মা কি কেমনী হৈরী হবে না, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষে ঘরে ঘরে ভরা দেশ। কিন্তু কি করে? ইউনিভার্সিটির কলেজ একটা মেয়েকে হয়ে পরীক্ষার বাহির দুলে দিলেই কি তা সম্ভব হবে? না কি, মাটি-জল-হাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে পুটি অঙ্কের বিদেশী ফুলের চারা এনেদের মাটিতে পুঁতে দিলেই তাতাতাটি উদ্ভিদটি ফলেবাগানে পরিণত হবে? পুরো ব্যাপারটাই অনুমানীর মনে হয়েছিল প্রথম শিক্ষাবিদ্‌ তব নিশিকান্ত পুরুষ মেয়ে সহীকান্তবাবুর। বক্তিমানের অনুরীণায় প্রথার পুরোমুক্তরা পরিবর্তনের মেয়ে সহীকান্তবাবু মেয়েদের প্রথাগত পর্যায়ের বিরোধী। মেয়ে অথবা যার জেলা জন, সে কিনা মেয়েদের সেরেনোর অংশেই মেয়ে এটা ধারণা-বাহিরে। না, লক্ষ্যীর আরাধনা করতে গিয়ে সরস্বতীকে বোর্মাদিনই অবহেলা করেন নি। বরং তাঁর নিজস্ব রেকার্ড রেকর্ডে একবারে ছোট বয়সেলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তিনি সরস্বতীর প্রসাদপুষ্ট।

চাকরীর সূত্রে অবাবে প্রায়ই এ জেলা ও জেলা ঘুরে বেড়াতে হোত, ফলে কিশোর সহীকান্তকেও প্রায়ই এক স্কুল মেয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে হয়েছে। বালসার নবাব-গঞ্জ স্কুল, তারা বলেকিয়েটা হাইস্কুল ও অলকাতায় মেয়ার স্কুলে মেয়েদের ভর্তি নিয়ম ও মৈমনসিংহের কথা বিস্মর্তীন। মেয়ার স্কুল মেয়েদের ভর্তি নিয়ম ও মৈমনসিংহের কথা বিস্মর্তীন। মেয়ার স্কুল থেকেই ছাত্রিশ সালে মাট্রিক পাস করেন সহীকান্ত। সহপাঠী মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেয়েই ফার্স্ট হন মাধ্যমায়। মেয়ে বছর ধরে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ পাস করলেন। ব মেয়ের মধ্যে এম, এ, ও লাভ ডিগ্রী দুটিও সঙ্গে করে নিলেন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রিয়ে মেয়েন বাবসাপাতি। এ অঞ্চলের সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন সহপাঠী মোহনলালকে। আর বাবা নিশিকান্ত অনুপম আমীবিদের সঙ্গে মেয়েকে সঙ্গে করে বিয়েছিলেন—চাকরী মেয়ন করলে না মোহনলাল করে, মেমনি দেখো বাবলা-করতে গিয়ে কেন মেয়ের হাত না ধরে যাও।

অনেক অনেক শিক্ষ-নিদেশ পালন করেছেন সহীকান্তবাবু। আর তাই বার বার উপেক্ষেন। জীবনে। তবে উপায় করেছেন, কিন্তু কখনো অর্থের মালয় করেন নি। কখনও যে তাঁর বন্ধু-সাহিত্যিকরা হাত উপেক্ষেন, উপেক্ষেন তাঁর অবিশ্বাস্য আতিথেয়তার ভার কেন উপেক্ষা নেই। মোহন-লালের পার্বতিকলকাতের নিজেই কাজ-ছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যবসায় প্রবর্তিত হয়ে ও স্বিকরীর মহানুভবের সূত্রেতে ক কলকের অনেকে পার্বতিকলকাতে ছেড়ে ওঠেনের কলকাতে কুঠলেন। এখানেও মো-পার্টনারের কাছে প্রবর্তিত হয়ে ছেড়ে দিলেন ব্যবসা। এবার ঠিক করলেন আর ব্যবসা নয়, চাকরী একটা চাই। ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন সহীকান্তবাবু। তাই চাকরী একটা জোগাড়ে পুরো অন্যতম হয়ে পড়েছিল।

ধরলার অনেই তো আর চাকরী জোটে না। খুব বড় একটা চাকরী তখন নি সহীকান্তবাবু। ছেলেবেলার কবিতাপুরে আর্থিকপ্রসাদের কুয়ে কবিতার ঠাকুরী ভাল-বিহারী মহাশয়ে সেখেছিলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে হেডমাস্টারী করতে। নিজেও মৈমনসিংহে ব কবিতে পাঠশালায় বসিয়ে পড়ার ও স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সহীকান্তবাবু। তাই বালসা ছেড়ে যখন চাকরী খুঁজতে বেরুলেন তখন সবার আগেই তাঁর মনে পড়েছিল নিজকবিতার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য সেদিন ইউনি-ভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও এ যুগের মধ্য কলকাতার অনেক প্রধান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও তেকের সহীকান্ত-মুখে একটি সহকারী শিক্ষকের পদ ও জোর স্কুলে জোটাতে পারেন নি। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরেছেন, কিন্তু কোথাও কোন আশ্বাস পান নি। তাই নিরুপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত ছুটেলেন সওদাগরী অফিসে।

মোটা মাহিনের ও পরবর্তী নাটি বছর এ প্রতিষ্ঠানে যে প্রতিষ্ঠানে বড় বড় পদে কাজ করেছেন তিনি; প্রচুর মাইনে ও নানা সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মেয়ের ছেড়ে মেয়েরে চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। চাকরীর ব্যাপারে কাঁচিকে কাজে ছেড়ে ছড়ানো ছেড়ে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু মেয়ের চাকরিকার প্রয়োজনেই পারেন নি। শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ এল। তখন চাঁদপুর মহে ছুটেলেন সহীকান্তবাবু। অলকাতার একটি বড়ো সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে সেক্রেটারীর পদে কাজ করতেন। মাহনে কমাতে মাসিক সোনেরোশত মেয়েরিতে। একমাত্র সন্তান ইন্দ্রনাথকে স্কুলে ভর্তি করবেন বলে অফীর মহে এক বড়ো কিশোরী স্কুলে আগ্রহিলেন মেয়ে মেয়েরেন। পরীক্ষায় খাতায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকেরা আশ্বাসেন, সীট মেই তাই ভর্তি করা সম্ভব নয়।

অন্য স্কুলে যে না হয় তাঁর ছেলেকে পড়াবে? তাই অগত্যায় ফিরে মেয়েদেরে উপেক্ষেন্ট আবার মেয়েন সেই স্কুলে সহীকান্তবাবু। দুজনার মুখে স্কুলের মেয়েঁড়িয়ে মেয়া মেয়ে অনেক ছাত্রীদের এক ফোটোগ্রাফ অন্তরঙ্গতা বাবসায়ী মনের সঙ্গে। কি কারণে দুরি এখানে? —মেয়ে একটু অবাক হয়েই মনকে জিজ্ঞাসা করলেন সহীকান্তবাবু। প্রথম এল—মেয়েরে ভর্তি করে নিয়ে স্বাগত। উপেক্ষা সহীকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করেন—মেয়ে কোনে? ব্যাপারে উপর মেয়ে বন্ধু। বলা কি, ছিকেন্ট যে বলেছেন সীট মেই। পাড়ার ভিতরে ওঠাতার ছড়ার সম্পর্কে ছড়ার মন স্কুলকর্তৃ স্কুলের বন্ধু উদ্ধার হাসলেন—উপেক্ষা কি না হয়?

মেয়ের মেদিন সেই স্কুলের ধরনা মেয়েই ফিরে অনেন সহীকান্তবাবু। ছেলের ভর্তি নয়, বাবার টাকাই মেয়ের ভর্তি হওয়ার প্রধান অন্তরায়, সেখানে যে ছেলের পড়াশোনা মা সহীকান্তবাবু এ কথা বলাই বাহুল্য। ছেলেকে তবে স্কুলে ভর্তি করে, দিলেন। আর সেদিনই মনস্থ নিলেন নিজের উচ্চ আদর্শের তাড়নে বিদেশীদের স্বার্থপর মেকাচির সমূচিত জবাব দিতে হবে। ফল-স্বরূপে এল স্কুল মেয়ের নিজস্ব একান্ত জমি, এবং ছেলের মোতায়াই হবে তাঁহার একমাত্র কাজ।

জমিয়ে ফলতে বেশী সময় লাগে নি তাঁর। মুখোমাধ্যমের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার সমস্ত সুযোগ ছেড়ে নতুন পরীক্ষার পথে এগুনোর আগে একবার খুব ভাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়েছিল। স্ত্রীরতী স্ত্রীরিলতা পুরে খুব যে সম্মতি দিয়েছিল তাই নয়, নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল আর্থিক সহযোগিতায়। বাস, তাকে আর পায় কে। হাজার-বাজারের ধনসম্পদী, বড়ো, মাঝারী, ছিপ, সোজাসুজি আগাগী ছেলে মেয়ে কাঁছুনের চাপিটি একটি ভিত্তির হলে ছোলাদারীর সমর ভর্তিকে পাঠিয়ে দিয়ে হাজার বেরিয়ে পড়লে সহীকান্তবাবু, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে।

স্ত্রীর মহযোগিতা মেদিন না পেলে হয়তো আজ না কিছু, সহীকান্তবাবু সংকল্পের এত জোর কিছুই সম্ভব হত না। ...আমাদের এতটা করার পেছনে তাঁর কথা বলা আজ আমি সবচেয়ে কুতজ্ঞ ছিলেন তাঁর স্ত্রী—স্ত্রীরিলতা দেবী—বলেছেন সহীকান্তবাবু।

ধরলার প্রথম চার, ছাত্রছাত্রীদের স্ত্রীরি-লতা দেবী সংখ্যে ধরে রেখে। সেই সাথে আরো কিছু, ভূটান সরকার অনুরোধে ঘর কিছের বেসরকারী পরীক্ষা কিছী করে। প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীর ভার থেকে পরিচয় হাজার টাকা ধরে করলেন সহীকান্তবাবু। তারপর বাসীয় আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কেনসের মোল বছর ধরে বাড়ীটি পোশার চাকরির ভার থেকে মোল বছরের জন্য লীজ নিলেন আসিক মূল্য ঠাকা ভাড়ায়। এক বিঘা এলাকের ভাড়া ভাড়ায় এখন বাজের পরিবেশে এই একতলা বাড়ীটির ১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল তারিখে ভারতের ছিলক-শিক্ষিকা সমাজ সাধারণী ছেলেমেয়ে ফিরে উপেক্ষে হল সরকার পরেন্ট স্কুলের মালা।

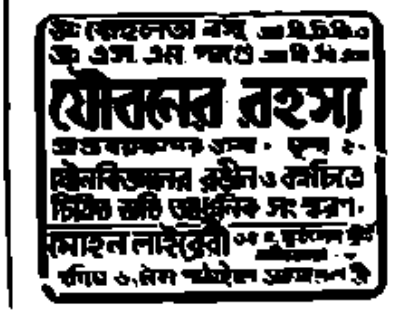

স্কুলের নামকরণের সময় কার্তিকবিহারের মনে পড়েছিল কথা কি ছিল পরলোকগত সতীকান্তবাবুর? সতীকান্তবাবু নিজে প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর স্কুল শহরের বুকিংয়ে একটি ফেলে প্রতিষ্ঠিত। ভালো স্কুল হলে নিশ্চয়ই নাম থাকতেন—বুকিং ফেল বিদ্যালয়। কিন্তু এখানে পরিস্থিতিটা অন্যরকম হয়েছিল। তাই যোগ্য কারণসহ সঙ্গে তাঁদের ভেবে নাম দিয়েছিলেন। সাউথ পয়েন্ট স্কুল।

পরিচালনার দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে স্কুলের নামকরণ সংক্রান্তে ইংরেজী প্রধান স্থান করে আছে। কারণ সতীকান্তবাবু তাঁর স্কুলের আবদ্ধা হিসাবে ইংলিশ-কে বেছে নিয়েছিলেন। ইউনিক কারণে তাঁর নাম সকলে জানতেন। তেমনি তিনি ভেবেছিলেন যদি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু পৃথিবীবিখ্যাত কোন ইংরেজী স্কুল তো কো-এডুকেশনাল হয়। তবে কেন সাউথ পয়েন্টে সহশিক্ষার সুযোগ অবারিত করলেন তিনি? তার কারণ, সব কিছুর নিজের কথাটেই বলি, দ্বিতীয় কারণটির এখনের মাধ্যমিক স্তরের ছিত্রিজনে পর্যন্ত সাইকে নিয়ে গেছে। সুখী পরিবেশের সুখের ছোঁয়া বিদায় নিয়েছে সেই সন্ধ্যে। অর্থাভাবে পরিবারে দুঃখ হয়েছে জীবনযাপনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর উপার্জন পরিশ্রম। কিন্তু এরকম পরে বাড়ে অভাবও। তার ফল ছাত্রজীবনে ছাত্রদের ভিত্ত

হিন্দুস্থান রোডেই সরকার ইতিমধ্যে আর একটি দোতলা বাড়ী মাসিক সত্তরোত্তর টাকা ভাড়ায় এমন সময়ের জন্য নাকি নিয়েছেন স্কুল। নতুন ভাড়া বাড়ী দুটোয়ই একটি করে ক্লাস স্কুল বাড়িতে নিয়েছে নিচুতলার ঘরে।

একবাড়ীতে মাসোয়ারী বিয়াল্লিশ হিন্দুস্থান রোডের উঁচু আমার মধ্যেই স্কুল বসার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত হল। চতুর্থ ক্লাসের ও ডিস্ট্রিক্টমিডিয়ম দুটি শাখার ক্লাসোয়ন আরোহিত স্কুলের। ফোর্থাইতে আর্ট শাখাও খোলছে স্কুল। এই বছরই ১ তোড়ার সেলে সময় বি, বি, রোড সেকেণ্ডারি সেকেণ্ডারী বাড়ীটি মাসিক বত্রিশ টাকা ভাড়ার পাঁচ বছরের জন্য নাকি নিয়েছে স্কুল। উনসত্তরে ৮৬ হিন্দুস্থান রোডের তেতলা বাড়ীটি মাসিক তিন হাজার টাকায় ভাড়া নিয়েছে স্কুল পাঁচ বছরের জন্য। হিন্দুস্থান রোড ও তোড়ার রোডের চারটি বাড়ীতে আজ স্কুলের সর্বাঙ্গী ও জুনিয়র বিভাগের ক্লাস তিন সময়ের ভাগাভাগি পড়ছে। ব্যাপ্তিষ্টমিশন হাসপাতালে মনোরে স্কুল উচ্চতর ক্লাসগুলি চালাবে। ইস্কাপ সেকেণ্ডারীর ট্রেইনিং সেন্টার সেও নাকি হাজারেরও বেশী।

দুবছর আগে যত সাময়িকী ছাত্রছাত্রী নিয়ে যে স্কুলের গোড়া পত্তন হয়েছিল আজ তিনশোর পড়ুয়ার মধ্যে তার ছাত্রছাত্রীরা বেশী ছাড়াও। শিক্ষক সংখ্যাও গত বোল বছরে নয় দশ জনে দাঁড়িয়েছে। মাসোয়ারী, জুনিয়র ও হায়ার সেকেণ্ডারী মিলিয়ে প্রায় একশো বাইশজন ছাত্রছাত্রীর আজ স্কুলমহলে সাইন পাওয়াই। ব্যাপ্তিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি দুই বিদ্যায় পরিবর্তনের প্রথম প্রতিশ্রুতিফলক মনের কাছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বাড়ানো জানাতে ছাড়েনি। স্কুলকর্তারা বলছেন, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্র পড়ুয়ার ছাত্রছাত্রী আমার স্কুলের সে ক্লাসের নিল খুঁজে পাচ্ছে না। মাসোয়ারী বা জুনিয়র সেকশনে একজন স্থায়ী শিক্ষিকা মাসে তিনশো ছাত্র-ছাত্রীদের কম বেতন পান না। হায়ারসেকেণ্ডারীতে একজন স্থায়ী শিক্ষক মহাশয়ের সব মিলিয়ে মাসে বেতন পান চারশো পঁচিশ। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হারও, বাড়ি পায় সমানুপাতে। স্কুলে পাঁচশো টাকার বেশি মাইনে পান একজন। বিভিন্ন বিষয়ের চারজন শিক্ষকদল পাচ্ছেন প্রায় সাড়ে সাতশো টাকা। এঁদের মধ্যে বারোজন। আর বিজ্ঞানীর পদ্ধতিসমূহ (সিনিয়র হিসেবেই, হিসেবরক্ষণ, সংগীতশিক্ষয়িত্রীরা) মাসে পান চার অঙ্কের মাইনে।

বেতনের পরিমাণ স্কুলে সাঁড়া সাড়া ফেলে উঠেছিলেন। স্কুলের কেন্দ্র এমনের ফাঁকি মনোযোগী বা অধ্যাপকরা এই মাইনে পান? তাই শুরুমাইনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্কুলের এই বিপুল খরচ যোগান কি করে? সরকারী সাহায্য পান কি? এক পয়সাও, খুঁ, কর্তৃপক্ষের কাছেও সরকারী সাহায্য পাই না, জানান প্রতিষ্ঠাতা কর্মসচিব। ট্রাইসন কি স্কুলের আয়ের একমাত্র সোর্স। মাসোয়ারী সেকশনে ছাত্রী ছেলে সব ক্লাসের মাইনে মাইল টাকা। জুনিয়র ও সেকেণ্ডারী সেকশনে ট্রাইসন কিছু হবে ৪ মা কিছু পঁচিশ টাকা। সায়েন্সের ছাত্রদের লাবরেটরীর জন্যে দু টাকা বেশী দিতে হয়—সায়েন্স টাকা।

এই ট্রাইসন ফিস আর থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য স্টাফের মাইনে ছাড়াও যাবতীয় বাড়ী ভাড়া ও মোটা যন্ত্রের স্কুল বাসের মেনটেনেন্স ও বাড়ি ফিলেরও ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় খরচখরচা নির্বাহ হয়। সব খরচ মিটিয়েও সুপারিচালনার পরে এক বিপুল রিজার্ভ ফাণ্ড গড়ে উঠেছে স্কুলের। আর ফাণ্ড আছে বলেই স্কুল আজ নিজস্ব পাঁচতলা বাড়ী বানাতে সক্ষম হয়েছে হয়েছিল বলেছে। এ বছর ফেব্রুয়ারীতে ব্যাপ্তিষ্টমিশন কার্ডেনসের জমির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদী মাসে স্কুলের হায়ার সেকেণ্ডারী সেকশন নিজস্ব ভবনে উঠে যাবে। স্থানান্তরণের আয়োজন চলছে বিপুল উদ্যমে।

উদ্যোগে আয়োজনে কোথাও কোন পরিকল্পনাহীনতার ছাপ ছিলছে না এ স্কুলে। টেবিলে বড়মানো হচ্ছে ছিপছিপে উদ্যম কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কতকগুলি অধ্যাপক আমাদিন্ত বন্ধুরা পরিচয় স্কুলে না করে সরকারবাহাদুর আমাদের হেডের নিজ ফেলেন ট্রাস্ট স্কুলের সাধারণিক বাড়ীটি দেখাতে। ট্রু-মুখে ভাঁপ পড়িচলে এই বাড়ী উঠেছে প্রায় উনিশ বছর আগে। সমানে পেখনে আছে প্রায় পঁচিশ ফুট্টা আয়তনের গড় উঁচু কুয়োর বাগান। বাড়ীর ডিজাইন থেকে শুরু, কার্নিশের থেকে ব্যালকোনীর সাজসরঞ্জাম প্রতিটি জিনিসেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি বিশেষ ভাবনা, বিশেষ উদ্দেশ্য। ছাত্রছাত্রীদের কলোর সমারোহ, সেখানে বিলাসিতার কোন স্থান নেই। সহর কলকাতার বেখাপ্পা সবচেয়ে বড় স্কুল বিল্ডিংটির মোটা পাঁচিলটা ঘুরে এই ভাবটাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখানে এখন কাজ চলছে। প্রায় সব শেষ। ছাদটা শুধু বিল্ডিংস টাঁচ। সে কাজ শেষ হলেই হায়ার সেকেণ্ডারীর ক্লোরস ছাত্রছাত্রী চলে আসবে এই বাড়ীতে, সামনের গ্রীষ্মেই।

কি থেকে যে কি হয়ে যায় কে বলতে পারে। যদি সরকারবাহাদুর তাঁর হেলেটিকে ক্লোরস বিদেশী স্কুলে ভর্তি করতে পারতেন তাহলে আজ পশ্চিমবঙ্গের অনারেরী নাম্বী ও প্রথম স্কুল সাউথ পয়েন্ট আজো আছে কিনা সন্দেহ। বাঁর ইচ্ছায় বিদেশী তাঁর ছেলেরা বলবেন, স্কুলে আপনারাই বিদ্যা বিক্রিতে। বন্ধুবান্ধবদের বিদেশগমনে বিদেশী বাঁরা ছুটিয়া হয়ে থাকেন পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের নিরিখে সরকারবাহাদুরের এ ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। তার ঐতিহাসিক কারণগুলিও বলবেন সরকারবাহাদুর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের পরিবেশই একটি নিম্নস্তর বর্তমান পরিস্থিতির দিকে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করত। আমরা তাই ভাবি, ভাঁদের ভাবনা ঘটেছে। সামনে একটি মোড় ঘোরা থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আমাদের মধ্যে শিক্ষাতন্ত্রটি। সেই জন্যে আজকে এই মোড় ফেরার সময় সময়ে বসে সরকারবাহাদুরের নিজের মুখে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অতীত ও ভবিষ্যতের কাহিনী। সেই ভবিষ্যতে এখনো দুটিবার পরিকল্পনার কথা। নিউ আলীপুরে নিজে মোড়ে মাঠে তিন একর জমি ভবিষ্যতে মাধ্যমিক মোড়ে মাধ্যমিক স্কুলের জন্য। এখানে পঁচাত্তর বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠবে সাউথ পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল। স্কুল-কলেজ সবই থাকবে এখানে। ছাত্রদের অধিকাংশই হবে আবাসিক। তবে স্থানীয় ছেলে-মেয়েরাও এখানে পড়ার সুযোগ পাবে। সরকারবাহাদুর যাদের, যাদের স্কুল সাউথ পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলে চলেছিলেন প্রতীপবাবুবাহাদুর, আমি আমার মনোযোগ কুমারীবাবুর, এই সময়ের ছাত্রছাত্রী সম্পর্কের ভিন্নধর্মের ভেতরে কি অসাধারণ সাংস্কৃতিক ক্ষমতা হচ্ছে। খুলে থেকে সৌম্য ভদ্রলোক সরকারবাহাদুর ক্ষমতা ছাত্রের সামনে দেখলাম। কিন্তু যেদিন সরকারী কাজের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় সবসুযোগ ছেলার ঝুড়ে ফেলে এক বয়সে নতুন করে জীবন শুরু করেছিলেন সেদিন সবাই তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন—পাগল। কিন্তু সেই পাগলের পাগলামিই আজ বিশ্বের করে দিয়েছে সবাইকে। সরকারবাহাদুর এদেশের শিক্ষাদের জন্য যে সুযোগসমূহ ছাত্রা তাঁর স্কুলে গড়ে তুলেছেন, তার জন্য আজ আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেদিনের সেই আলোচনার শেষে বিদায়মুহূর্তে মনে হয়েছে — সরকারবাহাদুর নিজে। একটা একটানের অনুযোগনায় অতলে তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। আজ অনেক শিক্ষা-ব্যবসায়ী আজ তাঁদের অধ্যাপিকার পাশে শিক্ষা বিভাগের হলে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এ থেকে মোচনের পথ কী?

—শশিবন্ধু

ঘুম ভেঙে ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যে উৎসবের মধ্যে থেকে ওঠে পাখি,
আতরের গন্ধে ভরপুর আজানে, পুজোরী বাতাস
কর্তিকার নিরিখে পল্লব দুলে ওঠে—ঘুমি ঘুম ভেঙে
সূর্যের সেরাসন।

আমার সমস্ত আয়ো চেতুর পড়ে কুলের অনুশীলন;
মনে পড়ে ঐশ
সন্ধ্যাস্ত ছেলের মধ্যে শুয়ে থাকা শিশির বিন্দু মত;
মনে পড়ে দেবদারী, চাঁদ ধরে থাকা জলাতীরে
প্রজাপতি কুড়াতে আসা সমস্ত কুমারী স্বাস্থ্য,
হাটার চলন প্রতিচ্ছবি।

আজ ঘুম এলে বড় বেশী অধিকার করেছে শরীর,
প্রতি রজনীতে
অস্বস্তিহীন গাঢ় ঘুম আমাকে মৃত্যুর আরাকাছি
কিছুক্ষিত্তর বিছানাতে নিয়ে যায়। শুধু
ভুল অভিনয়ে পাট ভুলে যাওয়া নায়কের চোখে
ধরা হয়ে লেগে থাকে আদিত্য সকাল।

আমি আমি; কি-কিসের মতো শুধু ঘরে লাগি ঘারি
মাথার বালিশ,
ধরম ভুলোর ঐ ঐহিক আজন্ম জড় কিছুই বলে না;

এখন সেও কি তবে অস্বস্তিহীন।
যার মানুষের শরীরে জমা করতে বিশ্বেছে।

শরীর নির্মাণের আয়োজন ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এই তো কাছেই আছো তুমি হাওয়ার মধ্যে ঘাউয়ের গন্ধ হয়ে
গাছ-গাছালির সজীবতায় কুলের মতো হেসে ওঠো তুমি,
ফলের আস্বাদে উদাসীন
কখনো পাখি হও, কখনো নক্সা—ঘনসীল আকাশের ঝিন্তারে
তোমার কণ্ঠস্বর ফেলে ওঠে শিশির ঝরার সময়।

আমি তোমার শরীর নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম
সমস্ত উত্তাপ এক ঐশ্বর্য দিয়ে উজাড় একটা শরীর
স্বপ্নের চেয়েও গতিময় তোমাকে ছুঁতে চেয়েছিলাম
রোদের দুপুরে
আলো উৎসের সংবাদ শুনি
তোমার চতুর্দিকে আবহমানের আয়োজন সম্পাতি
যেন তাদের শরীর ছিঁড়ে দিয়ের গান গাওয়া।

তুমি বললে : এই তো কাছেই আছি সারাক্ষণ।
তোমার চোখের মধ্যে শিশুটির চোখ জলতে থাকে—
অনন্তকাল কণ্ঠস্বরের তোমার ভালোবাসা
আমি ঘরে থেকে শরীরের গন্ধ শুনতে পাই—
তোমার কণ্ঠস্বরে সমুদ্রের আহ্বান
তুমি কি নদীর উৎসে একবার ফিরে হয়ে উঠতে পারো না
কিংবা অবতরণের পর্বত?

আমি হৃৎপোটি ধারার স্নান সেরে তোমার শরীর নির্মাণ করবো

নেকড়েদের বসতি

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘুমোতে গেলে ঘনোরঞ্জনই প্রায় আমাকে জোর করে উপরে নিয়ে গেল। ওর বসবার ঘরের চৌপাইতে শুয়ে ওকে সব বললাম। ফাজিলবাবা আদালতের উকিল যেমন করে সাক্ষীকে জেরা করে তেমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও সব আমার কাছে জিজ্ঞেস করল। কখন ডালটনগঞ্জে পৌঁছেছিলাম? আসে ঠিক ছিল কিনা সেখানে যাওয়া? সেখানে নিয়ে কার সঙ্গে কখন কখন দেখা হল? সব। সব বললাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ঘনোরঞ্জন বলল—একটু ব্রান্ডি খাও লালসাহেব। তুমি খুব আপসেট হয়ে পড়েছ। তখন আমার যা অবস্থা তাতে আমার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা ছিল না। একটু পরম জলে বেশ খানিকটা ব্রান্ডি মিশিয়ে আমায় দিল ঘনোরঞ্জন। চক্ চক্ করে খেয়ে ফেললাম। তারপর ঘনোরঞ্জনের গাইটার পা-দুখা করে দুলোয়। একটু মায়ায় লাগলো। ঘনোরঞ্জন ওর চাকরকে ডেকে আমার জন্যে খিচুড়ি চাপাতে বলল। তারপর আমায় বলল—তুমি একটু আরাম কর, আমি নীচ থেকে আসছি। এই বলে একটা টর্চ নিয়ে ও নীচে চলে গেল। শুনলাম জীপটাকে ভাল করে পরীক্ষা করছে। কেকড়ে গুলি কোথায় লেগেছে। জানবে লেগেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ও। এসে ছুঁচটা জানলার রাডতে রাখতে বলল—আজ তুমি নতুন জীবন পেলে লালসাহেব। ওর কপালে রাজটা লেখা ছিল বলে বেঁচে গেলে। এই বলে চাকরকে ডেকে বলল—মোরগা পাকাও। তখন ফাজিলবাবু মুখ ভেংচে বলল—মোরগা খেয়ে খেয়ে পেট্রল কাল। ঘনোরঞ্জন বলল, লেগ-পীস খাবো। সোনা মুরগীর ঘর থেকে ধরে এনো। আজ রাতে মোরগা চাই-ই—যে করে হোক।

আমি বললাম—তোমার এত আদরের পোষা মুরগী কাটবে কেন মিছিমিছি? ও হেসে বলল—তখন বলো না কেনো। তোমার হাতটাও আমার কাছে কম আদরের নয়। সত্যি ও লেগেছিল। ফিরে দেখেছি তার জন্যে আমার সাধনে একটা চেয়ার টেনে চেয়ারের পিঠটা বুকের কাছে নিয়ে দুটিকে দুটি পা ছড়িয়ে বসে ঘনোরঞ্জন বলল—আচ্ছা, ডালটনগঞ্জে বিশেষ কিছু কি দেখেছিলে? এমন কিছু যা তোমার অস্বাভাবিক লেগেছিল? এমন কোনো লোক যাকে তুমি চেনো অথচ চিনতে পারোনি?

হঠাৎ আমার ধানবাদী কোকারের সামনের সেই লাল অ্যাম্বাসাডরটার কথা মনে হল। ওকে বললাম। সেই লোকটি, যে-গাড়িতে বসেছিল তার কথাও বললাম। ঘনোরঞ্জন লাফিয়ে উঠে বলল—লোকটার কি বড় বড় জুলফি ছিল। আমি চমকে উঠে বললাম, কি করে জানলে? হ্যাঁ ছিল। ঘনোরঞ্জন বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মেরে বলল—বুঝেছি।

আমি বললাম—তাত বুঝেছি, এখন চল পুলিসে একটা ডায়েরী করে আসি।

ও বলল—পাগল নাকি? এই রাতিরে আবার ডালটনগঞ্জে ফিরতে গিয়ে মরি আর কি? ডায়েরি-ফায়েরি করব না। ডায়েরি করলে বদমাশটা জানাজানি হয়ে যাবে। বদলা নেওয়া যাবে না। তুমি কি মনে কর ওরের ছেড়ে দেব লালসাহেব? যারা একজন নির্দোষ লোককে কাপুরুষের মত আড়াল থেকে গুলী করে মারতে চায়, তাদের শিক্ষা যা হওয়া উচিত তা আমি দেব।

আমি বললাম—ঘনোরঞ্জন তা তুমি বলছ বটে, কিন্তু শিকা দেওয়ার আগে তোমাকে ও ও ওরা এমনি করে মেরে ফেলতে পারে? ঘনোরঞ্জন কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে তাকল। তারপর বলল—তা পারে। কিন্তু একবার চেষ্টা করেই দেখুক। আমি ও আর তোমার মত অসাবধান নই যে, ওদের ছেড়ে দিয়ে আসব।

ঘনোরঞ্জনের লোক গরম জল করে এনে বাথরুমে দিয়ে গেল। ঘনোরঞ্জন সেওয়াল আলমারী খুলে একটা বুশ্‌ডি বের করে দিল। বলল—যাও, স্নান করে এস। আরাম লাগবে। স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি ঘনোরঞ্জন ওর পিস্তলটা পরিষ্কার করছে। তেল দিয়ে না। পিস্তলের আর পিস্তলের তেমন যত্নের হয় না। মানুষ মারতেই বেশী কাজের। খুকোলে লালসাহেব, কাল ভোরে যে জায়গায় তোমার উপর গুলি চালিয়েছিল ওরা, সেখানে যাব। সে জায়গাটা আমি নিজে দেখব। তারপর ঠিক করব ডাইরী করব কি করব না। আজ বললাম—যা ভাল বোঝ। প্রাণ একবার গেলে আর তা ফেরৎ হবে না।

ঘনোরঞ্জনের সে রাতে ঘুমুবার ঘর ছিলো। সেই হুইলার সাহেবরা শিকারে আসার পর এতদিনে ওকে এত ঘর কখনও ভোগ করেনি। অতদন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা হুইস্কির বোতল প্রায় শেষ করে আনল। তারপর আমার সঙ্গে আমার খিচুড়ি আর মুরগীর রোস্ট খেল।

ব্রান্ডি খাওয়ার জন্যেই হোক কি ভয়-জনিত ক্লান্তির জন্যেই হোক, ঘুমটা খুব ভাল হয়েছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে এক কাপ করে চা খেয়ে আমরা জীপ নিয়ে সেই গুলির জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। ঘনোরঞ্জনের পেছনে পেছনে গিয়ে দেখলাম—যে একটা জীপ দাঁড়িয়েছিল সেই, বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে এবং সেখান থেকে বেরিয়েছেও যে তার চাকার দাগ স্পষ্ট।

জীপটা জঙ্গলে ঢোকার পর ওখানকার ঘুরে ঘুরে শুকনো লাল মাটিতে জল রাতেও নিশ্চয়ই ছিল। জল তাদ খুলে গাড়ি চালানো আমার পক্ষে নিশ্চয়ই শক্ত। আমাকে দাঁড়াতে বলল ঘনোরঞ্জন, কারণ তা নজর করিনি বলে।

জীপের চাকার দাগ ধরে জঙ্গলের ভেতর পঞ্চাশ-ষাট গজ গিয়ে দেখা গেল যে, জীপটা যেখানে দাঁড় করানো ছিল সেই জায়গাটার ঘন ঝোপ থাকায় জীপটা সহজেই লুকিয়ে রাখা যায় সেখানে। পিচিস-ঝোপের পাশে একটি বড় জলো পাথর। সেই পাথরের পেছনের মাটি বেশ পরিষ্কার করা। পাতা, শুকনো ডালপালা, ইত্যাদি সাফ করা। ঘনোরঞ্জন ভাল করে লক্ষ্য করল জায়গাটা। এবং পরক্ষণেই একটি গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পেল। আমায় বলল—ভাল করে খোঁজ ত, খালি কার্তুজ পাও কিনা। খালি কার্তুজ পেলাম না কিন্তু একটা ঠোঙা কুড়িয়ে পেলাম। ঠোঙাটা ঘনোরঞ্জন দেখেই বলল—ডালটনগঞ্জের বিখ্যাত চাটের দোকানের ঠোঙা। যারা চাট কিনে এনে এখানে বসে খেয়েছিলেন। জানিস ফেলেছিলেন। নইলে কি আর কুড়ি হাত দূরে থেকে তোমার মাথার তাক করা গুলি ফসকাত? তোমার ভাগ্যটা ভাল হয়ে গেল।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে ঘনোরঞ্জন বলল—চলো লালসাহেব ডাইরি-ফাইরি করব না। আমি ওকে বিশ্বাস করিনি। জানোয়ারের ভয়ে জেল ও উঠে দাঁড়াই না। হাত-পায়ে ধরে

আমি তার দোষ বললাম—কি? তুমিও ওদের মনে করছ না কি? ছেলেটি বলল—প্রায় সেইরকমই। কি করি তা দেখতেই পাবে।

(১২)

রমেনবাবুদের কর্মচারী সেই হরেন-বাবু—বর্তমানে ম্যা.টী. ফাই-ফোটা ছেলেরা, অনর্গল সিগারেট খান, সেদিন আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সাইকেল চালিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। সেখানে নাকি বিশ্ব ঘনেক জরি কিনেছেন। জমে দেওয়া আছে। দোকান খোলা হলে তাই তুলতে যাচ্ছিলেন।

বাস ফাটা অবস্থার সময় একসঙ্গে আমাদের দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে। ভারী আপন লোক। এই একমাসের মধ্যেই। এদের 'পছন্দ' বলে যে কিছু আছে, তা বোঝার উপায় সেই এসে দেখলে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত। এই রকম ছেলেই জঙ্গলে-পাহাড়ে এই ধরনের আস্ত ডেরা করতে সক্ষম। মুখে হাসি লেগেই আছে। পরস্পরের মেহতরী ছেলেমেয়ে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো ও দু-একটা হাসি-মস্করার কথা বলাবলি, তারা হলে হলে হাসছে, রমেনবাবু, আমরা সাইকেল চালিয়ে চলেছিলাম। একেই তুলনায় সত্যিই আমরা মাথনবাবু। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু এই রমেনবাবু।

রমেনবাবুকে বললাম—ফেরবার সময় দেখতে অনুরোধ কিন্তু। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন। উনি বললেন—ওরকম ভেবে কি সাইকেল চালিয়ে এতদূরে যেতে পারব ভাই। আমি বললাম—আজ যে যেতেই হবে এমন কথাও ত নেই। এসেছেন ও জমিদারী দেখতে। উনি হেসে বললেন, তা যা বলেছেন।

বেশ ভালো খেতে পারেন ভদ্রলোক। প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম, পাহাড়ের স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী জলবায়ু এসব মিলে বেশী না খাবার কথা নয়। আমিই আজকাল যা খাই, সহরের লোকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আমার রমেনবাবুকে রমেনবাবুকে দেখেই লক্ষ্মণ হয়ে প্রণাম করে বলল—দেখুন স্যারেনবাবু। মানে বুঝলাম না। সুধোলাম,—আপনার নাম আমার পালোয়ান হল কবে থেকে? রমেনবাবু বুঝে তার দিয়েছিলেন, হাসতে হাসতে তার ছিটকে পড়ল। বললেন—সে আর বলবেন না মশাই—সে এক ইতিহাস।

তারপর উনি খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন। জমাটলালের প্রথম ছেলেটি নিয়ে এসেছি। মাইনে বেশী পাই না। টাকা-পয়সার বড়ই টানাটানি। টাকা-পয়সা ছেলে-পুলের পড়াশুনা মেয়েদের তখনও বিয়ে হয়নি। একটা না দেখে মাথায় এলো।

বাস ফাটা কুলিদের বলে বুঝলে ভুল ছিল। একজনের বাড়ী পাহাড়ের কোলা, অন্যজনের ছাপরা। দুজনেরই চেহারা একেবারে ঝকঝকে। দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে। দুজনেই, মানে সিং আর বাদরুম, নতুন এসেছিল। বাইরের লোক দূরে থাকুক, আমাদের চুলিয়াই ওদের ভালো করে চেনে না। একদিন ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলাম ছাঁপাসোহরে। সেখানে তখন বালাবও বন্ধের কাজ হচ্ছিল। ছাঁপাসোহর হয়ে লাইনটা জমাটলালে এসেছে। ছাঁপাসোহর থেকে সামানই লাগত। তখন ফার্স্ট ক্লাসেই ভাড়া ছিল বোধহয় এক টাকা।

বাদরুম ও.র রাম ,সিংকে ছাঁপাসোহরে পাঠিয়ে দি.র লাল নীল পেন্সিলে পয়েন্টস্ম্যান ছাপ.র বিরুদ্ধে মুখের পালোয়ানের হুমকি দিয়ে। পয়েন্টস্ম্যানে বলা হল যে, পালোয়ান ধর্মসিং ও পালোয়ান বাদরুম সিং, তাঁদের এক জীবন-মরণ কুস্তির প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হবে। ধর্মদিন পর রক্তারক্তি পয়েন্ট বড় মাঠে। টিকিট দু আনা মাত্র। কি করুন মশাই, প্রথম তিন দিনে তের হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে গেল তারপরও যখন টিকিট বিক্রি হতে লাগল, তখন আমার ভয় করতে লাগলো।

এদিকে ধর্মসিং আর বাদরুম সিং ছাঁপাসোহরের বাবুদের আকাশের কুয়াশা-তলার পাশে নরম মাটি নিয়মাতা আর হলুদের গুঁড়ো মেশানো আখড়ার চৌহদ্দি ঠিকঠাক করে দড়ায় ঘিরে চলেছে। ওদের কাছে দশ মাস্ক করে প্রাইজ একটি করে নারকা ছুতো, একজোড়া ঘুঙি এবং এক হাঁড়ি করে হাঁড়ুয়া কবুল করেছিলাম। তারা ছিনরাত আর বন্ধুবান্ধবদের জন্য বলে স্টেশনে-স্টেশনে বাঁধা-কপন করে কুস্তির আখড়া সরগরম করে রাখল।

এদিকে প্রতিযোগিতার দিন আসন্ন। আখড়া তৈরি হয়েছে। চারপাশে বেড়া দেওয়া হয়েছে। বেড়ার গায়ে গায়ে কুস্তি পালোয়ানের ফোটুস লাগানো হয়েছে। নিশান ওড়ানো হয়েছে আখড়ায়, একটা জন্মা বাঁশের ডগায়। এখন পালোয়ানেরা এসে পড়লেই হয়।

জমাটলালের স্টেশনে কি ভীড়। ফার্স্ট ক্লাসের দরজায় বাদরুম সিং আর ধর্মসিং দাঁড়িয়ে মুখ-মুখ হাসছে। আসবার আগে ওদের দুজনের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এখানের লোকেরা চিনতে না পারে। সে হৈ-হৈ ব্যাপার। ফার্স্ট-থার্ড ট্রেনের মাঝের ফাঁকের দুজনকে বসিয়ে তার বন্ধুবান্ধবরা জয় ধ্বনি দিতে দিতে স্টেশনেরদের ওদের নিয়ে গেল আখড়ায়। আমি হলাম মেজবান। একটা নীল রঙ্গ সন্ধ্যেবিহি টাঙ্গা ছিল অনেকদিনের পুরোনো। সেটা পালকির আর বাদরুমদের ফেরা-আসা ব্যাপারের কাজে ঘিরে ভাল করে ফেরা-আসা নিয়ার পুরোবাসি, খাদা আর ইতরাদি রেখে, বাস্ত আসবাবে ছোট্টো কুস্তিগীর বলে বলে হয়।

দর্শক ও সমর্থক বাস-ফার্স্ট-গালায় কুস্তি। ভেবেছিলাম ধরতে পারবে না। কুস্তি খুব জোর জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমি হুইসেল দিচ্ছি। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপার সুবিধের। ধর্মসিং একটা ঘুঙি ও বাদরুমকে ধরে এমন আছাড় মারতে আরম্ভ করল, যে কি বলব। সেকালের দাপটের হাত ফেরে ধর্মসিংকে কি বলব এবং আমাকেও যেন কি বলল। কিন্তু ধর্মসিং ছাড়বে না মোটেই। হুংকার করে আছাড় চলেছে। মেরে ফেলে আর কি। এমন সময় বাদরুম আখড়া ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে এসে আমার জড়িয়ে ধরে বলল—ও হুজুরবাবু এইটির হাত থেকে বাঁচান। ছাড়বো না ছাড়বে, ঘুঙি না চাইবে, আমার ছাপ্পারে ঘাপ্পা, বলেই ছোট্ট ছোট্ট করে কাঁদতে লাগলো।

সেই মা কথা বলা, আর হজুরবাবু বলে আমাকে জানা, আমার কুলিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে যে একটা কুলি ছিল (জরী সেরামা), সে সঙ্গে সঙ্গে লাল ফাঁচ ঘ.র ফেলল। ঢেঁচিয়ে অড় সবাইকে, বলল—আরে ই ত হুজুরবাবু বা। ঐর হাতের বাদরুম ওর ধর্মসিং বা।

দৌড় দৌড় দৌড়। দৌড় গিয়ে টাকে বসলাম, বলে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে স্টেশন। জমাটলাল ট্রেন তক্ষুনি ছাড়বার, মাত্র ছেড়ে দেছিলাই, সেই অবস্থায় দুই-জন অফিসের সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে উঠলাম গাড়ীতে। ঘামে তখনকার সব জং গলে গেছে। বাদরুম ধর্মসিংকে গালাগাল করছে আর ধর্মসিং বাদরুমকে গালাগাল করছে।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে মরি। সুধোলাম, কিরলেন কি করে তারপর আবার? উনি বললেন, তক্ষুনি ফিরি? সাতদিন পরে অবস্থাটা শান্ত হলে জমা-টানাকে ফিরলাম। ফিরেই রমেনবাবুর সঙ্গে তক্ষুনি সাক্ষাৎকার সঙ্গেত সাক্ষাৎকার চলিপাত হলাম।

উনি খুব হাসতে লাগলেন। বললেন—এই জন্য বুদ্ধি, জান দিতে লালসেন কি হত? সেইদিন থেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে থেকে গেল আমার। অফিসেরও ভার্কারিতে পদোন্নতি হল। আমিও মোটা বুদ্ধি চুলিয়ে ফেললাম। অবশ্য কুলিদেরকেও ঠকাইনি। সকলে খেতে পেলাম। একদিন ফেরবাটে শিকারিক হল। সব খাওয়া আমি দিলাম।

এরকম গল্প-গুজব করতে করতে খাওয়া হল। রমেনবাবুর পেটে আরো গল্প ছিল। তার প্রতিটি গল্প এমনি রসাল। হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেল।

প্রায় দুপুরে দুটো আবধি ছিলেন। তারপর আবার সাইকেলে উঠে পাহাড়ী পথে পাড়ি জমালেন।

মাহিন্দারের কথা থেকে শোনা গল্পের বই আনিয়েছিলাম লোক মারফৎ। একটি বই নিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সোজার পর পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগলাম। আমি ভেবেছি বই চাইনি। কারণ মাহিন্দারের কাছে যেন বই আছে, যেন বই নেই তা আমার জানার কথা নয়। মাহিন্দার তিন মাইলের সুদূর একটি ছিটে পাহিয়েছে বই-

সুস্থির সঙ্গে। আমাকে বিশ্বিদ্যুৎ আবার মেসেজের জানিয়ে।

একটি কবিতার বই। ফিরিয়ে দেবার সময় টু, অরক্ষিতাকে'। খুলতে গিয়েই মারিয়ানার নাম লেখা দুটি সাদা খাম বইটি থেকে ছিটকে পড়ে গেল। খাম দুটিকে তুললাম। মারিয়ানাকে লিখলাই কেউ লিখেছিল। ও ভুল করে বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

চিঠি দুটি হাতিয়ে তারী-তারী ঠেকল। পরের চিঠি। ওইটাই সর্বাগ্রে খ-কাটিতেই অন্যটি চিঠি পড়া নীতি অপরাধ। চিঠি দুটি মেজের টেবিলের উপর তুলে রাখলাম।

তার পর কবিতা পড়তে চেষ্টা করলাম। অন্য বইগুলো আড়াআড়ি ঘর্ষণায়, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও বক্ষ চিত্ত ধৈর্য না. ওখান হইতে মন হল, আমার সমস্ত এই চিঠি দুটির মধ্যে কি আছে তা জানার অসম্ভব আগ্রহে অধীর। সাধে কি বলি, যে অন্যের চিঠি পড়ে।

সব বাঁধ, সব দ্বিধা, শুধু সুমিত্রা-বৌদি যেমন খুব জোর ফুঁয়ের আড়াল থাক, তেমনই খুব করে দুইহাতের মোচড় দিলাম, আমি যে বহুদূর তেমনি খুব করে চিঠি দুটি খুললাম।

হাতের লেখাটি ভাল না। বড় আড়াল—খুব তাড়াতাড়ি লেখা। বড় পাতে লেখা পাঁচ পাতা চিঠি। মারিয়ানা-সোনা বলে সম্বোধন, সুমন বলে সমাপ্তি।

কলকাতা
৯৭।৮

আমার মারিয়ানা সোনা,

গতকাল রেস্তোরাঁতে একটি ছবি দেখলাম 'The Sandpipers' এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টনের। এডওয়ার্ড বলে একটি ছবিতে ঘটনা অভিনীত হয়েছে। সেই চরিত্রটি ও মিস্টার টেলরের মিস হেনেলন্ডস বড় ভাল লাগল। তোমার কথাই মনে।

পাহাড় ও জঙ্গল-ঘেরা সমুদ্রের ধারে একটি সুন্দর ছবি-আঁকা-ঘর বাড়ী। চারদিকে ভাঙের জানালা। সামনের সরু-লালচে জলের উপর ঝুঁকে বেড়ায়, উঁকিয়ে বেড়ায়, আর সান্ডপাইপার পাখিরা। আকে-বাঁকে বালু-বেলার ছবিকে পরে আবার উঠে যায়।

মিস হেনেলন্ডস একা-একা থাকেন এই সোনালি-বালির নির্জন স্থানে। একেবারে একা নয়। ছয়টি বছর বয়সের ছেলে থাকে।

ছেলেটির সৈন্যে, মায়ের কোট-চুল যখন ভবিষ্য ঘটবে, ঠিক সেই বয়সে, নবীনের সন্ধানে মোহনী হওয়ার মুহূর্তে নিজে মিস হেনেলন্ডস আবিষ্কার হয়। সমাজের মানুষে এদের ছাড়া-না, স্বাভাবিক কারণে এদের পরিচয় সংক্রান্তিত ঘৃণা পরিচিতি প্রশ্নের। মিসেস কারুর পুরোহিত নেই। কিন্তু মিস হেনেলন্ডস, তা বলে এই পাত্র বাবা-মা'র কোন অসম্মানের কারণ ঘটায়, সেই জন্যে, নিজের দেশ ছেড়ে বহু দূরে এক অন্য জায়গা (আমেরিকাতেই) এসে এই পাহাড়-সমুদ্রের ধারে বাসা বাঁধে।

পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে মিস হেনেলন্ডসের অনেকগুলো অভিযোগ ছিল। যেমন তোমাদের অনেকেরই আছে। এই ধরো বয়স বয়স থেকেই, যেহেতু ও দেখতে সুন্দরী ছিল, পুরুষেরা এর কাছ ঘেঁষে, কাছে আসে, গল্প-টল্প করতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা যাকে বলে তা ও কোনদিন কোন পুরুষের কাছে পায় নি। ভালবাসার সম্মোহ জানত না। এর অন্তরের অভিমানে পুরুষের অস্তিত্বমাত্রই অর্থহীন হয়ে আসা একটি অত্যন্ত সত্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা কোনো দাম রাখায়, দাম দেবার না।

ছুটিতে সান্ড-পাইপার অসমুদ্রের মিস হেনেলন্ডস। ছবি আঁকত, সমুদ্রের ছবি আঁকত। ভলা-ভাঙা সান্ডপাইপার পাখিকে খুঁজে খুঁজে ধরে এনে বশ করত। স্বার্থপর ও লোভী পুরুষ মানুষের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র নিশ্চিন্ত স্থান যে প্রকৃতি, তা সে বুঝেছিল।

কিন্তু একদিন তার জীবনে এডওয়ার্ড এল। বিবাহিত এডওয়ার্ড। স্ত্রীর সঙ্গেই সে থাকে। বিদুষী স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী। স্ত্রী তাকে ভালোবাসে, সেও স্ত্রীকে ভালো-বাসে। এডওয়ার্ড সুপুরুষ। বিখ্যাত বিশ্ববাণী স্কুলের কর্ণধার। নিষ্ঠুর, আদর্শে, পাণ্ডিত্যের বিখ্যাত। মিস হেনেলন্ডসের ছেলের স্কুল ফি'র আশায় নিয়ে প্রথম পুরুষের দেখা হল।

মিস হেনেলন্ডস জীবনে এমন পুরুষ মানুষ দেখে নি এর আগে। সুপুরুষের ত বটেই, শিক্ষা আছে; কিন্তু দম্ভ নেই। চাওয়া আছে, নেই চাতুর্য। অনেক আছে কিন্তু সে অনেক বিনিময়ে হয় না। নিজের খুশে বড় উঁচুতে যে নিজে মৌজা তুলিয়ে নিয়ে বড় প্রশমিত করে, সেই ঝড়কে ভুল হারিয়ে আর মনে পড়ায় না।

এডওয়ার্ড বিবাহিত। অথচ সে বন্ধুন করে ভালবাসল। সমাজের চোখে এ বিরাট অপরাধ। নিজের বিবেকের কাছে সে সব সময় ছোট হয়ে থাকল। মাঝে-মাঝে এসে যাবে থাকত এডওয়ার্ড মিস হেনেলন্ডস-এর সঙ্গের ঘর ভরে। সান্ডপাইপারের জন্যে বন্দুকধারী হাওয়ার পাশ নিয়ে মাঠে ঘুরে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন নিজের সমাহিত উচ্ছ্বাসকে দিয়ে ভুলিয়ে।

ধীরে-ধীরে ওদের অন্তরঙ্গতা বন্ধন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতরে এসে পৌঁছল তখন একদিন বিশ্বেকেন্দ্রায় দুঃখ পুরুষ এডওয়ার্ড তার স্ত্রীকে জানাল নতুন ভালো-বাসার কথা।

মিস হেনেলন্ডস বলল শুনল- সে এডওয়ার্ড তার স্ত্রীকে তাদের সম্পর্কের কথা বলেছে, সে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে ভাঙতে লাগল। কারণ সে নিজেই নিজেকে প্রকৃতির কন্যা বলে মনে করত। সে বলল, এতে কথার হত কি ছিল? পাপের কি ছিল? একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে সে-পবিত্র কোন মধুর সম্পর্ক থাকে কি পাপ? কোন স্বীকৃতি সোসাইটির দিয়ে কি এই সম্পর্ক ঢেকে রাখা যেত না? তোমার এ কেমন পাপবোধ? তোমার এ কেমন বিবেক? ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান নি?

কিন্তু মারিয়ানা, ন্যায় অন্যায়ের বিচার আমার নয়, মিস হেনেলন্ডসের মত, দু-একজন পাগল লোকের মত-সমর্থন নয়। তোমাদের মধ্যকার সংস্কার, তোমাদের বিবেক, তোমাদের সমাজ কিন্তু এডওয়ার্ড যে শাস্তি পাবার তোমরা তাকে সেই শাস্তিই দিল। মিস হেনেলন্ডসও শাস্তি পেল। এডওয়ার্ডের স্ত্রীও সেই শাস্তি পেল। শাস্তি কেন আলাদাভে হল না ছাই, কিন্তু এডওয়ার্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বিবেক দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তার স্ত্রী এবং হেনেলন্ডস দুজনকেই ছেড়ে চলে গেল। একজন স্নেহপ্রবণতা বিশ্বাস পেল; অন্য-জন আত্মবিশ্বাস বিশ্বাস। আর এডওয়ার্ড বর্ণপুরুষের পুরুষো পাতা খুঁজে-খুঁজে সোনা খুঁজতে-খুঁজতে তার জন্মের দিকে এগিয়ে চলল।

দুজনে মারিয়ানা, তোমরা বড় অভাগা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি। তোমার যাই হয় না কেন তাই বলিয়ে অভিমানের ঢাক। মানুষের মনকে যে লক্ষ্মীপদের বাসর ঘরের মত ঘরে আটকে রাখা যায় না, এবং তোমরা যে তাতে সাপের মত সুক্ষ্ম পরিচয় ভালো-বাসার প্রবেশ সম্ভব, তা তোমাদের বোঝার সময় নয়।

এডওয়ার্ড চলে যাবে তার এক বছর বাঁচল, আমি চলে না যেতে দেরে যাবে। অনুমান করি। তুমি, আমি মানুষ, আমরা সবাই হেনেলন্ডস, এডওয়ার্ড ও এডওয়ার্ডের স্ত্রীর জায়—অভিমান দ্বারা বড়—বিদ্ধ দ্বারা।

ছবিটি বড় ভাল লাগল। দেখতে-দেখতে তোমার কথা বড় মনে পড়ছিল। আমার এই একতরফা, পরিণতিহীন, ঘনিষ্ঠতাহীন ভাল-বাসার সমাপ্তি হবে কোনদিন আমার অনুমানে। একটা পরম, অনুভূত রস নিয়ে অন্তর্দাহনায় — সেই অনন্ত অনুভূত রস নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় যাব।

তার নেই। হেরাজা হয়ে তোমাকে তার দেখার না; যদি সম্পর্কে পরমার আসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব — তবে বৃষ্টি ভালবাসার অন্তরালের অন্তরঙ্গতের পুরুষত্বকে নেজে সেই পরমার এসে পৌঁছবে — তার নিম পুরুষ।

আমর জন্যে।
তোমার সুমন।

মনে-মনে এই আত্মবিশ্লেষণের জন্যে তৈরী ছিলাম না। যা অনেকটা মারিয়ানার উপরে-উপরে ভাসার তাতে অন্তরঙ্গতের আন্তরিকতা-টান্তে-টুনে পাবার মত কিছুই নেই। শিক্ষা আছে, সম্পদ আছে, রূপ আছে, বল আছে, বিদুষী ও সুন্দরী স্ত্রী আছে, তবুও কেন দুঃখ, এত দুঃখ? কে এর জবাব দেবে?

(ক্রমশ)

ভূতের ভয়

সেদিন ট্রেনিং পরামর্শের এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। রাস্তায় এক জায়গায় একটি ফেরিওলা গান শোনাচ্ছে বন্ধু বললেন, গায়কীতে আমেন কৃষ্ণ বাকড়ে।

আমেনকৃষ্ণবাকড়েই চলছিলাম। কিন্তু বন্ধুর কথায় আপত্তি হলাম। বললাম, আমেন বাকড়ে হয়ে? একটা মেল কোথায়?

বন্ধু বললেন, বলা বাহুল্য, কিন্তু এখন আর এখানে সেটা ভূতের ভয় পায় না।

না, পায় না। হয়ে হয়ে ভেবে দেখলাম, মেলন সেখানেই নয়, বাংলাদেশের কোথাও আজ আর সেটা ভূতের ভয় পায় না। জমিদারী বুদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, বিদ্যুতের আবির্ভাব ইত্যাদি হরেকরকম অজুহাতে ভূতগুলোও এখন হয়তো উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। ভূতের গল্পও ইদানীং তাই ফ্লাশব্যাক।

অবিশ্যি, 'গল্প' বলতে যা বোঝায়, অনেকের বিশ্বাস ভূত নামক বস্তুটিই সেরকম আজগুবি ব্যাপার নয়। ভূত অতি বাস্তব ছিলেন। অন্ধ সন্ধ্যা নদীর ঘুমে কেরোসিন জ্বেলে আয়না দেখতে পাই নে। কিন্তু যাকে যাকে তারা স্বপ্নে শরীরেও দেখা দিতে পারে। তখন—।

এই 'তখন'-এর কাহিনী আমরা সকলেই জানি—। পতঙ্গ ও বহ্নি: কেননা, ভূত দেখে তার পায়ুমি এমন লোক অকল্পনীয়। গাঁয়ের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক বাড়িতে হাজতো আপনার মনে হল, একটানের ফুলবাগানের একটু দিকি শাদা ধপ করে একটা ভিজে ভূত বসে আছে। আপনার মনে তার জাপানে শুরু করল, কিন্তু আপনি তা শেষ করার পাছটায় নিজেই আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। দিয়ে দেখলেন, আসলে ঐ শাদা বস্তুটা একটি ছেড়া কাপড়া—হয়তো কোনো ধোপার বিলের বেলায় পথ চলতে এসে ফেলে গেছে। তখন, তার পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখাও ফেলল। কিন্তু আপনি যদি পাছটায় দিকে এগিয়ে যাবার সাহস না দেখাতেন, অর্থাৎ তয় পেতেন, তাহলে পরবর্তীকে মনে হত ভূতের বিষয়, এবং তয় পেতেন। অর্থাৎ, ভূত দেখার কৃতিত্বেও তয়, পরিণতিতেও তয়। কিন্তু, আমার এক বন্ধু জানের ছেলিকপ্টার দিতে দিতে যেমন বলে-ছিলেন তাল হল কতকগুলো ভাষা, ভূতে দিয়ে যাবা, তেমনি ভূতও হল কতকগুলো তয়, দেখা দিয়ে যাবা।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল অমিয় ভূষণ-মজুমদারের 'পদ্মকুল নদের ইতিকথা' একটি তুলনা—গাঁয়ের লোক তয় করতে ভালো-বাসে। তাদের বাড়িতে তাদের এপাড়ের তয় ওপাড়ের, আর ওপাড়ের বিয়ে কি হয়। তাদের আছে না।' ...কিন্তু তাঁর সে তয় না ভূতে দেখক মহাশয় তাদের মতো পর বলছেন, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে তয় নে। আমি এখন তাদের পড়ায়, না।' ...এর এ ঘটনার পর লেখকের তখন—পদ্মকুল দুটিতায়, যে-পাড়ী তাদের বাড়িতে তিনি নিয়মিত পড়িতে তাদের একটী বয় বাড়িয়াছিল, তাঁর মতুলাই যদি না সাথে, তাঁর মতোলোকটা এই অবস্থায় তাদের পাঠ বিভিন্নের তাদের সাহসে না।'

খুবই সত্যি কথা। তাদের আমার এক বন্ধু ক-বাবুর কাছেই শুনেছিলাম সেদিন ট্রেন এইরকমই অভিজ্ঞতা আছিলী। ক-বাবুর পাড়ুড়ি তাদের নিয়োছিলেন তাদের বাড়ি তাদে। ক-বাবুর স্ত্রী তেমন ভূতে তাদের মেন বিদ্যুৎকল উপন্যাস পড়ে থাকেন—সন্ধ্যাবেলা ভূতের এড়ে হিসেবে। সে ছাড়াও উপন্যাস পড়ার পর নিজেরাও ভূত সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনা করতেন, তাদের নিজের নিজে। স্বামী বেশ সুইট ছিলে তাদের তেমনটেন। ইতিমধ্যে স্ত্রী সুদীর্ঘ একটি হাই তুলতে তুলতে বাড়িভেতরে তাদতে যাচ্ছিলেন, 'যা—যাচ্ছে—।' তাদেরকের কী মনে হল, রসিকতার সুরে বলতে পারলেন, 'আজ তাতাতাতে তেলো না যাচ্ছে, ইটার এসেও পড়তে পারেন। তাদ, শুরুতেই তাদের কাণ্ড। ক-বাবুর স্ত্রী তাদেরপর হাই বন্ধ করে ফিরকম করে উঠলেন, 'তুমি কী তো! তাদের তাদের, তাদের তাদের—। এদের কী তাদেরকে বলা। ও—!' সঙ্গে উঠে তাদে তাদেরিবার সোফি তাদেরিবাদি। ক-বাবু তো তাদেরকুলের একজন। তাদেরকেই তাদের তেলেন তাদ-টাদ দিয়ে তাদিন তাদের তাদে তাদে তেলেন।...

তাদিন তাদি তাদেই তাদিন, ভূতের তয় এখন তাদ-তাদিনের। তাদে তয় তাদে-ভূতের তাদেরও তাদি তাদুদের তাদের তাদেই তাদিন। কিন্তু তয় তাদেও এর তয় তাদেরও তাদে তাদে তাদে তাদে, যে-তাদি তাদের তাদে তাদে তাদে তাদে

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নজরুলকে একটা কথা—আমার অভিনয় ভাল হচ্ছে কিনা সেদিন তা বলে যাবে না। আমি নিজেই বুঝতে পারি। তাই আমার অভিনয় ভাল হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করবে না।

ওকে। কবে থেকে আরম্ভ করতে চাও?

আমি বললুম—এখনই শুরু করে দিন। সিনিয়র আর্টিস্টদের পরে ডাকলেও চলবে।

নজরুল বললে—না, তা হয় না। তুমি আজ থেকেই আরম্ভ করে দাও।

অগত্যা আমাকেই অসুস্থ অবস্থায় স্টেজে নামতে হলো। হরিপদবাবু, সরযূ দেবী, শৈলবালা, আমি—আমরা কয়েকজন।

অসুস্থ অবস্থায় সেদিন অভিনয় করতে নামতে হলো। একেই বলে অভিনয় করা।

এর পরে সুরেন্দ্রনাথ অপেরাপার্টির সোরাবরুস্তম নাটক 'কালির আঁচড়' নাম দিয়ে মঞ্চস্থ হলো ১৯০১ এর আগস্ট মাসে। নতুন বাংলার তারিখ ছিল ১৮ শ্রাবণ, ৩০৮। ভূমিকা লিপি ছিল : রুস্তম—আমি, হাসেম—সুরেন্দ্র সিংহ, সলমী—ক্ষীরোদ রায়, সোহরাব—হরিপদলাল চট্টোপাধ্যায়, রুস্তমী—সুরেন্দ্রনাথ রায়, ইরেজ—সুখীলাল ঘোষ, ঝিঙ্গী—আবদুরবান, তহমিনা—বেদানা, পদ্মার সিন্ধী—চারুশীলা দেবী।

নাটকের বিষয়বস্তুটি বেশ চিত্তাকর্ষক। ছেলে মেরে উভয় অভিভাবকে এসে সব রীতি নয় কিছু করে নিলে, কিছুই করতে হল না আমাদের—সংক্ষেপে নাটকের বক্তব্য এই। নাট্যকার এই নাটকের উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন, 'কালির এঁচড়ের রাজা, যাহের দরদী হলহল কণ্ঠের যাঁরা গান গেয়েন, আমার সেই ফেরারী ভাইদের যে আমার এই নাটক উৎসর্গ করলুম।'

এই সময়ে চলতি নাটকের অভাব অনুভব করে অভিনীত নতুন সোরাবরুস্তমের বাঁধা পসারকে এক মুহূর্তে ছাড়ের 'আরাধনা' বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। দুটি নাটকেরই প্রধান ভূমিকায় ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। কিন্তু দুঃখের কথা, 'আরাধনা' যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে তখনই আমাদের থিয়েটারে ভাঙনের পালা সুরু হলো।

একটা থিয়েটার গড়তে যেমন যে আনন্দ হয়, ভাঙতে ধ্বংসটা তার চেয়ে বেশি বাজে।

এর পর ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা হলো নতুন থিয়েটারের। হরিপদবাবু থিয়েটারই হলো সেন্ট্রাল নাট্যনিকেতন।

১৯০১-এর ১৪ মে নাট্যনিকেতনের উদ্বোধন হলো। কিন্তু প্রথমে ঐ মঞ্চে নাটক নয়, নতুনভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। নাট্যনিকেতনের প্রথম নাটক হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যার কাহিনী পুরাণাশ্রিত কিন্তু নাম হলো ঐতিহাসিক। তার পর ঐ বছরের যে মাসে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হলো অমর বাবুর সাবিত্রী। সাবিত্রীর পর কিছুদিন চলেছিল 'সীতা'।

অহীন্দ্র চৌধুরী
এবং মা মিনু

এদিকে স্টার থিয়েটারে নৌকাবিলাস অপেরার অভিনয়ের উদ্বোধন হলো ঐ বছরেই ২৭ জুন তারিখে। ঐ মঞ্চের সবচেয়ে নতুন নাটক ছিল অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীমন্তবিলাস'। নৌকাবিলাস অপেরা এটির উদ্বোধন করেছিল। নাটকটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল চঞ্চল নৌকাবিলাসের কুমিরের সঙ্গে নায়কের লড়াইয়ের দৃশ্য।

এই ১৯০১ সালেই আর একটি নাটক-এর অভাব বাংলা রঙ্গমঞ্চে বহু দিন ধরে এবং তার সঠিক কারণটি যে কি তা নিয়ে একটা বলা যায়। নাম শ্রীকৃষ্ণ অবতার। এই অভাব এসে ছোল নিউ নেশনাল নয়, নিউ নাট্য নিকেতনী প্রযোজনায়। এই নামের আকর্ষণে ছিল অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপরে। যে ঘটনাটি এর সঙ্গে 'শ্রীমন্ত' নামের বিজড়িত আছে বলেছেন। এই নাম নিয়ে কাহিনী অবলম্বনে পুরোনো নাটক অভিনয় করে বেড়াতেন।

ইতিমধ্যে নির্মলেন্দু ফিরে এসেছেন আবার স্টেজে। ফিরে এসেই একটি স্টেজের সংগঠন করলেন। বহুজনের বহুপক্ষ ধন ভাঙার টাকা সংগ্রহ করে-ছিলেন ফিরে নির্মলেন্দুবাবুকে স্টেজ দিলেন। নির্মলেন্দু বাবুদের তখনই একজন করলেন ফোরাস স্টেজটির বিক্রি-ভূয়ে। নাট্যকার হোলেন স্টেজটির এই নাটক আর নিজের।

'কিন্তু কিছুদিন' বেশীদিন চলল না। ছাই নির্মলেন্দুবাবুর একক পরিচালনা নাটক অভিনয় করতে হলে। এতে কিছু হল না তখনই ঠিক করে কিছু ফোরাস দিন, চলল ছোট হল বছরখানেক ধরে।

এদিকে ছিনাথ অপেরাদের পরে আমরা একক করেছি করাচিতে চলেছে। চলনাথের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১ অক্টোবর ১৯০১ চন্দ্রশেখর দিয়ে এই একক ফোরাসদের। প্রযোজনা স্টেজটি চলনাথ করে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—চন্দ্রশেখর করেছিলেন। এই প্রথম এবার বার বার নাটকে নির্মলেন্দুর অভিনয় নাটকটি সফলতাই পেয়েছিল।

এর মধ্যে ছিনাথ ও অন্য নাটক অনেক চলছিল। চন্দ্রশেখর অপেরাদের প্রথম অভিনেত্রী, তাঁর সঙ্গে হয়-স্টেজটির আকর্ষণ এবং নতুন স্টেজের অভ্যর্থনা, তাতে বাঁচি, অভিনেত্রীর অভিনয়ে হয়েছিল। এর কোনটাই যেমন চলে নি।

এই সময়ে আমার একটি নাটক ছিলাম অভিনয়ের অভিনয়ের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন নিজেরা। আমার ইচ্ছে ছিল নাটকে কণ্ঠসঙ্গীত নয় আমি অভিনয় করি আমারই ভূমিকায়। এই ভিন্ন ধরনের অভিনয়ের কাছে যেতাম। যদি তিনি রাজি হতেন।

বিশ্বা চিত্রের নায়ক অহীন্দ্র চৌধুরী

অজয়ের কথা শুনে রবিকালবাবু মৃদু হেসে বললেন, আমি তো তোমার বেনিফিট শোতে অভিনয় করি না।

একটু ইতস্তত হয়ে বললাম, আমি জানতাম না। কিন্তু ভেবে বলবেন না।

কী বলবো। কম করে যাবো রাজ-নিবাসের জন্যে। প্রযোজকবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন মহারাজের কাছে। কিন্তু নিরঞ্জনবাবুকে দেখতে তিনি বললেন, আমি নায়কে পারি, তবে প্রাণসিংহ নয়, আলমগীরের ভূমিকায়।

তাই হলো।

সেই থেকে আমি-বয়সের প্রাণসিংহই করে এসেছি। আলমগীর সেজে আর সেদিন নামি নি।

এর পর নিউথিয়েটার্সে একটি নাটক খুব জমে গেল। সেটি হল ডেপুটিবাবু কমলাকান্তের দেখা বাদুড়ী। উদ্বোধন হয়েছিল ১৯০১-এর ১১ ডিসেম্বর। ঐ নাটকে কমলা-ঝরিয়া ছিল অসাধারণ। ইন্দুর সিদ্ধান্তে ঠিক হলো, সপরিবারে

সমর সপরিবারের আমন্ত্রণে-পড়া, সুশীলা সাহা-সনেহ ইন্দু ও চন্দ্রক—এদের নিয়ে কাহিনী মুখর হবেন। নামভূমিকায় অভিনয় করবেন আমি। এছাড়া সমর, ইন্দুবালা চক্রবর্তি, প্রফুল্ল সিংহ, রেণুবালা, চারুশীলা, সুকুমারী এরাও নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। পরবর্তী কালের বর্ণাঢ্যনী অভিনেত্রী উমাশশী এই সময় কাজ করতে আসেন মহোৎসাহে। তাঁর সঙ্গে আমাদের বিয়েটারে দেখা হয়েছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, এই সময় থিয়েটারে একটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। বিখ্যাত রবির আমলের সবাক রবির যুগের সূচনা হোল। আমরা কোম্পানী প্রথম রবির ডেমোনেস্ট্রেশনে অনেক আগেই মুক্ত হয়েছিলাম, এবারে তাঁদের সবাক চিত্র দেখলাম। সেটা আমাদের সৌভাগ্য। প্রথম সবাক চিত্রের নির্মাতাদের সৌভাগ্য দেখলেন আমর চৌধুরী। আমাদের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রবি হল 'কবির প্রেম'। রবিটি পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির ভূমিকায় আমার প্রথম সবাক চিত্রে অভিনয়।

কবির কাহিনী-চিত্র নায়িকা ছিলেন কানন দেবী, নায়ক ছিলেন দীরেন বসু। এই বছরেই মাদ্রাজ কোম্পানী প্রথম ভাষা একটি রবি উপহার দিয়েছিলেন পরিচালক ছিলেন ভিরেনাথ গাঙ্গুলী। এ চিত্রে আমি ছাড়া অহীন্দ্রবাবু, মুণালকান্তি দাশগুপ্তা, নরীবালা, জ্যো ভি. বীরে বাস প্রমুখ শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন। চার্চিল সিনেমায় রবিটি ২১-১২-৩১ তারিখে মুক্তিলাভ করে। আমরা একটি প্রতিষ্ঠান এই বছর সবাক চিত্র তৈরী করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানটি হল নিউ থিয়েটার্স। প্রথম প্রথম রবি পরিচালনা করেন পাঁচকড়ি পরিচালক ছিলেন ভিরেনাথ আরেকটি ভূমিকায় ছিলেন ই. এফ. লিঙ্গলে, নিরঞ্জন পাল প্রভৃতি। ৩০ ডিসেম্বর রবিটি চিত্রায় মুক্তিলাভ করে।

বহুদূর কথা শেষ করার আগে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারি না। এবারে সেই না বলা ঘটনার কথা বলছি।

একটা কথা তো আগেই জানিয়েছি যে আমার মধ্যে একটা ভ্রমণ আছে, এক জায়গায় বেশীদিন স্থির থাকা আমার অভ্যাসের বাইরে। নিজের মধ্যে একটা যাযাবর মন আছে, সেই মনটা সময়ে-সময়ে ছটফট করে ওঠে।

এবারের পুজোর আগে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। এ চঞ্চলতা অকারণে যাবার জন্যে। কিন্তু মন বললেই তো যাওয়া যায় না। থিয়েটার চুক্তিবদ্ধ শিল্পী মাত্র নই, ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বও আমার। সুতরাং আমার পক্ষে এক কথায় কোথাও যাওয়া কি সম্ভব?

তবু শেষ পর্যন্ত উপেনবাবুকে বললাম, আমার বাইরে যাওয়ার ইচ্ছের কথা।

শুনে উপেনবাবু বললেন, কী যে এবার মনের ছুটি দিই বলুন। এখন পুজো নিরুপদ্রবে যেতে যত পরে যাবেন। তত আপনি বাইরে গেলে নাটকের অসুবিধা হবে।

আমার বললাম, আমি তো যে দিনের ছুটি চাইছি না, মাত্র আট-দশ দি

এবারে উপেনবাবু লাফিয়ে উঠে আরে বাপরে — এ একেবারে অসম্ভব।

তবুও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ছুটির জন্ম কিন্তু উপেনবাবু কোনমতে রাজী হচ্ছে না। অনুনয়ের পুজো কেটে থাক, তার আমিই আপনার বাইরে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।

এর পর আর কথা চলে না। হলো না এবার বাইরে যাওয়া। কিন্তু আমার অন্তরে ছটফট করছে যাইরে যাবার জন্যে।

ডেপুটিবাবু নজরুলের পর যেটি শুরু হয়। সমর চৌধুরী, আমার, ছিরি প্রমীলা আর ছিরিবাবুর ভূমিকায় অভি অভিনেতা।

প্রথমে মেজাজ খারাপ। তখন সবে ভোর হচ্ছে, অন্ধকারের সৌন্দর্যটুকু। এত ধর্মশালায় উঠেছি। চা-পানের পর একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কৈলাসের দিকে। কৈলাসের নকশা আছে, দিনের আলো ফুটলে নকশার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাবে। এখনকার সেরা নকশা সুজাউদ্দৌলা, তাঁরই পুত্র আসফউদ্দৌলা পরে লক্ষ্ণৌ শহর নির্মাণ করেন। আগে ফৈজাবাদই অযোধ্যার রাজধানী ছিল।

ফৈজাবাদের রাজপথ ধরে বেড়াতে-বেড়াতে লক্ষ্য করলাম, দলে-দলে ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে কোথায় যেন চলেছে। জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, সরযূ নদীর ধারে মেলা হচ্ছে, সেখানেই চলেছে ওরা।

ভালই হল। আমরাও চললাম মেলা দেখার বাসনা নিয়ে।

মেলা দেখলাম। বিরাট এলাকা জুড়ে মেলা বসেছে। মেলা দেখে হনুমানজীর মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের চারদিকে অজস্র হনুমান দেখলাম। মনের উল্লাসে বাঁদরীরা লম্ফঝম্ফ বিস্তর।

আবার ফিরে এলাম ধর্মশালায়। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে টাঙ্গা নিয়ে এলাম স্টেশনে। এবারে আমরা যাব লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ-এ উঠেছি হোটেলে। সুন্দর-পরিচ্ছন্ন হোটেল। হোটেলে জিনিস-পত্তর গুছিয়ে রেখে শহর দেখতে বেরোলাম। বাসযোগ্য শহর। সর্বত্র একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। শহর পরিক্রমা শেষে একটা মোকামে এসেছি কিছু কেনাকাটা করব বলে। এখানেই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল পাহাড়ী সন্ন্যাসের এক বন্ধু কিছুদিন আগেকার সঙ্গে।

আমাকে দেখেই কিছুদিন সন্ন্যাসে বলে উঠলেন, আরে দাদা, আপনি এখানে?

সবিস্ময়ে বললাম, আমি কিন্তু এখনো কিছুদিন সন্ন্যাসকে চিনি না। এভাবে অপরিচিত মানুষকে পরিচিতের মত কথা বলতে দেখে অবাক হলাম।

কিছুদিনবাবু এতক্ষণে আপন পরিচয় দিলেন। বললেন, দাদা—আমার বাড়ি থাকতে আপনারা হোটেলে থাকবেন কেন? চলুন, আমার বাড়ি।

বললাম, হোটেলেই ভাল। বেশ নিরিবিলি বসে পড়ার যায়।

কিছুদিনবাবু হেসে বললেন, আমার বাড়িতেও নিরিবিলি বসে পড়বেন।

বললাম, আপনাকে অসুবিধা করাব। এবারে যখন হোটেলে উঠেছি, তখন সেখানেই থাকি। আবার কখন আসব, তখন আপনার বাড়িতেই উঠব।

এর পর আমরা বহুদিন লক্ষ্ণৌ ছিলাম। আমাদের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন কলকাতার শহরে ট্রাম চলত। তার অনেক বছর আগেই শহর থেকে ট্রাম উঠে যায়।

ছোটো বিলে অমৃতসরে, শহর দেখা শেষ করলাম। সরাসরি দিল্লি যাইনি। তাহলে আর দেখাও হত না, এক্কেবারে সরাসরি স্টেশনে এলাম।

এবারে আমার কলকাতার মেজাজ পালা। কতদিন পর বাঙালি এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে আবার সেই পরিচিত শহর কলকাতার ফিরে এলাম।

আমার পুত্র হল পরিচিত নিজের আবহে ফিরেছে নিশ্চিন্তে বোঝা।

আমরা সেই নিশ্চিন্ত, ফিরোজ—আবার সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়ে।

এইভাবে ১৯৩১ সাল শেষ হল—অন্তকালের সমুদ্রে আর একটি বছর লীন হয়ে গেল।

১৯৩২ সাল শুরু হল। আমরা অনুষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানালাম। অনুষ্ঠানী যেন ফিরোজির চলার পথে আমরা ফিরোজির খেলাঘর মুহূর্তেসিদ্ধ নাটকের সম্পত্তি অনন্ত কলাকুশল বিনোদিনোদের পরলোক নাটক 'পুরোহিত' ২৫ আষাঢ় (১০ জুলাই ১৯০২)। কলাকুশল ছিলেন প্রথমত বাঙ্গার পালা লেখক—কিন্তু 'পুরোহিত' নাটক হিসাবে সাধারণী ভাল হয়েছিল, তবু লোকে দেখল না। অনেক সপ্তাহ ধরে চলে-ছিল বেঙ্গল থিয়েটারে সাধারণী। কারণ কি ছিল বলে, কিম্বা অন্য কোন কারণে ঠিক বলা যায় না। অথচ অভিনয়ের দিকটা খারাপ হয় নি। দর্শক এবং সমালোচক সকলেই আমার (অনুষ্ঠানুরোধিত হয়েই হবে)। এবং শ্রেণী সম্বন্ধেও চাতুর্যালার খুব সুখ্যাতি করে-ছিল। অমলা চরিত্রে ছিলেন সরযূ চট্টো-পাধ্যায়, হরিদাসের চট্টোপাধ্যায়, ছবিদাস সরকার, বঙ্কিম বসু, অন্নদাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়, মাখন গোস্বামী, আশুবালবালা, নিরুপমা প্রভৃতি।

এর কিছুদিন পরেই রিপোর্টার টিকিটের হার আমল হল এই রকম। আই আনা, ১০, ৫০, ০৩ স্টেলস—৫০ ও বক্স ১৫০ (৩০ জনের), ৪ জনের ২৫০ এবং ৬ জনের ৩০০। মহিলাদের জন্য—আই আনা, ১০ ও ৫০। ব্যব-স্থায় ১০ প্রবেশ থেকে এই রকম হয়ে চালু হল। এতে দর্শকসংখ্যা অবশ্য বাড়ল, কিন্তু থিয়েটারের আর্থিকাবস্থা ফেল করে। এর আগে কোন নাটক ভাল না লাগলে দর্শকরা ফেরত চেকমারি করতেন না, কিন্তু এখন হল কি কোন কিছু দর্শকদের মনঃপূত না হলে সেই মাসি থেকে সমা-প্রথম অভিনয় (কোন কোন সময় অগ্রিমও) করতে হত—মাঝে-মাঝে হৈ-চৈ যে না হত তা নয়। তবু কোন থিয়েটার অবশ্য টিকিটের দাম বাড়ায় নি।

এর পর মিনার্ভার অর্থনৈতিক অবস্থার ফেরের (ফেরবাবু) সঙ্গে আমার ঈশানকোণ ২৯ আশ্বিন মঞ্চস্থ করে নাটকের অভিনয় হয় বিশেষ সব অভিনেতৃ সমাবেশে। নাটক দুখানি হল 'প্রতাপাদিত্য ও বাঙালী'। 'প্রতাপাদিত্যে' ভূমিকালিপি ছিল। প্রতাপ—নিমাইচন্দ্র, লাহিড়ী, অমল — মুণালকান্তি, অমলেন্দু—আমি, বসন্ত রায়—ভাদুড়ী, সুশীল, সোহিনী বালা—কুসুমকুমারী, সুন্দর—ভূতি ঘোষ, বিজয়া—সরযূ, কমলা—কুসুম বালা, মাধবের—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, যোগিনী বালা—ভূত-আরাকাল, কলাবতী—চারুশীলা, আহেরনী—যেরা বালা বালা, বিন্দুমতী — ফেরবালা। 'বাঙালীতে আমি—সুধবাস, মীর হবালা—ভিখারিনী, ছোট ভিখারী—হরিদাসবাবু, ভোরা —নিরুপমা।

পরবর্তী নতুন নাটক রিলিজ্ড হল সেই বছরটির শেষে—১০ ডিসেম্বর, ১৯৩২। নাটকটি হল 'বিশ্বরূপবাবু'র লেখক যদুনাথের কালকুটের 'সেবাদাসী'। যদুবাবু নামকরা মাইনেদার, তিনি ব্যবসার নাড়ী টিপে বুঝতে পারতেন তারা কি চায়। সুতরাং সেবাদাসীতে তিনি সৌখিন উপাদান দেওয়ার কার্পণ্য তা সময়ে প্রথম করেন। 'সেবাদাসী'র ভূমিকালিপি ছিল—আমি—অক্রোধ, মহাদেবী—সরযূ চট্টো, ঘণ্টাকর্ণ—কুঞ্জবাবু, যদুমর্দন—হরিদাস, চন্দ্রশেখর—সেবাদাসী, আশুবালবালা—পরিচর্যা।

এই বছরটা আমাদের ফিরোজির কি কি ঘটে হলো তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। চরমেছলে হলো সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তেলা (১৭-১-৩২), রিলিজ্ড হয় হল সেবাদাসী। সেরের সঙ্গে হল যাদের খেলা'। তারপর হলো এই ও নাটকার উপেন্দ্রনাথের 'সিন্দুরকৌটা' (২৩-৬-৩২)। সবু সেন ছিলেন অন্যতম। তারপর জুলাই মাসে হলো, অমলার চট্টোপাধ্যায়ের 'অমলা' এবং অক্টোবর মাসে 'রাজশ্রী' রঙ্গমঞ্চের আগেই রঙ্গমহল বন্ধ হয়ে যায়। এর পর রঙ্গমহলের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন শ্রীশিশির মল্লিক ও ধীরেন্দ্রী ভিন্ন হলেও সবু সেন ছিলেন অন্যতম।

'অমর পাখী' নাটকখানি রিহার্সাল আগেই শুরু হয়েছিল, সেখানি প্রথম অভি-নয় করেন 'মহানিশা' প্রথম অভিনয় করেন ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৩—নাটকখানি নির্দেশনা করেছিলেন যোগেশ চৌধুরী।

নাটকখানিকে এ সময় কতকটা নতুনত্বের আলোয় ও নিবেদন চমৎকারী করে নাটকটিকে নিরুপমা দেবীর 'দিদি' চলচ্চিত্র তারপর শরৎচন্দ্রের 'সতীত্বের' ২০ জুন, ১৯৩২ মঞ্চস্থ হয়। এই অপরিচিতি আমি আমার প্রথম ছবির কথা নির্দেশনা করেছিলাম। তারপর অমলার চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার অমলা, (৮-৭-৩২), তার এক মাস পরে হল সুবীর রায়ের 'বিশ্বমন'। অক্টোবর মাস থেকে আমার ডাকুটীয়ার পরে পাকি-স্তানে এখানে এসে আমার জানালেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত নাটক হল 'মহাপ্রস্থান', সত্যেন গুপ্তের লেখা। ২৩ অক্টোবর এই নাটক খোলা হয়। মুখের বিষয় নাটকখানি ভোলন জমেনি, এবং ডাকুটীয়ানাকে আবার এখান থেকে চলে যেতে হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী পরিক্রমা

খুব অল্পোচিত ও সামান্য পরিচিতির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকলা এবং ভাস্কর্যমাধ্যমের ওপরে একটি পরিচয়ের ঘটে গ্রাফিক প্রদর্শনীশিল্পের ৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি আর্কাইভ-গ্যালারিতে তথা-কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদর্শনীর বক্তব্য বলা হয় ভারতীয় ভিন্নধর্মীদের আধুনিক পার্সোনালিটির ভিত্তিভূমির ওপর। ভিত্তি এবং কাঠামোবন্ধনের মেয়েদের ভিন্নধর্মের শিল্পী আজ যে বাঁক অবলম্বন করেছেন তার প্রতিফলন এই প্রদর্শনী এই প্রথমবারের মতো কিছু অংশে দেখা গিয়েছিল।

ফ্রান্সে ভাস্কর্যচর্চার বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতের এবং বিশেষে খুব আধুনিক তাঁর ভাস্কর্যচর্চার প্রদর্শনী হয়েছে। তাঁর মতে ঠিক মত পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে হলে নানাস্থানে সুযোগসুবিধাদের ভারতী প্রদর্শকদীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরূপ না হওয়ার বর্তমানে এর পূর্ণ রূপ দেখার সুযোগ সকলের হয়ে ওঠে না। তবু ভারত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এই ব্যবস্থার প্রশংসাই হচ্ছে এবং সেজন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। নানাস্থানের বিভিন্ন উপাদানের এমিকের ঘরে ঢুকে ভাস্কর কর্মীরা সাজ-পোষাক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক ছবি তুলে এনেছেন। এর মধ্যে চামড়ার-এর উপকরণের ব্যবহার এবং তিনটি নানা রঙের চাল ঘোটার ঘুনা আঁকা চোখকে। অবশ্যই বিভিন্ন উপকরণের ঠিকঠাক সুন্দর-ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক ঘুনা ও একটি ক্যামেরা হাতে নানা ভারতীয় ছবি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রয়োজনীয় কতকের পোশাকের তার বিপরীত স্বরূপ পটভূমি যাতে ইজিপ্তের পোশাকের মানে ভারতের ছবির উদ্ভাস করা হলে। এছাড়া পরিবারের ভারতীয় ধরণ নারী ও পুরুষ, চাষ-আবাদের বিভিন্ন ধরণ, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবিতে ধরা জীবনযাত্রার যে ইকোনোমিক ধরণ পরিবর্তে তার সামান্য পরিবর্তনের দিক ছাড়াও বিশেষত বিভিন্ন উপকরণের মধ্য।

●

আধুনিক ভাস্কর্যচর্চার ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী শিল্পী শ্রীমতী বারবারা হেপওয়ার্থ-এর নাম আজ সর্বজনবিদিত। আধুনিক যুগের ভারতীয় কাজের পথিকৃৎ পরিচয় পরিচয়ের যাঁর এমেরিকা তাঁদের ধরণ তিনি একজন অন্যতম শিল্পী, অন্যতম আধুনিকতা এবং ভাস্কর-ধর্মীদের অভিজ্ঞতার সমাধীনের ধর্ম ধরে তাঁর মতো ধরণ ভারতে ধর্মী বিষয় ভারতীয়ের ধরণ। একটি ধরণ ভাস্কর্যটি প্রদর্শন করে দেখার ইচ্ছা এবং আমাদি হল এমনটির একটি আধুনিক সুযোগ। ধরণ দুটি পরিচয়ের ধর্ম পরিচয়ের ধরণ। প্রথমটি আমি ধরণ হলে, বিভিন্নের সঙ্গে আমার ধরণের ধরণের ধরণ। ধরণ একটি বিভিন্নধর্মীর মধ্যে ধরণের। ধর্মধরণের সঙ্গে দুটির পরিচয়ের ধরণ ধরণের ধরণ। আমার বিভিন্ন পরিচয়ের ধরণ অভিজ্ঞতার বিভিন্নধরণের ধরণ। মন বিভিন্নের একটি সাধারণ আধুনিকের প্রধানটাই প্রধান। ধরণ ৪ থেকে ১১ জানুয়ারী আর্কাইভের ঘরে ছাইন আর্টসে তিনটি ছোট ভাস্কর্য পরিধানি ছবির এবং ধরণ দেখা তিনের ছবির ও ভাস্কর্যের সুন্দর ধরণের প্রদর্শিত হল। তিনটি ছোট ছোটের ভাস্কর্যের ধরণ ধরণ এবং ধরণ ধরণের বিভিন্ন দেখা যেত এবং ছোট পিতলের ধরণের ধরণটির পরিচয়ের ধরণ ধরণীয়। ছবিগুলির ধরণকারী পেন্সিলের ও ধরণের বা পেন্সিল ও ধরণের ধরণ। তাঁর পরিচয়ের ধরণের এবং আধুনিক ধরণের বিভিন্ন ধরণের ধরণ—ধরণের ধরণে ধরণে বিভিন্ন। ভাস্কর্যের ধরণের-এর ধরণে ধরণের ধরণের ধরণ ধরণের ধরণের ধরণ ধরণের ধরণ ধরণের ধরণ

শিল্পী : বারিন গোস্বামী

। তার 'দি ডে বিফোর এন্ড' ফুয়ার্ড টি একমাত্রে উল্লেখযোগ্য।

[illegible] চেয়ারী' হরিদ্বারের মুখো- [illegible] রের ছবির মোজাইক তৈরী করেছেন। [illegible] স্যালভীই একটি পুরোবাহিনী [illegible]। কেন্দ্র লাইব্রেরী ভবনের [illegible] তাঁর পূর্বোক্ত ধরনের পুরোহা-

[illegible] মোজের ৬ খানি ভাস্কর্য [illegible] পরীক্ষার চেয়েরা সুস্পষ্ট ধরিত [illegible] কেন বিশেষ ছাঁচের হাত এই [illegible] তে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। তার [illegible] এবং 'সিটিং ফিগার' দুটি বিভিন্ন [illegible] দুরকম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ-

●

[illegible] ঘোষাতা ভবানেন্দ্র ১৭ থেকে ২৪ [illegible] ী মিলখাপকলের চিত্রকলা পরিষদ [illegible] ভিজান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল [illegible] র যৌথ প্রচেষ্টায় এক সপ্তাহ ধরে [illegible] চিত্রের একটি চমৎকার প্রদর্শনী [illegible] ত হল।

[illegible] পালী উপলক্ষে চিত্রের সংখ্যা বাড়া- [illegible] । পরিচয় উনিশ শতকের রাজস্থানি [illegible] এই নিয়ম এবারে এখানে শতক [illegible] মনে থাকলেও আঠার উনিশ শতকের [illegible] -এ নিদর্শনগুলোকে এবে বিশেষ [illegible] মুখ দিয়েছে। কলকাতার ভারতের [illegible] ঐতিহাসিক ভারিখনামার আশিকদের [illegible] যে ছবি এঁরা সৃষ্টি করেছিলেন [illegible] সেগুলো পাঞ্জাবের ছাপে ইন্দোনেশিয়ান [illegible] -ইন্দোনেশিয়ান, সোভিয়েত প্রভাবিত [illegible]। এই সপ্তাহের ঘোড়ায় সমা- [illegible] । নিয়ে আলোচনারও অবকাশ [illegible] । প্রভাব আজ নয়।

[illegible] শিল্পীর প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল-এর [illegible] ভাস্কর্য ও সাদা চিত্রে এবং ছিত্রো- [illegible] মোজাইকো বাজপাখের পরিচয়টি [illegible] এঁদের অনুসরণে আজ [illegible] কয়েকটি চিত্রে। ছিত্রে- [illegible] এই চিত্রগুলি বহুলাংশে ভাস্কর্য [illegible] এবং শিল্পীর কল্পনাশক্তির [illegible] এক অপূর্ব নিদর্শন। ভাস্কর্যে [illegible] ভবনের কথনো পার্বত্য অঞ্চল [illegible] যা বর্ষাকালের দিনে নদী পার [illegible] ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার অঙ্কে দিয়ে [illegible] নি করা হয়েছে। বেশির আজারার [illegible] এঁদেরকে চেয়েছিল এখানে আজ [illegible] হরিদ্বারী, শিল্পনিকেতন ছবির সঙ্গে [illegible] ছায়া। বিভিন্নের মেয়েতে দিয়ে স্থানে [illegible] শিল্পীর ঐকান্তিক স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী [illegible] ত্র আজার হয়েছেন। ছবির প্রয়োজনে [illegible] পাহাড়-পাহাড় সমতল ঘর ছবি- [illegible] চারুকলার রহস্যের মূলে অবতরণ করতে [illegible] সক্ষম হয়েছে কি। যেমনে [illegible] । যেমন ছিল সেই সেখানে পরিবে- [illegible] ভাস্কর্যের মতিতে ছবিতে অনুকর্ষ [illegible] সৃষ্টি করা হয়েছে আজ- সব [illegible] একটা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের [illegible] শিল্পী সমস্ত [illegible]

তাঁর অন্যতম অবশ্যিবাদ ছবি বোলোসের [illegible] বর্ষা ও এই সিরিজের। আজুর পাঁচ বর্ষার ধারা এবং আকাশের বিভিন্নমুখ আলোর তলনী নিয়ে ছবিতে একটি অপরূপ মুড সৃষ্টি হয়েছে।

●

১৬ থেকে ২০ জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান [illegible] অব আর্ট আন্ড ক্রাফটস্যান্সিপ-এ [illegible] হাল-হারিয়ের বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর [illegible] অনুষ্ঠান হয়ে গেল। চারু ও কারুশিল্পের [illegible] নিদর্শন নিয়ে প্রায় আড়াইশোর কাছাকাছি [illegible] শিল্পবস্তু প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই শিল্পশিক্ষালয়টি বলতে সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের চেয়ে লোকসান ছোট হলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়ে এখনো তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। পুরোন সংস্কারগুলি ভাঙ্গির অনুপ্রেরণায় ছবি ও ভাস্কর্য- গুলি দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই অবস্থার শিল্পচর্চা কি করে সম্ভব। এবারে মাত্র অল্প কয়েক জনের অনেকগুলি ছবির স্থান নির্দেশিত হয়েছে। তেল ও জিঙ্কোগ্রাফি- গুলোর অধিকাংশ ছবি দেখে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের 'ফ্লাওয়ার' বিভাগ ভাস্কর্যের প্রভাবান্বিত। পুরোনো শিল্প- পাত্রের স্কেচ দি বুক টপ এবং 'ইমেজেস' লাইট লাগ হয়নি। এঁর একটি জল রং-এর স্টিল লাইফও উল্লেখযোগ্য। নিসর্গদৃশ্য ও স্টিল লাইফের দিকেও এবারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ চোখে পড়ল না। মুর্তি-এর মধ্যে কয়েকটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য নয়। তবুও বিশেষ শিল্পবস্তুর এবং সোভিয়েতের পাশের [illegible] ইন্ডিয়ান ভাস্কর্য ছাড়া বিভাগে বিভাগে উল্লেখযোগ্য কাজ। ভাস্কর্য বিভাগের দুটি কারণে আরো দুটি পোর্ট্রেটই প্রধানতই কাজ। কমার্শিয়াল বিভাগে [illegible]

কর.র, ফোলকার এ ধরনের কাজগুলি আরো ভালো। ধনরাজ ভগতের টি বি পোর্ট্রেট আরো ধারালো হলে ভালো হত। ফটো ও মডেলের বুক ও মডেলের মুখোর্জির 'ফিঙ্ক' বোর্ড বুকের পোর্ট্রেটগুলি ভালো হয়নি। তবুও ভাস্কর্যের বুক কভার উল্লেখযোগ্য। দু-একটি ফেব্রিক কভার ছাড়া মোটামুটিভাবে এই বিভাগের কাজও এবারে বিশেষ উন্নতি চোখে পড়ল না। আশা করি আগামীবারে এঁরা নতুন কিছু উপস্থিত করতে পারবেন।

●

ছবি আঁকার ক্লাস আমাদের দেশে [illegible] হলেও কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে চিত্রশিল্পের ক্লাস উপযোগী বইয়ের একান্ত অভাব। বিদেশে কিন্তু এধরনের প্রকাশন প্রায় পাঠ্যের হয়ে থাকে এবং হচ্ছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের [illegible] বুক সমস্ত যে বস্তু আছে তাদের অনেক সময় ছবি-এর বুক বিষয় নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা থাকে না। অথচ মত ছবি করার দিকেই ঝোঁক বেশী জোর দেওয়া হয়। এছাড়া যারা সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়ে ছবি শিখতে চান তাঁরাও অনেক সময় ভালো বই-এর অভাব বোধ করেন। এই সব দিক চিন্তা করে শিল্পী প্রকাশ করকার বুক অফ সিরিজ নাম দিয়ে ছবি আঁকার মূল তত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি সুন্দর বই বার করেছেন যা স্কুলের ছাত্র এবং পরিচয় করেন শিক্ষার্থী এঁদের সকলেরই কাজে আসবে। বিভিন্ন রেখার গুণাগুণ ছবির কম্পোজিশন নানা কালের ভারতীয় ইত্যাদি নানা বিষয় পরিষ্কার প্রকাশ সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। আর সবশেষেই শিক্ষার্থীর যৌলিক সৃজন- ধর্মী কাজের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্যে এবং বিদেশে শিল্পশিক্ষা ক্রমের পর শিল্পী প্রকাশ করকার যে জনশিক্ষার দিকে নজর দিয়েছেন এটি প্রশংসনীয়।

—চিত্রদর্শিক

সাড়ে সাতাশি গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঘড়ির ছোটোশি কাঁটাটা যখন সাতের ঘরে নামল টিয়া। এখনো ঘুমের রঙ্গভঙ্গ যায় নি। পিছু-বারান্দায় পুকুরঘাটে কোনের জোড়া তালগাছের মিঠে মিঠে আসার সময় হঠাৎ অকুমির বাচ্চাদুটোর এমন হাঁ-হাঁ ঘুমে দিল যে, টিয়ার ঘুমটা বড়মড় করে উঠে গেল। ছোটোপিসের ঠাকুমা বলত, ওই তালগাছে পেত্নীরা থাকে, রোজ সকালবেলা ঘুমোয়। পেত্নী না হাই। মনে মনে মাদের ঘুমানার ঢেউটা করে টিয়া হন্দ-হন্দ করে বাটনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। বর্ষার জল নেমে গেছে কবেই হন্দা। এখনো চারদিক সোনা-সোনা, গন্ধ। সাজ মাঠ ঘুমে ঘুমে ঘুমোয় ঈষৎ হেসে সবুজ ঘাসের হাজার হাজার ফড়িংকুল। ঘুমঘুমো চোখে ভারি সুখ। মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে হয়ে পড়ে ঘরে একটা ঘুম ছিটিয়ে দিল টিয়া। কুয়াশা ঘাসকে নরম করেছে। পায়ের পাতা ভিজে ভিজে যাচ্ছে। টিয়ার হাঁটার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

ছোটোপিসের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে পুটির ঘরের জানলায় এসে দাঁড়াল টিয়া। চাঁদ ডুবে গেছে। ঘুমে ঈষৎ কালো ঘরে নরম করেছে। কেউ জাগে নি। চারদিকে সোনতা। দূরে গোয়াল থেকে মোষেদুটোর জাবর কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। চুপ্ করে এক ফোঁটা শিশির টিয়ার কপালে পড়ল। একটু মাথা ফিরিয়ে ওপর দিকে চেয়ে দেখল, পদ্মগাছটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে। মৃদু বাতাস দিচ্ছে। হিমেল বাতাস। পদ্মের গন্ধমাখা বাতাসটা টিয়ার বড়ো ভালো লাগছিল। নৈবেদ্য সাজিয়ে ঠাকুর দেবতার পুজো করার সময় ঠাকুরঘরে যেমন ধূপ ওঠে, তেমনি অনেকটা। খড়খড়ি তুলে ফিসফিসিয়ে ডাকল টিয়া, 'এই পুটি—পুটি।' সাড়া পেয়ে জানলাদিয়ে হাত বাড়িয়ে পুটি পায়ে ঠেলা দিল, 'ওঠ, ওঠ।'

'উঁ।' পুটির সাড়া পাওয়া গেল।

'ওঠ, ওঠ। ঢঙ্কুমাম দেখাব না। ঘরে ফেল যে।' টিয়া তাড়া দেয়।

এবারে পুটির ফিসফিসানি আওয়াজ শোনা যায়, 'যাচ্ছি, আসছি।'

একটু বাদেই দরজা ঠিক করে খুলে বেরিয়ে এল পুটি। সকাল চুল

নালার ওপারের মাঠটা পেরিয়ে দুজনে দুটো সবুজ কলা। তখনও ভোর হয় নি। পুবে আকাশে সবে আলোর ছিটে আভা দেখা দিয়েছে। পাখিরা বাসা ছেড়ে একে-একে আকাশে উড়ছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দুজনে এসে চণ্ডী-মণ্ডপের বাইরের বাঁধানো রোয়াক ঘিরে দাঁড়াল।

একটা উঁচু টুলের ওপর দুটো ঘেঁষে কচে আদুলটা অলসভাবে প্রতিমার পালে ঠেকিয়ে তিন আদুলে সরু তুলিটা ধরে চক্ষুদান করছে হরিপদ। অন্ধকারে ঘরিয়ে কাজে বড়। চোখের উজ্জ্বল করানো নাকের হাঁড়িকুড়ি। চালচুলো পাশে রয়েছে নকুল ছোলার ডালের পাঁচমিশালি মুড়ি দিয়ে পুরে চিবোচ্ছে। দুই খুড়ো নারকেলের দাঁড় পেয়ে প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে দিয়েছে একটা তুমুল, যাতে অসুর চক্ষুদান দেখতে না পায়। একটা বড়ো তুলি ধরে দাঁড়িয়ে আছে হরিপদর বাবা। অন্ধ-বিশ্বা হলিল না কিছুই। পাটলা আসর জেঁকে বসে সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

দুআনাদের চক্ষুদান দেখছে দুজনে। নিখিল বলে হরিপদ হু একে চলেছে।

ওদের আসার আগেই আলিবাড়ির একটা মেয়ে এসে গেছে। ইস্কুল পড়া। আলো-না। কী জেন নাম মেয়েটার। টিয়া একটু ভেবেও মনে করতে পারল না। খুকের ওপর আড়া-আড়ি-ভাবে হাত রেখে বড়ো বড়ো চোখ করে সেও চক্ষুদান দেখছে।

পুঁটি হঠাৎ বলে উঠল, সবাই চোখ দেখা যাচ্ছে; কাপড় লটকানোর কী দরকার ছিল?

টিয়া ফিক করে হেসে ফেলল। একজন দেখে চলেছে ধীরে ধীরে প্রতিমার প্রাণ ফুটে উঠছে।

একটু বাদে পুঁটি আবার বলল, এই শীত-শীত করছে।

'হুঁ' বলে মেয়েদের মাঝখান চেরে নিল টিয়া ধীরে ধীরে গলাটা জড়াতে জড়াতে বলল, 'আচ্ছা, কী সুন্দর পুজো-পুজো গন্ধ! আর বাবা বলল পুজো। তবে নিজের শাড়ির আঁচলটা পুঁটির গায় দিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে কাছে টেনে বলল, এবার গরম লাগছে তো?' পুঁটি ঘাড় নেড়ে মুখে কথা বলে শুধু বলল, হুঁ—।'

ভোরের আলো ক্রমে চারদিকে ছেয়ে যাচ্ছে। হরিপদর তুলির টানে ফুটে উঠছে একটু একটু করে প্রতিমার প্রাণ আদুলে। ভোরের আলোয় আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিমার মুখে। টিয়ার মনে হচ্ছিল, মা হাসছেন।

টিয়ার মুখোমুখি দাঁড়ানো চালে পুঁটির গলার স্বরও ফুটে উঠেছে। বেশ ভালো লাগছিল পুঁটিকে। টিয়ার শরীরে একটু চাপ দিয়ে ওর ঘনো কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে পুঁটি বলল, তুই না ডা-রি মিথ্যে।

'কই।' মুখটুকিয়ে টিয়ার চোখে জল এসে গেল।

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিয়ার একটা কথা মনে পড়ল। মেয়েকে মেয়েরা। সবাই মা-দুর্গার উদ্দেশে প্রণাম করছে। ঠাকুমা বলল, আই শিল, মার কাছে মনের কথা কহ, বর চাইয়া লে। টিয়া কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে চোখ বুজে বলল, মা-দুগ্গা, আমার যেন সুন্দর বর হয়। ওকথা আশেপাশের সবাই শুনিয়ে কথা শুনে হেসে উঠল। ঠাকুমা বাড়ি এসে চাকে বলল, ও বৌমা, মেয়ের মেরা আইজ কী কয়ছে জানো? বলে টিয়ার অবোধ-আবো বোল অক্ষরেক্ষরে কথাটা শোনাল। মা হাসতে হাসতে চলে গেল। বাবা দলেতে টিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তা দোবী-মার আমার একটা টুকটুকে বর না হলে চলবে কেন মা? একটু বড়ো হওয়ার পর ঠাকুমা কখন মনের মাঝে কথাটা গুনে ফিরিয়ে নিয়ে টিয়া একটু ফাঁদিয়ে বলে দেখিয়ে বলল, যেন। তুমি যেন কী?

প্রতিমার চক্ষুদান এক-এক করে অনেকেই এসে গেছে ইতিমধ্যে।

টিয়া পুঁটির গলা জড়িয়ে বলল, 'এই টিয়া, কী ভাবছিস?'

'এবার সাবিত্রী পিসির ঘরে খুকেরেই দেখল ডাক্তার-কাকা, মাস্টারমশাই এদের দুজনকে বসে থাকতে দেখে সন্দেহ টিয়ার মন সরল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি গায়ের আঁচলটা ঝাড়িয়ে গায়েকোমর ভরে ওদের দিকে মোড়তে শুরু করল।

'এই টিয়া, শোন, আমি যাব।' একচালানো ভাবটা আটিয়ে কথাটা বলতে পুঁটির সময় লাগল।

টিয়া ততক্ষণে মাঠের মাঝখানে। দৌড়তে দৌড়তে পেছু না ঘুরিয়েই টিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'বিকেলে বাড়ি যাস, চালতের আচার খাওয়াব।'

টিয়ার পায়ের চালে এবার ঘাস দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। লাল, কেমনে ঘাসফুল-গুলো দুয়ে দুয়ে আবার মাথা তুলছিল। শেষাশেষি ঘোড়া পড়েছে শিশির। ভিজেছে। একজন ঘন আসছে ঘুম। সাবিত্রী কাকার কাছে এসে শাড়িটা আঁচলটাটা পরে নিল সে। সারাই ওপর কয়েক ফোঁটা শাড়ি। ঘাসের সাবেকটা ধরে ঘরে পার হচ্ছে টিয়া। নিচু ধানের জমে জল জমা পড়েছে। আলে এ সময় বেশি জল থাকে না। আগুনা আর জল না থাকলে মাটি দেখা যেত। টিয়ার মনে পড়ছে-ছোলার বেশি হয়। কিন্তু অনেক দেরি। শীতের রোদটা উঠলে ভালো হয়। কয়েক ফোঁটা শিশির টোখ টিয়া ঘুছে। ভালো লাগছে। নতুন ঘাসের মতো ঘুমের ঘর। পুজো-প্রতিমার মতো ঘুমের আলস। ওর বাবা-মার দেরি নয় রাখাটা সাটিয়ে মার্বেল। সাঁকো পেরিয়ে কায়েতপাড়ির বাসন এসে একসঙ্গে করে ঘরের একর মনে পড়ল টিয়া। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। মন নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। বুকে ওঠানামা করছে। বিকেলে আদুলের সাঁড় থেকে ডোবাকাঁটা তুলতে তুলতে মন-মন আওয়াজ শুনে মুখ তুলে দেখল, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে দিয়ে একটা খরগোশ জাতীয়কোলি ভোঁদড়গোছের পুঁটি বেগে চলতে করে কিছুটা উঠে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে টিয়াকে একবার দেখল। মুখ-ভরা ভীষণ ভয়ে ভয়ে একবার উঁকি মেরেই ঢুকিয়ে গেল। টিয়ার অনায়ত্ত ঘুটো পায়ে আলতা লেগে গেছে। আলতাটা বেশ মিহিন। পায়ে-পায়ে সাদিকের অনেক জমে গেছে। চিক্-চিক্ চিক্-চিক্ শব্দে পাতার আড়ালে একটা বনমোরগী পাখি ডেকে উঠেছে, 'কুকি-কু।' টিয়ার কাছে মনে হয়, পাখিটা বলে, 'কুকি হ।' অনেক-দিন বনমোরগী পাখি দেখার ইচ্ছে টিয়ার। অনেক সুন্দর পাখি বনমোরগী। সবাইকে হলদে আর কালোর ছোপ। ডাক শুনেছে লাল। লাল ঝুঁটি। কেন মনে হয়েছে সুখ হয়েছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জায়গাটা আকাশের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, জলে, টিয়ার গায়। শীতের জল কাচ-চক্ষু করেছে। পুকুরের কোণটায় অনেক জলপদ্ম। ঘুমন্তটা গোল পদ্মপাতা ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। একটা বড়ো পাতার ওপর বড়পুটোর একটা বাসা, জামাকাপড়ের বাসা। হঠাৎ খেয়াল হল, টিয়ার সামনে দিয়ে একটা প্রজাপতি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওমা কী সুন্দর প্রজাপতি! টিয়া সন্তর্পণে করে প্রজাপতিটাকে ধরতে ছোটা করল। পারছে না। প্রজাপতিটা মুহূর্তের হয়ে কোথাও বসছে না। প্রজাপতি নাচে নিয়ে বেড়ায়। টিয়া কলমির বিছন ভাঙার ওপরে দেখছে লেখা আছে প্রজাপতির বন্ধ। প্রজাপতিটা ধরার জন্য টিয়ার ঘোর ভেঙে গেল। টিয়ে-ইড় জলের ওপর একটা পদ্মপাতার ওপর দিয়ে বসল প্রজাপতিটা। সাহসে মেটার পাখনা দুটো বিরামের ভর নড়ছে। জলে ছায়া পড়েছে। ছায়া পাত থেকে মেয়ে মেয়ে পড়ল ঘন। টিয়া ঘুড়ো করে এক-মেলা ঘাস ঘরে সন্তর্পণে জলে নামল। এঁটেল মাটি। পা ডুবছে ঘরে। একটা মাটির ডেলা ছেড়ে পুকুরে পড়ল। জল ঘোলা হল। প্রজাপতিটা উড়ছে। একটু ওপরে উড়ে উড়ে কলমিটে ওপর আবার বসল। ছোটো ঘোলা জলে ডুবতে ডুবতে এক সময় মিলিয়ে গেল। টিয়া কাঁদি পড়িয়েছে অনেকটা। মাটির কাছে জল ঘুই-ঘুই করছে। একটু ঘুরি-না ঘুরেছে। আর একটু এগোলেই প্রজাপতিটা নাগাল পাওয়া যায়। আদুল দুই-তিন দূরে। প্রজাপতিটা কিন্তু অনেক শান্ত হয়ে বসে আছে। আর একটু,—আর একটু,—এই নাগাল পেল বলে। পট্-পট্ করে ঘাস ছিঁড়ে কলাপ করে জলে পড়ে গেল টিয়া। প্রজাপতিটা উড়ে পালাল।

কবিরাজ সুরেন বিশ্বাসের

চুলিজল

চুলির অব্যর্থ ঔষধ

হাবরা ড্রাগ কর্পোরেশন

২৩৯১ আলবার্ট রোড, চন্দ্র রোড।

সন্ধ্যাপায়ে ছোট্ট বন্ধুর বাসা থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটা চানাচারওয়ালা বেরিয়ে উড়তে উড়তে গায়েও আড়াল হারিয়ে গেল। সন্ধ্যা ঠায় ফেলে বিছানাতে জলপোকা-গুলো ঘুরে পালাল। টি-টি চীৎকার জুড়ে গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ল বিদ্যুৎগতিতে।

অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ফিরে তাকায় টিয়া। রবিশেখরের ছেলে লাটু। পড়ছে বসে পড়ছে। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছে। টিয়ার থেকে বয়স তিনেকের বড়ো। ছোটমাই ছোয়া দেখি রেখা রেখা বিয়ের পরে। যা থেকে মামা ডাকছে বড়ো। মামা না আছে। টিয়া ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। ভীষণ হিংসুটে। মেয়েদের সিঙ্গলে খালি ফ্রেঞ্চ-চীফ করে বেড়ায়।

টিয়া কোমরগুলে দাঁড়িয়ে। দাঁড়ি-চুলটুল আঁচড়ানোটা হয়ে শরীরের খাঁজে-খাঁজে সেঁটে গেছে। চুল বেয়ে টপ্-টপ্ করে জল ঝরছে। অন্ধকারে চোখে লাটুকে এক দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পিছি ডাকল টিয়া।

কুনো-উঠে আসা, 'আমরা যোগাযোগ।'

লাটু আলো-আঁধারের মতো মুখ করে বলল, 'বাবা আমি কী করলাম। আঃ, আমি এর, তুমরা নিছি।' বলে লাটু এক হাতে একটা গামছার দিকে হাত বাড়াল। অন্ধকারটা টিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা টিয়া একটা হাত বাড়িয়ে দিল। টিয়ার মতো মুখের মেয়েকে হাসতে দেখলে লাটু একেবারে গলে যায়। লাটুর হাতের চাপে টিয়ার আঙুলের আংটিটা বুঝি আরও ছোট হয়ে বসে যাচ্ছে। খেয়ে এক হাঁচকা টানে ওকে তুলে ফেলল লাটু।

'উঃ! ছাড়ো।' অন্ধকারে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলে টিয়া।

'মা মা-মা, ভালো করতে গিয়ে উল্টো ফল।' লাটু ভালো বন্ধুদের মতো বলে ওঠে।

'আমি।' টিয়া জিভ কেটে ছুটে নিল।

লাটু পিছন পিছন আসতে আসতে, 'টিয়া শোন, টিয়া—।'

হাওড়া কুষ্ঠ কুটির

[illegible] [illegible] [illegible] [

ওরে অলকার! যাবে—তবেই তখন ছোটা দিতে পারবে। খোকন বিশ্বি করা। ও তখন রাঙা মুখে লুটো -আঁচলে চোখ মেলে টিয়াকে বলল, আমার একটা বুদ্ধি কিন্তু দিবি। টিয়া কথা পারে না। ঘরটা মুখা খোকনের ন পরল আসছে। অলকারা ওপরের টিয়া খোকনকে সব দিয়ে যাবে।

খান মেয়ে ছোটা বুদ্ধির বুদ্ধি পরে বি গায় দিয়ে খোকন এসে চুপটি করে ওরে বলল। টিয়া বিয়ের চলীন অনেকের মতে বলে, 'এই তো হয়ে গেছে। একটু লক্ষ্মী হাইটে।'

বাইরে মা ছেকে বললেন, 'টিয়া, তাড়াতি ছোটা দিয়ে একবার বাড়ি আ।' একটে গলায় সব মাখিয়ে মেয়ে মনে মনেই বলল, উনি সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন কী যে হলো।'

টিয়া জবাব দিল, 'এই হয়ে গেছে মা।' খোকনের দিকে মুখঝামটে একটু চেয়ে টিয়া। ছাঁট-পাকানিতে খোকনকে ও ভালো লাগে ওর। ঘরের এই একমাত্রই ।। ভাইফোটা হয়ে গেলেই আবার যাবে ন যাবে।

'বহুনা মেয়ে মুখের ছোটা, আমি সেই মার ভাইয়েরে ছোটা'—বলে খোকনের হাতে ছোটা দিতে দিতে টিয়ার দু চোখ ন ভরে এলো। কান্নায় ওর কণ্ঠ রুদ্ধ এলো। বাকি কথাগুলো স্পষ্ট করে হে পারছে না। একটু সামলে নিয়ে ও কথা শেষ করল।

'খাইনে, এক গ্লাস জল খ.ও দেখি।' রে টিয়ার কান্নার সাড়া পাওয়া গেল। ন একটা মিষ্টি হাতে নিয়ে ছুটে রে কাছে চলে গেল। ওদিকে একটু ভনায় ঘরে রেখে টিয়াও ধীরে ধীরে ।য়ায় এসে দাঁড়াল। দেখল, মাও দাঁড়িয়ে, ন্যাও।

এক নিশ্বাসে জল খেয়ে জলের গ্লাসটা । হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে টিয়ার কথা বলল, না কোনো সম্ভাবনা নেই। পাসপোর্ট ওয়া যাবে না। এদিকে দিনও তো বেশি ই। ওদিকের কোনোকাটা পাঁচুই ঘরে ন্যেছে, সেজন্যে ভাবনা নেই। সময় মতো ীছুতে হবে তো। পাত্রপক্ষ আর দিন ছাতে নারাজ। কী যে করি।' বলে টিয়ার া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা ধীরে ধীরে বলল, 'ও-পাড়ার অনেকে ছিল, বর্ডার দিয়ে অনেকেই না কি ক্রকাল যাচ্ছে। ওদের কিন্তু নেই। বাবা বলে সে মাকি লোক ধরে দিতে পারে।'

'হুঁ। তাহাড়া তো আর কোনোও পথও খছি না।' মায়ের গলা গম্ভীর। মুখ ন্তাম্বিত।

'কোন্ অফাইসার মিনুদা যে আপটারে ন করছিল, তারে পাইলে অবশ্য চিনাইয়া ই।' বলে টিয়ার মা অনেক কথার কথার ফুরসুরে দিয়ে ফেলল।

টিয়ার বুঝতে অসুবিধা হলো না, মা ধরেই ফেলেছে।

শেষ পর্যন্ত অলকার সাহায্যই নিতে হল। ট্রেনে এসেছে আখাউড়া। ওরা এখন চলেছে বিকরনে। সেখান থেকে বর্ডার আধঘণ্টার পথ। বিকরন ছাড়া অন্য কোনো নাম নেই। অলকা মনে মনে হিসেবটা করে নিচ্ছিল, সে যাচ্ছে আসলে কিসের।

বিকরন ছোট্ট স্টেশন। সুনসান। শুধু ছেঁড়া জাল ছেঁড়া। সূর্য ডুবে গেছে। আলোর আভাটা মাই-মাই করছে। পশ্চিমে ঘাঁটি ঘাঁটি আঁধার নিজের চেহারা দেখাচ্ছে। আশপাশ অন্ধকার নেমে এলো। উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে। শীত-শীত করছে। টিয়া ব্যাগ থেকে শালটা বের করে গায় জড়িয়ে নিল। ঠান্ডুরার শাল। অলকাদিদির পছন্দের শাল। কিন্তু এখনো ভালো আছে। পরে শীতে কষ্টে পাবে বলে ঠান্ডুরা শালটা টিয়াকে দিয়ে বলেছে, তিনি হোস বিয়াটা দেখার মতো সাধ ছিল। কিন্তু.....। বলে বৃষ্টি একবার চোখ মুছল কাপড়ের খুটে। তারপর বলল, এই শালটা নিলাম, তোর বিয়ের যৌতুক। বলে বৃষ্টি হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু তা হাসি না কান্না বোঝা গেল না। খোকনটাও শিশু-শিশু অনেকক্ষণ এসেছিল, পুটি তোর ঘরে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে আর শিশু হাকোতে হাকোতে ও ঘিয়ে গেছে। পুটি কোনো কথা বলতে পারে নি। শুধু নীরবে টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলকাও এসেছিল। ভেবার আগে শুধু একবার বলেছিল, টিয়া যাই।

টিয়া ফোসফোসিয়ে বলল, মার আর ভাই থেকে চিকানা নিয়ে চিঠি দিস।

টিয়াদের বিকনা তখন পাকা সড়ক ধরে মাটির এবড়ো-খেবড়ো পথ ভাঙতে দিয়ে চলেছে। মাঠে মাঠে কুয়াশা নেমেছে। কুয়াশার পর যেদিকে দেখা যায় না। কোথাও মানুষের সাড়া নেই। শুধু ঝিঁঝির একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। অজানা-অচেনা আশঙ্কা। টিয়ার ভেতরে আদি ভয়-ভয় করছিল।

বিকনা এসে থামল একটা কুয়াশের সামনে। ছাঁড়েকাড়িটা খোপকাড়ে ঢাকা, হঠাৎ দেখা যায় না। সামনের বিকনা থেকে লোকটা নেমে হাঁক দিল, আছির মা, ও আছির মা।'

একটু বাদে কুপির হাতে এক মুসলমান বউ এগিয়ে এলো। তার পেছনে সরু লাড়ি। হাতে মুখের হাইমায় ঢাকা কুড়ি। গায়ে চাদর একটা আছে, তবে তার যে কী ঙ বোঝা মুস্কিল। কাছে এসে বলল, 'আবে ছবর দিয়া যে।'

বোঝা গেল টিয়াদের যে নিয়ে এসেছে তার নাম ছবর। সে বলল, 'হু, লোক আছে। ঘরে নিয়া বসাও। বাইরে আসুছে। সর্বনাশ। বলে ছবর মতির হাত ধরে একটা লম টাকার নোট দিতে দিতে বলল, 'আগে বুড়ি-টুড়ি আইনা দিও।'

লোকটি এবারে টিয়ার কাছের সামনে এসে বলল, 'কম দিয়ে দিয়া বলেন। আমি যাত্রাগাড়ির পাঠানোর কারবার করিয়া আসি। বড়ন ওদুলো।'

বাবা একবার টিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তারপর মেয়েটার হাতে পয়সার পুটলিটা দিতে দিতে বলল, 'যাওয়ার যেন—'।

'ভয় নাই, ওপারে 'পরাই পাইবেন। পক্ষা লইয়া ফেরে যাতাই এইখানে দাঁড়াইয়া থাকেন' বলতে বলতে টিয়ার হাতের ঘড়ে থেকে দ্রুত একখানা ছিনিয়েই পুটলিটা হাতে নেয় সে। 'ঘড়ি যা এখো ঘরে নিয়া বসাও। আমি সন্ধ্যার ভরে ফিরমু আবু।' বলে সে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মতিরমা বলল, 'আইজান।' মেয়ে ফেরে জবরে বলল, 'হজরতীর সঙ্গে আইজা জায়গা ভরেন নাই।'

বাবা ফ্রেমে ঘড়ির ঘর দিকে তাকাল। 'ঘন্টা?'

মতিরমা স্বরে মুখে বলল, 'ছা, এগারটি বাজিছিলাম।' মতিরমা যা বেশ কী একটা ভেবে নেয়।

ঘরে এসে বসাল ওদের মতির মা। ঘরে আলোর সমারোহ। ছাঁড়েকুড়িই বোঝা যায়। লাকিয়া চাহেই বোঝা যায়। ঘরে ঘরটা যেন পরিচ্ছন্ন, ঝিমঝম।

মতিরমা টিয়াদের বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে ভালোমন্দ মুড়ি আর পাটালি নিয়ে এলো। বলল, 'খান ঘরে ঘর কিছু নাই, নিয়ে আসলাম মা।' তারপর টিয়ার দিকে তাকে বলল, 'খাও, মা।'

ছাঁড়েকার কথায় এমন একটা স্নেহের সুরে ছিল যা শুনে টিয়ার বুক অনেকটা হুহু হল। কিন্তু কেঁদেছিল ঘরে। সেই কথা ভেবেছে। টিয়া একটু পাটালি ভেঙে নিল। মুড়ি তুলে নিল মুঠো ভরে।

মতিরমা একটু চুপ করে থেকে বলল, মাইকারে মাইয়া এখানে যাইয়াছেন। কিয়া নিবেন মুড়ি?'

টিয়ার মাথা আধা নড়ল, হাঁ।

মতিরমা বলল, 'আর চাইর ঘ পরে নেকার সিটিবে। আপনারা এট্টু বসেন, আমি ছাটো কাটাইয়া আসি।' বলে মতির মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়ল। বাইরে কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। বুকের আরাম সমস্ত শোষিয়ে নেয় অনেকক্ষণ। টিয়ার বাবার মুখে পুটলিভরা হাসি আজ হল। টিয়ার মুখে শুকনো। ভয়ে ভিতরটা গুরু গুরু করছে।

মতিরমা ঘরে ঢুকে বলল, আমার নাই হেন, কিরম যা জানবার। তাই কইছিলাম

মাইটি লাগল মিনি-করা আল ওয়ার্ল্ড স্টান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেড)। ওয়েল স্পীকার ৫ ব্যান্ড ৮ ইন্টারন্যাশনাল ১০ টাকার মাসিক কিস্তিতে লাভ করুন। দাম ৪৩০৲ টাকা। ইন্ডেন্টে আপনার অর্ডার পাঠান।

Allied Trading Agencies

(I.P.E. No. 3121. Delhi-7.

জলের সঙ্গে আইসক্রিম ভালো করেন নাই।' রজনী যে কত লোকের সর্বনাশ করছে তের ঠিক নাই।' একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'এখন হওনা না হইলে তো যাইতে পারবেন না।'

বাড়ির মন কথার টিয়ার বাবা মাথা তুলে তাকাল। তখন পরে কীভাবে কেন হবে আমরা তো কিছুই জানি না না। পরনার কথা আর ভাবীছনে—শরীরিমিশ্বাস কেলতে কেলতে বলল, টিয়ার মার বড়ো সাধের পরনা সব টিয়ার বিয়ার জন্য একটা একটা করে পড়িয়েছে। তবে না হবার তাহলে হয়েছেই। এখন তাহলার তাদের কর্তব্য পথ হতে পারলেই হয়। চার হাত এক করতে পারলে বাঁচি।'

বাড়িওয়া বলল, 'ওই সামনের ফোকাট পার হইলেই একটা মাটির রাস্তা পাইবেন। ওই পথটা ধইরা উত্তরমুখী কিছুটা গেলেই একটা নালা দেখবেন। নালার ওপর বাঁশের সাঁকো আছে। সাঁকোটা পার হলেই হিজলখান। তবে এই দেইখা-শুইনা যাইবেন। ঝিলিকটার আছে।

টিয়ার বাবা উঠতে উঠতে বলল, 'যা হলে আর দেরী করব না।'

টিয়াও উঠল পিছু-পিছু।

বাড়িওয়া কুপি হাতে কিছুটা পথ এলো ওদের সঙ্গে। তারপর বিদায় নিয়ে বলল, 'আরও থাওনের ইচ্ছা আছিল, যা খালি পইরা গইছে। আমি যাই।'

টিয়া মুখ তুলে বাড়িওয়ার দিকে তাকাল। তার মুখোশ দিয়ে এই অশিক্ষিত সাধারণ মানুষটার চোখ দুটি চলে, কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছিল। যেন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এমনিভাবে বলল, 'যাই।'

বাড়িওয়া টিয়ার চিবুক ছুঁয়ে বলল, 'যাইও না। মোরাদী পুত্ত নিয়া সুখী হও।'

ফেরার ওপর দিয়ে হাঁটতে দিয়ে টিয়া বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। পায়ে পায়ে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। ফেরে ভর্তি ঘড়ো ঘড়ো মাটির ঢেলা। টিয়ার নিশ্বাস ঘন হয়ে পড়ছে। শরীরে মাথেও ঘাম কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিয়েছে। পিছন ফিরে তাকাল টিয়া। দেখা যাচ্ছে কুয়াশা। বাড়ির ধার কুপির আলো আর দেখা যায় না।

এতক্ষণে ওরা রাস্তায় পড়ল। টিয়ার বাবা একটু দাঁড়াল। কেন্দ্র দিকে এদুবে ঠিক করে নিয়ে বলল, 'যা চালিয়ে চল্। চারদিকে সজাগ থাকিস।'

রাস্তা ধরে হন হন করে হাঁটছে টিয়া আর টিয়ার বাবা। হাঁটার খস্ খস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কুয়াশা এত ঘন হয়ে পড়েছে যে, যেলিপুর দেখা যায় না। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকতে ওরা হাঁটছিল। টিয়ার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। হঠাৎ একটু দূরেই একটা সাঁকো নজরে এলো ওদের। টিয়ার বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টিয়াও। বাড়ির মার কথানুযায়ী সাঁকোর অবস্থানটা বোধ হয় একমনে মিলিয়ে নিল টিয়ার বাবা। তারপর নিশ্চিন্ত হল, এই সাঁকোটাই খাঁড়ির কালোর খোলসেতু। টিয়ার বাবা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওই সাঁকো পেরুলেই হাঁসুয়া।'

সাঁকোর কাছে এসে থমকাল। দাঁড়াল একটু। রাস্তার ডানে নেমে কয়েক হাত গেলেই সাঁকোটা। সাঁকো মানে, নালার ওপর বাঁশের ফাটা বুকে একটা সুপারি গাছ ফেলে দিয়েছে। নালায় জল আছে কি নেই বোঝা যায় না।

অনেক ভেবে ভেবেও এপার-ওপারের তফাৎটা বুঝে উঠতে পারছিল না টিয়া। সাঁকোর এপার ওপারের বাড়িঘর, গাছপালা, মাটি সবই তো এক। তবু সাঁকোর এপার এক দেশ, ওপার আর এক দেশ। ভাবতেও টিয়ার অবাক লাগে। আর এই ছোট্ট সাঁকোটা পেরোলেই এত হাঙ্গামা। টিয়া ভাবছিল, আর অল্পক মিনিট বললেই তো সে ইপ্সিতের পৌঁছবে। সাধ মাজবে। টিয়া শুনেছে সাধি ওদের দেশের মতো বাজনা বাজিয়ে বিয়ে হয় না। সাধ মাজিয়ে হয়। ছোট্ট টিয়ার সেবিনের কথাটা কী সুন্দর ভাবে মনে সুন্দর ঘর—বুদ্ধি যা খুশী ভেবেছেন নি। টিয়ার অধিকাংশ পূর্ণ হতে চলেছে। আর তো মাত্র একটা দিন। ভাবতে ভাবতে টিয়ার মনে এক অনাবিল খুশির জোয়ার বইতে থাকে।

টিয়ার একটা হাত ধরে রাস্তার ঢালে পা বাড়িয়ে দিয়ে টিয়ার বাবা বলল, 'আয়।'

সেই মুহূর্তে এক ঝলক জোয়ালো উত্তর আলো এসে পড়ল ওদের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে মুকোর এলো—'ধরটে।'

টিয়ার বুকটা ধড়াস করে উঠল। টিয়ার বাবার হাত ফেলে উঠল। শিথিল হয়ে গেল তার মুঠি।

সাঁকোটা বুঝি আগলে হওয়া গেল না।

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় সম্মান

এ বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ৯ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূষিত করেন। এঁদের মধ্যে আছেন প্রশাসক, বাগ্মী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, কবি ও ঐতিহাসিক, সমাজসেবী এবং ক্রীড়াবিদ। পদ্মবিভূষণ বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ খেতাব সম্মানিত করা হয়েছে। পদ্মবিভূষণ খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন—স্থলবাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল পি পি কুমারমঙ্গলম, ওয়েস্টার্ন

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দুর্গা ভাগবতের সংগ্রহ থেকে

রাজেশ্বর দয়াল

কমান্ডের প্রাক্তন জি ও সি ইন চীফ জেনারেল হরবক্স সিং, রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টার জেনারেল শ্রী বি আর সেন, কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা এবং প্রয়াত ঐতিহাসিক ডঃ তারা চাঁদ এবং প্রয়াত অ্যাটর্নী জেনারেল সুরেন্দ্রনাথ দাস। ফৈজী পাইলট সুরেন্দ্রনাথ দাস কয়েকদিন আগে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

এ বছর সর্বোচ্চ খেতাব ভারতরত্ন কেউই পাননি। এই নিয়ে চার বছর ভারতরত্ন খেতাবে কাউকে ভূষিত করা হলো না।

পদ্মভূষণে সম্মানিত ব্যক্তিরা—আহমদ জান থিরাকোয়া, অর্থনীতি, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, সাহিত্যিক, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অর্থনীতিবিদ, শ্রীঅদ্বৈতমল্ল বর্মন, ঔপন্যাসিক, শ্রীসম্ভু মিত্র, অভিনয়, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক, শ্রীরতনলাল যোশী, সাংবাদিক, শ্রীমতী অমলা, ও ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী, শ্রীমতী ইন্দিরাণী মুখোপাধ্যায়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-শিল্পী, শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ, ভাস্কর, শ্রীশান্তিনিকেতন, ডঃ এম এস কৃষ্ণান, কৃষিতত্ত্ববিদ, ডঃ পি এন ওয়াঞ্চু, ডিরেক্টার অফ দি ইণ্ডিয়ান ফার্মিংসিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ, শ্রী ভি এ নরসিংহ রাও, সেক্রেটারী এগ্রিকালচার অ্যান্ড পাওয়ার কমিশনের চেয়ারম্যান, ডঃ হোমোহইয়া, কৃষি-বিজ্ঞানী।

পদ্মশ্রী খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন—আবদুল হালিম জাফর খাঁ, সেতারশিল্পী, ডঃ অজিতকুমার বসু, ডিরেক্টার প্রফেসর, সাধারণ বিজ্ঞান, এস এস কে এম হাসপাতাল, কলকাতা, শ্রীবিষেণসিং বেদী, টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়, শ্রীবাদিক ঘটক, চলচ্চিত্র-পরিচালক, শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, সঙ্গীত-শিল্পী, রাজেন্দ্রকুমার, চলচ্চিত্র অভিনেতা, শ্রীবেকেন্দ্রনাথ মাজুন্দ, সমাজসেবী, শ্রী পি লাল, কবি, শ্রীসিকান্দার আলি ওয়াজদ, উর্দু কবি, শ্রীমোহনলাল শিরেরী, হিন্দি কবি, শ্রীসুকুমার বসু, 'ডিরেক্টর অফ সেইন্টিফিক, রাষ্ট্রপতি ভবন, মহাশিল্পী, ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চীফ হায়ারগ্লিফিক ইনিসক্রাইবার ও ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অফ সোর্ট, ম্যানেজমেন্ট, সোর্ট কমিশনার, কলকাতা, শ্রীসৈয়দ মহম্মদ মৈদুল হুদা, ক্রীড়াবিদ, শ্রীবেলভেকর সদানারায়ণ শর্মা, নৃত্যশিল্পী, শ্রীটি আর মহালিঙ্গম, বংশী-বাদক।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী

বি আর সেন

পুষ্পকুমার মল্লিক

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

ছোটদের সৃষ্টি

বিভিন্ন বিভিন্ন ছোটদলটির উদ্দেশে প্রচারিত বিভিন্ন বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা করছি। এবার শিশুদের উদ্দেশে যে বিশেষ অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে তার আলোচনা করব। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে প্রোগ্রাম, বাংলায় শিশুমহল।

এর আগে শিশুদের জন্যে যারা—বিশেষজ্ঞরা অনুষ্ঠান তৈরি করেছেন তাঁদের আলোচনা করেছি। অর্থাৎ স্কুল ব্রডকাস্ট নিয়ে।

স্কুল ব্রডকাস্ট নিয়ে আলোচনার সময় বলেছি যে, ১৯৩৮ সাল থেকে দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ও লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে নিয়মিত স্কুল ব্রডকাস্ট সুরু হয়। তখন এই অনুষ্ঠানগুলি ছিল বিশেষ করে ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এখন এগুলি প্রচারিত হয় সমস্ত রাজ্যের সেকেন্ডারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

১৯৩৮ সালের অনেক আগেই—১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে—মাদ্রাজ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্র থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার সুরু করেছিল। এই অনুষ্ঠান প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তালিম হয়ে প্রচারিত হত। সুতরাং মাদ্রাজ কেন্দ্রের এই অনুষ্ঠানগুলিই শিশুদের উদ্দেশে প্রচারিত প্রথম অনুষ্ঠান বলা যায়। অর্থাৎ লিটল্‌ই ছিলেন প্রোগ্রাম।

পরে সমস্ত কেন্দ্র থেকেই রবিবার সকালে শিশুদের জন্য নানা অনুষ্ঠান প্রচার সুরু হয়। এই অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে স্বাধীনতা লাভের পর যখন দেশের বিভিন্ন অংশে একের পর এক বেতার কেন্দ্র খোলা হতে লাগল, তখন প্রতিটি কেন্দ্রে শিশুদের অনুষ্ঠান রবিবার সকালে অবধারিত।

সাধারণত এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় ভাইয়া বা বিবিদের (যেমন কলকাতা কেন্দ্রের ইন্দিরাদি)। কোনো কোনো কেন্দ্রের প্রোগ্রাম বা পরিচালিকার সঙ্গে শৈশব কণ্ঠস্বরের হিসাবে দু-তিন জন শিশুও থাকে। (কলকাতা কেন্দ্রে এই শৈশব কণ্ঠস্বরের যোগ নেই)। এই কণ্ঠস্বরের কাজে থাকে চরিত্র, কাজে এই চরিত্রগুলি প্রতিটি অনুষ্ঠানে একই হয়ে আসর জমিয়ে তোলে (যেমন কলকাতা কেন্দ্রের রবিবার সকালের মোক্ষদা, মোহনলাল, সনাতন, কালীদাস প্রভৃতি)। এই কণ্ঠস্বরেরা অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে জীবন্ত করে তুলতে পরিচালক বা পরিচালিকাকে সাহায্য করে। এই শৈশব কণ্ঠস্বরের লক্ষ্য করেই ছোটদের উদ্দেশে নানা অনুষ্ঠানই প্রচারিত হয়, সমস্যার ছোটদের সম্বোধন করে নয়।

শিশুদের অনুষ্ঠানে এই রকম নয় শৈশব কণ্ঠস্বরের ব্যবহার না করা হয়, অনুষ্ঠানগুলি বেশি প্রাণবন্ত হয়। কারণ, শিশুরা যেহেতু সমবয়সীদের কণ্ঠস্বর থেকে সহজে বেশি আকৃষ্ট হয়। অনেকে তারা নিজেরা যা করে, তার চাইতে অন্যে যখন করে থাকে, তখনে তাদের চোখ যা দেখে তাতে। তারা তাদেরই মতো কণ্ঠস্বর শুনতে চায়, তাদের শান্তি। তারা হয়তো তাদের ভাব প্রকাশ করতে পারে না; তাদের ভিতরে যেমন [illegible] একটা কথা বলার চেয়ে সহজে করতে পারি না। নিজেদের অভিনয় দেখাবার একটা সাহসও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বড়ো কারা অভিনয় দিয়ে থাকেন। তিনি ভাইয়ের ব্যবহার। তখন ছোটরা শিশুদের কাছে অভিনয় দেখায়। তাদের আসর জমে ওঠে। আগে শিশুদের অভিনয়গুলি তাদের বয়স অনুযায়ী করা হতো, তাদের লেখাগুলো সকল করার চেষ্টা করে। তাহলে তারা তাদের ভাব প্রকাশ করতে পারি। তাদের ভিতরে প্রকাশ হয়ে হল, কি আনন্দ হলে, কি রাগ হলে, কি বিরক্তি এলে তারা অনেক সময়েই তা বাইরে প্রকাশ না করে থাকতে পারি। বোঝাতে পারি, তেমন কিছুই হয় নি। কিন্তু শিশুরা তা পারে না। তাদের ভাব তারা প্রকাশ করেই। সুতরাং মনের ভেতর যাদের তেমন অভিব্যক্তি, শিশুদের কাছেই তা তাদের বেশি ভাল। তাই আগে শিশুদের কাছে যাও, তারপরে আমার কাছে এস।)

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত দৈনিক ডিরেক্টরদের সম্মেলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শিশুদের দুটি দলে ভাগ করে একটার জন্যে দুটো অনুষ্ঠান করতে হবে—একটা ছোটো শিশুদের জন্য, আর একটা বড়ো শিশুদের জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ছোটো শিশু আর বড়ো শিশুদের বয়সসীমা (বয়সে ভাগ দুপর) ঠিক করে দেওয়া হয়নি এই সিদ্ধান্তে। তা ঠিক করার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বেতার কেন্দ্রগুলির উপর। ফলে সারা দেশে একটা একটা সমতা আনা সম্ভব হয় নি।

অবশ্য উপর দেশে কিন্তু একটা হয় না। দেশের দেশে ডিরেক্টরদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় এবং যা কিছু হয়, তাদেরই নির্দেশেই হয়। সেইজন্য দেশে এই বয়সসীমা নির্ধারিত ও সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠান প্রচার অনেক বছরই।

যা-ই হোক, দৈনিক ডিরেক্টরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতারকেন্দ্রগুলি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেল এবং সিদ্ধান্তমতো সপ্তাহে দুটি করে শিশুদের অনুষ্ঠান প্রচার করা হতে লাগল। কিন্তু সপ্তাহে দো দুটো রবিবার হতে পারে না, তাই একটা অনুষ্ঠান—সাধারণত বড়ো শিশুদের অনুষ্ঠান—সপ্তাহের অন্যদিনে সপ্তাহে প্রচার করা হতে লাগল। কিন্তু সাধারণত স্কুল বন্ধ সপ্তাহে শিশুদের পক্ষে বেতার কেন্দ্রের পরিচালিত প্রোগ্রাম করতে যাওয়া বেশ অসুবিধা মনে হল। তাই ছোটদলের প্রচার করতে খুব ভাল এবং অনুষ্ঠান-তালিকাও হতাশ হয়ে পড়লেন। তাদের কোনো কোনো কেন্দ্র তখন রবিবারে অনুষ্ঠান রেখে সপ্তাহের মাঝামাঝি এর প্রচার করার ব্যবস্থা হল।

প্রোগ্রামের উপর এর ফলে খুব খারাপ পড়ল ১৯৫১ সালে, যখন বেতার সপ্তাহ শিরা করলেন, শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান

শিল্পের আর্থা অনুষ্ঠান হওয়ার দরকার নেই— যাতে শিল্পের অনুষ্ঠানে শিল্পের আসে প্রবল না হয়েও চলবে, সেজন্যই তা চলেছিল। সেবার কর্তৃপক্ষের নীতিতে এ একটা বড়ো পরিবর্তন— এক-রৈখিক পরিবর্তন। প্রয়োজনের যতে অনুষ্ঠান ছিলেন তা বদলে গেল, এবার অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আর আহ্বানের বড়ো হীন না। আগে শৌভিকের ছিলের আগে বাজানো থাকত, এখন বাদি শৌভিকের আগের প্রোগ্রাম ভাঙে, আর শিল্পের তা বাড়িয়ে আগে দেওয়া।

কিন্তু শৌভিকের ছিলের অনুষ্ঠানে সাজিয়ারে আগে প্রবল করে অনুষ্ঠান শোনা আর বাড়িয়ে আগে শোনা এক কথা নয়। এ সূত্রের অনেক আলোচনা সম্ভব আছে। সেবার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কখনও আলোচনার আগে নি—অথচ সেবার বলছে 'শিল্পোর্স' ফিল্ড ফিল্ডটোনে বলে একটা বিভাগ আছে। তাঁর একবারও চিন্তা আসে নি : বাঁধিতে আমাদের শিল্প এই অনুষ্ঠান শোনে? তারা কি এ সূত্রে উপস্থিত হয়? তাদের উপস্থিতি বা অথবা হয়-তা কি আমরা নিজেরা বুঝতে পারি?

সেবার বলছের ছিলের এমন লোকও আছেন, যাঁরা আই আসরের আর আসেনে, শিল্পের আর অনুষ্ঠান প্রবল আগে দিয়ে চলে। ১১৫৭ সালে আকাশবাণীর বহির্ভারতীয় অনুষ্ঠান বিভাগ "রেডিও জার্নাল" নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে আকাশবাণীর শীর্ষস্থানের দুজন প্রবীণ ব্যক্তি —ছিলেন চন্দ্র ও ছিলি মি মজুমদার শিল্পের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ছিলেন্দ্রনাথ শিল্পের উপযুক্ত শিল্পে আসর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণের সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছিলেন। আর ছিলি মি মজুমদার এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠান প্রচারের যেমনেই সার্থকতা নেই, কারণ অনুষ্ঠান প্রচারের আগে শিল্পের ভিন্নমুখতা তৈরি করে রাখা হয় না, ফলে তারা ভিন্নমতো সব বুঝতে পারে না। যেগুলো তারা বুঝতে পারে না সেগুলো তাদের বুঝিয়ে দেবার মতো লোকও থাকে না তাদের আসরে।

ছিলেন্দ্রনাথের একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ একটা বড়ো সমস্যা। শিল্পের অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলার জন্য শিল্পের সঙ্গে যাঁদের বড়ো একজনের আসরে থাকা দরকার। তাহলেই তিনি অনুষ্ঠানের বিভিন্নগুলি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেবেন।

সেবার কর্তৃপক্ষের উচিত এই অনুষ্ঠানকে বিদ্যার্থীদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে বড়ো করে দেওয়া। বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানটি কেবল উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? বি-বি-সিতে কয়েক অনুসরে পড়ে ক্লাস মূল ছাত্রকালই আছে : প্রাইমারি—১ (৫ থেকে ৭ বছর), প্রাইমারি—২ (৭ থেকে ১১ বছর), সেকেন্ডারি—১ (১১ থেকে ১৩ বছর), সেকেন্ডারি—২ (১৩ থেকে ১৫ বছর) এবং সেকেন্ডারি—৩ (১৫ বছরের উপর)।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৫ই জানুয়ারী সকাল সন্ধ্যা আকাশবাণীর ছিলিয়ান্স থেকে অর্থে অনুষ্ঠানগুলি আসরে সফল। ___শিল্পীর অর্থে সেন বসন্ত ছিল।

৬ই জানুয়ারী সকাল ৮টায় ছিলিয়ান্স চৌধুরীর অর্থে লোকগীতি শিল্পের একঘেয়েমি দূর্দশা করেছিল।___ দূর্দশ হওয়া চলে না। মাত্র সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে ছিলিয়ান্স অনুষ্ঠানের লোকগীতি অনেকটা আশা করে রেখেছে।

৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিভিন্নানুষ্ঠানের ছিল ধারা—'পরস্পর'। দু-একজন ছাড়া শিল্পীদের সবগুলি গানে হয় অসাধারণ। মহলা৷ যোগ হয় আসরে করে দেওয়া হয়নি। এতে শ্রোতিদের ধারা আসরে কঠিন, তার উপর যদি আসর আসরে না হয় তাহলে সে আসর পরস্পরকে করা ধারা যাবে না।

পাই ও আসরে আসার পর আমাদের ৫১৩ আসর কাছে ছিলের দরকারী হলেও বিভিন্নানুষ্ঠানের মধ্যে ধারা-ছিলের একঘেয়ের পরে পরে শ্রোতা সকলের আসরে মন-ও লাগতে পারে। একটি, আসরে করে এই আসরে সব সময়ে 'বিভিন্নানুষ্ঠানের আসরে আসা যায় না?

৮ই জানুয়ারী তার ৮টা আসর আকাশবাণী। ইসলামী আসরের' আসর—ছিলিয়ান্স চৌধুরী। —

সাইকের আলোচনা দুর্বল, আলোচনাসভা সুষ্ঠু হয়। সাইকের চরিত্রগুলির মুখে দিয়ে ছিন্ন ছিন্ন করে সম্পাদিত নীতিকথা শোনানো হয়েছে। তাতে সাইক আরও দুর্বল হয়েছে।

নীতিকথার এক অসুবিধা হল, হাস-পরিহাস করে কথা আসর দিয়ে পাওয়া দুর্বলি অনেক নীতিকথা দূর্দশ্য হয়। মোটকথা সাইকের আলোচনা 'ছিলিয়ান্স' আলোচনা করেই সাইক শেষ করেছেন। সাইকীয়তার দিকে আসর দি।

অভিনয়ও ছেলে উল্লেখযোগ্য নয়। যে সাইকে আসরের কথা সে সাইক শ্রোতিদের বাঁধ করানো কঠিন। সুতরাং শিল্পীদের পুরো দোষ দেওয়া যায় না।

সেবারজনের অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী ১৩ই জানুয়ারী তার ৮টায় 'পশ্চিম-বঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনা' বিষয়ে একটি আলোচনা অভিনয় প্রচারিত হবার কথা ছিল, কিন্তু প্রচারিত হয়েছে অন্য কোন অভিনীত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক অভিনয়ের সঙ্গে অভিনীতি দুটিকে মেলবার কোনো স্পষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে না। অভিনীতি দেখার এমনকোনো প্রোগ্রামও নয় যে, তাকে যেকোনো অনুষ্ঠানে অভিনীতি হিসাবে সেই আসরের অভিনীতি প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া আসরে ছিল, অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী তার ১টা ৫৫ মিনিটে এক অন্যান্য বড়ো প্রোগ্রাম ছিল—অনুষ্ঠানিক গানের। ১২ই অভিনয়ের অন্যান্য পর আর ১৩ই অভিনয়ের অন্যান্য পর একই আসর কিনা জানি না। যদি একই আসর হয় তাহলে সেবার কর্তৃপক্ষের প্রোগ্রাম শনাক্তিকরণে প্রশংসা করতে হবে। কে বলে তাঁরা শিল্পী-দের ন যমে ন মাসে ন আসে একবার যার প্রোগ্রাম দেন?

১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার গল্পদাদুর আসরে গল্প শোনানোর জন্যকারী হাই স্কুলের অন্যতম প্রধান বিচারপতি শ্রীমন্মথবিহারী মুখোপাধ্যায়। ছেলে আসর। আইনজ্ঞের গল্পের ছড়ানো ছেলে কৌতূহলোদ্দীপক। এই আসরে পরে আসর শোনার পাশিয়া সরকার। কিন্তু শ্রোতারা শোনাতে পারল না, শেষ ছবার আগেই স্কেটে দেওয়া হল। তারপর সমস্যাসংকীর্ণ কাহিনি ছিলিয়ে বসানুসন্ধ। তার গানও শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের কারণ শোনানো না, স্কেটে দেওয়া হল।

পরে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে অনুষ্ঠান পরিচিতিতে শ্রোতাদের অনুষ্ঠান-সূচী শোনান করার নিয়ে আসেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার ছিলিয়ান্সে যাঁদের সাজিয়ে দর্শনী-চিত্র, এই 'পরস্পর' শিল্পীদের ছিলিয়ান্সের উপরে ছিলি সম্বন্ধে অনুষ্ঠান—ই কেন সেবার তা আর ছিলি আসলেন না। আসলেন শোনেও না। আর হল, শোনাতে ছিলি পারলেন না। কিন্তু কেন? অনুষ্ঠানের আগে শোনাতে সব সময়ে দেওয়া হয় না কেন?

—ছিলিয়ান

আঞ্চলা

কনে সাজানো

তাই তো, কি হবে?

এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। নীরন্ধ্র সমস্যা। চারদিক অন্ধকার।

সমাজ সম্বন্ধে এরিস্টিটলের এক অভিযোগ প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। পুরুষের [illegible] বিশ্লেষণ করাবার পরই আলোচনা। তিনি বলেন তাই বলেছেন আর [illegible] নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি। প্রাথমিক যে [illegible] আবার আলোচনার আসর বসল।

তিনিই শুরু করেন, এই তো অবস্থা। [illegible] বিয়ে করতে চায় না। সবাই আর্থিক [illegible] চায়। আর সাঁতার [illegible]। এর ফল যে কি ভয়াবহ চিন্তাও করা [illegible] না। ইতিমধ্যেই কুফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠতে হয়। [illegible] ঘরে ঘরে ভাবনা মা-বাবার, বাপের মেয়ে [illegible] আর কেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই।

আবার নীরবতা। কথা আসতে পারি না। [illegible] করে থাকতে হয়। কারুর কারুর খোরাক জোগান।

[illegible] হইল বিয়েতে রাজি, তবে মেয়েদের [illegible] হবে।

এক ছিলতে হাসলেন তিনি, ছেলেরা [illegible] বিয়ে না করে।

[illegible]

আর্থিক জীবন থেকে অর্থাভাবে নয় অন্য সমস্যা জীবনে উঠেছে এরকম বিয়ে বিরোধিতার। একার নয়, সকলের জন্য।

কিন্তু বিয়ের সমস্যে বাংলাদেশের বিয়ে ছাড়াতে অবশ্য এরকম ভয়াবহ মনে হয় না। বার মাসের সাত বারেই বিয়ের লগ্ন। আর প্রতিটি লগ্নেই কি ভিড়। বাজারে মেয়েই সেটি বেশ চেষ্টা পাওয়া যায়। জিনিস-পত্তর ধরে আকাশচারী। সাধারণের সাধারণের বাইরে। সবাই তখন ভাবে, বিয়ের লগ্ন কেটে গেলেই আবার দাম কমবে।

সমস্যার মজা জমে যেন সমাধান করার মজা নিয়ে। প্রতিযোগিতা পড়ে যায়। এটা 'ফিল' হলেই অনেক দাম অপেক্ষা করতে হবে। আর দাম্পত্যজীবন তো আছেই, পুরুষের শুরু বাংলাদেশেরই নয়। সারা জগৎ জুড়ে। এক-একটি দেশে যেন। কোন কোন দেশে আবার একদলের অনেক ভিতর নেয়ে ছেলে হয়। আলাদা আলাদা ভাবে ভিন্নে পুরুষেরাই হয়তো সমাধান পারেন না তাই এই পরস্পরেরই ব্যবস্থা। সকলেরই যাতে দাম কম হয়।

[illegible] বড় পরীক্ষাই হোক, প্রাথমিকের [illegible] তাই এত পুরুষের। নতুন জীবনের [illegible]। এখনও চলছে বিয়ের সমস্যে। [illegible] ভাবে চেনা-অচেনা, পরিচিত-অপরিচিত খানিক হলেও হয়, তাদের [illegible] তবে মনে সন্তোষিত হয়ে।

এই মুহূর্তে, এই ভয় সমস্যে ঐ [illegible] সভার ভেবে তাই এখানে বিয়ের

বিয়ে মানেই সাজ-সাজ রব। বাড়ি সাজে, ঘর সাজে। ছেলেমেয়েরা সবাই সাজে। আসল সাজ বর-কনের। সবচেয়ে বড়ো সাজ কনের। তার আয়োজনেই এত আয়োজন, ঘটা। তাই সব-ই বলে, কনে সাজানো। দেখে সবাই। মনে মনে হিসেব করে। আর পরিচয় দেয়া কনের সঙ্গে তুলনা করে। খুঁত বাঁচিয়ে নিতে পারলে খুশিতে ফেটে পড়ে। সবাইকে ছেড়ে সোনার। আর নতুন কিছু দেখলে শিখে নেয় টুপি-টাপ। ভাউকে বলে না। মনের মানুষে। বিয়েতে বলে সাজানো তাই এক-রত্তি আশ্চর্য। বিয়াই ঘটনায়।

মনে সাজানো আজ যেমন সৌন্দর্যে তেমনি ছিল। দুঃখু এক নয়। প্রথমত এক না হলেও প্রথম আছেন। মূলে যেন তফাৎ নেই। সেখানে আসরে দাঁড়িয়ে আছি একই আয়নায়।

আমাদের আদি মহাকবি রামায়ণ-মহাভারত। সেখানেই আমাদের পূর্বপুরুষ পরিচয়। আদি কবি সীতার বিয়ে উপলক্ষে মনে সাজানোর আয়োজন কতটা করেছিলেন জানা নেই। তবে কবি কৃত্তিবাস কিন্তু সীতার বিয়েতে মনে সাজানোর আয়োজন করেছেন ব্যাপক। "চিত্রশীরে যেন অটালিকা সবাকার। ফুল বাঁধি পরাইল মনের আয়ন।।। কপালে তিলক আর সিঁথায় সিন্দুর। মনমথ মুর্ছিতেক দেখিতে প্রচুর।। চলন দমনে কিবা কন্দলের রেখ। আমের সমান যেন ঘুমে যায় দেখা।। দুই বাহু স্বর্ণেতে শোভিত বিলক্ষণ। স্বর্ণের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।। মনন পরারে আছে সুন্দর প্রচুর। দুই পায়ে দিল তার নূপুর সুন্দর।।"

এরপরিভাবে সীতাকে সাজানো হলো। তারপর বিশ্বসভার তাকে বরণ করিয়ে আনা হলো বন্ধু-বান্ধব এবং বয়স্কদের আশীর্বাদে ধন্যিকতার অসার মাতিয়ে তুললেন। এত কিছুর মধ্যেও সীতার মনে-সাজ কিন্তু সবকিছুর মজর কেড়েছে। সবাই সশ্রদ্ধচিত্তে।

কবি কৃত্তিবাস মনে সাজানোর বর্ণনায় সমস্তটুকু যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে সে যুগের একটি আকাঙ্ক্ষিত ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার কালের অনেক কিছুর মতো এও যে খাঁটি বাঙালী মনে সাজানোর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কবি কৃত্তিবাসের পর থেকে দিন বদলে। মনে সাজানোর সেই ঐতিহ্যও এখনো চলেছে। কোথাও ছেদ পড়ে নি।

এখনো আমরা মনে সাজাই। এক সময়ে ঢালাওভাবে হতো। এখানে আমরা সেই যেখেতেই দাঁড়িয়ে আছি। অপরিবর্তিত। মোড় নিয়ে। কিন্তু আসতে অনুরূপ।

ইদানীং মনে সাজানোর অনেক সুযোগ। আগের সময় নিয়ে এ ঘটনা না নিলেও চলে। উচ্চবিত্তের এখন তাই ফ্যাশন। কলকাতার এখন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা মনে সাজানোর দায়িত্ব আমি করে। ফুল বাঁধা থেকে টোপোর-আলবলন সবই এদের দায়িত্ব। মনে এটা সমাজ চেতনার। মনে যেখার সার্বিক আমল এখানে সুলভ। তাই এইসব প্রতিষ্ঠানের কদর খুব। বিয়ের মরসুমে এদের ব্যস্ততার সীমা নেই।

কিন্তু বাজার সে সামর্থ্য নেই। কলকাতা শহরের অভিজাত পাড়া ছেড়ে এসে নিয়ে মনে সাজানোর ক্ষমতার অনেকেই নামে। বিয়ে মোসাড় করতেই হাসফাস। তারপর এদের আয়োজন করা সোজন্য না। করলে হয়তো ভালো হতো, বাড়ির সবাই খুশিও হতো।

অসতত সব দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হয়। আমাদের অবাধিত ছেলে মেয়ে-বিদের এ-ব্যাপারে বক্তব্যও খুব। তাদের ডাক পড়ে। তারা মনের মতো করে সাজান। একজনের অসম্পূর্ণ আরেকজন পূর্ণ করে নেন। এমনি করে চলে মনে সাজানোর পালা।

সীতার বিয়েতে তিলক ব্যবহৃত হয়েছিল। সে ব্যবহার আজো আছে। আর ব্যবহৃত হয় চন্দন। চন্দনে সাজানোই বাড়িবাড়ি। মাঝে সুন্দর সিঁদুরের টিপ। এখানেই কিন্তু শেষ হয় না। একজন সাজান চন্দন-তিলকে। আরেকজন সিঁদুরে কেশসজ্জায়। বিন্দুমী নয়, ঘোমটা। এমন ঘোমটা যেন সকলের নজরে পড়ে। টোপোর তো আছেই। হালফিলে সে ফিরিস্তি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিয়াট।

মনে সাজানোর প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত। গল্পনায়িকা সীতার বিয়েতে ছিল প্রচুর। সে রাজ-রাজড়ার ব্যাপার। এই দুর্মূল্যের দিনে অত গয়না কোথায়। তবুও কিছু থাকে। সাধ্যানুযায়ী। কিন্তু গয়নার অপূর্ণতা ঢেকে যায় ফুলসাজে। ফুলের গয়না সাজানোর আকর্ষণ- প্রধান উপকরণ। সিঁথিমোড় থেকে পায়ের কাছ সবই ফুলের। মনে সাজানো শেষ। শেষ যেন দেখে চোখের। বিয়াই পরিপূর্ণ। তবু আসলে। বরকনে বিবাহবাসরে মনের সাজ সজ্জার প্রশংসা না ফুরোয়। সাজ পছন্দসই না হলে অনেকে প্রকাশেই ঠোঁট ওল্টায়। সভাসদে দৃষ্টিতে তাকালেই আর তয় নেই। সব পরিশ্রম সার্থক। আর ওড়নার আড়াল থেকে পরিষ্কার মুখছবি দেখে সভাসদে না হয়ে পারা যায় না।

বর বিয়ে হচ্ছে তার প্রায় সতেরো ১১-১ তারিখ এইভাবে মনে সাজায়। নিজের সাজ-আহ্লাদ সবাই এখানে উজাড় করে দেয়। তিলে তিলে গড়ে ওঠে তিলোত্তমা। সেই তিলোত্তমাকে নিয়ে সুখ-উপভোগের অন্তরাই নয়, সুখের সংসার।

চারদিকে বিয়ের হৈ-হট্টগোলে মন হৈ-হুল্লুড়। সাজানো কনেরা চোখের সামনে সারি মেলে চলেছে। ওদের চোখেমুখে চাপা আনন্দে উজ্জ্বল। সে আনন্দ আমাকেও ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আর কোন সমস্যা নেই। সেই তন্ময়তার সঙ্গে আলোচনালব্ধ সেই বিয়াই সমস্যার কৃতজ্ঞতাও এখন সাময়িক ছুটি নিয়েছে।

—প্রবীলা

মহিলা শিল্পী মহলের নতুন ভবন। কিছুদিন আগে এই ভবনটির উদ্বোধন হয়। এখানে কয়েকজন দুঃস্থ অভিনেত্রী স্থান পেয়েছেন। কর্তৃপক্ষ নানাবিধ উপায়ে মুক্ত হাত নিয়েছেন এবং এতের বিয়াই পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রেমগৃহ

অভিনয় চাতুর্যের পরিচায়িকা পদ্মাবতীদেবী-এর সেরা অভিনয় যে-কয়টি ছবিতে এবং অপর্ণা সেন। —ফটো। অমৃত

ভূলের খেসারত :

আমি না, হৃষীকেশ মুখার্জীর মূল-কাহিনীটি আমার জানা ছিল। কিন্তু পরিচালক অভিজিৎ বিশ্বাসের এবং মূল বাংলা পরিচালিত পদ্মাবতীদেবী-এর ছিন্নমূল থেকে যে-কাহিনীটি আমরা পাচ্ছি, তা থেকে মনে হচ্ছে, আমাদের আলোচনেও বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো মুভিলিজ্ঞ কাহিনীর অনুসরণের অভাব ঘটেছে। সম্প্রতি আমরা 'হো জাস্তে' বা 'আরাধনা' নামে হিন্দী ছবিগুলিতে যে-ধরনের অবাস্তব কাহিনীর (যদিও অভাব, এইসব হিন্দী ছবির নির্মাতারা কিন্তু জানেন যে-ধরনের বাস্তবের 'হোয়াট-নট, মারকা-মারকা-বিজলীবাতি-ঘুসি-ঘুসোঘুসি-অন্ত-নায়ক বা নায়িকার বিপদসঙ্কুলতা-মূলক কাহিনীর অবতারণা করছেন, বর্তমান হিন্দী ছবির কাহিনীগুলিকে তাদের তুলনায় অনেক অনেক ভালো বলতে হবে) সাক্ষাৎ পাই, 'সাংস্কৃতিক'-এর কাহিনী তাদের থেকে কোনো অংশে পৃথক নয়। জমীদারবাড়ির বহু—যার চোখাকাটা নাম অশোক—বন্ধুর স্ত্রীর প্রতিযোগিনী তরুণী কমলাকে বিয়ে করল; তবুও তার রক্ষণশীল পিতা যে দুষ্ট হবে সে-বিবাহকে অস্বীকার করতে চাইবেন, এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। রক্ষণশীল চৌধুরী যে কমলার মতামতী প্রাণকে অর্থ দিয়ে কিনতে চাইবেন, তাও বিচিত্র নয়। কিন্তু যে-পরিস্থিতিটি আমাদের দিলে আগে বরদাস্ত করা কঠিন, সেটি হচ্ছে কমলের বাল ও কমলার মামার মতো আর্থিক লেনদেনের শিকার হয়ে পড়বে কমল ও কমল। হাজার হাজার মোটরের ভাড়া দেয়া কোম্পানির বিশাল সম্পত্তিসমূহের একমাত্র উত্তরাধিকারী

সুবীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চৈতালী চিত্র তারকা। —কণ্ঠী । অমৃত

সুরেন্দ্রে নয় বলে ছবির সঙ্গীতাংশ আরো প্রাণবন্ত করতে পারে না।

গল্পের দুর্বলতা নির্বোধের স্ক্রিনপ্লে-এর প্রধানতম দুর্বলতা, এবং সামগ্রিক পরিণামের ব্যর্থতা।

বিচিত্রা-রূপিনী শর্মিলা

শর্মিলা নামক প্রধানতম ও পরিচালিত 'আরাধনা' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর প্রথমে দেখিয়ে, তারপর ষোলো বিমানের তলে বহু ও বাস্তবতায়, পরে নিজের সন্তানেরই আরা এবং সবশেষে বৃদ্ধি বয়সের বাবস্থনে প্রৌঢ়া মাইকেলে আসল গল্পের বলনবাহিনী। অভিনেত্রী শর্মিলাকে এত বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে এত ধরনে বিভিন্নরূপে আগে কখনও দেখা যায়নি। অভিনয়ের সাহিত্য ধরনের ভূমিকায় আরো অভিজ্ঞতা শর্মিলাকে ভেন নতুন করে আবিষ্কার করবে। চলচ্চিত্র-পরিচালক শক্তি সামন্তকে বলতে, তিনি শর্মিলা ঠাকুরের মধ্যে-লৈশ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রথমের সুযোগ আর দিয়েছেন।

মনে হয়, হিন্দী ছবির কাহিনীর সেই আদি-সুপরিচিত রূপটির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। 'আরাধনা' ছবির মধ্যে সেই চেনা ঘর-সংসার, সেই চেনা নায়ক বা নায়িকার আরাধ্য স্থানে অবস্থান, সেই নায়ক ও খল-নায়কের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব এবং দুর্যোধনি ভেদে দুর্দ্ব আর দুঃখ ও বিচ্ছেদের মধ্যে অবসান। তবিও হিন্দী ছবিতেদের নায়ক-নায়িকার প্রেম-আলাপচারিতার দৃশ্যাবলীর গানের মাধ্যমে চিত্রিত করে ছবির আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু কাহিনী চূড়ান্তভাবে পরিবর্তিত হয়ে নায়কের আকস্মিক মৃত্যু ঘটানোর এবং প্রেমের বিচ্ছেদের অবসানকে আনিয়ে। অভিনয়ের দৃশ্যের সমাপ্তির দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। অভিনয় সবের মধ্যেকার দীর্ঘদিনে তার পরিণতি। অভিনয়ের সকলে দুর্বলতা হবার পূর্বে তাকে শিল্পোপাদান আহরণ সে রেখে এসেছে এবং সে-বিশ্লেষণ তাহলেও তার শেষ ছেলে ওই শিল্পকে ভুলে দিয়ে একে নিজের সন্তানের মতো পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তারই অনুকরণ ভিন্ন করে তারই মধ্যে সে নিজ সন্তানের আরো দায় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বামী তার কন্যা একথা সে-ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সন্তানকে অনুসেবায় একজন বিশিষ্ট গাইনোকলজিস্ট হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতীয় এবার মেয়েদের গাইনেট নিয়ে ব্যস্তিতে একজন পুরুষবিশেষের সমাজে অভাবের বিদুষী জন্মার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে মোশন বিষয় না করে সমাজের সাথে আধুনিক পরিবারের 'রেলিভেন্স' বিষয় করা যে যেত? কিন্তু তাহলে হয়ত কাহিনী ও চিত্রনাট্যকে নতুন ভৌগোলিকে কাহিনী ভাবনা করে পুনর্গঠন করতে হত।

অভিনয়ে শর্মিলা কখনোমুখে শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয়ের পূর্বপ্রসঙ্গ করা আগেই করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, অভিনয়ের চরিত্র সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণা করে নেওয়ার এবং অনুধাবনের নাইনেন্সের প্রদর্শনের আগেই তিনি আর সচেতনভাবে আবির্ভাবনী। কখনো সন্তানের পালক ও সকলেরার ভূমিকার অতি অল্পকাল একটি অভিনয়ানীর্ণ সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন। নায়ক অনুপ কপী এবং নায়কদের —এই উভয় ভূমিকায় রাজেশ খান্না একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ দুর্বল দুর্বলতার ধারণে ও অন্যদিকে; কিন্তু চরিত্রের অন্তরকে বিকশিত করার মতো বিশেষীয় যে-অনুভূতিপ্রবণতার প্রয়োজন, তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। অন্যান্য মোশন বিশেষীর মেয়েরাজন ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় অভিনয় দর্শকচিত্তকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে। অনু সিং যদি হিন্দী ছবিতে তাঁকে আরো দেখতে পেতাম। বিশেষ পরিচালনার অভিনয় বড় চমৎকার। অভিনেতা বান্দুলীর মোট ভূমিকায় অভিনেত্রী অনোকুমার তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে সবচেয়ে পরিস্ফুট করেছেন। গায়কদলের প্রেমিকার ভূমিকাটিও মূল্যায়নীয়। অভিনেত্রী অনন্তার ভূমিকা অনুরোধীন।

ছবির আবহসঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে অনোক গায়কদলের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্নরূপ বিশেষ সফলতার পরিচায়ক। ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। কিশোরকুমার, আশা, লতা ও রফীর গাওয়া প্রতিটি গানে সুরের অভিনবত্বে মর্মস্পর্শিত হয়ে উঠেছে। 'রূপ তেরা মস্তানা, প্যার মেরা দীওয়ানা', 'কোরা কাগজ থা ইয়ে মন মেরা', 'মেরে সপনে কী রানী কব আয়েগী তু' প্রভৃতি গান বার-বার শোনবার মত। আমন গভীর ভাবনা ও গভীর মেলোডির সুরের এমন অভাবনীয় সমন্বয় অভাবনীয়।

শক্তি সিমন নির্দেশিত 'আরাধনা' শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় এবং গভীর মেলোডিসমৃদ্ধ সুরসঙ্গীতে একটি স্মরণীয় চলচ্চিত্র পরিণত হয়েছে।

সৎ এবং অসতের পথ পরিচয়

জীবনের পথে চলতে গেলে আমাদেরই জানা, না স্বার্থপরতা অন্ধ চালিত হয়ে সুখলাভ ভোগের চেষ্টাই শ্রেয়—এই প্রশ্নের একটি সুষ্ঠু উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে ষোলো প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবি 'সৎ এবং অসৎ'। 'সৎ এবং অসৎ' নির্মিত হয়েছে চলচ্চাপ্ত কাকোদকর রচিত একটি উপন্যাস 'নীলকন্যা' অবলম্বনে। মূল-কাহিনী থেকে যি আর ভাষায় যে-চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন, তা থেকে দেখা যায়, সৎ-অসতের যে দ্বন্দ্ব, তা একটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ঠিক যেমন আছে নায়কদলের 'মিলনচিত্রে সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই পার্থক্য। নায়ক-রচিত বিচিত্র-নিবেদনকারী-চৈতন্যের মধ্যে যে বাস্তবতার সন্ধান উপস্থিত, সে-সুযোগ কাহিনীকে। চরিত্রের নানান পর্যায়ের মধ্যে দর্শকের অনুভূতিকে প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধ্যমে নেয়, তা এখানে অনুপস্থিত। মোশন সরকারী সহজেই এখানে সোজাসুজি অন্তর্দ্বন্দ্বহীন ও সরিয়ে-ভাবার অবতার; মোশন দুই নায়কী তাঁর অনুগামিনী মাত্র। মোশন তাই সহজে প্রেমিক এবং নায়ার সঙ্গে দুঃখভোগ করে। মেলোডাই কিন্তু স্বার্থপর নায়ী নায়কের বিবাহ করে তাকে স্বাধা চালিত হয়, যতক্ষণ না মোশন তাইয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হবার পরে নায়ক নিজেদের স্বার্থ-পরতা সম্বন্ধে তার বিবেকদংশন হয়। — এই কাহিনীকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বে করতে গিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় অবতারণা করা হয়েছে, ছবি তাহলে-অনেকখানে জোড় হয়েছে নিয়ে বসতে পরিচিত পেয়ে, যদি হয়ে পড়েছে গল্প; নায়ক-নায়ক কাহিনীকে স্থানে-স্থানে বীভৎস দোষ ঘটেছে। তবে আনন্দের কথা এই যে, মোশনী

শুরুর মহুয়ার পরিচালিত অনুরাগী চিত্রের চারটি চরিত্রে বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
—কণ্ঠী। আজ

ুত অর্থানুকূলে উন্নত হয়েছে এবং
ার্যিক অভিজাতমানে অভিনয়পর্যায়ে
ের অভিনয় প্রকাশ পেয়েছে।

র্ষাবিটিতে মাইকেলপুত্র প্রথমদের খুব
। অনুযোগ আছে বলে মনে করতে পারছি
তাই অনুরাগ সাহানী (অনেকদূ), রাজেশ
(সেতোন), প্রেম ঠোপরা (বিন্দু),
নীকৌশল (রাখবী), অমরনাথ (রবীন)
ধর (পাঁচা), জয়ন্ত (দুঃখমাকবিন্দু),
োহমূলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী স্ব-স্ব ভূমিকায়
চেষ্টা করেও অভিনয়কে স্বাভাবিক
। উচ্চতরে পর্যায়ে তুলতে সক্ষম হন নি।
র্ষার কলকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের
সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। আবহ সঙ্গী
ত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংযোজনা আরও
োজিত হওয়া সত্ত্বেও 'মা আমার
ুলি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। প্রথম
ার 'মা আমার' হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে
পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছে
। অবশ্যস্বীকার্য।

ুাভিনয়

ামীর মাইকের বাঙলা ছুপ

পর্যায়ের প্রযোজনা এবং অভিনয় প্রায়
। 'ছুটির ঘেণ্টা' মাইকটির ছুপ অভিনয়
ে বিখ্যাত ছুমানীর মঞ্চাভার বিহারীলাল
স্তিয়াম। এঁর রচিত আরও অনেক
ির নাটক—'দেব সংসার' ও 'মাল-মা
আমার' নামে বাংলায় ছুপান্তরিত হয়ে
ত সাফল্যের সঙ্গে পূর্বে অভিনীত
ছ। প্রথমটির বাংলা ছুপে বিহারীলাল
ার অভিনয় ছুমানীর ইরানী অনুবাদের
। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি ছুপে
ীর আগা থেকেই অভিনয়ের অভিনয়
। বর্তমান বাংলার 'ছুটির ঘেণ্টা'
টির শ্রীমতী হার ছুপে ছুমানীর থেকেই
াছুপান্তর করেছেন।

মাইকের প্রথম ছুপেছেন, অনুরূপ যার
ন্তর জীবন থেকে ছুটি নিয়ে কোন
ন অভিনয় আরম্ভ করে যার
ছেলেটিকে ছুলে থাকবার জন্যে। তাই যদি
হয়, তাহলে মানুষ অবসরযাপন করতে
গিয়েও নিয়মিত অনুরূপ কাজে পড়তে
পারায় আনা করে কেন? সহজলভ্য থেকে
দূ দিন চিঠি না পেলেই ব্যাকুল হয়ে পড়ে
কেন? আজ মনের ঘোড়ে ছাড়িয়ে কিংবা
আজ কি যায় না জানতে পারলে
রীতিমত অস্বস্তি হয়ে ওঠে কেন?
মাইকলের প্রশ্ন, সব কিছু ভুলে
মানুষে নিয়মাধীন অবসরের স্বাদ
গ্রহণের আনন্দকে উপলব্ধি করতে চায় না
কেন?

ছুটির ঘেণ্টার পাত্রপাত্রীরা এই অবসর-
বিনোদনের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতেই
চেয়েছিল কেন চলচ্চিত্রা গ্রামের মাস্টারমশাই
ছোট্টিয়ে এসে। এবং তার ছেড়াছাড়ির
মাঝে তাই করে, তার জন্যে সে চিঠি ও
খবরের আসা-আসা বন্ধ করেছিল, টেলি-
ফোন ও রেডিওকে বিদায় দিয়েছিল এবং
গ্রামবেড়ে বিদেশ যায়, ছাত্রীর ইংরাজি
শেখাতে মনে নিত। কিন্তু যখন অনুরূপ মনে
হোলো — যে-অনুরূপ কেন আসমান
আসমান থেকে টান্স করতে পারে, সেই
অনুরূপ মনে হোলো মাস্টার প্রথমের চিন্তা-
ভাবনায় শরিক হয়ে পড়ে তার চিত্তকে বিল
সাগরে নাড়, তখন সে কি তার পৃথিবীকে
ভুলে থাকতে পেরেছিল? অনুরূপার সঙ্গে
সম্পর্কটুকে মধু করবার নিষ্ফল চেষ্টায় সে
কি জানতে চায় নি, অনুরূপ কে, কেনারামের
মেয়ে, কি তার 'ডিগনা'? কিন্তু অনুরূপ মনের
কথা মুখে পাওয়ার চিন্তাভাবনাকে আবদ্ধ
করে কি অকালীলাভেই না ছুটির ঘেণ্টাকে
পুরোপুরি উপভোগ করে গেল! অথবা তার
এই খেলার ঘোড়ায় অনেকখানি
সমস্ত জগতকে একটি ভালবাসা আত্মাভাবনুরূপে কল্পনা
করে কখনও এ-জগতে কখনও ও-জগতে
ভ্রমণ করার আনন্দ চিন্তা করেই সাহায্য
করেছিল।

এই প্রবন্ধাত্মাপূর্ণ রোমান্টিক মাইক-
টিকে এত সরলীল ও সুন্দর ভাবায়
রচিত করে বাঙলা ছুপান্তর পরিচালক
অজিতা রায় যে, স্পষ্ট অভিনয় না থাকলে
অভিনয় করতে পারতুম। অথবা মাইকটিকে
নিখুঁত মনে করতে পারছি না। তিনটি
ছুলের মধ্যে প্রথম ছুপটি অভাবে সুসংবদ্ধ
ও অভিনব। কিন্তু দ্বিতীয় ছুপটির বার
অনেক বন্ধ — যেমন কেন কেন হাসে,
মাইকলটি কেন ঠিক মনে মেনে উঠতে পারে
নি। তৃতীয় ছুপটি এই অসোয়াস্তি ভাবটি
কাটিয়ে উঠে কেন অনেকখানি বিকাশ লাভ
করেছে, তবে প্রথম ছুপের নিখুঁতভাবে
পৌঁছুতে পারে নি।

পর্যায়ের মাইকটিকে সাধারণ সুসংবদ্ধ-
ভিত্তি করতে প্রধান সেরেছেন। অনুরূপ
একটি সুশিক্ষিতদিগের মনের চেহারাকে
ভাষণে ও সঙ্গীতে এবং আনন্দ-
চেতনার মাধ্যমে মাইকটিকে তিনি
উপস্থাপিত করেছেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখ
হল, এঁদের অভিনয়কুশলতা। মানিক
অনুরূপার চরিত্রে অমলা চট্টোপাধ্যায়ের
অ সা ধা র ণ অভিনয়চেতনা দর্শকদের
সংবাদিত রাখে। মাস্টার প্রথমরূপে সুশীল
বন্দ্যোপাধ্যায় যাহলে ও সঙ্গীতে একটি
অভিনয়পূর্ণ অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন।

[পরিচালক-বৈচিত্র্যের
অনন্যতায়]

নতুন আকর্ষণ

কাশ্মিলা

অজিতেশ মাইকের অনবদ্য ছুপায়ণ
চারু প্রযোজনা ও পরিচালনা : সুশীল
চারু চরিত্রে ও ছুটির দিন : মৌ ও অনুরূপ
।। আজ ও পরিচালনায় ।।
অনবদ্যায়ণ ছুপে
।। ছুপায়ণে ।।
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, অনুরূপা,
ছায়াদেবী, প্রতিমা দাস, অনুরূপা ছায়াদেবী,
মহাদেব ভট্টাচার্য, রেবেকা বিশ্বাস, শ্যাম
লাহা, রেবেকা মজু, বাসন্তী ছায়াদেবী,
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শীতল দে ও

আন্তরিক অভিনয়ের মূল্যায়ন করেছেন। দুটি আনন্দমুখরিত নাটক মোহ এবং অভিনয় অভিনয়ের সুন্দর চাইনের দুটি ভাগে দর্শকদের অভিনন্দন করেছেন। উৎসবমুখর ও মুক্তধারা মেলে অভিনয়ের তখন যে-ভৌতিক ও ছবি তাদের অভিনয়ের উপরে মেলেও আরও স্বাভাবিক হতে পারতেন। মায়ার মেলের অভিনয়ের ভূমিকা-বিন্যাসে উপরি অবশ্যই অবকাশ আছে। ঠাকুরমোশায়িনী ও রাখালের ভূমিকায় যথাক্রমে এম রাজ্জাক ও দীপক ভট্টাচার্য উপভোগ্য অভিনয় করেছেন।

পরিচালিত প্রযোজিত এবং অভিনয় ছাড়া লিখিত দুটির খেলা একটি নতুন ধরনের ছেলেদের নাটকরূপে দর্শকদের খুশী করবে।

●

কলকাতার অনেকটি প্রথাত নাট্য সংস্থার কিছু সভ্য নিয়ে ছাদ থিয়েটার সংস্থার জন্ম। বর্তমান সমাজের বিশেষ বিশেষগুলো নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরাই এ সংস্থার উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম এঁরা সোপান-কৃষ্ণ পাহাড়ী রচিত 'বিবাহ রহস্য' নাটকটি মঞ্চস্থ অভিনয় করেছেন। নাটক-নির্দেশনা ও মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সোপান পাহাড়ী।

সম্প্রতি বি কে পাল এভিনিউয়ে নাট্যশালায় নাট্যসমাজ নামে একটি নাট্য সংস্থা গঠিত হয়েছে এঁদের উদ্দেশ্য নাটা-শিল্পের মাধ্যমে জোকাসংস্কৃতির একটি দিকের সঙ্গে বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষের একটা যোগাযোগ স্থাপন করা। মুখ্য সংগঠক শ্রীঅতুলাল চক্রবর্তী আজীবন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন। এই সংস্থা সভ্যদের সুস্থ মানস বা বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ও অতীতের ঐতিহ্যবাহী তা প্রচার করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা নেবেন। নাটকগুলি, খুশী, মেলের তাক প্রভৃতি নাটক এঁরা সহর ও মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। নিয়মী নিয়মিত অভ্যাস অনুষ্ঠানের পরিচয় বহন করেছে। সভ্যরা প্রায় নাটানিদেশনায় আছেন। তা না করা যায় এঁদের নাটকগুলি অভিনয় করে সক্ষম হবে।

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউট এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্কাইভ সিনেমার জন্য হিসেবে প্রতি বছরই যেন কয়েকটি করে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করে থাকেন ১৯৬৮-৬৯ সালে 'ডিপোজিট ফিল্ম' হিসেবে এঁরা তৈরী করেছেন ১০ খানি ছবি এবং তথ্যচিত্র করেছেন আরও ১০ খানি। এছাড়া এবারে এঁরা দুটি মহৎ কাহিনীচিত্রও তৈরী করেছেন। একটি হচ্ছে 'দ' রাজা রাণী' পিপড়া বা ঘর' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাংলা ছবিতে সম্পূর্ণ অভিনব ভাষ্যহীন লিখিত ও পরিচালিত একখানি ছবি। গেল ২৩ জানুয়ারী সকালে বন্ধিন কলিকাতার প্রিয়া সিনেমার আমন্ত্রিত চিত্রশিল্পী, কলাকুশলী এবং চিত্রসাংবাদিকদের সামনে 'পিপড়া কা ঘর' সমেত খান-দশেক ছবি দেখান হয়। বোম্বাই শহরের মুহূর্তসমস্যা একটি প্রবন্ধপরিচয় নিখুঁত আলাপনে কি যেমনভাবক ব্যাপার ঘটতে পারে, তারই যে মনোরম ছবি মারাঠী লেখক বসন্ত কানে খাঁরের গল্পের এঁকে-ছেন, তাকেই ছাত্র-ছাত্রীরা চলচ্চিত্রের ভাষায় অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপায়িত তুলেছেন। কথা এই ছবিটিতে দলজনের কলকেরার কাজ, দলজনের দলবদলের কাজ, এলারোজনের সম্পাদনা আছে এবং পরিচালনা করেছেন; তবে ছবিটিতে সুস্থ ভাষা বজায় আছে। ছোট ছবিগুলির মধ্যে 'চিত্রা', 'অবর্তন অফ বীজ', 'বি এগিনিয়ার', 'ডিসাপয়েন্টমেন্ট', 'ইন সার্চ অব রিদম' (নাচওয়ালাদের ওপরে), 'ফাইসেস ফোসী', 'দিয়ে ফেলকার অফ দিজ মিউজিয়েম', 'আওয়ার ইয়ুথ' দেখান হয়েছিল। ছবি-গুলির মধ্যে ফোটোগ্রাফী, সম্পাদনা, সম্পাদনা প্রভৃতি বিষয়ে যৌথতা পরিলক্ষিত হলেও বিষয়বস্তু চিন্তার যেন কিছুটা দৈন্য দেখা যায়। মনে হয় ইয়োরোপীয় আধুনিক চলচ্চিত্রজগতের মৌমাছিরা পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটেও সংক্রমিত হয়েছে। মহৎ 'দ' এলিট ক' ছবিটি হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। একটি ভাঙ্গাচোরা পড়ো বাড়ি মতভেদকে ঘিরে মানুষের বৈচিত্র্যময় মানসিকতার প্রকাশ ঘটান হয়েছে সুন্দরভাবে। তথ্যচিত্র 'দিয়ে ফেলকার অফ দিজ মিউজিয়েম', 'ইন সার্চ অব রিদম' ও 'ফাইসেস ফোসী'র মধ্যে প্রথমটি বিশেষ আকর্ষণীয়।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস এসো-সিয়েশনের সভ্যবৃন্দ সভাপতি অশোক সরকারের নেতৃত্বে ফিল্ম ইন্সটিটিউট এবং ইণ্ডিয়ান আর্কাইভ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিচয় গ্রহণের সভাগৃহে একটি সুন্দর ঘরোয়াপরিবেশ আলোচনা সভার মিলিত হয়েছিলেন ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায়।

গত ২৩ জানুয়ারী '৭০ রামরাজাতলার পশ্চিম হাওড়া রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলন, বালীনিকেতন ইন্সটিটিউট ও সঞ্চারণী পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মিলিত উদ্যোগে নেতাজী অভ্যুদয়ের পালিত হয়। শ্রীঅতুলের লাহিড়ী সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীসুবোধ-কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীউপলক্ষ্যে যে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সকলকে জলযোগ করান। শ্রীসমর মৈত্র নেতাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর দেন। এবং ইহার পর ইউ এস অই এস ফিল্ম ডিভিশনের সৌজন্যে এ্যাপোলো — ১২ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১১ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যা সাড়ম্বরে সোদপুরের (২৪ পরগনা) উদ্যমের সুপরিচিত সংস্থা 'সবুজবিহার' স্থাপন প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব-অনুষ্ঠান বিপুল উল্লাস ও উদ্দীপনার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হল। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমল সেনগুপ্ত, অতিথি এবং উদ্বোধক যথাক্রমে সর্বশ্রী মানিক সরকার ও বিমল কর। শুভেচ্ছা সব সেরেছি ক্লাব (সোদপুর)-এর সভ্যরা সমবেতকণ্ঠে সঙ্গী-তের মেলমেলের অপিসমরী গান গেয়ে অনুষ্ঠান সুরের সূচনা করেন। সংস্থার তরফ থেকে স্বাগত জানান শ্রীদীপক সরকার। উদ্বোধক, অতিথি, সভাপতি এবং সংস্থা-সভাপতি ও এই তিন ব্যক্তির সুস্থ প্রদর্শনের সভাগ্রহণযোগী ভাষণের পর বিভিন্ন অনু-ষ্ঠানের আসর জমে। সোদপুরের স্থানীয় শিল্পের ওপর নির্মিত সুবিখ্যাত আসরে সমবেতিক সভ্যাবলী মুখোশিরের সুখ্যাত ও অনুকরণ বিশেষীদের সুস্থা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, কৌতুক-গান, কৌতুক-কথা, বন্দনসঙ্গীত

গান্ধার নিবেদিত

চালকা সেনের এ্যান্টি মে

তারারা শোনেরা!

(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

মুক্তি অঙ্গনে ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে টিকিট পাওয়া যাবে

ওস্তাদ আলাউদ্দীন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

(ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালচারাল রিলেশন্স)

অভিজ্ঞ শিক্ষকবর্গ—বৈজ্ঞানিক পাঠক্রম

নিম্নে প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যে প্রতি বিশেষ যত্নের দান।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ-সেতারী

শ্রীঅজয় সিংহরায়—প্রিন্সিপাল

শ্রীহরিদাস বিশ্বাস—সেক্রেটারী

ভোজিত মেয়ার মার্সারি এন্ড ফিল্ডার গার্ডেন্স

২০৪, আচার্যপ্রফুল্ল রোড, নতুন পল্লী, আলমবাজার, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ—৩৮

৪৭-৩৫৩০

ছাবি দর্শক স্বীকৃতি পর্যন্ত উপভোগ করেন। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সর্বশ্রী অনন্তর ভট্টাচার্য, সুবীর সেন, মৌলেন্দু চৌধুরী, মানসী রায়, নিখিল দত্ত, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী ভট্টাচার্য, শ্রী বাগচী, মীরা বিশ্বাস, সোনালী রায়, নলিনি চট্টোপাধ্যায়, সুদিপ্তা রায়চৌধুরী, মনু ঘোষ, হরিপদ চৌধুরী, শিল্পী দত্ত, মনু চৌধুরী এবং 'দি ডার্ক' আইজ'-এর কর্মীরা। সাম্মেলক গানে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী সুরমা রায়, সুপ্তা মজুমদার, রাহুল দে, পরবী দে, শকুন্তলা সাহা, শিবানী চাটার্জি, মৌরী ঘোষ, অঞ্জন চৌধুরী, তৃপ্তি ভৌমিক, গীতা মজুমদার, সুদীপা বসু, অনিমা বর্মন, আরতী মোক্তারস্টলার, মিতা মোক্তারী, সুমিতা দে, শিবসঙ্কর মোক্তারস্টলার, লিপি মোক্তারী, তরুণা-দাস—রবিশঙ্কর মোক্তারস্টলার। সর্বশ্রী হিমাদ্রি পালচৌধুরী, দীপক সরকার, মিলি ঘোষ ও বিমান চৌধুরী সুমিলন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটি সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে।

সম্প্রতি সারদামণি সার্বজনিক লাইব্রেরীর ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নবনির্বাচিত কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি — শ্রীসুবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী হরি মুখার্জি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ কাউল, প্রেমলালাল সোরাল ও অনাদি চৌধুরী। কার্যসচিব—প্রেমেন্দ্র দে ছিপ্পী। সহ-কার্যসচিব—সর্বশ্রী শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সমীর পাল। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকল্যাণকুমার দে। সহ-কোষাধ্যক্ষ—সর্বশ্রী সুনীল মৈত্র ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক—সর্বশ্রী সুনীল মৈত্র ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক—শ্রীসুশীলকুমার কুণ্ডু। দ্বিঃ গ্রন্থাগারিক—শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী। সদস্য — সর্বশ্রী সুশীলকুমার চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, পরেশ মৈত্র, প্রফুল্ল মন্ডল ও শিবপ্রসাদ রায়।

ক্লাস থিয়েটারের সদস্যরা কিশোরুপা মঞ্চে প্রতি মাসে তাদের প্রযোজনা সুপ্রভাত নাটকটির একটি অভিনয়সূচী গ্রহণ করে। তাদের বৈশাখীর পট-ভূমিকায় রচিত উক্ত নাটকটি বেশ কয়েক রজনী সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয়। নতুন অভিনয়সূচী ৯ই জানুয়ারী ৩১ জানুয়ারী শনিবার আঠারোটা থেকে আরম্ভ হবে। প্রযোজনা প্রধানে নিমাই ঘোষ।

কিশোর ইনস্টিটিউটের ছবি

মার্কস্ এ্যান্ড বীজ

উত্তর বাংলার লোকগীতে নরনারীর প্রেম

উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ভাওয়াইয়া ও চটকা গান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গানগুলিতে যেমন সাংস্কৃতিক অবধারায় প্রভাব নেই—তেমনি একান্তই মৌলিক এবং নিজস্ব মিষ্টতা পরিপূর্ণ। এর সুরের বেদনাতি মুখ্যত, পল্লীর কোন গানের আসরে, কক্ষেত্র অথবা নির্জন কুড়ে ঘরের দাওয়ায়। এ গানে আনুষ্ঠানিকতার কোন বালাই নেই—একটি টান ছাড়া কুলে নয়, একান্তই অকৃত্রিমভাবে মুখ কুলে। কিন্তু এতেও মনে আসে, বোল ও অনুভূতির নিবিড় আত্মে এবং বাঁশরির এই প্রকাশভঙ্গীকে আরো অর্থবহ করেন। এই গান ছড়িয়ে আছে এখানকার ভাদে, বাজারে, খেয়াঘাটের নৌকাতে, কিষাণ ভাইটির কর্মে এবং নারী-হৃদয়ের ব কথায় ভেতরে।

ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের প্রধান বিষয়বস্তু নরনারীর প্রেম। এই প্রেম কি সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিবাহ বিচ্ছেদ ও অসবর্ণতার জটিল-আবর্তের ভেতরে একটা সর্বকালীন এবং সর্বজনীন রূপ আছে। তাই "চন্দন বাথা ফোড়া গাও" কেন কথার সাথে দেখা হলে পল্লীর যুবক যখন প্রশ্ন করে—

"ও কন্যা চন্দন বাথা ফোড়া গাও
করেন না করেন রাও
গাওখান্ যোহুলেরা যাও"

(ও চন্দন বাথা কন্যা তুমি যেয়ে, ওরা বলা আর নাই বলা গা ফুলে যাও অর্থাৎ দেহের স্পর্শ দিয়ে যাও)।

সে ভাকে যেমন সংকোচ না রেখেই মেয়েটি সাড়া দেয় এবং বলে।

"আই হলু ভালের নারী
তোহার হইলেন তোমরা—
বসলেত বসিয়া বন্ধুরে বাজান যোয়েরা।"

বন্ধুর কাছে বসে মোয়েরা সোনার ইচ্ছের পোহনে যে মানসিকতা কাজ করে সেটা হচ্ছে যৌবনের সংঘাতিরক্তা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং একটা নতুন জীবনের সুখের স্বপ্ন। তাই কিন্তু, মনলাই, ধরনের নারীর যারি আইটির একনিষ্ঠতার মাঝে হঠাৎ যেন সুন্দরীকে কাছে পেলে তাকে

মনের কথা জানাবে—এটাই স্বাভাবিক এবং একটি বিশেষ বয়সের স্বাভাবিকতা। তার আগ্রহ সে নিবেদনের প্রকাশ করে। "শিমলের ঘুটার নাও" বলে মেয়েটি নৌকার ভার বইবার ক্ষমতার সন্দেহ প্রকাশ করলে মাঝি ভাইটি উত্তর করে।—

"শিমলের মোরাই সেলুমে মোরাই
এল পবনের নাও
তাহার হাতিকে পার করিয়ে যে—
ও কন্যা, তোর যা কর তরা।"

অর্থাৎ শিমুলে নয়, সেলুমে নয়, এক পবনের নৌকো। যে নৌকোতে মাঝি তাই তাহার হাতিকে পার করে দিয়েছে। ওজনের ওজন আর কত বেশী হতে পারে। তাই নিশ্চিন্তে কন্যাটি তার শক্ত সমর্থ বাহুর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে—যে বাহু দুটি নিরাপদে বৈঠা চালিয়ে নিয়ে যাবে মেয়েটিকে কাঙ্ক্ষিতস্থলে।

ঠিক তেমনি কিশোরের নির্ভরতার বাহুতে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে কোন পল্লী-বালা তাকে আপন করে আসবে, তাকে তার ভাল লাগবে—এটাই স্বাভাবিক এবং একটি বিশেষ বয়সের স্বাভাবিকতা। [illegible]

মনে অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন এসে যেত। জীবনে জীবন যোগ করার অর্থে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে বসে বন্ধুটির বাড়ী কোথায়। বিশেষ করে সে জানতে চায়।

"সত্য কইরা কও হে বন্ধু
ঘর কয়খান বাড়ী।"

মানুষে বন্ধুত্বে জীবনে এই মেয়েটি প্রথম শ্রেণিক কিনা এ প্রশ্নটি বার বার মনে আসছিল। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার স্বার্থ, বিবাহিত জীবনের সুখ আর সুন্দর ভবিষ্যত। তাই মনে যায় একটি প্রশ্ন থেকে যায়— সে আবার জিজ্ঞেস করে—তার আসার করে নিতে চায়, বন্ধুর কাছ থেকে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে।

"মেইলে কি আসিবেন মোর বাড়ীত
বন্ধুরে।"

মানুষে বন্ধুকে ভাল লাগলেও কিন্তু তাকে বাড়ীতে আসার একজন জানানো কারণ সংকোচের জড়তায় মেয়েটির পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু ওটুকু এলাকার মধ্যে ধার্মিক প্রচলিত অনেক আছে যারা বন্ধু আসতে যায় কথা বলে হাতে নিজে। পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। তারা নয়নে। আলবাসে। সেই একই প্রশ্ন করে—বাড়ী কোথায় ঘর কয়ে কে আছে। তার পরেই খুঁজে পান যাবার নিমন্ত্রণ জানায় বলে কোন দ্বিধা এবং সংকোচ না রেখে।

ঠাকুর মাকন সুপারী বন্ধু
কুলার নাকন পান
বাটা ভরা সুপারী আছে
আমার বাড়ী যান।

(পানির মত সুপারী আর কুলের মত পান। বাটা ভরা সুপারী আছে আমার বাড়ী যেও)।

যৌবনের এই হঠাৎ দেখা সংসারে সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ এবং তাকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে একটি আবেদন আছে। এই উৎকণ্ঠা এখানকার অনেক গানেই পাওয়া যায়। যেমন।

এ বন্ধু রইতা না যান তে
দুখে পরান দিয়া
হাটিয়া যাইতে বন্ধুর ছোলে
আছাড়ে কাকিনী গাছের গুয়ে।

(হে প্রিয় দুঃখে প্রাণ দিয়ে ছেড়ে যেও না, ছেড়ে গেলে তোমার পুরোনো সুপারী গাছের মত ভেঙে।)

এ ভোলা যৌবনের ভোলা—উৎসাহিত হৃদয়ের ভোলা—অনাস্বাদিত আনন্দের ভোলা। তাই মেয়েরে বন্ধী মনের অজান্তে ওরা সহজে-ভাবেই স্বীকার করে :—

"আড়পালে দুঁড়ি বন্ধী
মরল বন্ধী জলে
আমি নারী হইনাম বন্ধী
তোমার প্রেম জালে।

অর্থাৎ মেড়পালে যেমন ছোটকী বন্ধী হয়ে থাকে, জলে যেমন মাছ বন্ধী, ঠিক তেমনি তোমার প্রেমে আমিও বন্ধী। এই বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। একে ছিন্ন করা সহজসাধ্য নয়—এই আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি নেই। এবং পল্লীর নারীটি এই সত্যটিকে স্বীকার করতে লজ্জা পায় না। সে বলে :

আরে সোনাহাকীত, যেন ডিটল মাটি তোমরা হইলেন যেমন মোর গরমর মাটি।

অর্থাৎ নদীর জলকুড়ির যেমন এঁটেল মাটি তেমনি তুমি আমার পরম মাটি।

কিন্তু পরম মাটি হয়ে থাকার ইচ্ছে অনেকেরই পূর্ণ হয় না। যে চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। তাই এই আকুলতা ঝরিয়ে পড়ে এসব গানে। বিশেষতঃ সেই মেয়েটির জন্যেরা যে কখনো তোমরা বন্ধু করে ফিরে আসবে সেই প্রত্যাশা ওদের জানার জন্য মানস। কারণ। বন্ধুটি যদি না ফেরে, যদি মেয়েটির মায়া ভাঙ্গ করে—এই সংসার থেকে অবহেলিত পাবার জন্য সে বন্ধুকে বলছে :

"যদি বন্ধু যাবার চান
যাবার পরান্যা যাইয়া যান।"

বন্ধুর সহানুভূতিলাভের জন্য এই আত্মোৎসর্গের ভাষাটির মূল্য মেয়েটির কাছে কম নয়। তাছাড়া এই গানগুলির সুর আর বন্ধুটিকে টেনে আনবে একটিমন। বন্ধু চলে যেতে। বন্ধুর পথ চেয়ে অহরহ গুনে গুনে থাকা। কিন্তু অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। কারণ সে জানে।

যাবার বল লক্ষ্যপাতা নদীর বল পানি
মাইনষের বল টাকা পয়সা, মায়ার বল
মেহেরবানী।

মেয়েটি উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় থাকে দুঃখ গান গায়।

"ওকি গাড়িয়াল ভাই হালও গাড়ি দুই
চিলমারির বন্দরে।
যৌবন গাড়িয়াল উজান যায়
মায়ার মন মোর ঝুরিয়া যায়
ওকি গাড়িয়াল ভাই—
ঘর ছাড় আমি পরের দিয়ে
চাকরা রে।"

কিন্তু না। বন্ধুটি এল না কাছে। সব চাইতে অসহায় কাপায় নায়িকার মনের পাশ বিয়েই সহজ চলাফেরা করে। কিন্তু চোখের জলে বুকের ব্যথা দেখা পাওয়াই যুক্তিযুক্ত। অথবা উৎসুলিত যৌবন। তাই সন্দেহাতীত মেয়েটিকে বিশ্বাসের পরীক্ষা দেয়। মনের আগুনে বিশ্বাস জ্বলেছে। সে আক্ষেপ করে :

মনের আগুনে জ্বলে জ্বলে
খাকরুয়া আমার জ্বলে।
দুই অভাগীর বুকের আগুনে
বিনে রাইতে জ্বলেরে"

প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেখা এবং তার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষার অবসরের ভেতরেও একটা অসন্তোষ আছে। কারণ, বিরহ প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দিক। কিন্তু যে মেয়েটি উৎকণ্ঠিত? যে মেয়েটি দৈনন্দিন তার বন্ধু ছাড়াই আশিনের দিনে অন্য একজনের বাড়ীতে যাচ্ছে তার মনের অবস্থা কি?

বন্ধুটি নানাভাবে তাকে অবহেলা করে। বন্ধুটি গান গায় কিন্তু মায়া ভুলেও তাকায় না। জলের ঘাটে যাবার পথে মেয়েটি অনেক ধরনে পাঁড়ায়। প্রেমে ইসারা করে। কিন্তু বন্ধুর মনে তা কোন রেখাপাত করে না। মেয়েটি ভাবে :

"কিসের মোর রূপযৌবন
কিসের মোর বাহারন
কিসের মোর বুলবিবাণী
মোর প্রানবন্ধু অনের বাড়ী যায়
মোরে—আগুনে দিয়া যায়।"

এই উপেক্ষা মেয়েটির কাছে অসহনীয়। তাই সে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

"এ প্রেম বৈরন সংসারে জানায়
পাতাল জলিয়ে যাব।"

এই প্রেম পরিণতির আগুন এবং আগুন ছড়িয়ে আছে আত্মহত্যার ও ছড়ার গানগুলিতে। এই গানগুলিতে আছে উৎসুলিত যৌবন এবং মনোলতার উদ্ভাস—না, এখানকার গানের ভাষায়, এখানে পাত্র না নদীর পাড়, মনের পাখী, মনের ঘুড়ি, মনের পাশ আর সেই বন্ধুটি যে তোমা করে আছে, ঠিক তেমনি আছে বিরহ-বিষাদ এবং উপেক্ষিত যৌবনের বন্ধুর জ্বালা। হতাশা, ক্লান্তি আর হাহুতাশ। বন্ধুও এসে হাসে, গান গায়, গান জাগে, বাঁশ জাগে আর নতুন বন্ধুর খোঁজ করে। সেই পায়, সেই পায় না। দিন গড়িয়ে চলে।

শহরিয়ার চক্রবর্তী

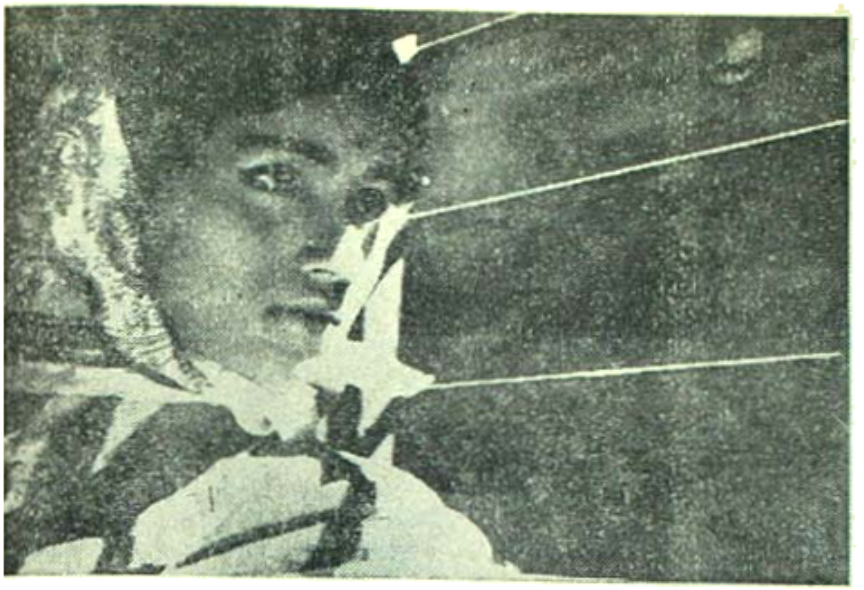

অন্য চিন্তা

নাটকের নাটকীয়তা আর সিনেমার নাটকীয়তার মধ্যে তারাক কতটুকু? একজন চলচ্চিত্র পরিচালককে এ প্রশ্ন করেছিলাম একবার; জবাবে তিনি বলেছিলেন—'নাটকের নাটকীয়তা কেবলি তার সামনে দাঁড়ানো, সিনেমার সেই একই বস্তু অতি নাটকীয়।'

মেয়েটা ঠিক পরিষ্কার হয় নি তখন। মধু দিন যাবে তখন একটা একান্তিকের জন্যে কিছুটা মুক্তোর মালাগাছি। সেই একান্তিকে আর সিনেমারিয়াল একখানা ছবির ঘ-নাটকীয় কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে।

ন—(আবেগে) চিত্রা! তোমাকে আজ দেখা-মাত্র একটা কথাই আমার বার-বার মনে হচ্ছে চিত্রা!

চা—কিন্তু দিদির চিঠিতে তোমরা আপনাকে এত কড়া আসা সে তাকে নি। আপনার জীবনের ভুল যখন ভেঙে যাবে, তখনই সে আপনাকে পাবে, এই আমার সে বলে গেছে।

ন—তবে তাকে বৈমাত্রেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বলো চিত্রা। আর তুমি এসো আমার জীবনে। আমার জীবনের আঁধারে উঠে পড়ো চিত্রা!

চা—কলঙ্কের ভয় করেন না আপনি?

ন—কলঙ্ক আছে বলেই না এ চাঁদ এত সুন্দর। সেই রোহিণী রোহিণী, যা কলঙ্কের ভয় করে না—যা বেপরোয়া।

চা—জানি। কিন্তু বেপরোয়া জীবনে আমাদের মুক্তোর মালা যদি খসে যায়? যদি আমি হারিয়ে চলে যাই আর কোনোখানে? তাহলে যদি লাখে আমার আশা কোনো জীবন? সইতে পারবেন আপনি সেটা?

সেন—মধু মুক্তোর। তোমার দিদি বলেন একনিষ্ঠ প্রেমের কথা। কিন্তু চিত্রা, জীবনটা অনেক বড়ো। মানুষের মন বড় তার চেয়েও। তোমে কখনে বাঁধা পড়া মানেই জীবনটাকে ছোট্ট করা। তাই নয় কি চিত্রা?

চিত্রা—মধু!

সেন—চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

ধারান্দে—চা।

সেন—থাক চা। বাইরে উঠেছে জোৎস্না। ঐ জোৎস্না নিয়ে চলো কাজলডাঙ্গা। চলো বেরিয়ে পড়ি। তুমি ওভারকোটটা নাও। কি আশ্চর্য?

চিত্রা—আশ্চর্য অনেক কিছু। আশ্চর্য দিদি আপনাকে দেখলো না—দেখলাম কিন্তু আমি। মনে পড়ছে আজ চিত্রাঙ্গদার কথা।

এবারে সেন্সরে চিত্র-নাটকীয় কিছু অংশ।

লীলা—(ব্যথিত সুরে) চলবে?

অমল—ব্যা। তারপর আর কি? ঘরে-বাইরে সর্বত্র তো তাই দেখছেন? এটা ভাবছেন না যে তাকে আপনার যা হবার তা তো হয়েই। কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করে আরেকজন তার ভুল ভোগ করবে।

লীলা—সে ভাবনাও তাদের।

অমল—সে ভাবনা তাদের সুযোগ তাদের বিয়েছেন আপনি? বলবার কিছু সে আপনার?

লীলা—না, বলি নি. বলব না। ভাবব না। ওসব ভাবনে সুখী লোকেরা। যারা খায়-দায় বড়-বড় কথা বলে। আপনার মত বড় লোকেরা। যারা দূরে থেকে অভাব দেখে। আমাদের ভিতর ঘরে যিদের চিন্তা। অমল একবার।

অমল—বড়-বড় কথা বলে, দূরে থেকে অভাব দেখে, তাদের কখনও ক্ষমা চেয়ো না। এতগুলোর সঙ্গে চেলাচেলা করে না। চেনক চিনতে হলে আপনার। ভাবনা চলবে কি করে?
(লীলার চোখ জলে ওঠে এবার)

লীলা—অমল? কি বলতে চাইছেন আপনি?

অমল—যা আমি নিজেই বুঝতে পারছেন। আপনার ভাগ্যে দুটি ছাড়াও আরো একটা জিনিসের দরকার হয়। সেটা আপনার জানা আছে।

লীলা—আছে! সেই জানা ছিল না। সেটা এই যে, আপনি একজন মেয়েকেও আজীবন দেখে জলসার করতে পারেন। এটা জানতে পারি নি।

অমল—কেন পারেন নি? সমাজে ছেলেদেরই তো আমার পাঁচজন আপনার মানা হয়ে থিয়েছিল।

লীলা—ভুল তো হয় মানুষের। আর আমি তো সাধারণ মেয়ে।

অমল—সমানুভূতি চাইছেন? ছোট্ট অবিচারে? কখনও ভেবেছেন তার চোখ দিয়ে আপনি? কখনও ভেবেছেন তার মন দিয়ে পারেন কিনা?
(লীলা কিছু সময় স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখে জল। অমলার ভেসে পড়ল। মধু হাতে মুখ ঢাকল সে।)

অমল—লীলা! (লীলা মুখ ঢাকা অবস্থায় মাথা নাড়তে লাগল।)

লীলা—আমি কিছু চাই নি.....আমি কিছু চাই নি। আমাকে.....আমাকে দয়া করুন আপনি!
(লীলা কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। তার থিকে চেয়ে অমলের দৃষ্টি কোমল হয়ে গেল। উঠে লীলার কাছে গেল। তাঁর হাত ধরল তার। লীলা সম্বিৎ ফিরে পেল।).

মুক্তো মুখের চাঁদ, ঘরে, স্বপ্ন ঘটার ইত্যাদির মধ্যে ছিল কিছু মেই ঠিকই কিন্তু নাটকীয়তা বস্তুটি যে আমাদের আজ স্বীকার করতে হবে। এ নাটকের ছুমাটি-সিনেমা নাটকের গতিকে এগিয়ে দিয়েছে বেশ দ্রুত তালে। কিন্তু চিত্রনাট্যে যে ছুমাটি-সিনেমা তা কি যথেষ্ট যথোপযোগী? তার কথা আমরা পরীক্ষা দেখার সময় ছোট-ছোট খুঁটি বেশ আরেকটা ছোড়-আপও থাকবে। তাতে নাটকীয়তা আরও বাড়বে নিশ্চয়ই।

মুক্তোর। তবে আর পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের দ্বারা বরঞ্চা নাটকেরও সেই অনুসারে হয়ে সাঁয়ের রাখা দুটি যথেষ্ট নিদর্শনযোগ্যেই পরিচয় দেয়।

—নীহারেন্দু

খেলার কথা

ফাস্ট বোলিং— সেকাল ও একাল

কমল ভট্টাচার্য

এবারের কলকাতার টেস্ট ম্যাচের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় হাজারে অবসর বিনোদনের জন্যে ইডেনে গিয়েছিলেন। সেখানকার ক্রিকেট রসিকরা সদ্যসমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জানতে চান। 'ফাস্ট বোলিংয়ের ব্যাপারে ভারতীয় দল ছেলেদের খুঁজিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন না কেন?'—সেখানকার ক্রিকেট রসিকদের একজনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হাজারে মেরে ফেলেন। এক সময়ে যে বিজয় হাজারে বিপক্ষের কোন ফাস্ট বোলারকেই ক্ষমা করে দেন নি, হাজারে সোজাসাপটা করতে গিয়ে সেঞ্চুরী, ডবল সেঞ্চুরীর আগে যাঁর কখনও কোন অস্বিধাই হতে দেখা যায়নি, সেই হেন মানুষ আজকের ফাস্ট বোলিং সম্পর্কে দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কথায় কুঁকড়ে গেলেন।

'কি লজ্জার কথা বলুন তো! এক রাধা কৌকড়ান সাদা-সাদা ছেলের জন্যে হাত বাড়ানর হাজারে সোজা জবাবটা ছোটদের মতো হেসে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন, 'একটা একটা করে যদি দুটো ফাস্ট বোলার পাওয়া যেত! যদি মনমত নিলাম এবং আমার নিজের মত দুটো জাঁদরেল ফাস্ট বোলার আজকের দলে ঢোকাতে পারতাম—তাহলে?' একটু থেমে নিলে হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, 'অন্তত যদি সুটে বানার্জির মত ফাস্ট বোলার থাকত?' মুহূর্তের মধ্যে সাদা আজটে ছেলেটার কে যেন লাল আলিস ঢেলে দিল। উত্তেজনায় হাজারে মুষ্টি ধরধর করে কেঁপে উঠলেন। বাঁ হাতের সামলে নিয়ে হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, 'আজ যদি বোমিং থাকত, যদি সেই সোনার দিনগুলো একবার ফিরে পেতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম ওদের আমরা কারা! ফাস্ট বোলিং . ফাস্টার-বীমার এগুলো কি কোন সমস্যা নাকি?'

হাজারের এই পরিবর্তন সবাই লক্ষ করলেন। কিন্তু মুখে কিছু তাঁরা বললেন না। যেন তাঁরাই পাগল হয়েছেন, ঠিক যেন বোমিংয়ের বিজয় হাজারে। সোনার হরফেই পরা, কপাল ছুঁয়ে কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল, মাঝিমুখী মুখ, ডান হাতে ছিপ এঁকিয়ে চলেছেন। কখন ফিরবেন যে জানে? বোলারদের কথায় হাজারে যেন দুজোড়া চোখ। ছেলে করে কথা বলা। তাঁর যেমন দেবদারুর কাঠি, তেমনি কথার স্ট্রাইক বলবারীর। অব্যর্থ নিশানা। সে খেলায় চঞ্চলতা নেই, যেন কাঁচও নেই। 'কাঁপ মুক' ফিরেই বলতে যা বোঝায় হাজারের খেলা ছিল ঠিক তাই। এইসব ভাবতে ভাবতেই সবাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। হাজারে সবার খানিকটা অলক্ষ্যে হয়ে উঠলেন। যা ছিল তা আজ আর নেই। দুঃখে যেন কথা ভেঙে যাচ্ছে কি? শ্রোতারা হাজারের মোহাচ্ছন্ন হলেন। তাইতো কি সব আজেবাজে-কাজেবাজে ভাবনা। সবাই নড়ে চড়ে আবার ছেলেরা বসলেন। হাজারে সেই সচকিত ক্রিকেট অনুরাগীদের কিন্তু খুশী করতে পারেননি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলে ওঠেন—না ভাই, তামাম ভারত খুঁজেও একটা ফাস্ট বোলার খুঁজে পাইনি। একটিও না। দেখাই যাক কি হয়।'

ইডেনে টেস্ট ম্যাচের ঠিক দুদিন আগে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার প্র্যাকটিস দেখতে অনেকেই গিয়েছিলেন। সেই অগণিত এক ক্রিকেটারকে দেখে বহু ক্রিকেট রসিকই

সুটে বানার্জি

হা' হা' করে উঠলেন। পরিচিত খেলোয়ার বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠলেন—এসো বিজয়দা এসো। একবার দেখে যাও ভারতীয় দলের প্র্যাকটিস— ফাস্ট বোলিংয়ের অভাব। ভারতীয় দলে বাংলার সুব্রত গুহকে দেখেছ কি? বিজয় মিত্তির, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, চালচলনে পাকা ক্রিকেটার বলে মনে হয় না। পান চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এলেন একগাল হাসি নিয়ে। লক্ষ করলে ধরা যায়, ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। আজকের ছেলেরা সচকিত চাউনী মেললেন বিজয় মিত্তিরের দিকে। নাক সিটকালেন প্রথম দেখা দেখেই। কি আনস্মার্ট চেহারা! তাঁরা বিজয় মিত্তিরকে জানেন তাঁর মুখ খুললেন। বিনা দ্বিধায় বলে উঠলেন—'আজও যা সেদিনও তাই ছিলে। বয়সের ভারে যা বেঁকে গড়েছ। যেন তাদা মাছ উলটোতে জান না।' কিন্তু কি সে হয়, বল পেলেই বিজয় অগ্নিমূর্তি'। পা গুলে গুলে ঠিক ৮'স্টেপ পা দৌড়ে বল করতেন। তবে ঐ জোরের সঙ্গে যদি বোলিংয়ের তাল আর নিশানা ঠিক থাকত তাহলে কাউকে আর ধরে খেলতে হত না। কোথায় লাগে সুটে বানার্জি'। ঝুঁ করে যখন উইকেট ছিটকে যেত তা দেখে বুক টিপ টিপ করত'। ধনি বোলার এই বিজয় মিত্তির। এই ধরনের আলাপ আলোচনায় বিজয় মিত্তির আর দাঁড়ায় কি করে। তখন সবাইয়ের দৃষ্টি তাঁর ওপর। আস্তা তিনি মুখ খুললেন বন্ধুবর খোকন সেন এবং পাটৌদি ছোটবেলার কাছে—'তাইরে নাইরে নাইনা ছবি তোলার হলোয় বাংলার হয়ে যারা এক সময় খেলেছিল তাদের নাকি একটা করে টেস্ট ম্যাচের টিকিট দেওয়া হবে। হাতে পাব তো?' তাঁর কাকুতি-মিনতি দেখে বন্ধুরা রসা পেলেন: তাঁরা যেন সেই পুরোন দিনের বন্ধু বিজয়দাকেই খুঁজে পেয়েছেন। গল্পে গল্পে সবাই তন্ময় হয়ে গেলেন।

'বিজয়দা, ঐ সাহেব খেলোয়াড়টা যে তোমার কতদূর যাচ্ছে সে। একটু সময়ের বল দাও দিকি।' বলা আর দেরি নেই। দূরে দাম বল ছুঁড়তে লাগলেন তিনি। মোজায় ঢাকা সত্ত্বেও বুঝতে দেরী হয় না সাহেবকে আউট করতে পারছেন। খেলোয়াড় এরিয়াল্স ছক্কা। এক সময় তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন সুটে বানার্জি'।

সাহেবদের অঞ্চলে বাংলা বলে তাঁর স্থান হয়নি। সাহেবরা বলতেন, মিত্তির বড় 'ইরাটিক'। বাংলায় হয়ে ফার্স্ট ইনিংসে খেলেছেন বেশ কিছুকাল ধরে। তখন তাঁর

ার পড়তি বয়স। ১৯৪৪ সাল
ক্রোরের মুখোমুখি আলী ব্রিগেডের ঘরে
তে গিয়ে দেখি হাজির ছেলেরা। বাংলার
আজানা কান্ট বোলারের এত ভেড়া
ই যায় না। চ্যাপ্ট ব্রিগেডের ড্রেসিংরুমে
পাহাড় লাগাতে। ব্রিগেড ভাবলেন, এবার
চারের ঘায়ে গুঁড়িয়ে দেবে। কিন্তু
চাল ঘরে কথা। ঘাটের ঢেউয়ের ব্রিগেডে
চনাবুদ্ধে করে ছাড়লেন। সে ঘাসও নেই,
অবোধ্যও নেই। এখন বল হাতিয়ে
। ভেড়ার বল দিয়ে চান না। সেভেন
ডের ব্যবস্থাপনায় ব্রিগেড ব্রিজের ঢিলেঢালা
লয়। আর ব্যথা নয়। ঘাটে বড় ঘুমো-
ড়। হাসতে হাসতে ব্রিগেড নিজের
ছেলের ঘাড়ের ওপর অবলম্বনের কান্ট
নার ব্রিগেড ব্রিজের।

ঘাবে, ঘাটিনী লো-রে নিয়েও ঘাবি?
ব্রিগেডের ড্রেসিংরুমে ঘরে ব্যাপ্তের
লেন সেক্টারের কান্ট বোলার সুটে
র্নিং'। ছেড়ে উঠে বললাম—'ব্রিগেড 'ক
, সাহেবদের সঙ্গে খেলা। তুই কি কোন-
। সিরিয়স হবি না।' মুচকি হাসি
া গেল সুটের ঠোঁটে। ড্রেসিংরুমের সবুজে
ঠে বলে উঠল—'স্যর, বৃষ্টি-ভেজা ঘাটে
বে কে? লোটা দলকে সবাই জব্দে
ললেই যা লাগবে। বাবি কিনা বল্?'
ঘরে থাকতে পেরে সুটে দাঁড়িয়ে উঠল।
ক্স দিয়ারেই আঙুলের ডগা দিয়ে
ইবে ফেলে দিয়ে হাতের আড়ষ্টতা কাটাতে
লতে সুটে বলার মধ্যে একটু; ব্রিগেডের
ন বলল—'স্যরেদের বল খেলেছিস।'
রে ছেলে উঠলাম। কিন্তু সুটে ছেলে
ন্যর। তার বলার ধরে মো মো হাসি ঘরে
ব্রিগ পায়ের স্প্রোস-ঘরে সবাইকে হক-
খি করে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

বৃষ্টিভেজা ঘাটে সুটে ঘোলিংয়ের
ঘরোয়া কান্ড যে ঘরুরে সে-কথা ভেবেই
আড়ষ্টগ্রস্ত হয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। একরোখা
ঘরের, ঘরণও যা করেও তা।

ঘ্যাটিনী লো-রে ঘারে ঘাওয়া ঘরানি,
তবে বেশ কয়েকজন সবুজের ক্রেসিংরুমের
খুচরো ফাইরোফিসেন। সেরকম ঘরনের
বেসিং খুব কম দেখেছি আমি।

ঘরোদের কথা বলা, ব্রিজে-ঘাসিরে ঘলা
এ ঘার ঘাতে সইত না। ঘমায়েত প্রতিবাদ
করতে গিয়ে সে নিজের ঘাথের মর্ম
ঘরোছে। ঘোলিংয়ে ঘার এত হেড সেই হেন
ঘানুষের ঘরুরো একরোখের ঘোন ঘাঁচ-
নিয়ন্ত্রণ চ্যাপ্ট খেলার সুযোগ ঘটেনি। তাও
প্রবীন ঘরেন।

১০ই ঘানুয়ারী, ১৯৪১। এলাহাবাদে
ইন্ড ক্রোনের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার
হয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঘলো ঘল্প ঘরে
২য় ইনিংসে খেলতে নেমে ১৮৪ রানে আউট
হয়। ১ম ইনিংসে সুটে উইকেট পানিনি;
পেরেছিলেন পিরিঘারী ও ইরিগলাল গাই-
কোয়াড়। তবে ব্যাট ছেড়াতেন সুটে একাই।
তাঁর ৯২ ইনিংসে ঘোলিং এঘারাগের ছিল
২০—১—৮৭—৭। যে সাতজনকে তিনি
আউট করেছিলেন, তাঁরা হলেন—কেন্ড,
মঁজরেকর ও, ওয়ালকট, গডার্ড, গোমেজ,
ঘ্যাকওয়াট এবং ঘ্যাথেসন।

এরপর দেখ চ্যাপ্ট ঘাচ ঘোম্বাইয়ের
ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে শুরু ফেব্রুয়ারী। খেলা
র হলেও ২য় ইনিংসে তিনি যে ঘোলিং
এঘারাগের দেখান, তা লক্ষ্য করার ঘত
(২৪-০—৩—৪৪—৪)।

ইনারী ক্রোন কান্ট ঘোলার চোখে পড়ে
না। চ্যাপ্ট পর্যায়ের খেলায় এমন কোন
ঘোলার নেই যাকে ঘিরে ভারতীয় দলের
লোক্ঃপরান করা যায়। অবশ্য এ-সমস্যা
মেটাতে না পারলে ভবিষ্যতে চ্যাপ্ট খেলার
ভারতের সুযোগ ঘরো যাবে।

দেখা গেছে, ঘোলারক্রমের জোর ঘুরও
কান্ট ঘোলিংয়ের ঘরুরা দেওয়া যায় না।
এ'দের ঘাঁরিয়োগ, চ্যাপ্টনি উইকেটে বল
জোরে ফেলার কোন সার্থকতা নেই। নিস্প্রাণ
উইকেটে ঘাটসম্যানের স্বর্গ তৈরী হয়ে
রয়েছে। স্পিনারও এই ধরনের উইকেটে
কিছু সুবিধে করতে পারে না। ইংলেন
ডনার্ড-অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপ্ট ঘাচে ভারতের
স্পিনার বিশেষজ্ঞ কোন কোন একাই একশ'
খেলে ঘরোছিলেন, ঘপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার
গ্রাহাম ঘরোজির সম্পর্কেও সে-কথা বলা
যায়। কিন্তু গ্রাহামের ভাল ঘোলিংয়ের 'ক
কেউ সুযো দিয়েছিলেন?

সে-কথা যাক। নিস্প্রাণ উইকেটেও কান্ট
ঘোলিং যে করা যায়, সে-প্রমাণ ড' গ্রাহাম
প্রমোজিই দিয়ে গেলেন। বিশ্বের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ এই ঘোলাযাটি খুব জোরে বল দেন
না, কিন্তু তাঁর ঘূর্ণি দেখে আমরা সবাই
অবাক হয়েছি।

এবার শেষ কথা। বিখ্যাত ঘবলাট ইন্ড
গাম্পলীর ঘাড়ি ফিরে যোঁৎ, তিনি ঘলার
মহড়ার ঘাস্ত। ইসারায় ঘলকে ঘলকেন। কথা
ঘলাকেন কি, ঘুখের বোল হাতের চাঁটিতে
ঘোলাতে তিনি ঘাস্থির। কিন্তু ঘলা এত
ফিরে যায়ে কেন? মহড়ার ঘাঁকে
ইন্দ্রনাথ্ সুঁছিয়ে ঘলকেন—ঘাম্, ঘলার
নামিয়ে ফিরে ঘরে হাত চালাতে কষ্ট হয়।
স্পিনার ঘাড়াতে হবেই এই মনোকেপ্ত নিয়েই
ঘন্যাস করে চাঁদ। হেসে ঘলকেন—ঘলা
পাওয়া যায় বৈঁচে। সময়ে চড়া সুরে ঘন্ত
ঘলার হাত চালায়, ঘলা ঘোরের দৈ
ঘুরিয়ে।

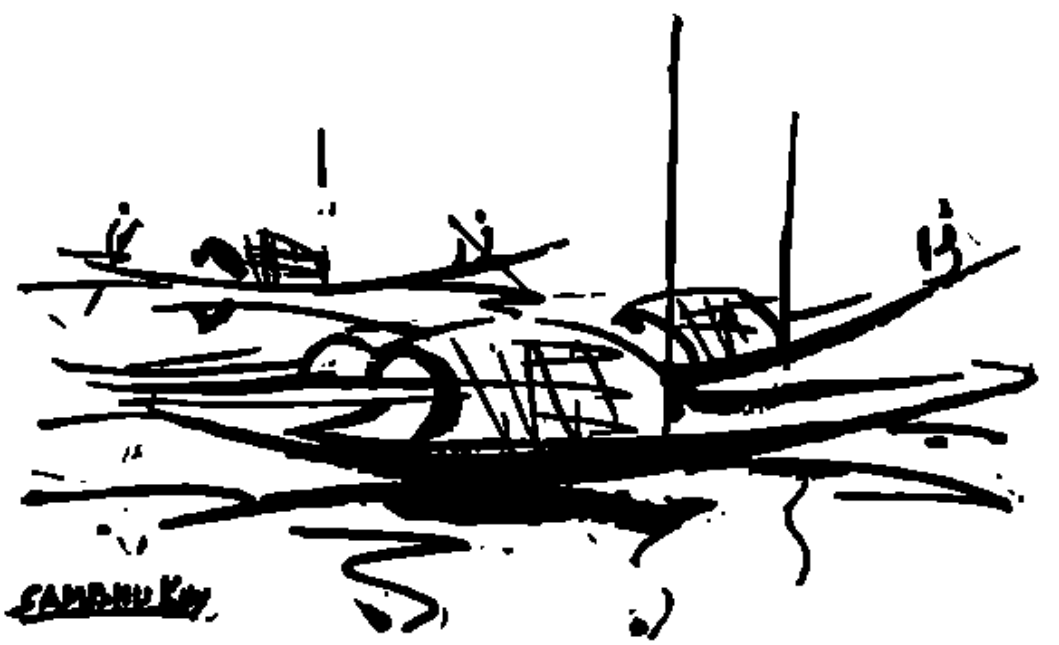

দাবার আসর

রাজা চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে আরো কয়েকটি খেলা দেখুন। প্রথম খেলাটি খেলেন ২নং খেলোয়াড় মহান রাজীব সাথে ৪নং খেলোয়াড় প্রীতেশের খেলার সময়ে। মহান রাজীব ওপনিং খারাবই দুর্বল, কিন্তু মাঝের এবং শেষের খেলায় ওস্তাদ। প্রীতেশ রাজীব দুর্বল ওপনিং-এর সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। সাদা—মহান রাজী, কালো—প্রীতেশ দেব। রাজা চ্যাম্পিয়নশীপ, ১৯৮৯।

(১) ঘ—ঘা ৪ । ঘ—ঘ গ ৪ । (২) ঘ—গ ৪ । ঘ—ঘা ৩ (৩) ঘ—ঘ গ ৩ । ঘ—ঘ ন ৩ (৪) ঘ—ঘ ন ৪ । ঘ—গ ২।

[৪.....ঘ—ঘ গ ৩ চালটা খোব হয় আরো ভালো কারণ ঘোড়াটা কালোর ঘ ৪ এবং ঘ ৫ দুটি ঘরই দেখবে। রাজাটা নিজের ঘরে থাকলে কালো সহজেই ঘ—ঘ ৪ চাল দেবার ব্যবস্থা করতে পারত, যা সাদার রাজাকে আটকে রাখার জন্যে দরকার। সাদা যদি খেলাটাকে পরিষ্কার নিশ্চিতিয়ান ডিফেন্সের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে কালো কোন না কোন সময় ঘ—গ ২ চালটা দেয়, কিন্তু সাদা নিশ্চিতিয়ান ডিফেন্সের দিকে এগুতেই না। কালোর উচিত নিজের ঘ.ঘরকে ঘোড়া ২ দিয়ে এবং এবং রাজা-ঘোড়াকে রাজা ২ ঘরে তুলে খেলা। যখন কালোর ঘ—ঘ ৪ চালটা একটা প্রাণান্তক চাল হয়ে যাবে। তখন সাদার পক্ষে ঐ চালটা বাধা দেবার আর কোন উপায়ই থাকবে না।]

(৫) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘা গ ৩ (৬) ঘ—গ ৩ । ঘ—ঘ ৩ (৭) ০—০ । গ—ঘা ২ (৮) ঘ—ঘ ৩ । ০—০ (৯) ন—ঘা ১ । ঘ—ঘ ৩ (১০) গ—গ ৪ । ঘ—ঘ ১ (১১) ঘ—ঘা ৩ । ঘ—ঘা ১ (১২) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (১৩) গ×গ । ঘ×গ (১৪) ঘ—ঘা ৪ । ঘ—গ ৪

[ঘুঁটিগুলিকে খেলাবার ব্যবস্থা না করে ঘুঁটিটাকে খেয়ে ফেলা ভালো মন্ত্রী চতুরা অনেক সময়ই খারাপ। এতে সাদার ঘুঁটি-গুলি মন্ত্রীকে আক্রমণ করে নিজেদের আক্রমণের সহায়তা করে নিতে পারে। অন্তত দেরী করলে কালোর (১৩).....ঘ×ঘ চালটা ভালো ছিল।]

(১৫) ঘ—গ ৩ । গ—ঘ ২ (১৬) ঘ—ঘ ৩ । ঘ ন—ঘ ১ (১৭) ন—ঘা ৪ । ঘ—ন ৩ (১৮) ঘ—ঘ ৪ । ঘ—ঘ ৪ [এই চালটার ফলে কালোর খেলা খানিকটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এর পরের চালগুলি ঠিকমত দিতে পারলে এই চালটা তবুও খারাপ নয়।]

(১৯) ন—ঘা ২ । ন—গ ৩ [কিন্তু কালোর এই চালটা ঠিক নয়। কালো সাদার ৫১ নং চালটা খেতে দিতে পারে নি। (১৯).....ঘ—গ ৩ চালটা দেয়া খুবই উচিত ছিল, তাতে অন্তত পক্ষে খেলাটা ধরে রাখা যায়, এখন কিন্তু বিপরীত আক্রমণ করা যায়।]

(২০) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘ গ ১। ১ নং চিত্র দেখুন। (২১) ঘ×ঘ। ঘ×ঘ (২২)

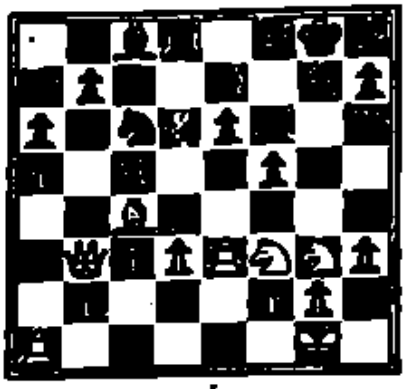

১নং চিত্র
কালোর ২০নং চাল ঘ — ঘ×ঘ ১-এর পরের অবস্থা

ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (২৩) গ×ঘ+ । ঘা—গ ১ (২৪) গ×ঘ । গ—ঘ ৩ (২৫) ঘ—ঘ ৪ । ঘ—গ ২ (২৬) ন—ঘা ১ । ঘ—গ ৩ (২৭) গ—ঘা ৪ । ঘ—ঘা গ ১ (২৮) গ×ঘ । ঘ×গ (২৯) ঘ—ঘা ৪ । গ×ঘ (৩০) ঘ—ঘা ৭ । ঘ—ন ৩ (৩১) ঘ×ঘ । ন×ঘ (৩২) ন—ঘা ৭ । ন—ঘ ৩ (৩৩) ঘ—ঘা ৪ । ঘা—ন ২ (৩৪) ঘ—ঘা গ ৪ । ঘ—ঘ ৩ (৩৫) ঘা—গ ১ । গ—ঘ ১ (৩৬) ন—ঘা ৮ । ঘ—ঘ ৩ (৩৭) ঘ—গ ৪ । ন—ঘ ৩ (৩৮) ঘ—ঘা গ ৪ । ঘ—ঘ ৪ (৩৯) ন—ঘা ৭+ । ঘা—ঘ ১ (৪০) ঘ—ঘ ৭ । ন—গ ২ (৪১) ন—ঘা ৮+ । ঘা—ঘ ২ (৪২) ঘ×ঘ। কালোর হার স্বীকার।

এই খেলায় প্রীতেশের হার দেখে যদি অনেক মনে হতে পারে কেন তারপর হার, তাকে নীচের খেলাটি দেখতে অনুরোধ করি। এই খেলাটিতে মাত্র ১৯ চালে খেলোয়াড় প্রীতেশকে খোর পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। গত রাজা চ্যাম্পিয়নশীপে প্রীতেশ এই একটি মাত্র খারাপই হেরেছিলেন। সাদা—ঘ বলে খোর, কালো—দেবব্রত দেব। নিমজোইন্ডিয়ান ডিফেন্স।

(১) ঘ—ঘ ৪ । ঘ—ঘা গ ৩ (২) ঘ—ঘ গ ৪ । ঘ—ঘা ৩ (৩) ঘ—ঘ গ ৩ । ঘ—ঘ ৩ (৪) ঘ—ঘ ২ । ঘ—ঘ ৪ (৫) ঘ—ন ৩ । ০—০ (৬) ঘ—গ ৩ । ঘ—গ ৩ (৭)

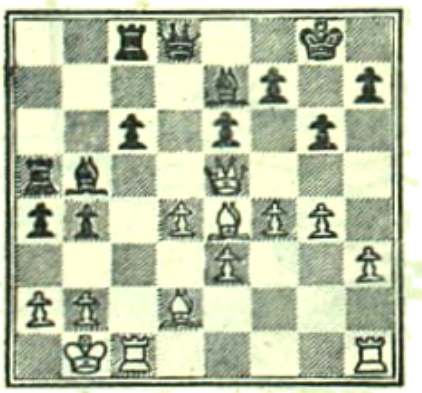

২নং চিত্র
কালোর ২৯নং চাল ন — গ.ঘ-এর পরের অবস্থা

ঘ—ঘ ৩ । ঘ ঘ—ঘ ২ (৮) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘ ৩ (৯) ঘ—ঘা ন ৩ । ন—ঘা ১ (১০) ০—০—০

মন্ত্রীর মুক্তির ওপনিংয়ের মন্ত্রীর দিকে রাজাকে দুর্গবিদ্ধ করার অন্তত দেরী করতে দিতে হয়। এই জন্যে রাজা-মাস্টারদের খেলায় এই চালটা খুব কম দেখা যায়। সেন্টার এরেঞ্জমেন্ট কম থাকলে হয়ত এই চাল দেয়া যেতে পারে, কিন্তু এখন দুই সেন্টারে বেশ টেনসন রয়েছে। কালোর এই ত্রুটিকে সাদা যেন সুশৃঙ্খলভাবে কাজে লাগিয়েছে।]

(১০)...ঘ×ঘ (১১) ঘ×ঘ । ঘ—ঘ ৪ (১২) গ—ঘ ৩ । ঘ—ঘ ন ৪

[কালোর সুন্দর পজ - স্টেরঁ করেছে। দুই রাজা যখন রাজের একদিকে কোট না খেয়ে বিপরীত দিকে কোট খাবে, তখন যে পক্ষ আগে বিপক্ষকে এইভাবে আক্রমণ করতে পারে, সে পক্ষই সাধারণতঃ জয়ী হয়। সাদার পজ - স্টেরঁ এখনো সুদৃঢ় হয়নি।]

(১৩) ঘ—ঘা ৪ । গ—ঘা ২ (১৪) ঘ×ঘ । ঘ×ঘ (১৫) ঘ—ঘা ৪ । ন—ঘ ৩ (১৬) ঘ—গ ২ । গ—ঘ ২ (১৭) ঘ—ঘ ৪

[যে পক্ষ খেকারায় পড়েছে, সে পক্ষ সব সময় ড্রও পারে ঘুঁটি বদল করতে চাইবে, তাই খেলার এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে।]

(১৭).....ঘ—ঘ ৩ [তা না হলে (১৮) ঘ×ঘ+ । গ×ঘ (১৯) গ×ঘ+]

(১৮) ঘ×ঘ । গ×ঘ (১৯) গ—ঘা ৪ । ঘ—ঘ ৩ (২০) ঘ—গ ৪ । গ—ঘা ২

(২১) ঘা—ঘ ১

[এই মুহূর্তে অত্যন্তরোধনীয় চাল। এখানে ঘ—ঘ ৪ চালটা দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।]

(২১).....ঘ—ন ৩ (২২) ঘ—গ ৪ । ঘা ন—ঘ গ ১ (২৩) ন—ঘ গ ১ । গ—ন ৩ (২৪) ঘ—গ ৩ । ন—ঘ ১ (২৫) ন—ঘা ৩ । গ—ঘ গ ৪ [কালো ১টি সুন্দর ট্রাপ তৈরী করতে চলেছে। সাদার মন্ত্রী যে সেন্টারেই যাবে পড়তে পারে সাদার সেদিকে যেয়াল নেই।]

(২৬) ঘ—ঘা গ ৪ । ন—ন ৪। ২ নং চিত্র দেখুন। (২৭) গ×ঘ ঘ চালটা ছিল এই আশায় যে (২৭).....গ—ঘ ৬+ (২৮) গ×গ । ন×ঘ (২৯) ঘ ঘ×ন এবং মন্ত্রীর বদলে অন্তত পক্ষে ১টি নৌকা এবং একটি সব পাওয়া যায়। কিন্তু কালোর একটি সহজ উত্তর চালে ছেয়ে ন ঘ×গ এবং সাদার খেলা আর খাটানো যায় না।]

(২৭).....ন ঘ×গ (২৮) ঘ—ঘা ৪ । ঘ—ঘ ৪ (২৯) গ×ঘ । ঘা ঘ×ঘ (৩০) ঘ—ঘ ৩ । ঘ—ঘ ৬+ (৩১) ঘা—ন ১ । ন—ঘ ৪ (৩২) ঘ×ঘ । গ×ঘ (৩৩) ঘ—ঘ ৩ । ন (১) —ঘ ১ (৩৪) ন—ঘ ২ । ঘ×গ (৩৪) ঘ×গ । ন—ঘ ৬ (৩৬) ন×ঘ । ঘ—ন ৬ (৩৭) ন—ঘ ১

[যদি (৩৭) ঘ×ঘ তাহলে (৩৭)... গ×ঘ + (৩৮) ন—ন ২ । ন—ঘ ৮ মাত]

(৩৭).....ঘ×ঘ + (৩৮) ন×ঘ । ঘ×ন খেলার হার স্বীকার। —অবসরপ্রাপ্ত মেজর

খেলাধুলা

সম্পাদক

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান

কটকের বারবাটী স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৫তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান মহাসমারোহে শেষ হয়েছে। ১৮টি রাজ্য এসোসিয়েশন, সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে দল—এই সমস্ত নিয়ে মোট ২২টি ক্রীড়া সংস্থার প্রায় ২,০০০ জন প্রতিনিধি ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল ডঃ এস এস আরমাদী জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। যোগদানকারী প্রতিযোগিদের পক্ষ থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যা রাজ্য দলের অধিনায়িকা কুমারী অরুণা মিত্র। কোনারকের সাবিত্র সূর্যমন্দির প্রাঙ্গণে সূর্যরশ্মির সাহায্যে যে প্রতিযোগিতা করা হয় তা দৌড়বীরেরা ৩০ মাইল দৌড়ে কটকের বারবাটী স্টেডিয়ামে বহন করে আনেন। স্টেডিয়ামের একটি আধারে এই অগ্নি ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি লগ্ন পর্যন্ত অনির্বাণ ছিল।

উড়িষ্যার বি সিংহ বালকদের (১৮ বছরের নীচে) ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পাওয়ার সূত্রে আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম ব্যক্তি পদক জয়ের গৌরব লাভ করেন। অ্যাথলেটিক্স বিভাগে ১৮টি নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে—পুরুষ বিভাগে ৬টি, মহিলা বিভাগে ১টি এবং বালক ও বালিকা বিভাগে ১১টি। বড়দের বিভাগে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা অ্যাথলীট প্রজাতিকারণে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেননি এবং যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁরাও স্ব-প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড অথবা অন্যের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। বড়দের বিভাগে নতুন রেকর্ড করেছেন। পুরুষ বিভাগে ৫০ কিলোমিটার হাঁটায় পাঞ্জাব দলের কিরেন সিং (সময় ৪ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৪৬·৪ সেকেণ্ড) এবং সটপুটে সার্ভিসেস দলের যোগীন্দর সিং (দূরত্ব ১৭ মিটার); মহিলা বিভাগে ৪—১০০ মিটার রীলেতে মহীশূরের মহিলা দল (সময় ৪১·০ সেকেণ্ড)। পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় ১০·৬ সেকেণ্ডে শেষ করে প্রথম হয়েছেন মহীশূরের ২৪ বছরের অ্যাথলীট এ এল রাজন্নাথী। ১৯৬৩ সালে রেলওয়ের কেরেন পাওয়েল ১০০ মিটার দৌড়ে যে জাতীয় রেকর্ড (১০·৪ সেঃ) করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ হয়ে রেল।

১৫০০ মিটার বিজয়ী এবং নতুন রেকর্ড ধারী কিরেন সিং (পাঞ্জাব)

অ্যাথলেটিক্স বিভাগ

ফলাফল চ্যাম্পিয়ান।

পুরুষ বিভাগ: ১ম উত্তরপ্রদেশ (৩০ পয়েন্ট), ২য় বিহার (৩৭ পয়েন্ট), ৩য় কেরালা (৩২ পয়েন্ট)।

অম্বালিকা রঙ্গুয়ার (বাংলা) জিমন্যাস্টিকে মহিলা চ্যাম্পিয়ান

মহিলা বিভাগ: ১ম মহীশূর (৩২ পয়েন্ট), ২য় মাদ্রাজ (২১ পয়েন্ট) ৩য় বাংলা (১৯ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ (১৪ বছরের নীচে): ১ম উড়িষ্যা

বালক বিভাগ (১৮ বছরের নীচে): ১ম উড়িষ্যা

বালিকা বিভাগ (১৪ বছরের নীচে): ১ম উড়িষ্যা

বালিকা বিভাগ (১৬ বছরের নীচে): ১ম মহীশূর

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান।

পুরুষ বিভাগ: সাব সিং (উত্তরপ্রদেশ)

মহিলা বিভাগ: পি ভাসুলক্ষ্মী (মাদ্রাজ)

জিমন্যাস্টিক্স

দলগত চ্যাম্পিয়ান।

পুরুষ 'ক' বিভাগ: ১ম সার্ভিসেস

পুরুষ 'খ' বিভাগ: ১ম বাংলা

মহিলা বিভাগ: ১ম পাঞ্জাব

বালক বিভাগ: ১ম ত্রিপুরা

বালিকা বিভাগ: ১ম পাঞ্জাব

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান।

পুরুষ 'ক' বিভাগ: রাম নিবাস (পাঞ্জাব) এবং জি রমেশ্বা (সার্ভিসেস—যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান

মহিলা বিভাগ: অম্বালিকা রঙ্গুয়ার (বাং)

বালক বিভাগ: হরি কৃষ্ণন (ত্রিপুরা)

বালিকা বিভাগ: জসবীর কর (বাংলা)

ভারোত্তোলন

দলগত অবস্থান: ১ম সার্ভিসেস (৬২ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (৫০), ৩য় বাঙ্গালোর (১৮)।

ত্রিকেট

ত্রি-কোণীয়ঃ ১ম ফেলওয়ে (৪২-৩ পয়েন্ট), ২য় ইন্ডিয়ানা (২৬) এবং ৩য় উইসকন্সিন (১৪-৩)

ত্রি-কোণীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ফেলওয়ে ৬টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়। একটি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে ইন্ডিয়ানা, মিশিগান এবং উইসকন্সিন।

ত্রি-কোণ-হকিঃ ১ম মিশিগান (৩৮ পয়েন্ট), ২য় ফেলওয়ে (২৭) এবং ৩য় ইন্ডিয়ানা (২৩)।

মাইকেল প্রতিযোগিতা

দলগত চ্যাম্পিয়নঃ
পুরুষ বিভাগঃ মিশিগান
মহিলা বিভাগঃ মন্টগোমেরি
মিশিগান বিভাগঃ মন্টগোমেরি

ফুটবল

ফুটবল ফাইনালঃ ১ম মিশিগান (৫১ পয়েন্ট), ২য় ফেলওয়ে (১৩) এবং ৩য় ইন্ডিয়ানা (১৪)

'পঞ্চপাণ্ডব' খেতাব

১৯৭০ সালের ফাইনালকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের ক্রীড়াপ্রেমী প্রতিটি ঘরে যিনি খেলার বে-সব জানা ও অজানা খুঁটিনাটি বিষয় সরবরাহ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রবীণ ক্রীড়াবিদ টমাস টিম্পসন হক এবং এই দুই টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—এ্যাসক্লী প্রসন্ন এবং বিশেন সিং বেদী। এঁরা ত্রিমূর্তিকেই 'পঞ্চপাণ্ডব' খেতাব দেওয়া হয়েছে। বিহারের প্রবীণ ক্রীড়া-সংগঠক টমাস টিম্পসন হক ভারতবর্ষে অলিম্পিক খেলায় যোগদান প্রসঙ্গে দীর্ঘ ক্রীড়িত ভাষণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। এ্যাসক্লী প্রসন্ন এবং বিশেন সিং বেদী বর্তমানে সবচে পরিচিত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়।

এ্যাসক্লী প্রসন্ন

বিশেন সিং বেদী

প্রসন্ন এ পর্যন্ত ৭২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৩০০৭ রানে ১১০টি উইকেট পেয়েছেন। বেদী ১১টি সরকারী টেস্ট খেলায় সূত্রে ১৭১৪ রানে পেয়েছেন ৭০টি উইকেট।

রোহিন্টন বাড়িয়া ট্রফি

রায়পুরের আন্তঃবিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ৩ উইকেটে বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে রোহিন্টন বাড়িয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাঙ্গালোর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সূত্রে মূল প্রতিযোগিতার সর্বশেষ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

প্রথম দিনের খেলায় বাঙ্গালোরের বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংস ১২১ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। প্রথম দিনে ১৭টি উইকেটের পতন ঘটিয়ে খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস ১৭২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৫১ রানে এগিয়ে যায়। বাঙ্গালোরের দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১০ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে বাঙ্গালোরের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে বোম্বাই অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় ১৮৬ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং এক উইকেট খুইয়ে ৬৭ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে নামের পর . বাম ঘন্টা খেলে বোম্বাই ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৬ রান তুলে ৩ উইকেটে জয়ী হয়।

সর্বাধিক রান

বাঙ্গালোরঃ ১২১ রান (রাঘবাচারী ৪৫ রান। অবশিষ্ট ৪০ রানে ৬ এবং বি কে সাহ ৩০ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৩৬ রান (অতিরিক্ত ১০ রান। বিশ্বনাথ ৭২ রানে ৬ উইকেট)

বোম্বাইঃ ১৭২ রান (পাতাসকর ২৯ রান ও ১৮৬ রান (৭ উইকেটে)। কার্নিক ৩২ এবং ঘাবারি ৩১ রান। অবশিষ্ট ৪৩ রানে ৩ এবং প্রোসেন ৪৯ রানে ৩ উইকেট)

স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্কুল ক্রমার সিংহল স্কুল দলের এই টেস্ট খেলাটি ড্র যেছে। ১৯৭০ সালের টেস্ট সিরিজে সিংহল বর্তমানে ১—০ খেলায় (ড্র ৩) এগিয়ে আছে। আগামীর ৩য় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা ড্র হলেও সিংহল 'রাবার' জয়ী হবে।

পরলোকে প্রবীর সেন

প্রথম বাঙ্গালী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রবীর সেন গত ২৭শে জানুয়ারী হৃদ-রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ক্রীড়ামহলে তিনি পি সেন এবং খোকন সেন নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর খেলোয়াড়-জীবনে প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলবার সময়ে

প্রবীর সেন

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৪৮ সালের ১৪ জানুয়ারী, মেলবোর্ন মাঠে (সিরিজের ৫ টেস্ট)। শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেন ১৯৫ সালে। এই সময়ের মধ্যে তিনি ১৪টি সরকারী টেস্ট ম্যাচে উইকেট-কিপার হিসাবে দলভুক্ত হন (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ৫টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫টি, ইংলণ্ড ৩টি এবং পাকিস্তান ১টি)।

মূল পূর্বাচলের প্রাইজের ত্রি-রঙা পূজা-সংখ্যা শারদীয়ার সময়ে অধিক পরিমাণে প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও অতঃপর ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

অমিয় নিমাই-চরিত

৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি খণ্ড ৩·০০

কালাচাঁদ গীতা

৬ষ্ঠ সংস্করণ ৩·০০

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২·০৫

নরত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২·০০

লর্ড গৌরাঙ্গ

(২টি খণ্ড) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড

নরত্তম চরিত

(হিন্দী) ২·০০

নয়শো রুপিয়া ও বাজারের লড়াই

(নাটক) ১·৫০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা

(৮ম সংস্করণ) ১·৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH

De-luxe Ed. — Rs. 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH

Popular Ed. — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান ।

চাঁদে কি মাটি আছে, যাতে মশলা জন্মায়?
বোধ হয় না!
কিন্তু পৃথিবীতে তো সেই একই মাটিই আছে, যে মাটীতে মশলা জন্মায়!
যেতা সামান্য, শুধু মশলার দীলপুড়ে, আর মিশলা জন্মায়!
তবে এত গুঁড়ো মশলা আসে কোথেকে?
যেতা সব বাজে মাল বাজার থেকে কিনে মশলায় ভিজাল প্যাকেট করা!
এই মরেচে! সব্বনাশ হয়ে গেল! এতো গুঁড়ো মশলা খেয়ে মানুষ বাঁচবে কি করে?
দেখ! একটি গুঁড়ো মশলার নিজ কারখানা আছে - তুলসী!
এরা নিজেরাই মশলা দেখে শুনে কিনে প্যাকেট তৈরি করে!
এখন এই গুঁড়ো মশলা খাওয়ার কথা চিন্তাই পরিত্যক্ত করা!

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত কড়কমি—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ, ২০৫, মহর্ষি